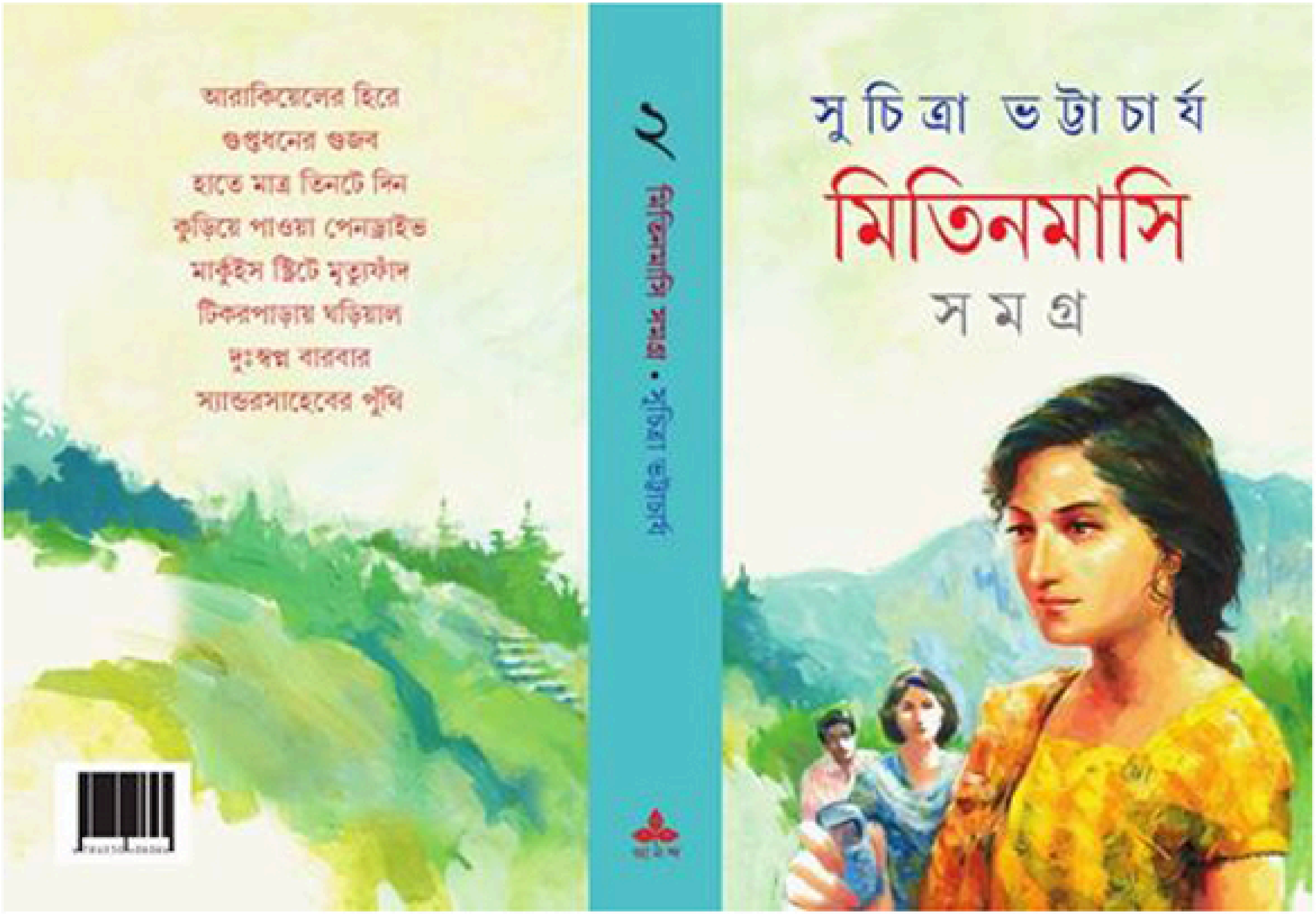
আরাকিয়েলের হিরে
গুপ্তধনের গুজব
হাতে মাত্র তিনটে দিন
কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ
মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ
টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল
দুঃস্বপ্ন বারবার
স্যান্ডরসাহেবের পুঁথি
২
মিতিনমাসি সমগ্র • সুচিত্রা ভট্টাচার্য
সুচিত্রা ভট্টাচার্য
মিতিনমাসি
সমগ্র

কিশোর কাহিনি সিরিজ

আরাকিয়েলের হিরে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আরাকিয়েলের হিরে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

আদরের চরকি,

ওরফে শরণ্যা বাগ্‌চীকে

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

পার্থমেসোর সঙ্গে জমিয়ে দাবা খেলছিল টুপুর। খেলা তো নয়, যুদ্ধ! শুরু হয়েছে সেই দুপুর থেকে, রবিবারের বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে, এখনও লড়াই থামার কোনও লক্ষণ নেই। টক্কর চলছে সমানে-সমানে। দু'পক্ষেরই স্নায়ু টানটান, একটা কী হয়, কী হয় ভাব! কালো বোড়েটাকে ষষ্ঠ ঘরে ঠেলে দিয়ে টুপুর একবার চোরা চোখে দেখে নিল পার্থমেসোকে। মাথাখানা চৌষট্টি খোপের বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ভুরুতে ইয়া মোটা ভাঁজ। হবেই তো! মেসোর হাল এবারও মোটেই সুবিধের নয়। টুপুর খুইয়েছে একটা গজ, একটা ঘোড়া, আর দু'খানা বোড়ে। ওদিকে মেসোর দু'টো হাতিই খতম, তিন-তিনখানা সাদা বোড়ে অক্কা পেয়েছে, সাদা মন্ত্রীরও ল্যাজে-গোবরে দশা।

মেসোকে আরও চাপে ফেলতে টুপুর তাড়া লাগাল, "কী গো, আর কত ভাববে? মুভ করো।"

পার্থ গম্ভীর মুখে বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া। সব দিকটা বুঝে নিই।"

"কম্পিটিশনে খেললে তুমি কিন্তু টাইম প্রবলেমে পড়ে যাবে। কোথাও তোমায় এত সময় দেবে না।"

"খুব ডেঁপো হয়েছিস তো! আমাকে নিয়ম শেখাচ্ছিস?" পার্থর দৃষ্টি তেরচা হল, "কবে থেকে দাবায় এত ওস্তাদ বনে গেলি রে? অবনীদার সঙ্গে রোজ প্র্যাক্টিস করিস বুঝি?"

"বাবা আজকাল থোড়াই দাবা খেলেন।"

"তা হলে কি তোর মাসির ট্রেনিং?"

টুপুর মুচকি হাসল। পার্থমেসোকে কেন বলতে যাবে, মিতিনমাসির টিপ্‌স সে পাচ্ছে বটে, কিন্তু আদতে তার উন্নতি তো ঘটেছে কম্পিউটারের সঙ্গে খেলে-খেলে। এই তো, এ বাড়িতে আসার পর, গত সাতদিনে আরও কত নতুন-নতুন চাল যে শিখল। নানান ধরনের ডিফেন্স, নয়া-নয়া কৌশলে আক্রমণ...। কম্পিউটারের শিক্ষা থেকেই তো এবার রক্ষণব্যূহ সাজিয়েছে নিমো-ইন্ডিয়ান কায়দায়, যা ভেদ করতে হিমশিম খাচ্ছে মেসো। এখন একবার যদি ভুল করে মন্ত্রীটাকে পিছিয়ে নেয়...।

হ্যাঁ, তাই হল। মন্ত্রী কোনাকুনি দু'ধাপ হঠে গিয়েছে। ব্যস, টুপুরকে আর পায় কে। লাফিয়ে উঠল কালো ঘোড়া, আড়াই ঘরের মোক্ষম প্যাঁচে একসঙ্গে পাকড়াও করেছে সাদা মন্ত্রী আর নৌকোকে। মেসোর মাথায় হাত। চুল খামচাচ্ছে।

ঠিক তখনই হুড়মুড়িয়ে বুমবুমের প্রবেশ। পার্কে ফুটবল পেটাতে গিয়েছিল, বিস্তর আছাড় খেয়েছে, সর্বাঙ্গ ধুলোকাদায় মাখামাখি। সটান টুপুরের পাশে বসে পড়ে বলল, "ও মা, তোমরা এখনও খেলছ?"

পার্থ গোমড়া গলায় বলল, "সোফা নোংরা কোরো না বুমবুম। যাও, জামা-প্যান্ট বদলে এসো।"

"বুঝেছি।" বুমবুম ফিচেল হাসল, "তুমি টুপুরদিদির কাছে হারছ।"

"চোপ! যাও এখান থেকে।"

বুমবুম পলকে ধাঁ। পার্থর ধমক শুনে এবার মিতিন আবির্ভূত হয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী? হঠাৎ চেঁচামেচি কেন? টুপুরের সঙ্গে পারছ না বুঝি?"

পার্থ অপ্রস্তুত হয়েছে এতক্ষণে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আরে দুর, টুপুরের সঙ্গে আবার পারাপারির কী আছে! ছোটদের জিতিয়ে

দিলে তবেই তো তারা খেলায় উৎসাহ পাবে।"

"ভুলভাল যুক্তি সাজিয়ো না," মিতিন ফিক করে হাসল, "দাবাটা ছোটরাই ভাল খেলে স্যার। তারা অনায়াসেই বড়দের পটকে দেয়। কেন বলো তো?"

"ছোটদের মাথায় প্যাঁচপয়জারগুলো ভাল খেলে বোধ হয়।"

"আজ্ঞে না স্যার। ছোটদের মেমরি ব্যাঙ্কের স্টক কম, কিন্তু যেটুকু তাদের মেমরিতে থাকে, সেটুকু তারা সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণে আনতে পারে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক দেখবে, অতিরিক্ত মেমরির ভারে হ্যাং করে যায়। আমাদের, বড়দের হয় সেই দশা। ছোটরা অবলীলায় সম্ভাব্য ষাট-পঁয়ষট্টিটা চাল মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী আক্রমণ শানিয়ে যায়। বড়রা কিন্তু তা পারে না। তাই একটা বয়সের পর ফিশার-কাসপারভদের মতো প্রতিভাধরদেরও দাবার আসর থেকে সরে যেতে হয়। অথচ ওঁরাই পনেরো-ষোলো বছর বয়সে দুনিয়া কাঁপিয়েছিলেন। তিরিশ পেরোবার আগেই হয়েছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।"

"রাইট, রাইট।" পার্থ উজ্জীবিত হয়েছে, "বিশ্বনাথন আনন্দই তো কম বয়সে...। কিংবা আমাদের ঘরের ছেলে সূর্যশেখর বা দিব্যেন্দু..."

"অতএব বুঝতে পারছ, টুপুরের কাছে হারায় কোনও লজ্জা নেই।"

"যাঃ, লজ্জা পাব কেন!" টুপুরের মাথায় আলগা চাপড় দিল পার্থ, "মন দিয়ে দাবাটা খেল রে টুপুর। তোর হবে। আমাকে যখন দু'-দু'বার হারাতে পেরেছিস...। জানিস তো, আমি খুব একটা হেঁজিপেঁজি প্লেয়ার নই। আন্ডার ফিফটিনের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে..."

"তুমি লাস্ট হয়েছিলে, তাই তো?" মিতিন ফোড়ন কাটল।

"নো। আমার নীচে আরও দু'জন ছিল।" পার্থ হ্যা হ্যা হাসছে, "যাক গে, একটু গরম-গরম কফি খাওয়াবে?"

"দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের খেলাটা যে এবার বন্ধ করতে হবে।"

"কেন?"

"আমার কাছে এক্ষুনি একজন আসবেন।"

"কে?"

"জনৈক আর্মেনিয়ান মহিলা।"

"আর্মেনিয়ান? তিনি তোমার সন্ধান পেলেন কী করে?"

"হয়তো কাগজে পড়ে। কিংবা কোনও ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন। আমার থার্ড আইয়ের নাম তো এখন একেবারে অপরিচিত নয়।"

দাবা ভুলে গিয়েছে টুপুর। টগবগ করে ফুটছে উত্তেজনায়। চোখ গোল-গোল করে বলল, "তা হলে একটা নতুন কেস বলো? আমার সামার ভেকেশনটা তা হলে মাঠে মারা যাচ্ছে না?"

"ধীরে মিস ওয়াটসন, ধীরে। আগে তিনি পায়ের ধুলো দিন, তাঁর সমস্যাটা কী শুনি, আদৌ তাঁকে ক্লায়েন্ট হিসেবে নেব কিনা ভেবে দেখি... তারপর না হয় নাচনকোঁদনটা শুরু করিস।"

তা মিতিন যতই জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করুক, টুপুরের কৌতূহল কিন্তু নিবল না। একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। মিতিন রান্নাঘরে যেতেই পার্থমেসোকে জিজ্ঞেস করল, "আর্মেনিয়ান মহিলার কী কেস হতে পারে বলো তো?"

পার্থ দাবার ঘুঁটি বাক্সে পুরছিল। ঠোঁট উলটে বলল, "কী করে আন্দাজ করি বল। দু'-চার দিনের মধ্যে লোকাল আর্মেনিয়ানদের নিয়ে কোনও ঘটনা কাগজে বেরিয়েছে কিনা তাও তো মনে পড়ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আর্মেনিয়ানরা মূলত বেনিয়া। অর্থাৎ কেসটা ধরলে তোর মাসির টু পাইস আসবে।"

মিতিন শুনতে পেয়েছে কথাগুলো। গলা উঠিয়ে বলল, "গাছে

কাঁঠাল গোঁফে তেল কোরো না। কলকাতার আর্মেনিয়ানরা মোটেই তেমন বড়লোক নন। অন্তত এখন যাঁরা থাকেন। এবং এঁদের অধিকাংশই বয়স্ক। অনেকে চার্চ থেকে সাহায্য পান, আবার কেউ-কেউ ক্রিশ্চানদের হোম-টোমেও আছেন।"

পার্থ বলল, "যাচ্চলে, তা হলে তুমি মহিলাকে আসতে বললে কেন? বেগার খাটবে নাকি?"

মিতিন ফের গলা তুলে বলল, "ঠিকঠাক কেস হলে এই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি কখনওই টাকার হিসেব করে না স্যার।"

এ কথা জজেও মানে। টুপুর মনে-মনে সায় দিল। নয়-নয় করে কম কেসে তো মাসির শাগরেদি করল না সে। স্রেফ অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিতিনমাসি কোনও রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, এমনটা কি কখনও দেখেছে? এই তো, গত বছরই কী দারুণ একটা কেরামতি দেখাল। বিয়ের বাহাত্তর ঘণ্টা আগে কনের নেকলেস উধাও। মাত্র এক দিনেই মিতিনমাসি উদ্ধার করে আনল কণ্ঠহার। গরিব মেয়েটার বাবার কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয়নি মিতিনমাসি। তেমন অভাগা কেউ এলে মিতিনমাসি অবশ্যই এবারও টাকা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি রাখতে গিয়েছিল পার্থ। ফিরে সোফায় হেলান দিয়েছে। বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, "কলকাতার সঙ্গে আর্মেনিয়ানদের কিন্তু একটা নাড়ির টান আছে।"

টুপুর নড়ে বসল, "কী রকম?"

"সাদা চামড়াদের মধ্যে ওরাই কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা। ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমারদের ঢের আগে ওরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। জব চার্নক আমাদের এই শহরে এসেছিলেন ষোলোশো নব্বইতে। তার অন্তত ষাট বছর আগে কলকাতায় এক আর্মেনিয়ান মহিলাকে সমাধি

দেওয়া হয়। মহিলার নাম ছিল রেজা বিবি। বিশ্বাস না হয় আর্মেনিয়ান চার্চের গোরস্থানে গিয়ে সমাধিফলকটা দেখে আসতে পারিস।"

ছোট ট্রে-তে কফি সাজিয়ে মিতিন হাজির। কাপগুলো হাতে-হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না স্যার। একটা মাত্র সমাধি দেখেই ধরে নেব, আর্মেনিয়ানরা তখন এখানে বাস করত?"

"কেন ধরব না শুনি?"

"গির্জার সমাধিক্ষেত্রে ওই সময়কার আর কোনও আর্মেনিয়ানের সমাধি নেই, তাই। ইতিহাস বলছে, ওখানে নেক্সট সমাধি আছে সতেরোশো কুড়িতে। মাঝে আশি-নব্বই বছরে আর একজনও আর্মেনিয়ান মারা যাননি বলতে চাও?" কফিতে চুমুক দিয়ে মিতিন টুপুরের দিকে ফিরল, "আসলে কী হয়েছিল জানিস? কলকাতা তো তখন ঘোর জঙ্গল। বনজঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে গোটাকয়েক গ্রাম ছাড়া এখানে আর কিস্যু ছিল না। ...আমার ধারণা, নদী দিয়ে তখন হয়তো কোনও আর্মেনিয়ান জাহাজ যাচ্ছিল, ওই মহিলা কোনও অসুখবিসুখে জাহাজে মারা যান, কাছেই ডাঙায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর যখন শহরটা গড়ে উঠল, তখন ওই সমাধিটা খুঁজে পেয়ে আর্মেনিয়ানরা ওখানেই একটা চার্চ প্রতিষ্ঠা করলেন।"

পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে আর্মেনিয়ান চার্চ পরে হয়েছে?"

"অবশ্যই। রেজা বিবি মারা গিয়েছেন ষোলোশো তিরিশে। আর চার্চটা তৈরি হয়েছে সতেরোশো চব্বিশে। মাঝে চুরানব্বইটা বছরের ব্যবধান, বুঝলে।"

তর্কে জুত করতে না পেরে পার্থ গুম। টুপুর মুগ্ধ চোখে

মিতিনকে বলল, "তুমি আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কেও এত খবর রাখো?"

মিতিন চোখ টিপে বলল, "ধুস, আমিও কি এত জানতাম নাকি? মহিলা কাল ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পর ইন্টারনেট ঘেঁটে মগজব্যাঙ্কটাকে একটু ভারী করে নিলাম। তোর মেসো তো পুরনো কলকাতার উপর হেভি ফান্ডা লড়ায়, ওকেও একটু চিপে দেওয়া গেল।"

এবার পার্থও হেসে ফেলেছে। মিতিনকে পালটা খোঁচা দেওয়ার জন্য জিভে শান দিতে যাচ্ছিল, ডোরবেল টুংটাং।

টুপুর অস্ফুটে বলল, "মহিলা এসে গেলেন নাকি?"

"মনে হচ্ছে।" মিতিন দেওয়ালঘড়িটা দেখল, "খুব পাংচুয়াল তো! সাড়ে ছ'টায় আসবেন বলেছিলেন, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায়!"

মাসি-বোনঝির কথার মাঝেই পার্থ গিয়ে দরজা খুলেছিল। আহ্বান জানিয়ে যে মহিলাকে অন্দরে নিয়ে এল, সে কিন্তু মোটেই প্রবীণা নয়। বড়জোর মিতিনের বয়সি, দু'-এক বছরের ছোটও হতে পারে। দেখে দীনদরিদ্র ভাবাও অসম্ভব। রীতিমতো ঝকঝকে চেহারা, তকতকে বেশবাস। গায়ের রংটি পাকা গমের মতো। কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা কুচকুচে কালো চুল টানটান করে বাঁধা। নীলচে চোখে বিদেশিনী-বিদেশিনী আভাস। পরনে লং স্কার্ট, আর ফুলহাতা বাহারি টপ। দু'টোই যথেষ্ট মহার্ঘ। হাতে কালো ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগের গায়ে নামী ইতালিয়ান কোম্পানির মনোগ্রাম।

মিতিন উঠে সৌজন্যের সুরে বলল, "আই অ্যাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। ইউ ক্যান কল মি মিতিন।"

"আই অ্যাম হাসমিক। হাসমিক ভারদোন।" ডিম্বাকৃতি মিষ্টি

মুখখানায় হাসি ফুটেছে। ইংরেজি টান মেশানো বাংলায় বলল, "আর্মেনিয়ানে হাসমিক মানে ইংরেজিতে জেসমিন। আমাকে সবাই 'জেসমিন' বলেই ডাকে।"

"নাইস নেম। প্লিজ় টেক ইওর সিট।"

জেসমিন ছোট সোফাটায় বসেছে। একটু যেন আড়ষ্ট। পার্থ আর টুপুরের সঙ্গে জেসমিনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিতিন বলল, "কফি চলবে?"

"নো থ্যাংক্স। আমি চা-কফি খুব কম খাই।"

"অ্যাজ ইউ প্লিজ়।"

টেবিলে পড়ে থাকা কফির ট্রে-টা ডাইনিং টেবিলে রেখে এল মিতিন। এক গ্লাস জলও এনেছে। টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে বড় সোফাটায় বসল। টুপুরের পাশে। কেজো গলায় বলল, "হ্যাঁ, এবার শোনা যাক আপনার প্রবলেমটা কী?"

পার্থ আর টুপুরকে এক ঝলক দেখে নিয়ে জেসমিন বলল, "কীভাবে যে স্টার্ট করি...। আমি থাকি মারকুইস স্ট্রিটে...।"

"নিজেদের বাড়ি?"

"না। আমার আঙ্কল, মানে পিসেমশাইয়ের বাড়ি। অনেক বছর ধরেই পিসি-পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আছি। ওঁদের কোনও সন্তান নেই তো, আমিই ওঁদের মেয়ের মতো।"

"আপনার বাবা-মা...?"

"নেই। রাশিয়া ভেঙে যখন আবার আর্মেনিয়া স্বাধীন হল, আমাকে পিসির কাছে রেখে বাবা-মা একবার দেশটা দেখতে যান। ওখানেই এক প্লেন ক্র্যাশে দু'জনে একসঙ্গে...।" জেসমিন কপালে-বুকে হাত ছুঁইয়ে ক্রস আঁকল, "তখন আই ওয়াজ সিক্সটিন। তারপর থেকে আঙ্কল-আন্টির কাছেই থাকি।"

"বিয়ে করেননি?"

"এখনও হয়ে ওঠেনি।"

"আঙ্কল-আন্টির দেখভাল করার জন্যেই কি...?"

"খানিকটা হয়তো তাই।" জেসমিন হালকা নিশ্বাস ফেলল, "আর এই মুহূর্তে তো বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।"

"কেন?"

"রিসেন্টলি আঙ্কল মারা গেলেন। গত বাইশে ডিসেম্বর। জাস্ট তিন মাস হয়েছে।"

"ও। কী হয়েছিল আঙ্কলের?"

"হার্ট অ্যাটাক। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ারও সুযোগ পাইনি।"

"কত বয়স হয়েছিল?"

"নট মাচ। ওনলি সেভেনটি থ্রি।"

মিতিনমাসির প্রশ্ন করার ধারাটা লক্ষ করছিল টুপুর। ক্রমাগত কথা চালাচালি করে কী সুন্দরভাবে সহজ করে দিচ্ছে জেসমিনকে। সঙ্গে-সঙ্গে জানা হয়ে যাচ্ছে ছোটখাটো তথ্য। যা হয়তো আপাতচোখে অদরকারি, আবার কাজে লেগে যেতেও পারে।

আলাপচারিতার ফাঁকে জেসমিন কখন যেন হাতে তুলে নিয়েছিল গ্লাসটা। জলটুকু শেষ করে একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বলল, "হ্যাঁ, যা বলতে আসা। আমরা খুব বিপদে পড়েছি ম্যাডাম।"

"কী রকম?"

"একটা হিরে ছিল বাড়িতে। আঙ্কলের মৃত্যুর পর থেকে সেটা মিসিং।"

"হিরে?" পার্থ ফস করে বলে উঠেছে, "কত বড়?"

"প্রায় পাঁচ ক্যারাট।"

টুপুরের চোখ পিটপিট। বলে কী জেসমিন? অত বড় একটা হিরে গায়েব?

॥ ২ ॥

মিতিন অবশ্য তেমন অবাক হয়নি। যেন এমন একটা কিছুই সে জেসমিনের মুখে শুনবে বলে আশা করেছিল। ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে হেলান দিল সোফায়। স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আমাকে হিরেটা উদ্ধার করে দিতে হবে, তাই তো?"

জেসমিন উৎকণ্ঠিত মুখে মিতিনকে দেখছিল। মিনতির সুরে বলল, "হ্যাঁ, ম্যাডাম। অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

"এক্ষুনি-এক্ষুনি কথা দিতে পারছি না। আগে সাফ-সাফ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই।"

"বলুন কী জানতে চান?"

"ডায়মন্ডটা এগ্‌জ্যাক্টলি কবে খোওয়া গিয়েছে?"

"আঙ্কলের মৃত্যুর পর আন্টি সিন্দুকটা প্রথম খোলেন পঁচিশে ডিসেম্বর সকালে। তখনই আবিষ্কার করেন হিরের বাক্সটা খালি।"

"অমন একটা দামি স্টোন বাড়িতে থাকত কেন?"

"তিন পুরুষ ধরে ওটা তো আয়রন চেস্টেই ছিল ম্যাডাম।"

"ইনশিওরেন্স করানো হয়নি নিশ্চয়ই?"

"থাকলে কি আর আপনার কাছে আসতাম?"

"ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে ক্লেম ঠুকে বসে থাকতেন, তাই তো? সেটা সোজাও হত অনেক।" মিতিন টানটান, "কিন্তু কেন ইনশিওরেন্স করানো হয়নি?"

"বলতে পারব না। ইনশিওরেন্সের ব্যাপারটা কখনও মাথাতেই

আসেনি। চিরকালই শুনে আসছি, আরাকিয়েল পরিবারের গুড লাক হিসেবে হিরে আয়রন চেস্টে আছে, থাকবে...।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আপনার পিসেমশাইয়ের টাইটেল বুঝি আরাকিয়েল?"

"হ্যাঁ স্যার। আঙ্কলের পুরো নাম জোসেফ মেলিক আরাকিয়েল। ওঁরা কলকাতার খুব পুরনো বাসিন্দা। প্রায় সওয়া দু'শো বছর আগে ওঁদের পূর্বপুরুষ মিস্টার আগা ক্যাচিক আরাকিয়েল কলকাতার আর্মেনিয়ান চার্চকে একটা বড় ঘড়ি উপহার দেন। গির্জার পাঁচিলটাও ওঁরই পয়সায় তৈরি।"

"বলেন কী?" পার্থর চোখ গোল-গোল, "আরাকিয়েল ফ্যামিলি দু'-আড়াইশো বছর ধরে কলকাতায়?"

"না না, মাঝে সুরাটে চলে গিয়েছিলেন। আঙ্কলের গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। মারকুইস স্ট্রিটের বাড়িটা তাঁরই তৈরি। হিরেটাও তাঁর সময় থেকেই ও বাড়িতে।"

"বুঝলাম।" মিতিনের কপালে পাতলা ভাঁজ, "তা হিরে চুরির তিন মাস পরে আমার কাছে এলেন যে বড়?"

"আগে পুলিশেরই দ্বারস্থ হয়েছিলাম ম্যাডাম। তারা তো এখনও কিছুই করে উঠতে পারল না। থানায় গেলেই শুধু শুনতে হয়, হচ্ছে-হচ্ছে, আমরা তো তদন্ত চালাচ্ছি...! এদিকে আন্টির তো চিন্তায়-চিন্তায় শরীর ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। একে আঙ্কলকে হারানোর শোক, তার উপর ওই হিরে...। মরিয়া হয়ে ভাবলাম যদি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য নেওয়া যায়...। আমার এক বাঙালি বন্ধু আপনার নামটা সাজেস্ট করল। ইনফ্যাক্ট, কালই আপনার ফোন নাম্বার পেয়েছি।"

"উম। পুলিশকে কবে ইনফর্ম করেছিলেন?"

"ওই দিনই। পঁচিশে ডিসেম্বর।"

“পুলিশ কি সঙ্গে-সঙ্গেই এল?”

“তা এল। প্রচুর জেরা করল সবাইকে। আন্টিকেও বাদ দেয়নি।”

“চাবি আর সিন্দুকের ফিংগারপ্রিন্ট নেয়নি?”

সবই করেছিল ম্যাডাম। আবার কিছুই করেনি। অর্থাৎ কিস্যু পায়নি।”

“মানে?”

“চাবি আর সিন্দুকে তো তখন শুধু আন্টির হাতের ছাপ।”

“হুম। তা চাবি কি আন্টির কাছেই থাকত?”

“না না, চাবি তো সর্বদাই আঙ্কলের জিম্মায়। কোমরে বাঁধা থাকত। সিন্দুকও আঙ্কল ছাড়া কেউ খুলতেন না। তবে এখন চাবি আন্টির হাতে এসেছে।”

“এখন মানে কখন?”

“অবশ্যই আঙ্কলের মৃত্যুর পর।”

“আপনার পিসেমশাইয়ের হার্ট অ্যাটাকটা কখন হয়েছিল?”

“রাতে। শোওয়ার পর। চেস্ট পেন ওঠার মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই তো সব শেষ।”

“তখন বাড়িতে আপনারা কে কে ছিলেন?”

“আমি, আন্টি আর নির্মলা।”

“নির্মলাটি কে?”

নির্মলা মেরি বিশ্বাস। আমাদের হাউস মেড। রাতদিন থাকে। বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছে।”

“অর্থাৎ আঙ্কল যখন মারা যান, বাড়িতে আপনারা তিনজনই...?”

“তা কেন, ডাক্তারবাবুও ছিলেন। ডাক্তারের হাতের উপরেই তো আঙ্কল...। ফোনে খবর পেয়ে হ্যারিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চলে এল।”

"হ্যারি...?"

"আঙ্কলের দাদার ছেলে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে থাকে। কারনানি ম্যানশনে। এ ছাড়া নির্মলা ঘাবড়ে গিয়ে ভাড়াটেদের খবর দেয়। তারাও এসে গিয়েছিল।"

"আপনাদের ক'জন ভাড়াটে?"

"দু'টো ফ্যামিলি। একতলায় থাকে।"

"তাঁরাও কি আর্মেনিয়ান?"

"এই শহরে আর্মেনিয়ান আর কোথায় ম্যাডাম। কমতে-কমতে সাকুল্যে আমরা এখন একশো'জন হব কিনা সন্দেহ। বেশির ভাগই হয় অস্ট্রেলিয়ায় কেটে পড়েছে, নয়তো ব্যাক টু আর্মেনিয়া।" জেসমিনের মুখে বিষণ্ণ হাসি, "আমাদের টেনেন্টদের মধ্যে একটা ফ্যামিলি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, অন্যটি কেরালাইট ক্রিশ্চান।"

"আর কে এসেছিল সেদিন?"

"বাহাদুর... মানে আমাদের দারোয়ান এক-দু'বার দোতলায় উঠেছিল। ডাক্তারবাবু যে ইঞ্জেকশনটা লিখে দিয়েছিলেন, বাহাদুরই দৌড়ে গিয়ে কিনে আনে। ওষুধটা অবশ্য পুশ করার আর সময় পাওয়া যায়নি।"

"তার মানে সেদিন রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে অনেক লোক?"

"হ্যাঁ, যাদের কথা বললাম। ভাড়াটেরা আসা-যাওয়া করছিল, হ্যারি তো থেকেই গেল। ও হ্যাঁ, হ্যারির বউ সুজানও এসেছিল। ভোর রাতে।"

"আপনারা কি সারারাত আঙ্কলের ডেডবডির পাশে ছিলেন?"

"কেউ না-কেউ তো ছিলই। হয় নির্মলা, নয় হ্যারি, কিংবা একতলার কেউ। আমি ঢুকছি, বেরোচ্ছি...। মাঝে অবশ্য ঘণ্টা খানেকের জন্য নিজের ঘরে গিয়েছিলাম। আন্টি খুব কান্নাকাটি

করছিলেন তো, তাই জোর করে তাঁকে আমার ঘরে শোওয়াতে হয়েছিল। আন্টির মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে কখন আমারও চোখ দু'টো একটু জড়িয়ে আসে। সুজান আসার পরে অবশ্য জেগে যাই। তারপর তো একের পর-এক আত্মীয়, প্রতিবেশী, আর বন্ধুরা আসতে শুরু করল।"

"ফিউনারেল কি পরদিনই হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। সকালেই বডি পিস হ্যাভেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে সূর্যাস্তের আগেই...।" জেসমিন রুমালের খুঁটে চোখের কোল মুছল। শুকনো হেসে বলল, "এর পর আপনি কী প্রশ্ন করবেন, আমি জানি ম্যাডাম। ...হ্যাঁ, পিস হ্যাভেনে পাঠানোর আগে আঙ্কলকে যখন সুট পরানো হচ্ছে, তখনই সুজান আঙ্কলের কোমর থেকে সিন্দুকের চাবিটা খুলে আন্টির হাতে দেয়। যদ্দুর জানি, আন্টি তারপর থেকে চাবি আর কাছছাড়া করেননি।"

মিতিন হেসে ফেলল, "ভালই থট রিডিং পারেন দেখছি।"

"তা নয় ম্যাডাম। বেশ কয়েকবার পুলিশের কাছে এই ভাইটাল কোয়েশ্চেনটার উত্তর দিতে হয়েছে যে।"

পার্থ বলল, "হবেই তো। ওটাই তো আসল পয়েন্ট। একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে, রাত্তির থেকে ভোরের গ্যাপটুকুর মধ্যে হিরেটাকে সরানো হয়েছে। মিস্টার আরাকিয়েলের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে হাতানো এবং সিন্দুক লক করে আবার চাবি কোমরে গুঁজে দেওয়া, এ তো জাস্ট মিনিট কয়েকের কাজ।"

"পুলিশও তো তাই বলছে। যুক্তিও।" জেসমিন দু'দিকে মাথা নাড়ল, "কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। ভেবেই পাচ্ছি না, শোকের মুহূর্তে কে ওই অপকর্ম করতে পারে!"

"আপনার মনটা বোধ হয় একটু বেশি সরল মিস ভারদোন।"

পার্থ ভুরুতে ঢেউ খেলাল, "ভেবে দেখুন, সেই রাত্তিরে যারা ডেডবডির কাছাকাছি ছিল, তারা সকলেই তো ডায়মন্ডটার কথা জানত?"

"তা ঠিক। তবে...।"

"তবেটবে কিছু নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ কী না করতে পারে! আমার তো মাথাতেই ঢুকছে না, কী করে আপনার পিসেমশাই ওরকম একটা দামি জিনিস ঘরে রাখার সাহস পেয়েছিলেন! সেদিন নয় ডামাডোল ছিল, এমনি দিনেই তো ওটা যে-কোনও সময় চুরি-ডাকাতি হয়ে যেতে পারত।"

"না, সেটা বোধ হয় সহজ ছিল না। আঙ্কল অসম্ভব সাবধানি ছিলেন। বাইরের লোক তো দূরস্থান, আমাদের কারওর সামনে উনি সিন্দুক খুলতেন না। এমনকী আন্টির সামনেও নয়। তা ছাড়া সিন্দুকে সিকিউরিটি অ্যালার্মের বন্দোবস্ত আছে। চাবি ছাড়া খোলা বা ভাঙার চেষ্টা করলে সাইরেন বেজে উঠবে।"

"কিন্তু চাবিটার জন্য তো উনি যে-কোনও দিন মার্ডারও হয়ে যেতে পারতেন।"

"সে ভয় তো ছিলই। আমি আর আন্টি কতবার বুঝিয়েছি... বলেছি, ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে আসতে... আঙ্কল শুনতেনই না। হিরেটা বাড়িতে না থাকলে সংসারে নাকি অমঙ্গল হবে।"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "আপনি কখনও হিরেটা দেখেছেন?"

"একবার। অস্ট্রেলিয়া থেকে ওঁর এক কাজ়িন এসেছিলেন, তাঁর পীড়াপীড়িতেই বের হয়েছিল।"

"কেমন দেখতে?"

"অনেকটা পায়রার ডিমের মতো। তবে আর-একটু ছোট। গোটা গা নিখুঁতভাবে কাটা-কাটা। পালিশটাও অসাধারণ। বাক্স

খুললেই ঝলমল করে ওঠে। ওই অপরূপ হিরে চুরি যাওয়াটা যে কত দুর্ভাগ্যের...।"

জেসমিনের বাক্য শেষ হল না, মিতিনের মোবাইল ঝংকার তুলেছে। সেলফোন কানে চেপে উঠে গেল মিতিন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কথা সারছে।

টুপুর জেসমিনকে দেখছিল। কথা থামিয়ে বসে আছে চুপচাপ। মাথা ঝুঁকিয়ে। গোলাপি নেল-পলিশ লাগানো নখে আঙুল বোলাচ্ছে আনমনে। বোঝাই যায়, ভারী উদ্বেগে রয়েছে। একে পিতৃসম পিসেমশাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু, তায় একখানা আস্ত হিরে লোপাট, জেসমিনের তো বিচলিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। বেচারা।

মিতিন ফিরেছে। মোবাইল ফোন টেবিলে রেখে কোনও ভূমিকা না করেই বলল, "হ্যাঁ, কেসটা আমি নিচ্ছি।"

বিষাদের ছায়া সরে পলকে জেসমিনের মুখে অনাবিল হাসি। কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, "সো কাইন্ড অফ ইউ। এই মুহূর্তে আপনার মতো একজন নামী গোয়েন্দাকেই আমাদের প্রয়োজন। আন্টি অবশ্যই এবার মনে খানিকটা বল পাবেন।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব," মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "কবে আপনাদের বাড়ি যাওয়া যায় বলুন তো? কাল?"

"কালকের দিনটা বাদ দিন ম্যাডাম। পরশু আসুন। কাল আমার কিছু বিজনেস অ্যাসাইনমেন্ট আছে।"

"আপনি ব্যবসা করেন বুঝি?"

"তেমন বড় কিছু নয়। নিজেই ডিজ়াইন করে শৌখিন মোমবাতি বানাই। নিউ মার্কেট আর নতুন শপিং-মলগুলোয় দু'-চারটে বাঁধা দোকান আছে, ক্যান্ডেলগুলো তাদের সাপ্লাই দিই।" বলতে-বলতে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে ভিজ়িটিং কার্ড বের করেছে জেসমিন। মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এতে বাড়ির অ্যাড্রেস আর ফোন

নাম্বারটাও পেয়ে যাবেন। আর ডিরেকশনটা হল, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে মারকুইস স্ট্রিটে ঢুকে...।"

"আমি চিনে নেব। তা হলে পরশুই যাচ্ছি? বিকেলে? অ্যারাউন্ড সিক্স?"

"ও কে। আন্টিকে আমি আজই জানিয়ে রাখছি।" জেসমিন উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে গিয়েও থমকেছে। ঘুরে ঈষৎ সংকোচের সুরে বলল, "ম্যাডাম, আপনার ফিজ্‌টা...?"

"পরে সেট্‌ল করব। আগে কাজ তো স্টার্ট করি।"

"তবু... এখন একটা অ্যাডভান্স...।"

"পরশু তো যাচ্ছি। তখন দেখা যাবে।"

খটখটিয়ে হিল বাজিয়ে জেসমিন চলে যেতেই পার্থ গজগজ করে উঠেছে, "তোমার কোনও দিন আক্কেল হবে না?"

মিতিন ভ্রুকুটি হানল, "কেন?"

"মিস হঃসমিক ভারদোনের পেট থেকে আরও কিছু ইনফরমেশন টেনে আনব ভাবছিলাম। তুমি এমন তাড়া দিয়ে ভাগালে...!"

"নতুন কী জানতে, শুনি?"

"অ্যাটমস্‌ফিয়ারটা। যাদের-যাদের নাম করল, তাদের কাকে-কাকে সন্দেহ করা উচিত... তারা সব কে কেমন লোক... হিরের প্রতি কার কতটা লোভ আছে...।"

"হিরের উপর লোভ?" মিতিন শব্দ করে হেসে উঠল, "সে তো দুনিয়ার সবার। চান্স পেলে তুমি, আমি হিরে চুরি করে ফেলব কিনা তার ঠিক আছে?"

"হাহ, তোমার দৌড় জানা। অ্যাডভান্সের টাকাটাও তো ছেড়ে দিলে।"

"ঠিকই তো।" টুপুর সায় দিল, "আরাকিয়েল ফ্যামিলির যথেষ্ট পয়সা আছে। টাকা তোমার নেওয়াই উচিত ছিল।"

"টাকা তো এসেই যাবে।" মিতিন চোখ নাচাল, "তা হ্যাঁ রে, হাঁ করে জেসমিনের কথা তো গিললি। কিছু বুঝলি কি?"

"কেস তো সোজা। তুমি একটু সুতো নাড়লেই কালপ্রিট ধরা পড়ে যাবে।"

"অত জলভাত নয় রে টুপুর। আমার তো ধারণা, প্যাঁচ একটা আছে।"

"কী রকম?"

"দেখা যাক।"

মিতিন উঠে বুমবুমের খাবার গরম করতে গেল। পার্থও রিমোট টিপে টিভি চালিয়েছে। চুপচাপ বসে ভাবছিল টুপুর। প্যাঁচের কথা বলল কেন মিতিনমাসি? এই কেসে কী ধরনের প্যাঁচ থাকতে পারে?

টুপুর জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল। নাহ্, মগজে কিছু আসছে না।

॥ ৩ ॥

সকাল থেকে আকাশ আজ মেঘলা। একফোঁটা হাওয়া নেই। চৈত্রমাসের দশ তারিখ হয়ে গেল, এখনও একটা কালবৈশাখী এল না। রোজই বেলা বাড়লে মেঘগুলো বেপাত্তা হয়ে যায়, চলতে থাকে বিচ্ছিরি চাঁদিফাটা গরম। ভ্যাপসা-ভ্যাপসা। গা জ্বালানো।

গরমের মধ্যেই টুপুরকে নিয়ে দুপুরে বেরিয়ে পড়েছিল মিতিন। ঢাকুরিয়া থেকে ট্যাক্সি ধরে সটান নিউ মার্কেট। নতুন থানাটায়।

আরক্ষা বাহিনীর অফিস রীতিমতো ব্যস্ত তখন। ঘরখানা পেরিয়ে মিতিন ওসি-র চেম্বারে উঁকি দিয়েছে।

মধ্যবয়সি থলথলে চেহারার অফিসারটি এক কনস্টেবলকে খুব দাবড়াচ্ছিলেন। মিতিনদের দেখে তাঁর গলা দিয়ে বুলেট ছিটকে এল, "ইয়েস?"

মিতিন ঋজু স্বরে বলল, "আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আপনাকে সকালে ফোন করেছিলাম...।"

"অ। আপনিই তিনি? আসুন। সঙ্গে লেজুড়টি কে?"

"আমার বোনঝি। কেসে আমাকে হেল্প-টেল্প করে।"

"পড়াশুনো ফেলে চোর-জোচ্চোরদের পিছনে ঘুরছে?"

টুপুর সামান্য সিটিয়ে গেল। কীরকম তেড়ে-তেড়ে কথা বলেন রে বাবা। মিতিনমাসির সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই, এ তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে নামটা নিশ্চয়ই জানেন।

মিতিন ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়েছে বেমালুম। দেখাদেখি টুপুরও বসল আড়ষ্টভাবে। কনস্টেবলটিকে ছেড়ে দিয়ে অফিসার গলাখাঁকারি দিলেন, "হ্যাঁ, কী যেন একটা দরকার ছিল আপনার?"

এবার মিতিন বিনীত স্বরে বলল, "মারকুইস স্ট্রিটের এক আর্মেনিয়ান ফ্যামিলি...।"

"অ। সেই হিরে চুরির কেস? ওটা তো সেকেন্ড অফিসার দেখছেন। বিশ্বনাথ মই।"

"আমি কি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"উনি কি আছেন! দাঁড়ান দেখছি।"

বলেই কলিংবেলে মুষ্ট্যাঘাত। ঝং শব্দ বেজে উঠতেই হুমড়ি খেয়ে ঘরে এক উর্দিধারী। ঝটাক স্যালুট মারতেই হুকুম জারি হল, "মইকো বুলাও।"

হুকুমবরদার বাইরে যেতেই মিতিন কেঠো হেসে বলল, "আপনার খুব দাপট আছে শুনেছি। অনিশ্চয় মজুমদার আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন।"

"আপনি আই-জি সাহেবকে চেনেন নাকি?"

"কেসের সূত্রে আলাপ। এখন ফ্যামিলিফ্রেন্ডের মতো হয়ে গিয়েছেন। বাড়িতে আসেন তো মাঝেমধ্যে।"

জাঁদরেল অফিসার পলকে মাখন। একগাল হেসে বললেন, "হেঁ হেঁ, আগে বলবেন তো! দুটো ঠান্ডা আনাই? কী গো বোনঝি, খাবে তো কোল্ডড্রিংক?"

টুপুরের বাসনায় জল ঢেলে দিল মিতিন। বলল, "না না, এই গরমে ঠান্ডা খাওয়া ঠিক নয়।"

"তা হলে চা? কফি?"

"কিচ্ছু লাগবে না। আমি কাজটা করেই চলে যাব।"

"একটু অতিথি সৎকারেরও সুযোগ দিলেন না! হেঁ হেঁ হেঁ।"

টুপুরের বেজায় হাসি পাচ্ছিল। হলফ করে বলতে পারে, অনিশ্চয় মজুমদার কস্মিনকালে মিতিনমাসিকে এই অফিসারটির কথা বলেননি। মিতিনমাসি যে এক একসময় কী অম্লান বদনে গুল মারে!

পিছনে হঠাৎ খোনা-খোনা গলা, "আমায় ডাকছেন স্যার?"

ঘাড় ঘুরিয়েই টুপুর বুঝল, ইনি বিশ্বনাথ মই না হয়ে যান না। পদবিটি চেহারার সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে গিয়েছে। লিকলিকে রোগা চশমাপরা তালঢ্যাঙা মানুষটিকে দেখলে গা বেয়ে চড়চড়িয়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করবে।

বড়বাবু গলা ফের রাশভারী করে বললেন, "এই ম্যাডামকে চেনেন?"

দু'দিকে মাথা দোলালেন বিশ্বনাথ, "না তো স্যার।"

“নামী ডিটেকটিভ। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আই-জি মজুমদার সাহেবের বন্ধু। মারকুইস স্ট্রিটের হিরে চুরির ব্যাপারটায় উনি আপনার কাছে কিছু জানতে চান।”

“ও।” চেয়ার টেনে বসলেন বিশ্বনাথ, “কী জিজ্ঞাস্য আছে ম্যাডাম?”

“না মানে... কেসটা তো আপনি ডিল করছেন। কী মনে হচ্ছে?”

“বেশ ভজকট। ওই হিরে উদ্ধার হওয়া খুব মুশকিল।”

“কেন? পাচার হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়?”

“লোকাল মার্কেটে বিক্রি হয়নি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওই সাইজের হিরে কোনও জহুরির কাছে বাঁকা পথে এলে শোরগোল পড়ে যেত। সোর্স তো আমাদের আছেই, কানে ঠিক চলে আসত খবর।”

“আর যদি বাইরে কোথাও চালান হয়ে গিয়ে থাকে?”

“সে আশঙ্কাও আমি খতিয়ে দেখিনি তা নয়।” নাকের মগডাল থেকে চশমা নেমে যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে তুলে বিশ্বনাথ বললেন, “ভেবে দেখুন, চোর যদি হিরেটা কাউকে পাস করে, তার বিনিময়ে নিশ্চয়ই মোটা টাকা নেবে। এবং সেই টাকা হজম করে ঘাপটি মেরে থাকা বেশ কঠিন কাজ। ব্যাঙ্কে তো রাখতে পারবে না, সুতরাং উশখুশ করবে খরচ করার জন্যে। হয় অ্যাসেট কিনবে, নয়তো স্রেফ ওড়াবে। সন্দেহভাজন কারওর সম্পর্কেই এখনও সেরকম পিকচার পাইনি।”

মিতিন ভুরু কুঁচকে বলল, “কত দাম হতে পারে হিরেটার?”

“এটা অবশ্য অনেকটাই নির্ভর করে যে কিনছে তার শখ-মর্জির উপর। পাঁচ টাকার জিনিস কেউ যদি কুড়ি টাকা দিয়ে কেনে, আপনি কি আপত্তি করতে পারবেন? তবে বাজারচলতি মূল্য

সম্পর্কে আমি একটা আন্দাজ দিতে পারি।" বিশ্বনাথ লম্বা শরীরটাকে আরও খানিক লম্বা করলেন, "মিসেস আরাকিয়েল বলছিলেন, হিরেটা নাকি গোলকুন্ডা মাইন্‌সের। এবং ওটি নাকি তিন পুরুষের সম্পত্তি। তাই যদি হয়, তবে ক্যারাট পিছু কম করে চল্লিশ লাখ।"

বড়বাবু বললেন, "চল্লিশ লক্ষ ইন্‌টু পাঁচ, কত হয়? দু' কোটি। কী বুঝলেন?"

মিতিনের আগে বিশ্বনাথবাবু বলে উঠলেন, "যে নিয়েছে, তার এখন সাপের ছুঁচো গেলা দশা। না পারছে ফেলতে, না পারছে গিলতে। আমিও তক্কে-তক্কে আছি। যেই না খোলশ ছেড়ে গাঝাড়া দেবে, অমনি ক্যাঁক।"

মিতিন হেসে বলল, "শুনলাম তো আপনি কষে জেরা করেছেন। কাকে-কাকে আপনার সন্দেহ হয়?"

বিশ্বনাথ বুঝি সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন। চশমা ঠিক করতে-করতে বড়বাবুর দিকে তাকাচ্ছেন। বড়বাবু ঢক করে ঘাড় নাড়লেন, "বলে দিতে পারেন। উনি আই-জি সাহেবের লোক।"

মিতিন তাড়াতাড়ি বলল, "বিশ্বনাথবাবু, ডোন্ট মাইন্ড, আপনার লিড থেকে যদি হিরেচোরকে ধরতে পারি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কৃতিত্বটা আমি আপনাকেই দেব।"

"আমার তালিকায় প্রত্যেকেই সন্দেহভাজন।" বিশ্বনাথের আঙুল ফের চশমায়। গলায় খানিক রহস্য মিশিয়ে বললেন, "মিসেস আরাকিয়েল নিজেই নাটকটি রচনা করতে পারেন। তারপর ধরুন, মহিলার যে ভাইঝিটি সঙ্গে থাকে... কী যেন নাম?"

"জেসমিন।"

"হ্যাঁ, জেসমিন। সে তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আরাকিয়েলের

সবচেয়ে নিকটজন। চাবিটা অকুস্থল থেকে হাতিয়ে সে যে কুকাজটি করেনি, তাও কি নিশ্চিত করে বলা যায়? আর রাতদিনের কাজের মহিলারা যে কত কী কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা তো আপনারা রোজ কাগজেই দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং হাউসমেডটিকেও আমি ক্লিন-চিট দেব না।"

"আর হ্যারি?"

"সেও তো মোটেই সাধুপুরুষ নয়। প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে তার একটি হোটেল আছে। হোটেলটির খুব একটা সুনাম নেই। মাঝে-মাঝেই সেখানে জুয়ার আড্ডা বসে। হ্যারির আর্থিক অবস্থাও এখন পড়তির মুখে। এই ধরনের মানুষরা কখন কী করে বসে বলা কঠিন। আর একতলার ভাড়াটেদের মধ্যে ডিসুজা বড় চাকরি করতেন বটে, তবে তাঁর পুত্রটি ঘোর অপদার্থ। রোজগার প্রায় নেই বললেই চলে, সংসর্গও ভাল নয়। বাবার সঙ্গে সেও রাতে উপরে এসেছিল, আমি খবর পেয়েছি। বাকি রইলেন মিস্টার কুরিয়েন। তিনি একটি চিট ফান্ড চালান। তিনবার কোম্পানির নাম বদলেছেন। একবার জেলে যেতে-যেতেও বেঁচে গিয়েছেন। আশা করি, এঁকে কেন সন্দেহ করছি সেটা আর ভেঙে বলার দরকার নেই। আর আছে দারোয়ান। বাহাদুর। যতই নিষ্পাপ দেখাক, আমি কিন্তু এখনও তাকে ছেঁটে ফেলিনি। হ্যারির বউও বরের সঙ্গে যোগসাজশ করে...।"

টুপুরের আর কানে ঢুকছিল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। বিশ্বনাথ মই বোধ হয় এবার ডাক্তারকেও টানাটানি করবেন। কিংবা মৃত মিস্টার আরাকিয়েলকে...।

মিতিনের কিন্তু এতটুকু বিরক্তি নেই। একগাল হেসে বলল, "অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাকে যে অমূল্য সাহায্যটি করলেন, তা আমার বহুকাল স্মরণে থাকবে।"

"এ তো আমার কর্তব্য ছিল ম্যাডাম। আই-জি সাহেবের পরিচিত আপনি... প্রয়োজন হলেই চলে আসবেন।"

বড়বাবু গদগদ মুখে বললেন, "সেদিন কিন্তু আপনাকে কিছু খেতেই হবে ম্যাডাম। নিদেনপক্ষে ডাবের জল...।"

"অবশ্যই।"

থানা থেকে বেরিয়ে ফের ট্যাক্সি। গনগনে আঁচ লেপে আছে ট্যাক্সির সর্বাঙ্গে। উনুনে বসানো চাটুর মতো গরম সিটে শরীর ছেড়ে দিয়ে টুপুর বলল, "বিশ্বনাথবাবু তোমায় কিন্তু খুব হ্যারাস করলেন। ইচ্ছে করে গুলিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।"

"আহা, ওভাবে ধরছিস কেন? উপরতলার সঙ্গে খাতির আছে বলেছি তো, তাই একটু মই ঘষলেন। তা ছাড়া সরকারি তদন্তের গোপন তথ্য আমার কাছে গড়গড় করে উগরে দেবেন, এতটা আশা করাও কি ঠিক?"

"তা হলে এসেছিলে কেন? দুপুরটা তো বেকার গেল!"

"না রে, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। নয়-নয় করে ছিটেফোঁটা তো পেয়েছি। ওগুলোই কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করে এখন খেলাতে হবে। দেখি, একটু-একটু করে ছবিটাকে সাজাই।"

বাড়ি ফিরে মিতিন ঢুকে গেল নিজের ছোট্ট স্টাডিতে। বোধ হয় ছবি সাজাতেই। মিতিনমাসি যে-কোনও কেসে কী করে এগোবে, এখনও তার থই পায় না টুপুর। দরকারই বা কী, মাসির পাশে-পাশে থেকে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াটাই তো যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। সুতরাং, এক্ষুনি-এক্ষুনি মাসির সঙ্গে বাতচিত করে লাভ নেই। কম্পিউটারে দাবা খেলতে বসে গেল টুপুর।

হিরে চুরির প্রসঙ্গ ফের উঠল সন্ধেবেলায়। প্রেস থেকে ফিরে পার্থ উত্তেজিত মুখে বলল, "তোর মাসি কাল অ্যাডভান্সটা না নিয়ে ভালই করেছে।"

মিতিন টুপুরের সঙ্গে বসে টিভি দেখছিল। ভ্রুভঙ্গি করে বলল, "হঠাৎ এই বোধোদয়?"

"ভেবে দেখলাম, এই কেসে আগাম দু'-পাঁচ হাজার নেওয়া মানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। তার চেয়ে স্ট্রেট পুরো দক্ষিণাটা হেঁকে দেবে। হিরের দামের এক পারসেন্ট।"

টুপুর বলে উঠতে যাচ্ছিল, সে তো অনেক টাকা গো! তাকে থামিয়ে মিতিন সরল মুখ করে বলল, "তাতে লোকশান হয়ে যাবে না তো?"

"কী বলছ? হিরের দাম সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে?"

"তোমার আছে?" মিতিন পালটা প্রশ্ন হানল, "তুমি কি আজকাল হিরের কারবার করছ?"

"আরে বাবা, হিরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি তো করি। মনে রেখো, আমার প্রেসটা বউবাজারে। যেখানে সোনা, রুপো, হিরে-জহরতের দোকান থিকথিক করছে।"

"বুঝেছি। আজ হিরে সম্পর্কে প্রচুর ফান্ডা নিয়ে এসেছ।"

"উঁহু, আগেই ছিল। আজ আবার একবার ঝালিয়ে নিলাম।" পার্থ সোফায় গ্যাট হয়ে বসেছে, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হিরেটার নাম জানো কি? কালিনান। ওজন পাঁচশো ক্যারাটেরও বেশি। দু' নম্বরে আছে ওর্‌লফ। তিনশো ক্যারাট। আমাদের কোহিনুরের র‍্যাঙ্ক ফিফ্‌থ। কেটেকুটে তার ওয়েট এখন দাঁড়িয়েছে একশো দু' ক্যারাটে। আর দশ নম্বর পজিশনটা হর্টেনসিয়ার। কুড়ি ক্যারাটের এই ডায়মন্ডটি এক সময় ফ্রান্সের রাজমুকুটে শোভা পেত। এখন অবশ্য হর্টেনসিয়ার ঠাঁই পেয়েছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে।"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "তার মানে ওদের তুলনায় আরাকিয়েল বাড়ির হিরে নেহাতই পুঁচকে, কী বলো?"

"যাহ্ বাবা, পাঁচ ক্যারাট কি ছোট? কীরকম প্রাইস হতে পারে জানো?"

"কত আর! দু' কোটি মতো।"

"তাই বা কম কী? এক পারসেন্ট পাওয়া মানেও তো দু'লক্ষ। অবশ্য ওজনের হিসেবে।"

"কিন্তু আমার প্রাপ্য তো আরও বেশিও হতে পারে। কারণ, হিরের দাম তো শুধু ওজনে হয় না। কোন খনি থেকে সেটা পাওয়া গিয়েছিল, কতটা বিশুদ্ধ, কেমন কাটিং হয়েছে, রং, গ্লেজ, সবই ম্যাটার করে। প্লাস বিশেষ এক-একটা হিরের কত যে ইতিহাস থাকে! আমাদের কোহিনুরের কথাই ধরো না। মালবের রাজার কাছ থেকে বাবর নাকি কোহিনুর লুট করেছিলেন। মোগল সম্রাটদের হাত ঘুরে সেটি গেল নাদির শাহের কাছে। তারপর পেলেন পঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ। এবং শেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে। এমন হিস্ট্রি আছে বলেই কোহিনুর না এত ফেমাস। এবং দামটাও সব হিসেবের বাইরে।"

"সে যদি বলো, ওর্‌লফের হিস্ট্রি তো ঢের ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং। এখন যদিও মস্কোয় আছে, কিন্তু আদতে ওটা নাকি ভারতের। দক্ষিণের এক মন্দিরে ওরকম দু'খানা হিরে নাকি বিষ্ণুমূর্তির দু'চোখে সেট করা ছিল। এক ব্যাটা ফরাসি সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সময় ওই মন্দিরে ঢুকে পড়ে। পাথর দু'টো দেখেই তো তার চোখ চকচক। কিন্তু একটা চোখ খুবলে নেওয়ার পরেই লোকটা বেজায় ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মন্দির থেকে ধাঁ। তারপর ঘাবড়ে গিয়েই হোক, কী হিরে বলে চিনতে না পেরেই হোক, রত্নটিকে সে বেচে দিল এক ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। মাত্র দু'হাজার পাউন্ডে। তারপর ক্যাপ্টেন জাহাজ

নিয়ে গেল আমস্টারডাম। সেখানে তখন থাকতেন রাশিয়ার এক কাউন্ট গ্রিগরি ওর্‌লফ। রানি ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের বিশেষ বন্ধু। নব্বই হাজার পাউন্ডে হিরেখানা কিনে ওর্‌লফ উপহার দিলেন রানিকে। আনন্দে আত্মহারা রানি রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে আস্ত একখানা প্রাসাদই দিয়ে দিলেন ওরলফকে। তিরিশ বছর পর নেপোলিয়ান হানা দিলেন মস্কোয়। পাছে নেপোলিয়ান হিরেটা নিয়ে চলে যান, ওর্‌লফকে লুকিয়ে রাখা হল এক পুরোহিতের সমাধিতে। তা নেপোলিয়ানও তো ছোড়নেওয়ালা নন। খুঁজে-খুঁজে ঠিক সন্ধান পেয়ে গেলেন হিরেটার। কিন্তু সমাধিস্থলে গিয়ে যেই না সৈনিকরা মাটি খুঁড়ে হিরে বের করতে যাবে, অমনি পুরোহিতের আত্মা এসে প্রচণ্ড অভিশাপ দিতে লাগল সৈনিকদের। তোদের ভয়ংকর ক্ষতি হবে... কেউ তোরা বেঁচে ফিরবি না... রাশিয়ানদের কাছে হেরে যাবি... !"

পার্থ গোঁফে তা দিল, "কী কপাল, নেপোলিয়ান শেষ পর্যন্ত রাশিয়াতে হেরেও গেলেন, ওর্‌লফও তাঁর কবজায় এল না।"

"কোথা থেকে পেলে গো গল্পটা?" মিতিন চোখ নাচাচ্ছে, "সাজিয়ে গুছিয়ে গুল মারছ না তো?"

"আজ্ঞে না। ক'দিন আগে একটা বইয়ে পড়ছিলাম।"

"তা বিষ্ণুর চোখের সেকেন্ড হিরেখানা গেল কোথায়?"

"নিশ্চয়ই আছে কোথাও। খুঁজে দেখতে হবে।" বেশি জেরায় পড়ার আগে পার্থ মানে-মানে উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমার সাজেশনটা কিন্তু খেয়াল রেখো। আরাকিয়েলরা যথেষ্ট মালদার পার্টি, দু' লাখের নীচে কখনও নামবে না।"

"মনে থাকবে।" মিতিন মুখ বেঁকাল। টুপুরকে বলল, "গালগল্পগুলো আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। কাল থেকে আমাদের কিন্তু অভিযান শুরু।"

টুপুর ঘাড় নাড়ল, "জানি তো।"

॥ ৪ ॥

বাড়িটা প্রাচীন, কিন্তু জরাজীর্ণ নয়। পাঁচিল ঘেরা সাহেবি ছাঁদের চেহারা। দোতলা। বেশ বড়সড় গাড়িবারান্দাওয়ালা। মজবুত পিলারে গাঁথা লোহার গেটখানা রীতিমতো সম্ভ্রম জাগায়। বাড়ি আর গেটের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চাতালের মতো। ঈষৎ এবড়োখেবড়ো, ঘাসবিহীন। পাঁচিলের গায়ে দু'খানা খুপরি-খুপরি ঘর। দরোয়ানের কোয়ার্টার।

মিতিন আর টুপুর খোলা গেট পেরোতেই এক নেপালি যুবক বেরিয়ে এসেছে, "কাঁহা জানা হ্যায়?"

"উপর। জেসমিন মেমসাবকা পাস।"

"আইয়ে। আইয়ে।"

গাড়িবারান্দা পর্যন্ত টুপুরদের পৌঁছে দিল গাঁটাগোট্টা চেহারার যুবকটি। সম্ভবত জেসমিনের নির্দেশেই এই খাতিরদারি। টুপুর ভাল করে দারোয়ানটিকে দেখে নিল। এই তবে বাহাদুর? বিশ্বনাথ মইয়ের মতো মিতিনমাসিও কি একে সন্দেহের তালিকায় রাখবে?

গোটা তিনেক ধাপ টপকালে চওড়া প্যাসেজ। তিনখানা টিউবলাইট জ্বলছে প্যাসেজে। দু'পাশে দু'খানা লম্বা-লম্বা দরজা। নেমপ্লেট লাগানো। ডিসুজা আর কুরিয়েন। আলোকিত প্যাসেজের শেষ প্রান্তে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। বারচারেক পাক খেয়ে সিঁড়ি পৌঁছেছে উপরে। সিঁড়ির শেষে আবার একখানা লম্বা টানা

প্যাসেজ। অন্দরে যাওয়ার জন্য দু'প্রান্তে দু'খানা, মধ্যিখানে পাশাপাশি তিনটে, মোট পাঁচটা দরজা। সামনেরটাতেই ডোরবেল।

জেসমিন বুঝি বেল বাজার প্রতীক্ষাতেই ছিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খুলেছে দরজা। নরম হেসে বলল, "ওয়েলকাম। আন্টি আপনাদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন।"

বর্গাকৃতি ড্রয়িংরুমে টুপুরদের বসিয়ে পিসিকে ডাকতে গেল জেসমিন। টুপুর ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিল ঘরটাকে, আর চমৎকৃত হচ্ছিল। আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, সর্বত্রই অ্যান্টিকের ছড়াছড়ি। দেওয়ালআলমারিতে কত যে দুষ্প্রাপ্য পুতুল। যিশুখ্রিস্ট, মা মেরি থেকে শুরু করে কিমোনো পরা জাপানি মেয়ে...। ঘরের চারকোণে রাখা চারটে অর্ধচন্দ্রাকার শ্বেতপাথরের টেবিলে সাবেকি ফুলদানি, রঙিন বাতিদান। এখানে সেখানে শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য মোমবাতি। নানান নকশার, নানান আকারের। দেওয়ালে ছোট-বড় অয়েলপেন্টিং, রকমারি মুখোশ...। অদ্ভুতদর্শন এক বাঁশের চোঙাও টাঙানো আছে দেওয়ালে। পাশে একজোড়া বাঁকানো কাঠের পাত, গায়ে ছবি আঁকা। একখানা গ্র্যান্ড পিয়ানোও ঘরে মজুত। কার্পেটে শুয়ে আছে পিতলের হরিণ।

তারিফের সুরে টুপুর বলে উঠল, "কী গ্র্যানজার গো!"

মিতিন অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "মাথার উপর ল্যাম্পশেডগুলো দ্যাখ। স্টেন্‌ড গ্লাস। ইতালিয়ান।"

"জগঝম্প বাঁশের ভেঁপুটা কী গো?"

"ডিজিরিডু। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের বাজনা। পাশের দু'টো বুমেরাং।"

"সেই অস্ত্র, যা ছুড়লে টার্গেটকে হিট করে আবার হাতে ফিরে আসে?"

"ইয়েস। তবে ছোড়াটা সহজ নয়। কেরামতি লাগে। এটাও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই...।"

মিতিন থেমে গেল। এক বয়স্ক মহিলাকে ধরে-ধরে আনছে জেসমিন। মহিলার চোখে রিমলেস চশমা, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে লম্বা গাউন। চেহারাটি ছোটখাটো, রোগাসোগা। গায়ের রং এককালে টকটকেই ছিল, এখন তাতে কেমন বাদামি-বাদামি ভাব। চামড়াও বেশ শিথিল। বয়সের তুলনায় যেন একটু বেশিই বুড়িয়ে গিয়েছেন মহিলা।

মিতিন আর টুপুর উঠে দাঁড়িয়েছিল। জেসমিনের পিসি ইংরেজিতে বললেন, "শুভ সন্ধ্যা। আমি ইসাবেল আরাকিয়েল। প্রয়াত জোসেফ মেলিক আরাকিয়েলের হতভাগ্য স্ত্রী। তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।"

আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই মিতিন দ্রুত কাজের প্রসঙ্গে চলে এল, "প্রথমে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতটার সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই। এবং একটু একান্তে।"

ইঙ্গিত বুঝেছে জেসমিন। তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একটু চা-কফির বন্দোবস্ত করি।"

"শুধু চা কিন্তু। লিকার উইদাউট সুগার। আর আমার এই অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য...।"

"কোল্ডড্রিংক, তাই তো?"

"দ্যাটস নাইস অফ ইউ।"

মধুর হেসে চলে গেল জেসমিন। মিতিন সোফা বদলে ইসাবেলের পাশে গিয়ে বসেছে। ইসাবেল অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছিলেন। দম নিয়ে বললেন, "আমি বাংলা বুঝি, কিন্তু বলতে পারি না।"

"ঠিক আছে, আপনি ইংরেজিতেই বলুন।"

"বাইশে ডিসেম্বরের ওই অপয়া রাতটাকে আমি মনে করতে চাই না। তবু তুমি যখন শুনতে চাইছ...। সন্ধে থেকে শুরু করি?"

"যেভাবে আপনার সুবিধে হয়।"

"বিকেলবেলা রোদ্দুর পড়ে এলে জোসেফ রোজ হাঁটতে বেরোতেন। অনেক কালের অভ্যেস। সেদিন ফিরলেন সাতটা সওয়া-সাতটা নাগাদ। তখন আমি টিভি দেখছিলাম। তা উনি তো গল্‌ফ কিংবা কার রেস ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন না... আমাকে ইভনিং টি দিতে বলে উনি চলে গেলেন পাশের লাইব্রেরিরুমে। চা নিয়ে গিয়ে দেখি, যথারীতি খবরের কাগজ খুলে বসেছেন। একটা পিকিউলিয়ার হবি ছিল জোসেফের। রোজ তিনটে-চারটে করে নিউজ় পেপার কিনতেন, আর বসে-বসে যত ক্রসওয়ার্ড আর জাম্বল আছে, সেগুলোর সমাধান করতেন। বিশেষ-বিশেষ দিনে খবরের কাগজ বন্ধ থাকলে জোসেফ ছটফট করতেন সারাদিন। এমনই নেশা, ওই সময়ে কেউ কথা বলতে গেলেও তাঁর কী বিরক্তি।" ইসাবেল একটু থামলেন। বারকয়েক চোখ পিটপিট করে বললেন, "তবে সেদিন, কে জানে কেন, আমার সঙ্গে গল্প করলেন খানিক। হয়তো চিরতরে চলে যাবেন বলেই...।"

টুপুর ঝানু গোয়েন্দার স্বরে প্রশ্ন করল, "কী কথা হয়েছিল স্মরণে আছে?"

"তেমন বিশেষ কিছু নয়। ইসাবেলের মুখে দুঃখী হাসি, কাকে-কাকে কার্ড পাঠানো যায়, কার জন্য কী উপহার কিনতে হবে... দু' সপ্তাহ পরেই ক্রিসমাস ছিল তো।"

"দু' সপ্তাহ পরে?" টুপুর অবাক, "সেদিন তো ছিল ডিসেম্বরের বাইশ...?"

"আমরা পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করি না, মাই চাইল্ড।

সেদিন শুধু একটা বাতি জ্বালাই। আর্মেনিয়ানদের ক্রিসমাসের উৎসব হয় ছয় জানুয়ারি।”

“তাই বুঝি?” ব্যাপারটায় বিশেষ একটা উৎসাহ না দেখিয়ে মিতিন ইসাবেলকে প্রসঙ্গে ফেরাল, “হ্যাঁ, তারপর কী হল?”

“আমি আবার বেডরুমে গেলাম টিভি দেখতে। জোসেফ ক্রসওয়ার্ড পাজ়লে মন দিলেন। জেসমিন আসার পর তিনজনে একসঙ্গে ডিনার সারলাম।”

“জেসমিন এলেন কখন?”

“ন’টা নাগাদ। কাজে বেরোলে ওর একটু রাতই হয়। ... ডিনারের পর জোসেফ কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন টেরেসে। তারপর আমরা তো শুয়েই পড়লাম। ঘুমটা যখন আসছে... হঠাৎ টের পেলাম জোসেফ আমায় ঠেলছেন। আলো জ্বেলে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি, বুকের যন্ত্রণায় উনি কুঁকড়ে-কুঁকড়ে যাচ্ছেন। ঘামছিলেনও ভীষণ। ভয় পেয়ে জেসমিনকে ডেকে তুললাম। আওয়াজে নির্মলাও জেগে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকাল ডাক্তারকে কল দিয়েছিল জেসমিন। তবে ডাক্তারবাবু আসার আগেই তো উনি কেমন স্থির হয়ে গেলেন।” ইসাবেলের গলা ধরে এল। নাক টেনে বললেন, “ডাক্তারবাবু চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। হার্ট পাম্প করলেন, মুখে মুখ লাগিয়ে বাতাস পাঠিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যার সময় শেষ, তাকে কি আর ধরে রাখা যায়! ইনঞ্জেকশনটাও তো দেওয়া গেল না।”

“সরি আন্টি।” মিতিন ইসাবেলের হাতে হাত রাখল, “জানি আপনাকে এসব প্রশ্ন করা মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার যে আমায় জানতেই হবে।”

“কিন্তু কিন্তু করছ কেন? বলো না?”

“আমি তো এসেছি আপনাদের হিরে হারানোর তদন্ত করতে...।”

মিতিন গলা ঝাড়ল, "আর হিরেটা খোওয়া গিয়েছে মিস্টার আরাকিয়েল মারা যাওয়ার পর-পরই...।"

"মৃত্যুর ঠিক পরেই কিনা তা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, পঁচিশ তারিখ সকালে যখন সিন্দুক খুললাম, তখন দেখি বাক্সটা খালি।"

"আপনি তো আগে কখনও সিন্দুকে হাত দেননি?"

"না। জীবনে ওই প্রথম। সিন্দুক থেকে কিছু বের করার দরকার হলে জোসেফ ঘর বন্ধ করে সিন্দুক খুলতেন। তখন আমারও ঘরে থাকার অনুমতি ছিল না।" ইসাবেল একটা নিশ্বাস ফেললেন, "সেদিন জেসমিন কিছু টাকা চাইল। সমাধি দেওয়ার দিন খরচাপাতিগুলো হ্যারি মানে আমার ভাসুরের ছেলেই তো করেছিল। ওকে টাকাটা ফেরত দেবে বলে...। ভাগ্যিস খুললাম, চুরিটা তাই তখনই ধরা পড়ল।"

"হঠাৎ বাক্সটাই বা দেখতে গেলেন কেন? ওটা তো খোলার প্রয়োজন ছিল না!"

"নিছকই কৌতূহলে। আগে কখনও সিন্দুক খুলে দেখার সুযোগ পাইনি তো।"

"হুম। জেসমিন তখন কোথায়?"

"বেরিয়েছিল কী যেন কিনতে। ফোন করে জানাতেই ও চলে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশকে...।"

"ও।" মিতিন একটু থেমে থেকে বলল, "আচ্ছা আন্টি, চাবিটা তো মিস্টার আরাকিয়েলের কাছেই থাকত?"

"বরাবর। আমি যখন বিয়ের পর এ বাড়িতে আসি, তখন থাকত শ্বশুরমশাইয়ের হেপাজতে। তিনি গত হওয়ার পর থেকে জোসেফই...। চাবিটা যেন ওঁর শরীরের একটা অংশ বনে গিয়েছিল।"

"তা আপনার হাতে চাবিটা এল কখন?"

"ওই রাত্তিরে তো চাবির কথা আমার মাথাতেই ছিল না। মগজ কাজই করছিল না কোনও। কখন যেন জেসমিনের ঘরে গিয়ে শুয়েছিলাম, তারপর সকালে ফের ও ঘরে যেতে সুজ়ান আমাকে চাবিটা দিল।"

"মিস্টার হ্যারির বউ?"

"তুমি তাকে চেনো?"

"জেসমিনের মুখে নামটা শুনেছি।"

"হ্যারি আর সুজ়ান আমার উপর খুব রেগে আছে।"

"কেন?"

"পুলিশ ওদের খুব জেরা করেছে তো। ভাবছে আমি ওদের নামে নালিশ করেছি।" ইসাবেল ফের একটা নিশ্বাস ফেললেন, "বোঝে না, আমিও নিরুপায়। পুলিশকে তো বলতেই হবে সেদিন রাতে জোসেফের পাশে কারা-কারা ছিল।"

"বটেই তো। রাতভর চাবি ছিল মিস্টার আরাকিয়েলের কোমরে। তখনই সিন্দুক খুলে হিরে সরানো হয়েছে কিনা পুলিশ তো খতিয়ে দেখবেই।" মিতিন আড়চোখে অন্দরে যাওয়ার দরজাটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "তা সুজ়ানের হাতে চাবি এল কীভাবে?"

"সুজ়ান তো সকলের সামনেই জোসেফের কোমর থেকে খুলল।"

"সবাই মানে? কে কে ছিল তখন?"

"অনেকে। হ্যারি, মিস্টার ডিসুজা, মিসেস কুরিয়েন...। এ ছাড়া জেসমিন, নির্মলারা তো ছিলই।"

"আপনার ভাড়াটেরা কি হিরেটার কথা জানতেন?"

"অজানা ছিল না। আমি কখনও সেভাবে আলোচনা করিনি বটে, তবে দু'-একবার হয়তো বলেছি। ডিসুজা কুরিয়েনদের সঙ্গে

জোসেফের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। জোসেফও হয়তো গল্প করে থাকতে পারেন।"

"এবার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন। ভাড়াটেদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?"

ইসাবেল চুপ। প্রায় মিনিটখানেক নীরব থেকে বললেন, "পিটার ডিসুজা ছিলেন জোসেফের বন্ধু। অ্যালবার্ট এই বাড়িতেই জন্মেছে। কুরিয়েনরাও আছে প্রায় তিরিশ বছর। ওদের সম্পর্কে আমি কী মন্তব্য করব বলো? সজ্ঞানে এরা আমাদের ক্ষতি করবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। ওদের সন্দেহ করলে তো জেসমিন, নির্মলা, হ্যারিদেরও সন্দেহ করতে হয়।"

"নির্মলাও কি বহুদিনের পুরনো...?"

"হ্যাঁ। ষোলো বছর বয়স থেকে আছে। আর্মেনিয়ান চার্চ কিছু বৃদ্ধাশ্রম আর অনাথালয়ের সঙ্গে যুক্ত। ওই রকমই একটা অনাথ আশ্রম থেকে জোসেফ এনেছিলেন নির্মলাকে। এখন জেসমিনও আমার মেয়ে, নির্মলাও আমার মেয়ে।" বলতে-বলতে ইসাবেল হঠাৎই চঞ্চল, "কী কাণ্ড দ্যাখো... নির্মলা এখনও তো তোমায় চা দিয়ে গেল না! দাঁড়াও তো, দেখি উঠে।"

ইসাবেলকে অবশ্য উঠতে হল না। নির্মলা প্রায় তখনই ট্রে সাজিয়ে ঢুকেছে। ক্ষণিকের জন্য টুপুরের মনে হল, আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিল নাকি নির্মলা? চা, কোল্ডড্রিংক নামিয়েই সে চলে গেল বটে, তবে তার আগেই টুপুর তাকে মোটামুটি জরিপ করে নিয়েছে। চেহারায় একটু যেন আদিবাসী-আদিবাসী ভাব। বছর তিরিশেকের নির্মলার কালোকুলো মুখে একটা আপাত সারল্য থাকলেও খুদে-খুদে চোখের ঘূর্ণন বলে দেয়, সে মোটেই বোকা নয়। মিতিনমাসি কি নজর করল ব্যাপারটা?

চা শেষ করে মিতিন বলল, "চলুন আন্টি, এবার আপনার শোওয়ার ঘরে যাই।"

ইসাবেল বললেন, "তা হলে জেসমিনকে ডাকি? আমাকে একটু ধরুক।"

"আমি হেল্প করব?"

"না না, তুমি কেন? ওরা তো আছে।"

"আপনার প্রবলেমটা কী আন্টি? হাঁটু?"

"শুধু হাঁটু নয়, সর্বাঙ্গই যেন অচল হয়ে আসছে। এই ক'মাসে যে কী হল, পায়ে আর তেমন জোর পাই না, হাতে বল নেই, আঙুলগুলোও বড্ড কাঁপে...।" ইসাবেলের স্বর দুলে গেল, "অবশ্য আমার আর থেকেই বা কী লাভ! উনি নেই, আরাকিয়েল বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক হিরেটাও বিদায় নিল...।"

ইসাবেলের হাহাকারে টুপুরের চোখ ছলছল এবার। মিতিনের কিন্তু তেমন কোনও তাপউত্তাপ নেই। গলা উঁচিয়ে ডাকল জেসমিনকে। ভাইঝিকে ধরে কাঁপা-কাঁপা পায়ে হাঁটছেন ইসাবেল। পিছন-পিছন মাসি-বোনঝি।

ড্রয়িংরুমের ডান পাশের ঘরটি লাইব্রেরি। মোটা-মোটা আইনের বইয়ে চার দেওয়াল ঠাসা। আইনজ্ঞের টেবিলচেয়ার ছাড়াও একখানা গোল শ্বেতপাথরের টেবিল রয়েছে ঘরে। সাবেকি আরামকেদারাও। কড়িবরগাওয়ালা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে চার ডাঁটির ফ্যান।

ঘরটা পেরোতে-পেরোতে টুপুর প্রশ্ন করল, "মিস্টার আরাকিয়েল বুঝি ল'ইয়ার ছিলেন?"

"উঁহু।" জেসমিন উত্তর দিল, "আঙ্কলের বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ভাল পশার ছিল।"

"আর আঙ্কল? বিজ়নেস?"

“অনেকটা ওই রকমই। আঙ্কলের ঘোড়দৌড়ে খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর নিজের ঘোড়াও দৌড়ত কলকাতা আর বেঙ্গালুরুর ট্র্যাকে। পরে রেসের মাঠের রোজগার লাগিয়ে দেন বিভিন্ন কোম্পানিতে। নিয়মিত ডিভিডেন্ড পেতেন, দিব্যি চলে যেত।”

কথায়-কথায় পরের ঘরখানায় পা রেখেছে টুপুর। আগের দু'টো ঘর বড় ছিল বটে, কিন্তু এটা যেন বিশাল। চারখানা দরজার একটা বাইরের প্যাসেজে বেরনোর, একটা পাশের ঘরে যাওয়ার, তৃতীয়টি অন্দরকে যুক্ত করেছে, চতুর্থটি দিয়ে গাড়িবারান্দার মাথার টেরেসটিতে যাওয়া যায়। লাইব্রেরি ঘরের দরজাটি ছাড়া বাকি তিনটি দরজা অবশ্য বন্ধ। লম্বা-লম্বা জানলায় ভারী-ভারী পরদা ঝুলছে।

ঘরে ঢুকেই টুপুরের চোখ গিয়েছে সিন্দুকে। গোলাকার হাতলওয়ালা দেওয়ালে গাঁথা আয়রন চেস্ট। বিছানার ওপাশে, ঘরের কোনায়। প্রকাণ্ড খাটটি থেকে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে। আস্তে-আস্তে বাকি আসবাবেও দৃষ্টি ঘুরল টুপুরের। বিডে কারুকাজ করা ভারী চমৎকার দু'টো কাঠের আলমারি, তাদের মাঝখানে একটা পুরনো অ্যাকোয়ারিয়াম, সাহেবি আমলের ড্রেসিংটেবিল, মানুষপ্রমাণ দোলআয়না, সবই বেশ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে সাজানো। মেঝের লতাপাতার স্কার্টিং যেন আলাদা একটা মাত্রা এনেছে সজ্জায়। শুধু হালফ্যাশনের স্ট্যান্ডে টিভিটাই যা খাপছাড়া।

ইসাবেল খাটে বসেছেন। পাশে জেসমিন। মিতিন সোজা সিন্দুকের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “একবার খোলা যাবে কি?”

“অবশ্যই।” গাউনের পকেট থেকে একজোড়া চাবি বের করলেন ইসাবেল। জেসমিনকে বললেন, “দেখিয়ে দাও।”

পুরু লোহার পাল্লার ভিতরভাগে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সঠিক চাবি ছাড়া খোলার চেষ্টা করলে যা কিনা সশব্দে বেজে ওঠে। সিন্দুকের দু'টো তাকই প্রায় শূন্য। ফাঁকা ভেলভেটের বাক্স,

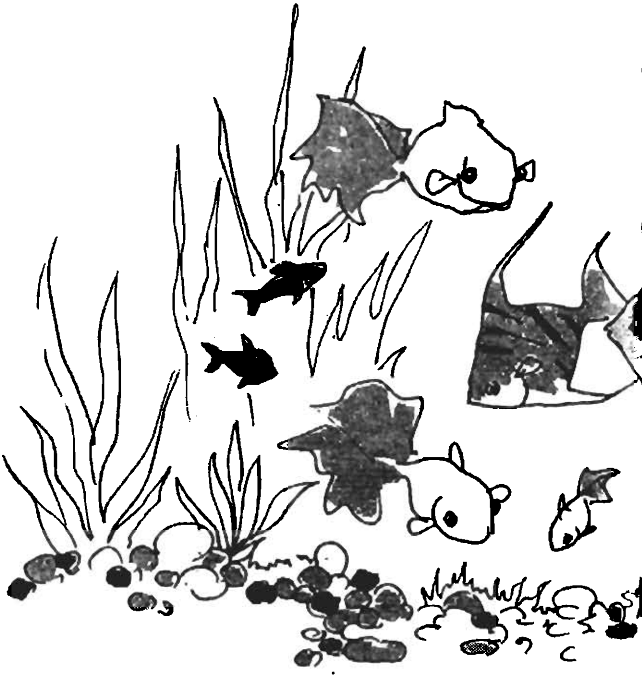

একখানা ডায়েরি, খুচখাচ কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। নীচে বন্ধ লকার। জেসমিন বলল, "ওখানে টাকাপয়সা আর শেয়ারের সার্টিফিকেট থাকে। দেখবেন কি?"

"থাক।" মিতিন নীল ভেলভেটের আধারখানা খুলে দেখল। আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাক্সটা কি এখানেই ছিল? না লকারে?"

ইসাবেল বললেন, "আমি তো সেল্‌ফেই দেখেছি।"

"খোলা ছিল? না বন্ধ?"

"বন্ধই।"

"আচ্ছা আন্টি, হিরেটার কোনও ইনশিওরেন্স করানো হয়নি কেন বলতে পারেন?"

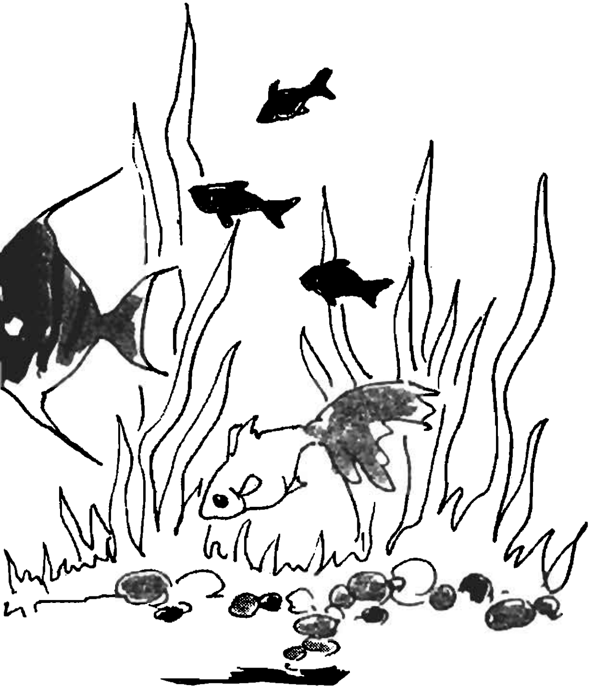

"শুনেছি আমার শ্বশুরমশাই একবার চেষ্টা করেছিলেন। ইনশিওরেন্স কোম্পানি নাকি খুব বেশি টাকার প্রিমিয়াম হাঁকে। শর্তও দেয় অনেক। কোথায় রাখতে হবে, কীভাবে রাখতে হবে...। শ্বশুরমশাই হিরে সিন্দুক থেকে সরাতে রাজি হননি। জোসেফও আর ও ব্যাপারে গা করেননি কোনও।"

"ও।" মিতিন কথা বলতে-বলতে ডায়েরিটা দেখছিল। হালকা বিস্ময়ের সুরে বলল, "এ তো অনেক পুরনো! উনিশশো বাহাত্তর সালের।"

"ওটিও শ্বশুরমশাইয়ের। ওই বছরে তিনি মারা যান। জোসেফ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন।"

"হুঁ।" ডায়েরিটা রেখে মিতিন এবার পায়ে-পায়ে এগোল দেওয়ালে

ঝোলানো একটি ছবির সামনে। হ্যাট-কোট পরা এক সুপুরুষ সাহেবের ফোটো। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটির নীচে ছোট্ট শ্বেতপাথরের টেবিল, কাঠের চেয়ার। টেবিলে মোমদানিতে লাল বাটি-মোমবাতি। অর্ধেক জ্বলা বাতি থেকে মোম গলে টেবিলেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ছবিতে চোখ রেখে মিতিন বলল, "ইনি নিশ্চয়ই মিস্টার আরাকিয়েল?"

জেসমিন সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে ইসাবেলকে চাবি দিয়েছে। পকেটে চাবি রাখতে-রাখতে ইসাবেল ঘাড় নাড়লেন, "প্রায় কুড়ি বছর আগের। মধ্যবয়সে উনি যেন আরও রূপবান হয়েছিলেন।"

"ছবির নীচে মোমবাতি কে জ্বালান? আপনি?"

"হ্যাঁ। শুতে যাওয়ার আগে রোজ রাতে ওঁর ধ্যান করি। ওই চেয়ারে বসে।"

"সুন্দর-সুন্দর মোমবাতির সাপ্লায়ার কে? নিশ্চয়ই জেসমিন?"

লাজুক হেসে জেসমিন বলল, "অন্য কোনও মোমবাতি আন্টি ব্যবহারই করবেন না।"

"আপনার কারখানাটি কোথায়?"

"কারখানা-টারখানা আবার কী! নীচের একটা গ্যারাজে নিজে-নিজেই বানাই। হঠাৎ বেশি অর্ডার এসে গেলে নির্মলা সাহায্য করে হাতে-হাতে।"

কথোপকথনের মাঝে টুপুরের দৃষ্টি হঠাৎ অ্যাকোয়ারিয়ামে। দু'টো রেডসোর্ড টেল মারামারি জুড়েছে। একটা ধাড়ি অ্যাঞ্জেল ভারিক্কি ভঙ্গিতে এসে ঝগড়া থামাল। জলে ভাসমান কাচের পাত্র থেকে পুটপাট কেঁচো খেয়ে চলেছে মলির ঝাঁক। গাপ্পি গোরামিনরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আপন মনে। আশ্চর্য, এত কাণ্ডকারখানা চলছে জলে, অথচ জলের তলদেশ একদম স্থির। ঈষৎ সবজেটে জলে দুলছে ঝাঁঝি, ভাসছে জলজ উদ্ভিদ, মাছেরা হঠাৎ-হঠাৎ ডুব দিচ্ছে

তলায়, সব মিলিয়ে কী অপরূপ দৃশ্য। বদলে-বদলে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো, প্রতি মুহূর্তে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখে যেন নেশা লেগে যায়।

সত্যি, কী নিশ্চিন্ত জীবন মাছেদের। চুরিচামারির বালাই নেই। শোকতাপ নেই। বাড়ির কর্তা মারা গিয়েছেন, তাই নিয়ে কোনও বিকারও নেই। দিব্যি মজাসে আছে।

আহা রে, মানুষের জীবনও যদি এমন হত!

॥ ৫ ॥

ইসাবেলের ঘর থেকে বেরিয়ে আরাকিয়েলদের দোতলাটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল মিতিন। ভিতরবারান্দা, রান্নাঘর, বাথটব শোভিত স্নানাগার, নির্মলার থাকার জায়গা, জেসমিনের ডেরা...। জেসমিন থাকে ইসাবেলের শয়নকক্ষের একেবারে উলটো প্রান্তে। ঘরটা ওরকমই বড়, তবে আসবাবপত্র দিব্যি আধুনিক। কম্পিউটার, টিভি আর মিউজিক সিস্টেম মজুত। এ ঘর থেকেও টেরেসে যাওয়ার একটা দরজা আছে।

টেরেসে দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "আপনাদের গাড়িবারান্দার এই ছাদটাই বাড়ির সেরা জায়গা। কী হাওয়া এখানে।"

মিতিন-টুপুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছিল জেসমিন। হেসে বলল, "এই জায়গাটা আমারও খুব প্রিয়। কত সময় আমি এখানে বসে গান শুনি, বই পড়ি...।"

টুপুর বলল, "আমি হলে তো রাতে মাদুর পেতে এখানেই শুয়ে থাকতাম।"

“পারতে না। বড্ড মশা।” জেসমিন হাসিটাকে ছড়িয়ে দিল। মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, “এবার এককাপ কফি হবে নাকি?”

“চলতে পারে। তবে তার আগে একবার নির্মলার সঙ্গে বসব।”

জেসমিনের হাসি নিবল, “আপনার কি নির্মলাকে সন্দেহ হয় ম্যাডাম?”

“নট এগ্‌জ্যাক্টলি। সেদিন রাতের ডিটেলটা আমি প্রত্যেকের মুখ থেকেই আলাদা-আলাদাভাবে শুনতে চাই। নীচে ভাড়াটেদের কাছেও যাব।”

“বেশ। নির্মলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

নিজের ঘরের মধ্যে দিয়ে অন্দরে গেল জেসমিন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নির্মলা হাজির। কোমরে জড়ানো ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে বলল, “আমায় ডাকছেন?”

কোনও ঘোরপ্যাঁচ নয়, মিতিন সরাসরি প্রশ্ন হানল, “হিরেটা কে সরিয়েছে বলো তো?”

নির্মলা পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে অবাক স্বরে বলল, “আমি কী করে বলব?”

“তুমিই তো বলবে। চুরিটা হয়েছে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতে। এবং একমাত্র তুমিই গোটা রাত ওই ঘরে ছিলে।”

“কে বলেছে?”

“তা জানার তো দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।”

নির্মলা একটুক্ষণ চুপ। আস্তে-আস্তে ঠোঁটে একটা ফ্যাকাশে হাসি ফুটেছে। কেটে-কেটে বলল, “খবরটা যে-ই দিয়ে থাক, ভুল বলেছে। আমি মোটেই সারারাত ওই ঘরে ছিলাম না। দু’-দু’বার তো কিচেনে যেতে হল। কফি বানাতে।”

"কখন? কত রাতে? মিসেস আরাকিয়েল জেসমিনের ঘরে শুতে যাওয়ার পর?"

"হ্যাঁ। জেসমিন আন্টিকে নিয়ে গেল। একতলার পিটার আঙ্কল তো আগেই নেমে গিয়েছিলেন নীচে। মিস্টার হ্যারি আর অ্যালবার্ট গিয়ে বসলেন লাইব্রেরিরুমে। আঙ্কলের ফিউনারেল নিয়ে ওঁরা আলোচনা করছিলেন। তখনই মিস্টার হ্যারি আমায় ডেকে কফি বানাতে বলেন।"

"তার মানে আঙ্কলের ঘরে তখন আর কেউ নেই?"

"না, মিস্টার কুরিয়েন ছিলেন। উনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ, আঙ্কলের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করছিলেন। আমি ওঁকেও এককাপ কফি দিই।"

"মিস্টার কুরিয়েন ছিলেন কতক্ষণ?"

"কফি শেষ করেই তো চলে গেলেন। ফের সেই সকালে এসেছিলেন।"

"তুমিই শুধু রয়ে গেলে মিস্টার আরাকিয়েলের ঘরে?"

"একা ছিলাম না। কাপগুলো রাখতে এসে জেসমিনের রুমে গিয়েছিলাম। আন্টিকে দেখতে। ফিরে দেখি, মিস্টার হ্যারি আর অ্যালবার্ট বসে আছেন আঙ্কলের পাশে।"

"তারপর?"

"ওঁরা আমায় বললেন একটু রেস্ট নিতে। আমার একদম ইচ্ছে করছিল না। আঙ্কল আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মতো মনে করতেন...।"

নির্মলার গলা আবেগে বুজে এল। ঘনঘন চোখ মুছছে। মিতিন যেন দেখেও দেখল না। কাঠখোট্টাভাবে বলল, "আর দ্বিতীয়বার কফি করতে গেলে কখন?"

"সাড়ে তিনটে নাগাদ। মিস্টার হ্যারির ঢুলুনি আসছিল, ঘুম তাড়াতে...।"

"তুমি ছাড়া তখন কি মিস্টার হ্যারিই শুধু আঙ্কলের কাছে...?"

"অ্যালবার্টও ছিল। ওদের কফি দিয়ে এর পর আমি নিজের রুমে যাই।"

"শুতে?"

"না। মা মেরির কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আঙ্কলের আত্মা যেন শান্তি পায়।"

"ফের আঙ্কলের ঘরে এলে কখন?"

"ভোর হওয়ার মুখে-মুখে।"

"তখন ঘরে কে কে ছিল?"

"কেউ না। অ্যালবার্ট নীচে চলে গিয়েছিল। মিস্টার হ্যারি ঘুমোচ্ছিলেন। ড্রয়িংরুমে। আমি গিয়ে বসার পরই অবশ্য মিস্টার হ্যারি জেগে যান। তারপর সকাল হওয়া পর্যন্ত তো আমি আর মিস্টার হ্যারি...।" নির্মলা মিতিনের চোখে চোখ রাখল, "পুলিশকেও আমি একই কথা বলেছি। মিলিয়ে দেখবেন।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও। জেসমিনকে বলো, আমরা ড্রয়িংরুমে আসছি। ওখানেই কফি খাব।"

নির্মলা চোখের আড়াল হতেই টুপুর কলকলিয়ে উঠল, "নির্মলাকে পুরো বিশ্বাস কোরো না মিতিনমাসি। ওর চোখ দু'টো মোটেই সুবিধের নয়।"

"দুনিয়ায় ক'জনই বা পুরো সত্যি বলে রে টুপুর! ঘেঁটে-ঘেঁটে সত্যিটাকে বের করতে হয়।"

"কিছু কি ধরতে পারলে?"

"সবে তো কলির সন্ধে।" মিতিন মৃদু হাসল, "চল, কফিতে চুমুক দিয়ে একতলার কাজটাও আজ চুকিয়ে ফেলি।"

শুধু কফি নয়, সঙ্গে এবার প্লেটভর্তি কাজু-চানাচুর। জেসমিন

জোর করে একখানা খামও ধরিয়ে দিল মিতিনকে। অগ্রিম বাবদ চেক। না নিলে আন্টির নাকি অস্বস্তি হবে।

ইসাবেলের সঙ্গে অবশ্য আর দেখা হল না মিতিনদের। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ঘরে। জেসমিনকে বিদায় জানিয়ে মিতিন-টুপুর এসেছে ডিসুজাদের দরজায়।

একবার নয়, বারতিনেক বেল বাজানোর পর পাল্লা খুলেছেন দশাসই চেহারার এক প্রবীণ। বছর সত্তরের মানুষটির গায়ের রং ঈষৎ তামাটে, মাথাজোড়া টাক, চোখের পাতা ফোলা-ফোলা। পরনে গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট আর হাফহাতা গেঞ্জি।

হাসি-হাসি মুখে বৃদ্ধ বললেন, "ইয়েস?"

ইংরেজিতেই কথা শুরু করল মিতিন। হেসে বলল, "আমি দোতলার হিরে চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।"

"কী চুরি?"

"হিরে। মিস্টার জোসেফ আরাকিয়েলের।"

"না না, আমি মিস্টার ডিসুজা। আরাকিয়েলরা উপরে থাকে। ওই যে সিঁড়ি।"

টুপুর আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ভদ্রলোক বোধ হয় কানে ভাল শোনেন না। এঁর সঙ্গে কীভাবে কথা চালানো যায়?

তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে মিতিন নিজের কার্ডটা বের করে দিল। চোখ থেকে অনেকটা তফাতে ধরে পড়লেন পিটার। তারপর একবার মিতিনকে দেখছেন, একবার টুপুরকে।

গলা সামান্য চড়িয়ে মিতিন বিনীতভাবেই বলল, "আমরা কি ভিতরে যেতে পারি?"

"ও শিওর। কাম ইন।"

বড়সড় ড্রয়িংরুমখানা রীতিমতো অবিন্যস্ত। সোফাগুলো দামি, কিন্তু এখন বেশ তেড়াবেঁকা দশা। কাগজ, জলের বোতল, আর

সিগারেটের প্যাকেট ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। সেন্টার টেবিলে তাস। ঘরটা বোধ হয় পরিষ্কারও হয় না নিয়মিত। আসবাব-কার্পেট-মেঝেতে ধুলোর আস্তরণ।

মিতিন-টুপুর অন্দরে আসতেই পিটার যেন খানিক ব্যস্ত হয়েছেন। বিছানো তাস প্যাকেটে ভরতে-ভরতে বললেন, "বোসো। বিপত্নীকের ফ্ল্যাট তো, একটু অযত্নেই থাকে।"

"না না, ঠিক আছে।" মিতিন আর টুপুর বসেছে পাশাপাশি। মিতিন ফের গলা তুলে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই হিরে চুরির সংবাদটা জানেন?"

"জানব না? এত থানা-পুলিশ হয়ে গেল!" পিটারের ঘড়ঘড়ে গলা বেজে উঠল, "ওফ, পুলিশ আমাদের যা নাস্তানাবুদ করেছে। অ্যালবার্ট, মানে আমার ছেলে তো বাড়িতে থাকতেই চাইছে না। এমনিই মা মারা যেতে কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল...।"

"এখনও বুঝি উনি বাড়ি নেই?"

"আজ একটা কাজে বেরিয়েছে। দু'জন ফরাসি টুরিস্টকে কলকাতা দেখাচ্ছে।"

"গাইডের কাজ করেন বুঝি?"

"ওই আর কী। ও যে কখন কী করে...।"

টুপুর কানে-কানে মিতিনকে বলল, "তা হলে আর এখানে বসে কী লাভ? চলো, উঠে পড়ি।"

মিতিন যেন শুনেও শুনল না। সামান্য ঝুঁকে পিটারকে বলল, "আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি? জেরা নয়, কৌতূহল।"

"বলো কী জানতে চাও?" পিটার টানটান হলেন, "তবে আমি কিন্তু ওই চুরির ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।"

"হিরেটার ব্যাপারে তো জানেন?"

"জোসেফের মুখে শুনেছি। ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন সুরাটের নামী ডাক্তার। গুজরাতের কোনও এক স্থানীয় রাজাকে কঠিন অসুখ থেকে বাঁচিয়ে ওই হিরে উপহার পেয়েছিলেন। জোসেফ বড় সাবধানে রাখত রত্নটিকে।"

"আপনি কখনও হিরেটা দেখেছেন?"

"না। অনাত্মীয় কাউকে দেখানোর নাকি রেওয়াজ ছিল না।"

"আরাকিয়েল পরিবার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

"আমি ওদের খুব সম্মান করি। অর্থবান আর্মেনিয়ান হিসেবে জোসেফের একটা অহংকার ছিল বটে, তবে আচার-ব্যবহারে কখনও সৌজন্যের অভাব দেখিনি। সত্যি বলতে কী, দীর্ঘদিন রেলে চাকরি করেছি, রিটায়ারমেন্টের আগে ডিজিএম হয়েছিলাম, কিন্তু জোসেফের তুলনায় আমি তো নেহাতই চুনোপুঁটি। অথচ জোসেফ আমাকে বন্ধুর মতোই দেখত। ইদানীং জোসেফ দানধ্যানও করছিল খুব। কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজ অ্যান্ড ফিলানথ্রপিক অ্যাকাডেমিতে মোটা ডোনেশন দিত। প্রায়ই বলত, বউটউ না থাকলে গোটা সম্পত্তিটাই নাকি লিখে দিত অ্যাকাডেমিকে, কোনও হোমটোম করার জন্যে। আর্মেনিয়া থেকে অনেক গরিব-দুঃখী ছেলে এখানে এসে পড়াশুনো করছে তো, তারা যেন এখানে একটা আস্তানা পায়।"

মিতিনের ভুরুতে পলকা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল, "আর মিসেস আরাকিয়েল কেমন?"

"যথেষ্ট সহৃদয় মহিলা। আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মিসেস আরাকিয়েল যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তা বলার নয়। তাই তো সেদিন দুঃসংবাদটা পেয়েই অ্যালবার্টকে নিয়ে উপরে ছুটলাম। অ্যালবার্ট এমনই অবশ্য দোতলায় বেশি যেতে চায় না...।"

"কেন?"

"জেসমিন ওকে তেমন পছন্দ করে না যে। মেয়েটা একটু নাকউঁচু ধরনের। ওর মামারা ছিল গালস্টুন ফ্যামিলির, সেই দেমাকেই যেন ফুটছে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "গালস্টুনরা খুব বড়লোক ছিলেন বুঝি?"

"শুধু বড়লোক কী বলছ, টাকার কুমির। জোহানেস গালস্টুন তো এক সময় সাড়ে তিনশোখানা বাড়ি বানিয়েছিলেন কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার কুইন্‌স পার্ক, সানি পার্ক, ওঁরই হাতে তৈরি। এখন যেখানে নিজাম প্যালেস দ্যাখো, ওই জায়গাটাও ছিল গালস্টুনদের। বিশাল একটা পার্ক ছিল ওখানে। গালস্টুনদেরই নামে। তারপর তো হায়দরাবাদের নিজাম জায়গাটা কিনে...।"

পিটার বকবক করেই চলেছেন। মিতিন থামাল বৃদ্ধকে। গল্পের মাঝেই প্রশ্ন জুড়ল, "আপনার সঙ্গে জেসমিনের সম্পর্ক কী রকম?"

"আমিও ওই মেয়ের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলি না। এমন অসভ্য... আমার ফ্ল্যাটের পাশেই বাহারি মোমবাতি বানাচ্ছে... ভুলেও একটা উপহার দিল না কোনও দিন!"

"সত্যি, এ ভারী অন্যায়।" মিতিন ভ্রূভঙ্গি করল, "আচ্ছা, হ্যারির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

"অল্পস্বল্প। দেখা হলে হাসে, কেমন আছি জিজ্ঞেস করে...। তবে অ্যালবার্টের সঙ্গে ওর খাতিরটা আর-একটু বেশি।"

"কী করে হল?"

"শুনেছি হ্যারির হোটেল শিলটনকে ও টুরিস্ট জোগাড় করে দেয়।"

"বুঝলাম।" মিতিন কবজি উলটে ঘড়ি দেখল। দুম করে প্রশ্ন

থামিয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ডিসুজা। আজ তা হলে উঠি। পরে একদিন অ্যালবার্টের সঙ্গে নয় মোলাকাত হবে।"

"ওই হতচ্ছাড়াকে কি সহজে বাড়িতে পাবে?" পিটার মাথা নাড়লেন, "বরং অ্যালবার্টের মোবাইল নম্বরটা রাখো। তবে হিরের ব্যাপারে ও কিছু বলতে পারবে বলে মনে হয় না।"

মিতিন আর কথা বাড়াল না। নম্বরটা চুপচাপ তুলে নিল নিজের মোবাইলে।

পিটারের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে টুপুর ফিক করে হাসল, "চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা চালাতে গিয়ে তোমার গলা চিরে যায়নি মিতিনমাসি?"

"ওফ, তাও আবার ইংরেজিতে!" মিতিনও হাসছে, "একটা অভিজ্ঞতাও হল। ভাবছি এবার থেকে জেরা করতে বেরোলে ব্যাগে লবঙ্গ রেখে দেব।"

কুরিয়েনের ফ্ল্যাটে অবশ্য চিৎকারের প্রয়োজন হল না। ফটর-ফটর ইংরেজি বলারও নয়। বছর ষাটেকের কেরালাইট ক্রিশ্চানটি ভালই বাংলা জানেন। সম্ভবত ব্যবসার সুবাদেই। শীর্ণকায় মিসেস কুরিয়েনও বোঝেন মোটামুটি। তবে মিতিনের ভিজিটিং কার্ড দেখে এবং আগমনের উদ্দেশ্য শুনে দু'জনের কেউই প্রীত হলেন না।

মিতিনরা বসতে না-বসতেই কুরিয়েন গজগজ করে উঠলেন, "এভাবে আমাকে বারবার জ্বালাতন করার কী অর্থ?"

বিরক্তিটাকে বিশেষ আমল দিল না মিতিন। ঠান্ডা গলায় বলল, "উপায় নেই বলেই তো আসা। মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতে আপনার হোয়্যার অ্যাবাউটস্‌টা জানাটা খুব ভাইটাল।"

"পুলিশকে তো বলেছি।"

"আমাকেও বলুন।"

"আপনি কে, অ্যাঁ?" লুঙ্গি-শার্ট পরা কুরিয়েন তাচ্ছিল্যের সুরে

বললেন, "মিসেস আরাকিয়েল আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।"

"বলবেন কি না বলবেন সে আপনার ইচ্ছে।" মিতিনের স্বর আচমকাই কঠিন, "মনে রাখবেন, লজিক্যালি আপনিই কিন্তু মেন সাসপেক্ট।"

মোটা-মোটা সাদা গোঁফের ফাঁক থেকে প্রশ্ন ঠিকরে এল, "কোন হিসেবে?"

"কারণ তো অনেক। প্রথমত, আপনার চিটফান্ডের অবস্থা এখন খুব ভাল নয়। যারা টাকা রেখেছিল, তুলে নিতে চাইছে। আর আপনিও টাকা ফেরত দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, আপনার আগের কোম্পানিগুলো... মানে এখনকার বিজনেস আগে যেসব নামে ছিল...।"

"দাঁড়ান-দাঁড়ান। আমার ব্যবসার খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

"বাজারে আপনার রেকর্ড তো ভাল নয় স্যার। খবর তো বাতাসে উড়ছে।" মিতিন বেতের চেয়ারে হেলান দিল, "তারপর ধরুন, চটজলদি লাভের আশায় যেসব শেয়ার কিনেছিলেন, সেগুলোও তো ডুবুডুবু। হালে পানি পেতে এখন আপনার অনেক টাকার দরকার। পুলিশ তো বলছে, আপনি সম্ভবত ডায়মন্ডটা বেচে...।"

"বেচার প্রমাণ পুলিশের হাতে আছে নাকি?"

"প্রমাণ পুলিশ ঠিক বের করে নেবে। একবার হাতে দড়ি পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছেন, এবার আপনাকে গারদে পোরা এমন কিছু শক্ত হবে না।"

"আপনি কিন্তু বাড়ি বয়ে এসে আমায় ইনসাল্ট করছেন ম্যাডাম।"

“ইনসাল্ট কি সতর্কবাণী সেটা পরে টের পাবেন। শুধু শুনে রাখুন, আপনি যে সেদিন সিন্দুক খুলেছিলেন তার কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে।”

“মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে।” কুরিয়েন প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন, “আমি সিন্দুক স্পর্শও করিনি।”

“নির্মলা যখন কফি বানাতে গেল, তখন কি একা ঘরে শুধুই ধ্যান করছিলেন? ভুলে যাবেন না, ও ঘরের চারটে দরজাই তখন খোলা।”

“মোটেই না। ভিতরবারান্দার দরজা তখন ভেজানো ছিল।”

“প্রেয়ার করতে-করতে সেটাও লক্ষ করেছেন তা হলে?”

“হ্যাঁ...না...মানে...আগেই চোখে পড়েছিল।”

“বটে?”

মিতিনের ধারাল দৃষ্টির সামনে এবার যেন বেশ মিইয়ে গেলেন কুরিয়েন। স্বর নরম করে বললেন, “আপনি কিন্তু মিছিমিছি আমাকে জড়াচ্ছেন ম্যাডাম। মা মেরির নামে শপথ করে বলছি, হিরে আমি নিইনি।”

এতক্ষণে মিসেস কুরিয়েনেরও বাক্য ফুটেছে। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, “আমার স্বামী আর যাই হোন, চোর-বাটপাড় নন। নেহাতই সংসারী মানুষ আমরা। দু’-দু’টো মেয়ে আছে, তাদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি... সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠাও কম নয়। এক সময় ব্যবসায় একটু এদিক-ওদিক হয়েছিল ঠিকই, তা বলে উনি অন্যের বাড়ি থেকে হিরে হাতিয়ে নেবেন? এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। ঢের হয়েছে, এখন আপনারা আসতে পারেন।”

মিস্টার কুরিয়েনের পাংশু হয়ে থাকা মুখখানা দু’-চার সেকেন্ড দেখল মিতিন। তারপর মিসেস কুরিয়েনকে বলল, “বেশ তো, চলে যাচ্ছি। আপনিই বরং আপনার হাজব্যান্ডকে একটা প্রশ্ন করবেন।”

"কী?"

"একা ঘরে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে উনি কী করছিলেন!"

বলেই আর বসল না মিতিন। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসেছে টুপুরকে নিয়ে।

টুপুরের পেট কৌতূহলে ফুলছিল। গাড়িবারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করল, "এটা কেমন হল মিতিনমাসি? জানলে কী করে মিস্টার কুরিয়েনই সিন্দুক খুলেছিলেন?"

মিতিন মুচকি হাসল, "ধরে নে, মনশ্চক্ষে দেখেছি।"

"তুমি শিওর, হিরে মিস্টার কুরিয়েনই নিয়েছেন?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য। সবে তো পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো শুরু হল। এবার দ্যাখ না, একটু-একটু করে কেমন ঝাঁঝ ছড়ায়।"

"আশ্চর্য! মিস্টার কুরিয়েনের ব্যবসার হালহকিকতই বা এত জেনে ফেললে কীভাবে?"

"দুয়ে-দুয়ে চার করে।" মিতিন আলগা টোকা দিল টুপুরের মাথায়, "বুদ্ধিটাকে খেলা, তা হলেই বুঝে যাবি।"

॥ ৬ ॥

টুপুর বাংলা খবরের কাগজটা ওলটাচ্ছিল। পার্থমেসো যতক্ষণ থাকে, কাগজ তো হাতে পাওয়ার উপায় নেই। বাথরুমেও নিয়ে যায় আজকাল, কমোডে বসে খবর মুখস্থ করে। এ ছাড়া শব্দজব্দ তো আছেই। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে শব্দজব্দ, ভাতের গরাস মুখে তুলতে-তুলতে শব্দজব্দ, এমনকী বেরনোর আগে জুতো পরতে-

পরতেও শব্দ মাথায় এলে টুক করে বসিয়ে দিচ্ছে ছকে। ভাগ্যিস আজ তাড়াতাড়ি প্রেসে ছুটল, নইলে থোড়াই এই সাড়ে ন'টায় কাগজ হাতে পেত টুপুর।

কিন্তু খবরের কী ছিরি! হাওড়ায় গুমখুন। পেরুতে ভূমিকম্প! ইরাকে বোমা বিস্ফোরণ! শ্যামনগরে রেল অবরোধ! উফ, একটাও কি সুসংবাদ থাকতে নেই? বেজার মুখে খেলার পাতায় গেল টুপুর। আছে, আছে! সানিয়া মির্জা জিতেছে কাল। সিনসিনাটি ওপেনে সানিয়া থার্ড রাউন্ডে উঠল। এক চেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে।

টুপুর ঝুঁকে পড়তে শুরু করল খবরটা। তিন সেটের লড়াই হয়েছে। প্রথম সেটে হেরে গিয়েছেন সানিয়া, পরের দু'টো সেটে...।

আচমকাই মনঃসংযোগে ব্যাঘাত। মিতিনমাসি কথা বলছে মোবাইলে, "অ্যাম আই টকিং টু মিস্টার অ্যালবার্ট ডিসুজা?"

ব্যস, সানিয়া মির্জা মাথায়। টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, তুমি অ্যালবার্টকে ফোন করছ... তার আগেই মিতিনমাসির আঙুল উঠে এসেছে ঠোঁটে। চুপ। এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন করে দিয়েছে লাউড স্পিকার। টুপুর শুনতে পেল একটা তড়বড়ে গলা ইংরেজিতে বলছে, "ও আপনিই তা হলে কাল আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার।" মিতিনের গলায় মধু ঝরছে, "আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল। কী চমৎকার মানুষ...।"

"তো? আমাকে ফোন করছেন কেন?"

"একটা খবর দেওয়ার ছিল।" মিতিন ঝটিতি বলল, "হিরের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

এক সেকেন্ড বুঝি থমকে রইল গলাটা। তারপরই উচ্ছ্বাস উড়ছে, "পেয়ে গেলেন? এত তাড়াতাড়ি? কে নিয়েছিল?"

"নামটা বলা এখনই ঠিক হবে না। হিরে এখনও হাতে আসেনি। জাস্ট একটা স্টেপ বাকি।"

"ওহ্!"

"আপনার কাছ থেকে শুধু একটা ইনফরমেশন চাই। তা হলেই হিরেটা লোকেট করে ফেলব।"

"কী বলুন তো?"

"ফোনে বলা যাবে না। আপনার সঙ্গে যদি একবার দেখা করা যায়...।"

"কখন?"

"যদি আজ দুপুরে সময় দেন...।"

"কিন্তু আমি যে আজ হোল-ডে বিজি।"

"মাঝে কি একটু টাইম বের করা যায় না?"

"এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন বলুন তো? খুব ফিশি মনে হচ্ছে!"

"গোটা ব্যাপারটাই তো ফিশি মিস্টার ডিসুজা। আমার মনে হয়, আপনিও চান হিরেটা এখনই উদ্ধার হোক। আফটার অল আপনাকেও তো কম হ্যারাসড হতে হয়নি।"

"তা ঠিক। জেসমিনকেও একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। মহারানির স্পর্ধা কত, অ্যালবার্ট ডিসুজাকে কিনা চোর ভাবে!" গলাটা একটু থেমে আবার বেজে উঠেছে, "একটা কথা বলুন তো। জেসমিনই কি হিরেটা হাতিয়েছে?"

"দেখা হলে সব জানতে পারবেন। তা হলে কখন আমরা মিট করছি?"

"এক কাজ করুন। দেড়টা... না না, দু'টো নাগাদ চলে আসুন।"

"কোথায়?"

"ভিক্টোরিয়ার সাউথ গেটে।"

"ফাইন। আমি পৌঁছে যাব।"

মোবাইল অফ করে মিতিন বলল, " তা হলে আমরা দেড়টায় রওনা দিই, কী বল?"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সে নয় যাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি এত কায়দা করে ডাকলে কেন?"

"জাস্ট একটু ভাঁজ মেরে নিলাম। নইলে থোড়াই রাজি হত।"

"তাও... তোমাকে গিয়ে তো হিরের ব্যাপারে কিছু একটা বলতে হবে।"

"তখনকার কথা তখন ভাবব'খন। যা, সকাল-সকাল স্নানটা সেরে নে।"

তক্ষুনি-তক্ষুনি অবশ্য উঠল না টুপুর। হাতে এখনও অনেক সময়, খেলার পাতাটা পড়ল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর গিয়ে উঁকি দিয়েছে রান্নাঘরে। আজ চিতল মাছের গাদা এনেছে পার্থমেসো। সাবধানে কাঁটা ছাড়াচ্ছে আরতিদিদি, মুইঠা বানাবে। ওয়াও! তাক থেকে বয়াম পেড়ে টুপুর কুলের আচার বের করল খানিকটা। চাখতে-চাখতে বুমবুমের সঙ্গে খুনসুটি চালাল কিছুক্ষণ। খুব টিনটিন পড়ার নেশা হয়েছে বুমবুমের, ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিতেই সে কী চিলচিৎকার! ইতিমধ্যে হাতিবাগান থেকে মা'র ফোন এসে গেল। মিতিনমাসির কাছে টুপুরের সারাদিনের রুটিন জানতে চাইছেন মা। এর পরই তার ডাক পড়বে টের পেয়ে টুপুর সটান বাথরুমে।

স্নান করতে-করতে হঠাৎই মাথায় ফিরে এল হিরে চুরির ঘটনাটা। কুরিয়েনকেই যদি সন্দেহ মিতিনমাসির, তা হলে আবার অ্যালবার্টকে ডাকাডাকি কেন? মিস্টার আরাকিয়েলের কাছে একা থাকাই যদি বিচার্য হয়, নির্মলা মেরি বিশ্বাস তবে ছাড় পায় কোন

হিসেবে? হিরে সরিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে রাখা নির্মলার পক্ষে কী এমন কঠিন কাজ! হিরের তো লয়ক্ষয় নেই, কম্পাউন্ডেই কোথাও মাটিতে পুঁতে রাখলে কে খোঁজ পাবে? রান্নাঘরের কৌটোবাটায় থাকলেই বা দেখছে কে? আটা-ময়দার লেচিতেও তো হিরেটা পুরে রাখা যায়। তারপর কোনও একদিন মওকা বুঝে কেটে পড়লেই ব্যস, দু' কোটি টাকার মালকিন। উঁহু, নির্মলাকেই ভাল করে চেপে ধরা উচিত।... বাহাদুরকেই বা ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না কেন মিতিনমাসি? সেদিন রাত দু'টোর পর বাহাদুর কি একবারও দোতলায় ওঠেনি? সারারাত দরজা খোলা... কেউ এ ঘরে নিদ্রায়, কেউ ও ঘরে... তখন যদি বাহাদুর...? নাহ, মাথা খারাপ করে লাভ নেই। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

পাক্কা দুপুর দু'টোয় টুপুররা পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়ায়। চড়া রোদে পুড়ছে পৃথিবী। ট্যাক্সি থেকে নেমেই মাসি-বোনঝি দেখতে পেল, ভিতরের নুড়ি ছড়ানো পথ ধরে বাইরে আসছে এক বিচিত্রদর্শন মানুষ। চেহারায় নয়, সাজপোশাকে। টাইট জিনসে অজস্র তাপ্পি, ঢোল্লা টি-শার্টে রামধনু রং ঝিকমিক। বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। থুতনিতে ছাগলদাড়ি। চোখে সবজেটে সানগ্লাস। চুল সজারু-কাঁটার মতো খাড়া-খাড়া।

টুপুর অস্ফুটে বলল, "অ্যালবার্ট নাকি?"

"মনে হচ্ছে।" মিতিন মোবাইলের বোতাম টিপল, "দাঁড়া, ভেরিফাই করে নিই।"

মোক্ষম কৌশল। বিচিত্রদর্শন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, হঠাৎই পকেট থেকে সেলফোন বের করে নম্বর দেখতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে মিতিন হাত তুলল, "হাই। আমি এখানে।"

কাঁধ দোলাতে-দোলাতে এগিয়ে এল অ্যালবার্ট। সানগ্লাস খুলে

টুপুরকে একবার দেখে নিয়ে মিতিনকে বলল, "আপনিই মিসেস ডিটেকটিভ?"

"ইয়েস। ...চলুন না, ছায়ায় গিয়ে কথা বলি।"

আপত্তি করল না অ্যালবার্ট। তবে শিরীষগাছের নীচে সরে এসে বলল, "আমার কিন্তু হাতে সময় নেই। ভিতরে টুরিস্ট আছে।"

"জাস্ট দু'-চার মিনিট।" মিতিন অল্প হাসল, "একটা-দু'টো পয়েন্ট মিলিয়ে নিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"কী পয়েন্ট?"

"জেসমিন সেদিন সারারাত কী করছিল?"

"আগেই ধরেছিলাম, সরষের মধ্যে ভূত!" অ্যালবার্ট খসকুটে-মার্কা দাড়িতে হাত বোলাল, "নইলে আমার পিছনে ও পুলিশ লেলায়!"

"বলুন,বলুন। মনে করে-করে বলুন। আপনার উপরেই কিন্তু সব নির্ভর করছে। কিচ্ছু মিস করবেন না।"

"আমার নিখুঁত স্মরণে আছে। নির্মলা এসে ডেথ-নিউজ়টা দিতেই বাবা হাউমাউ করে উঠলেন। তাঁকে নিয়ে গেলাম দোতলায়। জেসমিন তখন..." অ্যালবার্ট নাক-চোখ-মুখ একসঙ্গে কুঁচকোল, "ইয়েস, জেসমিন তখন জোসেফ আঙ্কলের মাথার পাশে। ফোঁচ-ফোঁচ করে ন্যাকাকান্না কাঁদছে। দৃশ্যটা সহ্য হচ্ছিল না, বাবাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসেছিলাম। হ্যারি আসার পর আবার ঢুকলাম আঙ্কলের ঘরে।"

"মিস্টার হ্যারি এলেন কখন?"

"অ্যারাউন্ড টুয়েল্‌ভ। জেসমিন তখন আন্টিকে সান্ত্বনাবাক্য শোনাচ্ছে।"

"তারপর জেসমিন কী করল?"

"অনেকক্ষণ তো বসেই ছিল ওখানে। তারপর তো আন্টিকে নিজের রুমে নিয়ে গেল।"

"তখন ক'টা বাজে?"

"রাত পৌনে দু'টো... দু'টো...।"

"আর তো রাতে জেসমিনকে দেখেননি?"

"উঁহু, একবার যেন দেখেছিলাম। কখন যেন... কখন যেন...?"

"ভাল করে মনে করুন। স্টেপ বাই স্টেপ।"

"ওয়েট, ওয়েট। ওরা যাওয়ার পর তো আমি আর হ্যারি এলাম লাইব্রেরিরুমে। আঙ্কলের সৎকার নিয়ে হ্যারির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হ্যারির মাথা ধরেছিল খুব, নির্মলাকে কফি বানাতে বলল। নির্মলাও গেল কিচেনে।"

"তখন নিশ্চয়ই মিস্টার আরাকিয়েলের বডির পাশে কেউ নেই?"

"নো, নো। কুরিয়েন আঙ্কল ছিলেন তো। উনি তো কফি খেয়ে নীচে গেলেন।"

"আর আপনারা? লাইব্রেরিরুমে রইলেন?"

"উঁহু, আমরা তো তখন ড্রয়িংরুমে। ইনফ্যাক্ট, কফিটাও তো খেলাম ড্রয়িংরুমে বসে। হ্যারি ল্যান্ডলাইন থেকে পরপর ফোন করছিল যে। রিলেটিভদের।"

"অত রাতে আত্মীয়দের ফোন?"

"নট ইন দিস কান্ট্রি ম্যাম। অস্ট্রেলিয়ায়, স্টেট্সে, আর্মেনিয়ায়...। গোটা বিশ্বেই তো ওদের আত্মীয় ছড়ানো।" অ্যালবার্ট ডিঙি মেরে ভিক্টোরিয়ার গেটের ওপাশটা দেখে নিল। ফের ডুব দিয়েছে স্মরণে। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ, ওই সময় জেসমিন আসেনি।"

"তা হলে?"

"ফোনটোন সেরে কিছুক্ষণ পর আবার আমরা জোসেফ আঙ্কলের কাছে গেলাম। হ্যারি ছেলেবেলার গল্প বলছিল। রিগার্ডিং জোসেফ আঙ্কল। শুনছিলাম। রেসের মাঠে যাওয়ার আগে জোসেফ আঙ্কল নাকি একবার হ্যারিদের বাড়ি যেতেনই। হ্যারি নাকি আঙ্কলের গুডলাক ছিল...।"

"হ্যারিরা বরাবরই আলাদা থাকতেন নাকি?"

"শুনেছি বিয়ের পরই হ্যারির বাবা কারনানি ম্যানশনে চলে যান।"

"কেন?"

"দ্যাট আই কান্ট সে। আমার অন্যের ব্যাপারে জানার অত কিউরিওসিটি নেই।"

"বেশ। তারপর কী হল?"

"নির্মলাও শুনছিল গল্প। আমরা ওকে নিজের রুমে গিয়ে রেস্ট নিতে বলেছিলাম...। যায়নি। দেন... হ্যারি আবার একবার কফি চাইল। সেকেন্ড টাইম কফি দিয়ে নির্মলা অবশ্য আর বসেনি, রুমে চলে যায়।"

"তখন বুঝি জেসমিনকে দেখলেন?"

"ইয়েস, ইয়েস। তখনই তো...। আমরা ড্রয়িংরুমে গেলাম সিগারেট খেতে। সেই সময়েই জেসমিন ড্রয়িংরুমে একবার উঁকি দিয়েছিল। আমি আছি দেখেই বোধ হয় আর ভিড়ল না, চলে গেল।"

"তখন টাইম কত?"

"জোসেফ আঙ্কলের রুমে বসে কফি খেলাম অ্যারাউন্ড পৌনে চারটে। কফি শেষ করে হ্যারি আমার কাছে সিগারেট চাইল। আমি প্যাকেট নিয়ে যাইনি... নীচে গেলাম আনতে। ফিরেছিলাম বোধ হয় মিনিট পনেরো পর।"

"অতক্ষণ লাগল কেন?"

"পেটটা একটু আপসেট লাগছিল। টয়লেটে গিয়েছিলাম।" লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসল অ্যালবার্ট, "ফিরে ড্রয়িংরুমে বসি। উইথ হ্যারি। অর্থাৎ ধরুন... তখন চারটে বেজেছে। তারপর তো হ্যারি সোফায় হেলান দিল, আমিও নীচে এসে শুয়ে পড়লাম।"

"আবার কখন গেলেন দোতলায়?"

"বেশ লেটেই। তখন উপরে বাড়িভর্তি লোক। আঙ্কলকে পিস হ্যাভেনে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় চলছে।" বলেই অ্যালবার্টের চটজলদি প্রশ্ন, "কী বুঝলেন? জেসমিনই হিরেটা সরিয়েছে তো?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল না।" মিতিনের স্বর সহসা বদলে গিয়েছে। ঈষৎ রুক্ষভাবে বলল, "আপনি কিন্তু কিছু একটা বাদ দিয়ে গেলেন অ্যালবার্ট।"

"কখনও না। নেভার।" অ্যালবার্ট জোরে-জোরে ঘাড় নাড়ছে, "সব তো বললাম, ইন ডিটেল।"

"উঁহু। একটা খিঁচ রয়েই যাচ্ছে।" মিতিনের চোখ সরু, "ওয়ান অফ ইওর অ্যাকশনস ইজ় মিসিং।"

"বিলিভ মি, দ্যাট নাইট যা যা করেছি, সব বলেছি। আপ অন গড। মিথ্যে বললে আমার জিভ খসে পড়বে।"

মিতিন একটুও গলল না। একই সুরে বলল, "কী খসবে দেখতেই পাবেন। একটা কথা ভুলবেন না, সাসপেক্ট লিস্টে আপনার নামটা কিন্তু একেবারে উপরের দিকে।"

"কী অন্যায় কথা! কেন?"

"কারণ, হিরে হাতানোর সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। এবং সেটি পাচার করা আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সহজ।"

"ও গড, কেস যে পুরো উলটে গেল!" অ্যালবার্ট কটমট

তাকাল, "আমাকে ফাঁসানোর জন্যই ডেকেছেন নাকি?"

"ফাঁসার মতো কাজ করে থাকলে তো ফাঁসবেনই।" মিতিনের স্বর আরও কঠিন, "শেষরাত্তিরে সিন্দুকটা খুলেছিলেন কেন, অ্যাঁ?"

"আ-আ-আ-আ-আমি?"

"হ্যাঁ। আপনিই। অবাক হওয়ার ভান করবেন না।" মিতিন চাপা গলায় ধমক দিল, "শুনুন, যেসব বিদেশিকে নিয়ে আপনি ঘোরেন, তাদের কাউকে হিরেটা পাচার করেছেন কিনা সেটা কিন্তু আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য এক্ষুনি নয়। পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করার পর।"

"পুলিশ আমায় অ্যারেস্ট করবে?"

"জবাব না দিয়ে টুপুরকে টানল মিতিন, "চল।"

অ্যালবার্ট কাতর স্বরে বলল, "বিশ্বাস করুন, হিরে আমি নিইনি। আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভবই ছিল না।"

মিতিন ঘুরে তাকাল, "কেন?"

অ্যালবার্টের মুখে আর বাক্য নেই। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, দু' হাত নাড়ছে, কিন্তু আর স্বর ফুটছে না। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে দূরে চলে গেল, পরক্ষণে ভিক্টোরিয়ার গেট পেরিয়ে অন্দরে। হনহনিয়ে হাঁটছে, আর তাকাচ্ছে ঘুরে-ঘুরে।

টুপুর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে মিতিনকে দেখছিল। বিড়বিড় করে বলল, "তুমি তা হলে মিস্ট্রি সল্‌ভ করে ফেলেছ? কুরিয়েন নয়, এই অ্যালবার্টই...?"

"ধীরে বালিকা, ধীরে।" মিতিনের দৃষ্টিতে রহস্যের ঝিলিক, "কলি সবে সন্ধে পেরিয়ে রাত্তিরে পা রাখল। ভোর হতে এখনও ঢের বাকি।"

"সত্যি করে বলো তো, তুমি কাকে সন্দেহ করছ?"

"প্রায় সবাইকেই।" মিতিন হাসল, "আমিও এখন মইসাহেবের দলে।"

"ও বলবে না?" টুপুর ঈষৎ আহত, "এখন তবে কী কর্তব্য? গৃহে প্রত্যাবর্তন?"

"উঁহু। এবার হোটেল শিলটন। মিশন হ্যারি।"

॥ ৭ ॥

হোটেল শিলটনের বহিরঙ্গে তেমন একটা দেখনদারি নেই। তিনতলা ব্রিটিশ স্থাপত্যের বিল্ডিংটায় বয়সের ছাপ পড়েছে। তবে ছোট্ট সবুজ লনখানি যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মিনি লাউঞ্জ আর রিসেপশন কাউন্টারটিও মোটামুটি ছিমছাম। মোটা-মোটা গথিক থামে, দীর্ঘকায় দরজা-জানলায়, কারুকাজ করা কাঠের সানশেডে একটা বনেদিয়ানার গন্ধও পাওয়া যায় যেন।

রিসেপশনের বাঁ দিকে মালিকের ঘর। ভিতরে ভিজ়িটিং কার্ড পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিল মিতিন। দরজার পিতলের নেমপ্লেটখানা পড়তে-পড়তে টুপুর ফিসফিস করে বলল, "ভদ্রলোকের ভাল নামটা কী খটোমটো গো!"

মিতিন নিচু গলায় বলল, "এ আর কঠিন কী! হ্যারোতিউন থেকে হ্যারি। আর্মেনিয়ানদের নাম এরকমই হয়।"

ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। হাত দেখিয়ে বলল, "আপনারা যেতে পারেন।"

ভিতরে চড়া ঠান্ডা। কম্পিউটার শোভিত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে মাঝবয়সি হ্যারি। ঘুরনচেয়ারে আসীন। গোলগাল মুখ,

ভালমানুষ-ভালমানুষ চেহারা। গায়ের রং ফরসা হলেও মোটেই সাহেবদের মতো নয়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চকচকে কামানো গাল। পরনে ঝকঝকে সুট-টাই।

ঠোঁটে হাসি টেনে মিতিন বলল, "গুড আফটারনুন মিস্টার আরাকিয়েল।"

হ্যারির মুখমণ্ডলে তেমন কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না। বিনা সৌজন্যেই বললেন, "বসুন। জানতাম আজ-কালের মধ্যেই আসবেন।"

গদিমোড়া চেয়ারে বসে মিতিন বলল, "তদন্তের খবর কে দিল আপনাকে? জেসমিন? নির্মলা? না ইসাবেল আন্টি?"

"সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট নয় ম্যাডাম।" হ্যারির স্বর অসম্ভব শান্ত, "শুধু ভাবছি, আর কত মানসিক অত্যাচার আমার কপালে আছে! এখন তো মনে হচ্ছে আঙ্কলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে যাওয়াটা সেদিন উচিত হয়নি।"

"ওভাবে ধরছেন কেন মিস্টার আরাকিয়েল? আপনি তো কর্তব্য পালন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই রাত্তিরে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এবং ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আপনি তাতে জড়িয়ে পড়েছেন।"

"হুম। সেই অ্যাঙ্গেলেই তো দেখার চেষ্টা করছি।" টেবিলের কাচে পেপারওয়েট ঘোরাচ্ছেন হ্যারি। থেমে বললেন, "ও কে। কী কী জানতে চান বলুন? বাইশে ডিসেম্বরের রাতের ডিটেলটা আর একবার বলতে হবে নিশ্চয়ই? যাতে আমার বক্তব্যের অসঙ্গতি থেকে ধরতে পারেন হিরেটা আমি কখন সরিয়েছি?"

হ্যারির বাচনভঙ্গিতে টুপুর থ। মহা ঝানু লোক তো! বিকার নেই, উত্তেজনা নেই, দিব্যি কেমন চিবিয়ে-চিবিয়ে ইংরেজিতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন মিতিনমাসিকে!

টুপুরকে আরও অবাক করে দিয়ে মিতিনও হাসছে মিটিমিটি। কোনও রকম পাঞ্জা কষাকষিতে না গিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "তার আর প্রয়োজন নেই মিস্টার আরাকিয়েল। মোটামুটি সকলের স্টেটমেন্ট তো নিলাম, ওগুলো ঘেঁটেঘুঁটেই যা পাওয়ার পেয়ে গিয়েছি।"

"এবং নিশ্চিত হয়েছেন হিরে আমিই নিয়েছি, তাই তো?" হ্যারির স্বরে ব্যঙ্গ, "কিন্তু ম্যাডাম, জিনিসটা খুঁজে না বের করলে তো অপরাধ প্রমাণ হবে না। তা কোথা থেকে সার্চ শুরু করবেন? আমার বাড়ি? অফিস? ব্যাঙ্কের লকার? আপনি একাই খুঁজবেন, নাকি পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে?"

"দেখা যাক কী হয়।" মিতিন হ্যারির চোখে চোখ রাখল, "আগে তো বোঝার চেষ্টা করি, হিরে আপনি নেবেন কেন!"

"আমি আপনাকে লিড দিতে পারি ম্যাডাম ডিটেকটিভ। হোটেল শিলটন এখন ভাল চলছে না। তাই হয়তো হোটেল আর হিরে বেচে বাকি জীবনটা আমি বসে-বসে খাব। কিংবা সপরিবার কেটে পড়ব অস্ট্রেলিয়ায়।"

"উঁহু, কারণটা তেমন জোরালো লাগছে না।"

"কেন নয়? ওই হিরের দাম আপনি জানেন?"

"আন্দাজ করতে পারি। টাকার হিসেবে অন্তত দু' কোটি।" মিতিনের চোখে স্নিগ্ধ হাসি, "কিন্তু এও জানি, হিরেটা আপনার কাছে টাকার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি মূল্যবান।"

একক্ষণে হ্যারির মুখে যেন সামান্য ভাঙচুর। ঘুরনচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "আপনাকে তো যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট মনে হচ্ছে।"

"উঁহু, বুদ্ধিমতী নই, যুক্তিবাদী। আমি কার্যকারণে বিশ্বাস করি।"

হ্যারির চোখের মণি পলকের জন্য স্থির। তারপর থেমে-থেমে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, হিরে আমি নিয়েছি কি নিইনি, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তবে পুলিশের লোক নন বলেই আপনাকে বলছি, ওই হিরেতে আমার কাকার যতটা অধিকার ছিল, আমারও ঠিক ততটাই আছে। ওটা কখনওই কাকা বা তাঁর পরিবারের একার প্রাপ্য নয়। আমার বাবাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল।"

"অন্যায়ভাবে বলছেন কেন? আপনার ঠাকুরদা যদি তাঁর ছোট ছেলেকেই দিয়ে যান, কার কী বলার আছে?"

"না ম্যাডাম, তা তিনি পারেন না। হিরেটা ঠাকুরদা অর্জন করেননি। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি। একজন ভারতীয় হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করার জন্য বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা।"

"আপনার মা...?"

"মরাঠি। শোভা দেশপান্ডে। হিন্দু বলেই ঠাকুরদা তাঁকে মানতে পারেননি।" চেয়ারের ঘূর্ণন থামিয়ে হঠাৎই ঝুঁকেছেন হ্যারি। ব্যথিত মুখে বললেন, "দুঃখের কথা কী জানেন, আমার ঠাকুরদা ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ, অথচ উনি একবারও ভেবে দেখেননি আমাদের আর্মেনিয়ানদেরই অনেকের পূর্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু।"

টুপুরের গলা দিয়ে বিস্ময়ে ঠিকরে এল, "ওমা, আর্মেনিয়ানরা কী করে হিন্দু হবেন?"

"ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ভারী অদ্ভুত ম্যাডাম।" হ্যারির ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি, "আপনারা হয়তো খবর রাখেন না, এক সময় ভারতের সঙ্গে আর্মেনিয়ার নিয়মিত ব্যবসাবাণিজ্য চলত। শুধু তাই নয়, যিশু খ্রিস্টের জন্মের দেড়শো বছর আগে দু'জন হিন্দু রাজকুমার পাকাপাকিভাবে আর্মেনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। আর্মেনিয়ান ভাষায় তাঁদের একজনের নাম জেসান্নি, অন্যজনের

নাম ডেমেটার। ভারতীয় ভাষায় নাম দু'টো শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কৃষ্ণ আর জগন্নাথ। কনৌজের রাজা দীনাক্ষীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা। প্রাণে বাঁচতে পালিয়ে আর্মেনিয়ায় আশ্রয় নেন। আর্মেনিয়ার রাজা তাঁদের থাকতে দিয়েছিলেন তারোনে। পরে আরও অনেক হিন্দু সেখানে গিয়ে একটা বড়সড় শহর গড়ে তুলেছিল। তার প্রায় পাঁচশো বছর পর আর্মেনিয়ার এক খ্রিস্টান রাজার সঙ্গে হিন্দুদের যুদ্ধ হয়। হেরে গিয়ে হিন্দুরা সদলবলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।"

মিতিন বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

"আরও ইন্টারেস্টিং কী জানেন? আর্মেনিয়ায় এখনও এক হিন্দু বীরের মূর্তি আছে। স্থানীয় ভাষায় সেই যোদ্ধার নাম আর্টজান। অর্থাৎ আপনাদের অর্জুন। এবার বলুন, এই সব হিন্দুর কেউ যে আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন না তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়?"

"তা বটে।" মিতিন চেয়ারে টানটান হল, "আপনার ঠাকুরদা সত্যিই কাজটা ঠিক করেননি। কিন্তু একেবারেই কি কিছু দেননি আপনাদের?"

"অতি সামান্য, অতি সামান্য। শুধু প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের এই বাড়িটা, যেখানে বাবা কষ্টেসৃষ্টে এই হোটেলটা বানিয়েছিলেন। আর নগদ মাত্র এক লাখ টাকা।"

"হুম, আপনার ক্ষোভের কারণটা বোঝা গেল।"

"ক্ষুব্ধ হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক, ম্যাডাম?" হ্যারি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন, "এখনও যে কত রকম বঞ্চনা আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে।"

"যেমন?"

"আমার কাকার কাণ্ডটাই দেখুন না। ঠাকুরদা নয় অবুঝ ছিলেন, কিন্তু কাকা? তিনি তো আমায় খুব ভালবাসতেন বলেই জানতাম।

আমিও কখনও কর্তব্যে গাফিলতি করিনি। সময় পেলেই কাকা-কাকিমাকে দেখে আসতাম, নিয়মিত খোঁজখবর রাখতাম...। নিজের যখন ছেলেমেয়ে নেই, কাকার কি উচিত ছিল না সম্পত্তির খানিকটা অন্তত আমায় দিয়ে যাওয়া? কিন্তু একটা উইল করে গোটা সম্পত্তিটা উনি কাকিমাকে দিয়ে গেলেন।"

"মিস্টার আরাকিয়েলের উইল ছিল?"

"তবে আর বলছি কী। উইল যদি আদৌ না থাকত, অন্তত সম্পত্তির একটা ভাগ তো আমি পেতাম। খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী। অথচ সেটুকুও উনি করলেন না। ...আর কাকিমা যা করলেন...।"

"ইসাবেল আন্টি? তিনি আবার কী করলেন?"

"ভাবতেও পারবেন না ম্যাডাম। আত্মীয়স্বজনের ব্যাপার বলতেও লজ্জা করে। হিরে নিয়ে আমার পিছনে পুলিশ তো লাগিয়েছেনই, আমি আর আমার স্ত্রী জেরায় জেরবার হয়ে গিয়েছি। তার মাঝেই খবর পেলাম তড়িঘড়ি করে কাকিমা উইলের প্রোবেটও নাকি নিয়ে ফেলেছেন।"

"তাই নাকি? কবে? কদ্দিন আগে?"

"কাকা গত হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই। জানুয়ারি মাসে।"

"আপনি জানলেন কোথা থেকে? অ্যালবার্ট...?"

হ্যারি ঈষৎ থতমত, "না... মানে... বোধ হয় অ্যালবার্টই...।"

"অ্যালবার্টের সঙ্গে আপনার খুব ভাব, তাই না?"

"ভাব বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝলাম না।" হ্যারি ফের সপ্রতিভ, "অ্যাল মাঝে-মাঝে প্রোফেশনাল কারণে আমার কাছে আসে, দেখা-সাক্ষাৎ হলে কথাবার্তা বলি।"

"প্রোফেশনাল কারণটা কী?"

"অ্যাল এখন গাইডের কাজ করে। অফিশিয়াল লাইসেন্স ওর

নেই, তবে চালাকচতুর ছেলে তো, যোগাযোগ ঠিক তৈরি করে ফেলে। আর ওই সব ফরেন টুরিস্টদের আমাদের হোটেলে এনে তুললে কিছু কমিশনও পায়।"

"ব্যস, এইটুকুই ব্যবসায়িক সম্পর্ক?" মিতিনের চোখ সরু, "নাকি হোটেল শিলটনের বেআইনি জুয়ার বোর্ডেও নিয়মিত আসে অ্যালবার্ট?"

হ্যারির শান্ত চোখ দু'টো আচমকাই জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে আবার হিমশীতল। কেটে-কেটে বলল, "আপনি কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন ম্যাডাম ডিটেকটিভ। ভদ্রতা করে কথা বলছি বলে যদি ভেবে থাকেন আপনি যা খুশি প্রশ্ন করবেন, তা হলে কিন্তু ভুল করছেন। আপনার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।"

"দেবেন না।" মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তবে বাইশে ডিসেম্বর রাতে অ্যালবার্ট চলে যাওয়ার পর আপনি সত্যি-সত্যি ঘুমোচ্ছিলেন, নাকি কাকার ঘরে গিয়ে সিন্দুকটা পরখ করছিলেন, এ ব্যাপারে পুলিশের কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

হ্যারি দু'-এক সেকেন্ড নিশ্চুপ। তারপর মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেছে, "গোড়াতেই একটা গলদ করে ফেললেন ম্যাডাম। অ্যাল চলে যাওয়ার পর আমি ঘুমোইনি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর অ্যাল গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, অ্যাল কখন চলে গিয়েছিল, আমি জানিও না।"

"সরি। মানতে পারলাম না। আপনি ইচ্ছে করে আমাকে মিসগাইড করছেন।"

"যা খুশি ভাবতে পারেন। আমার কিছু যায়-আসে না।" হ্যারির স্বরে ওঠাপড়া নেই, "আগেই তো বললাম, ওই হিরেতে আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। যদি নিয়ে থাকি, বেশ করেছি। পারলে খুঁজে বের করুন।"

"বেশ। দেখি চেষ্টা করে।" মিতিন উঠে পড়ল, "আজ তা হলে চলি মিস্টার আরাকিয়েল। আশা করছি শিগগিরই আমাদের আবার দেখা হবে।"

শিলটন হোটেল থেকে বেরিয়ে টুপুর বলল, "মিস্টার হ্যারি কিন্তু বেশ পিকিউলিয়ার, তাই না?"

মিতিন কী যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, "কেন?"

"বা রে, যাকেই হিরে নিয়ে ক্রস করা হচ্ছে, সে-ই হাউমাউ করে উঠছে। একমাত্র মিস্টার হ্যারিরই কোনও হেলদোল নেই! কেমন বুক বাজিয়ে বলে দিলেন, নিয়ে থাকলে বেশ করেছি!"

"হুম।"

"তোমার কী ধারণা? মিস্টার হ্যারিই কালপ্রিট?"

"তোর কী মনে হচ্ছে?"

"আমার মনে হয়...।" টুপুর মাথা চুলকোল, "হ্যারির সঙ্গে অ্যালবার্টের যোগসাজশ আছে। এই দুই মক্কেলের উপর রাউন্ড দ্য ক্লক নজর রাখলে হিরের হদিশ মিলতেও পারে। অবশ্য গ্রু অ্যালবার্ট যদি কোনও বিদেশির কাছে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আর কিছু করার নেই।"

"বলছিস?"

"হ্যাঁ গো। আমার মন বলছে সেরকমই কিছু ঘটেছে। এবং সেই কারণেই মিস্টার হ্যারি এত বেশি কনফিডেন্ট।"

"আর হিরের বদলে যে টাকাটা এল, সেটা মিস্টার হ্যারি কোথায় রাখতে পারেন?"

"জায়গার অভাব? হোটেলের লনেই তো পুঁতে রাখা যায়।"

"হুম।... নে, এবার একটা ট্যাক্সি ধর। বাড়ি গিয়ে আরতিকে ছাড়তে হবে।"

বিকেলবেলা থিয়েটার রোড থেকে ট্যাক্সি পেতে খুব অসুবিধে

নেই। সিটে বসে টুপুর বলল, "মাটিতে টাকা পুঁতে রাখার থিয়োরিটা কি তোমার পছন্দ হল না?"

"অপছন্দ হল তো বলিনি।" মিতিন হাসল, "আমি কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছি না। আবার একটা লাইন ধরে একবগ্গা ভাবতেও রাজি নই। তবে হ্যারির কাছে এসে একটা মস্ত লাভ হল।"

টুপুর চোখ কুঁচকোল, "কী লাভ?"

"প্রথমত, মানুষটাকে খানিকটা চেনা গেল। সেকেন্ডলি, অনেক ইনফরমেশনও মিলল।"

"কী ইনফরমেশন? আর্মেনিয়ানদের গল্প?"

জবাব দেওয়ার আগেই মিতিনের মোবাইল বেজে উঠেছে। নম্বরটা দেখেই মিতিনের ভুরু জড়ো, "ইয়েস?"

ব্যস, আর কথা নেই মিতিনের মুখে, কানে যন্ত্র চেপে একটানা শুধু শুনে যাচ্ছে, মোবাইল অফ করার আগে একবারই মাত্র স্বর ফুটল, "ও কে।"

টুপুর আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, "কে গো?"

"মিস্টার কুরিয়েন।"

"অ্যাঁ? মিস্টার কুরিয়েন হঠাৎ? কী বলছেন?"

"বললেন, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আদতে একটি মহাশূন্য। কী বুঝলি?"

টুপুর ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। কী যে হেঁয়ালি করে না মিতিনমাসি!

॥ ৮ ॥

হেঁয়ালি ক্রমেই বাড়ছিল। বাড়ি ফিরে গোটা সন্ধেটা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল মিতিনমাসি। রাতে খেতে বসেও আনমনা। মুরগির ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে অজস্র জ্ঞান বিতরণ করল পার্থমেসো। রেজাবিবির সমাধিটাকে যদি হিসেবে না ধরা হয়, তা হলে কলকাতায় পা রাখার ঢের আগেই নাকি চুঁচুড়ায় ঘাঁটি গেড়েছিল আর্মেনিয়ানরা। তারপর চন্দননগরে। তারপর মুর্শিদাবাদের লাগোয়া সৈদাবাদে। মোগল বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের ফরমান নিয়ে সৈদাবাদে নাকি জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল আর্মেনিয়ানরা। অবশ্য প্রথম গির্জাটি নাকি গড়ে চুঁচুড়ায়। আমাদের বঙ্গদেশে সেটাই নাকি দ্বিতীয় প্রাচীনতম গির্জা। পার্থমেসোর এমন লম্বা বক্তৃতাও চুপচাপ গিলে নিল মিতিনমাসি, একটাও টীকা-টিপ্পনী জুড়ল না। এমনটা কালেভদ্রে ঘটে। মিতিনমাসির মগজে যখন জট পড়ে যায়, শুধু তখনই। কেসটা কি তবে, টুপুর যেমনটা ভাবছিল, তত সরল নয়? মিস্টার কুরিয়েনই বা কী এমন সংবাদ শোনাল টেলিফোনে? দুয়ে-দুয়ে চার কি তবে হচ্ছে না?

পরদিন সকালেও মিতিনমাসি ঝিম মেরে বসে। পার্থমেসো কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই সালোয়ার-কামিজ পরে তৈরি। আরতিকে বলল, "আমি আর টুপুর একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। বুমবুমকে খাইয়ে দিয়ো।"

বিস্মিত মুখে টুপুর বলল, "কোথায় যাবে?"

"মারকুইস স্ট্রিট।"

"কেন গো?"

"কয়েকটা গিঁট খুলতে হবে। জেসমিন আর ইসাবেল আন্টিকে একবার মিট করা দরকার।"

জেসমিনও মিতিনদের দেখে অবাক। বলল, "কী ব্যাপার ম্যাডাম? ফোনটোন না করেই হঠাৎ...?"

"চলে এলাম।" মিতিন একগাল হাসল, "অসুবিধে করলাম কি?"

"তা নয়... তবে আমি যে একটু বেরোব এখন...।"

"একদম সময় নেই?"

"না না, আছি কিছুক্ষণ। আসলে বারোটায় এক পার্টিকে টাইম দিয়েছি তো...।"

"মিনিট কুড়ির মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"আহা, এত ইতস্তত করছেন কেন? আসুন তো।"

ড্রয়িংরুমে মিতিনদের বসিয়ে নির্মলাকে শরবত তৈরির নির্দেশ দিয়ে এল জেসমিন। মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, "কদ্দুর এগোলেন?"

"সামান্যই। অন্ধকার সুড়ঙ্গে হাঁটছিলাম, সবে যেন একটু আলোর দিশা পাচ্ছি।"

জেসমিনের চোখ জ্বলজ্বল, "হিরেটা তা হলে পাওয়া যাবে?"

"সম্ভাবনা আছে।"

"থ্যাঙ্ক গড। আন্টি তা হলে প্রাণ ফিরে পাবেন।"

"আন্টি এখন আছেন কেমন?"

"একই রকম। ওষুধ তো চলছে, তবে তেমন উন্নতি হচ্ছে না। হিরেটা পেলে হয়তো শকটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, শরীরটাও ফিরবে।"

"হুঁ।" মিতিন মাথা নাড়ল, "এবার তা হলে কাজের কথায় আসি?"

"বলুন?"

"মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর পর মিস্টার হ্যারি তো আর এ বাড়িতে আসেননি, তাই না?"

"তা কেন, আসছিল তো। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর থেকে আর যোগাযোগ রাখছে না। একমাত্র ফিউনারেল ডিনারের দিন সপরিবার এসেছিল। ঘণ্টাখানেকের জন্য।"

"আন্টিকে টেলিফোনও করছেন না?"

"উঁহু। পিসি তো সে জন্যও খুব আপসেট।"

"ফিউনারেল ডিনারের দিন মিস্টার হ্যারির মুড নিশ্চয়ই ভাল ছিল না?"

"একেবারেই না। প্রায় কারওর সঙ্গেই কথা বলেনি।"

"আচ্ছা, মিস্টার হ্যারি কি শুধু পুলিশের ব্যাপারেই আহত? নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?"

"আর কী কারণ থাকবে?"

"শুনলাম মিস্টার আরাকিয়েল উইল করে যাবতীয় সম্পত্তি ইসাবেল আন্টিকে দিয়ে গিয়েছেন। সেই কারণেও কি মিস্টার হ্যারি...?"

জেসমিন ক্ষণিকের জন্য থতমত। অস্ফুটে বলল, "আপনি হ্যারির কাছে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। মনে হল ওঁর কিছু এক্সপেক্টেশন ছিল।"

"আশ্চর্য, আঙ্কলের প্রপার্টি আন্টি পাবেন, এটাই তো স্বাভাবিক! হ্যারি আশা করে কোন মুখে?"

"কারণ, সম্পত্তির অনেকটাই যে বংশগত। এমনকী হারানো হিরেটাও। সুতরাং, মিস্টার হ্যারির যে একটু হলেও দাবি নেই, একথা বোধ হয় আইনও বলবে না।"

"দেখুন ম্যাডাম, আইনি কুটকাচালি আমি একদম বুঝি না।

আঙ্কল যদি তাঁর স্ত্রীকেই সব দিয়ে যান, কার কী বলার আছে?"

"তা তো বটেই। ...আচ্ছা, মিস্টার হ্যারি কি আগে শুনেছিলেন উইলের কথা?"

"জানার তো কথা নয়। আমাকেও আঙ্কল কখনও বলেননি। আন্টিকেও না।"

"ও।... আপনারা জানলেন কবে?"

"ফিউনারেল ডিনারের পর। আঙ্কলের সলিসিটর আমাদের জানালেন। উইল তো ওঁদের কাছেই গচ্ছিত ছিল।"

"মানে সলিসিটার ফার্মে?"

"হ্যাঁ। রয় অ্যান্ড সেন। তিন নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট।"

"কে কে সাক্ষী ছিল উইলের?"

"একতলার সিনিয়র ডিসুজা। আই মিন, পিটার আঙ্কল। আর আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান, যিনি সে-রাত্রে আঙ্কলকে দেখতে এসেছিলেন।"

"ও। কবে নাগাদ উইলটা করা হয়েছিল?"

"ডেট তো দেখলাম বছর তিনেক আগের।" জেসমিনকে ঈষৎ অসহিষ্ণু দেখাল, "কিন্তু হিরে চুরির সঙ্গে উইলের কী সম্পর্ক ম্যাডাম?"

"হয়তো কিছুই না। তবু বুঝে নিতে দোষ কী!" আলোচনার মাঝে নির্মলা নিঃশব্দে শরবত রেখে গিয়েছিল, চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "আচ্ছা... একটা কথা। আন্টি এত তড়িঘড়ি উইলের প্রোবেট নিতে গেলেন কেন?"

"আমিই অ্যাডভাইস করেছিলাম। হিরে মিসিং হওয়ার পর আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। মনে হয়েছিল, সম্পত্তিটা এক্ষুনি-এক্ষুনি পিসির নামে করে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া আঙ্কলের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলোর নাম ট্রান্সফারও তো জরুরি ছিল।"

"ভাল করেছেন। ঠিকই করেছেন। ইসাবেল আন্টির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিকটাও তো ক্লিয়ার থাকা দরকার।" মিতিন সামান্য হাসল, "প্রপার্টি এখন তা হলে ইসাবেল আন্টির নামেই, কী বলেন?"

"হ্যাঁ। ওটা নিয়ে আর কেউ ট্যাঁফোঁ করতে পারবে না।"

"আচ্ছা জেসমিন, হিরের সম্পর্কে উইলে কোনও উল্লেখ ছিল কি?"

"আলাদাভাবে থাকবে কেন! স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বলতে তো হিরেটাও...।" জেসমিনের চোখ সহসা স্থির, "হিরেটা কি তবে হ্যারিই সরিয়েছে?"

"আরও দু'-একটা দিন যাক, সব জেনে যাবেন।" মিতিন আবার হাসছে, "শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাকে অগ্রিম দেওয়াটা আপনার বৃথা যাবে না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।" শরবত শেষ করে মিতিন গ্লাস টেবিলে রাখল, "আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন... যেতে পারেন এবার।"

"আপনারা?"

"আর-একটু বসি। ইসাবেল আন্টির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

"এখন কথা বলবেন?" জেসমিন দু'-এক সেকেন্ড ভাবল, "বেশ তো, নির্মলাকে ডেকে দিচ্ছি। ও আপনাদের আন্টির রুমে নিয়ে যাক।"

ইসাবেল বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। নির্মলা ধরে বসিয়ে দিতেই চোখ ঘষে বললেন, "ওমা, তোমরা! কখন এলে?"

"এই তো...।" টুপুরকে নিয়ে মিতিন খাটের ধারটায় বসল, "কী বই পড়ছেন আন্টি?"

"মঁপাসার ছোট গল্প।"

"আপনি বুঝি মঁপাসার ভক্ত?"

"ভীষণ। গল্পগুলো তো বারবার পড়ি। তবে এখন চোখের যা হাল, দু'-চার পাতা পেরোতে না-পেরোতে অক্ষরগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে যায়।"

"ছানি আসেনি তো? ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"আর আমার ডাক্তারে কাজ নেই। রোগ ধরতে পারে না, শুধু গাদাগাদা ওষুধ দেয়। আমি আর ওষুধও খাব না।" ছোট্টখাট্টো শান্ত ইসাবেল গজগজ করে উঠলেন, "ভাবছি এবার ধ্যান করাটাও ছেড়ে দেব।"

"কেন আন্টি? ধ্যান কী ক্ষতি করল?"

"ধ্যানই তো যত নষ্টের গোড়া। যেদিন থেকে জোসেফের ছবির সামনে বসছি, সেদিন থেকেই জোসেফ আমায় ডাকাডাকি করছেন। শরীরও বিগড়োচ্ছে দিনদিন। যখনই ধ্যান সেরে উঠি, মনে হয়, আরও যেন কমজোরি হয়ে গেলাম, হাত-পায়ের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। আরে বাবা, টেনে নিতে হয় তো টেনে নাও, এরকম দগ্ধে-দগ্ধে মারা কেন!" ইসাবেল আবার দু'হাতে চোখ রগড়ালেন, "যাক গে, আমার কথা ছাড়ো। হিরের কী খবর?"

"প্রাণপণ চেষ্টা করছি আন্টি। মনে হয় শিগগিরই পেয়ে যাবেন।"

"মনে হয়-ফয় নয়। ওই হিরে আমার চাইই চাই। আরাকিয়েল বংশের 'গুড লাক' যদি না মেলে, এই বুড়ি তা হলে আর বাঁচবে না।"

"ওসব অলক্ষুনে কথা মুখেও আনবেন না।" মিতিন ঝুঁকে ইসাবেলের হাতে হাত রাখল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব আন্টি?"

GOLD
13578

"বলো।"

"আপনি কি কখনওই আঙ্কলকে সিন্দুক থেকে হিরেটা বের করতে দেখেননি?"

"সেদিন তো বললাম, সিন্দুক খোলার সময় উনি আমাকেও ঘরে থাকতে দিতেন না।"

"হুঁ। ... আজ আর-একবার সিন্দুকটা দেখতে পারি?"

"দ্যাখো।" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মলাকে চাবির গোছা বাড়িয়ে দিলেন ইসাবেল, "যা, খুলে দে।"

সিন্দুকের অভ্যন্তর সেদিনের মতোই ফাঁকা-ফাঁকা। ভেলভেটের ফাঁকা বাক্স খোলা পড়ে। ডায়েরি আর টুকরো-টুকরো কাগজ যেখানে ছিল সেখানেই। বাক্সখানা আবার ভাল করে পরখ করে ডায়েরিটা হাতে নিল মিতিন। উলটোচ্ছে পৃষ্ঠা। সময় নিয়ে-নিয়ে। হঠাৎই বাড়িয়ে দিয়েছে টুপুরকে। চাপা গলায় বলল, "লাস্ট পেজটা দ্যাখ।"

ডায়েরিটা সংখ্যায় সংখ্যায় ঠাসা। পাতায়-পাতায় হিসেব। একদম শেষ পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় করে লেখা, GOLD 13578.

টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "গোল্ড তেরো হাজার পাঁচশো আটাত্তর? এর মানে কী?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন ডায়েরি রাখল স্বস্থানে। নির্মলাকে সিন্দুক বন্ধ করতে বলে ফিরেছে ইসাবেলের কাছে।

ইসাবেল জিজ্ঞেস করলেন, "ফের দেখে লাভ হল কিছু?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কি সহজে করা যায় আন্টি?" মিতিন মৃদু-মৃদু হাসছে, "মিস্টার আরাকিয়েলের উইলের বলে বিশাল সম্পত্তি আপনি পেয়ে গেলেন। এটা আপনি কী মনে করেন? লাভ? না লোকসান?"

“পুরোটাই লোকসান, বাছা। সেই মানুষটাই আর রইলেন না... তাঁর সম্পত্তি নিয়ে এই বয়সে আমি কী করব?”

“তবু তো তাড়াহুড়ো করে উইলের প্রোবেটটা নিলেন।”

“জেসমিন বলল যে। না নিলে নাকি অসুবিধে হতে পারে। কেন, ভুল করেছি?”

“না না, ভুল কীসের।”

“আমার কিন্তু কেমন যেন খচখচ করছিল। মনে হচ্ছিল, বড্ড বিষয়ী হয়ে যাচ্ছি। তারপর থেকেই তো ধ্যানে মন দিলাম।”

“হুঁ। তা আপনি উইল করার কথা ভাবছেন না?”

“ভাবছি তো। জোসেফের কয়েকটা ভুল তো শোধরাতে হবেই।”

“কীরকম?”

“জোসেফের খুব ইচ্ছে ছিল আর্মেনিয়ান অ্যাকাডেমিকে কিছু দান করার। হয়তো উইলটা উনি বদলাতেনও। কিন্তু সময় তো পেলেন না। ভাবছি, টাকাকড়ি যা আছে তার একটা মোটা অংশ অ্যাকাডেমিকে দিয়ে যাব। এই বাড়ি আর কিছু টাকা পাবে জেসমিন।” বলতে-বলতে ইসাবেল ফিরেছেন নির্মলার দিকে, “আমার এই মেয়েটাকেও ফেলব না। এর জন্য বাড়ির একখানা ঘর আর আজীবন মাসোহারার বন্দোবস্ত অন্তত করে যাব।”

টুপুর ফস করে বলে উঠল, “আর হিরে?”

“আগে খুঁজে তো পাওয়া যাক। তারপর ভেবে দেখব।”

ইসাবেলের গলায় সংশয়ের সুর। টুপুর হাসল মনে-মনে। এই প্রবীণা মহিলা জানেন না, মিতিনমাসি যখন একবার কেসটা হাতে নিয়েছে, ওই হিরে উদ্ধার হবেই। যদি হিরে পাচারও হয়ে গিয়ে থাকে, তাও মিতিনমাসি এ ক'দিনে টের পেতই। শুধু উইল নিয়ে এত পুছতাছ কেন, সেটুকুই টুপুরের বোধগম্য হচ্ছে না। ওই আজব

লেখাটাই বা হঠাৎ দেখাল কেন? সোনার সঙ্গে হিরের কী সম্পর্ক? ১৩৫৭৮-এরই বা মানে কী?

ভাবনাটাকে বেশি খেলানোর অবকাশ পেল না টুপুর। গাড়িবারান্দার ছাদটা একবার ঘুরে এসে ইসাবেলের কাছ থেকে বিদায় নিল মিতিন। দরজা বন্ধ করতে নির্মলাও এসেছে পিছন-পিছন। হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতিন তাকে বলল, "আন্টির ঠিকমতো খেয়াল রাখছ তো?"

নির্মলা নীরস গলায় বলল, "দেখাশুনো করাটাই তো আমার কাজ।"

"বিনিময়ে তো পাচ্ছও অনেক কিছু। আন্টি তো তোমার সারা জীবনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।"

"আন্টির করুণা। আমার ভাগ্য।"

"তুমি কিন্তু আন্টির ভালবাসার পুরো মর্যাদা দাওনি নির্মলা।"

"একথা কেন বলছেন?"

"বাইশে ডিসেম্বরের রাতটা ভাবো, তা হলেই জবাব পেয়ে যাবে।"

পলকে নির্মলার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। মাথা নিচু করে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু...।"

নির্মলা থেমে গেল। দু'-চার সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে নির্মলাকে দেখল মিতিন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নীচে।

টুপুর কৌতূহলে টগবগ করে ফুটছিল। একতলায় এসে বলল, "মিস্টার হ্যারি আর নির্মলা কি আঁতাত করে...?"

"এখন কোনও প্রশ্ন নয়। চল, জেসমিনের মোমবাতির কারখানাটা একবার দেখে যাই।"

"কেন?"

"বললাম যে, নো প্রশ্ন। জাস্ট ফলো মি।"

গিয়ে অবশ্য লাভ হল না। বাড়ির পিছনের গ্যারাজ ঘরটা বন্ধ। তালামারা পুরনো আমলের কাঠের পাল্লা ঠেলেঠুলে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল মিতিন। কিছুই বোধহয় গোচরে এল না। হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎই হনহন করে চলে গেল পাঁচিলের ধারের ঝোপটায়। ছোট্ট একটা কাগজের বাক্স কুড়িয়ে দেখছে ভুরু কুঁচকে। বাক্সটা ফেলে দিয়ে টুপুরকে বলল, "দাঁড়া এখানে। আমি আসছি।"

বলেই দুদ্দাড়িয়ে আবার দোতলায়। টুপুর হতবাক। গিয়ে বাক্সটা তুলে দেখল একবার। কী কাণ্ড, এ যে এক ডজন থার্মোমিটারের বাক্স। এটা দেখে মিতিনমাসি অত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন? কী ছাই রহস্য পেল বাক্সটায়?

মিনিট পাঁচেক পর ফিরেছে মিতিন। আর-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না, টুপুরকে ডেকে নিয়ে সোজা গেটের বাইরে। বাহাদুর যে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে, সেদিকেও নজর নেই যেন।

লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটছিল মিতিন। তাল মেলাতে টুপুরের গলদঘর্ম দশা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুখে এসে মিতিন ট্যাক্সি ধরতে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারখানা কী? আবার ওপরে ছুটলে কেন?"

ব্যাগ খুলে মিতিন একটা আধপোড়া লাল বাটি-মোমবাতি বের করে দেখাল, "এটা আনতে।"

টুপুরের গুলিয়ে যাচ্ছিল সব কিছু। মোমের মধ্যে হিরে আছে নাকি?

॥ ৯ ॥

সন্ধেবেলা বুমবুমের খাটে বসে হিরে চুরির কেসের একটা নোট মতো বানাচ্ছিল টুপুর। মিতিনমাসি এবার তাকে কোনও কাজই দেয়নি, তবু প্রত্যেকের জবানবন্দি, কার সম্পর্কে টুপুরের কী ধারণা জন্মেছে, লিখছে সাজিয়ে গুছিয়ে। হঠাৎ কোনও নতুন পয়েন্ট মনে পড়লে যোগ করে নিচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। যেমন এইমাত্র স্মরণে এল, পিটার ডিসুজা একজন সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও উইলের খবর টুপুরদের কাছে গোপন করে গিয়েছিলেন। মিসেস আরাকিয়েলও নিজে থেকে উইলের কথা ভাঙেননি! জেসমিন-নির্মলারাও নয়। ভুলটা ইচ্ছাকৃত? না অনিচ্ছাকৃত? টুপুরের মন্তব্যটা হয়তো কাজে লাগবে না, তবু নোট থাকা ভাল। টুপুর দেখেছে বিবরণী বিশদ হলে মিতিনমাসির কাজে সুবিধে হয়। টুপুর নিজেও শিখতে পারে, তদন্তের কোন-কোন সূত্র দরকারি, কোনটাই বা নেহাত অদরকারি।

ঘরে বুমবুমও মজুত। কম্পিউটারে ভিডিও গেমস খেলছে এক মনে। মা বাড়ি নেই, দিদিও কম্পিউটারের দখল চাইছে না, বুমবুমের এ ভারী সুখের সময়। পরশু অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে, মঙ্গলবারই নতুন ক্লাস শুরু। ছুটির শেষ দু'টো দিন যেন চুটিয়ে উপভোগ করছে বুমবুম।

পার্থ ফিরল সাড়ে আটটা নাগাদ। চৈত্রের গরমে থসথস করতে-করতে। এসেই শাওয়ার চালিয়ে স্নান। তারপর পাউডার-টাউডার মেখে আয়েশ করে বসেছে সোফায়। খবরের কাগজ উলটোতে-উলটোতে হাঁক পাড়ল, "টুপুর...? অ্যাই টুপুর...?"

কাগজ-কলম ফেলে দৌড়ে এল টুপুর, "কী বলছ?"

"তোর মাতৃষ্বসাটি গেলেন কোথায়?

"কী জানি। দুপুরে মারকুইস স্ট্রিট থেকে ফিরেই নাকে-মুখে গুঁজে কোথায় বেরিয়ে গেল।"

"তোকে নিল না?"

"তাই তো দেখছি।"

"একাই হিরে উদ্ধারে গেল নাকি?"

"বুঝতে পারছি না।"

"এহ্, তোর মাসি এখনও তোকে এলেবেলেই ভাবে রে। তুই আর জাতে উঠলি না।"

টুপুর হেসে ফেলল। পার্থমেসো তাকে রাগাতে চাইছে। হাসতে-হাসতেই বলল, "মাসি তার নিজের ডিউটি করছে, আমি আমার।"

"তোর কী ডিউটি শুনি?"

"রিপোর্ট তৈরি করা। কদ্দুর কী প্রোগ্রেস হল...।"

"আদৌ কিছু এগিয়েছে কী?"

"জানতে চাও, এখনও পর্যন্ত কী করেছি? আনব লেখাটা?"

"ওরে বাবা, এখন ওটা পড়বি নাকি?" পার্থ হাই তুলল, "তার চেয়ে বরং দ্যাখ, খাবারদাবার কিছু আছে কি না।"

উৎসাহে জল ঢেলে দিতেই টুপুর বিরস মুখভঙ্গি করে বলল, "আরতিদি ইডলি-সম্বর বানিয়ে রেখে গিয়েছে। মাইক্রোওয়েভে গরম করে দেব?"

"সঙ্গে একমুঠো চানাচুরও দিস। আর চা।"

"ইডলির সঙ্গে চানাচুর? কী কম্বিনেশন গো!"

"ভ্যারাইটি জীবনের মশলা রে। তুইও ট্রাই করে দেখতে পারিস।"

"নো চান্স। ওই বিদ্‌ঘুটে মিক্সচার তুমিই খাও।"

জলখাবার হাতে পেয়েই তুবড়ি ছোটাতে শুরু করেছে পার্থমেসো। আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞান আহরণ করেছে, এখন ভাণ্ডার উজাড় করার পালা। সম্রাট আকবর নাকি এক আর্মেনিয়ানকে ছেলে হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্যে প্রধান বিচারপতিও নাকি ছিলেন একজন আর্মেনিয়ান। বিচারপতির নাম ছিল আবদুল হাই। আকবরের সময় থেকেই দিল্লি, আগ্রা, পঞ্জাব, সর্বত্রই আর্মেনিয়ানরা জাঁকিয়ে বসতে থাকে। একটা গির্জাও নাকি তারা বানিয়ে ফেলেছিল আগ্রায়, আকবর বেঁচে থাকাকালীন।

বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ মিতিনের প্রবেশ। পার্থর ডাকাডাকিতে সাড়া না দিয়ে থমথমে মুখে সটান ঢুকে গেল স্টাডিতে। বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। টুপুর আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেস চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এমনটাই করে মিতিন, তারা জানে।

রাতে অবশ্য মিতিন বেরিয়ে খেতে বসল একসঙ্গে। এলোমেলো কথা বলল দু’-চারটে, কিন্তু কেসের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম নীরব। অর্থাৎ কেস নিয়েই ভাবছে। এবং কেস সংক্রান্ত কোনও আলোচনাই এখন পছন্দ করবে না। আহার সেরে ফের সেঁধিয়ে গেল নিজস্ব কুঠুরিতে। টুপুর যখন শুতে গেল, তখনও স্টাডির আলো নেবেনি।

সকালবেলা মিতিন কিন্তু একদম অন্য মেজাজে। নিজেই ব্যালকনির গাছে জল দিল, মাঝে-মাঝে গুনগুন গান গাইছে, আরতিকে আলুর পরোটা ভাজতে বলল, খুনসুটি করল বুমবুমের সঙ্গে।

টুপুরও গন্ধ পেয়ে গিয়েছে ওমনি। আলুর পরোটার প্লেট হাতে নিয়ে মাসিকে জিজ্ঞেস করল, “কেস মনে হচ্ছে সল্‌ভড?”

"ইয়েস। যবনিকা কম্পমান।" মিতিনের মুখে বিচিত্র হাসি, "এবার পরদাটা তুলে দিলেই হয়।"

"কে নিয়েছে তা হলে হিরেটা?"

"সাসপেন্স।"

"বুঝেছি, বলবে না।" টুপুর চোখ তেরচা করল, "জিনিসটা পাওয়া যাবে তো? নাকি পাচার হয়ে গিয়েছে?"

"ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে পচে মর। কী বুঝলি?"

"ধাঁধাটার জবাব তো মশারি।" টুপুর ঘাড় চুলকোচ্ছে, "একটু ঝেড়ে কাশো না মিতিনমাসি।"

"আর তো কয়েকটা ঘণ্টা। দমটাকে ধরে রাখ।" মিতিন পার্থর দিকে তাকাল, "তুমি কী করছ বিকেলে?"

শব্দজব্দ করতে-করতে পরোটা ছিঁড়ছিল পার্থ। তবে কান কিন্তু এদিকেই খাড়া। ঠোঁট উলটে বলল, "ঠিক নেই। ভাবছি অ্যাকাডেমিতে একটা নাটক দেখতে যাব।"

"উঁহু। আমাদের সঙ্গে মারকুইস স্ট্রিট চলো।"

"গিয়ে?"

"জোড়া নাটক দেখবে। উইথ ফাটাফাটি ক্লাইম্যাক্স। ...উঁহুহু, চোখ বড়-বড় কোরো না। ঠিক চারটেয় শো। রোববার দুপুরে না ঘুমিয়ে তৈরি থেকো।"

পার্থর পরোটা বোঝাই গাল হাসিতে ভরে গেল, "ও কে, ম্যাডাম টিকটিকি।"

॥ ১০ ॥

ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছে আট-ন'জন। মিসেস আরাকিয়েল তো আছেনই, জেসমিন, নির্মলা, হ্যারি, সুজ়ান, ডিসুজারা বাপ-ছেলে, কুরিয়েন কর্তাগিন্নি সকলেই হাজির। মিতিনরা ঢোকামাত্র হালকা একটা গুঞ্জন উঠেছিল, এখন এক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে।

পার্থ আর টুপুরকে দু'দিকে নিয়ে মিতিন বসল বড় সোফাটায়। উৎসুক চোখগুলোতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কথা শুরু করেছে, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বাইশে ডিসেম্বরের রাতটা সম্পর্কে আপনারা কেউই সত্যি কথা বলেননি। অবশ্য মিসেস আরাকিয়েলকে আমি ধরছি না। কারণ, ওই রাতটা নিখুঁত স্মরণে রাখা আন্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না। উনি আর মিস্টার পিটার ডিসুজা ছাড়া উপস্থিত প্রত্যেকেই সেদিন অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ করেছিলেন।"

ইসাবেল বিড়বিড় করে বললেন, "কী বলছ বাছা? সবাই মিলে হিরে চুরি করেছে?"

"উঁহু, তা কেন।" মিতিন চিলতে হাসল, "আমি বরং সেদিন রাতে কী কী ঘটেছিল, তার একটা ছবি তুলে ধরি। তা হলেই ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"বেশ তো, বলো শুনি!"

"মিস্টার আরাকিয়েলের ডেডবডি ঘিরে অনেকেই ছিলেন সেদিন। মিসেস কুরিয়েন আর সুজ়ান ছাড়া এ ঘরের সব্বাই। রাত

দু'টোর সময়ে মিসেস আরাকিয়েলকে নিয়ে জেসমিন তার ঘরে গেল, মিস্টার পিটার ডিসুজাও নেমে গেলেন নীচে। আর তারপরেই শুরু হল এক আজব লুকোচুরি খেলা। অ্যালবার্টকে নিয়ে মিস্টার হ্যারি লাইব্রেরিরুমে এসে বসলেন। একটু পরে হ্যারি কফি বানাতে বললেন নির্মলাকে। যখন নির্মলা কিচেনে, মিস্টার কুরিয়েন তখন ডেডবডির পাশে একা। মিস্টার আরাকিয়েল যে সিন্দুকের চাবি সর্বদাই কোমরে বেঁধে রাখতেন, এ সংবাদ কারওরই অজানা নয়। একা ঘরে মিস্টার কুরিয়েনের চোখ লোভে চকচক করে উঠল। তবু উনি ঠিক সাহস পাচ্ছিলেন না। কিন্তু হ্যারি আর অ্যালবার্ট ড্রয়িংরুমে উঠে যেতেই ঝটপট মিস্টার আরাকিয়েলের কোমর থেকে চাবিটা নিয়েই সিন্দুক...।"

অ্যালবার্ট চেঁচিয়ে উঠল, "কুরিয়েন আঙ্কল? এ তো ভাবাই যায় না!"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। এমন অনেক কিছুই ঘটে, যা আমাদের কল্পনার অতীত। তবে তখন তো সবে খেলা শুরু হয়েছে।" মিতিনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "মিস্টার কুরিয়েন বেশি সময় পাননি। নির্মলা কফি নিয়ে চলে এল কিনা। চাবিটা কোনও রকমে ডেডবডির কোমরে গুঁজে দিয়ে মিস্টার কুরিয়েন তখন প্রবল টেনশনে ভুগছেন। কোনও মতে কফি শেষ করে হুড়মুড়িয়ে পালালেন একতলায়।"

জেসমিন উত্তেজিত স্বরে বলল, "হিরে সমেত?"

"বলছি, বলছি। কুরিয়েন বেরিয়ে যেতেই নির্মলা ফাঁকা পেয়ে গেল ঘর। সে বড় সাবধানি মেয়ে, কফির কাপ নেওয়ার অছিলায় হ্যারি আর অ্যালবার্টকে দেখে এল। হ্যারি তখনও ফোন করছেন। এর পর কাপ কিচেনে নামিয়ে নির্মলা গেল জেসমিনের ঘরে। আন্টি আর জেসমিন শুয়ে আছেন দেখে ভিতরবারান্দা দিয়ে

মিসেস আরাকিয়েলের বেডরুমে ফিরল। তারপর যে-আঙ্কল তাকে হোম থেকে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরই ডেডবডির কোমর থেকে চাবি খুলে...।"

"নির্মলা?" ইসাবেল আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমার নির্মলা ওই হীন কাজ করেছে?"

"লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয় আন্টি। নির্মলা হয়তো ভেবেছিল হিরেটা পেলে এক লাফে বড়লোক হয়ে যাবে।" মিতিন তেরচা চোখে হ্যারি আর অ্যালবার্টকে দেখল, "এমনটা কি এ ঘরের আর কেউ ভাবেননি? এই যে মিস্টার হ্যারি সিরিয়াস মুখ করে বসে আছেন... কিংবা ওই যে অ্যালবার্ট চোখ গোলগোল করে কথা শুনছেন... এঁরা কেউই তো সাধু নন।"

হ্যারি কঠিন গলায় বলে উঠলেন, "উলটোপালটা দোষারোপ করবেন না ম্যাডাম। আমি পছন্দ করি না।"

"থামুন।" মিতিনেরও স্বর চড়েছে, "নির্মলা থাকা অবস্থাতেই আপনারা ডেডবডির কাছে ফেরেননি?"

"তো?"

"নির্মলাকে শুতে যাওয়ার জন্য আপনি পীড়াপীড়ি করেননি? কিছুতেই নির্মলা উঠল না দেখে নানা গল্প শুরু করলেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার কফির অর্ডার। এবার কফি দিয়ে নির্মলা আর বসতে পারল না, ভিতরে-ভিতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল তো। সে যেতেই আপনি ছটফট করতে লাগলেন, মতলব আঁটলেন ঘর থেকে অ্যালবার্টকে সরানোর।"

"ও, সেই জন্যই আমাকে সিগারেট আনতে বলেছিলেন?" অ্যালবার্টের বিস্ময়মাখা গলা উড়ে এল, "আমি নীচে যেতেই...।"

"হ্যাঁ, সময়টার উনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। নিজেকে কর্তব্যপরায়ণ বলে দাবি করেন বটে, তবে মৃত কাকার কোমর

থেকে চাবি খুলতে তাঁর হাত কাঁপেনি। ওটাও বোধ হয় ওঁর কর্তব্য ছিল।"

অ্যালবার্ট জোরে-জোরে মাথা নাড়ছে, "খুব খারাপ কাজ... খুব বাজে কাজ করেছেন হ্যারি।"

"আপনি বেশি ফটর-ফটর করবেন না তো। আপনি নিজে কী, অ্যাঁ?" মিতিনের স্বরে ধমক, "হ্যারি ড্রয়িংরুমে ঘুমিয়ে পড়তেই আপনিও চান্স নেননি? মিস্টার আরাকিয়েলের মতো সজ্জন পিতৃতুল্য মানুষের কোমর থেকে চাবি খোলেননি আপনি? কেউ কোথাও নেই, সবাই ঘুমোচ্ছে... মওকা বুঝে সিন্দুক খুলে...।"

জেসমিন তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "জানতাম... জানতাম এ অ্যালের কুকীর্তি। সেদিন রাতে বজ্জাত ছেলেটাকে দেখেই বুঝেছিলাম পেটে কোনও বদমতলব আছে।"

"বদমতলব তো কারওর মনেই কম নেই ম্যাডাম জেসমিন।" মিতিনের গলায় ব্যঙ্গের সুর, "আপনিও যে শেষরাতে গাড়িবারান্দার ছাদ দিয়ে আঙ্কলের ঘরে এসে একই কুকর্মটি করলেন, তার পিছনে কি কোনও ভাল মতলব ছিল?"

"মিথ্যে কথা। আমি সকালের আগে আর ওই রুমে যাইনি।"

"সাক্ষী কিন্তু আছে। নির্মলা কিন্তু দেখেছে আপনাকে।"

"হতেই পারে না। নির্মলা তখন ঘুমোচ্ছিল।" বলেই চমকে উঠেছে জেসমিন। চোখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখল একবার। তারপর মুখ ঢেকেছে দু' হাতে। মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "বিশ্বাস করুন, সিন্দুক আমি খুলেছিলাম। কিন্তু হিরে তখন ওখানে ছিল না।"

"আপনাকে বিশ্বাস করা খুব শক্ত জেসমিন। তবে আপনার এই কথাটুকু অন্তত সত্যি।" মিতিনের চোখে একটা হাসি খেলা করছে, "আপনি যখন সিন্দুক খোলেন, হিরে তখন ভেলভেট বক্সে সত্যিই ছিল না। শুধু তাই নয়, অ্যালবার্ট, হ্যারি, নির্মলা, কুরিয়েন, যে

যখনই খুলেছে... সকলের ভাগ্যেই ওই শূন্য বাক্সটি জুটেছে।"

"কী কাণ্ড, হিরে তা হলে গেল কোথায়?" পিটার ডিসুজা আজ কানে শ্রবণযন্ত্র লাগিয়ে এসেছেন, প্রতিটি শব্দই শুনছেন মন দিয়ে। গমগমে গলায় বললেন, "হিরে কি তা হলে ভ্যানিশ হয়ে গেল?"

"মোটেই না। হিরে হিরের জায়গাতেই আছে। মিস্টার আরাকিয়েল তাকে যথেষ্ট নিরাপদে রেখে গিয়েছেন। আই মিন, রেখে দিয়েছিলেন। ঘরের চোর-ডাকাত, বাইরের চোর-ডাকাত, কেউই যাতে হিরেটা লোপাট করতে না পারে। সিন্দুক ভাঙলেও নয়।"

"কোথায় রেখেছিলেন উনি?" অনেকক্ষণ পর ইসাবেলের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "এই বাড়িতেই কি...?"

"হ্যাঁ আন্টি। হিরে আপনাদের বেডরুমেই আছে।" মিতিন উঠে দাঁড়াল, "আসুন, দেখাই।"

হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো ও ঘরে চলেছে মিতিন। পিছনে মন্ত্রমুগ্ধ ইঁদুরের মতো দঙ্গলটা। ঢুকেই মিতিন সোজা অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে জলে দেখছে কী যেন। মাথা নাড়ল দু'দিকে। ঘুরে-ঘুরে এপাশ-ওপাশ থেকে ভাল করে দেখল মৎস্যাধারটিকে। কপালে টকটক আঙুল ঠুকছে। হঠাৎই টেবিলটা টেনে অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে ঘুরিয়ে নিল পুরোপুরি। তারপর অ্যাকোয়ারিয়ামের তলায় হাত রেখে জোর হ্যাঁচকা টান।

অবাক কাণ্ড! পাতলা একটা চোরকুঠুরি বেরিয়ে এসেছে অ্যাকোয়ারিয়ামের নীচ থেকে। অনেকটা দেরাজের মতো।

দু' ডজন চোখ একসঙ্গে আছড়ে পড়ল দেরাজে। মধ্যিখানে, গোল খোপে ওটা কী? হিরে না?

হ্যাঁ, হিরেই। বালি আর নুড়িতে অ্যাকোয়ারিয়ামের তলদেশ

ঢাকা বলে দেরাজটার অস্তিত্ব বোঝার কোনও উপায়ই নেই। বালি সরিয়ে ফেললেও হিরে দেখা যাবে না, টিনের পাতের নীচে রয়েই যাবে চক্ষুর অগোচরে।

টুপুর বিমোহিত। কী অনুপম শোভা, আহা! হাল্‌কা সবুজ দ্যুতি ঠিকরে-ঠিকরে বেরোচ্ছে গা দিয়ে। সাধে কী দু' কোটি টাকা দাম!

মহামূল্যবান রত্নটি খোপ থেকে তুলে ইসাবেলের হাতে দিল মিতিন। বলল, "খুশি তো আন্টি?"

ইসাবেলের চোখে জল। গদগদ গলায় বললেন, "আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না বাছা। আরাকিয়েল বংশের গৌরব তুমি আজ ফিরিয়ে দিলে। ঠিক বলছি না হ্যারি?"

হ্যারিকে তেমন একটা আহ্লাদিত মনে হল না। আড়চোখে জেসমিনকে দেখে নিয়ে বলল, "হিরে পাওয়া গিয়েছে... আমাকে বদনামের ভাগী হতে হল না... এটাই তো যথেষ্ট। তবে আরাকিয়েল বংশে এই হিরের মেয়াদ আর কদ্দিন? বড়জোর বিশ-পঁচিশ বছর। মানে যদ্দিন আপনি আছেন। তারপরই তো ভারদোনদের হাতে...। সেখান থেকে আবার হয়তো অন্য কোনও বংশে...।"

"না হ্যারি, না।" ইসাবেল জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন, "আমি ঠিকই করে রেখেছি, হিরে আমি তোমাকে দিয়ে যাব। অবশ্য একটা শর্তে। কোনও কারণেই তোমরা এই হিরে বেচতে পারবে না।"

সুজান জড়িয়ে ধরল ইসাবেলকে, "থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি। এই হিরে আমার ছেলে বা তার ছেলেও যাতে বেচতে না পারে, আমরা সেটা নিশ্চিত করে যাব।"

একটা খুশি-খুশি বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ঘরে। অপরাধের ভার লাঘব হতে সকলেই যেন বেশ পুলকিত। হঠাৎই অ্যালবার্ট প্রশ্ন করে বসল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব ম্যাডাম?"

মিতিন ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল, "ইয়েস?"

"হিরে অ্যাকোয়ারিয়ামেই আছে, আপনি বুঝলেন কী করে?"

"ওটা তো বলা যাবে না ভাই। ট্রেড সিক্রেট।" মিতিন মুচকি হাসল, "ধরে নিন, আমি ম্যাজিক জানি।"

অ্যালবার্ট কাঁধ ঝাঁকাল। পিটার হা হা হাসছেন। উচ্ছ্বাসে ডগমগ ইসাবেল তো আগামী রোববার একটা ভোজই ঘোষণা করে ফেললেন। পার্টিতে বিশেষ অতিথি মিতিন, টুপুর আর পার্থ। বুমবুমকেও আনতে বললেন সঙ্গে। নেমন্তন্ন পেয়েই পার্থ গোঁফে তা দিতে শুরু করেছে।

বিকেল গড়াচ্ছে সন্ধের দিকে। ইসাবেলের বাড়ি ফাঁকা হচ্ছিল ক্রমশ। হ্যারি আর সুজ্ঞান গেলেন সবার শেষে। ইসাবেল এবার কাজের কথায় এলেন। মিতিনকে বললেন, "জানি, তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। সম্মানদক্ষিণা হিসেবে যদি তোমায় এক লাখ টাকা দিই...?"

মিতিন গম্ভীর মুখে বলল, "আপত্তি নেই।"

"আর যদি দু' লাখ দিই?"

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিতিন বলল, "একটু বেশি হয়ে যাবে না কী? এক লাখই তো ঠিক আছে।"

"না। দু' লাখই ঠিক। জেসমিনকে দিয়ে চেক-বই আনালেন ইসাবেল। কাঁপা-কাঁপা হাতে লিখে চেকটা বাড়িয়ে দিলেন মিতিনকে। ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, "তুমি জানো না, আমার কী উপকার করেছ। আমি যেন জীবনটাই ফিরে পেলাম। দ্যাখো না, এবার কেমন চটপট সুস্থ হয়ে উঠি।"

ব্যাগে চেক রাখতে-রাখতে মিতিন একবার দেখল জেসমিনকে। একটু যেন উদাস জেসমিন। নখ দিয়ে নখ খুঁটছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে

নীরস গলায় মিতিন বলল, "আপনার সুস্থ হওয়াটা কিন্তু হিরে ফেরত পাওয়ার উপর নির্ভর করছে না আন্টি।"

"কেন নয়? এখনই তো শরীরে অনেক জোর পাচ্ছি।"

"আবার দুর্বল হয়ে পড়বেন। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপবে। বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই পারবেন না। দৃষ্টিশক্তিও ক্রমে চলে যাবে। ঘা ফুটে-ফুটে বেরোবে গায়ে। কাশবেন, রক্তবমি হবে।"

"কী বলছ তুমি এসব?"

"একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আপনি জেসমিনকে জিজ্ঞেস করুন।"

জেসমিন যেন ইলেকট্রিক শক খেল সহসা। চমকে তাকিয়েছে। আমতা-আমতা করে বলল, "আ-আ আমি কী করে জানব?"

"আপনিই তো জানবেন।" মিতিনের গলা আচমকাই বরফের মতো ঠান্ডা, "যে-পিসি আপনাকে মায়ের স্নেহে বড় করে তুলেছেন, আপনি তাঁকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছেন...।"

"কী বলছেন আপনি?" জেসমিন চিৎকার করে উঠল, "আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"মাথা খারাপ হয়েছে তো আপনার। টাকার লোভে। সম্পত্তির লোভে। পিসিকে দিয়ে তড়িঘড়ি উইলের প্রোবেট নেওয়ালেন। যাতে সমস্ত সম্পত্তি পিসির নামে আসে। তারপর শুরু হল আপনার খেল। পিসি কোনও উইল করার আগে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করলেন মনে-মনে। আপনি জানতেন, পিসি আপনাকে পুরো সম্পত্তিটা দেবেন না। কিন্তু উইল না করে মারা গেলে আরাকিয়েলদের সব কিছুই আইনত আপনার হাতে চলে আসবে। তবে একটাই কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন। হিরের লোভ ছাড়তে না পেরে আমার কাছে আসাটাই আপনার কাল হল। অবশ্য তার পিছনেও আপনার

একটা নিজস্ব হিসেব ছিল। হিরে না পাওয়া গেলে রটিয়ে দিতেন, হিরের শোকেই পিসি মারা গিয়েছেন। আর মিললে হিরে হবে আপনার উপরি লাভ।" মিতিনের স্বরে বিদ্রুপ ঝরে পড়ল, "এখন যে আপনার দু' কূলই গেল জেসমিন। হিরে যাবে হ্যারির ঘরে। আর সম্পত্তি-টম্পত্তির আশা শিকেয় তুলে আপনাকে যেতে হবে শ্রীঘরে।"

জেসমিনের ফরসা সুন্দর মুখখানা বদলে গিয়েছে আমূল। রাগে গনগন করছে সে। তর্জনী উঁচিয়ে বিকৃত স্বরে বলল, "এবার আপনি কাটুন তো। প্রলাপ শোনার আমাদের সময় নেই।"

টুপুরকে হতবাক করে মিতিন ব্যাগ থেকে আধপোড়া লাল বাটি-মোমবাতিখানা বের করেছে। জেসমিনকে দেখিয়ে বলল, "এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু প্রলাপ নয়। এটা আমি পুলিশের জিম্মায় তুলে দিচ্ছি।"

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। পলকে জেসমিনের মুখ শুকিয়ে আমসি। ঢোক গিলে বলল, "কেন, পুলিশ কী করবে?"

"আর-একবার কেমিক্যাল টেস্ট করবে। যেমন আমি করিয়েছি। প্যারাফিনের সঙ্গে কতটা পারদ মিশিয়েছেন, পুলিশও একবার দেখুক।"

ইসাবেল ধন্দ মাখা মুখে বললেন, "মোমবাতিতে মার্কারি? কেন?"

"ওটা স্লো-পয়জনিংয়ের একটা টেকনিক। যে-যে উপসর্গগুলোর কথা বললাম, আস্তে-আস্তে সবক'টাই দেখা দেবে। তারপর এক বছরের মধ্যে ভিক্টিম পরপারে। মৃত্যুটা যে মার্কারির বিষেই ঘটল, কেউ আন্দাজও করতে পারবে না। ধ্যানের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বিষ ঢুকছে... কী দুর্ধর্ষ আইডিয়া!"

ইসাবেল স্তম্ভিত মুখে বসে। নির্মলা দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল,

তারও চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত। ঘাড় ঝুলিয়ে ফেলেছে জেসমিন। আর টুঁ শব্দটি নেই।

মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার আপনিই ঠিক করুন আন্টি, আপনার ভাইঝিকে কী শাস্তি দেবেন? পুলিশ? বাড়ি থেকে বিতাড়ন? নাকি এবারকার মতো ক্ষমা?"

"জানি না। কিচ্ছু জানি না।" ইসাবেল ভেঙে পড়েছেন কান্নায়।

ট্যাক্সিতে বসে উশখুশ করছিল টুপুর। একরাশ প্রশ্ন ভিড় করেছে মাথায়, কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে, ভেবে পাচ্ছে না।

মিতিন বুঝি পড়ে ফেলেছে টুপুরকে। মাথায় একটা আলগা চাটি মেরে বলল, "ভোম্বল হয়ে গেলি কেন? এখনও নিশ্চয়ই ভেবে মরছিস অ্যাকোয়ারিয়ামটা কী করে আমার মগজে এল?"

"হ্যাঁ।" টুপুর ঢকঢক ঘাড় নাড়ল, "কী করে যে ধরলে?"

"বেশ ডিফিকাল্ট ছিল। চিন্তা করতে-করতে কাল রাতে আমার ঘুম যায় আরকী! জব্বর একখানা শব্দজব্দ দিয়েছিলেন বটে মিস্টার আরাকিয়েল!"

"কোনটা শব্দজব্দ? কাল ডায়েরিতে যেটা দেখালে? গোল্ড তেরো হাজার পাঁচশো আটাত্তর?"

"ভুলভাবে বললি। গোল্ড ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এইট।"

"মানে?"

"গোল্ডের লাতিন নাম জানিস?"

সামনের সিট থেকে পার্থ বলল, "আমি জানি। অরাম।"

"কারেক্ট। এ ইউ আর ইউ এম। ...এবার এমন একটা শব্দ তৈরি কর, যার প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম অষ্টম লেটার পাশাপাশি সাজালে অরাম হয়! ডিকশনারি ঘেঁটে দেখিস, একটাই ওয়ার্ড পাবি। অ্যাকোয়ারিয়াম।"

"বেড়ে বার করেছ তো! লুকিয়ে-লুকিয়ে ক্রসওয়ার্ড সল্‌ভ করো নাকি?"

পার্থর তারিফে মিতিন ফিক করে হাসল, "আজ্ঞে না, স্যার। ব্রেনটাকে জাস্ট একটু খেলালেই ধরে ফেলা যায়।"

টুপুর মাথা নাড়ল, "বুঝলাম। কিন্তু হিরে যে আদৌ সিন্দুকে ছিল না, এটা তুমি টের পেলে কীভাবে?"

"মিস্টার কুরিয়েনের সৌজন্যে। ভদ্রলোক যদি ফোনে কনফেস না করতেন, সিন্দুক উনি খুলেছিলেন... আর খুলে হিরে দেখেননি... তা হলে আমাকে আরও খানিক হাতড়াতে হত। সেই রাত্রের ক্রোনোলজি বলে, সিন্দুক খোলার প্রথম সুযোগটা পান কুরিয়েনই। ব্যস, এতেই তো দুয়ে-দুয়ে চার।"

"আর মোমে পারা মেশানোটা?" পার্থ প্রশ্ন ছুড়ল, "ওরকম একটা প্যাঁচোয়া প্ল্যান তুমি আন্দাজ করলে কী করে?"

"ভেরি সিম্পল। ...টুপুর, মনে পড়ছে জেসমিনের কারখানার পিছনে থার্মোমিটারের বাক্স পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ তো।"

"মার্কেট থেকে সরাসরি পারদ কিনত না জেসমিন, পাছে কেউ সন্দেহ করে। তার বদলে গুচ্ছ গুচ্ছ থার্মোমিটার থেকে মারকারি বের করে প্যারাফিনে মিশিয়ে দিত।"

"কী শয়তানি বুদ্ধি, বাব্বাহ!" টুপুর চোখ ঘোরাল, "তুমি যে কোন আক্কেলে জেসমিনকে ক্ষমা করে দিতে বললে! জেলখানাই ওর যোগ্য জায়গা।"

"না রে, জেসমিন তো জাত ক্রিমিনাল নয়। লোভের তাড়নায় দুর্বুদ্ধি চেপেছিল মাথায়। দুর্বুদ্ধি ঠেলেছে পাপের পথে। অনুশোচনা এলে নিশ্চয়ই শুধরে যাবে।"

"অনুশোচনা আসবে মনে হয়?"

"আশা করতে দোষ কী! মানুষই ভুল করে, মানুষই ভুল শুধরোয়। তা ছাড়া, যা ভয় দেখানো হয়েছে, হাসমিক ভারদোন এখন খুব চাপে থাকবে। একটাই শুধু ক্ষতি হল। ইসাবেল আন্টির বিশ্বাসটাই ভেঙে গেল। আর কখনও কি জেসমিনের উপর ভরসা করতে পারবেন?"

কথাটা টুং করে বাজল টুপুরের বুকে। মনোমোহিনী হিরে ছাপিয়ে ইসাবেল আরাকিয়েলের অসহায় মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখে। আহা রে, আপনজনরাও যে কেন মানুষকে এত দুঃখ দেয়! বোঝে না, ভালবাসা হিরের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি দামি।

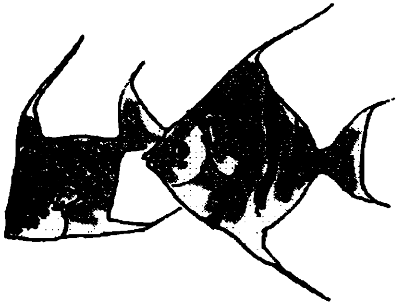

9 788177 567908

কিশোর কাহিনি সিরিজ

গুপ্তধনের গুজব

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

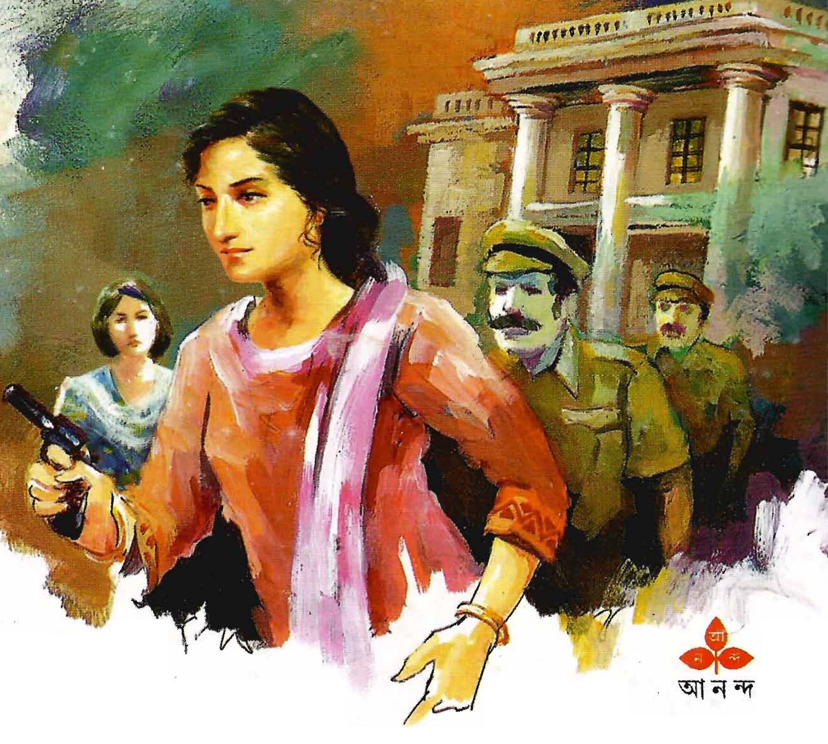

আনন্দ

গুপ্তধনের গুজব

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

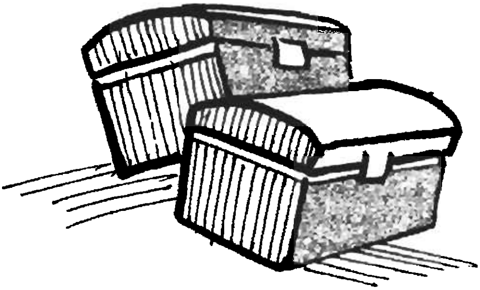

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

টিকু-ছুটকুকে

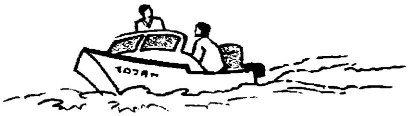

ভারী ফুরফুরে একটা মেজাজ নিয়ে ঘুম ভাঙল টুপুরের। কাল সন্ধেবেলা সে এসেছে মিতিনমাসির বাড়ি। আজ রবিবার, আগামীকাল জন্মাষ্টমী, পরশু পনেরোই অগস্ট, বুধবার স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস, এখন ক'দিন ছুটিই ছুটি। আর এইরকম মিনি ভেকেশানে মাসির বাড়ি ঘাঁটি গাড়ার মজাই আলাদা। অবিরাম আড্ডা, হইহই, এদিক-সেদিক বেড়ানো, বুমবুমের সঙ্গে খুনসুটি...! কী আনন্দে যে কাটে দিনগুলো। এর সঙ্গে মাসির কোনও কেস চললে তো কথাই নেই। বিপুল উৎসাহে টুপুর ছুটতে পারে তার পিছন-পিছন। উত্তেজনার আগুন পোহানোর সঙ্গে-সঙ্গে মস্তিষ্কে খানিক শান দিয়ে নেওয়াও যায়।

বিছানা ছাড়ার আগে টুপুর ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভাঙল। সাড়ে সাতটা বাজে, বুমবুম এখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ভাইয়ের গালে আলতো টোকা দিয়ে পায়ে-পায়ে ঘরের বাইরে এল টুপুর।

লিভিংরুমে উঁকি মারতেই পার্থমেসোর প্রশ্নবাণ উড়ে এল, "অ্যাই মেয়ে, বৃত্রাসুরের আগের জন্মের নাম কী ছিল?... চার অক্ষর।"

টুপুর থতমত মুখে বলল, "কে বৃত্রাসুর?"

"এক অসুর। যাকে মারার জন্য দধীচিমুনির পাঁজরার হাড় দিয়ে ইন্দ্রের বজ্র তৈরি হয়েছিল।"

"ও হ্যাঁ, জানি তো। কী যেন? কী যেন? চিত্রসেন?"

"নো। চিত্রকেতু। এবার চশমার একটা প্রতিশব্দ বল দেখি? তিন অক্ষরের?"

টুপুর প্রমাদ গুনল। পার্থমেসো এখন শব্দজব্দের নেশায় রয়েছে, প্রশ্নে-প্রশ্নে টুপুরকে পাগল করে দেবে। একটা হাই তুলে টুপুর বলল, "জানি না।"

"জেনে রাখ। উপাক্ষ।"

"ও।"

"কতবার বলেছি, ভোরবেলা উঠে শব্দছক করবি, স্মৃতিশক্তি প্রখর হবে। এবার বল তো, জটাসুরের ছেলে...চার অক্ষর...!"

"ঘ্যাঁঘাসুর?"

"তোমার মাথা। অলম্বুষ। ঠিক আছে, এবার একটা সোজা জিজ্ঞেস করছি। আলতার প্রতিশব্দ কী? তিন অক্ষরের?"

"অলক্ত?"

"উঁহু। য দিয়ে।"

টুপুর মাথা চুলকোল, "পারব না।"

"যাবক।" পার্থ দু' দিকে মাথা নাড়ল, "নাঃ, মাসির পোঁ ধরে-ধরে তোর ব্রেনে পলি জমে যাচ্ছে। দাঁড়া, তোকে আরও সোজা একটা...!"

পরবর্তী আক্রমণের অবশ্য সুযোগ পেল না পার্থ। টুপুরকে রক্ষা করতেই বুঝি বেজে উঠল ডোরবেল। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল টুপুর।

অমনি চমক। অনিশ্চয় মজুমদার! পরনে ট্র্যাকসুট, পায়ে স্নিকার, হাতে কায়দার ছড়ি।

পার্থ প্রায় লাফিয়ে উঠল, "স্বয়ং আই জি সাহেব যে! সক্কাল-সক্কাল হঠাৎ গরিবের ডেরায়?"

"ছুটির দিনের ব্রেকফাস্টটা এখানেই সারতে এলাম। আজ আপনাদের মেনু কী?"

"ফুলকো লুচি আর সাদা আলুচচ্চড়ি। উইথ কাঁচালঙ্কা।"

"গ্র্যান্ড!" স্নিকার খুলে অনিশ্চয় সোফায় বসলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "তা গৃহকর্ত্রীকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়?"

"শরীরচর্চা চলছে। ডাকব?"

ডাকাডাকির প্রয়োজন হল না। অনিশ্চয় মজুমদারের বজ্রকণ্ঠ শুনে মিতিন নিজেই বেরিয়ে এল। আই জি সাহেবকে দেখল ঝলক। দোপাট্টায় ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, "আপনি কি আজকাল মর্নিংওয়াকেও রিভলবার নিয়ে বেরোচ্ছেন?"

অনিশ্চয় তাড়াতাড়ি কোমরে হাত রাখলেন, "কী কাণ্ড, বোঝা যাচ্ছে নাকি?"

মিতিন মুচকি হাসল, "এটুকুও না নজরে পড়লে গোয়েন্দাগিরি তো ছেড়ে দিতে হয় দাদা। তা এত সতর্কতা কীসের জন্যে? কোনও গুন্ডা-বদমাশ প্রাণহানির হুমকি দিয়েছে নাকি?"

"ওদের আমি থোড়াই পরোয়া করি। তবে আজকাল উগ্রপন্থীদের যা উৎপাত বেড়েছে...! কাকে কখন টার্গেট করে তার ঠিকঠিকানা কী?"

"একদম খাঁটি কথা। সাবধানে থাকাই তো ভাল।" পার্থ সায় দিল, "এত রকম অস্ত্র ওদের হাতে। বোমা, রিভলবার, অটোমেটিক রাইফেল, হাজারও ধরনের বিস্ফোরক, এমনকী, রকেট লঞ্চারও...!"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "কিন্তু ওরা এসব পাচ্ছে কোত্থেকে?"

"দেশের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে চোরাগোপ্তা। আর বাইরে থেকে তো আসছেই।"

"যারা পাঠাচ্ছে তাদের ধরা যাচ্ছে না?"

"চেষ্টার কি কসুর রাখছি রে ভাই। তবে বিদেশ থেকে অস্ত্র

আমদানি ঠেকানো বড় মুশকিল। অন্তত আমাদের এই রাজ্যে। এত লম্বা বর্ডার, স্থলপথ, জলপথ জঙ্গল, পাহাড়... কোন দিক দিয়ে যে কীভাবে এন্ট্রি নেয়! এই তো, মাসখানেক আগে আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরে খবর ছিল, সুন্দরবন দিয়ে নাকি বেশ কিছু জিনিস ঢুকছে। তা সে এমন নদীনালার জায়গা, কিছু ট্রেসই করা গেল না।" ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন অনিশ্চয়, "একটাই সান্ত্বনা, শুধু আমরাই যে এঁটে উঠতে পারছি না, তা নয়, আমরা নই, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ সর্বত্রই এক হাল।"

"হুঁ, গভীর সমস্যা।" পার্থর বিজ্ঞ রায়, "আর্মস আসা রুখতে না পারলে উগ্রপন্থী-দমন খুব কঠিন কাজ।"

কথার মাঝে রান্নাঘরে গিয়েছিল মিতিন। আরতিকে জলখাবারের নির্দেশ দিয়ে সোফায় এসে গুছিয়ে বসল, হাসি-হাসি মুখে অনিশ্চয় মজুমদারকে বলল, "আপনার আগমনের হেতুটা কিন্তু এখনও ভাঙেননি দাদা।"

"বা রে, বললাম যে লুচি খেতে এসেছি।"

"ওটা তো একটা মামুলি উপলক্ষ। আই ওয়াশ। আসল উদ্দেশ্যটা এবার শুনি?"

"ওঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যাবে না।" অনিশ্চয় হো হো হাসলেন। পরক্ষণেই সামান্য গম্ভীর, "হ্যাঁ, কারণ একটা আছে বটে। তবে সাংঘাতিক সিরিয়াস কিছু নয়।"

"কীরকম?"

"আপনার কি মনে আছে, হপ্তাতিনেক আগে ডায়মন্ডহারবারের কাছে নুরপুরে একটা ইন্সিডেন্ট ঘটেছিল? মিডিয়ায় বেশ শোরগোলও পড়েছিল ঘটনাটা নিয়ে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী এক গুপ্তধন-টুপ্তধন সংক্রান্ত ব্যাপার ছিল। একটা পুরনো বাড়িতে মাটিটাটি খুঁড়তে গিয়ে দু'টো ছেলে ধরা

পড়ে। তারপর থেকে বাড়িটায় রাশি-রাশি লোক গিয়ে ভিড় করছিল...। এখন বোধ হয় কানাডা ফেরত এক ভদ্রলোক থাকেন বাড়িটায়। ভদ্রলোক তো টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গুপ্তধনের অস্তিত্ব নাকি নেহাতই রটনা। লোকজনের ভিড়ে তিনি উদ্বিগ্ন, বিরক্ত। তিনি চাইছিলেন ওইসব হল্লাগুল্লা বন্ধ হোক।"

"আপনার স্মরণশক্তি তো দারুণ!" অনিশ্চয়ের চোখে-মুখে তারিফ। স্মিত মুখে বললেন, "ঘটনাটা তা হলে আর-একটু ডিটেলে আপনাকে জানিয়ে দিই। ওই ছেলে দু'টোকে পুলিশ যথেষ্ট জেরা করেছিল, কিন্তু কিছুই তেমন পাওয়া যায়নি। ওদের বক্তব্য, ওই বাড়ির কুলপুরোহিতের মুখে তারা গুপ্তধনের গল্পটা শুনেছে। আর তাই লোভে পড়ে...!"

"তা কুলপুরোহিতকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেনি?"

"হুঁ, তাও করেছিল। তবে বুড়োটা একেবারেই ফালতু, বড্ড টল টক করে। ও নাকি ওর বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছে...। লোকাল পুলিশের মতে সবটাই বুড়োর বানানো গল্প।"

"ছেলে দু'টো এখন কোথায়? নিশ্চয়ই এখনও পুলিশ কাস্টডিতে নেই?"

"ওদের তো পরদিনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তেমন ক্রাইম তো কিছু করেনি, স্রেফ অন্যের বাড়িতে অনুপ্রবেশ...। তা ছাড়া ভদ্রলোকও কোনও কেসটেস করতে চাননি।"

আরতি চা রেখে গেল। সঙ্গে বিস্কুট। পেয়ালাটা অনিশ্চয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে মিতিন বলল, "তা আমাকে এখন কী করতে হবে? গুপ্তধনের অনুসন্ধান?"

"ঠিক তা নয়। আবার অনেকটা সেরকমও বটে।"

"মানে?"

"ব্যাপারটা তা হলে আপনাকে আর-একটু বিশদে বলি। কানাডা ফেরত ওই ভদ্রলোক, অর্থাৎ বাড়িটির মালিক, আমার খানিকটা পরিচিত। আমার দাদার সহপাঠী ছিলেন। অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। বিদেশে অধ্যাপনা করতেন, এখানে এসেও লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। গত পরশু উনি হঠাৎ আমার কাছে হাজির। একান্তই ব্যক্তিগত কারণে। ওঁর বক্তব্য, গুপ্তধন নিয়ে লোকজনের কৌতূহল কমে গিয়েছে বটে, তবে অন্য এক অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। প্রায় রাত্তিরেই নানারকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানা নাকি চলছে বাড়িতে। হঠাৎ-হঠাৎ উদ্ভট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেমন একজোড়া সাহেব-মেমের ঝগড়া, মেয়েলি গলার কান্না, কুকুরের ডাক...।"

"তার মানে বাড়িটায় ভূত আছে?" পার্থর চোখ গোল-গোল, "ভদ্রলোক সেখানে একা-একা বাস করছেন?"

"ভূত নিয়ে ভদ্রলোককে খুব একটা ভাবিত তো দেখাল না। ওঁর ধারণা, ওসব মনের ভুলও হতে পারে। উনি চিন্তিত অন্য একটা কারণে। ক'দিন আগে আবার উনি দু'টো লোককে মাটি খুঁড়তে দেখেছেন। মাঝরাত্তিরে। পাকড়াও করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তারা পালিয়ে যায়। এখন ভদ্রলোক ভাবতে শুরু করেছেন, হয়তো কোনও গুপ্তধন থাকলেও থাকতে পারে। উনি তাই ব্যাপারটা প্রাইভেটলি ইনভেস্টিগেট করিয়ে দেখতে চান।"

"বুঝলাম।" মিতিন মাথা দোলাল, "কেসটা তাই আপনি আমায় দিতে চাইছেন?"

"কাজের চাপ বেশি না থাকলে যান না। গুপ্তধন উদ্ধার করাটা তো আপনার ভালই আসে। হয়তো কোনও চিরকুট-ফিরকুট পেয়ে গেলেন। কিংবা জটিল ধাঁধা। সেটাকে সমাধান করে...।" অনিশ্চয়ের মোটা গোঁফের ফাঁকে একফালি হাসি, "ভদ্রলোকের ভালই টাকাকড়ি আছে, আপনার প্রাপ্তিযোগ মন্দ হবে না। তবে

হ্যাঁ, ভদ্রলোক বিষয়টা নিয়ে পাবলিসিটি চাইছেন না একদম। পুলিশ কিংবা মিডিয়ার হাঙ্গামাও তাঁর ঘোরতর অপছন্দ।"

"অর্থাৎ যা করব একেবারে নিঃসাড়ে। তাই তো?"

"কারেক্ট। প্রয়োজনে আমি তো আছিই।"

লুচি-তরকারি এসে গেল। আহারে ভারী মনোযোগী হয়ে পড়লেন অনিশ্চয়। টোকা দিয়ে-দিয়ে ফুটো করছেন ফুলকো লুচি, আলু পুরে সাপটে নিয়ে আস্ত লুচি সোজা চালান করে দিচ্ছেন মুখগহ্বরে। খানপনেরো লুচি উদরস্থ করে মহাতৃপ্তির একটি ঢেকুর তুললেন। থালা শেষ হতে না-হতেই গরমাগরম কফি পৌঁছে গেল হাতে।

বড়সড় কফিমগটায় চুমুক দিয়ে অনিশ্চয় ফের কথায় ফিরলেন, "আপনি তা হলে ভদ্রলোককে কবে মিট করছেন ম্যাডাম?"

"আজই যেতে পারি। দুপুর বিকেলে।"

"গুড। আমি তা হলে ভদ্রলোককে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনিও ওঁর নাম আর মোবাইল নাম্বার নোট করে নিন।"

টুপুর অমনি ছুটে মিতিনমাসির মোবাইল ফোনটা নিয়ে এল। ভদ্রলোকের পুরো নামটা শুনে তার চক্ষু চড়কগাছ। মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী! অস্ফুটে বলেই ফেলল, "এরকম নাম আবার হয় নাকি?"

"ওঁদের পরিবারের সকলের নামই একটু অভিনব। মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ'র বাবার নাম ছিল কপিধ্বজ কপাটবক্ষ বাগচী। তাঁর বাবা, বজ্রধ্বজ বিরাটবক্ষ বাগচী। তাঁর বাবা ছিলেন সিংহধ্বজ সমুদ্রবক্ষ বাগচী।"

"ব্যস, ব্যস, আর এগোবেন না।" পার্থ দু' হাত তুলে থামাল, "রোববারের সকালের পক্ষে ওই সিংহধ্বজ পর্যন্তই যথেষ্ট।"

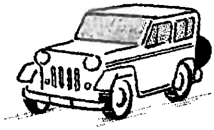

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরোতে-বেরোতে দুপুর দু'টো। কাজেকর্মে ঘোরাঘুরির জন্য সম্প্রতি একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে মিতিন। লাল টুকটুকে চার-চাকাখানা সাধারণত নিজেই চালায়। আজ সারথির আসনে পার্থ। সবে মাসদেড়েক হল পার্থ ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে, এখনও তার হাত তেমন সড়গড় নয়। আস্তে-আস্তে চালাচ্ছে গাড়ি, অতি সাবধানে। ঠাকুরপুকুরের পর ডায়মন্ডহারবার রোড বেশ সরু, উলটো দিক থেকে বাস-লরি ধেয়ে আসে ক্রমাগত। সাইকেল, অটো, ভ্যানরিকশারও কমতি নেই। সবদিক সামলেসুমলে রীতিমতো কসরত করে এগোতে হচ্ছে পার্থকে। সরিষা-আমতলার মতো ঘিঞ্জি এলাকায় গাড়ির গতি তো প্রায় রুদ্ধ হওয়ার জোগাড়। ডায়মন্ডহারবারের খানিক আগে, ডাইনে বাঁক নিয়ে, টুপুররা যখন নুরপুর পৌঁছল, শেষ শ্রাবণের সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

জনপদটি নেহাতই ছোট। একেবারেই গঙ্গার ধারে। সবুজ গাছগাছালিতে ছাওয়া। নদীর পাশ বরাবর উঁচু বাঁধের রাস্তা। একদিকটা চলে গিয়েছে লঞ্চঘাটায়, অন্যদিকে নদী আর বাঁধের মাঝখানে একের পর-এক ইটভাঁটা। গোটাতিনেক ইটভাঁটা পেরোতেই চোখে পড়ল লোহার ফটক। থামের ফলকে এখনও অস্পষ্টভাবে টিকে আছে বাড়ির নাম 'নিন্‌হো'।

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "ভারী অদ্ভুত নাম তো! নিন্‌হো মানে কী?"

পার্থ পথশ্রমে বেজায় ক্লান্ত। তার সংক্ষিপ্ত চালকজীবনে এতখানি লম্বা পাড়ি এই প্রথম। নয়-নয় করেও টানা পঞ্চাশ কিলোমিটার

স্টিয়ারিংয়ে বসে প্রায় ধুঁকছে এখন। তার মধ্যেও ফুট কাটল, "নিন্‌হো মনে হয় ধ্বজাধারীদের কারও ডাকনাম।"

"আজ্ঞে, না স্যার। ওটা একটা পর্তুগিজ শব্দ। মানে 'পাখির বাসা'।" মিতিন গাড়ি থেকে নামল। গেটের উপর চোখ চালিয়ে বলল, "হর্নটা একটু বাজাও তো।"

আওয়াজ দিতেই কাজ হল। প্রাচীন বাড়িখানা থেকে হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন বিশালকায় এক ভদ্রলোক। ছ' ফুটের উপর লম্বা, চওড়া কাঁধ, টকটকে ফরসা রং, মাথাজোড়া টাক, ফোলা-ফোলা গোল মুখে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। দশাসই বপুটি মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ নামের সঙ্গে যেন খাপে-খাপে মিলে যায়।

মিতিন নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। অনিশ্চয় মজুমদার আমায় পাঠিয়েছেন।"

ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বছর পঁয়ষট্টির মীনধ্বজ গেট খুলে দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেল্টু আমায় ফোন করেছিল। আসুন, গাড়িটা ভিতরে এনে রাখুন।"

পার্থর আর গাড়ি নাড়ানোর ইচ্ছে নেই। বেজার গলায় বলল, "এখানেই থাক না।"

"ভরসা পাচ্ছি না ভাই। যা সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে!"

অগত্যা গাড়ি অন্দরে এল। টুপুর লক্ষ করল, পাঁচিল ঘেঁষে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির নীচে আর-একখানা গাড়ি শোভা পাচ্ছে। বেশ বড়সড়, হালফ্যাশানের। যথেষ্ট দামিও। সম্ভবত মীনধ্বজের।

নুড়ি বিছানো পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে মীনধ্বজের বাড়িখানাও দেখছিল টুপুর। তাকিয়ে থাকার মতোই বাড়ি বটে। পাঁচিলঘেরা বিঘেপাঁচেক জমির মধ্যিখানে খাঁটি বিদেশি স্থাপত্য। বয়স দেড়শো বছর তো হবেই, তবে তেমন জরাজীর্ণ নয়। জমকালো চেহারার

অনেকটাই এখনও অটুট। সবচেয়ে লক্ষণীয়, হঠাৎ দেখে একতলা মনে হলেও বাড়িটি আদতে দোতলা। সাদা পাথর বসানো প্রশস্ত বারান্দা থেকে মোটা-মোটা ডোরিক থাম উঠে গিয়েছে স্যান্ডকাস্টিংয়ের রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত। ওই থামগুলোর আড়ালে দোতলা প্রায় ঢাকা পড়ে থাকে। বারান্দাটাও বেশ উঁচুতে, পাক্কা দশ-দশখানা সিঁড়ি পেরোতে হয়। বারান্দার ওপারে ঘর। কী লম্বা-লম্বা দরজা-জানলা, বাপ্‌স! দরজা-জানলার মাথায় রংবেরঙি শার্সিতে নকশাও রীতিমতো নজরকাড়া।

বারান্দা টপকে টুপুর আরও বিমোহিত। কী প্রকাণ্ড হলঘর রে বাবা! সিলিং একদম টঙে, ছাদের লেভেলে। হলের দু'পাশ দিয়ে জবরদস্ত দু'খানা কাঠের সিঁড়ি, দোতলায় যাওয়ার জন্যে। দোতলার চারদিকে টানা বারান্দা, যেমন পুরনো দিনের হিন্দি ফিল্মে দেখা যায়।

পলকের জন্য টুপুরের মনে হল, এমন ডাকসাইটে বাড়িতে গুপ্তধন থাকতেই পারে।

সুসজ্জিত হলঘরে অজস্র অয়েলপেন্টিং, মাঝখানে পুরু কার্পেটের উপর সোফাসেট। পুরনো হয়েছে সোফাগুলো, তবে ঘরের সঙ্গে মোটেই বেমানান নয়। শ্বেতপাথরের টেবিলও আছে এদিক-ওদিকে, কারুকাজ করা ফুলদানি আর ছোটখাটো ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো।

টুপুরদের সোফায় বসিয়ে মীনধ্বজ বললেন, "চা-কফি চলবে তো? নাকি শরবত?"

পার্থ বলল, "আমি আগে একগ্লাস জল খাব।"

শশব্যস্ত পায়ে ভিতরে ছুটলেন মীনধ্বজ। ফিরলেন এক বছর আটাশ-তিরিশের বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে। তার হাতের ট্রেতে তিনগ্লাস জল। একাই সব ক'টা গ্লাস শেষ করে থামল পার্থ।

মহিলাকে কফি বানাতে বলে মীনধ্বজ এবার বসলেন সোফায়। সামান্য গলা নামিয়ে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই ভেল্টুর মুখে সব শুনেছেন?"

মিতিন মাথা নাড়ল, "মোটামুটি। তবে ডিটেলটা তো আপনি বলবেন।"

"কোত্থেকে শুরু করব?" মীনধ্বজকে ঈষৎ উত্তেজিত দেখাল, "সেই প্রথমবার ছেলে দু'টোকে যখন ধরলাম...?"

"আহা, আপনি টেনশন করবেন না। আমি আস্তে-আস্তে সব জেনে নেব।" মিতিন সোফায় হেলান দিল, "আপনি কি এখন এ বাড়িতে একাই থাকেন?"

"হ্যাঁ, একাই তো! মাঝে-মাঝে অবশ্য সন্দীপনও রাতে থেকে যায়।"

"তিনি কে?"

"এ বাড়ির কেয়ারটেকার। ভেরি নাইস চ্যাপ। ও না থাকলে এ বাড়ি থোড়াই এমন বাসযোগ্য থাকত। আমি পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরছি জেনে গোটা বাড়িটাকে ও টিপটপ করে রেখেছিল।"

"আপনারই অ্যাপয়েন্ট করা লোক?"

"না না, তিন পুরুষ ধরে ওরা এ বাড়ির দেখাশোনা করছে। এখন তো প্রায় ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গিয়েছে।"

"তিনি এখন কোথায়? আছেন বাড়িতে?"

"না। ও তো দুপুরে নিজের বাড়িতে গেল। সন্ধেবেলা আবার আসবে।" বলেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন মীনধ্বজ, "ডাকব সন্দীপনকে? কথা বলবেন?"

"থাক, তাড়া নেই। সন্দীপনবাবুর বাড়ি কোথায়?"

"কাছেই। ডায়মন্ডহারবার রোডের মুখটায়। ফোন পেলেই মোটরবাইক নিয়ে চলে আসবে।"

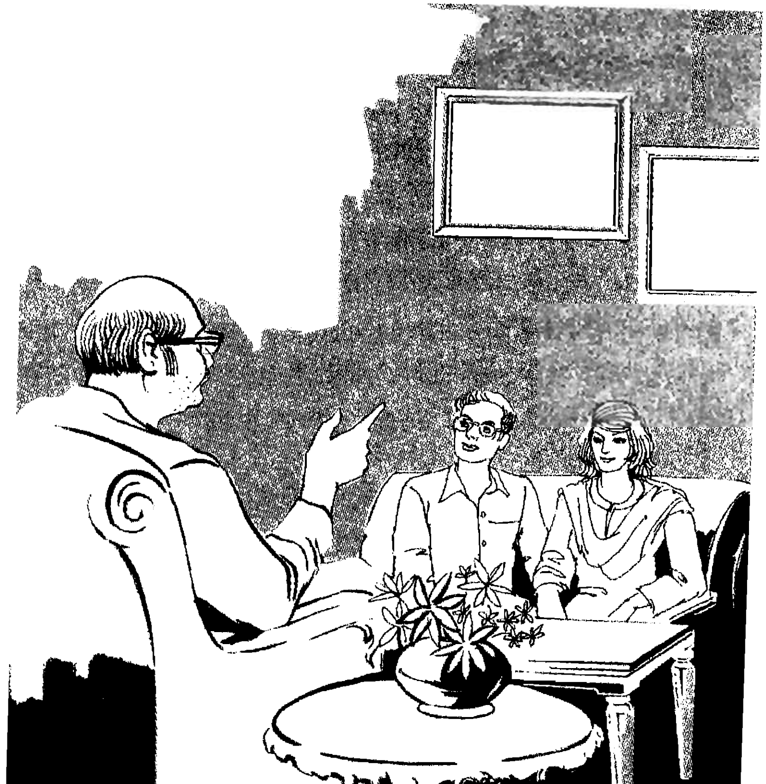

"উনি চব্বিশ ঘণ্টা এখানে থাকেন না কেন?" পার্থ ফস করে প্রশ্ন জুড়ল, "আপনি বয়স্ক মানুষ, যে-কোনও সময় আপনার তাঁকে প্রয়োজন হতে পারে?"

"এতে ওর কোনও দোষ নেই। প্রথম কথা, আমি নিজেকে এজেড ভাবি না। আই অ্যাম ওনলি সিক্সটি সিক্স। অ্যাবসলিউটলি ফিট অ্যান্ড স্ট্রং। সেকেন্ডলি, আমার একটা বাজে অভ্যেস আছে। দীর্ঘদিন বিদেশবাসের কুফল আর কী। বাড়িতে সারাক্ষণ পরিবারের বাইরের কেউ ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলবে, এ আমার মোটেই পছন্দ নয়।" মীনধ্বজ আলতো হাসলেন, "সন্দীপন তো আগে এখানেই থাকত। আমিই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তার কাজ রোজ একবার করে দর্শন দেওয়া, আর আমি হাঁক মারলেই তুরন্ত হাজির হওয়া। চটপট আসতে-যেতে যেন অসুবিধে না হয়, তাই মোটরবাইকও কিনে দিয়েছি ছেলেটাকে।"

"ভালই করেছেন।" মিতিন গলা ঝাড়ল, "আপনার কাজের মেয়েটিও নিশ্চয়ই রাতে এখানে থাকে না?"

"প্রশ্নই নেই। করুণা রান্নাবান্না সেরে সন্ধে নাগাদ চলে যায়।"

"তারপর থেকে সারাক্ষণ আপনি একা?"

"হ্যাঁ। যদি না কোনওদিন সন্দীপনকে আটকে রাখি।"

"আপনি আটকান? কেন?"

"আরে, আমি কি একেবারেই অসামাজিক মানুষ?" মীনধ্বজ হো হো হেসে উঠলেন, "এক-আধদিনও কি মানুষের সঙ্গ ভাল লাগতে নেই?"

মিতিনও হেসে ফেলল। আবার কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, করুণাকে দেখে থেমে গেল। কফি আনল করুণা, সঙ্গে তিনটে প্লেটে অমলেট, চানাচুর, সন্দেশ।

খাদ্যবস্তু দেখেই পার্থর চোখ চকচক। টুপুরেরও অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছিল। যা খারাপ রাস্তা দিয়ে এসেছে, ঝাঁকুনিতেই দুপুরের ভাত কখন হজম। মেসোর দেখাদেখি হাতে প্লেট তুলে নিল। অমলেট কাটল চামচে।

মীনধ্বজেরও হাতে কফিমগ। মিতিনও চুমুক দিচ্ছে উষ্ণ পানীয়ে। করুণা দৃষ্টির আড়াল হতে মিতিন থমকে যাওয়া প্রশ্নটায় ফিরল, "আচ্ছা মিস্টার বাগচী, প্রথম দিন ঠিক কোন সময়ে দু'টো ছেলে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে ধরা পড়ে?"

"রাত্তিরেই। অ্যারাউন্ড এগারোটা।"

"সেই রাত্তিরে কি সন্দীপনবাবু এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, ছিল বলেই তো সেবার ছেলে দু'টোকে ধরা গেল। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে আমি দোতলায় নিজের কাজকর্ম নিয়ে বসে ছিলাম। একটা জটিল সমীকরণ মিলছিল না কিছুতেই! ফ্রেশ এয়ার নিতে ছাদে গেলাম। পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ চোখে পড়ল, আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটায় কারা যেন...। সঙ্গে-সঙ্গে একতলায় নেমে সন্দীপনকে ডাকলাম।"

"উনি তখন কী করছিলেন?"

"টিভি দেখছিল। নিজের ঘরে... আই মিন, ওর জন্য অ্যালট করা ঘরে বসে। আমার মুখে শুনে ও চেঁচামেচি করতে বারণ করল। তারপর দু'জনে পা টিপেটিপে ব্যাকইয়ার্ডে গিয়ে...। ছেলে দু'টো এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারেনি। তারপর ওদের আটকে রেখে সন্দীপনই তো পুলিশে ফোনটোন করে...!"

"হুম।" মিতিন কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "আর লাস্ট যেদিন মাটি খুঁড়তে দেখলেন, সেদিন সন্দীপনবাবু কি...?"

"সন্দীপন থাকলে কি লোক দু'টো পালাতে পারে? আমিও

এমন হাঁকডাক করে ফেললাম...! ওরা হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে সোজা গঙ্গায় নেমে গেল।"

পার্থ তেরচা চোখে বলল, "মাঝেও তো ক'দিন কী সব শব্দটব্দ শুনেছেন?"

"রাতের দিকে মনে হয় কিছু-কিছু আওয়াজ কানে আসে, তবে আমি ঠিক সার্টেন নই। আবার উড়িয়েও দিতে পারছি না। ঘুম ভেঙে একদিন যেন শুনলাম, একজন পুরুষ আর-একজন মহিলা জোর ঝগড়া করছে। ইংরেজিতে। দরজা খুলে বাইরে আসতেই ভোঁ ভাঁ। আর-একদিন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে এল। চুপচাপ শুয়ে থাকতে-থাকতে সুরটা একসময় থেমেও গেল। পরে চিন্তা করে দেখলাম, ওটা বোধ হয় বিড়াল-টিড়ালের ঝগড়া...। গত সপ্তাহে একদিন অবশ্য খুবই ধুপধাপ হচ্ছিল। ঘর থেকে বেরনোর পরও বেশ খানিকক্ষণ শুনেছি শব্দটা।"

"কোন দিক থেকে আসে আওয়াজগুলো?"

"বাড়ির ভিতর থেকেই। যদিও আমি একতলা, দোতলায় হন্যে হয়ে খুঁজেও কোনও সোর্স পাইনি। এক হতে পারে, গঙ্গার ধারে বাড়ি, হয়তো রাত্তিরে উলটোপালটা হাওয়া জানলা-টানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়, আর আবোল-তাবোল শব্দ তৈরি করে। কাঠের বাড়িতে তো এরকম হয়ই। আমি বিদেশে দেখেছি।"

"তা হলে আপনি এত আপসেট হচ্ছেন কেন?"

"কারণ, আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও একটা গড়বড় আছে। অ্যাদ্দিন কোত্থাও কিছু ছিল না, হঠাৎ আমি আসার পরেই কোত্থেকে এক গুপ্তধনের গুজব ভেসে উঠল! পাবলিকলি ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পরও রিউমারটা থামল না, তারপরেও লোক আসছে! আর এটাই আমার খুব ফিশি লাগছে।"

মিতিন একটুক্ষণ স্থির চোখে মীনধ্বজকে দেখে নিয়ে বলল, "অর্থাৎ আপনিও এখন গুপ্তধনের রটনাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?"

"ঠিক তা-ও নয়। এখনও অবিশ্বাসই করছি। কিন্তু...!" মীনধ্বজের কপালে মোটা ভাঁজ, "বোধ হয় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। ইভেন্টগুলোকে যদি কার্যকারণের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেত!"

"হুম।" মিতিন নড়ে বসল, "তা ঠিক কোন রহস্যটার আপনি সমাধান চান? গুপ্তধন আদৌ আছে কি না যাচাই করতে হবে? নাকি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে? নাকি ভৌতিক শব্দগুলোর উৎস জানা গেলেই আপনি সন্তুষ্ট?"

"ধরুন, তিনটেই।" মীনধ্বজকে অস্থির দেখাল। জোরে-জোরে মাথা নাড়ছেন, "জানেন তো, যত ভাবছি, ততই কেমন পাগল-পাগল লাগছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট না হলে আমার মানসিক অশান্তিটা কিছুতেই যাবে না। এর একটা বিহিতের জন্যে আমি যে-কোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতে রাজি।"

"টাকা জিনিসটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান মিস্টার বাগচী। তবে একটা জটিল রহস্যভেদ করার আনন্দ তার চেয়েও দামি।" মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "আর এই রহস্যটা আমার মোটেই সরল মনে হচ্ছে না।"

"তা হলে কেসটা নিচ্ছেন?"

"অবশ্যই। আমি আজ থেকেই কাজে নামতে চাই। এক্ষুনি।" মিতিন সোজা হল, "চলুন, আগে আপনার গুপ্তধনের স্পটটা দেখে আসা যাক।"

বাড়ির পিছনভাগে চওড়া বারান্দা। সামনের মতোই। সেখান থেকে পাঁচ ধাপ সিঁড়ি নেমেছে। নীচে প্রশস্ত চাতাল। বাঁধানো চাতালের ডান হাতে ঠাকুরঘর। ছোটখাটো একটা মন্দিরও বলা যায়। আবার যেন মন্দির নয়ও। রং গেরুয়া, মাথায় সুন্দর চূড়া, তবু কেমন যেন বিদেশি ছাঁদ। উলটো দিকে খানতিনেক তালাবন্ধ ঘর। সম্ভবত কাজের লোকরা থাকত একসময়। চাতাল শেষে ফের সিঁড়ি, মাটি পর্যন্ত। খানিক গিয়ে গঙ্গায় যাওয়ার বাহারি গেট। ফটকের ওপারে লম্বা রোয়াক বানানো আছে, লোকজনের বসার জন্যে। পশ্চিমে কুলকুল বয়ে চলেছে গঙ্গা, গুমোট শ্রাবণেও আজ ফুরফুরে বাতাস ধেয়ে আসছে নদী থেকে, দিব্যি এক আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিকেল।

গেটের খানিক আগে বাঁয়ে ঘুরলেন মীনধ্বজ। হাঁটতে-হাঁটতে পাঁচিলের প্রায় কোনায় এসে থামলেন। জমির এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই সেই অকুস্থল।"

একনজরে সেভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই। খোঁড়া জায়গাটা এখন একেবারেই সমতল। একটাই যা তফাত, আশপাশে প্রচুর ঘাস-আগাছার মাঝে ওই ফালি জমিটুকু একদম ন্যাড়া।

মিতিন উবু হয়ে মাটিটা টিপে-টিপে দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ যে দেখি রীতিমতো পিটিয়ে-পিটিয়ে প্লেন করা হয়েছে!"

"হ্যাঁ, সন্দীপনই লোক লাগিয়ে দুরমুশ করিয়েছে। খোঁড়া মাটি চালান করে দিয়েছে ভিতরে।"

"কেন?"

"যাতে জায়গাটাকে আর আলাদা করে আইডেন্টিফাই না করা যায়।"

"অর্থাৎ, আগে জায়গাটার কিছু বিশেষত্ব ছিল?"

"তা একটু ছিল বইকী। একটা পাথরের স্ল্যাব গাঁথা ছিল ওখানে। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। ওই পাথরের তলায় গুপ্তধন থাকতে পারে, এমন আজগুবি চিন্তা ভুলেও কখনও মাথায় আসেনি। তবে এখন গুপ্তধনের গুজব যদি রটে, আর বাইরের লোক জমিতে আলটপকা একটা পাথর গাঁথা দেখতে পায়, তা হলে তাদের মনে তো সন্দেহ জাগতেই পারে। নয় কি?"

"মানে পাথর-চাপা গুপ্তধন! তা প্রস্তরখণ্ডটি গেলেন কোথায়?"

"চোররা তো ওটা উপড়েই ফেলেছিল। এখন ওই পাঁচিলের ধারে পড়ে আছে।"

"গিয়ে দেখি একটু?"

"শিওর।"

ত্বরিত পায়ে পাথরটার কাছে গেল মিতিন। আয়তাকার খণ্ডটিকে চাগাড় দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ভারী, একা পেরে উঠল না, পার্থও হাত লাগাল। কোনওক্রমে খাড়া করার পর দু' পিঠে হাত বুলিয়ে দেখল কী যেন। ফের স্বস্থানে শুইয়ে দিয়ে বলল, "প্রথম কাজ শেষ। এখন আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে-ঘুরে দেখি চলুন।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে এবার দোতলায় ওঠার পালা। ঘরের কোনও অন্ত নেই। গোটা তিন-চার খোলা, বাকিগুলোয় তালা ঝুলছে। দরজা-জানলাগুলো একই প্যাটার্নের। লম্বা-লম্বা, কাঠ আর কাচের পাল্লা বসানো। মাথায় রঙিন কাচের নকশা। কড়িবরগাওয়ালা উঁচু-উঁচু সিলিংয়ে অদ্ভুত এক প্রাচীন গন্ধ।

মুগ্ধ চোখে দেখতে-দেখতে পার্থ বলল, "আপনার পূর্বপুরুষদের টেস্ট ছিল। খাসা বাড়িখানা বানিয়েছিলেন কিন্তু।"

"ধুস, আমরা বানাতে যাব কেন?" মীনধ্বজ হেসে ফেললেন, "বাড়িটা তো ছিল এক পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর। নাম ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা। ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনও কারণে তাঁর বিবাদ বেধেছিল, তখনই প্রায় জলের দরে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শিখিধ্বজ শাল্মলীবক্ষ বাগচীকে বাড়িটা বেচে দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। এখন থেকে প্রায় সওয়াশো বছর আগে।"

"তখন থেকেই বুঝি আপনারা এখানে?"

"না, না। শিখিধ্বজ তো কখনওই থাকেননি। বাগবাজারে আমাদের সাবেকি বসতবাড়ি ছিল, উনি সেখান থেকে অবরেসবরে এখানে বেড়াতে আসতেন। তাঁর ছেলে সিংহধ্বজ অবশ্য পাকাপাকিভাবে বাস করার কথা চিন্তা করেছিলেন। ভেতরে উঠোনে মিনি চ্যাপেল ছিল, চ্যাপেলটাকে তিনিই মন্দিরে পরিণত করেন। আমাদের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দর পূজার্চনাও তখন থেকেই শুরু। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এখানে বসবাসের সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি হৃদ্‌রোগে মারা যান। মোটামুটি ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা নুরপুরে আছি।"

"আপনি কি এ বাড়ির একাই মালিক এখন?"

"হ্যাঁ। আমার কোনও ভাইবোন নেই।"

"তা পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি...শরিকি ভাগাভাগি...?"

"সেই দায় থেকেও আমি মুক্ত। শিখিধ্বজ উইল করে বাড়িটা সিংহধ্বজকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিংহধ্বজের ছিল এক ছেলে, দু' মেয়ে। ঠাকুরদার সেই দুই বোন স্বেচ্ছায় এই সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে দেন। আবার আমার ঠাকুরদার দু' ছেলে। আমার কাকা পীতধ্বজ পর্বতবক্ষ বাগচী এই বাড়ির অংশের বিনিময়ে বাগবাজারের বাড়িখানা পেয়ে যান। সুতরাং তালেগোলে এ বাড়ির আর কোনও ভাগীদার থাকল না।"

গল্প শুনতে-শুনতে গোটা দোতলাটাই চক্কর মারা হয়ে গেল। শেষে স্টাডিতে এনে টুপুরদের বসালেন মীনধ্বজ। চরম অগোছাল ঘর। দেওয়াল-আলমারি, র‍্যাক, টেবিল, ইজিচেয়ারের হাতল, মেঝে, সর্বত্র শুধু বই আর বই। একটি টেবিলে কোনওক্রমে স্থান পেয়েছে কম্পিউটার, টিভিকে বসানো হয়েছে বেঁটে টুলে।

চটপট চেয়ারে স্তূপীকৃত বইগুলো মেঝেয় নামিয়ে দিলেন মীনধ্বজ। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "এর মধ্যেই কষ্ট করে বসতে হবে কিন্তু!"

মিতিন বসল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলল, "নেক্সট স্টেপটায় এগনোর আগে একটা-দু'টো চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে। কিছু ডেলিকেট প্রশ্ন করছি, আশা করি জবাব দিতে আপনার অসুবিধে নেই?"

"বলুন কী প্রশ্ন?"

"যেমন ধরুন, গুপ্তধন থাকার মতো আপনাদের সঙ্গতি ছিল কি না। সেকেন্ডলি, ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার কোনও জোরালো কারণ কখনও ঘটেছিল কি?"

পার্থ ফস করে বলল, "শুধু ওঁদের কথাই ধরছ কেন? সেই পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা, তাঁরও তো কোনও লুকনো সম্পদ থাকতে পারে?"

"তিনি এই বাড়িতে ধনসম্পত্তি পুঁতে রেখে দেশে চলে গেলেন? ভদ্রলোক কি উন্মাদ ছিলেন?"

"তা অবশ্য ঠিক।" পার্থ মাথা চুলকোল, "যদি কিছু থাকেও, সেটা মীনধ্বজবাবুরই পূর্বপুরুষ...!"

মীনধ্বজ একটু সময় নিয়ে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, আমি চিরকাল পড়াশোনা নিয়েই থেকেছি। তার ওপর বহুকাল বিদেশে। তাই পূর্বপুরুষদের কাহিনি আমার খুব একটা জানা নেই। তবে

যতদূর যা শুনেছি, রাজশাহিতে... মানে এখন যেটা বাংলাদেশে... আমাদের নাকি জমিদারি ছিল। প্রজাদের খাজনার টাকাতেই আমার পূর্বপুরুষরা বসে-বসে খেতেন। গানবাজনার চর্চা করতেন, পায়রা ওড়াতেন, বিড়ালের বিয়ে দিতেন...। ফুর্তির দাপটে সেই জমিদারি একসময় নাকি ক্রোক হয়ে যায়। তবে ততদিনে আমার গুণধর পূর্বপুরুষরা বেশ কয়েকটা বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন উত্তর কলকাতায়। ঠাকুরদাকে... পরে আমার বাবাকেও দেখেছি, ওইসব বাড়ির ভাড়ার টাকাতেই তাঁরা দিব্যি সংসার চালাতেন। অভাব অনটন হয়নি, সচ্ছলই ছিলাম, তবে সাংঘাতিক রইস অবস্থা আমাদের আর ছিল না। এমনকী, আমাকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে মাকে গয়না পর্যন্ত বেচতে হয়েছিল। এমন একটি পরিবারে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনা কতটা তা আপনিই বিচার করুন। তবে হ্যাঁ, শিখিধ্বজের সময়ে তো যথেষ্ট রমরমা ছিল, তিনি যদি এখানে কিছু পুঁতেটুতে রেখে থাকেন...!"

"তা কী করে সম্ভব? তিনি তো এখানে থাকতেনই না! ফাঁকা বাড়িতে কি...?"

"হ্যাঁ। সেটাও একটা ভাবার বিষয় বটে।"

মীনধ্বজ চুপ করে গেলেন। পার্থও আর রা কাড়ছে না। মিতিনও ভাবছে কী যেন।

খানিক পরে মিতিন বলল, "এবার একটা-দু'টো ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনি তো দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলেন?"

"হ্যাঁ। প্রায় চল্লিশ বছর।"

"আগাগোড়াই কানাডায়?"

"নাঃ। প্রথমে বছরদশেক বস্টন। বাকি সময়টা ওদেশে। টরন্টোর কাছে ওয়াটারলু বলে একটা ছোট শহর আছে, ওখানেই ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম। অঙ্ক। পিওর ম্যাথমেটিক্স।"

“হঠাৎ চলে এলেন কেন?”

“আমার স্ত্রী বছর আষ্টেক আগে ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমেরিকান। আমার ছেলেমেয়ে দু’জনেই ওখানে সেটল্‌ড। একজন অটোয়া, অন্যজন ভ্যাংকুভারে থাকে। একা-একা ওয়াটারলুতে মন্দ ছিলাম না, তবে বছর চার-পাঁচ ধরে মনে হচ্ছিল, একাই যদি থাকি, কেন নুরপুরে নয়? মরতে হলে দেশের মাটিতে মৃত্যুই তো ভাল। তাও ফাইনাল ডিসিশান নিতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল।”

“আপনি যে পার্মানেন্টলি চলে আসছেন, তা কি এখানে কাউকে জানিয়েছিলেন?”

“তেমন কেউ তো নেই। বাবা বছর কুড়ি আগে গত হয়েছেন, মা গিয়েছেন সাত বছর। তবে সন্দীপনকে ইন্টিমেট করেছিলাম আসার মাসছয়েক আগে।”

“সন্দীপনবাবু কতদিন এ বাড়ির দেখাশোনা করছেন?”

“বছরতিনেক। তার আগে তো সন্দীপনের বাবাই...!”

“তিনি কি মারা গিয়েছেন?”

“না না, আছেন। তবে বয়স হয়েছে তো, আর পেরে উঠছিলেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করেই উনি সন্দীপনের হাতে বাড়ি ছেড়েছেন।”

“এটা কি সন্দীপনবাবুর হোলটাইম জব?”

“ওর বাবা পর্যন্ত তাই ছিল। তবে সন্দীপনকে আমি ছাড় দিয়েছি। ক’ টাকাই বা মাইনে, মাত্র আট হাজার। আজকালকার দিনে তাতে কি চলে? সন্দীপন একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলেছে। আরও দু’জন বন্ধু মিলে। দু’টো রোজগারে ওর মোটামুটি কুলিয়ে যায় বলেই মনে হয়।”

“সন্দীপন বিয়ে-থা করেছেন?”

"উঁহু। এখনও ঝাড়া হাত-পা।"

"ও কে। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।" মিতিন ঘড়ি দেখল, "এবার কি আমি এ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"সন্দীপনকে ডাকি তা হলে?"

"তিনি আসুন না ধীরেসুস্থে। তার আগে একবার করুণাকে মিট করি। আপনি বরং ততক্ষণ আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে...!"

"করুণাকে কী জিজ্ঞেস করবেন? ও কী-ই বা জানে?"

"অনেক সময় বিন্দুতেও সিন্ধুদর্শন হয় মিস্টার বাগচী।"

"বেশ, বলুন কথা। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, ভূতটুতের প্রসঙ্গ তুলবেন না। মেয়েটির হাতের রান্না ভারী চমৎকার। ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে পালালে আমার সমূহ বিপদ।"

কী সরল অনুনয়! টুপুর ফিক করে হেসে ফেলল।

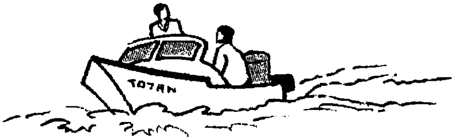

রান্নাঘরটি যথারীতি বড়সড়। ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। গ্যাস, চিমনি, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, টোস্টার, মিক্সার-গ্রাইন্ডার...! আধুনিক রন্ধনশালার সমস্ত উপকরণই মজুত। দেওয়ালে কাঠের খোপটোপ বসিয়ে দিব্যি বাহার আনা হয়েছে ঘরখানায়।

মিশকালো গ্রানাইট পাথরের স্ল্যাবের সামনে দাঁড়িয়ে আটা মাখছিল করুণা। হাত চালাতে-চালাতে গান গাইছে গুনগুন। মিতিন-টুপুরের আকস্মিক আবির্ভাবে চমকাল জোর।

কাছে গিয়ে অবলীলায় করুণার কাঁধে হাত রাখল মিতিন, "তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম ভাই!"

মিতিনমাসির এই কায়দাটা ভালই কাজ দেয়, দেখেছে টুপুর। ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে আপ্লুত হয়ে অনেক সময়ই মনের-প্রাণের কথা বলে ফেলে কাজের লোকজন।

করুণা অবশ্য সহজ হয়নি। অস্ফুটে বলল, "আমার সঙ্গে কী কথা দিদি?"

"বা রে, এক জায়গায় বেড়াতে এলাম... বাড়ির সবার সঙ্গে চেনাজানা করব না? এবার থেকে হয়তো মাঝে-মাঝেই আসব।"

"কেন?"

"এমনিই। জায়গাটা ভারী সুন্দর তো!"

"আমি জানি আপনারা কেন এসেছেন।" শ্যামলা রং ছোট্টখাট্টো চেহারার বউটার ঠোঁটে পলকা হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, "গুপ্তধনের খোঁজ করতে, তাই না?"

টুপুর অবাক। আড়ি পেতে শুনেছে নাকি?

মিতিন অবশ্য তেমন বিস্মিত নয়। স্বাভাবিক গলাতেই বলল, "মীনধ্বজবাবু বলেছেন বুঝি?"

"না না, সাহেব আমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আলোচনা করেন না। আমি আন্দাজেই...!"

"ও।" মিতিন আর ঘাঁটাঘাঁটিতে গেল না। নরমভাবেই বলল, "যাক গে যাক, যা কানে গিয়েছে তা কানেই রাখো। পাঁচকান কোরো না, হ্যাঁ?"

করুণা ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

দু'-এক সেকেন্ড নীরব থেকে মিতিন ফের বলল, "তুমি তো জেনেই ফেলেছ কেন এসেছি। এবার তা হলে তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করি?"

"ঠিকঠাক জবাব দিয়ো।" টুপুর ফুট কাটল, "বানিয়ে বললে মাসি কিন্তু ধরে ফেলে।"

"বানিয়ে-বানিয়ে কেন বলব?" করুণা যেন সামান্য ঝেঁঝে উঠল, "আমি কাজ করি, চলে যাই। আগডুম বাগডুম বকে আমার কী লাভ?"

"বটেই তো, বটেই তো।" মিতিন করুণার পিঠে আলতো চাপড় দিল, "তুমি থাকো কোথায় গো?"

"এই তো,. বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে বাঁয়ে একটা রাস্তা ঢুকেছে... হেঁটে গেলে মিনিটকুড়ি লাগে।"

"শুধু কি এই বাড়িরই কাজ করো?"

"হ্যাঁ দিদি, গোটা দিনটা তো এখানেই কাটে। সেই সকাল আটটায় ঢুকি, সন্ধের আগে ছুটি মেলে না। ঢাউস বাড়ির দোতলা, একতলা ঝাড়পোঁছ, বাসনমাজা, কাচাকুচি, রান্নাবান্না, সাহেবকে খেতে দেওয়া... কম কাজ?"

"একা হাতে সব করো?"

"সন্দীপনদাদা ঘর পোঁছাপুছির জন্য আলাদা লোক রাখতে চেয়েছিলেন, সাহেব রাজি হননি। বাড়িতে গণ্ডায়-গণ্ডায় লোক ঘুরে বেড়ালে সাহেবের অস্বস্তি হয়।"

"তা হলে মাইনেও নিশ্চয়ই ভালই পাও?"

"তিন হাজার দেন।"

"কবে কাজে লেগেছ?"

"সাহেব আসার পর থেকেই। এই তো... চারমাস চলছে। যখন এলাম, তখন তো সাহেবের অর্ধেক বাক্সপেটরা খোলাই হয়নি। তারপরেও আবার একপ্রস্থ জিনিসপত্র এল। অবিশ্যি সবেতেই শুধু বই আর বই। আমি আর সন্দীপনদাদা যে কতদিন ধরে খালি বই গোছগাছ করেছি!" করুণা ঠোঁট ওলটাল, "অত বই পড়ে মানুষের যে কী হয় কে জানে!"

"বোধ হয় তোমার সাহেবের মতো খ্যাপাটে বনে যায়!"

কথাটা মনে ধরল করুণার, মুখ টিপে-টিপে হাসল। তার হাসির মাঝেই মিতিন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তা এ বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারে তুমি কী জানো?"

করুণা যেন থতমত, "আমি কী বলব?"

"শোনোনি, দু'টো চোর গুপ্তধন খুঁজতে এসে ধরা পড়েছিল?"

"একথা তো নুরপুরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে দিদি। তারা নাকি গেঁওখালি থেকে এসেছিল, পুলিশ নাকি তাদের খুব পিটিয়েছে...!"

"গেঁওখালি?" টুপুর মিতিনমাসির দিকে তাকাল, "সে তো পূর্ব মেদিনীপুরে। সেখান থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসে মাটি খুঁড়ছিল?"

"গেঁওখালি কী এমন দূর, বোন? আমাদের ঘাট থেকে ফেরি ধরলে জোর দশ-পনেরো মিনিট। সারাক্ষণই তো এপার-ওপার চলছে।"

"ঠিকই তো।" মিতিন সায় দিল, "তুমি আর কিছু শোনোনি?"

"বললাম যে... সবাই আলোচনা করছে...!"

"আচ্ছা, গুপ্তধনের কথা কি ইদানীং উঠেছে? নাকি আগেও ছিল?"

"গুজব তো একটা ছিলই দিদি। তবে আগে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। গঙ্গার ধারে এমন একটা প্রাসাদ পড়ে থাকলে কত কথাই তো রটে। ছেলে দু'টো ধরা পড়তে এখন মাতামাতি শুরু হয়েছে। ক'দিন যা গেল, বাব্বাঃ! ভিড়ে ভিড়, গেট টপকে এসে সব উঁকিঝুঁকি মারছে... টিভির লোকরাও তো খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। সাহেব তো তখন রেগে কাঁই। ঠাকুরমশাইকে এই মারেন, তো সেই মারেন।"

"ঠাকুরমশাই? মানে এ বাড়ির কুলপুরোহিত?"

"হ্যাঁ গো দিদি। রোজ দু'বার করে আসে, আর খানিক অং বং চং করে চলে যায়।"

"গুজবটা বুঝি উনিই ছড়াচ্ছেন?"

"ওই অপকম্মো আর কে করবে? সারাক্ষণ গাঁজার নেশায় টং, মুখেও অহরহ আজগুবি বুলি। নুরপুরের কেউ ওর কথা ধরে না। ছেলে দু'টো বাইরের ছিল বলেই হয়তো...। আর ওরা দু'টোতে হানা না দিলে থোড়াই লোকে ঠাকুরমশাইয়ের গপ্পো নিয়ে মাথা ঘামাত।"

"তা হলে কি গুপ্তধনের খবরটা ভুল?"

"বললাম তো, আজগুবি। মাটির তলে মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর... আহা, কী উপাখ্যানই না ফেঁদেছেন! বাড়ির মালিক খোঁজ রাখেন না, অথচ উনি সব জেনে বসে আছেন, হুঁহ্!"

"তুমি দেখছি ঠাকুরমশাইকে একদমই পছন্দ করো না?"

"ওই খিটখিটে বুড়োটাকে দেখলেই গা জ্বলে। নিজে সারাদিন কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিকঠিকানা নেই, আমি ঠাকুরদালানে পা রাখলেই চোটপাট! এঁটো কাপড়ে উঠবি না, চৌকাঠ মাড়াবি না, আমাকে ছুঁবি না...!"

"বুঝলাম, উনি তোমায় খুবই হেনস্থা করেন?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "আচ্ছা করুণা, তুমি, সন্দীপনবাবু আর ঠাকুরমশাই ছাড়া আর কার-কার যাতায়াত আছে বাড়িতে?"

"তেমন তো কাউকে দেখি না। কম্পিউটারের একটা লোক আসে মাঝেমধ্যে, উপরে সাহেবের ঘরে বসে কী সব খুটুরখাটুর করে। আর মাসে এক-দু'বার মুনিশ লাগিয়ে সন্দীপনদাদা বাইরের ঝোপঝাড় সাফা করান। এ ছাড়া গ্যাস কিংবা ইলেকট্রিকের লোকটোক...ব্যস।"

"এ বাড়িতে কোনও দরোয়ানও তো দেখলাম না?"

"শুনেছি সন্দীপনদাদারাই এ বাড়িতে থাকতেন। এখন তো আর... !"

"হুম। তা তোমার সাহেব কি সারাক্ষণ বাড়িতেই বন্ধ থাকেন? বেরোনটেরোন না?"

"খুব কম। হপ্তায় হয়তো এক-আধদিন... নিজেই গাড়ি চালিয়ে...। তবে সকাল-দুপুর যখনই যান, সন্ধের মধ্যে ফিরবেনই। লেখাপড়া ছেড়ে নড়তেই যেন আলিস্যি। শুধু পড়তে-পড়তে হাঁপ ধরলে ছাদে খানিক হাঁটেন, নয়তো গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন একা-একা।"

"বাঃ, অনেক গল্প করা গেল।" মিতিনের মুখ খুশি-খুশি, "এবার তোমার বিষয়ে কিছু শুনি? বাড়িতে কে কে আছেন?"

"শাশুড়ি, বর, মেয়ে আর ছোট ননদ। মেয়ের সাত পুরে আট চলছে। ইশকুলে পড়ে। ননদের অবশ্য অঘ্রানে বিয়ে।"

"কী করেন তোমার বর?"

"আগে ভ্যানরিকশা চালাত। মালিকের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল, বসিয়ে দিয়েছে। ইদানীং তেমন কিছু করে না। সন্দীপনদাদা বলেছেন, ব্যাঙ্ক লোনে রিকশা কিনিয়ে দেবেন। সেই আশাতেই দিন গুনছে।"

"তোমাদের সন্দীপনদাদা তো খুব ভাল লোক?"

"সে আর বলতে! আমাকে কথা দিয়েছেন, ননদের বিয়ের খরচাও জোগাড় করে দেবেন। দয়ার প্রাণ না হলে আজকাল এমনটা কেউ করে?" বলে একটু থামল করুণা। চোখ পিটপিট করে মিতিনকে দেখল। গলা নামিয়ে বলল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিদি?"

"কী?"

"এত যে প্রশ্ন করছেন...আপনি কি মেয়েপুলিশ?"

"কাছাকাছি। মেয়েগোয়েন্দা।"

করুণা কী বুঝল কে জানে, একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "গুপ্তধন আছে কি না জানি না। আমার বর বলে, বড় বাড়ির ব্যাপার, মণিমাণিক্য কোথাও থাকতেও পারে। কিন্তু দিদি, সেটা উদ্ধার কি সোজা কথা? মেয়েরা কি এসব কাজ পারে?"

"অ্যাই, তুমি আমার মাসিকে কী ভাবছ বলো তো?" টুপুর আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "মাসির এলেম সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে? কত খুনে-ডাকাত-বদমাশ ধরেছে জানো? এই তো, কিছুদিন আগেই...!"

কেউ তার গুণপনার ব্যাখ্যান শুরু করলে চটপট তাকে থামায় মিতিন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন চুপচাপ শুনে যাচ্ছে! নাকি শুনতেই পাচ্ছে না? হঠাৎই করুণা-টুপুরকে হতবাক করে তিরবেগে দরজায় ছুটে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কাকে যেন কড়া ধমক, "আপনার এই অভ্যেসটাও আছে তা হলে?"

বাইরেটায় এসে টুপুর থ। হাড়ডিগডিগে বেঁটেখাটো চেহারার এক বৃদ্ধ কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। ধবধবে সাদা চুল, কপালে রক্ততিলক, ড্যাবাড্যাবা দু'টো চোখ করমচার মতো লাল। খেঁটো ধুতির প্রান্তখানা খালি গায়ে চাদরের মতো জড়ানো, হলদেটে পৈতে থেকে একথোকা চাবি ঝুলছে।

"ইনিই তবে এ বাড়ির ঠাকুরমশাই?"

মিতিন ফের দাবড়াল, "আড়াল থেকে কী শুনছিলেন, অ্যাঁ?"

"কিছু না তো।" ঠাকুরমশাই ঢোক গিললেন, "করুণার কাছে একটু জল চাইতে এসেছিলাম। কথা চলছে বলে ভিতরে ঢুকিনি।"

"মিথ্যে বলবেন না। চলুন, চলুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"আপনারই জায়গায়। ঠাকুরদালানে।"

এমন কর্তৃত্বের সুরে হুকুম ছুড়ল মিতিন, সুড়সুড় করে হাঁটা শুরু করলেন বৃদ্ধ। করুণার ভারী আহ্লাদ হল, হাসল মুখে আঁচল চেপে।

পিছনের চাতালে এসে থামল মিতিন। বেজার মুখে বৃদ্ধও। তীক্ষ্ণ চোখে তাঁকে নিরীক্ষণ করে মিতিন বলল, "নেশা করে আছেন মনে হচ্ছে?"

ঠাকুরমশাইয়ের গোমড়া জবাব, "বাবার প্রসাদকে নেশা বলে না।"

"শিবঠাকুরের ভক্ত হয়ে এখানে রাধাগোবিন্দর সেবা করেন?"

"এটা আমাদের বংশের পেশা। আমরা ছিয়াশি বছর ধরে এ বাড়িতে পুজো করছি।"

"অ। আপনারাও তিন পুরুষ? সন্দীপনবাবুদের মতো?"

"না। আমরা চার। আমার ঠাকুরদার বাবা এই মন্দিরের প্রথম পূজারি। দেখে বুঝতে পারবেন না, এই মন্দির আগে ফিরিঙ্গিদের গির্জা ছিল।"

"মন্দিরের কাহিনি শুনেছি। মীনধ্বজবাবু বলেছেন।"

"তা হলে নিশ্চয়ই এও জানেন, আমার ঠাকুরদার বাবা ঈশ্বর ভুজঙ্গমোহন চক্রবর্তী গির্জাটিকে শোধন করে মন্দির বানানোর পরামর্শ দেন। তাঁরই উপদেশমতো যিশু আর মা মেরির মূর্তি বাড়ির নীচে যত্ন করে রাখা আছে?"

"বাড়ির নীচে মানে?"

"তলায়। গর্ভগৃহে।" ঠাকুরমশাইয়ের চোখ তেরচা হল, "কেন, মীনধ্বজ বলেনি বাড়ির নীচে ঘর আছে? অন্তত তিন-চারখানা?"

টুপুর আর মিতিন চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। অমনি তাল বুঝে বৃদ্ধ তরতরিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি ধরছিলেন, মিতিন হাঁ হাঁ করে উঠল, "আরে আরে, চললেন কোথায়? কথা যে শেষ হয়নি?"

"কিন্তু আমার যে আরতির সময় হয়ে গিয়েছে?"

"আহা, একদিন দু'-পাঁচ মিনিট দেরি হলে রাধাগোবিন্দর কিছু ক্ষতি হবে না।"

ঠাকুরমশাই ঘুরে দাঁড়ালেন, "বেশ, বলুন কী জিজ্ঞাস্য?"

মিতিন কেজো গলায় বলল, "আমার পরিচয় তো আপনি জেনে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই আগমনের কারণটাও আন্দাজ করতে পারছেন?"

"পারছি।"

"আপনি তো এ বাড়ির সঙ্গে বহুকাল ধরে যুক্ত, হঠাৎ এখন গুপ্তধনের গল্পটা শুরু করলেন কেন বলুন তো?"

"অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী এমনি-এমনি কিছু বলে না।" শ্লেষ্মাজড়ানো প্রবীণ স্বর ঘড়ঘড় বেজে উঠল, "সে যা শোনে, তাই পাঁচজনকে শোনায়।"

"কী শুনেছেন আপনি?"

"আমার বাপ-ঠাকুরদা যা বলতেন। মাটির তলে মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর...!"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান গুপ্তধন সত্যিই আছে?"

"অতশত জানি না। যা শুনেছি, তাই বলি।"

"তা, হঠাৎ মীনধ্বজবাবু ফেরার পরেই কথাটা চাউর করা শুরু করলেন কেন?"

"বাজে অভিযোগ। মোহরের গল্প আমি চিরকালই বলছি। আগে কেউ পাত্তা দিত না, এখন লোকে বিশ্বাস করছে। এতে আমার কী অপরাধ? আমি কি কখনও গুপ্তধন হাতানোর চেষ্টা করেছি?" অপরাধী-অপরাধী ভাব মুছে ফেলে বেশ তেজের সঙ্গে কথা বলছেন অনঙ্গমোহন। ক্ষয়াটে শরীর টানটান করে বললেন, "শুনুন ভাই, পুজোআর্চা করে খাই বটে, আমরা কিন্তু খুব ফ্যালনা পরিবার

নই। আমাদের একটা বংশমর্যাদা আছে। আড়াইশো বছর ধরে নুরপুরে আমাদের বাস। এখানেই আমাদের আদি বাড়ি। এককালে আমাদের বিশাল রমরমা ছিল। আমার পূর্বপুরুষরা হাতি ছাড়া কোথাও নড়তেন না। একবার মন্বন্তরের সময় দশ-দশখানা গ্রামকে আমরা একাই...!"

"বুঝেছি, বুঝেছি। আপনারা অতি উচ্চ ঘর।" দু' হাত তুলে মিতিন থামাল অনঙ্গমোহনকে। ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল, "কাজের কথায় আসুন তো। ছেলে দু'টোকে আপনি গুপ্তধনের গল্প কবে শুনিয়েছিলেন?"

"কোন ছেলে?"

"যারা মাটি খুঁড়তে গিয়ে ধরা পড়ে।"

"তাদের আমি চিনিই না। ফেরিঘাটের চা-দোকানে গিয়ে অনেক সময় গল্পগাছা করি, তখন ওরা হয়তো শুনেও থাকতে পারে।"

"হুম। আর-একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো? আপনি গুপ্তধনের খবর জানেন, অথচ মীনধ্বজবাবুর এ সম্পর্কে কোনও আইডিয়াই নেই, এটা কী করে সম্ভব?"

"দেখুন, এ বাড়ির মেঝেতে কান পাতলে মোহরের ঝনঝন শোনা যায়। আমার ঠাকুরদা বলতেন, সঙ্গে অনেক দীর্ঘশ্বাসের শব্দও নাকি কানে আসে। শুধু মোহর নয়, বাড়ির নীচে নাকি মানুষের পাপও জমে আছে। মীনধ্বজ যদি কিছুই না শুনতে পায়, সেটা তার দুর্ভাগ্য।"

"আপনি নিজে কখনও শুনেছেন?"

অনঙ্গমোহন জবাব দিলেন না। ঢুলুঢুলু চোখে হাসলেন মিটিমিটি।

হাসিটাকে একটুও পড়তে পারল না টুপুর।

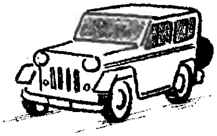

মন্দিরে উঠে গেলেন অনঙ্গমোহন। জোর-জোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি সারছেন। পিছনের লোহার ফটক পেরিয়ে মিতিন আর টুপুর গঙ্গার ধারে এল।

নদীতে ভাটা চলছে। বাঁধানো পাড়ের অনেকটা নীচ থেকে ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে থকথকে এঁটেলমাটির কাদা। দেখে আন্দাজ করা যায়, জোয়ারে কতদূর পর্যন্ত জল আসে। ওপারে পশ্চিম আকাশে সূর্য প্রায় ডুবুডুবু, তার লালচে আভায় চিকমিক করছে গঙ্গা। ফেরিঘাট থেকে এই বুঝি একটা লঞ্চ ছাড়ল, ঢেউ কেটে-কেটে যাত্রীবোঝাই জলযান চলেছে গেঁওখালির দিকে। ওপারে স্থলভূমির ছায়া-ছায়া গাছগাছালি যেন জলরঙে আঁকা ছবি।

টুপুর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "কী দারুণ লাগছে গো মাসি! অপূর্ব!"

মিতিনের দোপাট্টা হাওয়ায় উড়ছিল। গায়ে সাপটে নিয়ে বলল, "স্পটটা কিন্তু ভারী মজাদার। কাছেই দক্ষিণবঙ্গের দু'-দু'খানা বিখ্যাত নদ এসে মিলেছে গঙ্গায়। রূপনারায়ণ, আর দামোদর। রূপনারায়ণের মোহনার এক তীরে গেঁওখালি, অন্য পারে গাদিয়াড়া। আবার নুরপুর যদিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, গেঁওখালি পূর্ব মেদিনীপুরে আর গাদিয়াড়া হাওড়ায়। তিনটে জেলারই সীমানায় নদী। মানেটা বুঝতে পারছিস? চাইলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লঞ্চে-লঞ্চে তিনটে জেলা ছুঁয়ে আসতে পারিস।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "গঙ্গা-রূপনারায়ণের সঙ্গম তো দেখতে পাচ্ছি। দামোদর কোথায়?"

"খানিক ডাইনে। গঙ্গা ক্রস করে গাদিয়াড়া যেতে চোখে পড়ে।"

টুপুর প্রায় বলতে যাচ্ছিল, 'ঝপ করে ঘুরে এলে হয়!' গিলে নিল ইচ্ছেটা। দরকারি কাজে এসে এই ধরনের বায়না জোড়া মানায় না। তা ছাড়া তদন্ত তো আজই চুকছে না! আবার আসতে হবে, তখনই না হয়...!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। পিছনে মীনধ্বজের গমগমে গলা, "গঙ্গার শোভা দেখছেন নাকি ম্যাডাম?"

টুপুর, মিতিন একসঙ্গে ঘুরছে। পার্থকে নিয়ে এদিকেই আসছেন মীনধ্বজ। পাশে এক দীর্ঘকায় তরুণ।

ফিসফিস করে টুপুর বলল, "সন্দীপনবাবু নাকি?"

"মনে তো হচ্ছে। বাগচীসাহেবের বোধ হয় তর সইল না। ডেকে নিয়েছেন।"

হ্যাঁ, অনুমান সঠিক। ছেলেটি সন্দীপনই। বেশ ঝকঝকে চেহারা, বয়স বোধ হয় তিরিশও ছোঁয়নি, গায়ের রং ফরসাই বলা যায়, চুল ঈষৎ কোঁকড়া, বাদামি ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখ দু'টো যথেষ্ট উজ্জ্বল। কালো ট্রাউজারস পরে আছে সন্দীপন, গায়ে হালকা নীল বুশশার্ট।

আলাপ করিয়ে দিতেই সন্দীপন স্মিত মুখে বলল, "কাকাবাবু আমার পরামর্শটা শুনেছেন দেখে ভাল লাগল। আমি তো প্রথম থেকেই বলছি, এ বাড়িতে যদি কোনও রহস্য থাকে, সেটি উদঘাটন পুলিশের কম্মো নয়। দরকার একজন পেশাদার গোয়েন্দার। আপনার মতো।"

মিতিন হেসে বলল, "আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

"নাম শুনেছি। আপনি তো বিখ্যাত মানুষ। ইলিয়ট রোডের সেই ভুতুড়ে বাড়ির কাণ্ডকারখানা আপনি যেভাবে সল্‌ভ করেছিলেন...। খবরের কাগজে তো ফলাও করে বেরিয়েছিল নিউজটা।"

"কপাল দেখুন, আবার সেই ভূতের বাড়ির সমস্যাই এসেছে।"

"এ বাড়ির কথা বলছেন?"

"অবশ্যই। মিস্টার বাগচী প্রায় রাতেই তো ভৌতিক শব্দ শুনছেন।"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু বলছেন বটে।" সন্দীপন অল্প হাসল, "মজার ব্যাপার কী জানেন তো? আমি রাতে থাকলে কোনও আওয়াজই হয় না! শুধু তাই নয়, আমি তো অন্তত পৌনে তিন বছর এই বাড়িতে একা-একা থেকেছি। কোনওদিনই ওইসব বিদ্‌ঘুটে সাউন্ড কানে আসেনি।"

মীনধ্বজ বললেন, "আমি তো মানছি ওটা হয়তো মনের ভুল।"

"কিন্তু আপনি ভয় তো পাচ্ছেন।"

"মোটেই না। অবাক হচ্ছি।"

"মনের ভুলটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন কাকাবাবু, প্লিজ। না হলে, রাতে নয় আমি এখানে থাকি। যদি একটাও সাউন্ড হয়, সোর্সটা আমি ধরে ফেলবই।"

"ঠিক আছে, সে দেখা যাবেখ'ন।" আলোচনাটা যেন মীনধ্বজের পছন্দ হচ্ছে না, কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, "গঙ্গার ধারটা কেমন লাগছে ম্যাডাম?"

"দুর্দান্ত! এখানে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়।" বলতে-বলতে মিতিনের দৃষ্টি হঠাৎ ঢালের কাদায় স্থির। আঙুল তুলে বলল, "ভাঙা-ভাঙা থামের মতো ওগুলো কী মিস্টার বাগচী?"

"ওখানে এককালে বাঁধানো জেটি ছিল। সেই অল্‌মিডাসাহেবের যুগে। জাহাজটাহাজও নাকি ভিড়ত। আমি অবশ্য জন্ম থেকে জেটির ধ্বংসাবশেষই দেখছি। তবে একটা জিনিস এখনও টিকে আছে।" মীনধ্বজ দু'পা এগোলেন। খাড়া পাড়ের কিনারে গিয়ে সন্তর্পণে ঝুঁকলেন সামান্য। বললেন, "নীচের দিকটা দেখুন। ওই বাঁয়ে।"

দর্শনীয় বস্তুই বটে। টুপুররা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার থেকে খানিক তফাতে, বাঁ দিকে পাড়ের গায়ে এক চৌকো লোহার গেট। মরচে ধরা, কাদামাখা। আকারে রীতিমতো বিশাল। পাড় থেকে শুরু হয়ে খাড়া চলে গিয়েছে ঢাল পর্যন্ত। অন্তত ফুটদশেক চওড়া তো হবেই, উচ্চতাও পনেরো ফুটের কম নয়।

পার্থ গোল-গোল চোখে বলল, "ওটা কী?"

"গেস করুন।"

"স্লুইস গেট?"

"রাইট। সামনে নাকি পরপর আরও তিনটে ছিল। সবই এখন নদীর গর্ভে।"

"এত লকগেট? কেন?"

"এককালে নদী তো এখানে যথেষ্ট তেজিয়ান ছিল, তখন নাকি জলের চাপ কমাতে খুলে দেওয়া হত একটার পর-একটা। শেষ গেটটি ওপেন করলে জল নাকি চলে যেত আমাদের বেসমেন্টে। বোধ হয় ওটা ছিল বাড়িটাকে রক্ষা করার কৌশল। জলের লেয়ার নেমে গেলে বেসমেন্ট আবার ক্লিয়ার হয়ে যেত।"

টুপুর অত্যুৎসাহী মুখে বলে ফেলল, "যেখানে যিশু আর মা মেরির মূর্তি রাখা আছে?"

"না না, ওগুলো তো বেসমেন্টের ঘরে। জল আসত ঘরগুলোর নীচে, চাতালে। সেখানে আউটলেটও ছিল। জলের হাইট বেশি বেড়ে গেলে, আউটলেট দিয়ে নাকি বেরিয়েও যেত।" বলেই মীনধ্বজ থমকালেন, "বেসমেন্টের কথা তোমাদের কে বলল?"

"ঠাকুরমশাই!"

"তার সঙ্গে পরিচয় হল কখন?"

"এই তো, একটু আগে।" মিতিন আবার লকগেটের প্রসঙ্গে ফিরল, "বেসমেন্টে তা হলে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা আছে?"

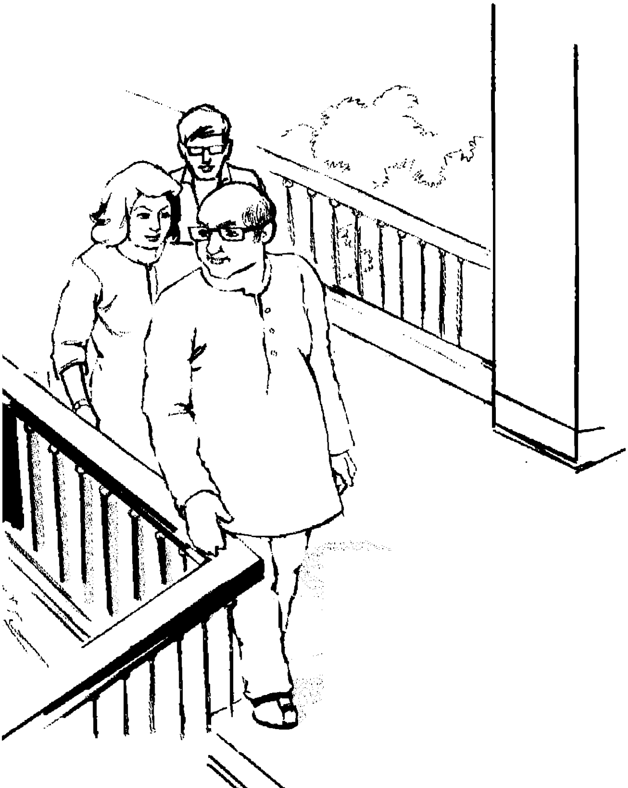

"ছিল। এখন আর নেই। ওই লকগেট বহুকাল ধরেই অচল। খোলা-বন্ধ করার সিস্টেমটাও কোথায় ছিল কে জানে!" মীনধ্বজ গলা ঝাড়লেন, "তখন বললাম না, শিখিধ্বজ কোনওদিনই এখানে বাস করেননি...! তখন থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জাহাজঘাটা, লকগেট, সবই পঞ্চত্ব পেয়েছে। নেহাত আমার ঠাকুরদা নদীর পাড়টা বাঁধিয়েছিলেন, তাই অতীতের স্মৃতিটুকু আছে কোনওরকমে। এ ছাড়া, ভিতরে যাতে জল না ঢোকে, ঠাকুরদা বেসমেন্টে পুরু দেওয়ালও তুলে দেন। সুতরাং লকগেট ব্যবহারেরও আর প্রশ্ন নেই।"

"স্ট্রেঞ্জ! সেই প্রোটেকশান সিস্টেম ছাড়াই বাড়ি অক্ষত আছে?"

"তাই তো দেখছি। জলও অনেক কমে গিয়েছে যে! পদ্মা যত ফুলেফেঁপে উঠেছে, ভাগীরথী তত নিস্তেজ হয়েছে। সেই জন্যই হয়তো আর বিপদটিপদ ঘটেনি।"

"হুঁ।" মিতিন ভাবল কী যেন। বলল, "বেসমেন্টে একবার যাওয়া যায় না?"

"এখন? অন্ধকার হয়ে এল...আমি তো খুব একটা নীচেটিচে যাই না...কারেন্টও নেই! দিনেরবেলা স্কাইলাইটের আলোয় দেখলে বোধ হয় সুবিধে হত।"

সন্দীপন মৃদু স্বরে বলল, "এখনও অসুবিধে নেই। টর্চ তো আছে।"

মীনধ্বজ বললেন, "তুমি তা হলে নিয়ে যাও। আমি আর নামছি না, নীচটা বড্ড স্টাফি।"

বাড়ির সামনে যে দশ ধাপ সিঁড়ি, তার তলাতেই বেসমেন্টের দরজা। তালা খুলে ঢুকল সন্দীপন। টর্চ হাতে চলেছে আগে-আগে। উপরতলার মতো একেবারেই খোলামেলা নয়, বরং সত্যিই খানিকটা

দমচাপা ভাব। তবে আঁধার এখনও তেমন ঘুরঘুট্টি হয়নি। ছোট-ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসা অন্তিম সূর্যালোক একটা আবছায়া রচনা করেছে অন্দরে। ছায়াই বেশি, ক্ষীণ আলোটুকু চাপা পড়ে যাচ্ছে টর্চের দাপটে।

টানা লম্বা প্যাসেজের গায়ে পরপর তিনখানা ঘর। প্রথমটায় তো ঢোকারই জো নেই, রাশি রাশি ভাঙাচোরা আসবাবে বোঝাই। একটা পায়াভাঙা চেয়ারের হাতল ছুঁয়ে টুপুর টের পেল, কী পুরু ধুলোর আস্তরণ। দ্বিতীয় ঘরখানায় আদ্যিকালের কিছু লোহালক্কড় পড়ে আছে। তিন নম্বরটিতে চ্যাপেলের মূর্তি আর কিছু আসবাব। ছোট যিশুকে কোলে মাটির মা মেরির পাশেই বড়সড় একটি পিয়ানো। একটা-দু'টো লম্বা বেঞ্চও আছে। ছবি আছে বেশ কিছু। অধিকাংশই ডাঁই করা, দু'-চারটে দেওয়ালে ঝুলছে। মানুষপ্রমাণ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবিখানা একদিকের দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে। এ ঘরেও প্রাচীন-প্রাচীন গন্ধ।

টর্চের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ঘুরছিল মিতিনের। বলল, "পেন্টিংগুলো তো বেশ ভাল কোয়ালিটির। উপরে নিয়ে গিয়ে টাঙাননি কেন?"

সন্দীপন টর্চটা আবার ঘুরিয়ে বলল, "মন্দিরের যিনি প্রথম পূজারি, তাঁর নাকি বারণ ছিল।"

পার্থ আক্ষেপের সুরে বলল, "এত ভাল একখানা পিয়ানো, তাও কেমন অযত্নে নষ্ট হচ্ছে!"

"উপায় কী বলুন? পূর্বপুরুষদের স্থির করা নীতি তো কাকাবাবু ভঙ্গ করতে পারেন না।"

"তা বটে।" মিতিন জিজ্ঞেস করল, "বেসমেন্টের সেই চাতালটা কোথায়, যেখানে জল আসত?"

"আসুন, দেখাচ্ছি।"

তৃতীয় কামরাটির পিছনে আর-একটি দরজা। খুলতেই ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। বেশি নয়, দশ-বারো ধাপ। আলো দেখিয়ে-দেখিয়ে মিতিনদের নীচে নিয়ে এল সন্দীপন। খুব একটা বড় নয় চাতালটা। সামনে খাড়া দেওয়াল, পিছনেও খাড়া দেওয়াল। প্রকাণ্ড একটা বাক্সের মতো চেহারা।

সামনের দেওয়ালে আলো ফেলে সন্দীপন বলল, "কাকাবাবুর ঠাকুরদা এই দেওয়ালটাই গেঁথেছিলেন।"

মিতিন একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল, "জল বেরনোর জায়গা ছিল শুনছিলাম?"

"বোধ হয় সাইড ওয়ালে ছিল। নিশ্চয়ই তখনই আটকে দিয়েছেন, এখন তো আর বোঝার কোনও উপায় নেই।"

সবক'টা দেওয়ালেই একটু টোকা মেরে দেখল মিতিন। দেওয়ালে কান পেতে কিছু যেন শোনারও চেষ্টা করল। আপনমনে বলল, "স্ট্রাকচারগুলো সলিড।"

"আগেকার দিনের নির্মাণ ম্যাডাম... তখন তো খুব পাকা কাজই হত।"

"ঠিক। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

আবার লোহার সিঁড়ি। তৃতীয় ঘরের মধ্যে দিয়ে ফের প্যাসেজ। বেসমেন্টের বাইরে এসে বড়সড় শ্বাস নিল পার্থ। উদাস স্বরে বলল, "কেন যে এমন গর্ভগৃহ বানানো? শেষ পর্যন্ত তো আবর্জনা জড়ো করার জায়গা!"

"সেটাও এক ধরনের ইউটিলিটি।" মিতিন হাসল সামান্য। সন্দীপনকে জিজ্ঞেস করল, "নীচে কি একদমই আসা হয় না?"

বেসমেন্টের দরজা বন্ধ করছিল সন্দীপন। তালাটা টেনে পরখ করে নিয়ে বলল, "খুব কম। একেবারেই খোলাখুলি না করলে চামচিকে-টামচিকে বাসা বাঁধবে, তাই মাসে এক-আধবার...!"

"চাবি কি আপনার জিম্মাতেই থাকে?"

"কাকাবাবু আসার আগে কাছেই রাখতাম। এখন উপরেই থাকে, দরকারমতো নিয়ে খুলি।"

"আপনারা তো আগে এ বাড়িতেই বাস করতেন?"

"হ্যাঁ, আগে সব্বাই ছিলাম। বছর কুড়ি আগে বাবা ডায়মন্ডহারবার রোডে নিজস্ব বাড়ি বানালেন। তখনই আমি, মা আর দিদি সেখানে চলে যাই। বাবা ওখানেও থাকতেন, এখানেও থাকতেন। আমি অবশ্য এ বাড়ির দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা এখানেই থেকেছি।"

"শুনলাম আপনার একটা টিউটোরিয়ালও আছে? কী পড়ান?"

"কমার্স। এম কম পাশ করেও চাকরিবাকরি জুটল না। তিন বন্ধু মিলে তাই কোচিং ক্লাসটা খুলেছি। বাড়ির কাছেই। তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে।"

"কদ্দিন?"

"বছর দুয়েক।"

"কখন চলে কোচিং?"

"দুপুর থেকে সন্ধে আটটা।"

"আপনার আর দুই বন্ধুও কি নুরপুরের?"

"একজন আমতলার। অন্যজন থাকে ডায়মন্ডহারবারে। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। চাকরি না পেয়ে আমাদের এমন জেদ চেপে গেল...!"

"কাজের কাজ করেছেন! আচ্ছা সন্দীপনবাবু, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী মানুষটি কেমন?"

একটু সময় নিয়ে সন্দীপন বলল, "ভালই তো! দোষের মধ্যে দোষ, একটু বানিয়ে-বানিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন। আর একটু নেশাটেশা করেন। তবে লোক খারাপ বলা যাবে না।"

"কিন্তু উনিই তো অশান্তির মূল? গুপ্তধনের গুজবটা তো উনিই ছড়িয়েছেন?"

"ওটা পাকেচক্রে ঘটে গিয়েছে। ঠাকুরমশাইয়ের মুখে গুপ্তধনের গল্প তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনছি। হাসাহাসি করতাম সকলেই।"

"কিন্তু এরকম রটিয়ে উনি কী সুখ পান?"

"কী জানি! আসলে একজন বিফল মানুষ তো, জীবনে কিছুই করে উঠতে পারেননি। পুরুতগিরি করে ক' পয়সাই বা আসে? একটা চাকরি জোগাড় করেছিলেন কোনওরকমে, পিয়নের। কারওর কাছ থেকেই তেমন শ্রদ্ধাসম্মান পাননি কখনও। তিন ছেলের একটাও মানুষ হয়নি। তারা সব এখন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়। বড়টা তো চিটিংবাজির কেসে একবার হাজতবাসও করে এসেছে। বেচারা ঠাকুরমশাইকে রিটায়ারমেন্টের পর, সংসার প্রতিপালনের জন্য এখন জমি-বাড়ির দালালি করতে হয়। তাই হয়তো দুর্ভাগা লোকটা নিজেকে একটু ওজনদার প্রতিপন্ন করতে ওইসব গল্প এখনও চালিয়ে যান। তা বলে গুপ্তধনের খোঁজে কেউ যে সত্যি-সত্যি শাবল-গাঁইতি নিয়ে হাজির হবে, এতটা বোধ হয় উনিও ভাবেননি।"

"ঠাকুরমশাই কিন্তু আমাদের আর-একটা কথাও বলেছেন আজ।"

"কী?"

"এ বাড়ির নীচে শুধু গুপ্তধন নয়, অনেক পাপও নাকি জমে আছে?"

"পাপ?" সন্দীপন ক্ষণিক নিশ্চুপ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "এটা তো নতুন শুনছি! কিন্তু এ বাড়িতে পাপ জমা হবে কোত্থেকে? আমি যতটুকু জানি, কাকাবাবুর পূর্বপুরুষরা কেউই তো তেমন

খারাপ লোক ছিলেন না! হয়তো সেভাবে কেউ রোজগারপাতি করেননি। বংশের পয়সায় বসে-বসে খেয়েছেন। উত্তর কলকাতায় তো অনেক বাড়ি ছিল, একে-একে প্রায় সবই গিয়েছে। সেও তো ওই আলস্যের কারণে। কিন্তু কারও উপর ওঁরা অত্যাচার করেছেন, কিংবা কাউকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি গ্রাস করেছেন, এমন অভিযোগ কস্মিনকালেও শুনিনি। ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন, কী পাপ? কে করেছে?"

"হুঁ, প্রশ্নটা করা হয়নি। আচ্ছা, অনঙ্গবাবুরা কি এ বাড়িতে থাকতেন কখনও?"

"ভুজঙ্গমোহন নাকি অল্প কিছুদিন ছিলেন। তারপর কাকাবাবুর ঠাকুরদার বাবা তাঁকে খানিকটা জমি কিনে দেন, সেখানেই বাড়িঘর বানিয়ে...!"

টুপুর বলল, "সে কী? ঠাকুরমশাই যে বললেন এখানে আড়াইশো বছর ধরে আছেন? ওঁদের নাকি বিশাল অবস্থা ছিল...?"

"তুমি বুঝি বিশ্বাস করেছ?" সন্দীপন হেসে ফেলল, "ওটা নিয়েও তো ঠাকুরমশাইয়ের গল্প আছে। গঙ্গা নাকি ওঁদের প্রাসাদের মতো অট্টালিকাটি গ্রাস করে নিয়েছে...!"

"রং চড়ানোটা বোধ হয় ওঁর নেশা।" মিতিন না হেসেই বলল, "আর-একটা কথাও আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে সন্দীপনবাবু। গুপ্তধনের গল্প তো আপনার শৈশব থেকেই শোনা। তারপর বেশ কিছুদিন এ বাড়িতে একাই ছিলেন। তখনও কি কখনও রটনাটা সত্যি কি না যাচাই করার কৌতূহল আপনার জাগেনি?"

"ওই খুঁড়েটুড়ে দেখা?" সন্দীপন এবার বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। পরক্ষণেই মুখখানা গ্রাম্ভারি করে বলল, "দেখুন ম্যাডাম, আমার বাবা একটা কথা প্রায়ই বলেন। আমরা নাকি গুপ্তধনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছি। কাকাবাবুর বাবা প্রায়

রাস্তা থেকে তুলে এনে আমার ঠাকুরদাকে এ বাড়িতে ঠাঁই দেন। তারপর আর কোনও দিন আমাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা করতে হয়নি। দিদির বিয়ে, আমার পড়াশোনা...এমনকী, বাবা যে বাড়িটা বানিয়েছেন, তার পিছনেও কি কাকাবাবুদের অর্থসাহায্য কম ছিল? এ বাড়িতে মাটির উপরেই যখন এত পেয়ে গিয়েছি, মাটির তলায় আর কেন ঘড়া-ঘড়া মোহর খুঁজতে যাব বলুন?”

প্রশ্নোত্তরের মাঝেই মীনধ্বজ বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। উদ্‌গ্রীব মুখে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ম্যাডাম, পরিদর্শন কমপ্লিট?”

মিতিন হাসল, “হল এক রাউন্ড।”

“কিছু হদিশ পেলেন?”

“এত তাড়াতাড়ি?” মিতিনের হাসি চওড়া হল, “আমি কি ম্যাজিক জানি?”

এবার আর পার্থ নয়, স্টিয়ারিংয়ে মিতিন। যাওয়ার সময় গাড়ি চালিয়ে যা পরিশ্রম হয়েছিল, ফেরার পথে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তার ডবল উশুল করে নিল পার্থ। গোটা রাস্তা মিতিনও স্পিকটি নট। কোনও তদন্ত শুরু করলে এটাই মিতিনের দস্তুর। টুপুরেরও মুখে কুলুপ। এখনও তার চোখে ভাসছে অপরূপ এক নদী, এক নয়নাভিরাম সূর্যাস্ত, নদীতে ছড়িয়েছিটিয়ে ভেসে থাকা নৌকো, ওপারের ছায়া-ছায়া গাছপালা, বাড়িঘর...। গঙ্গা রূপনারায়ণের সঙ্গমটাও দেখা হল। দামোদরটাই যা বাকি রয়ে গেল, ইস!

বাড়িতে ঢুকেই অবশ্য নীরবতার ইতি। বুমবুম কেন এখনও

খাওয়া না সেরে কম্পিউটারে, তাই নিয়ে বকাবকি জুড়ল মিতিন। টুপুর টুক করে টিভিতে একটা রিয়েলিটি শো দেখতে বসে গেল। ঢাউস এক কাপ চা খেয়ে পার্থও দিব্যি টগবগে। মিতিনের উদ্দেশে টিপ্পনী ভাসিয়ে দিল, "তোমার ভেল্টুদাদা তোমাকে কিন্তু একটা ফালতু কেসে ফাঁসিয়ে দিলেন।"

আরতি টেবিলে খাবারদাবার রেখে চলে যাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে এসে বুমবুমকে আহারে বসাল মিতিন। আলগোছে পার্থকে বলল, "কেন, কেসটার কি মেরিট নেই?"

"একেবারেই না।" পার্থ চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসল। হাতের ইশারায় ডাকল টুপুরকে। টেবিলে আরও তিনখানা প্লেট সাজিয়ে টুপুরকেই সাক্ষী মানল, "তুইই বল, তোর মাসি এমন একটা জিনিস খুঁজতে গিয়েছে, যেটা আছে কি না সে সম্পর্কেই কেউ নিশ্চিত নয়। কস্মিনকালে তার অস্তিত্ব ছিল কি না তাও কেউ জানে না। শুধুমাত্র এক গুলবাজ বুড়ো ছাড়া।"

প্রিয় অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠতে হয়েছে বলে টুপুর যেন খানিক আনমনা। ঢক করে ঘাড় নেড়ে বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

ক্যাসারোল খুলে প্লেটে রুটি নিল পার্থ। টুপুরকেও দিল। হাতায় মাটনকারি তুলতে-তুলতে বলল, "তারপর ধর, এমন একটা ক্রাইম হয়েছে, যা অপরাধ পদবাচ্যই নয়। দু'টো বুদ্ধু খামোখা মাটি খুঁড়ে পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়েছে। ঠিক, কি না?"

টুপুর স্যালাড টানল, "সেরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে!"

বেজায় উৎসাহ পেল পার্থ। মুখে আরও বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে বলল, "তারপর দ্যাখ, বাড়িতে এমনই ভৌতিক ঘটনা ঘটছে, যাতে কেউই তেমন ভীত নয়।"

"হুঁ।" টুপুর রুটি ছিঁড়ল, "মীনধ্বজবাবুকে তো মোটেই আতঙ্কিত দেখাল না।"

"ওই মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী একটি ট্যাবলেট, বুঝলি? যখনই দেখেছি গেটে দরোয়ান নেই, তখনই বুঝেছি, ইনি একটি হাড়কেপ্পন। এত দূর গেলাম, অতক্ষণ রইলাম...স্টমাকে কী জুটল বল? নাম মীনধ্বজ, অথচ ক'টা ফিশফ্রাইও খাওয়াতে পারলেন না।"

টুপুর হেসে বলল, "বুঝেছি, তুমি খুব ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি হাত চালাও।"

"উঁহু, খিদেটা বড় কথা নয়। এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। অমন লম্বাচওড়া একটি নাম বয়ে বেড়াচ্ছেন, থাকেন পেল্লাই এক প্রাসাদে...শোনালেন রাজশাহির জমিদার ছিলেন। অথচ বুকের খাঁচাটা এইটুকু।" আঙুলের মুদ্রায় মীনধ্বজের হৃদয়ের মাপখানা দেখাল পার্থ। রুটির টুকরো ঝোলে ডুবিয়ে বলল, "খুব তো তোর মাসিকে বারফট্টাই দেখালেন, এনি অ্যামাউন্ট দিতে পারেন! কিন্তু একটা পয়সাও তো অ্যাডভান্স ঠেকালেন না!"

"আহা, মাসিও তো বলল, আজ কিছু লাগবে না!"

"অমনি উনি হাত গুটিয়ে নেবেন? এ কী ধরনের ভদ্রতা?" পার্থ আবার মিতিনকে খোঁচাল, "তোর মাসিটাও হয়েছে সেরকম! যা আসছে, ঝটাক্সে ব্যাগে পুরে ফ্যালো...! তা নয়, উনি ভবিষ্যতের আশায় তাকিয়ে আছেন! আরে বাবা, পরে তো লবডঙ্কা জুটবে!"

"কেন?"

"কারণ, কেসটায় কিস্‌সু নেই। নো রহস্য, নো ক্রাইম, না কোনও অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। সারমর্ম বুঝে গেলে মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ তোর মাসিকে টা টা করে দেবে। এবং তোর মাসির ভেল্টুদা আড়ালে তখন খ্যাকখ্যাক হাসবে।"

পর্বতাকৃতি অনিশ্চয় মজুমদারের 'ভেল্টু' নামটা শুনলেই টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি আসছে। এখনও কোনওক্রমে হাসিটা চেপে জুলজুল চোখে মিতিনমাসিকে দেখল টুপুর। আশ্চর্য, কোনও

প্রতিক্রিয়াই নেই? এত শ্লেষ-বিদ্রুপের পরেও? একমনে রুটি-মাংস খাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে বাঁ হাতের চাপড়ে তাড়া লাগাচ্ছে বুমবুমকে!

অগত্যা টুপুরকেই হাল ধরতে হয়। ভুরুতে একটা ভাঁজ এনে টুপুর বলল, "আমার কিন্তু ব্যাপারটা একদম সিধেসাদা লাগছে না মেসো। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি।"

"ওটা তোর ঘ্রাণশক্তির দোষ। মাসির সঙ্গে থেকে-থেকে হয়েছে।"

"উঁহু। ঠাকুরমশাই মানুষটি ধরো পঞ্চাশ বছর ধরেই এক গল্প করছেন। কিন্তু মীনধ্বজবাবু পাকাপাকিভাবে ফিরে আসার পরই গুপ্তধনের সন্ধানে কেউ হানা দিল। এটা কি খুব স্বাভাবিক?"

"স্রেফ কাকতালীয়।"

"আর অনঙ্গমোহনবাবুর আড়িপাতাটা?"

"ওটা অনেকের নেচার থাকে। কেউ কথা বললে লুকিয়ে-লুকিয়ে শোনার।"

"অনঙ্গমোহনবাবু সম্পর্কে আর-একটু কিন্তু ভাবার আছে। করুণা একদমই অনঙ্গমোহনকে পছন্দ করে না। মীনধ্বজবাবুও বাড়ির ঠাকুরমশাইটির উপর প্রীত নন। লক্ষ করছিলে, মাসি যেই অনঙ্গমোহনবাবুর কথা তুলল, অমনি মীনধ্বজবাবুর চোয়াল পলকের জন্য হলেও কেমন কঠিন হয়ে গেল?"

"আমি অত খেয়াল করিনি।" বলেই পার্থ পালটা তর্ক জুড়ল, "অবশ্য অনঙ্গমোহনের মতো একটি চিড়িয়াকে পছন্দ করারও তো কোনও কারণ দেখি না। এক সন্দীপন ছাড়া সকলেই ওঁর নিন্দামন্দই করবে।"

"তাই?"

"ইয়েস। সন্দীপন ছেলেটার মনটা ভাল বলে, যথাসম্ভব রেখেঢেকে কমেন্ট করছিল।"

"আমি শুধু অনঙ্গমোহনবাবুর কথাই বলছি না।" টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "করুণাই বা জানল কী করে, মাসি ডিটেকটিভ? সেও নিশ্চয়ই আড়ি পাতে। তারপর...আমরা যেটা প্রায় ধরছিই না...দ্বিতীয় আর-একদিন চোর এসেছিল। কী উদ্দেশ্যে?"

"সেম ধান্দা। কাল্পনিক গুপ্তধন।"

"কিন্তু তারা তো খোঁড়াখুঁড়ি করেনি? জায়গাটা তো প্রথম ঘটনার পরেই মাটি ফেলে দুরমুশ করে দেওয়া হয়েছে! এবং এখনও ইনট্যাক্টই আছে জায়গাটা!"

"দ্বিতীয়বার গাঁইতি মারার সুযোগই তো পায়নি। মীনধ্বজবাবু এমন হল্লা জুড়েছিলেন...!"

"আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, গুপ্তধনের জন্য প্রথমবার খোঁড়াখুঁড়ির পর করুণা তো স্পটটা জেনেই গেল! তারপর হয়তো সেকেন্ড টাইম ও কাউকে পাঠিয়েছিল? হয়তো ওর বর, সঙ্গে আর কেউ...? পাছে তার ওই ষড়যন্ত্র মিতিনমাসি ধরে ফেলে, কথা বলার সময় তাই অত আড়ষ্ট ছিল?"

"ওটা অবশ্য তুই জানিস। করুণাকে জেরার সময় আমি তো ছিলাম না। তবে, করুণার বর যদি খুঁড়তে এসেও থাকে, তা হলেও কি গুপ্তধন আছে প্রমাণ হয়?"

"যাই বলো, মীনধ্বজবাবুরই কিন্তু জায়গাটা খুঁড়ে দেখা উচিত এখন।"

"উচিত তো বটেই। আমি হলে তো ডিটেকটিভ না ডেকে নিজে আগে দেখতাম।"

"সন্দীপনই বা দেখল না কেন?"

"এটাই তো প্রমাণ করে, গুপ্তধনের ব্যাপারটাই ফক্কিকারি। নইলে সন্দীপন যতই ডায়ালগ ঝাড়ুক, ট্রাই একটা নিতই। মীনধ্বজবাবুরা উপকার করেছেন বলে কি সন্দীপনের লোভলালসা সব উবে

গিয়েছে? মুখে বললেই মানতে হবে? মীনধ্বজবাবুরই তো গুপ্তধন থাকতে পারে এই আশায় চোখ চকচক করছিল!"

"আমার আর-একটা কথাও মনে হচ্ছে, বুঝলে মেসো। গুপ্তধনের গুজবটার সূত্র ধরে, একটা হাঙ্গাম-হুজ্জোত বাধিয়ে এবং তার সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারট্যাপার জড়িয়ে কেউ হয়তো মীনধ্বজবাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে!"

"কেন?"

"মীনধ্বজবাবুকে উৎখাত করার জন্যে।"

বুমবুমের খাওয়া শেষ। চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমেও দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে বলল, "উৎখাত মানে কী?"

"উৎখাত হল গিয়ে...।" পার্থ নাক কুঁচকে বলল, "ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে স্থানান্তরীকরণ।"

বুমবুম চোখ পিটপিট করল, "বাংলায় বলো না।"

"বেশ, সরলভাবে বোঝাচ্ছি। ধর, তুই কম্পিউটারে গেম খেলছিস। তোর টুপুরদিদি গিয়ে তোকে ঘেঁটি ধরে তুলে দিল...এটাকেই বলে উৎখাত। ক্লিয়ার?"

বুমবুম মাথা দোলাতে-দোলাতে চলে গেল বেসিনের দিকে।

পার্থ আবার প্রসঙ্গে ফিরল। টুপুরকে বলল, "উৎখাত কেন করবে শুনি?"

"বাড়িটার দখল পাওয়ার জন্যে। কিংবা উনি যাতে বিরক্ত হয়ে বাড়িটা বেচে দিয়ে চলে যান? অনঙ্গমোহন তো জমিবাড়ির দালালি করেন, তাঁরই ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। হয়তো কেনার লোক আছে, বিক্রি হলে অনঙ্গমোহন মোটা কমিশন পাবেন।"

পার্থ চোখ বুজে ভাবল একটুক্ষণ। তারপর দু'দিকে ঘাড় নাড়ল, "না রে, গুপ্তধনের গপ্পো রটিয়ে কাউকে বাড়ি থেকে ভাগানো যায় না। একমাত্র ভূতের ভয়টাই...! তবে সেটাও তো তেমন কাজের

নয়। আই মিন, ওতে মীনধ্বজবাবু চট করে ঘায়েল হবেন না। প্লাস, অঙ্কের টিচার তো, তেমন জুতসই ভুতুড়ে ছাত্র পেলে অঙ্ক কষানো আরম্ভ করবেন।"

টুপুরের খেই হারিয়ে গেল, "আর তো কোনও পয়েন্ট মাথায় আসছে না মেসো। করুণা, অনঙ্গমোহন, সন্দীপন, যাকেই সন্দেহ করি না কেন, একটা লাগসই মোটিভ তো চাই।"

"পাবি না।" পার্থ খিকখিক হাসল, "বললাম তো, কেসটা পুরো ফাঁপা। তোর মাসিকে লাট খাইয়ে ভেল্টুবাবু এবার ড্যাং-ড্যাং কাঁসর বাজাবেন।"

মিতিন একভাবে খেয়ে যাচ্ছে। একটিবার ঘাড় তোলারও নাম নেই। টুপুর করুণ মুখে বলল, "ও মাসি, কিছু একটা বলো না!"

বহুক্ষণ পর মিতিনের স্বর ভেসে উঠল, "দাঁড়া, আগে তোর মেসোর বোলচাল খতম হোক।"

"বেশ, আমি চুপ করলাম।" পার্থ যেন উসকাল, "এবার তুমি চালু হও।"

"নাঃ, তেমন বলার কিছু নেই। আমি শুধু দু'-একটা ব্যাপার ভাবছি।"

"কীরকম?"

"খুঁড়ে মাটি মেলে, বোজাতেও মাটি লাগে।"

"মানে?"

মিতিন মুখ তুলল এবার। চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, "পাপ কাকে বলে?"

"অন্যায় কাজকে। অমানবিক কাজকে।"

"রাইট। এখন বলো, উচ্চতা কি মিলছে? কিংবা দৈর্ঘ্য?"

"কীসের?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য।" মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "কাল আমাদের দ্বিতীয় অভিযান। প্রস্তুত হও টুপুর!"

সকাল ন'টার মধ্যে মিতিন স্নানটান সেরে তৈরি। মাসির তাড়া খেয়ে টুপুরও। পার্থ আজ অভিযানে অংশ নিতে পারছে না। প্রেসে বিস্তর কাজ আছে, কাকে-কাকে যেন জিনিস ডেলিভারি দিতে হবে। মুখে যতই টিপ্পনী কাটুক, আজও তার নুরপুর যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বাসনায় জল পড়ে যেতে সে যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধ।

শেষ মুহূর্তেও পার্থ একবার বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করল, "কাল পনেরোই অগস্ট, কালই চলো না। ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ব। বুমবুমকেও নেব সঙ্গে। চমৎকার একটা আউটিং হয়ে যাবে।"

প্রস্তাবটা আমলই দিল না মিতিন। সরাসরি বলল, "আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না স্যার। তা ছাড়া, এখন একটা দিনও আমি নষ্ট করতে রাজি নই।"

"দিন তো তোমার এমনিতেই নষ্ট। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে বেড়ানোই তো অর্থহীন।" মিতিনকে নিরস্ত করতে না পেরে পার্থর পুটুস হুল। পরক্ষণেই স্বরে উপদেশ, "যাক গে, সাবধানে যেয়ো। গাড়িতে তেল বেশি নেই, ট্যাঙ্কি ভরে নিতে ভুলো না যেন!"

"আমরা তো গাড়ি নিচ্ছি না।"

"বাসে যাচ্ছ নাকি? ঝাঁকুনিতে কোমর খুলে যাবে কিন্তু।"

"তোমাকে টেনশান করতে হবে না। পারলে তাড়াতাড়ি ফিরে বুমবুমকে কোথাও একটা ঘুরিয়ে এনো।" বলেই টুপুরকে নিয়ে মিতিন রাস্তায়। মোড়ে এসে ট্যাক্সি ধরল। সিটে বসে নির্দেশ, "হাওড়া।"

টুপুর অবাক, "ও মা! হাওড়া যাব কেন?"

"আজ রুটটা একটু বদলাচ্ছি। হাওড়ায় ট্রেন ধরে বাগনান, সেখান থেকে গাদিয়াড়া। তারপর জলপথ।"

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! কাল মনে-মনে গাদিয়াড়ার কথা ভাবছিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই আশা পূরণ হতে চলেছে! টুপুর আহ্লাদিত মুখে বলল, "হঠাৎ এই প্ল্যান?"

"দেখতে চাই, অন্যভাবে নুরপুর পৌঁছতে কেমন লাগে।"

অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে মিতিনমাসির, তবে ভাঙতে না চাইলে টুপুরই বা জোরাজুরি করবে কেন? একসময় তো জানা যাবেই, এখন চুপচাপ মিতিনমাসিকে দেখে যাওয়াই ভাল।

বাগনান পৌঁছে একটা অটো নিয়ে নিল মিতিন। হাওড়ার এদিকটায় টুপুর আগে কখনও আসেনি। চারদিক এমনিতেই সবুজ, বর্ষায় ভিজে সেই সবুজ যেন ঝকঝক করছে। পড়ছে ছোট-ছোট গ্রাম, একটু ভিড়-ভিড় জনপদ! এক জায়গায় মেলাও চলছে জন্মাষ্টমীর। রঙিন পোশাকে অনেক কচিকাঁচা জড়ো হয়েছে সেখানে। শেষে বেশ খানিকটা ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে টুপুররা যখন গাদিয়াড়া পৌঁছল, ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা ছুঁইছুঁই।

অটোর ভাড়া মিটিয়েই মিতিন নদীর পাড়ে ছুটল। সামনেই বয়ে যাচ্ছে রূপনারায়ণ। গঙ্গাও বেশি দূর নয়। কাল গঙ্গায় তেমন জল ছিল না, তুলনায় রূপনারায়ণ আজ থইথই। উঁচু পাড় ঢাল হয়ে নেমেছে নদীতে, জলে বাঁধা আছে সার সার নৌকো।

মিতিন পাড় থেকে চেঁচিয়ে এক মাঝিকে ডাকল, "ও দাদা, জোয়ার কতক্ষণ চলবে?"

হাওয়ায় উত্তর ভেসে এল, "আরও ধরুন ঘণ্টাখানেক।"

"ঠিক তো?"

"জলই আমাদের জীবন দিদি। হিসেবে ভুল হয় না।"

এবার যেন মিতিনের ছটফটানি একটু কমল। টুপুরকে বলল, "চল, আগে কিছু খেয়ে নিই।"

কাছেই পরপর বেশ কয়েকটা খাওয়ার হোটেল। বর্ষাকাল বলেই

বোধ হয় ভ্রমণার্থী নেই তেমন, হোটেলগুলো প্রায় মাছি তাড়াচ্ছে। মোটামুটি পছন্দসই দেখে একটায় ঢুকল মিতিন। ইলিশমাছ আর ভাতের অর্ডার দিয়ে কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে লঞ্চঘাট কদ্দুর ভাই?"

"বেশি নয়। জোর হাফ কিলোমিটার।"

"ওখান থেকে কি নৌকো পাওয়া যাবে?"

"নদীতে ঘুরবেন? সামনে থেকেই নৌকো নিন না। চেনা মাঝি আছে, বলে দিচ্ছি। আপনাদের মায়াচর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনবে।"

"না গো। আমরা নৌকোয় নুরপুর যাব।"

শুধু টুপুরই নয়, ছেলেটিও এবার যথেষ্ট বিস্মিত। হাতের কাছে লঞ্চ মজুত, তবু নৌকোয় নুরপুর যেতে চায়, এমন যাত্রী বোধ হয় বড় একটা দেখেনি সে। তাও বাড়তি কৌতূহল না দেখিয়ে ছেলেটি বলল, "তা হলে অবিশ্যি লঞ্চঘাটে গিয়েই নৌকো খোঁজা ভাল। ওদিক দিয়ে নুরপুর কাছে হবে।"

"এখান থেকেও নিতে পারি, যদি নুরপুরের কোনও নৌকো মেলে। মানে, যার মাঝি ওদিকেই থাকেন?"

"তেমন কাউকে পাব কি?" ছেলেটা একটুক্ষণ ভাবল, "ঠিক আছে, আপনারা ততক্ষণ খান, আমি দেখছি।"

হ্যাঁ, মিলেছে একজন। সুস্বাদু ইলিশের ঝাল আর গরম-গরম ভাতে পেট টইটম্বুর করে ভোজনালয় থেকে বেরিয়ে টুপুর দেখল, এক বুড়োমতো লোক প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। নুরপুরেরই বাসিন্দা, নাম সনাতন।

মিতিন তো মহাখুশি। বলল, "আমরা কিন্তু সোজা নুরপুর ঘাটে যাব না। আগে গঙ্গা থেকে ভাল করে নুরপুরটা দেখব।"

সনাতন বললেন, "যেমন আপনাদের ইচ্ছে।"

নৌকো থেকে সরু কাঠের তক্তা পেতে দিলেন সনাতন। ঢাল

বেয়ে নেমে, তক্তায় পা রেখে, সন্তর্পণে নৌকোয় উঠল টুপুর-মিতিন। পাটাতনে বাবু হয়ে বসার পর সনাতন নৌকো ছাড়লেন। এখনও জোয়ার চলছে, স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে নৌকো, কসরত করে এগোতে হচ্ছে সনাতনকে। বইঠা বাইছে এক ষোলো-সতেরো বছরের তরুণ, সনাতন হাল ধরেছেন।

আস্তে-আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে গাদিয়াড়া। টুপুর দু' চোখ মেলে তীরভূমিটা দেখছিল। পারের কাছে হাঁটুজলে কী যেন হাতড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল। সকলেরই কোমরে গামছা, জল থেকে কিছু তুলে খপাখপ পুরছে গামছায়।

টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, "ওরা কী ধরছে গো মাঝিদাদা?"

"মীন গো দিদি।"

"মানে মাছ?"

"উঁহু, মাছের চারা।" মিতিন হেসে বলল, "জোয়ারের জলে অজস্র কুচিকুচি মাছ ভেসে আসে। পোনাগুলো ধরে ভেড়ির লোকদের বেচতে পারলে এদের টু পাইস ইনকাম হয়। কত মানুষ এই মীন ধরেই জীবিকানির্বাহ করছে। চিংড়ির বাচ্চাতেই রোজগার সবচেয়ে বেশি।"

"বড় কষ্টের জীবন গো দিদি। দু'টো পয়সা আয় করতে মানুষের ঘাম ছোটার জোগাড়।" সনাতন মাথা দোলালেন, "তা, তোমরা বুঝি গাদিয়াড়া বেড়াতে এসেছিলে?"

"ওই আর কী।" মিতিনই বলল, "যাব নুরপুর। একবার গাদিয়াড়া ছুঁয়ে গেলাম।"

"এখানকার কেল্লাটা দেখেছ?"

"আজ হয়ে উঠল না।" মিতিন টুপুরের দিকে ফিরল, "জানিস তো, গাদিয়াড়ায় লর্ড ক্লাইভের একটা দুর্গ আছে। উঁহু, ছিল। ফোর্ট মর্নিংটন। ব্রিটিশরা বহুকাল আগেই দুর্গটা পরিত্যাগ করে। নদীর বাঁকে

প্রায় হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকত দুর্গটা। উনিশশো বিয়াল্লিশের বন্যায় প্রায় চুরমার হয়ে যায়। এখন ওটা শুধুই ধ্বংসস্তূপ।"

কথায়-কথায় রূপনারায়ণ আর গঙ্গার সঙ্গমস্থল এসে গিয়েছে। দু'টো নদনদীর ধারাকে দিব্যি চিহ্নিত করা যায়। যেখানে নদনদী দু'টো মিশেছে, সেখানে স্রোতটাও কেমন এলোমেলো। ঘূর্ণিতে নৌকো প্রায় পাক খেয়ে যাচ্ছিল। দক্ষ হাতে সামলে নিলেন সনাতন। এবার ভাগীরথী বেয়ে চলেছেন। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে নুরপুর, কাছে আসছে। পশ্চিমে দামোদর নদও দৃশ্যমান। ভাগীরথী যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার খানিক আগে দামোদরের মোহনা।

হঠাৎই টুপুরের নজরে পড়ল, তীব্রবেগে ধেয়ে আসছে একটা স্পিডবোট। ডায়মন্ডহারবারের দিক থেকে। ভাগীরথীকে চিরে শাঁ শাঁ ঢুকে গেল রূপনারায়ণে। উথলে ওঠা ঢেউ এসে ছলাৎ ধাক্কা মারল টুপুরদের নৌকোয়, টলমল দুলে উঠল তরণী। ঝলক জলও ছিটকে এল টুপুরদের মুখে-চোখে।

সনাতন বিরক্ত মুখে বললেন, "এই এক কায়দা হয়েছে। আজকাল বোটগুলোর ছোটাছুটির কোনও বিরাম নেই।"

স্পিডবোটটাকে চোখ কুঁচকে দেখছিল মিতিন। বলল, "সংখ্যায় এরা বুঝি বেড়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ গো দিদি। সময় নেই, অসময় নেই, সারাক্ষণ দাপাচ্ছে। রাতেও তো চরে বেড়ায়।"

"ওগুলো কাদের বোট? পুলিশ?"

"না গো। পেরাইভেট পার্টির। আমোদ-ফুর্তি করতে আসে নদীতে।" সনাতন হাল সামান্য ঘোরালেন, "তোমরা নুরপুরঘাটেই নামবে তো?"

"এক্ষুনি নামছি না।" মিতিন ফের গুছিয়ে বসল, "আগে নুরপুরের আশপাশটা একটু ঘুরে-ঘুরে দেখি।"

"নুরপুরে দেখার কী-ই বা আছে গো দিদি! ওই এক লাইটহাউস, আর বাঁধের মুখটায় কন্ধকাটা সাহেব-মেমসাহেবের সমাধি। তা, সেই সমাধি দেখতে হলেও তো নৌকো থেকে নামতে হবে। তখন খ্রিস্টানদের অনাথ আশ্রমটাও ঘুরে আসতে পার।"

"গঙ্গার ধারে একটা প্রাচীন বাড়ি আছে বলে শুনেছি?"

"কোনটা? কলকাতার বাবুদের বাড়িটা? যেখানে ক'দিন আগে ধনরত্ন নিয়ে হুলস্থূল হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ গো। ওই বাড়িটাও একবার নদী থেকে দেখব।"

"কেন?"

"এমনিই।"

"বুঝেছি, তুমি খবরের কাগজের লোক।" হঠাৎ যেন গোপন কিছু আবিষ্কার করে সনাতনের চোখ জ্বলজ্বল, "বেশ তো, চলো। একদম ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

জোয়ার শেষ, জল এখন প্রায় স্থির। নৌকো চলেছে নিন্হো অভিমুখে। সনাতনের সহকারী কিশোরটি বইঠা টানছে ছপাৎ-ছপ। হঠাৎ উৎসাহিত মুখে চেঁচিয়ে উঠল, "হুই বাড়িটা দেখা যায়।"

টুপুরেরও গোচরে এল। অস্ফুটে বলল, "বাড়িটা নদী থেকে কতটা উঁচুতে গো মিতিনমাসি!"

ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ছোট্ট বাইনোকুলার বের করল মিতিন। চোখে লাগিয়ে বলল, "হুঁ, একটু বেশি উঁচুতে।"

"হাইটের জন্যই কি বাড়িটা গঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে?"

"হতে পারে।" বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখেই মিতিন সনাতনকে জিজ্ঞেস করল, "ও বাড়ির কারওর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি?"

"একজনকে তো নুরপুরের সবাই চেনে। পুরুতমশাই। বড় অমায়িক মানুষ গো! সবার সঙ্গে গপ্পো করে।"

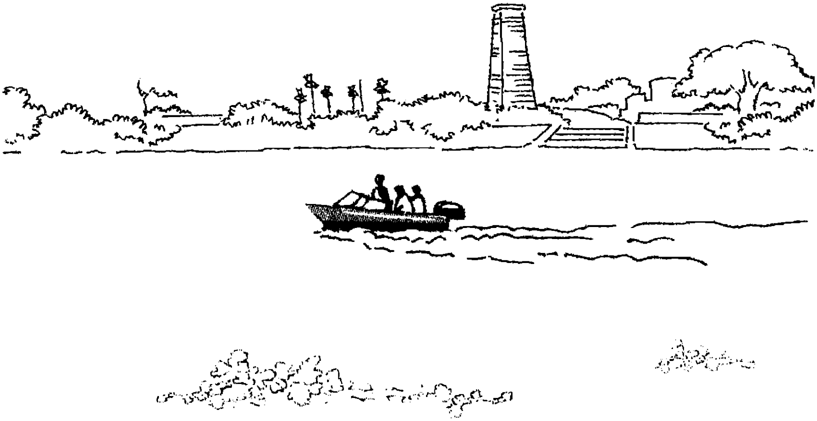

"ও বাড়ির ইতিহাস কিছু জানা আছে?"

"বড় মানুষদের ঘরের কাহিনি আমরা গরিবগুরবোরা কোত্থেকে জানব দিদি? তবে দেশে-ঘরে তো অনেক উপাখ্যানই বাতাসে ভাসে। শুনেছি, যে–সাহেবের কাছ থেকে বাবুরা বাড়িটা কেনেন, তিনি মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না।"

"কীরকম?"

"সাহেব নাকি খুব অত্যাচারী ছিলেন। দলবল নিয়ে যেই না গাঁয়ে ঢুকতেন, অমনি লোকে দুদ্দাড়িয়ে পালাত। কচিকাঁচারা এত ভয় পেত যে, একবার দৌড় লাগালে আর ঘরেই ফিরত না।"

"তা অত্যাচারটা কী করতেন?"

"অত বলতে পারব না। লুঠপাট চালাতেন বোধ হয়।"

"কলকাতার বাবুরা নিশ্চয়ই সেরকম নন?"

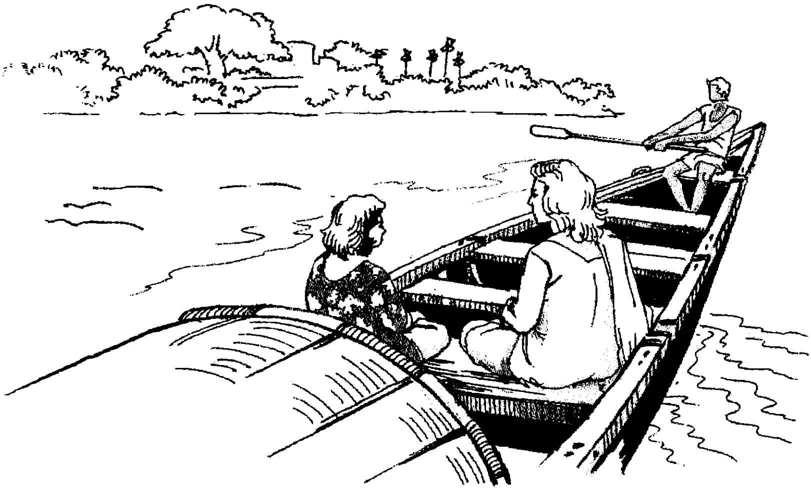

"তেমন কোনও বদনাম কানে আসেনি। ওঁরা তো আর থাকেনও না। তবে ইদানীং নাকি এক বাবু এসে রয়েছেন।"

নৌকো পৌঁছে গিয়েছে বাড়ির একদম কাছে। কালকের কাদা-ভরা তীর জলে থইথই। লকগেট পর্যন্ত চলে গিয়েছে জল। লোহার দরজার অন্তত ফুটপাঁচেক এখন জলের তলায়।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মাঝিভাই, লকগেটটা কি পুরোপুরি ডোবে কখনও?"

"খুব কম। বছরে জোর এক-আধদিন। ওই...বড় বান-টান এলে।"

"তখন কি লকগেট এরা খুলে দেয়?"

"কই আর? বন্ধই তো আছে বরাবর।"

"কখনও খুলতে দেখেননি? ভাল করে স্মরণ করুন।"

"না গো দিদি। কম করে পঞ্চাশ বছর নৌকো বাইছি, গেট কখনও খোলা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। তবে সামনেটা কাদা জমে একেবারে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, পরিষ্কার করার পর চেহারা ফের খোলতাই হয়েছে।"

"কবে পরিষ্কার হল?"

সনাতন একটু ভেবে বললেন, "তা এক বছর তো হবেই। গত জষ্টিতে। জল তখন অনেক কম ছিল নদীতে। দশ-বারোটা শ্রমিক তিনদিন ধরে কাদাটাদা ছাড়াল। সেই মাটি গেল পাশে রতনবাবুর ইটভাঁটায়।"

অলস গতিতে দুলে-দুলে বাড়িখানা পেরোল নৌকো। অল্প একটু এগিয়ে মিতিন বলল, "এখানেই পাড়ে নৌকো ভেড়ানো যায় না মাঝিভাই?"

"কেন, ঘাটে যাবেন না?"

"থাক। অদ্দুর আর টানার দরকার নেই। আবার পিছনে যাওয়া...!"

"তবে রতনবাবুর ঘাটেই বাঁধি?"

"সে আপনার যেমন সুবিধে।"

নৌকো থেকে নেমে সামান্য অস্বস্তিতে পড়ে গেল টুপুর। ইটভাঁটার কর্মীরা কাজ থামিয়ে হাঁ করে দেখছে তাদের। দু'জন ফিটফাট শহুরে মহিলা নদীপথে এসে ইটভাঁটায় অবতরণ করছে, এমন দৃশ্য তাদের কাছে বোধ হয় অভাবনীয়।

মিতিনের ভ্রুক্ষেপ নেই। সনাতনের টাকা মিটিয়ে উঠল পাড়ে। গায়েই মীনধ্বজদের পাঁচিল, চলল তার গা ঘেঁষে। তিরিশ-চল্লিশ পা গিয়ে থামল হঠাৎ। ঝুঁকে মাটি থেকে দু'খানা জীর্ণ পলিথিনের বস্তা তুলল। ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। বস্তা দু'টো দেখল উলটে-পালটে।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আছে গো এতে?"

মিতিনের ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি, "মাটি!"

"তা ইটভাঁটায় তো মাটিই থাকবে।"

মিতিন আর কিছু বলল না। মাথা নিচু করে হাঁটছে ফের। ইটভাঁটার সীমানা পেরিয়ে উঠল বাঁধের রাস্তায়। বাঁয়ে ঘুরে মীনধ্বজদের গেটে গেল।

মোবাইল ফোনে ডাক দিতেই মীনধ্বজ সশরীরে হাজির। ব্যস্তভাবে বললেন, "এ কী, আজ আবার আসছেন, জানাননি কেন?"

মিতিন একগাল হাসল, "সারপ্রাইজ ভিজিটের মজাই আলাদা।"

গেট খুলে মীনধ্বজ ইতিউতি তাকালেন, "আপনাদের গাড়ি কোথায়?"

অম্লানবদনে মিথ্যে বলল মিতিন, "আজ বাসে এলাম।"

পাক্কা বারো ঘণ্টার সফর সেরে টুপুর আজ কুপোকাত। ওঃ, একখানা দিন গেল বটে! সেই সকালে রওনা দিয়ে গাদিয়াড়া হয়ে নুরপুর, তারপর মীনধ্বজবাবুর বাড়ি ঘণ্টাতিনেক নানান অনুসন্ধান চালাল মিতিনমাসি। টুপুরকেও শাগরেদি করে যেতে হল। শেষে সত্যি-সত্যি বাস ধরে প্রত্যাবর্তন। একই দিনে ট্যাক্সি, ট্রেন, অটোরিকশা, নৌকো, বাস—শুধু উড়োজাহাজটাই যা হয়নি। বাসেই ধকল গেল সবচেয়ে বেশি। বড্ড টিকুর-টিকুর চলে, একবার দাঁড়ালে আর নড়তেই চায় না। নুরপুর থেকে তারাতলা প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিয়ে

দিল! তারাতলায় ট্যাক্সি নিয়ে টুপুর যখন ঢাকুরিয়া পৌঁছল, তখন সব দম নিঃশেষ।

পার্থ আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে। আরতিকে ছুটি দিয়ে নিজেই বানিয়েছে রাতের খানা। আলুর দম, চিকেন-ভর্তা আর পরোটা। বুমবুমকে খাইয়েও দিয়েছে সময়মতো। টুপুর-মিতিনের বিধ্বস্ত দশা দেখে বুঝি মায়া জাগল, ঝটাপট সাজিয়ে ফেলল টেবিল। টুপুরকে বলল, "আয় রে, ওস্তাদ শেফের হাতের রান্না খেয়ে আজ তোদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক।"

চিকেন-ভর্তাটা পার্থমেসো ভালই বানায়, আগেও খেয়েছে টুপুর। আলুর দমটাই তাই চাখল প্রথমে। জিভে ঠেকিয়েই বলল, "দারুণ! নারকোল তো দিয়েছ, সঙ্গে পোস্ত আছে মনে হচ্ছে?"

"ইয়েস। এটা মুঘলাই আলুর দম। জানিস তো, মুঘলদের সব খানাতেই অল্পবিস্তর পোস্ত থাকত?"

"আমি তো জানতাম আফগানিস্তানে খুব পোস্তর চাষ হয়।"

"আরে, সেই জন্যই তো! মুঘলরা কোন রাস্তা দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল, অ্যাঁ? বাবর তো অরিজিনালি কাবুলেরই রাজা ছিলেন।" পার্থ মুখে একটা গাম্ভীর্য ফোটাল, "যাক গে, আজ তোদের এক্সপিডিশন কেমন হল বল?"

সংক্ষেপে বর্ণনাটা সারল টুপুর। নৌকোয় বসে লকগেট দর্শন, ইটভাঁটা হয়ে মীনধ্বজদের গৃহে প্রবেশ, মীনধ্বজ-করুণা-অনঙ্গমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব, খোঁড়াখুঁড়ির জায়গাটা আবার পর্যবেক্ষণ, বেসমেন্টে মিতিনমাসির উত্তেজিত পদচারণা, বেরনোর মুখে সন্দীপনের সঙ্গে ঝলক মোলাকাত—সবই বলল আলগা-আলগা ভাবে। শুধু ইলিশ ভক্ষণটাই চেপে গেল, পাছে পার্থমেসো দুঃখ পায়।

কথার মাঝেই মিতিনও স্নান সেরে হাজির। চিকেনটা শুঁকল

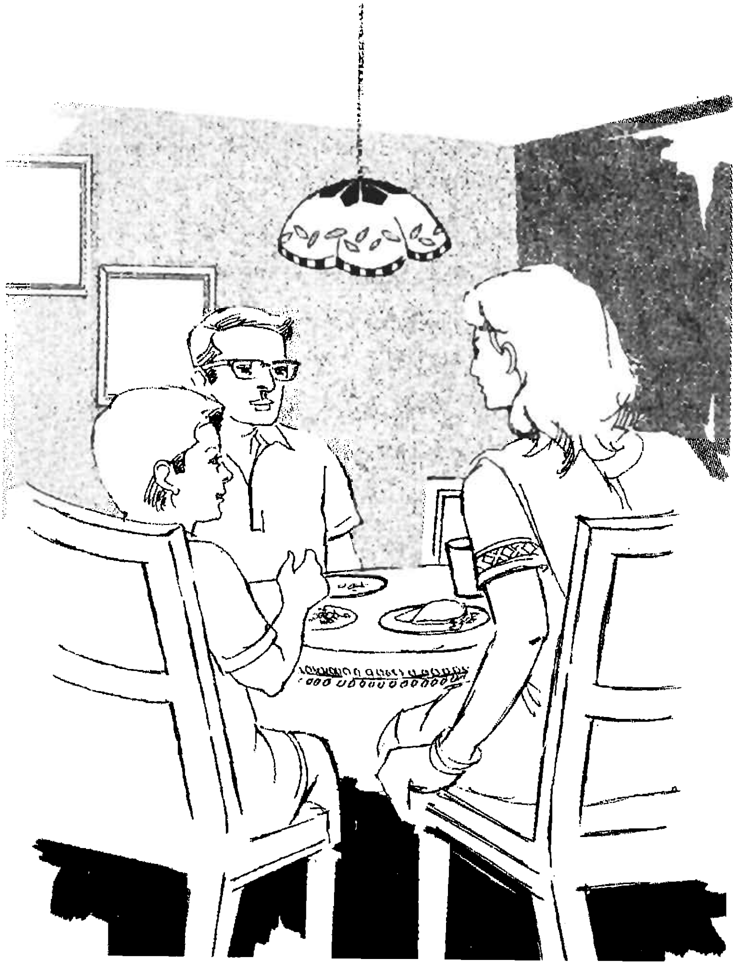

একটু, তারপর একখানা পরোটা আঙুলে ঝুলিয়ে নিরীক্ষণ করল।

পার্থ ভুরু নাচিয়ে বলল, "কেমন দেখছ?"

"ভারতের ম্যাপ হয়নি। মেরেকেটে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র বলা যায়।"

"শুধু শেপটাই দেখলে?" পার্থ রীতিমতো আহত, "কীরকম মুচমুচে হয়েছে দ্যাখো!"

ছোট্ট একখানা টুকরো দাঁতে ছিঁড়ে অনেকক্ষণ ধরে পাকলে-পাকলে খেল মিতিন। অধীর চোখে মতামতের জন্য অপেক্ষা করছে পার্থ। মিনিটদুয়েক পর মিতিনের উদাসীন তারিফ, "ওকে! খিদের মুখে চলে যাবে।"

পার্থ ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "এই তো তোমাদের দোষ। প্রাণ খুলে প্রশংসা পর্যন্ত করতে পার না। রান্নাটা তো ছেলেদের হাতেই বেশি খোলে, এটা মানতেও মেয়েদের আপত্তি!"

মিতিন খিলখিল হেসে উঠল। ওই হাসিই বুঝি বলে দিল, তার সারাদিনের ক্লান্তি কেটে গিয়েছে। গপাগপ খাওয়া সেরে ঝপাঝপ বানিয়ে ফেলল তিনকাপ কফি। টুপুর বিছানায় যাওয়ার উদ্‌যোগ করছিল, তাকে পাকড়াও করে বসাল সোফায়। হাতে গরম কফি ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এক্ষুনি শুলে চলবে? পরীক্ষা দিতে হবে না?"

"কীসের পরীক্ষা?"

"সারাদিন যে সঙ্গে ঘুরলি, কদ্দুর কী বুঝলি শুনি?"

টুপুর ঈষৎ চাঙা বোধ করল। মিতিনমাসি তাকে গুরুত্ব দিলে নিজেকে বেশ ওয়াট্‌সনের মহিলা সংস্করণ বলে মনে হয়। ঠোঁট কামড়ে বলল, "অনেক নতুন তথ্যই ভাঁড়ারে এল আজ। কোত্থেকে শুরু করি?"

"যেখান থেকে খুশি।"

"প্রথমে করুণার প্রসঙ্গে বলি?"

"বল।"

"করুণা আগের দিন জানায়নি মীনধ্বজবাবুর বাড়িতে ওর বরের যাতায়াত আছে।"

"বরের নামটা কী?"

"গোবিন্দ। সন্দীপনবাবু ওকে দিয়েই বাড়ির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করান।"

"সুতরাং বাড়ির চারপাশটা গোবিন্দ ভালই চেনে।" অভিমত ছুড়ে পার্থ কফি নিয়ে বলল, "তাই তো?"

"অবশ্যই। আর সেই কারণেই অন্ধকারে খোঁড়াখুঁড়ির স্পটটা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়। অতএব পরেরবার যে দু'টো লোক হানা দিয়েছিল, গোবিন্দ তাদের একজন হলেও হতে পারে।"

"হুম।" মিতিন মাথা দোলাল, "তারপর?"

"অনঙ্গমোহনবাবুর ঠাকুরদার বাবা নিন্‌হো-তে বছরকয়েক বাস করেছিলেন। সিংহধ্বজের সঙ্গে তাঁর ভালই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভুজঙ্গমোহন ছিলেন একজন জ্যোতিষী, অনেক ব্যাপারেই সিংহধ্বজ তাঁর পরামর্শ মেনে চলতেন। সিংহধ্বজকে পাকাপাকি বসবাসের দিনটা তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওখানে প্রবেশের আগে সিংহধ্বজের মৃত্যু হয়।"

পার্থ ফোড়ন কাটল, "এই জায়গাটায় একটু প্যাঁচ আছে মনে হচ্ছে!"

মিতিন চোখ নাচিয়ে বলল, "কী প্যাঁচ?"

"সিংহধ্বজের মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয় তো? হয়তো ভুজঙ্গমোহনই তাঁকে...!"

"তুত, গুলিয়ে দিয়ো না তো! সিংহধ্বজ মারা যান বাগবাজারের বাড়িতে। হৃদ্‌রোগে। মোরওভার, ভুজঙ্গমোহন তাঁকে অযথা খুন করবেনই বা কেন?"

"মোটিভ তৈরি করাই যায়।" পার্থ নড়েচড়ে বসল, "যদিও গুপ্তধনের তত্ত্বে আমি এখনও বিশ্বাস করছি না, তবু ধরো, পর্তুগিজ বণিকটি তাঁর সব সোনাদানা নিয়ে যেতে পারেননি। জলদি-জলদি কেটে পড়ার তাড়ায় কিছু হয়তো গোপন জায়গায় রয়েই গিয়েছে। হয়তো সিংহধ্বজ কোনওভাবে সেই স্থানটির সন্ধান পেয়েছিলেন। এবং বিশ্বাস করে ভুজঙ্গমোহনকে বলেও ফেলেছিলেন, অবশ্যই স্থানটির সঠিক অবস্থান না জানিয়ে। ভুজঙ্গমোহন হয়তো তখন ওই বাড়িতেই ছিলেন, অথবা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তিনিই হয়তো লোভে পড়ে সিংহধ্বজকে হত্যা করে...। পরে নিজেও তিনি ওই গুপ্তধন খুঁজে পাননি। তাই মরার আগে ছেলেকে গল্পটা বলে যান। সেই ছেলে বলেন তাঁর ছেলেকে...। এভাবেই হয়তো বংশপরম্পরায় কাহিনিটি চলছে। অনঙ্গমোহনের বাপ-ঠাকুরদা হয়তো রাষ্ট্র করে বেড়াননি, এখন পেটপাতলা অনঙ্গমোহনের দৌলতে সবাই জেনেছে।"

"খুবই কষ্টকল্পনা। তবে উড়িয়ে দিচ্ছি না। মাথায় রাখব।" মিতিন কথাটা ভাসিয়ে ফের টুপুরে ফিরল, "আর কী কী জানলি আজ?"

"চোদ্দো মাস আগে লকগেটের কাদা সাফ হয়েছে।"

"আর?"

"লকগেট আদৌ খোলা হয় না। জল বাড়লেও ক্বচিৎ কখনও পুরোটা ডোবে।"

"নেক্সট?"

"সন্দীপনবাবু দায়িত্ব নিয়ে কাদা পরিষ্কারের কাজটা করিয়েছিলেন। তবে তার আগে ফোনে মীনধ্বজবাবুর অনুমতি

নিয়ে নেন। কাদা সরাতে সন্দীপনবাবুর সাত হাজার মতো টাকা খরচ হয়েছিল। আর কাদামাটি বিক্রি করে তিনি আটশো টাকা পান। পাশ বইয়ে হিসেব আছে।"

"হুঁ। তারপর?"

"আর কী?" টুপুর মাথা চুলকোল, "তেমন কিছু তো...!"

"স্মৃতিশক্তিকে আরও প্রখর কর। তোর মেসোর মতো শুধু শব্দজব্দ করে কিস্‌সু হবে না। প্রতিটি ডাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখার একটা প্রসেস আছে। সময়ের উলটো দিকে ধাপে-ধাপে এগোতে হয়। অর্থাৎ দিনের শেষ থেকে ক্রোনোলজিক্যালি শুরুতে যাওয়ার চেষ্টা করবি। প্রথমে শুধু আজকের দিনটা। তারপর আজ আর গতকাল। তারপর আজ কাল পরশু। বুঝলি?"

"হুঁ।"

"এবার বল, মীনধ্বজবাবু আজ কী জানালেন?"

"কী?"

"কানাডার বাড়িটা এখনও বিক্রি করেননি। সেপ্টেম্বর মাসে আবার ওয়াটারলু যাচ্ছেন। তখন বাড়িটাও বেচবেন, ছেলেমেয়ের কাছেও মাস তিন-চার কাটিয়ে আসবেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলেন তো। কিন্তু এই কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

"হয়তো আছে। হয়তো নেই। তবে তথ্যটা তো মাথায় রাখতে হবে।" মিতিন ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল, "আচ্ছা, একটা ব্যাপার তুই লক্ষ করেছিস?"

"কী গো?"

"খুব ইন্টারেস্টিং। পিছনের ফটক থেকে গঙ্গার দিকে মুখ করলে লকগেটখানা বেশ খানিকটা বাঁয়ে।"

পার্থ বলল, "ও তো কালই দেখেছি।"

"আর যে স্পটটা খোঁড়া হয়েছিল, সেটা কিন্তু একদম লকগেটের সোজাসুজি।"

"তাই নাকি? তো?"

"ভাবছি কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক কি একেবারেই নেই?"

"এ তো আমার গল্পের চেয়েও আষাঢ়ে কল্পনা ম্যাডাম ডিটেকটিভ।" সুযোগ পেয়ে পার্থ একটু খোঁচা দিয়ে নিল, "ভুতুড়ে শব্দ-টব্দের ব্যাপারে আর এগোতে পারলে? কাল আর নতুন কিছু ঘটেছে?"

"নাঃ। ডিটেকটিভ দেখলে ভূতরা তফাতে সরে যায়। সাপে-নেউলে সম্পর্ক তো!"

টুপুর হেসে ফেলল। মীনধ্বজদের বাড়ির একটা দৃশ্য মনে পড়ল হঠাৎ। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, তুমি বেসমেন্টে তখন ওভাবে হাঁটছিলে কেন? প্যাসেজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পা গুনে-গুনে যাচ্ছ, ফিরছ? বেসমেন্টের চাতালে নেমেও ঘাড় উঁচিয়ে ঘর তিনখানা বারবার করে দেখছিলে?"

"নির্মাণের কারিকুরিটা বুঝতে চাইছিলাম।" কপালে টকটক টোকা মারল মিতিন। ঝপ করে তর্জনী তুলে বলল, "ওয়ান মোর থিং। মীনধ্বজবাবুর বাড়ি আর রতনবাবুর ইটভাঁটার মাঝের পাঁচিলটা কিন্তু কমন।"

টুপুর বলল, "হ্যাঁ তো!"

"এবং পাঁচিলের হাইট সাত-আট ফুটের বেশি নয়।"

"তুমি কি বলছ চোর দু'টো ওই পাঁচিল ডিঙিয়েই গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল?"

"কীসের সন্ধানে এসেছিল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে স্পটটায় পৌঁছনোর ওটাই সহজতম রুট। নয় কি? আর পালানোর সময় তো দৌড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে, হাত পনেরো-বিশ সাঁতার কেটে, ইটভাঁটায় উঠে হাওয়া মারা যায়।"

"ওঃ, তোমাদের গবেষণা এবার থামাবে?" পার্থ কফির কাপ সিঙ্কে রেখে এসেছে। লম্বা হাই তুলে বলল, "যেখানে গুপ্তধনই নেই, সেখানে কে ঢুকল, কে বেরোল, কে খুঁড়ল, কে পালাল, তাতে কী যায় আসে? সবই তো মিনিংলেস।"

"গুপ্তধন মানে কি শুধু সোনাদানা আর মোহর?" মিতিন পালটা প্রশ্ন হানল, "অন্য কিছু কি হতে পারে না?"

"দুনিয়ায় আর কী বহুমূল্য আছে ম্যাডাম?"

"সেটাই তো ঠাহর করার চেষ্টা করছি।"

"চালিয়ে যাও।" পার্থ আবার হাই তুলল, "আমি শুতে চললাম।"

"এই দাঁড়াও, দাঁড়াও। কথা আছে।" মিতিন তাড়াতাড়ি পার্থকে আটকাল, "তোমার বন্ধু অরুণাভ পুরনো নিউজপেপার জমায় না?"

"ওটাই তো ওর রিসার্চের টপিক। ভারতের সংবাদমাধ্যমের ক্রমবিকাশ। অরুণাভ তো হিকির গেজেটেরও ফটোকপি রেখেছে।"

"গুড। কাল তো ছুটি, সকালে ওর বাড়ি গিয়ে পুরনো দিনের নিউজ একটু ঘেঁটে এসো তো। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে অল্‌মিডা নামের কোনও ব্যবসায়ী...!"

"বলতে হবে না, বুঝে গিয়েছি।" পার্থ তৃতীয় হাইটি তুলল। ঘরে যেতে-যেতে বলল, "ডোন্ট ওরি, কিছু যদি থাকে, ঠিক জোগাড় করে আনব।"

পার্থ চলে যাওয়ার পরও মিতিন বসে থাকল চুপচাপ। টুপুরেরও ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু মিতিনমাসিকে ছেড়ে উঠতে পারল না। কী ধরনের গুপ্তধনের কথা ভাবছে মিতিনমাসি? কোনও যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা? হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন পুঁথি? অথবা বিখ্যাত শিল্পীর দুষ্প্রাপ্য কোনও ছবি? কিন্তু সেসব কি মাটিতে পুঁতে রাখা

সম্ভব? এক, যদি কোনও বাক্সে পুরে...। অল্‌মিডার সময় থেকেই কি রাখা আছে? নাকি শিখিধ্বজ বা সিংহধ্বজ...?

ভাবনাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ মিতিনমাসির গলা, "আমার মোবাইলটা নিয়ে আয় তো।"

"এত রাতে কাকে ফোন করবে গো?"

"আমাদের ভেল্টুদাকে। গেঁওখালির যে ছেলে দু'টো ধরা পড়েছিল, তাদের একটু ট্রেস করতে চাই।"

"কেন? ওরা আর কী কাজে লাগবে?"

"কিছু কি বলা যায় রে! হয়তো ওরাই এই রহস্যের মিসিং লিংক।"

অর্থটা ঠিকঠাক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না টুপুর। কোন মিসিং লিংকের কথা বলছে মিতিনমাসি?

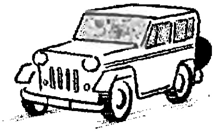

স্বাধীনতা দিবসের সকালে মনমেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকে টুপুরের। ঘুম ভাঙে প্রভাতফেরির আওয়াজে, ড্রাম বাজাতে-বাজাতে পাড়া পরিক্রমা করে ক্লাবের ছেলেমেয়েরা। কানে আসে দেশাত্মবোধক সংগীতের সুর, সমবেত গানের মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। টুপুরও বেরিয়ে পড়ে চটপট। পাড়ায় জাতীয়পতাকা উত্তোলনের পর সোজা স্কুল। সেখানে একটা অনুষ্ঠান হয় ফি বছর। গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক। ফাংশন শেষে লুচি-বোঁদের প্যাকেট সাবাড় করতে-করতে হল্লাগুল্লার আনন্দও নেহাত কম নয়।

তা এ বছর তো টুপুর মাসির বাড়িতে। রুটিনটাও তাই অন্যরকম। ভোরবেলা ফিটফাট হয়ে বুমবুমদের স্কুলে গেল টুপুর। ভাইয়ের খুদে গার্জেন বনে। সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরে দেখল, পার্থমেসো নেই। আরতিদি যথারীতি কাজে ব্যস্ত, আর অস্বাভাবিক গম্ভীর মিতিনমাসি সোফায় আসীন।

টুপুর চোখ নাচিয়ে বলল, "কী গো, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-তে প্যাঁচার মতো মুখ কেন?"

ভারী গলায় মিতিন বলল, "কেসটা বড্ড তাড়াতাড়ি পেকে গেল রে।"

"মানে?"

"মীনধ্বজবাবুর ফোন এসেছিল। কাল রাতে ও বাড়িতে আবার একটা ইন্সিডেন্ট ঘটেছে।"

"কীরকম?"

"রাত তিনটে নাগাদ মীনধ্বজবাবু বাথরুম যাওয়ার জন্য উঠেছিলেন। তখনই হঠাৎ শব্দ পেয়ে জানলা দিয়ে দেখেন, পিছনের গেট টপকে জনাপাঁচেক লোক ঢুকছে বাড়িতে। জানলা থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন মীনধ্বজবাবু, লোকগুলোও তৎক্ষণাৎ সটকান দেয়। চটপট চাতালে নেমে মীনধ্বজ দেখেন, একটা স্পিডবোড বিকট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বাঁয়ে, মানে ডায়মন্ডহারবারের দিকটায়।"

টুপুর স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। বিড়বিড় করে বলল, "কী সাংঘাতিক কাণ্ড!"

"হুম।"

"লোকগুলো ডাকাতটাকাত নাকি? গুপ্তধনের খবর পেয়ে চড়াও হয়েছিল?"

"অনেকটা সেরকমই লাগছে বটে। তবে...।" মিতিন একটুক্ষণ

চুপ থেকে বলল, "যদি ডাকাতই হয় তো দুদ্দাড়িয়ে পালাবে কেন? ওই নির্জন জায়গায় মীনধ্বজবাবু গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। আর একটা ছেষট্টি বছরের লোককে মেরেধরে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে চলে যাওয়া ডাকাতদের পক্ষে কী এমন কঠিন?"

"তা হলে কি ওরা চোরটোরই...?"

"চোর-ছ্যাঁচোড় কি দলবেঁধে আসে রে? তাও আবার স্পিডবোট নিয়ে?"

"ডাকাতও নয়, চোরও নয়, লোকগুলো তা হলে কী? নিশ্চয়ই ওরা রাত তিনটেয় নিন্‌হোর চাতালে আড্ডা জমাতে আসেনি?"

"হুঁ, ওদের উদ্দেশ্যটাই তো ভাবছি।"

"আমি কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মানতে পারছি না মিতিনমাসি।"

"কী?"

"কেন যে মীনধ্বজবাবু জেদ করে একা-একা আছেন? সন্দীপনবাবু বাড়িতে থাকলে কত সুবিধে হয়।" বলেই টুপুর একটু দম নিল, "অবশ্য দলবেঁধে এলে ওঁরা দু'জনেই বা কী করবেন?"

"বটেই তো। তবে মীনধ্বজবাবু এবার খুব ঘাবড়েছেন। সকাল হতে না-হতেই ডেকেছিলেন সন্দীপনকে। শুনে-টুনে সন্দীপনও নাকি ভীষণ উদ্বিগ্ন। সে নাকি বলেছে, আর কোনও ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। যত শিগগির সম্ভব সে গেটে বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করছে। সামনে-পিছনে, দু'দিকেই।"

"মীনধ্বজবাবু রাজি তো?"

"মনে তো হল পরামর্শটা এবার শুনবেন। আমাকেও জিজ্ঞেস করছিলেন, কী করা উচিত?"

"তুমি কী বললে?"

"সিকিউরিটির বন্দোবস্ত তো যখন-তখন করা যায়। তবে আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছি।"

"কিন্তু এর পর যদি মারাত্মক কিছু ঘটে যায়?"

"উহুঁ, ঘটবে না। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে...!"

মিতিন ঝুপ করে থেমে গেল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিক কী বলছে আর জানা হল না টুপুরের। ঠোঁটে কুলুপ আঁটলে মাসির পেট থেকে কথা বের করা শিবেরও অসাধ্য। তবে ভাবনাচিন্তার একটা জটিল প্রক্রিয়া যে মিতিনমাসির মস্তিষ্কে চালু হয়ে গিয়েছে, তাতে টুপুরের সন্দেহ নেই।

অগত্যা টুপুরের আর কাজ কী, ভ্যাবলার মতো বসে থাকা ছাড়া?

সময় কাটাতে টিভি চালাল টুপুর। ঘুরছে এ চ্যানেল, ও চ্যানেল। বেশিরভাগ চ্যানেলেই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের ঘটা এখন। কোথাও দেশপ্রেমের সিনেমা দেখাচ্ছে, কোথাও গান, কোথাও কুইজ। দূরদর্শনে চলছে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ। জঙ্গি হানার আশঙ্কায় দেশের সর্বত্রই এখন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দু'-চার হাত অন্তর-অন্তর কমান্ডোর প্রহরা। তাদের সতর্ক চোখ ঘুরছে এদিক-ওদিক।

অনুষ্ঠানটার মাঝেই পার্থমেসো ফিরে এসেছে। ঢুকেই টুপুরকে বলল, "তোর মাসিকে আমার ফিজ রেডি করতে বল।"

"কীসের?"

"একটা সকালের মধ্যে এত কিছু ইনফর্মেশন জোগাড় করলাম, তার মূল্য দিতে হবে না?"

মিতিন প্রায় ধ্যানস্থই ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আগে শুনি তো। দেখি কতটুকু কী কাজে লাগে।"

"ব্যবহার করতে পারবে কি না সেটা তোমার সমস্যা। তবে

তথ্যগুলো দারুণ ইন্টারেস্টিং।” ধপাস করে সোফায় বসে একখানা সিগারেট ধরাল পার্থ। পোড়া কাঠি অ্যাশট্রেতে গুঁজে বলল, “নুরপুর ছিল এক পিকিউলিয়ার জায়গা। একদিকে ডায়মন্ডহারবারে ব্রিটিশদের ফোর্ট, এক সময় যার নাম ছিল ‘চিংড়িখালি গড়’। অন্যদিকে ফলতায় ডাচদের দুর্গ, সিরাজদ্দৌলার হাতে মার খেয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য তার আগেই ডাচরা ওই দুর্গ থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। এই দুই দুর্গের মাঝে নুরপুর ছিল হার্মাদদের ঠেক। হার্মাদ মানে জানিস তো টুপুর?”

“জলদস্যু!”

“ইয়েস। স্প্যানিশ শব্দ আর্মাডার অপভ্রংশ হল ‘হার্মাদ’। আর্মাডার অর্থ হল ‘নৌবহর’। তা যাই হোক, দেড়-দু’শো বছর ওই পর্তুগিজ জলদস্যুরা নুরপুরকে সেন্টার করে তাদের লুঠপাট চালাত। এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষের দিকে ব্রিটিশরা তাদের হঠিয়ে দেয়। তবে এক-দু’জন ব্রিটিশদের সঙ্গে ভাবটাব জমিয়ে রয়ে গিয়েছিল নুরপুরে। সেই রকমই এক হার্মাদ বেসিল ডি অল্‌মিডা ওখানে একটা নতুন ব্যবসা ফেঁদে বসে। খুব অভিনব নয় অবশ্য, এই কাজ তারা ভারতবর্ষে আগেও করেছে। ভারতের বাইরেও। হঠাৎ-হঠাৎ গ্রামে হানা দিয়ে ছেলে-বুড়ো-জোয়ান যাদেরই হাতের কাছে পেত, তুলে এনে বিদেশে চালান করত দাস হিসেবে। বেসিল প্রধানত এদের পাচার করত ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ওখানকার গায়না, ত্রিনিদাদ, অনেক জায়গাতেই তখন ব্রিটিশ শাসন। ওইসব ব্রিটিশরাই কিনে নিত লোকগুলোকে, তাদের দিয়েই বানাত বাড়িঘর রাস্তাঘাট।”

মিতিন বলল, “বাজে কথা ছেড়ে পয়েন্টে এসো।”

“আরে বাবা, আসছি তো।” পার্থ ছাই ঝাড়ল, “কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতের ভার নেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবসাটি রমরমিয়ে চলেছে।

তারপর ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এই দাস-চালান নিয়ে খুব ঝড় ওঠে। অগত্যা ব্যবসাটাও শেষমেশ বন্ধ করতে হয়।"

"ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা সম্পর্কে কী জানলে?"

"ওই নামটা পাইনি। বোধ হয় ফ্রান্সিস ছিল বেসিলের ছেলে। ওর সময়েই সম্ভবত ওই পাপ ব্যবসার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।"

"এটা হয়তো মানা যেতে পারে।" মিতিন ঘাড় নাড়ল, "সময়টা মোটামুটি মিলছে। রানি ভিক্টোরিয়া মানে আঠারোশো আটান্ন। তার যদি পনেরো-বিশ বছর পরেও ফ্রান্সিস নুরপুর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে তো এখন থেকে সওয়াশো বছরই হয়। ঠিক কিনা?"

"একদম ঠিক। খাপে-খাপ মিলে যাচ্ছে।"

"আমিও এই লাইনেই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে, এবার আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি।"

"রেখাটি সম্পর্কে অভাজন কি কিছু জানতে পারে?"

"ধৈর্য ধরো মহাশয়। অচিরেই সব প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।"

বলতে-বলতে মিতিন মোবাইলের বোতাম টিপল। রিং-টোন বেজে উঠতেই কানে চাপল খুদে দূরভাষ যন্ত্রটি। ও প্রান্ত বোধ হয় ধরছে না, কেটে দিয়ে আবার চেষ্টা করল। এবারও ব্যর্থ। আস্তে-আস্তে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে মিতিনের। চতুর্থ দফা প্রয়াস চালিয়ে ছেড়ে দিল। মোবাইলটা টুপুরকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একটা দরকারি কল আসতে পারে। ধরে শুনে নিস কথাগুলো।"

"কার ফোন? কী কথা?"

"তুই জানিস।"

মিতিন উঠে বাথরুমে গেল। চোরা একটা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে টুপুর। বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে হল না অবশ্য, মিনিট তিনেকের মধ্যেই মোবাইলে ঝংকার। মনিটরে নামটা দেখেই টুপুর শশব্যস্ত, "হ্যাঁ অনিশ্চয় আঙ্কল, বলুন?"

"মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে ছিল।" ওপারে অনিশ্চয় মজুমদারের ওজনদার গলা, "তোমার মাসির তো পরপর মিস্‌ড কল দেখছি।"

"হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে মাসি আপনার কাছে একটা ইনফর্মেশন চেয়েছিল, সেই ব্যাপারেই...!"

"মাসি এখন কোথায়?"

"স্নানে ঢুকেছে। আপনি আমায় বলতে পারেন।"

"মিস ওয়াটসন?" অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসিটা থামতে প্রায় মিনিটখানেক সময় লাগল। তারপর হঠাৎই ভারী গলায় বললেন, "বেশ, শোনো তা হলে। কাল রাতেই আমি গেঁওখালি থানায় ফোন করেছিলাম। ওরা এখনও ডিটেল জানাতে পারেনি, তবে কিছু ফিডব্যাক দিয়েছে। যে ছেলে দু'টো নুরপুরে ধরা পড়েছিল...একজনের নাম তপন, অন্যজন বোধ হয় সফিকুল...দুই মূর্তিমানই দিনপনেরো হল বেপাত্তা।"

"মানে?"

"মানে গেঁওখালি ছেড়ে কোথাও পালিয়েছে। কোথায় আছে বাড়ির লোকও নাকি ঠিকঠাক বলতে পারেনি।"

"ও।"

"তোমার মাসিকে বোলো, থানায় আমার বলা আছে, ওরা ফিরলেই খবর পাওয়া যাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।"

"তারপর...তোমরা আবার মীনধ্বজদার বাড়ি যাচ্ছ কবে?"

"ঠিক জানি না। মাসি বলতে পারবে।"

"আমাকে টাইম টু-টাইম কেসের ডেভেলপমেন্টটা জানাতে বোলো। আমি কিন্তু একটু চিন্তায় আছি। বেচারা বিদেশ থেকে এসে কী যে গাড্ডায় পড়ল...আমাদের হাতেও ব্যাপারটা ছাড়তে চাইল না!"

আপনমনে আরও একটুক্ষণ গজগজ করে ফোন কাটলেন

অনিশ্চয়। টুপুর বুঝে উঠতে পারল না, অনিশ্চয়ের সমাচারটা ভাল না খারাপ? ছেলে দু'টোকে জেরা না করলে কেসটা এগোতে কি অসুবিধে হবে মিতিনমাসির? ওরাই নাকি মিসিং লিঙ্ক! কিন্তু দু' মক্কেল পালালই বা কোথায়? কেন? অন্য কোনও গুপ্তধনের সন্ধানে পাড়ি দিল নাকি?

টুপুরের বিস্ময় অনেকটাই বুঝি বাকি ছিল। এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে হতাশা তো দূরে থাক, মিতিনমাসি একটু চমকাল না পর্যন্ত! শুধু চোয়াল আরও শক্ত হল, চোখের মণি দু'-এক সেকেন্ড বুঝি স্থির, ব্যস। চুলটুল আঁচড়ে এসে আবার হাতে তুলল মোবাইল ফোন।

এবার মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী। অসম্ভব কেজো স্বরে মিতিন বলল, "গুপ্তধন রহস্য আমি সমাধান করে ফেলেছি। আমার চেকটা রেডি রাখবেন।"

...

"দাঁড়ান, উত্তেজিত হবেন না। যা বলছি আগে মন দিয়ে শুনুন। কাল দুপুর বারোটায় করুণা, সন্দীপন আর অনঙ্গমোহনকে অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকতে বলবেন। তাদের সামনেই আমি সুতোর জটটা খুলব।"

...

"না। এই মুহূর্তে আপনার কিছুই জানার প্রয়োজন নেই। বরং কিছু করণীয় আছে। এখন বাড়িতে ওই তিনজনের কেউ প্রেজেন্ট আছে কি?"

...

"শুধু করুণা? আপনি এক্ষুনি ছুটি দিয়ে দিন। সন্দীপন আর অনঙ্গমোহনবাবুকে ফোনে ইনফর্ম করুন, দু'জনের কারওরই আজ আর আপনার বাড়িতে আসার দরকার নেই। রাধামাধবের পূজার্চনা একদিন বন্ধ থাক। কারণটাও তিনজনকে জানিয়ে দেবেন। বাড়িটা এখন যে অবস্থায় আছে, আমি ঠিক সেই অবস্থাতেই কাল বাড়িটাকে

দেখতে চাই। অতএব কাল দুপুর বারোটার আগে কেউ যেন ও বাড়িতে পা না রাখে। যা বললাম, মুখস্থ করে নিন। অবিকল এই বাক্যগুলোই বলবেন সকলকে। একটি শব্দও বাদ না দিয়ে। গুপ্তধন-রহস্য ফাঁস করার জন্য আমিই যে তাদের ডাকছি, এটাও জানাতে ভুলবেন না।"

...

"আর-একটা কথা। আজ রাত্তিরটা চোখ আর গলাকে বিশ্রাম দিন। আপনার কম্পাউন্ডে কেউ ঢুকলেও টুঁ শব্দটি করবেন না। চেনা অচেনা কাউকে দেখলেও না। ভয় নেই, আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকছে।"

পার্থ আর টুপুর হাঁ করে কথাগুলো গিলছিল। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, কিছুই ঢুকছে না মগজে।

ফোনালাপ সেরে মিতিনের সরাসরি প্রশ্ন, "তোমরা আজ সারারাত জাগতে পারবে?"

পার্থ-টুপুর কোরাসে বেজে উঠল, "আমরা? কেন?"

"নো কোয়েশ্চেন। জবাব চাইছি। পারবে?"

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল পার্থ-টুপুর। কী হেঁয়ালি রে বাবা!

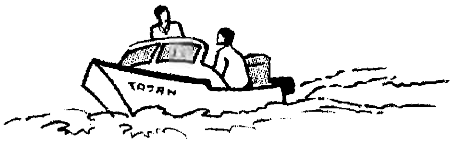

রাত তখন দু'টো দশ। নুরপুরের পথঘাট পুরোপুরি শুনশান। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাদা। একটা জিপ প্রায় নিঃশব্দে উঠে এল বাঁধের রাস্তায়। হেডলাইট না জ্বালিয়ে। নিন্‌হোর খানিক আগে থামল সহসা। পরপর পাঁচটা লোক নামল গাড়ি থেকে। এগোল সতর্ক ভঙ্গিতে।

নিন্‌হোর গেটে এসে সামনের লোকটা একগোছা চাবি বের করল।

ছোট্ট শব্দ, খুলে গেল তালা। ফটক সামান্য ফাঁক করে একে-একে ঢুকে পড়ল পাঁচমূর্তি। প্রত্যেকেরই পায়ে রবার সোলের জুতো, তবু নুড়িপাথরে হাঁটতে গিয়ে আওয়াজ বাজছে মৃদু-মৃদু। গোটা কম্পাউন্ড এখন অন্ধকার। চওড়া বারান্দায় একখানা বাল্‌ব জ্বলছে বটে, তবে তার দ্যুতি সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত যেন পৌঁছচ্ছে না। গাঢ় আবছায়ায় লোকগুলোকে কেমন আধিভৌতিক লাগছে।

অ্যাসবেস্টস ছাওয়া গ্যারাজটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। কিছু শুনল কি? নাকি মনের ভুল? সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল এদিক-ওদিক। মীনধ্বজের গাড়িখানাকে দেখল ঝলক। আস্তে-আস্তে মিলিয়ে এল ভুরুর ভাঁজ, আবার এগোল। সোজা বেসমেন্টের দরজায় পৌঁছে অভ্যস্ত হাতে চাবি ঘোরাল তালায়। হাতের ইশারায় ডাকল সঙ্গীদের। পরপর পাঁচজন সেঁধিয়ে গেল বেসমেন্টে।

দশ মিনিট। কুড়ি মিনিট। তিরিশ মিনিট। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নিঝুম পুরীর গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো। চারজনের মাথায় ভারী কাঠের বাক্স, পঞ্চমজনের কাঁধে বড়সড় এক ঝোলা। সেই ঝোলাধারীই ফের বন্ধ করল বেসমেন্ট।

ঠিক তখনই এক তীব্র আলোর ঝলকানি। পাঁচ সেলের টর্চের জোরালো রশ্মি আছড়ে পড়ল লোকটার মুখে। টর্চের পিছন থেকে মিতিনের গলা গর্জে উঠল, "আপনার কারিকুরি, জারিজুরি, সব শেষ সন্দীপন। উঁহু, একটুও নড়ার চেষ্টা করবেন না। আমার রিভলবার কিন্তু লোডেড এবং আমি টার্গেট মিস করি না।"

ঘটনার আকস্মিকতায় সন্দীপন হতচকিত। দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুবৎ। বাকি চারজন বাক্স ফেলে ফটকের দিকে দৌড়তে যাচ্ছিল, মিতিন এবার তাদের উদ্দেশে হুংকার ছুড়ল, "পালাবার পথ নেই। পুলিশ গোটা বাড়িটাই ঘিরে ফেলেছে। যদি চুপচাপ ধরা দেন তো ভাল, নইলে এক্ষুনি পুলিশ শুট করবে।"

সত্যি-সত্যিই ডজনদুয়েক পুলিশ যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল। কম্পাউন্ডেই গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল তারা। ঝকঝকে চেহারার এক তরুণ অফিসার সপ্রতিভ স্বরে বলল, "এবার তা হলে হ্যান্ডকাফ পরাই ম্যাডাম?"

"এক্ষুনি। একটুও দেরি করবেন না। পাখির বাসা থেকে একটা পাখিও যেন উড়ে যেতে না পারে। আগে পালের গোদাটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধুন। ওর মগজটা শয়তানিতে গিজগিজ করছে। ও কিন্তু ভয়ংকর বিপজ্জনক ক্রিমিনাল।"

"কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না ম্যাডাম।" সন্দীপন গরগর করে বলে উঠল, "ভবিষ্যতে আপনার কপালে খুব বড় বিপদ আছে।"

"নিজের বর্তমানটা তো আগে সামলান। অন্তত দশ বছর জেলের ঘানি তো ঘুরিয়ে আসুন। যদি গরাদের ওপার থেকে বেরোতে পারেন, তখন নয় আবার মোকাবিলা করা যাবে।"

সন্দীপন ফের তড়পে উঠতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার দাবড়ে থামালেন তাকে। হাতকড়া পরালেন। পার্থ-টুপুরও বেরিয়ে এল মীনধ্বজের গাড়ির পিছন থেকে। জুলজুল চোখে দেখল সন্দীপনকে। অস্ফুটে বলল, "কিন্তু ও ব্যাটার ক্রাইমটা কী? বাক্সগুলোয় গুপ্তধন আছে বুঝি?"

"এতক্ষণ কষ্ট করলে, আর-একটু ধৈর্য ধরো। বাড়ির মালিকের সামনেই বাক্স খোলা হোক।"

হ্যাঁ, পার্থ-টুপুর কম কষ্ট করেনি। সেই রাত সাড়ে ন'টায় পৌঁছেছিল ফলতায়। অনিশ্চয় মজুমদারের নির্দেশে একখানা ভুটভুটি তৈরি ছিল ফেরিঘাটে, তাতে চড়ে এগারোটায় নুরপুর। তারপর চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতো পিছনের ফটক টপকে গুটিগুটি পায়ে মীনধ্বজের গ্যারাজ। তখন থেকে টানা তিনঘণ্টা ঘাপটি মেরে বসে ছিল ঢাউস গাড়িটার আড়ালে। ইয়া-ইয়া মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ দাগড়া-দাগড়া, তবু মুখে শব্দটি করার

জো নেই, এতটুকু নড়াচড়াও নিষিদ্ধ। এ যে কী যমযন্ত্রণা! তা যাই হোক, কষ্ট করে কেষ্ট না পাক, সন্দীপন তো মিলেছে। এবার ক্লাইম্যাক্স তো দেখতেই হয়।

মিতিনের ডাক পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছেন মীনধ্বজ। হঠাৎ বাড়িতে এত পুলিশটুলিশ, লোকজন দেখে প্রথমটায় তাঁর কেমন বেভুল দশা। সন্দীপনের হাতকড়াটি পর্যন্ত খেয়াল করেননি। তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলেন, "অ্যাই, কী হয়েছে? এখন এত ভিড় কেন?"

সন্দীপন এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিন হেসে বলল, "ও আপনাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে মিস্টার বাগচী!"

"কেন?"

"এমন মহৎ কাজকর্ম করছিল...আপনার বাড়িটাকে গোডাউন বানিয়ে...!"

"মানে?"

"মানে এই বাক্সগুলোয় আছে। স্বচক্ষেই দেখুন।"

তরুণ পুলিশ অফিসারটি একটার পর-একটা বাক্স খুলছেন। অন্দরের বস্তুগুলোকে দেখে, শুধু মীনধ্বজ কেন, সকলেরই আক্কেল গুড়ুম। ডজন-ডজন রিভলবার! স্বয়ংক্রিয় রাইফেল! খানতিনেক মিনি রকেট লঞ্চার! অজস্র কার্তুজ, শেল, গ্রেনেড! সন্দীপনের ঝোলা থেকেও বেরোল বেশ কিছু জিনিস। দিশি পিস্তল, পাইপগান, গুলি...।

টুপুরের স্বর ঠিকরে উঠল, "এ যে একখানা আস্ত অস্ত্রাগার!"

"সেই জন্যই তো বলছি, উনি মহৎ কর্মে লিপ্ত ছিলেন! বিদেশ থেকে চালান হয়ে আসা অস্ত্র যেসব গুণধরদের মাধ্যমে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, শ্রীমান সন্দীপন তাদেরই একজন। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গও আছে। তপন, সফিকুল, তারপর এই আরও চার পিস...।"

"কী সর্বনাশ! সন্দীপনকে আমি এত বিশ্বাস করতাম...!" মীনধ্বজ

হায়-হায় করে উঠলেন, "আমার বাড়িতে এই কারবার চালাত? কোথায় রাখা ছিল এসব?"

"রাত্তিরবেলাতেই দেখবেন? চলুন তা হলে।"

পাঁচ মক্কেলকে পুলিশভ্যানে তুলে দিয়ে অফিসারটিও মিতিনদের সঙ্গ নিলেন। বেসমেন্টে ঢুকল মিতিন। টর্চের আলো পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ঘর দু'টো পেরিয়ে তিন নম্বরটিতে এসে মিতিন বলল, "আপনি কি জানেন, এ বাড়িতে একটা পাতালপুরী আছে?"

মীনধ্বজ বললেন, "আমরা তো সেখানেই দাঁড়িয়ে।"

"উঁহু, এ তো মর্ত্যধাম। পাতালপুরী আরও নীচে।" অন্ধকারে মিতিনের গলা কেমন অন্যরকম শোনাল, "আমরা এখন পাতালপুরীর খিড়কি দরজায় মিস্টার বাগচী।"

"কই, কোথায় দরজা? ওদিকে তো শুধু বেসমেন্টের চাতালে নামার...!"

"ওটি ছাড়াও এ ঘরে আর-একটি দরজা আছে। আরও নীচে নামার।" বলতে-বলতে মিতিন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বিশাল তৈলচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছবিটাকে ঠেলে বাঁয়ে সরাতেই বেরিয়ে পড়ল এক গহ্বর। অন্ধকারে গর্তটা যেন হাঁ হাঁ করছে।

মিতিন গহ্বরের মুখটায় আলো ফেলল, "আসুন, দেখুন, এখান থেকে কীভাবে লোহার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে! অনেকটা নীচ পর্যন্ত!"

টুপুর বিস্ময়ের প্রান্তসীমায়। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ ফুট নেমেছে ঘোরানো সিঁড়ি! তলায় শুধু আঁধারই আঁধার!

একে-একে সবাই নামছেন সিঁড়ি বেয়ে। খুব সাবধানে। মাঝামাঝি পৌঁছতেই পরপর লোহার বাঙ্ক। একটা-দু'টো নয়, অজস্র। কম করে তিরিশ-চল্লিশটা তো হবেই। সিঁড়ি থেকে বাঙ্কে যাওয়ার রাস্তাও আছে। সরু সরু। তিন-সাড়ে তিন ফুটের বেশি উঁচু নয় বাঙ্কগুলো, কিন্তু অনেকটাই গভীর।

টর্চ মেরে-মেরে বাক্সের ভিতরগুলো দেখছিল মিতিন। বলল, "বেবাক ফাঁকা। সব ক'টা বাক্সই বের করে নিয়েছে।"

মীনধ্বজ হতবাক মুখে বললেন, "বাড়ির তলায় এরকম সাংঘাতিক সব ব্যবস্থা আছে আমি জানতামই না!"

"আপনার বাবা-ঠাকুরদাও অবগত ছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত সিংহধ্বজবাবুই ওই প্রকাণ্ড ছবিটি দিয়ে দরজাটাকে পাকাপাকিভাবে আড়াল করে দেন।"

"কেন?"

"কারণ, এই দরজাই তো একটা কুৎসিত অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করছে।"

"কী হত এখানে?"

"অন্ধকারে দাঁড়িয়েই অন্ধকারের কাহিনি শুনবেন?" মিতিন টর্চের আলো ঘোরাল, "তার চেয়ে চলুন উপরে, আপনার লিভিংরুমে গিয়ে বসি।"

দিনের আলো ফুটতে না-ফুটতে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন অনিশ্চয়। অস্ত্র উদ্ধারের নাম শুনেই প্রায় উড়তে-উড়তে চলে এসেছেন নুরপুরে। দ্রুত ঘুরে এলেন পাতালপুরী। একদম তলা পর্যন্ত সরেজমিন করে উপরে উঠে হাঁপালেন কিছুক্ষণ। তার পরেই গলায় বিলাপ ঝরে পড়ল, "ও হো হো, আর্মস স্মাগলিংয়ের কেসেও আপনি পুলিশকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন?"

মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "কিছু মনে করবেন না অনিশ্চয়দা, পুলিশের যা কর্মতৎপরতা, তাদের কাছে হারা কিন্তু খুব কঠিন।"

"যা খুশি টিজ করে যান! আমাদের তো এখন প্রতিবাদের মুখ নেই।" ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন অনিশ্চয়, "তবে ক্রিমিনালদেরও ব্রেনের তারিফ করতে হয়। জিনিসগুলো রাখার জন্য এমন একখানা জায়গা সেট করেছে...!"

"ওই বাঙ্কগুলো কিন্তু সন্দীপনদের তৈরি নয়। ওগুলোর নির্মাতা তো বেসিল ডি অল্‌মিডা।"

"তিনি কে?"

"ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডার বাবা। ঠাকুরদাও হতে পারেন। ওই ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডার কাছ থেকেই বাগচীপরিবার এই বাড়িটি কিনেছিলেন। বেসিল ডি অল্‌মিডা ছিলেন একজন পর্তুগিজ হার্মাদ এবং দাসব্যবসায়ী। গ্রামগঞ্জ থেকে ছেলেবুড়োদের ধরে এনে ওই অন্ধকূপের মতো বাঙ্কগুলোয় পুরে রাখতেন। জাহাজের খোল ভর্তি করার মতো লোক সংগ্রহ হয়ে গেলেই পত্রপাঠ চালান করতেন সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। বিনিময়ে মিলত ঘড়া-ঘড়া মোহর।"

করুণা এখনও আসেনি। মীনধ্বজ নিজেই কফি বানিয়ে এনেছেন। ট্রে-খানা টেবিলে রাখতে-রাখতে বললেন, "এখন বুঝতে পারছি গুপ্তধনের গুজব চাউর হওয়ার কারণ কী।"

"যা রটে তার কিছু তো বটে।" মিতিন হাতে কফিমগ তুলল, "সিংহধ্বজবাবু ওই ঘড়া-ঘড়া মোহরের গল্পই করেছিলেন ভুজঙ্গমোহনকে। সম্ভবত গুপ্ত দরজার সংবাদটিও ভুজঙ্গমোহনের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সিংহধ্বজবাবুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে ভেবে কাউকেই ওই গোপন দরজাটির কথা তিনি জানাননি। এমনকী, দাসব্যবসার কথাও নয়। তাতে হয়তো বাগচীবাড়িরও দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে খানিক হেঁয়ালি করেছেন। ফলে মাটির তলায় মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর...! এমন একটি গুজব ক্রমে-ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।"

অনিশ্চয় প্রাজ্ঞস্বরে বললেন, "ওই রিউমার থেকেই কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারের কথা আপনার মাথায় আসা উচিত ছিল মীনধ্বজদা।"

"আরে ভাই, আন্ডারগ্রাউন্ড মানে আমরা তো চিরকালই জানি, বেসমেন্ট আর বেসমেন্টের চাতাল। লকগেট খুললে নাকি চাতাল পর্যন্ত জল এসে যেত। তারপর আর-একটি আউটলেট দিয়ে তা বের করেও দেওয়া হত। অবশ্য সবই শোনা গল্প। আমার ঠাকুরদা তো কবেই পাঁচিল তুলে চাতালে জল আসাযাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।"

"নিন্‌হোয় জল ঢোকা কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি মিস্টার বাগচী। ওই জলপথেই এ বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র ঢোকানো হয়েছে।"

"কীভাবে? কীভাবে?" অনিশ্চয় খাড়া হয়ে বসলেন।

"তা হলে একটু পিছন থেকে শুরু করি। অল্‌মিডাদের সময়ে লকগেট ছিল তিন-তিনখানা। জলের চাপ কমাতেই গেটগুলো ব্যবহার হত বটে, তবে যাদের ধরে আনছে, তারা যাতে কোনওভাবেই নদীতে পালাতে না পারে তার জন্যও ছিল ওই তিন ধাপের গারদ। কোনও কারণে হু হু করে জল বেড়ে গেলে গোটা পাতালপুরী ভর্তি হয়ে জল উঠে পড়ত বেসমেন্টের চাতালে। তখন বাঙ্ক থেকে বের করে বেসমেন্টের ঘরগুলোয় রাখা হত বন্দি মানুষগুলোকে। আর যখন চালানের প্রয়োজন হত, লকগেটগুলো খুলে, ক্যানালে জল ঢুকিয়ে, নৌকোয় করে নদীতে আনা হত, অর্থাৎ অল্‌মিডাদের জাহাজঘাটায়। শিখিধ্বজ বাড়িটা কেনার পর ক্রমে-ক্রমে জাহাজঘাটা এবং দু'খানা লকগেট পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তখন হয়তো কোনও বড় ঘূর্ণিঝড়টড়ও হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, হয়েছিল তো!" পার্থ বাইরে থেকে একরাশ শিঙাড়া-জিলিপি কিনে এনেছে। গরম শিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে বলল, "অরুণাভর বাড়িতে তো কাল দেখছিলাম। আঠারোশো তিরানব্বইতে একটা জোর সাইক্লোন হয়েছিল এই এলাকায়।"

"তবে তো ওই ঝড়েই...।" মিতিন পার্থর কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে বলল, "যাই হোক, থার্ড গেটটা টিকে গিয়েছিল কোনও মতে। কিন্তু আর ব্যবহার হয়নি। সিংহধ্বজবাবু গুপ্ত দরজাটি ছবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার পর পাতালপুরীটিও পাকাপাকিভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। পরে মীনধ্বজবাবুর ঠাকুরদা বজ্রধ্বজবাবু আর কোনওরকম ঝুঁকিতেই যেতে চাননি। পাছে ওই লকগেটখানা ভেঙে কোনওভাবে জল ঢুকে পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি চাতালেও পাঁচিল তুলে দেন। অতএব লকগেট অধ্যায়ের ওখানেই পরিসমাপ্তি হওয়ার কথা।"

"কিন্তু তা হল না।" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর টুপুর বলে উঠল, "সন্দীপনবাবু লকগেটখানা পরিষ্কার করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুললেন।"

"ঠিক তাই। কারণ, এ বাড়িতে একা থাকার সময় সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, কীভাবে লকগেট খোলা যায়। একই সঙ্গে সে বের করে ফেলেছে পাতালপুরীতে ঢোকার রাস্তা। তারপরেই আর্মস ডিলারদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। তলে-তলে নিজস্ব একটা দলও তৈরি করে নেয় সে। রাতে জোয়ারের সময় লকগেট খুলে দেয়, টুক করে অস্ত্র সমেত স্পিডবোট ঢুকে পড়ে পাতালপুরীতে। অস্ত্র বেরনোরও একই পন্থা। তবে স্থলপথেও পাচার হয় অস্ত্রের পেটি। ভায়া গুপ্ত দরজা।"

"এবং তাকে তো সন্দেহ করারও কেউ নেই।" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "ফাঁকা বাড়িতে তো শ্রীমান সন্দীপন একাই অধীশ্বর।"

টুপুর বলল, "তা কেন? অনঙ্গমোহনবাবু তো আসতেন দু'বেলা। তিনি কি কিছুই আঁচ করতে পারেননি?"

"কী করে করবেন? প্রথমত, তাঁর যাতায়াত একটা নির্দিষ্ট টাইমে। আর সেই সময়টিতে তো সন্দীপন লক্ষ্মী ছেলে। দ্বিতীয়ত, অনঙ্গমোহনবাবুর সঙ্গে ব্যবহারটিও অত্যন্ত মধুর রেখেছে সন্দীপন। তা ছাড়া অনঙ্গমোহন তো বহু সময়ই নেশার ঘোরে থাকেন!"

"হুঁ। মীনধ্বজবাবু এসে পড়াতেই সন্দীপনের মুশকিল হল।"

"শুধু মুশকিল কী রে? বল সাড়ে সর্বনাশ। মীনধ্বজবাবু পার্মানেন্টলি থাকাই শুরু করলেন তা নয়, সন্দীপনকেও বাড়ি থেকে আউট করে দিলেন। ফলে সন্দীপনেরও ছটফটানি বাড়ছিল। কারণ, এই ধরনের নিষিদ্ধ মাল তো রোজ-রোজ আসে না, দু'মাস, চারমাস পরপর হয়তো কোনও জাহাজে চোরাগোপ্তা এল। সমুদ্র থেকে সেই অস্ত্র স্পিডবোট বা নৌকোয় করে ঢোকে সন্দীপনদের মতো এজেন্টদের ঘরে। মীনধ্বজবাবু দেশে ফেরার পরেও সন্দীপনের কাছে এরকম একটা কনসাইনমেন্ট এসেছিল। ঝুঁকি নিয়ে পাতালপুরীতে পেটিগুলো ঢুকিয়েও ফেলেছিল সন্দীপন। প্ল্যান ছিল, এবার কারবারটা কিছুদিন বন্ধ রাখবে। পাছে মীনধ্বজবাবুর কোনওভাবে খটকা জাগে, তাই লকগেট খোলা-বন্ধের ব্যবস্থাটাও সাময়িকভাবে অকেজো করে দিয়েছিল। আর সেই কম্মোটি করতে গিয়েই বিপত্তি। যা ভয় পাচ্ছিল, তাই হল, মীনধ্বজবাবু দেখে ফেললেন।"

মীনধ্বজ হতবাক স্বরে বললেন, "আমি আবার কী দেখলাম?"

"ওই যে দু'টো চোর...মাটি খোঁড়া... !"

"লকগেট বিকল করার জন্য ওরা মাটি খুঁড়ছিল?"

"ওটাই তো ভ্রান্তি। দৃষ্টিবিভ্রম। দূর থেকে যখন আপনি দেখছেন, তখন মাটি খোঁড়া হচ্ছে না বোজানো চলছে, তা কি আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব?"

মীনধ্বজবাবু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মুখে তাকিয়ে। চশমার কাচের পিছনে বড়-বড় চোখ দু'খানা যেন আরও বিস্ফারিত। তোতলানো গলায় বললেন, "ম্-ম্-মাটি খোঁড়া হচ্ছিল না?"

"উঁহু। উলটো কাজটাই তপনরা করছিল তখন। আপনার সন্দীপনের নির্দেশ মতো।"

"ওরা কী বোজাচ্ছিল?"

"আহা, ওইখানটাতেই তো লকগেটের প্রাণভোমরা। পাথরের নীচটায়। আমার হিসেব বলছে, ওখানেই আছে লকগেট খোলা-বন্ধ করার মূল হাতলখানা। ওই হাতল থেকেই মোটা লোহার তার খাড়া নেমেছে পাতালপুরীতে। সেখানে পুলিতে পাক খেয়ে লম্বভাবে তার পৌঁছেছে লকগেটে। পাথর সরিয়ে হ্যান্ডেলটা ঘোরালেই লকগেট খুলে যাবে।"

"কী কাণ্ড! যত শুনছি, ততই শিহরিত হচ্ছি।"

"চিরকাল চোখের সামনে পড়ে থাকা জিনিসে আমাদের কৌতূহল থাকে না মিস্টার বাগচী। তবে হ্যাঁ, ইদানীং তো পরিস্থিতির কিছু বদল ঘটেছিল। ওই জগদ্দল পাথর আর অনড় অবস্থায় ছিল না। নিয়মিত সরানো হয় বলে আলগা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এবার আপনার কৌতূহল জাগতেও পারত।"

"কিন্তু আমি সত্যিই কিছু খেয়াল করিনি ম্যাডাম!"

"হতে পারে। তবে যার মনে পাপ, সে তো ভয় পাবেই। এবং তাকে সাবধানও হতে হবে। অবশ্য একটা কথা মানছি, সন্দীপনের উপস্থিতবুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। পরিস্থিতি ম্যানেজ করার জন্য সুচতুরভাবে নিজেই ছেলে দু'টোকে পাকড়াও করেছে। আর তারাও সন্দীপনের শিক্ষা মোতাবেক গুপ্তধনের হুজুগটা আউড়ে গিয়েছে পুলিশের কাছে। কিন্তু ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে! ওই গুজবই যে সন্দীপনকে গাড্ডায় ফেলে দেবে, এটা সন্দীপন ভাবতেও পারেনি।"

"কী গাড্ডা?"

"ওই যে...গুপ্তধন নিয়ে হইচই, ভিড়ভাট্টা, নিউজ চ্যানেল...। হট্টগোলের মাঝে বেচারা সন্দীপনের কারবারের নাভিশ্বাস। অগত্যা বেচারা আপনাকে অনেক ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। রাত্তিরে চুপিসারে বেসমেন্টে ঢুকে নানানরকম সাউন্ডের টেপ চালাত। হ্যাঁ, সেই কারণেই সন্দীপন সামনে থাকলে আপনি ভৌতিক শব্দ কখনও শোনেননি।" মিতিন সোফায় হেলান দিল, "আপনি যে ভূতের ভয়েও তেমন কাবু

হলেন না, এটাও সন্দীপনের দুর্ভাগ্য। এদিকে পাতালপুরীতে জমে থাকা জিনিসগুলো ডেলিভারির তাগাদা আসছে, সন্দীপন ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছে। জিনিস পাচারের জন্য ইটভাঁটার পাঁচিল দিয়ে দু'টো লোক নামাল, আপনি দেখে ফেললেন। স্পিডবোটে পাঁচজন এল, তাও আপনার নজরে পড়ে গেল।”

অনিশ্চয় গোঁফ মোচড়াতে-মোচড়াতে গিলছিলেন কথাগুলো। হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, “আপনি যা বলছেন ম্যাডাম, তাতে তো অ্যাদ্দিনে মীনধ্বজদার সাবাড় হয়ে যাওয়ার কথা। আস্ত মানুষটা হাপিস হয়ে গেলেই বা কী করার ছিল?”

“উঁহু। তাতে একটু সমস্যা ছিল বইকী। মীনধ্বজবাবুকে খুনই করুক কি লোপাট, চাঞ্চল্য তো একটা হবেই। কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা আসবে, ছেলেমেয়েরাও এসে পড়বে...। আর সবচেয়ে বড় ঝামেলা তো আপনি। আই জি সাহেব যে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না, এটাও তো সন্দীপনকে মাথায় রাখতে হয়েছে। অতএব সব মিলিয়ে যে চাপ সৃষ্টি হবে, তাতে সন্দীপনের কারবারের চিরতরে বারোটা। এমনকী, তার গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং কোনওক্রমে এবারের কনসাইনমেন্টটা বিনা ঝঞ্ঝাটে পার করে দেওয়াটা তো বেশি জরুরি। মীনধ্বজবাবু সেপ্টেম্বরে বিদেশে গেলে আবার নয় ক'দিন ব্যাবসাটা চালাত।” মিতিন একটু থামল। আড়চোখে মীনধ্বজকে দেখে নিয়ে বলল, “অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে মেরে ফেলত না, সে গ্যারান্টিও কিন্তু নেই। কারণ, আমদানি করা পেটিগুলো সন্দীপনকে বের করতেই হত। আর পৌঁছে দিতে হত যথাস্থানে। নইলে সন্দীপন তো নিজেই ঘ্যাচাং ফু হয়ে যাবে।”

“বটেই তো। ওই ব্যবসা সাংঘাতিক খতরনাক। লাখ-লাখ টাকা উপার্জন হয় ঠিকই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সামনে খাঁড়া। সামান্য বেগড়বাঁই করলেই জান খতম।”

"একবার লাইনে পা রাখলে বেরিয়ে আসারও তো উপায় নেই।" পার্থ রুমালে মুখ মুছল, "একেই বলে শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে।"

মীনধ্বজ করুণ মুখে বললেন, "আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না, সন্দীপনের মতো ভদ্র, শিক্ষিত ছেলে কী করে দেশদ্রোহীদের খাতায় নাম লেখাল?"

"দুষ্কর্মের জন্য সম্ভাবনাময় এমন একটা নিরালা বাড়িতে একটি ইয়াং ছেলে একা বাস করছে..., দেখে নিশ্চয়ই কোনও ওস্তাদ ছিপ ফেলেছিল। চারের সঙ্গে বঁড়শিও বিঁধে গিয়েছে গলায়, আপনার সন্দীপন হাঁসফাঁস করছে এখন।"

"বেচারার লাইফটাই বরবাদ হয়ে গেল।"

"সেই টোপ দেনেওয়ালাকেও আমি ছাড়ছি না। ছোকরার পেট থেকে সব ক'টা নাম টেনে বের করব।" মুঠো ঝাঁকিয়ে ঘোষণা করলেন অনিশ্চয়, "যদি ভালয়-ভালয় সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়, তো আবার সুস্থজীবনে ফিরলেও ফিরতে পারে।"

মিতিন চুপচাপ আলোচনা শুনছিল। হাত বাড়িয়ে ভ্যানিটিব্যাগখানা টানল কাছে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, "এবার তো আমাদের উঠতে হয় মিস্টার বাগচী।"

মীনধ্বজ ব্যস্তভাবে বললেন, "সে কী? এক্ষুনি যাবেন? রাতভর পরিশ্রম গেল, একটু বিশ্রামটিশ্রাম নিয়ে...!"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একেবারে বাড়ি গিয়েই রেস্ট নেব।"

"ওকে। ফিজটা তো অন্তত নিয়ে যাবেন।" মীনধ্বজ উঠে দাঁড়ালেন, "এক সেকেন্ড। চেকবইটা নিয়ে আসি।"

লম্বা-লম্বা পায়ে দোতলায় গেলেন মীনধ্বজ। অনিশ্চয় গা-ঝাড়া দিয়ে বললেন, "চলুন, আমিও রওনা দিই। একবার শুধু থানাটা ছুঁয়ে যাব। তারপর চারজনে একসঙ্গে গল্প করতে-করতে...!"

“পুলিশের গাড়িতে ফিরব?” পার্থর পুটুস টিপ্পনী।

অনিশ্চয় ভুরু কুঁচকে বললেন, “কেন, পুলিশের গাড়িতে কী অসুবিধে?”

“না, মানে শুনেছি, পুলিশের গাড়িতে ওঠাটা নিজের হাতে, কিন্তু নামাটা...! অনেক সময় নাকি নামতে-নামতে ছ’মাস, এক বছরও লেগে যায়!”

অনিশ্চয় দম ছেড়ে হেসে উঠলেন। দুলে-দুলে হাসলেন, হাসিতে সর্বাঙ্গ কেঁপে-কেঁপে উঠল। ঘরের গুরুগম্ভীর আবহাওয়া তরল হয়ে গেল যেন।

মীনধ্বজ ফিরলেন। হাতের সাদা খামখানা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “আর একটা-দু’টো প্রশ্ন করব?”

“বলুন?”

“করুণা আর অনঙ্গকে কি কাজে বহাল রাখতে পারি?”

“স্বচ্ছন্দে! সন্দীপন ওদের হাতে রেখেছিল, তবে পলিউট করতে পারেনি।”

“আপনার তদন্তে আমি মুগ্ধ। কিন্তু, রহস্য উদঘাটনের সূত্রগুলো আপনি কী করে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলেন যদি জানতে পারি? নিছকই কৌতূহল!”

খামখানা ব্যাগে ঢুকিয়ে মিতিন ভাবল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, “আমি শুধু চারটে সুতো জোড়া লাগিয়েছি। পাথর, বস্তা, বেসমেন্টের প্যাসেজের লেন্থ, বাড়ির উচ্চতা।”

মীনধ্বজ ফ্যালফ্যাল তাকালেন, “বুঝলাম না।”

“একটা ভারী পাথর দীর্ঘকাল মাটিতে গাঁথা থাকলে যে পরিমাণ শ্যাওলা জমা উচিত, এমনটি ছিল না। অর্থাৎ পাথর মাঝে-মাঝেই সরানো হত। তারপর পাঁচিলের ওপারে পেলাম দু’খানা মাটির বস্তা। ইটভাটায় বস্তা করে মাটি আসে না। ওরা পাড়ের মাটিই কাটে, তখন।

নৌকো বোঝাই মাটি কেনে। তখনই বুঝেছিলাম তপনরা বস্তা বোঝাই মাটি এনেছিল হ্যান্ডেলের জায়গাটা বোজাতে। সন্দীপন বস্তা দু'টো পাঁচিলের ওপারে ফেলে দেয়। মোরওভার, গর্ত যদি খোঁড়াই হয়ে থাকে, তবে সেই মাটি দিয়ে গর্ত পুরো বুজবে না, দুরমুশ করতে আরও মাটি লাগবে। তখনই নিশ্চিত হলাম, গর্ত খোঁড়াই হয়নি। তিন নম্বর, আপনার বেসমেন্টের প্যাসেজের দৈর্ঘ্য, আই মিন যেখানে তিনটে ঘর আছে, আপনার বাড়ির দৈর্ঘ্যের চেয়ে অন্তত তিরিশ ফুট কম। ওই শূন্যস্থানটুকু তা হলে কোথায়? তৃতীয় ঘরের গুপ্ত দরজাই এর একমাত্র সমাধান। এবার আসি আপনার বাড়ির উচ্চতায়। নদী থেকে লকগেট সমেত বাড়িটা যত উঁচু হওয়া উচিত, বাড়ির বেসমেন্ট আর উপরের অংশ মিলিয়ে তার চেয়ে অনেক কম। অতএব একটা পাতালপুরী থাকতেই পারে। এই সিম্পল ব্যাপারগুলো যে কেন আপনারা লক্ষ করেননি! সন্দীপন তো মনে হয় এগুলো থেকেই...!"

মীনধ্বজ মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিতিন-পার্থ অনিশ্চয়ের গাড়িতে গিয়ে উঠল। পাদানিতে পা রেখেও টুপুর হঠাৎ থমকাল। বলল, "দু' মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বলেই ছুটতে-ছুটতে সোজা গঙ্গার পাড়। প্রভাতী আলোয় কী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নদীকে!

প্রায় দু'শো বছর ধরে কত কিছু ঘটে গিয়েছে এ বাড়িতে। সেই অল্মিডাদের সময় হাজার-হাজার মানুষের কান্না, বাগচীপরিবারের আয়েশি জীবন, শেষমেশ সন্দীপনের এই ভয়ংকর কার্যকলাপ—বহতা নদী সবই দেখেছে, তবু কেমন বয়ে চলেছে উদাসীন!

আপনাআপনি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল টুপুরের। কার জন্য কে জানে!

9 788177 568813

কিশোর কাহিনি সিরিজ

হাতে মাত্র তিনটে দিন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

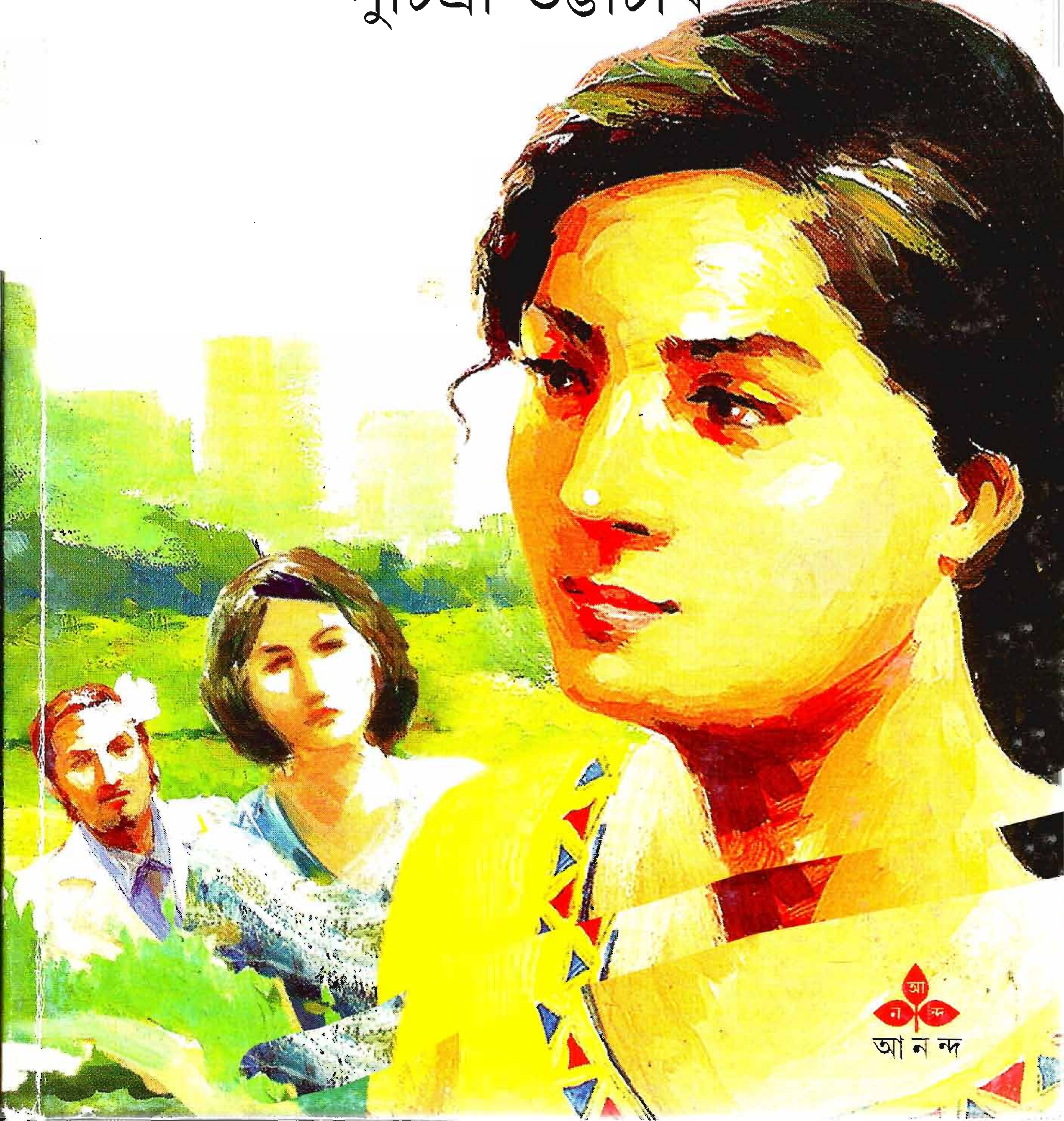

আনন্দ

হাতে মাত্র তিনটে দিন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

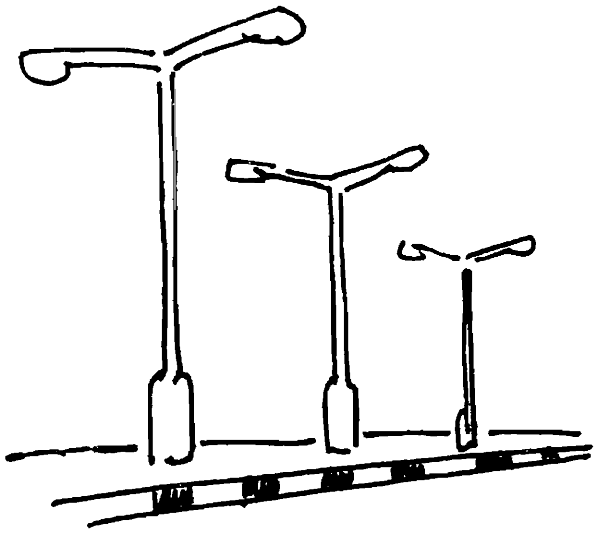

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

আদরের
অভিজ্ঞান ভট্টাচার্যকে

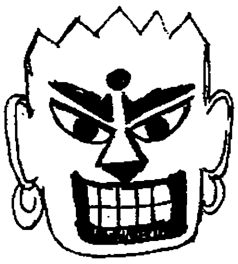

দরজা খুলেই টুপুরের দু'চোখ খুশিতে চকচক। পার্থমেসো ফিরল বাড়িতে, হাতে ইয়া এক প্লাস্টিকের ঝোলা। ভুরভুর সুগন্ধ বেরোচ্ছে ঝোলা থেকে। লোভনীয় খাবারের ঘ্রাণ।

টুপুর ভুরু নাচাল, "কী এনেছ গো?"

"জানবি, জানবি। অত তাড়া কীসের?" ডাইনিং টেবিলে ঝোলা নামিয়ে ধীরেসুস্থে জুতো ছাড়ল পার্থ। গ্রাম্ভারি গলায় বলল, "আজ নর্থ ক্যালকাটা গিয়েছিলাম, বুঝলি। তোদের হাতিবাগানের কাছেই। আমার এক ক্লায়েন্ট সেই কবে সুভেনির ছাপিয়েছে, এখনও পয়সা দেওয়ার নামটি নেই। ফোন করলেই বলে, নেক্সট উইক। কাঁহাতক সহ্য হয়, দিয়েছি আজ তার অফিসে হানা। আমায় সশরীরে দেখে এমন ঘাবড়েছে...!"

"অমনি পেমেন্ট দিয়ে দিল, তাই তো?"

"অর্ধেকটা। তাই বা কম কী বল? আমি তো আজ ফুটো কড়িটিও আশা করিনি।" পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "টাকাটা পেয়ে এত আনন্দ হল, সোজা চলে গেলাম উত্তর কলকাতার বিখ্যাত অ্যালেন্স কিচেনে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা চিকেন চপ আর প্রন কবিরাজি কিনে ফেললাম।"

"ওয়াও!" টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠল। প্যাকেটের গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "এ তো এখনও গরমাগরম গো! সুদূর গ্রে স্ট্রিট থেকে উড়ে এলে নাকি?"

"ওড়াই বটে। মেট্রো ধরে সাঁ কালীঘাট, সেখান থেকে ট্যাক্সিতে

সোজা ঢাকুরিয়া।" পার্থ এদিক-ওদিক চোখ চালাল, "তোর মাসি কোথায় রে?"

"বুমবুমকে পড়াচ্ছে।"

"ভেরি গুড। চটপট দুটো প্লেট নিয়ে আয় তো। তোর মাসি টের পাওয়ার আগে দু'জনে দু'খানা চপ সাবাড় করে দিই।"

তা মিতিনমাসিকে ফাঁকি দেয় সাধ্য আছে পার্থমেসোর! গোয়েন্দা বলে কথা, ঠিক এসে গিয়েছে বিড়াল-পায়ে। টুপুর রান্নাঘর থেকে প্লেট আনার আগেই জারি হয়ে গেল নির্দেশ, "আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো, তারপর আহার।"

অগত্যা পার্থ বেজার মুখে বাথরুমে এবং মিতিন যথারীতি পাকা গৃহিণীর ভূমিকায়। চপ-কাটলেটগুলো বের করে পরিপাটি সাজিয়ে ফেলল প্লেটে। টুপুরকে কফির জল চড়াতে বলে কুচকুচ পেঁয়াজ-শসা কাটছে। পারতপক্ষে দোকানের স্যালাড খায় না মিতিন, কাউকে খেতেও দেয় না। বেশিক্ষণ কেটে রাখা শসা-পেঁয়াজে নাকি জীবাণু টানে খুব।

পার্থ পোশাক-টোশাক বদলে ফিরল ডাইনিং টেবিলে। একখানা চিকেন চপ তুলে নিয়ে পেল্লাই কামড় বসাল। তারিয়ে-তারিয়ে চিবোচ্ছে। সঙ্গে কফিতে চুমুক। পুলকিত স্বরে বলল, "আহা, বয়ে আনার পরিশ্রমটা সার্থক। বেড়ে বানিয়েছে কিন্তু।"

"কলকাতার এই সাবেকি দোকানগুলোর গুডউইল তো এমনি-এমনি গজায়নি।" মিতিনের টুকুস মন্তব্য, "এদের মাল-মেটিরিয়ালও এক নম্বর, হাতের কেরামতিও লা-জবাব।"

"তবে রোজ-রোজ তো অদ্দূর থেকে আনা যায় না।" পার্থ গলাখাঁকারি দিল, "মাঝে-মাঝে তো ঘরেও বানাতে পারো।"

"খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমি এখন চপ-কাটলেট ভাজব?"

"অসুবিধে কোথায়? বসেই তো আছ। টিকটিকিগিরির প্রতিভাটা নয় রান্নাঘরে লাগালে।"

মিতিনের হাতে সত্যিই এখন কাজ নেই। তার জন্য কোনও ছটফটানি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর চারদিন হল এ বাড়িতে এসেছে টুপুর। এর মধ্যে একটি বারও কম্পিউটার পর্যন্ত খুলতে দেখল না মাসিকে। ফোনাফুনি নেই, ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি নেই, বাইরে বেরোচ্ছে না, সারাদিন হয় গল্পের বইয়ে ডুবে আছে, নয়তো গান। চলছে অবিরাম রবীন্দ্রসংগীত কিংবা পুরনো আমলের হিন্দি গান। যে গানগুলো শুনলেই টুপুরের হাই ওঠে। রান্নাঘরেও মোটে ঢুকছে না মিতিনমাসি। আরতিদি যা রেঁধে দিয়ে যাচ্ছে তাই গিলে নিচ্ছে চুপচাপ। মাসিকে এত উদাসীন, এমন নিস্পৃহ জীবনে দেখেনি টুপুর।

তবু পার্থমেসোর খোঁচাটা টুপুরের ভাল লাগল না। বেকার মানুষকে কাজের খোঁটা দেওয়া কি উচিত? দেশে হঠাৎ চোর-ডাকাত কমে গেলে মাসি কী করবে?

রিনরিনে গলায় টুপুর প্রতিবাদ জানাল, "মিতিনমাসি মোটেই এখন বসে নেই মেসো। মগজটাকে কয়েক দিন রেস্ট দিচ্ছে শুধু।"

"দেখিস বাবা, বেশি বিশ্রামে মগজে না মরচে ধরে যায়।"

কী আশ্চর্য, এহেন টিপ্পনীতেও মিতিন দিব্যি নির্বিকার। কাসুন্দি ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে কবিরাজি কাটলেট খাচ্ছে। হঠাৎ কী মনে পড়তে থামল। একটা প্লেটে আধখানা কবিরাজি নিয়ে বলল, "দাঁড়া, এটা বুমবুমকে দিয়ে আসি। বেচারা দশমিকের অঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

মিতিন ঘরে যাওয়ামাত্র পার্থর খিকখিক হাসি, "দেখলি তো, তোর মাসি কেমন কায়দা করে কাটল?"

"কাটাকাটির কী আছে?"

"বুঝলি না? আজকাল আর কেউ ডাকছে না তো, তাই আঁতে লাগছে।"

"জেনেশুনে মাসিকে তা হলে হার্ট করছ কেন?"

"অ। তোরও গায়ে ফোসকা পড়ছে বুঝি?" পার্থর স্বরে কৌতুক। এক চুমুকে কফি শেষ করে বলল, "জব্বর একখানা চামচি হয়েছিস বটে মাসির। একজনকে ছ্যাঁকা দিলে অন্যজনের চামড়া জ্বলে।"

টুপুর ফোঁস করে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই পার্থ ধাঁ। খবরের কাগজ মুখে সোফায় ধপাস। সুদোকু ছেড়ে ইদানীং আবার আগ্রহ বেড়েছে শব্দজব্দে, মন দিয়ে সমাধান করছে ধাঁধার।

ঠিক তখনই সেন্টারটেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল ফোনে সুরেলা ঝংকার।

পার্থর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটল। ভুরু কুঁচকে বলল, "তোর মাসির কাণ্ডটা দ্যাখ। এখানে মোবাইল ফেলে..., যা, দিয়ে আয় তো।"

মুঠোফোনখানা তুলে টুপুর খুদে মনিটরটা দেখল। নাম নেই, শুধু নাম্বার। অর্থাৎ অচেনা কেউ। মাসির ঘরের দিকে এগোতে-এগোতেই ফোনটা কানে চেপেছে, "হ্যালো?"

"আমি কী প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছি?"

ঈষৎ জড়ানো গলা। যেন একটু কাঁপছেও। পরিষ্কার বাংলায় বললেও সামান্য অবাঙালি টান আছে উচ্চারণে।

টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "না, আমি ওঁর বোনঝি। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা। ম্যাডাম আমাকে চিনবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার একটা জরুরি দরকার আছে। একবার কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।"

দৌড়ে গিয়ে মিতিনকে ফোনটা দিল টুপুর। আবছা একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, তাই নড়ল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছে। মিতিনমাসির সংলাপ থেকে অবশ্য কিছুই আন্দাজ করার জো নেই। 'হুঁ, হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ঠিক আছে' এই সবই আউড়ে যাচ্ছে

ক্রমাগত। শেষে অবশ্য গুছিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের ডিরেকশনটা দিল। তারপর ফোন অফ করে পায়ে-পায়ে উঠে এল বাইরের ঘরে। নীরবে।

টুপুরও এসেছে পিছু-পিছু। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গো ভদ্রলোকের? ওই শেঠ রুস্তমজি না কী যেন...!"

"ঠিক বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের নাকি খুব বিপদ। এক্ষুনি একবার ওঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করছিলেন।"

"কোথায় থাকেন?"

"চৌরঙ্গিতে। হ্যানোভার কোর্টে।"

"তুমি যাবে এখন?"

"হুঁ। ভদ্রলোক গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দেখি গিয়ে, শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা কী গাড্ডায় পড়লেন।"

পার্থ কান খাড়া করে শুনছিল। চোখ গোল-গোল করে বলল, "শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা? সে তো খুব ধনী ব্যবসায়ী!"

"ইয়েস। ফেমাস কার্পেট মার্চেন্ট। গোটা ইন্ডিয়ায় ওঁদের শোরুম আছে।"

"জানি তো। ওদের ব্র্যান্ডনেম 'ফ্যান্টাসি'।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "কার্পেট ব্যবসায়ীর এমন কী ঘটল যে, মিতিনমাসিকে এক্ষুনি দরকার?"

"অনেক কিছুই হতে পারে।" পার্থ খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রাখল। বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, "হয়তো সম্পত্তি নিয়ে বখেড়া। হয়তো জাল উইলটুইল বেরিয়েছে।"

"তার জন্য এমন অসময়ে...! গাড়িটাড়ি পাঠিয়ে...?"

"তা হলে নির্ঘাত মণিমাণিক্য কিছু খোওয়া গিয়েছে। রুস্তমজি নাম শুনেই তো বুঝছিস ভদ্রলোক পারসি? ওঁদের ধনদৌলতের

কোনও সীমা-পরিসীমা নেই রে। হয়তো পূর্বপুরুষের টেনিসবল সাইজের চুনি ছিল, কিংবা প্ল্যাটিনামের মুকুট...!"

"পারসিরা সবাই খুব বড়লোক হয় বুঝি?"

"দু'-চার পিস গরিব থাকতেও পারে, আমি দেখিনি। শিক্ষাদীক্ষাই বল, কি ব্যাবসা-বাণিজ্য, সবেতেই ওরা ঢের এগিয়ে। গুণ আছে ওদের। এমনি-এমনি কি সেই পারস্যদেশ... এখন যাকে বলে ইরান... সেখান থেকে এসে এ দেশে জাঁকিয়ে বসতে পারে?"

"তা বটে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা তো চাট্টিখানি কাজ নয়।"

"ওরা ভারতকে আর বিদেশ বলে ভাবেই না। ইনফ্যাক্ট, এ দেশে পা রাখার পর থেকেই ওরা ইন্ডিয়ান হতে চেয়েছে এবং হয়েও গিয়েছে। বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ল-ইয়ার, কবি, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সব লাইনেই ওরা সফল। স্বাধীনতা সংগ্রামেও ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট তো পারসি, দাদাভাই নওরোজি। মাদাম কামা নামে এক পারসি মহিলা তো ইউরোপে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বিপ্লবীদের অস্ত্র সাপ্লাই করতেন। দু'-দু'খানা কাগজ বের করতেন জেনেভায় বসে। 'বন্দে মাতরম' আর 'তলোয়ার'।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"ইন্ডিয়ায় পারসিদের প্রথম আগমনের কাহিনিটা আরও ইন্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই জানিস না!"

"না মানে... ইতিহাস বইয়ে তো নেই...!"

"জি কে-টা আরও বাড়া।" পার্থ সোফায় হেলান দিল। চোখ নাচিয়ে বলল, "পারসিদের সম্পর্কে কতটুকু কী জানিস বল তো?"

"এই যেমন ধরো, ওদের ধর্মগুরুর নাম জরথুস্ত্র। ওরা আগুনকে পুজো করে।"

“একদম ভুল ধারণা। পারসিরা অগ্নির উপাসক নয়। তবে ওরা আগুনকে খুব পবিত্র বলে মানে। ওদের মন্দিরে আগুনকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখে।” পার্থ সেন্টারটেবিলে পা তুলে দিল, “যাক গে, ঠিকঠাক ইনফরমেশনগুলো ব্রেনে পুরে নে। অ্যারাউন্ড সাতশো খ্রিস্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করেছিল আরবরা। তখন জরথুস্ত্রবাদী পারসিদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পালায়। প্রথমে তারা আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমান ইরানের খোরাসানে। পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে শ’খানেক বছর কাটিয়ে বাসা বাঁধে পারস্য উপসাগর উপকূলে। হরমুজ প্রদেশে। বছর পনেরো পর সাত-সাতখানা জাহাজে চড়ে তারা হাজির হয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে। গুজরাতের পাশে। দিউতে। তখন ওখানে রাজা ছিলেন জদি রানা। পাক্কা উনিশটা বছর দিউয়ে প্রায় ঘাপটি মেরে ছিল পারসিরা। হঠাৎ একদিন ওদের ওপর নজর পড়ল রাজার। অমনি রাজসভায় ডাকলেন পারসি প্রধানকে। বললেন, ‘আপনারা কি এ দেশে পাকাপাকি থাকতে চান?’ প্রধানের সঙ্গে এক পারসি পুরোহিতও এসেছিলেন সভায়। তাঁর নাম নেরেয়োসং। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ‘যদি আপনি অনুমতি দেন...।’ শুনে জদি রানা পাঁচ-পাঁচখানা শর্ত দিলেন পারসিদের।”

“কী শর্ত?”

“প্রথমত, তাদের ধর্মটা যে ঠিক কী, রাজাকে ভাল করে বোঝাতে হবে। দু’নম্বর শর্ত, নিজেদের ভাষা ছেড়ে এখানকার ভাষায় কথা বলতে হবে। তিন নম্বর, পারসি মেয়েরা যেন ভারতীয় পোশাক পরে। চার নম্বর, কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র রাখা চলবে না। আর পাঁচ নম্বরটা ভারী মজার। বিয়ের শোভাযাত্রা করতে হবে রাত্তিরে। মানে অন্ধকার নামার পর।”

“এমন আজব শর্ত কেন?”

“রাজারাজড়ার খেয়াল। যাই হোক, ওরা কিন্তু প্রতিটি শর্ত অক্ষরে-অক্ষরে মেনেছিল। ক্রমে-ক্রমে ওরা অ্যাইসান ভারতীয় বনে গেল... এখন মেয়েরা যেভাবে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরে, সে তো পারসি মহিলাদের নকল করে। আমাদের বেঙ্গলে প্রথম কে ওই স্টাইলে শাড়ি পরেছিল জানিস? জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। রবি ঠাকুরের মেজবউদি। প্রথম ভারতীয় আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের...!”

“তোমার জ্ঞানের ঝাঁপিটা এবার বন্ধ করবে?” অনেকক্ষণ পর মিতিনের গলা বেজে উঠল। ঘুরে টুপুরকে বলল, “তুই কি মেসোর গল্পই গিলবি? না আমার সঙ্গে বেরোবি?”

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! টুপুর তোতলা গলায় বলল, “যে-যে-যে-যেতেই পারি।”

“চটপট তা হলে তৈরি হয়ে নে। এক্ষুনি গাড়ি এসে যাবে।” মিতিন শোওয়ার ঘরের দিকে এগোতে গিয়েও কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। পার্থকে বলল, “আমার ফিরতে সম্ভবত দেরি হবে।”

“সে আমি বুঝে গিয়েছি। বুমবুমকে খাইয়ে দিতে হবে, তাই তো?”

“চাইলে নিজেও ডিনার সেরে নিয়ো।”

“দেখা যাবেখ’ন।” পার্থ মিটিমিটি হাসল। চোখ টিপে বলল, “যাক, শেষ পর্যন্ত তবে বেকার দশা ঘুচল, অ্যাঁ?”

“তো?”

“রোদ্দুর উঠেছে দেখলেই খড় শুকিয়ে নিয়ো কিন্তু।”

“মানে?”

“কেস যদি টেক-আপ করো, গোড়াতেই অ্যাডভান্স নেবে। রেটটা একটু চড়ার দিকে রেখো। যে জিনিস হারিয়েছে, অন্তত তার দামের ফাইভ পার্সেন্ট।”

“ভুল করছ। রুস্তমজির হিরে-জহরত কিছু খোয়া যায়নি।”

"কী করে শিয়োর হলে?"

"ভদ্রলোকের গলা শুনে। এমন নার্ভাস স্বর...!" মিতিন মাথা দোলাল, "উহুঁ, মিস্টার জরিওয়ালার বিপদ অনেক-অনেক বেশি গভীর।"

"যেমন? কোনও আনন্যাচারাল ডেথ? খুনটুন গোছের কিছু?"

"তা হলে তো আগে পুলিশ ডাকত।"

"আর কী হতে পারে?"

"সহজ উত্তর একটা আছে। হয়তো আমার অনুমানটা ভুলও নয়।"

"কী বলো তো?"

"ভাবো। ভাবতেই থাকো। দেখো, মাথা চুলকে-চুলকে যেন টাক না পড়ে যায়।"

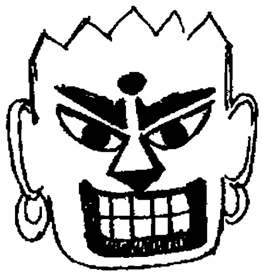

নিঃশব্দে ছুটছিল গাড়িটা। ধবধবে সাদা বিদেশি মোটরকার। কলকাতার রাস্তায় এই মডেলের গাড়ি খুব বেশি চোখে পড়ে না। চেহারায় যেন গর্বিত রাজহাঁসের ভাব। গাড়ির সিটগুলোও কী নরম, আহা। মৃদু এ সি চলছে অন্দরে। যতটুকুতে বেশ আরাম হয়, ঠিক ততটুকুই। ড্যাশবোর্ডের দামি পারফিউম হালকা সৌরভ ছড়াচ্ছে। সবে রাত আটটা, কলকাতার রাস্তায় এখনও যথেষ্ট কোলাহল, কিন্তু কাচঘেরা শকটে বসে কিচ্ছুটি টের পাওয়ার জো নেই। গাড়ির চলনও ভারী মসৃণ। ঝাঁকুনি ছাড়াই দিব্যি পার হচ্ছে পথের খানাখন্দ।

টুপুরের একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ল। ইস, মিতিনমাসি যে কবে একখানা এরকম গাড়ি কিনবে!

সুখ-সুখ আবেশের মধ্যেই গাড়ি পৌঁছোল এক প্রাচীন অট্টালিকায়। ড্রাইভারটি ভারী ফিটফাট। নিখুঁত কামানো গাল, সরু গোঁফ, পরনে আকাশ-নীল উর্দি, মাথায় টুপি। বয়স বছর বত্রিশ-তেত্রিশ, চেহারাতে একটা চেকনাই আছে। আদবকায়দাও জানে। গাড়ি চালানোর সময় দু'বার মোবাইল বেজেছিল, ধরে হাউহাউ করে কথা বলেনি। দু'বারই নম্বর দেখে কেটে দিয়েছে লাইন। এখনও ইঞ্জিন বন্ধ করে ত্বরিত পায়ে নেমে এল সিট থেকে। মিতিন-টুপুরের দরজা খুলে দাঁড়াল। সসম্মানে বলল, "সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যান। লিফ্‌ট আছে। তিনতলায় ডান দিকে সাহেবের ফ্ল্যাট।"

গাড়ি থেকে নেমে অভ্যেস মতোই এদিক-ওদিক চোখ চালাল টুপুর। দেখল, মূল ফটক থেকে তারা অনেকটা ভিতরে দাঁড়িয়ে। গেটের ওপারে রাজপথ, তার ওপারে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ফটক আর অট্টালিকার মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ছায়া-ছায়া অন্ধকার মাখা। আগে এখানে মূর্তিটুর্তি বসানো ফোয়ারা ছিল বোধ হয়, এখন নেহাতই ভগ্নস্তূপ। টিকে আছে শুধু লোহার ঘেরাটোপখানা।

জবরদস্ত ইমারতে প্রবেশের মুখে চার ধাপ সিঁড়ি। মিতিনের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে উঠতে-উঠতে টুপুর বলল, "বাড়িটা অন্তত এক-দেড়শো বছরের পুরনো, কী বলো?"

"একশো আশি পেরিয়েছে। আঠেরোশো বাইশে তৈরি।"

"জানলে কী করে?"

"ফটকে লেখা আছে। সারাক্ষণ হাঁ করে থাকিস না, চোখ-কানটাও খোলা রাখ।"

"সরি। আচ্ছা, বাড়িটার নাম 'হ্যানোভার কোর্ট' কেন গো? ওই নামের কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল কি এটা?"

"সম্ভবত না। ওই সময় রাজারাজড়াদের নামে বাড়ির নামকরণের

একটা চল ছিল। আঠেরোশো বাইশে ইংল্যান্ডে রাজত্ব করত হ্যানোভার বংশ। বোধহয় সেই সুবাদেই...!"

"ও।"

কথায়-কথায় মাসি-বোনঝি লিফ্‌টের দরজায়। কোলাপসিব্‌ল গেট লাগানো প্রাচীন আমলের ঢাউস লিফ্‌ট। উঠলও ভারী ধীর লয়ে।

বেরিয়েই অদূরে রুস্তমজির নেমপ্লেট বসানো প্রকাণ্ড দরজা। ডোরবেল বাজানোমাত্র কপাট খুলে গিয়েছে। একজন বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের সুদর্শন ভদ্রলোক খানিকটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। চওড়া করিডরখানা শুনশান দেখে বুঝি বা স্বস্তি পেলেন সামান্য। তাড়াহুড়োর স্বরে বললেন, "আসুন। প্লিজ, কাম ইনসাইড।"

মিতিনরা ঢোকামাত্র বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ভদ্রলোক হাতজোড় করে মিতিনকে বললেন, "আমিই রুস্তমজি। আপনি নিশ্চয়ই...?"

"প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি।" মিতিন প্রতিনমস্কার জানাল। টুপুরকে দেখিয়ে বলল, "মাই নিস। এবং সহকারীও বটে।"

রুস্তমজি যেন শুনেও শুনলেন না। টানা লম্বা প্যাসেজ ধরে হাঁটছেন মিতিনদের নিয়ে। অতিকায় এক সুসজ্জিত ড্রয়িংহলে ঢুকে থামলেন। কারুকাজ করা ভারী সোফায় আসন গ্রহণ করতে বললেন মিতিনদের। নিজেও বসলেন মুখোমুখি। এক রাজকীয় ডিভানে। মিতিন কোনও প্রশ্ন করার আগেই বলে উঠলেন, "আপনারা যখন এলেন... লিফ্‌টম্যান ছিল কি?"

"না তো।"

"আর কেউ?"

"উঁহু। শুধু আমরা দু'জনেই তো...!"

"দ্যাটস গুড। দ্যাটস বেটার।"

"আপনার বিপদটা বোধহয় অনুমান করতে পারছি।" মিতিন সোফায় হেলান দিল। তার চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরছে রুস্তমজির মুখমণ্ডলে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, "কে কিডন্যাপ্‌ড হয়েছে? আপনার ছেলে? নাকি মেয়ে?"

"আমার একমাত্র ছেলে। রনি। আজই বিকেলে...।" রুস্তমজি ঢোক গিললেন, "আপনি বুঝে ফেলেছেন?"

"এ তো ভেরি সিম্প্‌ল গেস মিস্টার জরিওয়ালা। একমাত্র অপহরণের ক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা ব্যাপারটাকে সাধ্যমতো গোপন রাখতে চায়।"

"হুম।" রুস্তমজির মুখটা ভারী শুকনো দেখাল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, "বুঝছেনই তো, ছেলের লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন।"

"পুলিশকেও জানাননি নিশ্চয়ই?"

"প্রশ্নই আসে না। ওরা যেভাবে আমায় শাসাল...!"

"অর্থাৎ অপহরণকারীদের ফোনকল আপনি পেয়েছেন?"

"না হলে জানব কী করে রনিকে আটকে রেখেছে! ওরা টাকা চায়। এক কোটি।"

টুপুর প্রায় আঁতকে উঠল, "এক কো..ও..ও..টি?"

"আগামী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা দিতে হবে। তা হলেই আমি রনিকে ফেরত পাব। আমি ওদের চাহিদা মেটাতে রাজি হয়েছি।"

মিতিন গম্ভীর স্বরে বলল, "টাকা যখন দেবেনই স্থির করেছেন, আমাকে ডাকলেন কেন?"

রুস্তমজি একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, ঈশ্বরের কৃপায় ব্যাবসাসূত্রে আমি মোটামুটি অর্থবান। এক কোটি টাকা তেমন ছোট অঙ্ক নয় বটে, তবে আমার কাছে খুব

বেশিও নয়। রনির প্রাণের বিনিময়ে ওই টাকা আমি ব্যয় করতে প্রস্তুত। কিন্তু...!"

"কিন্তু কী?"

"আমি একজন ধর্মপ্রাণ পারসি। যতটা সম্ভব মহান জরথুস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলি। তিনি বলেছেন, শুভ-অশুভের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শুভই জেতে। এবং অশুভকে সাজা পেতে হয়। অন্যায় যে করেছে তাকে শাস্তি পাওয়ানোটাই ধর্মপ্রাণ পারসির কর্তব্য। এতেই আমাদের ঈশ্বর অর্থাৎ আহুরমাজদা সন্তুষ্ট হন।"

"বুঝেছি। আপনি চান অপহরণকারীরা ধরা পড়ুক। তাই তো?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। টাকা যাক ক্ষতি নেই। আমি আমার রনিকেও চাই, আর অহরিমান অর্থাৎ শয়তানের সেই অনুচরদের শাস্তিও চাই। তেমন একটা শোরগোল না করে যাতে ওদের পাকড়াও করা যায় তার জন্যই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার স্ত্রী পইপই করে মানা করেছিল, তবুও...!"

মিতিনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। একবার দেখল টুপুরকে, আবার কী যেন ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, "ওকে! নো প্রবলেম। চ্যালেঞ্জটা আমি নিচ্ছি।"

"পারবেন তা হলে লোকগুলোকে ধরতে? কথা দিচ্ছেন?"

"দেখা যাক। চেষ্টা তো একটা করি।" মিতিন সোজা হয়ে বসল, "ঘটনাটা ঠিক কীভাবে, কোথায় ঘটেছে আগে খুলে বলুন।"

"আজ বিকেলে... রনির স্কুল ছুটির পর... আমি অবশ্য খবরটা পেলাম সন্ধে নাগাদ।" রুস্তমজিকে ভারী বিচলিত দেখাল, "মানে কোত্থেকে যে শুরু করি...!"

"ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি পরপর জবাব দিয়ে যান।" মিতিন সামান্য ঝুঁকল। দেখাদেখি টুপুরও। মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলের বয়স কত?"

"আট। গত মাসে ওর এইট্‌থ বার্থডে গিয়েছে।"

"কোন ক্লাসে পড়ে? কোন স্কুলে?"

"সেন্ট পিটার্স। এই তো সবে ফোরে উঠল।"

"যাতায়াত করে কীভাবে?"

"বাড়ির গাড়িতে। আপনি যে গাড়িতে এলেন, সেটাতেই...!"

"আপনার কি এই একটিই গাড়ি?"

"না। একটা হন্ডা সিটিও আছে। তবে রনি বি এম ডব্লিউটা পছন্দ করে বলে বিকেলেও অফিস থেকে ওটাই পাঠিয়ে দিই। রনিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গাড়ি আবার অফিসে চলে আসে।"

"আজও নিশ্চয়ই গিয়েছিল গাড়ি?"

"হ্যাঁ। অশোক তো বললেন আড়াইটেতেই...!"

"অশোক কে? আপনার ড্রাইভার?"

"না। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। অশোক মজুমদার। এইসব টুকিটাকি ব্যাপার অশোকবাবুই হ্যান্ডেল করেন। রোজই আড়াইটে নাগাদ গাড়িটা উনি রওনা করিয়ে দেন। আমার অফিস ক্যামাক স্ট্রিটে, রনির স্কুল মৌলালিতে। ছুটি হয় তিনটেয়। প্রাইমারি সেকশন তো, তাই এক ঘণ্টা আগে। রোজই মোটামুটি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছে যায় গাড়ি। দু'-চার মিনিট দেরি হলে রনি অপেক্ষা করে। ওদের স্কুলের নিয়মকানুন খুব কড়া। ড্রাইভার গিয়ে আইডেন্টিটি কার্ড না দেখালে দরোয়ান বাচ্চাকে ছাড়ে না। আজ ড্রাইভার গিয়ে শোনে, রনি আগেই চলে গিয়েছে।"

"কী করে স্কুল ছাড়ল? আই-ডি কার্ড ছাড়া?"

"সেখানেই তো জটটা পেকেছে। রনিকে না পেয়ে ড্রাইভার প্রায় পড়িমড়ি করে এসে লীলাকে, আই মিন রনির মাকে আগে রিপোর্ট করে। লীলাও হতবাক। সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলে ফোন করেছে। এবং আশ্চর্য কাণ্ড, রনিদের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম খোঁজ নিয়ে জানান,

দরোয়ান নাকি স্কুলের নিয়ম মাফিক আইডেন্টিটি কার্ড দেখেই রনিকে ছেড়েছে।”

“সে কী? আই-ডি কার্ড দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে?”

“স্কুলের তো তাই বক্তব্য।”

“হুম। তারপর?”

“তারপর আর কী, লীলার প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। আমায় বহুবার ফোন করেছিল। কিন্তু আমি তখন এমন ব্যস্ত...! সেল্‌স ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং চলছিল... মোবাইলটা সুইচ্‌ড অফ রেখেছিলাম। আমাকে না পেয়ে শেষে লীলা নিজেই দৌড়েছিল স্কুলে।”

“ম্যাডাম তো অফিসের লাইনেও চেষ্টা করতে পারতেন!”

“লীলার বোধহয় তখন মাথায় আসেনি। এমন পাজল্‌ড হয়ে গিয়েছিল...! সত্যি বলতে কী, লীলার অতগুলো মিস্‌ড কল দেখে ফোন করে যখন ঘটনাটা শুনলাম, আমারই হাত-পা ছেড়ে যাওয়ার দশা। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও কাজকর্ম ফেলে বাড়ি ছুটেছি।”

“ম্যাডাম তখন বাড়িতে?”

“জাস্ট ফিরেছে। স্কুলে দরোয়ান ছাড়া কাউকে তো পায়নি। বড়দেরও তার অনেক আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছে। এবং ওই একই কথা আউড়ে গিয়েছে দরোয়ান। আই-ডি কার্ড দেখেই নাকি সে...!” রুস্তমজি বড় করে একটা শ্বাস টানলেন, “রনিকে না পেয়ে লীলা প্রায় পাথর তখন। আমাকে দেখে এমন ডুকরে কেঁদে উঠল...! তাকে সামলাব, না পুলিশে খবর দেব ভেবে পাচ্ছি না...! ঠিক সেই সময়েই ফোনটা এল।”

“মোবাইলে?”

“না। ল্যান্ডলাইনে। নাম্বারটা কলার লিস্টে উঠেছে।” হাত বাড়িয়ে সাইডটেবিল থেকে হ্যান্ডসেটখানা তুললেন রুস্তমজি। বোতাম টিপে নাম্বারটা বের করে মিতিনকে বাড়িয়ে দিলেন।

চোখ কুঁচকে নাম্বারটা দেখল মিতিন। টুপুরকে বলল, "নোট করে নে।"

রুস্তমজি বললেন, "ওই নাম্বার থেকে কি কিছু ট্রেস করা যাবে?"

"সম্ভাবনা কম। এটা পাবলিক বুথের নাম্বার।" বলে মিতিন আবার ঝুঁকেছে, "ফোনে এগজ্যাক্টলি কী বলল?"

"প্রথমে তো ফোনটা লীলা তুলেছিল। ওদিক থেকে হুমকি শুনেই লীলা কাঁপতে-কাঁপতে আমায় রিসিভার দিয়ে দিল। আমার গলা পেয়ে লোকটা ফের থ্রেট্ন করল, 'কাল সকাল আটটার মধ্যে পঞ্চাশ লাখ চাই।' নইলে রনিকে আর ফেরত পাব না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রনি যে আপনার কাছেই আছে, প্রমাণ কী?' লোকটা তখন রনির গলাও শুনিয়ে দিল। খুব কাঁদছিল ছেলেটা। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ম্যাডাম। তবু মরিয়া হয়ে বললাম, 'এই রাত্তিরেই নগদ পঞ্চাশ লাখ জোগাড় করব কোত্থেকে? আমার একটু সময় চাই।"

"রাজি হল?"

"লোকটা তখন আর-একজনের সঙ্গে বোধহয় আলোচনা করল। দু'জনেরই গলা শুনতে পেয়েছি আমি। তারপর খানিকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। সম্ভবত মাউথপিস চেপে রেখেছিল হাত দিয়ে। অ্যাট লাস্ট আমাকে জানাল, সে সেভেনটি টু আওয়ার্স টাইম দিতে পারে, তবে টাকা চাই পুরো ওয়ান ক্রোড়। আমি আর কোনও দরাদরি করিনি। কারণ, পঞ্চাশ লাখ টাকার চেয়ে আড়াই দিন সময় আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। এতে হয়তো শয়তানদের ধরতে সুবিধে হবে আমাদের।"

"কিন্তু বিপদের ঝুঁকিও তো বেড়ে গেল। ছেলেটা আরও আড়াই দিন কিডন্যাপারদের খপ্পরে থাকবে।"

"দেখুন ম্যাডাম, আমি ব্যাবসা করে খাই। একটু আধটু মানুষ চিনি। যারা ছেলের বাবার প্রেশারে বেশি সময় দিতে রাজি হয়, আর তার এগেনস্টে ডবল টাকা চায়, তারা নিজেদের স্বার্থেই আমার রনিকে ঠিকঠাক রাখবে।"

"হুঁ।" মিতিন মাথা দোলাল। অল্প সময় নিয়ে বলল, "একটা প্রশ্ন। আপনি অফিস থেকে কি হন্ডা সিটি ধরে ফিরেছেন আজ?"

"না। ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। ওই গাড়িটা তো বাড়িতে ছিল। বাড়িতেই থাকে। লীলার জন্য।"

"তারও ড্রাইভার আছে নিশ্চয়ই?"

"সে এখন ছুটিতে। গত সপ্তাহে দেশে গিয়েছে।"

"কোথায় দেশ?"

"বিহার। জাহানাবাদ।"

"বদলি ড্রাইভার নেই?"

"প্রয়োজন হয় না। দরকারে লীলা নিজেই ড্রাইভ করে।"

"আপনার বি এম ডব্লিউর ড্রাইভারটি নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত?"

"তারক ভাল ছেলে। অশোক ওকে চমৎকার রিক্রুট করেছেন। রনিকে না দেখতে পেয়ে খুব ভেঙে পড়েছে তারক। রনির সঙ্গে খুব ভাব তো। ছেলেটা আজ ভয়ও পেয়েছে ভীষণ।"

"কেন?"

"ভাবছে, বোধহয় চাকরিটা গেল।"

"রনিকে নিয়ে আসার কার্ডটা কি তারকের কাছেই থাকে?"

"হ্যাঁ। আজ অবশ্য লীলাকে দিয়ে দিয়েছে।"

মিতিন আবার একটা কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। হলের ও প্রান্তে দরজায় এক মহিলা। পরনে প্রিন্টেড সালোয়ার, খাটো কামিজ। পাতিয়ালা সুট। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। টকটকে ফরসা রং, সোনালি রং-করা চুল, তীক্ষ্ণ নাক এবং বেশ দীর্ঘাঙ্গি। সুন্দর

মুখখানা বিশ্রীরকম ফুলে আছে, বড়-বড় চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল।

রুস্তমজি আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলার সঙ্গে, তার আগে টলমল পায়ে ছুটে এলেন মহিলা। মিতিনের পাশে ধপ করে বসে পড়লেন। কোনও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই খপ করে চেপে ধরলেন মিতিনের হাতখানা। তার পরেই আচমকা আর্তনাদ, "দোহাই আপনার, লোকগুলোকে ধরতে গিয়ে রনির যেন কোনও বিপদ না ঘটে। রুস্তমজি যাই বলুক, আমি শুধু আমার ছেলে ফেরত চাই।"

মিতিন হাত রাখল লীলার পিঠে। অঝোরে কেঁদে চলেছেন লীলা। থামছেই না কান্না।

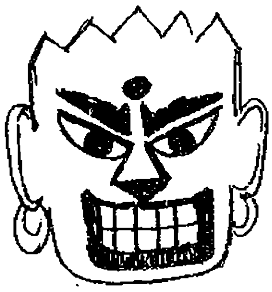

দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা ছবি। তেল রঙে আঁকা। কোনও অয়েল পেন্টিং-এ পাগড়িওয়ালা পুরু গোঁফ জাঁদরেল পুরুষ, কোনওটায় বা হ্যাট-কোট পরা এদেশি সাহেব। চোগা চাপকানধারীও আছেন একজন। তিনজন মহিলার ছবিও দৃশ্যমান। তাঁদের প্রত্যেকেরই পরনে শাড়ি আর কায়দার ব্লাউজ। প্রতিটি তৈলচিত্রই বলে দেয়, রুস্তমজি অভিজাত ঘরানার মানুষ।

টুপুর চোরা চোখে ছবিগুলো দেখছিল। রুস্তমজির কাজের মেয়েটি কফি রেখে গিয়েছে, সঙ্গে বিস্কুট আর কাজুবাদাম। কফিমগ এখনও হাতে তোলেনি টুপুর। অস্বস্তি হচ্ছে। অজস্র বহুমূল্য শো-পিসে সাজানো, পেল্লাই একখানা গ্র্যান্ড পিয়ানো শোভিত হলঘরখানা এখন যা অস্বাভাবিক রকমের থমথমে! মিতিনমাসির মুখে রা নেই,

রুস্তমজিও নিশ্চুপ। লীলা অবশ্য খানিকটা সামলেছেন, দু'হাত কপালে রেখে তিনিও এখন স্থির। এমন পরিবেশে কি কফিতে চুমুক দেওয়া যায়!

মিতিনই অবশেষে নীরবতা ভাঙল। নরম স্বরে লীলাকে বলল, "আমি এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব। মানে, আমার তো এখনও অনেক কিছু জানার আছে...!"

লীলা কপাল থেকে হাত সরালেন। জোরে একবার নাক টেনে সোজা হয়ে বসলেন। চোখের কোলটা মুছে নিয়ে বললেন, "ইয়েস!"

"আপনি যখন গাড়ি নিয়ে স্কুলে পৌঁছোলেন, তখন ঠিক ক'টা বাজে?"

"ঘড়ি তো দেখিনি।" লীলার স্বরে প্রখর অবাঙালি টান, "বিকেল পাঁচটা হবে।"

"তখন স্কুলে দরোয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না?"

"না। রনিদের প্রিন্সিপাল মিসেস রায় নাকি তার পাঁচ মিনিট আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন।"

"দরোয়ান কি আপনাকে দেখে অবাক হয়েছিল?"

"ভীষণ। সে তো বারবার হলফ করে বলল, কার্ড দেখে তবে রনিকে ছাড়া হয়েছে। তবে কার্ডটা কে দেখিয়েছে মনে করতে পারল না।"

"দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলার পর আর কি আপনি প্রিন্সিপাল-ম্যাডামকে ফোন করেছিলেন?"

"করা উচিত ছিল। তবে... তখন আমি এমন ডিসটার্বড ছিলাম... রুস্তমজিকেও ফোনে পাচ্ছি না... আমার ব্রেন কাজ করছিল না।"

"তক্ষুনি রুস্তমজির অফিসে গেলেন না কেন? রনির স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই তো রুস্তমজির অফিস, তাই না?"

"ঠিকই তো! কেন যাইনি? রুস্তমজিকে তো তুলে আনতে পারতাম।" লীলাকে ভারী বিহ্বল দেখাল। একটু ভেবে বললেন, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারক বোধহয় আমায় জিজ্ঞেস করেছিল বাড়ি ফিরব কি না... আমি বোধহয় ঘাড় নেড়েছিলাম। বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই অবশ্য রুস্তমজির ফোন এসে গেল।"

"আর-একটা প্রশ্ন। আপনাদের অন্য ড্রাইভারটি তো ছুটিতে। সে কি আগে থেকেই ছুটির কথা বলে রেখেছিল?"

"রাকেশ তো হঠাৎই দেশে গেল। ওর মা নাকি খুব অসুস্থ।"

"ও।" মিতিন আলগা মাথা নাড়ল। অন্যমনস্কভাবে একটা কাজুবাদাম হাতে তুলল। ঘুরে রুস্তমজিকে বলল, "আচ্ছা, আপনার হ্যান্ডসেটে তো দেখলাম ছ'টা বত্রিশে কিডন্যাপারের ফোন এসেছিল?"

রুস্তমজির ঠোঁট নড়ল, "হ্যাঁ, টাইমটা তো তাই।"

"একটা ব্যাপার আমার কিন্তু স্ট্রেঞ্জ লাগছে। আপনার স্ত্রী স্কুলে গিয়েছিলেন পাঁচটা নাগাদ। মৌলালি থেকে আপনার বাড়ি আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। অর্থাৎ মোটামুটি সাড়ে পাঁচটা। আপনিও পৌঁছেছেন তার পর-পরই। বড়জোর পৌনে ছ'টায়। কিডন্যাপারের ফোন আসার অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। এতক্ষণ টাইম পেয়েও আপনি পুলিশকে জানালেন না...?"

"বিশ্বাস করুন, উপায় ছিল না।" আড়চোখে লীলাকে দেখে নিলেন রুস্তমজি। গলা নামিয়ে বললেন, "লীলা তখন এত এক্সাইটেড ছিল...! ক্রমাগত বলছে, তোমার জন্য রনি মিসিং হল, তোমার জন্য রনির বিপদ ঘটেছে...! ওকে শান্ত করতে গিয়েই...!"

"এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ড। ম্যাডাম আপনাকে দোষারোপ করছিলেন কেন?"

"কারণ একটা আছে। যদিও আমি সেটাকে আমল দিতে চাই না।"

"তবু শুনি?"

"লীলার ইচ্ছে ছিল, বাইপাসের দিকে যে গ্লোবাল স্কুলটা হয়েছে, রনি সেখানে পড়ুক। মূলত আমার জেদেই রনি সেন্ট পিটার্সে ভরতি হয়। ওসব এ সি ক্লাসরুম, এ সি স্কুলবাস, চোখ ধাঁধানো পরিমণ্ডল আমার পছন্দ ছিল না।"

লীলা বললেন, "আসল কথাটা বলছ না কেন? তুমি কখনওই ট্র্যাডিশনের বাইরে যেতে চাও না।"

"বটেই তো। আমি সনাতন ধারার স্কুলিংই পছন্দ করি। আমার বিশ্বাস, মিশনারি স্কুলগুলোতেই বেটার চরিত্র গঠন হয়। তা ছাড়া আমি নিজেও সেন্ট পিটার্সের ছাত্র। নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর দুর্বলতা থাকবে না?"

"আপনি চমৎকার বাংলা বলেন তো! প্রচুর বাঙালি বন্ধুবান্ধব আছে নিশ্চয়ই?"

"আমি খুব একটা মিশুকে মানুষ নই ম্যাডাম। ক্লাব-পার্টিতেও তেমন যাইটাই না। একমাত্র উইকে এক-দু'দিন আমাদের পারসি ক্লাবে...!" রুস্তমজি একটু থামলেন। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললেন, "কলকাতায় এখন আমরা সাকুল্যে সাতশোজন পারসি বাস করছি। মাত্র শ'আড়াই পরিবার। ওই ক্লাবেই তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, নিজেদের সুখদুঃখের গল্প করি...!"

"তা হলে এত ভাল বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?"

"আমরা এখানে প্রায় পৌনে দুশো বছর আছি ম্যাডাম। এসেছিলাম সেই আঠেরোশো উনচল্লিশে। যে বছর প্রথম এখানে অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।"

"এজ্‌রা স্ট্রিটে?"

"তার পাশের গলিতে। পারসি চার্চ স্ট্রিটে। মন্দিরটা অবশ্য বহুকালই বন্ধ। ওখানকার পবিত্র আগুন তো এখন রাখা আছে

আমাদের দ্বিতীয় অগ্নিমন্দির আতস আদ্রনে। লালবাজারের কাছে।” রুস্তমজি ফিকে হাসলেন, “প্রায় সাত পুরুষ যেখানে বাস করছি সেখানকার ভাষা তো মাদার টাং-এর মতো সড়গড় হয়ে যাওয়া উচিত, নয় কি? তার উপর আমরা বিজনেসম্যান, লোকাল ল্যাঙ্গোয়েজের উপর দখল না থাকলে ব্যাবসা চালাতেও তো অসুবিধে।”

“তা বটে।” মিতিন মৃদু হাসল, “আচ্ছা, আপনারা ভারতের কোত্থেকে এসেছিলেন? গুজরাত?”

“না, মুম্বই।”

“কার্পেট ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টই কি আপনাদের পারিবারিক ব্যাবসা?”

“আগে আরও অনেক কিছু ছিল। জরি দিয়ে শুরু। তারপর জুটমিল, কাপড়ের কল, স্টিমশিপ...। কারখানাগুলো তো অনেক দিনই বন্ধ, তবে কার্গোশিপের বিজনেসটা আছে।”

“আপনিই চালান?”

“না। আমার বাবা শিপিং-এর ব্যাবসাটা ভাইকে দিয়েছেন। সে থাকে মুম্বইয়ে, ওখানেই তার কাজকারবার।”

“আপনার বাবা-মা কি জীবিত?”

“অবশ্যই। তাঁরা এখন ভাইয়ের কাছে। কলকাতাতেও আসেন মাঝে মাঝে। বিশেষ করে নওরোজের টাইমে কলকাতায় থাকাই তাঁদের বেশি পছন্দ।”

“নওরোজ... মানে আপনাদের নিউ ইয়ার?”

“না, না, এটা অন্য উৎসব। প্রাচীনকালে পারস্যে আমাদের সম্রাট জামশেদ যেদিন সিংহাসনে বসেছিলেন, সেই দিনটাকে আমরা নওরোজ হিসেবে পালন করি।”

“উৎসবটা বসন্তকালে হয় না?”

"শীতের শেষে, বসন্তের শুরুতে।" শান্তভাবেই বললেন রুস্তমজি, তবে এবার যেন তাঁকে খানিক অসহিষ্ণু দেখাল। বিনয়ী সুরেই বললেন, "ম্যাডাম, এসব প্রশ্নের সঙ্গে কি রনির কিডন্যাপিং-এর কোনও সম্পর্ক আছে?"

"হয়তো নেই। আবার থাকতেও তো পারে। আসলে আপনাদের পরিবারের সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বুঝে নিতে চাইছি।"

"তা হলে একবারেই বলে দিই। আমার পূর্বপুরুষ মুম্বই থেকে প্রথমে এসেছিলেন হুগলিতে। সেখান থেকে কলকাতায় এসেই আবার মুম্বই চলে যান। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে চিনদেশের সঙ্গে আফিং-এর ব্যাবসা শুরু করেন। তারপর জাহাজ...। আস্তে আস্তে অন্য বিজনেসেও নেমে পড়েন। আর আমার স্ত্রী লীলার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন জামশেদজি ফ্রাম্‌জি ম্যাডান। নিশ্চয়ই তাঁর নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই। ওঁকে তো এককালে ইন্ডিয়ান ফিল্মের রাজা বলা হত। ওঁর নামেই তো কলকাতার ম্যাডান স্ট্রিট।"

"এখন অবশ্য লীলার সমস্ত আত্মীয়স্বজনই মুম্বইয়ে সেটল্‌ড। আমারও কলকাতায় আর কোনও নিয়ার রিলেটিভ নেই। আর কিছু জানার আছে কি?"

"আপাতত এই যথেষ্ট।" মিতিন যেন রুস্তমজির মৃদু উষ্মাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। একই রকম স্বচ্ছন্দ সুরে বলল, "আবার কিডন্যাপিং-এ ফিরি। কোথায়, কখন, কীভাবে টাকা দিতে হবে তা কি কিডন্যাপার জানিয়েছে?"

রুস্তমজি ঈষৎ থতোমতো। তারপর দু'দিকে মাথা নাড়লেন, "না।"

"অর্থাৎ আবার ফোন আসবে।"

"মনে তো হচ্ছে।"

"আপনি কি টাকাটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছেন?"

"হয়ে যাবে।"

"তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আবার ফোন আসুক, তারপর এগোবেন।" মিতিন গলা ঝাড়ল, "আচ্ছা, কিডন্যাপারের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, কোনও আওয়াজ কানে এসেছে কি? ট্রেনের শব্দ কি বাসের হর্ন, কিংবা দোকানবাজারের হট্টগোল...?"

"বোধহয় একটা সাইকেলরিকশার ভেঁপু..., আমি ঠিক শিয়োর নই।"

"আর দুটো কোয়েশ্চেন। এমন কেউ আছে কি, যে আপনার কাছ থেকে এভাবে বাঁকা পথে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারে? কোনও পারিবারিক শত্রু বা বিজনেস এনিমি? অথবা আপনার উপর কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে...?"

রুস্তমজির চওড়া কপালে মোটা মোটা ভাঁজ। মিনিটখানেক চিন্তা করে বললেন, "সরি ম্যাডাম। আমি তো তেমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, রনির অপহরণের সংবাদটা এখনও পর্যন্ত কে কে জানে?"

"র‍্যানসাম চাওয়ার ব্যাপারটা শুধু আপনারাই জানলেন। তবে রনিকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে, এটা তো তারক বুঝছে। আমাদের কাজের মেয়ে লছমিও। এ ছাড়া সেন্ট পিটার্সের দরোয়ানও কিছুটা অনুমান করতে পারে। প্লাস, রনিদের প্রিন্সিপালও হয়তো খানিকটা আঁচ পেয়েছেন।" রুস্তমজি লীলার দিকে তাকালেন, "তুমি নিশ্চয়ই কাউকে ফোনটোন করোনি?"

"আমি কাকে ফোন করব?" ঝেঁঝে উঠতে গিয়েও লীলার স্বর করুণ হয়ে গেল সহসা। কাঁদোকাঁদো মুখে মিতিনকে বললেন, "আপনি কিছু একটা করুন ম্যাডাম। যত টাকা চাইবেন, দেব। শুধু আমার বাচ্চা যেন সহি-সলামত ফিরে আসে।"

"ভাবছেন কেন, বাহাত্তর ঘণ্টা সময় তো আমরা পেয়েছি।" মিতিন লীলার হাতে হাত রাখল, "তবে কাজে নামার আগে কয়েকটা জিনিস চাই।"

"কী দেব বলুন?"

"রনির কয়েকটা রিসেন্ট ফোটো। আর স্কুলকে একটা চিঠি, যাতে আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারি। তবে চিঠিতে কিডন্যাপিং-এ খবরটা উল্লেখ করার দরকার নেই।"

"আর?"

"আপনার দুই ড্রাইভারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার।"

"আমি দিচ্ছি।" রুস্তমজি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "এক্ষুনি।"

"আপনাকে আর-একটা রিকোয়েস্ট ছিল।"

"কী?"

"গাড়িটা অনর্থক বের করার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই চলে যাব।"

পলকের জন্য বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তমজির মুখে। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিতিনের দিকে। তারপর ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "বেশ, তাই হবে। তবে যদি কিছু পারিশ্রমিক অ্যাডভান্স করি, তাতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?"

"তাড়া কীসের মিস্টার জরিওয়ালা? মাত্র তো বাহাত্তর ঘণ্টার মামলা। তার পরেই না হয়...!"

রুস্তমজি আর জোরাজুরি করলেন না। দরকারি জিনিসগুলো একটা বড় খামে পুরে, ছলছল-চোখ লীলাকে ফের আশ্বাসবাণী শুনিয়ে, হ্যানোভার কোর্ট ছাড়ল মিতিন।

ট্যাক্সিতে উঠেই টুপুর বলল, "রুস্তমজির গাড়িটা নিলে না কেন?"

"মিছিমিছি কেন আর ছেলেটাকে খাটাই! এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।"

"অজুহাতটা যেন কেমন-কেমন? তুমি কি তারককে সন্দেহ করছ?"

জবাব নেই। ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে মিতিন। চোখ বুজে হেলান দিল সিটে। টুপুরও যেন অবসন্ন বোধ করছিল। মনটা ভার হয়ে আসছে। লীলার হাউহাউ কান্না এখনও বাজছে কানে। আহা রে, মা বলে কথা। লোকগুলো কী নিষ্ঠুর রে বাবা! রনি তো বুমবুমেরই বয়সি হবে, ওইটুকুনি বাচ্চাকে টাকার লোভে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে? শুধু কি তাই, মেরে ফেলারও ভয় দেখাচ্ছে। হয়তো কিছু খেতে দেয়নি, হয়তো মারধর করছে...! না, জঘন্য নরপশুগুলোর কড়া শাস্তি হওয়া দরকার।

ভেজা ভেজা গলায় টুপুর ডাকল, "মিতিনমাসি?"

"উঁ?"

"বদমাশদের পাকড়াও করা যাবে তো?"

"দেখি!"

মিতিনমাসির গলায় কি আত্মবিশ্বাসের অভাব? কেসটা অবশ্য বেশ জটিল। কোনও ক্লু-ই তো নেই। ফোন বুথটা খুঁজে পাওয়া গেলেই কি বজ্জাতদের ধরা যাবে? অসম্ভব। বাচ্চার আই-ডি কার্ড পর্যন্ত যারা নকল করতে পারে, তারা নিশ্চয়ই দুঁদে শয়তান। সময়টা বড্ড কম। মাত্র তিন দিন। তাই বোধহয় বেশি দুর্ভাবনায় পড়েছে মিতিনমাসি। রুস্তমজি তো পুলিশকেও জানাচ্ছেন না, পুরোপুরি মিতিনমাসির উপর ভরসা করে বসে, এও তো এক ধরনের মানসিক চাপ। সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট, শয়তানদের ধরতে হবে অতি সাবধানে। একবার যদি তারা টের পায় রুস্তমজি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন...!

ফাঁকা রাস্তায় শাঁ শাঁ ছুটছে ট্যাক্সি। গড়িয়াহাটের ব্রিজ পেরোল। হঠাৎই নড়েচড়ে উঠল মিতিন। ব্যাগ খুলে মোবাইল বের করল। টকটক বোতাম টিপে ফোন কানে চাপল।

কয়েক সেকেন্ডের প্রতীক্ষা। তারপরই মিতিনের গলা বাজল, "অনিশ্চয়দা? আমি মিতিন বলছি।"

টুপুরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। করছে কী মিতিনমাসি? সরাসরি পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানকে জানিয়ে দিচ্ছে ঘটনাটা?

না, অনিশ্চয় অঙ্কেলের কাছে পাবলিক বুথটার অবস্থান জানতে চাইল মিতিনমাসি। কারণটা ভাঙল না, ঠাট্টা করে এড়িয়ে গেল।

ফোন অফ করে মিতিন বলল, "বাড়ি ফিরে যেন মেসোর সঙ্গে বেশি গল্পে মাতিস না। খেয়েই শুয়ে পড়বি।"

"কেন গো?"

"কাল একটা কঠিন দিন। অনেক ছোটাছুটি আছে।"

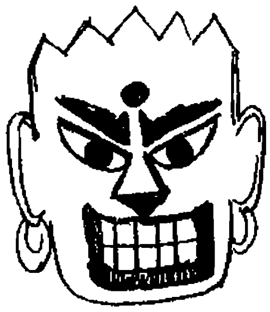

সকালে একটা ভারী প্রাতরাশ, ন'টার মধ্যে স্নান, সাড়ে ন'টা বাজতে না-বাজতে টুপুর পুরোপুরি তৈরি। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে মিতিনও প্রস্তুত। আরতি রান্না করছিল, বেরোনোর আগে তাকে কয়েকটা টুকিটাকি নির্দেশ দিল মিতিন। বুমবুম স্কুল থেকে এলে তাকে কী খেতে দেবে, ম্যাগির বায়না জুড়লেও আরতি যেন কানে না তোলে, খেলতে যাওয়ার আগে বুমবুম যেন অবশ্যই পোশাক বদলায়, এই সব। রাতে টুপুরের প্রিয় কষকষে আলুর দমও বানিয়ে

রাখতে বলল আরতিকে। তারপর ক্যাবিনেটের দেরাজ থেকে বের করল গাড়ির চাবি। হ্যাঁ, আজ গাড়িটা লাগবে।

পার্থ দাড়ি কামাচ্ছিল। কাল রাতে ঘটনাটা শোনার পর থেকে সেও বেশ উদ্বিগ্ন। কোনওরকম মজা, রসিকতা করছে না। বাথরুমের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, "বেরোচ্ছ?"

"হ্যাঁ। পারলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।"

"আমিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যেতে পারতাম।"

"দরকার কী ভিড় বাড়ানোর! অনর্থক তোমার প্রেসের কাজ ফেলে...!"

"সারাদিন খুব টেনশনে থাকব। কাজে মনই বসবে না।"

"চিন্তা কোরো না। প্রয়োজন বুঝলে তোমায় ডেকে নেব।"

টুপুরকে নিয়ে নীচে এল মিতিন। পার্কিং-স্পেস থেকে লাল মারুতিখানা বের করে চলল অভিযানে। আধঘণ্টাতেই পৌঁছে গেল সেন্ট পিটার্সে। চার্চের লাগোয়া পুরনো বনেদি স্কুল। ইমারতখানা প্রাচীন, তবে চেহারা এখনও বেশ শক্তপোক্ত। উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে সবুজ রঙের প্রকাণ্ড লোহার ফটক বন্ধ। কোনও কলরব নেই, অন্দরে ক্লাস চলছে জোর কদমে।

বড় গেটের এক কোণে বেঁটে লোহার দরজা। সেখান দিয়েই ঢুকল মিতিন আর টুপুর। অমনি কোত্থেকে এক খাকি উর্দিধারী বেরিয়ে এল। প্রায় পথ রোধ করে বলল, "কোথায় যাবেন?"

মিতিন ভারিক্কি স্বরে বলল, "প্রিন্সিপাল-ম্যাডামের কাছে। প্রাইমারি সেকশনের।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

রুস্তমজির চিঠিটা হাতে তুলে দেখাল মিতিন। দরোয়ান কী বুঝল কে জানে, বলল, "চলে যান। অফিসের গায়েই ম্যাডামের ঘর।"

ভ্রূ কুঁচকে দরোয়ানটিকে জরিপ করে নিল টুপুর। রোগা, লম্বা,

বছর চল্লিশেক বয়স, ব্যাকব্রাশ করা চুল, মুখটা খানিক চোয়াড়ে-চোয়াড়ে। এই লোকটাই কি রনিকে ছেড়েছিল কাল? আর-একজন দরোয়ানকেও অবশ্য দেখা যাচ্ছে। বিশাল ছাতিমগাছটার তলায় বসে আয়েশ করে খইনি ডলছে মোটাসোটা লোকটা। গাছের ওপাশে চার-চারটে ঢাউস স্কুলবাস দাঁড়িয়ে। না, রুস্তমজির ছেলের স্কুলটি যথেষ্ট ওজনদার।

প্রিন্সিপালের দরজায় পিতলের ফলকে নাম জ্বলজ্বল করছে 'অমিতা রায়'। বাইরে এক বেয়ারা বসে ছিল, তার হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠাতেই, কী কাণ্ড, মিসেস রায় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। ধবধবে সাদা বয়কাট চুল, ছোটখাটো চেহারার মহিলাটি মিতিনদের খাতির করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আন্তরিক সুরে বললেন, "আপনারা মিস্টার জরিওয়ালার কাছ থেকে আসছেন....,ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম। চা খাবেন? না কফি? নাকি কোল্ড ড্রিঙ্কস?"

"থ্যাঙ্কস। কিচ্ছু না।"

"তা বললে চলে? আপনি জানেন না, মিস্টার জরিওয়ালাকে আমরা কতটা শ্রদ্ধা করি। প্রাক্তনী হিসেবে তিনি সেন্ট পিটার্সের গর্ব। শুধু তাই নয়, আমাদের স্কুলের যে-কোনও অনুষ্ঠানে উনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেন।"

"দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, উনি কিন্তু স্কুল থেকে যথোচিত প্রতিদান পাননি।"

মিতিনের কেটে-কেটে উচ্চারণ করা বাক্যটিতে জোর ধাক্কা খেলেন অমিতা। হতভম্ব মুখে বললেন, "কেন, কী হয়েছে?"

"কাল ওঁর ড্রাইভার স্কুলে এসে রনি, আই মিন রৌণককে পায়নি এবং মিসেস জরিওয়ালা উৎকণ্ঠিত হয়ে আপনাকে ফোন করেছিলেন।"

"হ্যাঁ তো। আমি তো খবর নিয়ে ওঁকে জানিয়েও দিলাম মিস্টার জরিওয়ালার অন্য গাড়িটা এসে ওকে নিয়ে গিয়েছে!"

"আপনি শিয়োর, ওঁদের অন্য গাড়িটা এসেছিল?"

"আমাকে তো দরোয়ান সেরকমই বলল...।" অমিতা সহসা থমকালেন, "এনিথিং রং?"

"ভীষণ-ভীষণ রং। রৌণক কাল কিডন্যাপড হয়েছে।"

"অ্যাঁ?" ভদ্রমহিলা প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, পরক্ষণে ধপাস করে বসে পড়লেন। সপ্রতিভতা ঝরে গিয়ে রীতিমতো তোতলাচ্ছেন, "ও মাই গড! পুলিশ জানে?"

"রুস্তমজি এখনও পুলিশকে কিচ্ছু জানাননি। উনি ঘটনাটা স্ট্রিক্টলি কন্‌ফিডেন্সিয়াল রাখতে চান। আশা করি, আপনিও আপাতত খবরটা পাঁচকান করবেন না।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু... আপনি...?"

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ।" মিতিন নিজের একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল, "কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ হিসেবে এক কোটি টাকা চেয়েছে। পরশু সন্ধের মধ্যে। আমি ক্রিমিনালদের ধরার চেষ্টা করছি।"

"ও। তা আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"ভুলে যাবেন না ম্যাডাম, ঘটনাটা আপনার স্কুলের সামনেই ঘটেছে। আপনাদেরই দরোয়ান রৌণককে কিডন্যাপারদের হাতে তুলে দিয়েছে।"

"দরোয়ান তো আই-ডি কার্ড দেখে তবে...!"

"বুঝলাম। কিন্তু স্কুলের আই-ডি কার্ড বা তার নকল ক্রিমিনালদের হাতে গেল কী করে?"

"সেটা আমি কী করে বলব?" অমিতার গলায় এবার আত্মরক্ষার সুর। চোখ ঘুরিয়ে বললেন, "বাচ্চা জানে কিংবা বাচ্চার গার্জেন।"

"স্কুলে আই-ডি কার্ডের কোনও কপি থাকে না? ক্লাসটিচারের জিম্মায়?"

"না। দুটো কার্ডের একটা বাচ্চার গলায় ঝোলে, অন্যটা থাকে বাড়ির লোকের কাছে।"

"বেশ। কিন্তু প্রতি বছরই নিশ্চয়ই নতুন কার্ড ইসু হয়?"

"হ্যাঁ। পুরনো কার্ডগুলোও গার্জেনদের জিম্মাতেই থাকে। তবে এ বছর...!"

"কী হয়েছে এ বছর?"

"এবার স্কুলের একটা ফাংশান ছিল। অ্যানুয়াল এগ্‌জাম আর সেশনের মাঝে। বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরনো কার্ডগুলো গার্জেনদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। এ বছর নতুন কার্ড ইসু করার পরও ওগুলো আর ফেরত দেওয়া হয়নি।"

"অর্থাৎ আগের বছরের কার্ড আপনাদের হেপাজতে?"

"হ্যাঁ। ক্লাসটিচারদের। আমি অবশ্য ওঁদের বলেছি ডেসট্রয় করে দিতে।"

"কাজটা হয়েছে কি?"

এতক্ষণে অমিতা যেন সামান্য গুটিয়ে গেলেন। দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, "নিশ্চয়ই হয়েছে...!"

"আপনি নিশ্চিত নন, তাই তো?"

অমিতা চুপ। পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা পড়ল, বাইরে মৃদু কোলাহল। দু'জন শিক্ষিকা ঢুকছিলেন অমিতার ঘরে, হাতের ইশারায় তাঁদের আসতে মানা করলেন অমিতা। দুই শিক্ষিকাই কিঞ্চিৎ বিস্মিত, তবে চলেও গেলেন তৎক্ষণাৎ।

মিতিন ঘুরে তাঁদের দেখছিল। ফের সিধে হয়ে বলল, "আপনার বক্তব্য তো মোটামুটি শুনলাম। এবার যে রৌণকের ক্লাসটিচারের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।"

"ডেকে পাঠাব?"

"যদি না খুব অসুবিধে হয়।" মিতিনের স্বর সামান্য নরম, "তবে কাইন্ডলি তাঁর সামনে অপহরণের প্রসঙ্গটা তুলবেন না।"

"সে আমার মাথায় আছে।" বলেই কলিংবেলে চাপ। পলকে বেয়ারা হাজির। অমিতা ভার-ভার গলায় বললেন, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডামকে এক্ষুনি আসতে বলো তো। আর শোনো, এখন কাউকে ঘরে অ্যালাও করবে না।"

ঘাড় নেড়ে চলে গেল বেয়ারা। হঠাৎই যেন টুপুরের দিকে নজর পড়ল অমিতার। মুখে আলগা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এটি কে? মিস্টার জরিওয়ালার পরিবারের কেউ?"

"আমার বোনঝি। ঐন্দ্রিলা।"

"যাক, তাও ভাল। আমি ভাবলাম যদি...!" অমিতাকে কেমন অসহায় দেখাল। প্রায় আপন মনে বললেন, "পারসিরা অনেকেই এই স্কুলটা খুব পছন্দ করেন। তাঁরা খবরটা পেলে ছেলেদের হয়তো স্কুল থেকে সরিয়ে নেবেন। স্কুলের পক্ষে সেটা যে কী লজ্জার!"

"স্কুলের মানসম্মানটাই আপনার কাছে বড় হল ম্যাডাম?" মিতিনের স্বর তীক্ষ্ণ, "বাচ্চাটার বিপদ নিয়ে আপনি ভাবিত নন?"

"তা কেন, ছি ছি। রৌণককে আমরা সবাই খুব ভালবাসি। তার উপর সে মিস্টার জরিওয়ালার একমাত্র ছেলে...। এই স্কুল থেকে সে কিডন্যাপ্‌ড হল, ভাবলেই বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে।"

কথার মাঝেই দরজায় এক তরুণী। ছিপছিপে লম্বা, শ্যামলা রং, পরনে সালোয়ার-কামিজ। কাঁধে দোপাট্টা।

অমিতা গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "প্রিয়াঙ্কা, মিট দিস লেডি। ইনি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় উত্তর দিয়ো।"

প্রিয়াঙ্কা অবাক মুখে বসলেন চেয়ারে। মিতিনকে দেখছেন। টুপুরকেও। সপ্রতিভ স্বরেই মিতিনকে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন?"

মিতিন ঈষৎ ঘুরে বসল। প্রায় প্রিয়াঙ্কার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো ক্লাস ফোরের এ সেকশনের ক্লাসটিচার?"

"হ্যাঁ।"

"বাচ্চাদের স্কুল থেকে ছাড়ার সময় আপনি প্রেজেন্ট থাকেন?"

"এটা তো আমার ডিউটি ম্যাডাম।"

"ঠিক কী পদ্ধতিতে বাচ্চাদের ছাড়েন, একটু যদি বিশদে বলেন।"

"ছুটির পর আমরা সেকশনের বাচ্চাদের লাইনে দাঁড় করাই। যারা স্কুলবাসে যায়, নাম ডেকে-ডেকে তাদের বাসে পাঠিয়ে দিই। আর যাদের বাড়ির লোক নিতে আসে, তাদের গেটের কাছে নিয়ে যাই। বাড়ির লোক আই-ডি কার্ড দেখালে দরোয়ান বাচ্চা হ্যান্ডওভার করে দেয়।"

"আপনি সামনে থাকেন?"

"শেষ বাচ্চাটি যতক্ষণ না যায়, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।"

"কার্ড কে দেখে? আপনি, না দরোয়ান?"

"দু'জনেই। দরোয়ান তো পাশেই থাকে।"

"ভাল করে ভেবেচিন্তে বলুন, প্রতিটি কার্ড আপনি দেখেন তো?"

প্রিয়াঙ্কা সামান্য থতোমতো। ঝলকে প্রিন্সিপালকে দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে... সেশনের প্রথম এক-দু' সপ্তাহ খুবই কড়াকড়ি বজায় রাখি। তারপর মোটামুটি চেনাজানা হয়ে গেলে...!"

"কার সঙ্গে চেনাজানা?"

"যাঁরা নিতে আসছেন...। অবশ্য সব সময়ই কার্ড দেখা হয়।"

"গতকাল কি এই নিয়ম পালন করা হয়েছিল?"

প্রিয়াঙ্কা আবার যেন হোঁচট খেলেন। অস্বস্তি মাখা গলায় বললেন, "কেন ম্যাডাম, কোনও কমপ্লেন আছে নাকি?"

“কমপ্লেনের কোনও কারণ ঘটেছিল কি?”

“সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না।”

“একটি বাচ্চাকে কিন্তু কাল বাড়ির ড্রাইভার ছাড়া অন্য একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।”

“এমন তো হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অচেনা লোকের কাছে ক্লাস ফোরের একটা বাচ্চা যাবেই বা কেন? সে তো আপত্তি জুড়বে।”

“রৌণক জরিওয়ালার বাবা কিন্তু বলছেন, তাঁর গাড়ি এখানে আসার আগেই...!”

“কাল তো রৌণকদের অন্য গাড়িটা এসেছিল। কালো রঙের হন্ডা সিটি। রৌণকের মা যে গাড়িটা নিয়ে আসেন মাঝে মাঝে। ড্রাইভার কার্ড দেখিয়ে নিয়ে গেল, রৌণকও কিছু বলল না...!”

“লোকটা যে ওই গাড়িটিরই ড্রাইভার বুঝলেন কী করে?”

“কারণ, গাড়িটা সে-ই চালাচ্ছিল।”

“আপনি তাকে স্টিয়ারিং-এ দেখেছেন?”

“তা নয়। আসলে ড্রাইভারই তো সাধারণত বাচ্চাদের নিতে আসে। রৌণকও লাফাতে-লাফাতে লোকটার সঙ্গে চলে গেল... তাই অন্য কিছু ভাবার অবকাশ হয়নি।”

“ও। তা কাল হন্ডা সিটিটাই এসেছিল, জানলেন কী করে? গাড়িটা আপনি দেখেছিলেন?”

“সত্যি বলতে কী, ওই সময় অতশত খেয়াল করার সুযোগ কোথায়? এত বাচ্চা...এমন ক্যালোর-ব্যালোর...। তবে কে যেন একটা চেঁচিয়ে বলল...।” প্রিয়াঙ্কা পলকে চিন্তা করলেন, “হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সোহম রৌণককে বলছিল, আজ তোদের হন্ডা সিটিটা এসেছে রে।”

“সোহম কি রৌণকের ক্লাসমেট?”

“দু’জনে খুব বন্ধু। পাশাপাশি ছাড়া বসবেই না।”

"হুম। আচ্ছা, শেষ বাচ্চাটাকে যখন কাল ছেড়েছিলেন তখন ক'টা বাজে?"

"সাড়ে তিনটে তো বটেই।" প্রিয়াঙ্কাকে খানিক ব্যাকুল দেখাল, "এত কথা জানতে চাইছেন কেন ম্যাডাম?"

জবাব না দিয়ে প্রিয়াঙ্কার চোখে চোখ রাখল মিতিন, "আপনার সেকশনের বাচ্চাদের গত বছরের কার্ডগুলো তো আপনার হেপাজতেই ছিল?"

"এখনও আছে। আমার ড্রয়ারে।"

"সে কী!" অমিতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন," ওগুলো না নষ্ট করে দেওয়ার কথা?"

"হয়ে ওঠেনি ম্যাডাম।" প্রিয়াঙ্কা আমতা-আমতা করছেন, "বাচ্চাদের ফোটো থাকে তো, তাই ছিঁড়তে, পোড়াতে মায়া লাগে। আমরা প্রাইমারির টিচাররা, সবাই মিলে ঠিক করেছি, গরমের ছুটিতে সব পুরনো কার্ড একসঙ্গে জড়ো করে জ্বালিয়ে দেব।"

"বুঝলাম।" মিতিন সহসা গম্ভীর। অমিতার মুখও থমথম করছে। ভুরু কুঁচকে তাঁকে দু'-এক সেকেন্ড দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "প্রিয়াঙ্কা, এবার আপনাকে ক'টা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?"

"বলুন?"'

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"টালিগঞ্জ।"

"বাড়িতে কে কে আছেন?"

"মা, দুই ভাই...। বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছোট হায়ার সেকেন্ডারি দিল।"

"বাবা...?"

"বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন। রোড অ্যাক্সিডেন্টে।"

"আপনি চাকরি কত দিন করছেন?"

"দেড় বছর।"

"অর্থাৎ বাড়িতে এখন আপনি একাই রোজগেরে?" মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "সোহম আজ এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কাইন্ডলি তাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন?"

প্রিয়াঙ্কার মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "রৌণকের কী হয়েছে বলুন না, প্লিজ!"

"সময় হলে জানতে পারবেন এবং এখন কলিগদের সঙ্গে নো আলোচনা।" মিতিনের গলা কাঠ-কাঠ, "আর হ্যাঁ, এক্ষুনি ড্রয়ার চেক করে জানান পুরনো সমস্ত কার্ড ঠিকঠাক আছে কি না।"

ঢক করে ঘাড় নাড়লেন প্রিয়াঙ্কা। উঠে বেরিয়ে গেলেন সন্ত্রস্ত পায়ে।

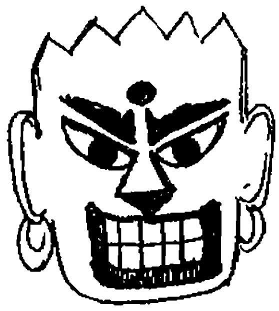

মিলিটারি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল ছেলেটা। হাত, পা, মাথা নড়ছে না এতটুকু। এমনকী, চোখের পলকটাও পড়ছে না। তবে চোখের মণি দুটো ঘুরছে টুপটাপ, ধীর গতিতে টেনিসকোর্টে বল ছোটার মতো। কখনও টুপুরে গিয়ে থামছে, কখনও অমিতায়। দেখছে মিতিনকেও, তবে সেভাবে যেন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মিতিন মিটিমিটি হাসছে। হাসিমুখেই বলল, "তুমি তো মনে হচ্ছে ভারী লক্ষ্মী ছেলে?"

সোহম জবাব দিল না। যেন এরকম একটা ফালতু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মানেই হয় না।

"তুমি কী খেলতে ভালবাসো? ফুটবল? না ক্রিকেট?"

"ক্রিকেট।"

"ব্যাটিং? না বোলিং?"

এবার ঘাড় একটু ঘুরল, "আমি পেস বল করি।"

"ও মা, তাই নাকি? কে তোমার ফেভারিট বোলার?"

"ব্রেট্ লি।"

"কোনও ব্যাটসম্যানকে তোমার ভাল লাগে না?"

"লাগে। ম্যাথু হেডেন।"

"সে কী! ভারতের কোনও খেলোয়াড়কে পছন্দ নয়? সচিন তেন্ডুলকর?"

"সর্বদাই সচিন ভাল, তবে আমি অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার।"

"বাঃ, বাঃ।" মিতিন জোরে হেসে উঠল, "ভারতীয় হলে ভারতের ক্রিকেটটিমকে সাপোর্ট করতে হবে, এমন তো কোনও রুল নেই!"

সোহমের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল এতক্ষণে। কৌতূহলী স্বরে বলল, "তুমিও অস্ট্রেলিয়ার দলে?"

"একটু একটু।"

মিতিন এলোমেলো গল্প করেই চলেছে। টুপুর অবাক হয়ে দেখছিল, কীভাবে সোহমের আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিচ্ছে মিতিনমাসি। মিনিট দু'-তিন পর মূল প্রসঙ্গে এল। সোহমকে কাছে টেনে বলল, "রৌণক তোমার খুব বন্ধু, তাই না?"

"ফার্স্ট ফ্রেন্ড।" বলেই সোহমের চোখ পিটপিট, "তুমি রৌণককে চেনো?"

"চিনি তো। রৌণকের বাবা আমার বন্ধু।"

"ও। রৌণক আজ আসেনি কেন?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

"কী হয়েছে রৌণকের?"

"সিরিয়াস কিছু নয়। কাল-পরশুর মধ্যে সেরে যাবে।"

"কাল তো রৌণক ভালই ছিল! যাওয়ার সময় বলল, আজ আমার জন্য ভিডিয়ো গেমসের নতুন একটা সিডি আনবে...!"

"কাল বুঝি রৌণকদের গাড়ি আগে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। ও যে হন্ডা সিটিটায় গেল...!"

"যে হন্ডা সিটি মানে? ওটা তো রৌণকদেরই আর-একটা গাড়ি!"

"উঁহু। ওটা রৌণকদের সেই গাড়িটা নয়।"

"বলো কী, অ্যাঁ?"

অমিতা চুপচাপ কথোপকথন শুনছিলেন, এবার প্রায় আঁতকে উঠলেন, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম এইমাত্র বলে গেলেন, কাল তুমি নাকি চেঁচাচ্ছিলে, 'রৌণক, তোদের হন্ডা সিটিটা এসেছে।' "

"আমার মিসটেক হয়েছিল ম্যাম। রংটা সেম তো, তাই...!"

"কী করে বুঝলে ওটা অন্য গাড়ি?" মিতিনও বেশ উত্তেজিত, "নম্বর দেখে?"

"হ্যাঁ তো। রৌণকদের হন্ডা সিটির নাম্বার থ্রি থ্রি ফোর ফোর। কালকের গাড়ির নাম্বারে কোনও থ্রি ছিলই না। ফোরও না।"

"তাও রৌণক ভুল গাড়িতে উঠে গেল?"

"তাই তো দেখলাম। যে আঙ্কলটা নিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে লাফাতে-লাফাতে...!"

"আঙ্কলটাকে তুমি চেনো?"

"উঁহু। কখনও দেখিনি।"

"তার মানে যে আঙ্কল হন্ডা সিটি চালান, ওই আঙ্কলটা তিনি নন?"

"কী জানি! আমি তো সেই ড্রাইভার আঙ্কলকে ভাল করে দেখিইনি।"

“কেন? হন্ডা সিটি তো মাঝেসাঝে রৌণককে নিতে আসে?”

“হন্ডা সিটি যেদিন আসে, আন্টি নিজেই নেমে রৌণককে নিয়ে যান। ড্রাইভার আঙ্কল গাড়িতেই থাকেন। তা ছাড়া অনেক সময় তো আন্টি নিজেই গাড়ি চালান।”

“বুঝলাম।” মিতিন সামান্য ঝুঁকল, “আচ্ছা সোহম, কালকের আঙ্কলটা কি ইউনিফর্ম পরা ছিলেন?”

“না। গ্রিন শার্ট। আর জিন্‌স।”

“দেখতে কেমন?”

“গোঁফ আছে, চশমা আছে, হাইট শর্ট...!” বলতে-বলতে থমকাল সোহম। চোখ সরু করে বলল, “এত কোয়েশ্চেন করছ কেন? রৌণক কি মিসিং?”

“না না, তোমার মেমারি টেস্ট করছিলাম।” মিতিন আলগা হাসল, “এবার বলো তো, যে গাড়িটা এসেছিল, তার নাম্বার কত?”

“পুরোটা পড়তে পারিনি। তার আগেই তো হুস করে বেরিয়ে গেল। তবে নাম্বারটায় সিক্স আর নাইন ছিল। পাশাপাশি। লাস্টে।”

“দারুণ চোখ তো তোমার! তা গাড়িতে রৌণক আর ওই আঙ্কল ছাড়া আর কি কেউ ছিল?”

“দেখতে পেলাম কোথায়! রৌণকও উঠল, গাড়িও ধাঁ।”

“যাঃ, এই আনসারটা তা হলে তুমি দিতে পারলে না!” মিতিন আবার একটু হাসল, “যাক গে, তুমি মেমারি টেস্টে পাশ করে গিয়েছ। আজই রৌণককে গিয়ে বলছি, তোমার জন্য সিডি যেন অবশ্যই নিয়ে আসে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

“তুমি কিন্তু এখন রৌণককে ফোন কোরো না। শুয়ে থাকতে হচ্ছে তো, বন্ধুদের ফোন পেলে মন খারাপ হবে। যাও, ক্লাসে যাও।”

দু'পা গিয়েও সোহম দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্দিগ্ধ চোখে মিতিনকে বলল, "তুমি কি পুলিশ?"

"কেন বলো তো?"

"এত ক্রস করলে! নিশ্চয়ই রৌণকের অন্য কিছু একটা হয়েছে!"

"এ মা, তুমি কী বোকা! পুলিশ কি এরকম একটা দিদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে?" টুপুরকে দেখাল মিতিন। হাসি-হাসি মুখেই বলল, "আমি রৌণকের একটা আন্টি। রৌণক ক'দিন স্কুলে আসবে না তো, খবরটা তাই প্রিন্সিপালম্যামকে দিতে এসেছিলাম।"

সোহম তবু যেন বিশ্বাস করল না। তবে চলে গেল পায়ে-পায়ে। মিতিন আর টুপুরকে দেখতে-দেখতে।

ছেলেটা ঘর থেকে বেরনোমাত্র অমিতা কপাল চাপড়ালেন, "কী হবে এখন? রৌণককে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে?"

মিতিন নীরব। মুখে একটি শব্দও নেই। একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে টুপুরকে চেয়ার ছাড়ার ইঙ্গিত করল। কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে পড়ল অমিতার ঘর থেকে।

স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে ফুটপাথ ঘেঁষে মিতিনের মারুতি। সেদিকে এগোতে গিয়েও টুপুরের পা সহসা নিশ্চল। উত্তেজিত মুখে বলল, "প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের কাছ থেকে আই-ডি কার্ডের খবরটা তো নেওয়া হল না!"

ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করছিল মিতিন। ভাবলেশহীন গলায় বলল, "প্রয়োজন নেই।"

"কেন?"

"পুরনো কার্ড যদি নকল হয়ে থাকে, আর সেই কাজে যদি স্কুলের কেউ জড়িত হয়...!"

"তা হলে সেই কার্ড এখন ফেরতও চলে এসেছে।"

"তবু জেনে নিলে... !"

"নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই টুপুর।"

"কিন্তু..., যে দরোয়ান কাল রনিকে ছেড়েছিল, তাকে তো একবার ট্যাপ করতে পারতে?"

"দরকার পড়লে নিশ্চয়ই করব। তবে আগের কাজ আগে।" মিতিন গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে মোবাইল বের করল। বোতাম টিপে চাপল কানে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ওপার থেকে পার্থর গলা ঠিকরে এল, "কী নিউজ? কী হল স্কুলে? জানা গেল কিছু?"

"পরে শুনো। এক্ষুনি একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। মোটর ভেহিক্ল ডিপার্টমেন্টে তোমার এক বন্ধু আছে না?"

"শ্যামল বসাক। ডেপুটি ডিরেক্টর।"

"চটপট তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। একটা গাড়ির ডিটেল ইনফরমেশন চাই। কালো হন্ডা সিটি। শেষ দুটো নাম্বার ছয় আর নয়। কবে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, সব জোগাড় করে ফেলো। যদি কলকাতায় রেজিস্ট্রেশন না হয়ে থাকে, সেটাও জানাও। কতক্ষণ লাগবে?"

"ধরে নাও অন্তত ঘণ্টাদুয়েক।"

"চেষ্টা করো যাতে এক ঘণ্টার মধ্যে হয়। বলো, এক্সট্রিম্‌লি আর্জেন্ট। একটা বাচ্চার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।"

"দেখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব... !"

ব্যস, কথার মাঝখানেই মোবাইল অফ। মিতিনের দৃষ্টি উইন্ডস্ক্রিনে স্থির।

টুপুরের উত্তেজনার পারা আরও চড়ছিল। উৎসাহিত চোখে বলল, "সোহম কিন্তু জব্বর একটা ক্লু দিয়েছে।"

"হুম। সূত্রটা ইম্পর্ট্যান্ট। এগোতে সুবিধে হবে।"

"শুধু সুবিধে? গাড়ির মালিকের সন্ধান পেলেই তো কালপ্রিট কট।"

"অত সহজ বোধহয় নয় রে। অপরাধী অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এগিয়েছে। হিসেব ছকে।"

"কী হিসেব?"

"তলিয়ে ভাব।" মিতিনের মারুতি চলতে শুরু করল। মৌলালি মোড়ের আগে ঘুরল বাঁয়ে, এসপ্ল্যানেড অভিমুখে। হালকা যানজট ঠেলে এগোচ্ছে। গিয়ার বদলাতে-বদলাতে মিতিন বলল, "হাতে তো এখন খানিকটা সময় আছে, লাইট লাঞ্চ সেরে নিবি নাকি?"

"যা বলবে।"

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে গাড়ি মধ্য কলকাতার এক স্ন্যাকবারের দরজায়। সবে বারোটা বাজে, দোকানে এখন তেমন ভিড় নেই। সকালের পরোটা-আলুচচ্চড়িতে পেট এখনও গজগজ, মাসি-বোনঝি কারওই তেমন খিদে পায়নি, তবু একপ্লেট করে স্যান্ডুইচের অর্ডার দেওয়া হল। সঙ্গে কফি।

মনে মনে ঘটনা পরম্পরা সাজানোর চেষ্টা করছিল টুপুর। স্যান্ডুইচ হাতে তুলে বলল, "একটা ব্যাপার কিন্তু দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কোনও পেশাদার অপরাধী রনিকে অপহরণ করেনি। যে করেছে, সে রনির যথেষ্ট পরিচিত।"

"বটেই তো। নইলে রনি নির্বিবাদে তার সঙ্গে যাবে কেন!"

"ইস, রনি যদি একবার গাড়ির নাম্বারটা খেয়াল করত!"

"বড়রাই করেন না, ও তো একটা বাচ্চা। আমাদের বাড়ির তলায় যদি একটা লাল মারুতি দাঁড়িয়ে থাকে, তুই কি প্রথমে ধরে নিবি না গাড়িটা মিতিনমাসির? নাম্বার মেলানোর কথা কি আগে মাথায় আসবে?"

"তা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই চেনা লোকটি রনির আই-ডি

কার্ড পেল কোত্থেকে? স্কুলের কারও সঙ্গে যোগসাজশ করেই কি পুরনো কার্ডটা...!”

“কার্ড জোগাড় করার আরও নানান উপায় আছে রে। যাক গে, তোর যা মনে হচ্ছে বলে যা, শুনছি।”

“আমার ধারণা...।” টুপুর ঢোক গিলল, “দুষ্কর্মের প্ল্যানটা ছকা হয়েছে অনেক আগে। যখন পুরনো কার্ডগুলো ক্লাসটিচারের জিম্মায় এসেছে, তখনই...!”

“তার মানে বলছিস প্রিয়াঙ্কাও এর সঙ্গে জড়িত?”

“সরাসরি যোগ না থাকলেও, কিছু দায় তো তাঁর আছেই। প্রথমত, কার্ডগুলো তিনি নষ্ট করেননি। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই তিনি কার্ডগুলোকে যথেষ্ট সাবধানে রাখেননি। আর সেই সুযোগ নিয়েই কেউ... হয়তো ওই দরোয়ানটাই রনির পরিচিত লোকের কাছে কার্ডটা পাচার করেছিল। যেহেতু সে অপরাধের অংশীদার, তাই হয়তো ছুটির সময় ইচ্ছে করে কার্ডটা ভাল করে চেক করেনি। প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম তো কিছুই দেখেন না, অতএব লোকটাকে সন্দেহের মুখে পড়তেও হয়নি।” টুপুর আশান্বিত চোখে তাকাল, “কী গো, ভুল বললাম?”

“না। সেভাবে দেখতে গেলে তো প্রিয়াঙ্কা স্বয়ং জড়িয়ে থাকতে পারেন। গোটা সংসারের দায় তাঁর কাঁধে, পরিবার চালাতে তাঁর খরচ-খরচাও কম নয়...! প্রলোভনে উনি পড়তেই পারেন।”

“তবে?” টুপুর আরও উৎসাহিত, “প্রশ্ন এখন একটাই। নাটের গুরুটি কে? আমার তো মনে হয় রাকেশ। মানে মিস্টার জরিওয়ালার হন্ডা সিটির ড্রাইভার।”

“সে বেচারাকে সন্দেহ করার কারণ?”

“তার ছুটি নেওয়া এবং রনি-অপহরণ একই সঙ্গে ঘটল, এটা কি কাকতালীয়? দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই? যেমন

পুরনো কার্ড এ বছর ক্লাসটিচারের হেপাজতে থাকা আর রনিকে গুম করা, দুটো ঘটনা একই সময়ে ঘটা মোটেও আকস্মিক হতে পারে না।"

"উম, তোর মগজ তো দেখছি পাকছে! বেশ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাবতে শিখেছিস!" মিতিন মুচকি হাসল, "আর-একটা ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে রে। সেটাও কাকতালীয় না হতে পারে।"

"কী বলো তো?"

"প্রিয়াঙ্কার স্টেটমেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে করার চেষ্টা কর।"

টুপুরের পুরো গুলিয়ে গেল। স্টেটমেন্টের কোন অংশটার কথা বলছে মিতিনমাসি? উপযাচক হয়ে হন্ডা সিটির খবর শোনানোটা, নাকি...?

ভাবনার মাঝেই মিতিনমাসির মোবাইল বাজল। মনিটরে নাম দেখে তাড়াতাড়ি ফোন কানে ধরল মিতিনমাসি, "হ্যাঁ অনিশ্চয়দা, বলুন? ও, ফোনবুথটা লেক টাউনে? বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। থ্যাঙ্ক ইউ দাদা। পরে বলব। সম্ভবত পরশু আপনার সাহায্য লাগবে। সময় আর জায়গা আপনাকে জানিয়ে দেব।"

চলভাষযন্ত্র নীরব হওয়ার পর টুপুর কলকল করে উঠল, "রনিকে তা হলে লেক টাউনে রেখেছে?"

"উঁহু। ফোনটা ওখান থেকে এসেছিল। এবং এর থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।" মিতিন ব্যাগের চেন টানল। মাথা নেড়ে বলল, "তবে একবার তো যেতে হবেই। যদি বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া হয়, তবুও।"

বিল মিটিয়ে ফের লাল মারুতি। ফের ছুটল গাড়ি। মূল শহর ছেড়ে বাইপাস পৌঁছোতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। এত জ্যাম রাস্তায়!

উলটোডাঙার মুখে এসে আবার মিতিনের মোবাইল ঝনঝন।

গাড়ি চালানোর সময় ফোন ধরে না মিতিন, মাসির ব্যাগ খুলে টুপুরই বোতাম টিপল। ও প্রান্তে মিসেস জরিওয়ালা। গলা থরথর কাঁপছে, "ম্যাডাম, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!"

নিজের পরিচয় দিতে ভুলে গেল টুপুর। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, "নতুন কী ঘটল আবার?"

"এইমাত্র একটা ফোন এসেছিল। আই মিন, রনির কিডন্যাপারের।"

"কী বলছে?"

"রুস্তমজি যে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, সেটা ওরা জেনে গিয়েছে।"

"তো?"

"খুব শাসাচ্ছিল। কেউ কোনওরকম গোয়েন্দাগিরি চালালে রনিকে ওরা মেরে দেবে।"

"তা আমরা এখন কী করব?"

"আমি রুস্তমজিকে বলছি আপনাদের রুপিয়া দিয়ে দিতে। আপনারা আর কিচ্ছু করবেন না, প্লিজ! অনুগ্রহ্ করে আমার রনিকে নির্বিঘ্নে ফেরত পেতে দিন।"

টুঁ শব্দটি না করে লীলার বক্তব্য শুনল মিতিন। চোয়াল শক্ত হল ক্রমশ। জ্বলছে চোখ জোড়া। তবে গাড়ি কিন্তু চালাচ্ছে একই গতিতে। এতটুকু ছন্দপতন নেই।

টুপুর নিচু গলায় ডাকল, "মিতিনমাসি?"

"উঁ?"

"ফোনবুথ-টুথে গিয়ে আর লাভ আছে কোনও?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কষা গোয়েন্দার কাজ নয়। কেস যখন নিয়েছি, শেষ না দেখে ছাড়ব না।"

"বাচ্চাটার যদি কোনও ক্ষতি হয়ে যায়?"

"হবে না।"

"কী করে জোর দিয়ে বলছ?"

"যারা ভয় দেখায়, তাদের কলজের জোশ কম। জানবি, তারা নিজেরাই ভয় পেয়েছে।"

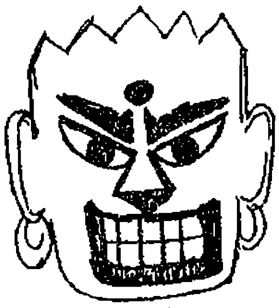

সবে ফাল্গুন মাস চলছে। তবে দুপুরের রোদ এখনই যথেষ্ট কড়া। বেলা আড়াইটে বাজে, বাঙ্গুর অ্যাভেনিউয়ের পথঘাটে লোক নেই বিশেষ। মিতিনদের অবশ্য কপাল ভাল, খুব একটা খোঁজাখুঁজি করতে হল না, সহজেই সন্ধান মিলল ফোনবুথখানার।

বড় রাস্তার উপরেই খুপরি দোকান। বাইরে জ্বলজ্বল করছে সাইনবোর্ড। দোকানের অর্ধেকটা কাচ দিয়ে ঘেরা টেলিফোন-ঘর, বাকি জায়গাটুকুতে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে এক প্রৌঢ় মানুষ। টেবিলে খাতাপত্র আর বিলিং মেশিন।

গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে ঢুকল মিতিন। ফাঁকা বুথে একা-একা ঢুলছিলেন ভদ্রলোক। ভরদুপুরে মিতিনদের আগমনে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। চোখ কচলে বললেন, "লোকাল কল করবেন? না এস টি ডি?"

"কোনওটাই নয়।" মিতিন নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল, "একটা ইনফরমেশন চাই।"

ভদ্রলোক কার্ড উলটেপালটে দেখলেন বটে, তবে যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মিতিন ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করল, "বুথে কি আপনিই থাকেন সারাদিন?"

"কেন বলুন তো?"

"আমার জানা দরকার, কাল বিকেল-সন্ধেয় এখানে কে ছিল?"

"আমিই তো থাকি। কালও নিশ্চয়ই আমিই ছিলাম।"

"ভালভাবে মনে করে দেখুন তো, কাল বিকেল সাড়ে ছ'টা নাগাদ কে বা কারা এখানে ফোন করতে এসেছিল!"

"অত খেয়াল থাকে নাকি? কত লোক ঢুকছে, বেরোচ্ছে...! আর বিকেল-সন্ধেতে তো ভাল ভিড় থাকে।"

"এখান থেকে কোথায় ফোন যাচ্ছে না যাচ্ছে, তার রেকর্ড থাকে নিশ্চয়ই?"

"বিলে নাম্বার থাকে। আমি ওসব রেকর্ড রাখি না। অযথা কাগজের জঞ্জাল কে বাড়ায়?"

"কিন্তু কাল এখান থেকে এমন একটা কল হয়েছে, যার জন্য আপনি ঝামেলায় পড়তে পারেন।"

"কেন? কী হয়েছে?" ভদ্রলোক এতক্ষণে যেন সন্ত্রস্ত, "কে ফোন করেছে এখান থেকে?"

"ভয়ংকর এক অপরাধীর গ্যাং।" মিতিন গলাটাকে বেশ রহস্যময় করল, "পুলিশ কিন্তু আপনাকে এসে ধরবেই।"

"এ কী ফ্যাসাদ রে বাবা! ভদ্রলোকের মুখ-চোখ শুকিয়ে গেল, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলবেন তো!"

"এক্ষুনি জানানো যাবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এসেছিল দু'জন। তারা একসঙ্গে বুথে ঢুকেছিল। ঠিক সাড়ে ছ'টায়।" মিতিনের চোখ সরু, "কিছু স্মরণে আসছে কি?"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান।" ভদ্রলোক চোখ বুজে ভাবলেন একটু। তারপর ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললেন, "সময়টা আমি অত দেখিনি, তবে সন্ধের মুখে-মুখে... সাইকেল নিয়ে... দুটো কল করল দু'জনে...!"

"দু'জনই ছিল তো?"

"হ্যাঁ। ওই মোড়ের বাড়ির ভদ্রমহিলা তখন বুথে। আই এস ডি করছিলেন। লোক দুটো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, এই টেবিলের সামনে। একজনের কাঁধে কিট্সব্যাগ ছিল। ঘড়ি দেখছিল ঘনঘন। আমাকে দু'-একবার তাড়াও লাগাল।"

"কীরকম বয়স তাদের?"

"নিখুঁতভাবে বলি কী করে? তবে ধরুন গিয়ে... পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটল্লিশ...!"

"কেমন দেখতে?"

"অর্ডিনারি। চেহারায় তো সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি।"

"পোশাক কী ছিল বলতে পারবেন?"

"না ম্যাডাম। অত আমি লক্ষ করি না। তবে খুব একটা উৎকট পোশাক ছিল না, এটুকু জানাতে পারি। তেমন হলে তো চোখে লাগত।"

"হুম। ফোন শেষ হওয়ার পর তারা কী করেছিল?"

"বিল পেমেন্ট করল। তারপর সাইকেল ফুটপাথে দাঁড় করানো ছিল, চড়ে চলে গেল।"

"দু'জনের দুটো সাইকেল?"

"হ্যাঁ। না, না, সাইকেল বোধহয় একটাই ছিল।"

টুপুর আর চুপ থাকতে পারল না। ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে একটা সাইকেলেই দু'জনে...?"

"তাই হবে। কে জানে, আমি হয়তো ভুলও বলতে পারি।"

"যেটুকু স্মরণ করতে পারলেন, সেটুকুই যথেষ্ট।" মিতিন চিলতে হাসল, "আপনাকে একটি অনুরোধ আছে।"

"বলুন?"

"আমার কার্ডটা ড্রয়ারে রেখে দিন। যদি লোক দুটো আবার

আসে বা পথেঘাটে তাদের দেখে চিনতে পারেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে খবর দেবেন।”

“অবশ্যই।” ভদ্রলোক জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন। তারপর হঠাৎই দৃষ্টি সরু, “লোক দুটো কি কাউকে খুনটুন করেছে ম্যাডাম?”

“ওই গোছেরই কিছু। এখন বলা বারণ।”

ভদ্রলোককে আর কোনও প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে মিতিন সোজা দোকানের বাইরে। গাড়ি স্টার্ট করে টুপুরকে বলল, “তোর মেসোকে একটা ফোন লাগা তো। দ্যাখ তো, কদ্দূর এগিয়েছে!”

মাসির ব্যাগ খুলে মোবাইলটা বের করতে-করতে টুপুর বলল, “এখান থেকে কিন্তু খানিকটা দিশা পাওয়া গেল।”

“যেমন?”

“সাইকেলে যখন এসেছিল, লোক দুটো নির্ঘাত কাছাকাছি কোথাও থাকে।”

“অসম্ভব নয়।”

“অতএব রনিকেও ধারেকাছে কোথাও রেখেছে।”

“হুম। নে, এবার ফোনটা লাগা।”

মেসোর নাম্বার টেপার আগেই মোবাইলে বাজনা। স্বয়ং রুস্তমজির কল।

চমকে গিয়ে মিতিনমাসিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল টুপুর, মিতিনের ইশারায় নিজের কানেই চাপল, “মাসি এখন ড্রাইভ করছেন মিস্টার জরিওয়ালা। কিছু খবর থাকলে আমায় দিতে পারেন।”

তিন-চার সেকেন্ড পর রুস্তমজির গলা শোনা গেল, “ওয়েল, লীলা একটু আগে আমায় ফোন করেছিল। ওকে কিডন্যাপাররা খুব ভয় দেখিয়েছে।”

"জানি। ম্যাডাম মাসিকে বলেছেন।"

"ইয়েস, আমি সেটাও শুনেছি।"

"ও।"

"আমার এখন জানার বিষয়, আপনার... আই মিন তোমার মাসি এখন কী করতে চান? আর এগোবেন? না তদন্তটা এখানেই স্টপ করে দেবেন?"

আড়চোখে মিতিনমাসিকে দেখে নিয়ে টুপুর বলল, "কোনও ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা মাসির স্বভাবে নেই, মিস্টার জরিওয়ালা।"

"এটা খুবই প্রশংসনীয়। আমি এই অ্যাটিটিউডটাই বেশি পছন্দ করি। তবে উনি যদি এখানেই থেমে যেতে চান, তা হলেও আমার আপত্তি নেই। আমি ওঁকে যথাযথ ফিজ দিয়ে দেব। লীলার উপর দিয়ে যে মানসিক ঝড়টা যাচ্ছে, তার কথাও তো মাথায় রাখতে হবে।"

"তা ঠিক। তবু...!" টুপুর মুহূর্তের জন্য থামল। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, "কাজ না করে ফিজ নেওয়াটাও আমার মাসির ধাতে নেই, মিস্টার জরিওয়ালা। তা ছাড়া মাসি এই কেসটায় বেশ খানিকটা এগিয়েছেন, এখন কিডন্যাপারদের না ধরে আগেই থেমে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক।"

ও প্রান্তের স্বর একটুক্ষণ নীরব। তারপর আবার বাজল, "ঠিক আছে, ম্যাডাম যা ভাল বুঝবেন তাই করুন। আমিও তো অপরাধীদের শাস্তি চাই। বাই দ্য বাই, উনি কদ্দূর কী এগোলেন, জানতে পারি কি?"

এতক্ষণের সমাচার উগরে দিতে যাচ্ছিল টুপুর, হঠাৎ কাঁধে মিতিনের মৃদু চাপ। ইঙ্গিত বুঝে থমকাল টুপুর। আমতা-আমতা করে বলল, "মাসি আপনাকে সব জানাবে।"

"ওকে। নো প্রবলেম। ম্যাডামের ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।"

ফোনটা ছাড়তেই মিতিন হালকা গলায় বলল, "তোকে তো দেখছি এবার রেমিউনারেশন দিতে হবে রে।"

"কেন গো?"

"যা ওস্তাদ হয়ে উঠছিস দিনদিন! কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বললি রুস্তমজির সঙ্গে।"

মিতিনমাসির মুখে এমন তারিফ শুনলে টুপুরের পুলক না জেগে পারে! একগাল হেসে বলল, "মানছ তা হলে আমি তোমার যোগ্য সহকারী?"

"অনেকটা। তবে আরও দু'-চারটে কথা রুস্তমজিকে বলা উচিত ছিল।"

"কীরকম।"

"কিডন্যাপারদের ফোন আবার আসবে। রুস্তমজি যেন প্রতিটি কলের নাম্বার আর টাইম নোট করেন এবং অবিলম্বে আমাকে জানিয়ে দেন।"

"ঠিকই তো! এটা তো মাথায় আসেনি!" টুপুর ঝটিতি মোবাইলটা হাতে নিল, "বলে দিই রুস্তমজিকে?"

"হুটোপুটির দরকার নেই। ফোন এলে উনি নিজেই করবেন।"

"তা হলে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?"

"যেটা বলা উচিত ছিল, সেটা তোকে শেখাচ্ছি।" লেক টাউন ছেড়ে ভি আই পি রোডে পড়ল গাড়ি। বাঁয়ে গাছপালা আর সরু খালের ওপারে সল্টলেকের বাড়িঘর। একটা ফুটব্রিজও গিয়েছে সেদিকপানে। আলগাভাবে ফুটব্রিজটাকে দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "তুই কিন্তু দরকারি ফোনটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিস টুপুর।"

এ তো রীতিমতো কর্তব্যে গাফিলতি। টুপুর জিভ কাটল। পার্থমেসোর লাইনটা টিপে মাইক্রোফোনটাও চালু করে দিল।

"কী গো মেসো, সাড়াশব্দ নেই কেন?"

"আর বলিস না। শ্যামলকে তো ফোনে ধরতেই পারছিলাম না। এনগেজ্‌ড, এনগেজ্‌ড...।"

"তা হলে?"

"পেয়েছি শেষ পর্যন্ত। শ্যামল একটু টাইম চাইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডিটেল পেয়ে যাব। তোরা কোথায়?"

এবার টুপুর নয়, মিতিনের জবাব। গলা তুলে বলল, "আমরা তোমার প্রেসে যাচ্ছি। ট্রাফিক নরমাল থাকলে মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব।"

লাগল অবশ্য প্রায় এক ঘণ্টা। দুপুরবেলা প্যাসেঞ্জার তোলার জন্যে বাস-মিনিবাসগুলো যেভাবে যত্রতত্র রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে! তাদের টপকে এগোনোর সাধ্য আছে গাড়িঘোড়ার? তার উপর বউবাজারের রাস্তা তো অকহতব্য। ট্রাম, বাস, টানারিকশা, ট্যাক্সি, ঠেলাগাড়িতে তো থিকথিকে জ্যাম। পার্থর প্রেস পর্যন্ত তো পৌঁছোতেও পারল না গাড়ি। যানজট আর ভিড়ের চোটে বেশ খানিকটা আগে মারুতিকে রাখতে হল। তারপর ধাক্কা খেতে-খেতে বাকি পথটুকু হন্টন।

পার্থর প্রেসে আগে কখনও আসেনি টুপুর। চেহারা দেখে একটু বুঝি হতাশই হল। আদ্যিকালের এক জীর্ণ বাড়ির নীচের তলায় দু'খানা ঘর নিয়ে পার্থর ছাপাখানা। রাশিরাশি কাগজ গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়, কোণেও দাঁড় করানো আছে নানান রঙের কাগজের রোল। তার মাঝেই কম্পিউটার, ডি টি পি মেশিন, চেয়ার, টেবিল, কাঠের র‍্যাক...। একটা ঘরে কম্পোজের কাজ চলছে, অন্যটায় মুদ্রণ। ভিতরে নড়াচড়ার জায়গা এত কম, পা রাখলেই যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। দুটো ঘরেই অবশ্য এ সি চলছে, এটাই যা বাঁচোয়া!

মিতিন-টুপুরকে দেখে পার্থ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা, কফি, না ঠান্ডা

পানীয় কী আনাবে ভেবে পেল না। শেষে বুদ্ধি করে ডাব আনতে পাঠাল একজনকে। টুপুরকে বলল, "তোদের পেটে কিছু পড়েছে? নাকি খাবার আনাব?"

"আমাদের নিয়ে চিন্তা পরে।" মিতিনের কেজো প্রশ্ন, "কাজটা হল কি?"

"ও শিয়োর। শ্যামল আমার মান রেখেছে। এইমাত্র ফোন করেছিল।" বলতে-বলতে টেবিল থেকে একটা চিরকুট তুলে পড়ল পার্থ, "লাস্টে ছয় আর নয় নাম্বারওয়ালা একটা কালো হন্ডা সিটির সন্ধান মিলেছে। পুরো নাম্বার টু ওয়ান সিক্স নাইন। দু' হাজার আট সালের গাড়ি, রেজিস্ট্রেশনটা কমার্শিয়াল, অর্থাৎ ভাড়া খাটে। মালিকের নাম দ্বিজেন হালদার। কার রেন্টের ব্যাবসা আছে। ঠিকানা, সেভেন বি, মিড্‌লটন রো। ফোন নাম্বার...!'

"লাগবে না।" মিতিন একটা টুল টেনে বসে ছিল, তড়াক উঠে দাঁড়াল, "চল টুপুর, বেরিয়ে পড়ি। দ্বিজেন হালদারকে এক্ষুনি মিট করতে হবে।"

"আহা, ডাবটা তো খেয়ে যাও।"

"সময় নেই, পার্থ। মিড্‌লটন রো যেতে কতক্ষণ আবার লাগে! গিয়ে লোকটাকে পাব, কি পাব না, কে জানে!" মিতিন ঘড়ি দেখল, "তুমিও সঙ্গী হতে পারো। যদি অবশ্য কাজের প্রেশার না থাকে।"

পার্থ বুঝি মুখিয়েই ছিল। কর্মচারীদের নির্দেশ দানের পালা সেরে সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। চোখে রোদচশমা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রেস ছেড়ে। গাড়িতে এসে নিজেই চালকের আসনে বসল।

ছুটল গাড়ি। দক্ষিণ মুখে।

ভিতরে-ভিতরে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল টুপুর। কী চমৎকার সরল গতিতে এগোচ্ছে তদন্ত। কিডন্যাপারের কল থেকে একটা ফোনবুথের সূত্র মিলেছিল, সেখানে হানা দিয়ে

তাদের পুরোপুরি নিরাশ হতে হয়নি। অন্তত এটুকু তো অনুমান করা গেল, অপরাধীরা কোন অঞ্চলের! মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ির হদিশও হাতের মুঠোয়। এবার নিশ্চয়ই অপরাধীর টুঁটি চেপে ধরতে অসুবিধে হবে না! বেচারা রনিটাকে যদি আজই উদ্ধার করা যায়...!

সাতের বি মিড্লটন রো মোটেই দ্বিজেন হালদারের বসতবাড়ি নয়। ঠিকানাটি কার রেন্টাল অফিসেরই। আরও অনেক অফিস আর দোকানপাটের মাঝে ফালি ঘরে 'স্টার টুরস অ্যান্ড ট্রাভেল্স'। খুদে অফিসটি রীতিমতো ঝাঁ চকচকে। দ্বিজেন হালদার মানুষটিও বেশ কেতাদুরস্ত। সবুজ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে ঘোরানো-চেয়ারে আসীন। সামনে ল্যাপটপ। চারপাশে সুদৃশ্য কাঠের প্যানেলিং করা দেওয়ালে পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ফোটো। একটি গণেশের মূর্তিও আছে। দ্বিজেন হালদারের ঠিক মাথার উপরে, কাচের তাকে। টাটকা মালা পরানো। ধূপের গন্ধও আবছাভাবে নাকে আসে যেন।

ল্যাপটপে আঙুল চলছিল দ্বিজেন হালদারের। মিতিনদের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুললেন সুট-টাই পরা বছর পঞ্চাশের মানুষটি। চেয়ারে হেলান দিয়ে কেতাবি ঢঙে বললেন, "ইয়েস? হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?"

পার্থকে শেখানোই ছিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পার্থ বলল, "আমাদের একটা গাড়ি চাই। কাল দুপুরে।"

"আপনারা কে? কোত্থেকে আসছেন?"

"সেটা জানা বুঝি খুব জরুরি?" পার্থও কায়দা মেরে বলল, "ওয়েল, আমি হরিসাধন সরকার, ইনি আমার স্ত্রী তারাসুন্দরী সরকার, আর এই মেয়েটি হল...!"

"এক সেকেন্ড।" দ্বিজেন হাত তুলে থামালেন পার্থকে।

তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "সরি স্যার। আমরা পার্সোনালি কাউকে গাড়িভাড়া দিই না।"

"সে কী? কালই তো এখান থেকে একটা কালো হন্ডা সিটি, যার নাম্বার টু ওয়ান সিক্স নাইন, কোনও একজনকে ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া দিয়েছিলেন!"

দ্বিজেন হালদারের ভ্রূ-তে ভাঁজ। বিরক্ত স্বরে বললেন, "আপনারা ঠিক কে বলুন তো? কী চান, অ্যাঁ?"

পার্থ নয়, এবার মিতিন মুখ খুলল। আই-ডি কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে শীতল গলায় বলল, "নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, অকারণে আসিনি? আশা করি আপনার সহযোগিতা পাব?"

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন দ্বিজেন। একটুক্ষণ গুম থেকে কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, "আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তবে আমি কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাও চাই না। বলুন আপনাদের কী জানার আছে?"

"ওই বিশেষ গাড়িটি কাল ভাড়া খাটতে গিয়েছিল কি?"

"হ্যাঁ।"

"রাতে নিশ্চয়ই ফিরেছে?"

"না। পার্টি চারদিনের জন্য নিয়েছে গাড়িটা। তাদের কোনও গেস্ট এসেছে ফরেন থেকে, গাড়ি নিয়ে অতিথিরা মন্দারমণি গিয়েছে।"

"কাল কখন থেকে ভাড়া ছিল গাড়ি?"

"দুপুর থেকে। বেলা দুটোয় রিপোর্টিং ছিল।"

"কোথায়?"

"এটাও বলতে হবে?" দ্বিজেনের স্বর রুক্ষ, "বেলেঘাটা। টাওয়ার অফ সাইলেন্সের গেটে।"

মিতিনের দৃষ্টি চকিতে স্থির, "আপনার পার্টির নাম জানতে পারি?"

দ্বিজেন ক্ষণকাল চুপ। তারপর যেন খানিক ইতস্তত করে বললেন, "এঁরা আমার খুব পুরনো ক্লায়েন্ট। প্রায়শই অফিশিয়াল কাজে আমার গাড়ি নেন...! কার্পেট ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যাবসা তো, মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে লোক আসে...!"

"আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"রুস্তমজি জরিওয়ালা। যাঁদের ফ্যান্টাসি ব্র্যান্ডের কার্পেট আছে।"

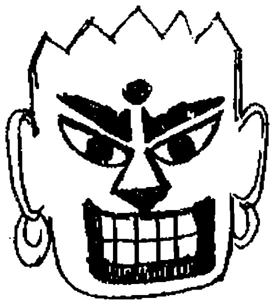

এমন তাজ্জব জীবনে হয়নি টুপুর। ভদ্রলোক বলছেনটা কী? খোদ শেঠ রুস্তমজি কালো হন্ডা সিটিটা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন? আর সেই গাড়িতেই কিনা রনি নিখোঁজ?

পার্থরও চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার দশা। ধন্ধমাখা মুখে একবার টুপুরকে দেখল, পরক্ষণে মিতিনকে। প্রায় পেন্ডুলামের মতো ঘুরছে তার মাথা। কী যেন বলতে গেল মিতিনকে, স্বর ফুটল না।

মিতিনও প্রথমটায় চমকেছিল। তবে সামলে নিয়েছে এখন। স্বাভাবিক গলাতেই ফের জিজ্ঞেস করল, "গাড়ির জন্য কবে ফোন করেছিলেন রুস্তমজি?"

দ্বিজেন হালদার মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "আশ্চর্য, মিস্টার জরিওয়ালা কেন ফোন করতে যাবেন? তাও এত সামান্য ব্যাপারে? ফোন এসেছিল ওঁর অফিস থেকে।"

"কে করেছিলেন?"

"অতশত বলতে পারব না। কেউ একজন করেছিল, গাড়ি চলে

গিয়েছে, ব্যস।" দ্বিজেন হালদার ঈষৎ তেরিয়া, "আপনারা এসব জেনে কী করবেন?"

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন জুড়ল মিতিন, "রুস্তমজির নাম করে যে-কেউ ফোনে গাড়ি চাইলেই আপনি পাঠিয়ে দেন?"

"এমন বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বলছেন কেন?" দ্বিজেন যেন এবার বেশ ক্ষিপ্ত। সামান্য চড়া গলাতেই বললেন, "হ্যাঁ, দিই। মিস্টার জরিওয়ালার সঙ্গে এভাবেই আমার বিজনেস চলছে আজ পনেরো বছর ধরে। জাস্ট একটা রিং পেলেই গাড়ি চলে যায়। কখনও ওঁর অফিস, কখনও এয়ারপোর্ট, কখনও হোটেল... এনি ড্যাম প্লেস, যেখানে ওঁরা হুকুম করেন। মাসের শেষে থোক বিল পাঠাই, দিন পনেরোর মধ্যে পেমেন্ট এসে যায়। আমার সিস্টেমে কি ভুলচুক আছে কোনও?"

এবারও প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মিতিন। নিরীহ স্বরে বলল, "ওঁরা কি কাল ওই হন্ডা সিটিটাই চেয়েছিলেন?"

"অবশ্যই। নইলে আমি পাঠাব কেন? বিশেষ কোনও নির্দেশ না থাকলে ইন্ডিকা-ফিন্ডিকা গোছের কিছু যায়।"

"আপনার কি ওই একটাই কালো হন্ডা সিটি?"

"হ্যাঁ। কালো রঙে একটা আভিজাত্য আছে তো, অনেক ক্লায়েন্টই ওটা লাইক করেন।"

"মিস্টার জরিওয়ালার অফিসে ওই গাড়িটি কি এবার প্রথম গেল?"

দ্বিজেন হালদার একটু ভেবে বললেন, "বোধহয়। সাধারণত কোনও বড় হোটেল-টোটেলই তো গাড়িটা বুক করে।"

"আর-একটা প্রশ্ন না করে পারছি না মিস্টার হালদার। গাড়িটা যে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে পাঠাতে বলা হল, এতে আপনি অবাক হননি?"

"ভাবলাম, মিস্টার জরিওয়ালার কোনও পারসি গেস্ট এসেছেন।" বলতে-বলতে দ্বিজেন হালদারের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের রেখা, "দেখুন ম্যাডাম, অবাক হওয়া আমার পেশা নয়। ক্লায়েন্টদের সন্তুষ্ট রাখাটাই আমার কাজ। তাঁরা চাইলে ধাপার মাঠেও আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।"

"বুঝলাম।" মিতিন তর্জনীটা তুলল, "আচ্ছা, মিস্টার জরিওয়ালারাই কাল গাড়িটা নিয়েছেন, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো?"

"মানে? আর কে নেবে?"

"একবার ফোন করে কনফার্মড হয়ে নিলে হত না?"

দুম করে মেজাজ হারালেন দ্বিজেন হালদার, "আপনারা এবার আসুন তো ম্যাডাম। কী ব্যাপারে, কাকে নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন আমি জানি না। তবে এখানে গোয়েন্দাগিরি ফলিয়ে কোনও লাভ নেই। দ্বিজেন হালদার আজ পর্যন্ত কোনও কাঁচা কাজ করেনি। করেও না।"

"বেশ। চলি তা হলে। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।"

মিতিন বেরিয়ে আসছিল, পিছন থেকে দ্বিজেন হালদারের গলা উড়ে এল, "ম্যাডাম, আপনার কার্ড ফেলে গেলেন যে!"

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "ওটা থাক। আপনার দরকার হতে পারে।"

বিচ্ছিরি একটা মুখভঙ্গি করলেন দ্বিজেন হালদার। বঙ্কিম হেসে বললেন, "ওকে। থাক। অ্যাজ ইউ প্লিজ।"

বাইরে এসে পার্থ গরগর করে উঠল, "আচ্ছা খিটকেল লোক তো! ভালভাবে কথা বলতে জানে না!"

মিতিন আলগাভাবে বলল, "গোয়েন্দা দেখলে কে আর খুশি হয়?"

"ভদ্রলোকের হাবভাব কিন্তু বেশ সন্দেহজনক গো মিতিনমাসি।" টুপুর ফুট কাটল, "একবার জানতে পর্যন্ত চাইলেন না, কেন হঠাৎ অফিসে ডিটেকটিভ এসেছে!"

"এই ধরনের লোকদের কী বলে জানিস? ওভার কনফিডেন্ট। একদিক দিয়ে দেখলে এরা খুব নির্বোধও। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।"

হাঁটিতে-হাঁটিতে পার্কিং-লটে এল তিনজনে। পার্থই চালকের আসনে বসল। মিতিন তার পাশে। পিছনে টুপুর।

গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "নেক্সট গন্তব্য কী জানতে পারি?"

"ভাবছি।"

"রুস্তমজির অফিসে একবার ঢুঁ মারবে নাকি?"

"না, থাক। বাড়িই চলো। টায়ার্ড লাগছে।"

"বিকেল পাঁচটাতেই দম ফুড়ুৎ?"

"যা কিছু ভাবতে পারো। তবে আজকের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।"

"ফেরত পথে তা হলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের কাছটায় দাঁড়াই! কয়েক প্লেট স্টিম্‌ড মোমো কিনে নিই? পেটটা চুঁইচুঁই করছে। দুপুরে জমিয়ে টিফিনটা হল না...!"

"কেনো। টুপুরেরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।"

"বুমবুমটাও মোমো খুব ভালবাসে।"

"হুম।"

গাড়ি দৌড় শুরু করার পর মিতিনের মুখে আর বাক্যিটি নেই। কী যেন ভাবছে। ভেবেই চলেছে। পথে মোমো কেনা হল, চিপ্‌স আর কোল্ড ড্রিঙ্কস খেল পার্থ-টুপুর, মিতিন যেন দেখেও দেখল না।

টুপুরও বেশি ঘাঁটাল না মিতিনমাসিকে। চিন্তার সময় খোঁচাখুঁচি করলে মাসি রেগে যায়।

বাড়ি ঢুকেই মিতিন সোজা স্নানে। শীতল জলধারায় বুঝি তাজা করছে শরীর-মন।

পার্থ আর টুপুর মোমো নিয়ে বসে গেল। বুমবুমও লাফাতে-লাফাতে হাজির। টপাটপ তুলে গপাগপ পুরছে মুখে। সুড়ুৎ-সুড়ুৎ চুমুক মারছে চিকেন স্টকে। আরতি কফিও বানিয়ে দিল চটপট।

খেতে-খেতে পার্থমেসোর সঙ্গে তর্ক চলছিল টুপুরের। ওই দ্বিজেন হালদার লোকটাকে নিয়েই। টুপুরের ধারণা, দ্বিজেন হালদার নিশ্চয়ই অপহরণ কেসে যুক্ত, পার্থ মোটেই সহমত নয়। যুক্তি, পালটা যুক্তির কাটাকুটি বেধেছে জোর।

টকটকে লাল চাটনিতে চিকেন মোমো মাখাতে-মাখাতে পার্থ বলল, "মাথা ঠান্ডা করে ভাব। আমরা তিন-তিনজন হানা দিয়েছি...। ক্রাইমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে লোকটা কি একটুও ব্যাকফুটে যেত না?"

"আরে বাবা, রুস্তমজি ডিটেকটিভ লাগিয়েছেন, এ সংবাদ তো এখন ক্রিমিনালদের অজানা নেই। দ্বিজেন হালদার তাই হয়তো আগে থেকেই অ্যালার্ট ছিলেন। ইচ্ছে করে মিসলিড করছিলেন আমাদের। শেঠ রুস্তমজির নাম জড়িয়ে কেসটাকে যদি ঘেঁটে দেওয়া যায়...!"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তোর মাসি রুস্তমজিকে একটা ফোন করলেই তো সত্যি-মিথ্যেটা ফাঁস হয়ে যাবে। আর এই বুদ্ধিটুকু নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের ঘটে আছে! আমার রিডিং, দ্বিজেন হালদার অভদ্রতা করেছে বটে, কিন্তু নাটক করেনি।"

"অর্থাৎ কেউ একজন ফোনে গাড়ি চেয়েছিল, আর ভদ্রলোক অমনি কোনও কিছু যাচাই না করে রুস্তমজিদের নামে হন্ডা সিটিখানা পাঠিয়ে দিলেন?"

"এরকমটা হয়েই থাকে টুপুর। একে নামী কোম্পানি, তায় পুরনো ক্লায়েন্ট, এ ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি খুব একটা থাকে না রে। জাস্ট একটা ফোনকলই যথেষ্ট।"

"যদি তোমার লজিক মেনেও নিই..., দ্বিজেন হালদারের মনে কি একবারও প্রশ্ন জাগল না, গাড়িটাকে কোথায় রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে? স্টেশন নয়, এয়ারপোর্ট নয়, হোটেল কিংবা অফিস নয়..., গাড়ি যাবে কিনা সেই টাওয়ার অফ সাইলেন্সে? কথাটা কি একটু সাজানো লাগে না?"

"এটাই তো প্রমাণ করে, রুস্তমজির অফিস থেকেই গাড়িটা চাওয়া হয়েছিল।"

"আশ্চর্য, শহরে এত জায়গা থাকতে টাওয়ার অফ সাইলেন্স কেন?"

"টাওয়ার অফ সাইলেন্স কী জানিস?"

"খুব জানি। পারসিদের সিমেট্রি। পারসি ধর্মে দাহ করা বা সমাধি দেওয়ার প্রথা নেই। ওরা একটা মিনারের চূড়ায় ডেডবডি রেখে আসে, চিল-শকুনে সেই মৃতদেহ খায়।"

"কারেক্ট। পারসিরা মনে করে, অন্য কোনও পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার হলে আগুন, মাটি আর জল অপবিত্র হবে।" সুযোগ পেয়ে পার্থ জ্ঞান বিতরণ করল, "কলকাতায় প্রথম টাওয়ার অফ সাইলেন্স, পারসিদের ভাষায় যাকে বলে 'দখ্‌মা', তৈরি হয়েছিল আঠেরোশো বাইশ সালে। যিনি বানিয়েছিলেন তাঁরও নাম রুস্তমজি। পুরো নাম, রুস্তমজি কাওয়াস্‌জি বানাজি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথের বন্ধু। পরে প্রথমটি বন্ধ করে দ্বিতীয় দখ্‌মাটি বানানো হয়। উনিশশো বারো সালে।"

"তো?" টুপুর রীতিমতো অসহিষ্ণু। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এর সঙ্গে কেসের কী সম্পর্ক?"

"নেই। আবার আছেও। এটুকু তো অন্তত পরিষ্কার হল, গাড়িটা নিশ্চয়ই কোনও পারসি...!"

"ঘোড়ার মাথা।" মিতিন ঘরের দরজা থেকে টিপ্পনী ছুড়ল হঠাৎ। ভিজে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে এসে বসল সোফায়। ভ্রূ নাচিয়ে বলল, "যত সব আজগুবি ভাবনা মাথায় আসে কোত্থেকে? গাড়ি বেলেঘাটার টাওয়ার অফ সাইলেন্সে গেলে কোনও পারসিই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এমনটা ধরে নেওয়ার কি কোনও কারণ আছে?"

"আমিও তো তাই বলছি।" টুপুর কলকল করে উঠল, "মেসো খামোখা এই কেসে পারসিদের ঢোকাচ্ছে। কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, এটা দ্বিজেন হালদারের একটা চাল।"

"চাল, না ভাত, এক্ষুনি দেখতে পাবি।" চিরুনি রেখে একখানা মোমো তুলল মিতিন। কামড় দিয়ে বলল, "দশটা মিনিট অপেক্ষা কর। নিউজ আসছে।"

আরতি মিতিনের কফি আনল। টেবিলে কাপ রেখে বলল, "আমি তা হলে এবার রওনা দিই?"

"রুটিটুটি সব কমপ্লিট?"

"হ্যাঁ। ঝাল-ঝাল আলুর দমও বানিয়েছি। সঙ্গে মেটে-চচ্চড়ি।"

"আয় তা হলে। মোমো খেয়েছিস?"

"হ্যাঁ। দাদা দিয়েছে।"

"আরও তো অনেক রয়েছে, তোর মেয়ের জন্য দু'-চারটে নিয়ে যা। শাশুড়ির জ্বর হয়েছে বলছিলি, সেরেছে?"

"না গো। ভাবছি আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

"দেখিস বাবা, সিজন চেঞ্জের সময় নানান রোগব্যাধি হয়। মেয়েকেও সাবধানে রাখিস। সারাদিন ঠাকুরমার কাছে থাকে, তার যেন ছোঁয়াচ না লাগে।"

ঘাড় নেড়ে গোটাচারেক মোমো ঠোঙায় ভরে নিল আরতি। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, মিতিনের মোবাইলে ঝংকার।

খুদে যন্ত্রটি কানে চেপেই মিতিনের ঠোঁটে মুচকি হাসি। মাইক্রোফোনের বোতামটা টিপে দিয়ে বলল, "আরে, দ্বিজেনবাবু যে? এত তাড়াতাড়ি আমায় স্মরণ করলেন যে বড়?"

দ্বিজেন হালদারের আর্তস্বর ধ্বনিত হল, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ম্যাডাম! আমি তো ধনেপ্রাণে মারা গেলাম!"

"কেন?" মিতিনের গলায় মধু ঝরছে, "কী হল?"

"আপনারা যাওয়ার পর মনটা কেমন খচখচ করছিল। হঠাৎ এসে এত প্রশ্ন করলেন...! নির্ঘাত কোনও কারণ আছে...! তবু রুস্তমজির অফিসে ফোন করতে পারছিলাম না, যদি ওঁরা কিছু মাইন্ড করেন...! শেষে মরিয়া হয়ে এই খানিক আগে অশোকবাবুকে ফোন করেছিলাম।"

"অশোকবাবু মানে মিস্টার জরিওয়ালার প্রাইভেট সেক্রেটারি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। উনিই তো বেশিরভাগ সময় যোগাযোগ করেন। এবার অবশ্য উনি ফোন করেননি...! তখনই আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল...! আজকাল যা সব কাণ্ড ঘটছে...!"

"আহা, কী হয়েছে বলবেন তো?"

"অশোকবাবু যা বললেন, তাতে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ওঁদের অফিস থেকে কাল নাকি কোনও গাড়িই চাওয়া হয়নি! শুধু তাই নয়, গত পনেরো দিনের মধ্যে রুস্তমজিদের কোনও গেস্টও আসেননি কলকাতায়!"

"অর্থাৎ আপনার গাড়ি গায়েব, তাই তো?"

"সেরকমই তো দাঁড়ায়। আমার ড্রাইভারকে রিং করলাম, এক-দু'বার নয়, বারদশেক। এক উত্তর আসছে, মোবাইলটি এখন বন্ধ আছে!"

"খুবই দুঃসংবাদ। আমি অবশ্য এরকমই কিছু আন্দাজ করেছিলাম।" মিতিনের স্বরে এতটুকু হেলদোল নেই। ঠান্ডা গলায় বলল, "এখন কী করবেন?"

"ভেবে পাচ্ছি না। আপনিই বলুন...! আমার নিশ্চয়ই এক্ষুনি পুলিশকে জানানো উচিত?"

"সেটাই নিয়ম। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার একটু বিপদ আছে। হাতে হাতকড়িও পড়তে পারে।"

"কেন?" দ্বিজেন হালদারের গলা কাঁপল, "কী করেছি আমি?"

"কাল দুপুর তিনটে নাগাদ আপনার ওই হন্ডা সিটিতে সেন্ট পিটার্স স্কুলের একটি বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। শুনলে আপনার আরও খারাপ লাগবে, অপহৃত বাচ্চাটি শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালার একমাত্র সন্তান।"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ?" বিস্ময় আর আতঙ্ক একসঙ্গে ঠিকরে উঠল ওপারে। তারপর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও আওয়াজ নেই। অবশেষে ফের সরব হলেন দ্বিজেন হালদার। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "কই, অশোকবাবু তো আমায় কিছু বললেন না?"

"মিস্টার জরিওয়ালা ঘটনাটি যথাসম্ভব গোপন রেখেছেন। অশোকবাবুরও জানার কথা নয়।"

"ও। আপনি বুঝি মিস্টার জরিওয়ালার ছেলের কেসের ব্যাপারেই?"

"হ্যাঁ। আমি রনিকে খুঁজছি।"

"বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আমি বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। আমার গাড়ি গিয়েছে, ক্লায়েন্টও গেল, আজ হোক, কাল হোক, পুলিশও আমায় ধরবে...! কী গাড্ডায় যে পড়লাম!"

"আমার একটা বুদ্ধি নেবেন?"

"হ্যাঁ, বলুন, বলুন। আমি একটি আস্ত বুরবক, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।"

"আপাতত মুখে চাবি দিয়ে রাখুন। অন্তত কাল আর পরশু, দুটো দিন। ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানাবেন না, রুস্তমজির অফিসেও আর যোগাযোগ করবেন না। পুলিশের হ্যাপাটা আমি দেখছি। যদি অপকর্মের ভাগীদার না হন, নির্ভয়ে থাকতে পারেন।"

"গাড়িটা ফেরত পাব তো? প্রায় দশ লাখ টাকা দাম...!"

"দেখা যাক, আপনার কপালে কী আছে!"

কথা শেষ হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পার্থ। দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলল, "বেড়ে মজা, বেড়ে মজা! সিংহের রোয়াব ছেড়ে দ্বিজেন হালদার এখন নেংটি ইঁদুর! আর-একটু স্ক্রু টাইট দিলে না কেন?"

"ভুল করছ পার্থ, কাউকে জব্দ করা আমার কাজ নয়।" মিতিনের শান্ত জবাব, "আমার এখন একটাই টার্গেট, ক্রিমিনালদের পাকড়াও করা।"

"এবং রনিকে অক্ষত দেহে উদ্ধার।" টুপুর বাকিটা যোগ করে দিল, "আমাকে তো রনির চিন্তাই বেশি কুরে-কুরে খাচ্ছে।"

"সেই দুর্ভাবনা কি আমারও নেই রে?" মিতিন শুকনো হাসল, "রনিকে যারা ধরে রেখেছে, তারা অত্যন্ত ধড়িবাজ। পুলিশ বা গোয়েন্দাকে ঠকানোর জন্য তাদের বন্দোবস্ত প্রায় নিখুঁত।"

"যা বলেছ। গাড়ির ক্লুটাও কেমন যেন পিছলে গেল। কে গাড়ি নিয়েছে, বোঝার তো কোনও জো রাখেনি।"

"তাতে কী! না চাইতেই দু'-চারটে সূত্র তো হাতে এসেইছে। কিছু ফাঁকফোকরও।"

"যেমন?"

"প্রত্যেকের স্টেটমেন্ট খুঁটিয়ে স্মরণ কর।" মিতিন কফিতে চুমুক

দিল, "এনিওয়ে, আমি যা স্মেল পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে রুস্তমজির অনুমানই সঠিক। টাকাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। খুনখারাপিতে যাওয়ার মতো হিম্মত তাদের হবে না।"

পার্থ চোখ কুঁচকে বলল, "তুমি যেন তাদের মনের কথা পড়ে ফেলেছ?"

"কিছুটা তো বটেই। আমার প্রেডিকশন সহজে ভুল হয় না। দেখলে তো, দ্বিজেন হালদারের ফোন কেমন এসে গেল!"

"ওটা তো স্রেফ ঝড়ে বক। দ্বিজেনবাবু যদি রুস্তমজির প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ফোন না করতেন, তা হলেই তোমার কেরামতি গন।"

"একেই তো থটরিডিং বলে স্যার। আমি একশো পার্সেন্ট শিয়োর ছিলাম, ভদ্রলোক রুস্তমজির অফিসে কনট্যাক্ট করবেনই।"

"ধরো, যদি না করতেন?"

"তা হলে তো কেস অবিলম্বে সলভ্‌ড। দ্বিজেন হালদারকে খোদ কিডন্যাপার বলে কোমরে দড়ি পরাতাম।" মিতিন মুখ টিপে হাসল, "এক্ষুনি আর-একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব?"

"কী?"

"রাতে আজ আর-একটা ফোন আসবে।"

"এটা বলতে টিকটিকি হওয়ার প্রয়োজন নেই।" পার্থ হা-হা হাসছে, "তোমার ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই রাত্তিরে একটা কল করবেন!"

"আমি রুস্তমজির কথা বলিনি। উনি তো করবেনই। অন্য একজনের কথা বলছি।"

টুপুর বলল, "আমি বলব?"

"শুনি।"

"রনিদের স্কুলের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম। ভদ্রমহিলা খুব টেনশনে আছেন।"

"তিরটা ভালই ছুড়েছিলি। তবে একটুর জন্য ফসকাল।" টুপুরের মাথায় আলগা চাঁটি মেরে মিতিন বলল, "ফোনটা আসবে রনির ক্লাসটিচারের, মিস প্রিয়াঙ্কার।"

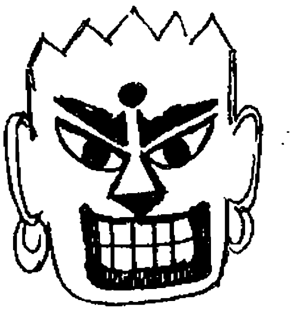

ছেঁড়া-ছেঁড়া একটা স্বপ্ন দেখছিল টুপুর। এক গভীর জঙ্গল..., বুমবুম ঝোপঝাড়ের মাঝখানে কম্পিউটার বসিয়ে রোডর‍্যাশ খেলছে...। হঠাৎই দুই মুশকো খেলুড়ে বেরিয়ে এল মনিটরের কালো গাড়ি থেকে...। মুখ বেঁধে ফেলল বুমবুমের...। পাঁজাকোলা করে বুমবুমকে তুলল গাড়িটায়...। কম্পিউটারের পরদায় ফের ছুটল গাড়ি...। টুপুরও দৌড়োল পিছন-পিছন...। আচমকা সামনে এক পাহাড়...। লোক দুটো বুমবুমকে পাহাড়ের গুহায় ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল...। প্রকাণ্ড একখানা পাথর এনে আটকে দিল গুহার মুখ...। কোত্থেকে তখনই প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম আর রনিদের স্কুল-গেটের সেই দরোয়ানটা হাজির...। টুপুর ছুটে প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের কাছে গেল...। প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'কার্ড কই, কার্ড...!' টুপুর চিৎকার করে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু স্বর ফুটল না...। পিছন থেকে কে যেন ডাকল টুপুরকে...। একবার ডাকল, দু'বার...!

ওই ডাকেই বুঝি বিকট স্বপ্নখানা ভেঙে খানখান। চমকে চোখ খুলে টুপুর দেখল, সামনে মিতিনমাসি। হাতে চায়ের কাপ।

ভ্রূ কুঁচকে মিতিনমাসি বলল, "কী রে, উঠবি না?"

এখনও স্বপ্নের রেশটা কাটেনি টুপুরের। চোখ রগড়ে বলল, "অনেক বেলা হয়েছে বুঝি?"

"সাড়ে সাতটা। আমার কত কাজ হয়ে গেল, তুই এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিস?"

"কী কাজ করলে?" টুপুর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

"অনিশ্চয়দার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা সেরে নিলাম। রুস্তমজির সঙ্গে কিছু বাতচিত হল...!"

"কিডন্যাপিং-এর খবরটা অনিশ্চয় আঙ্কলকে জানিয়ে দিলে নাকি?"

"ঝেড়ে কাশিনি, তবে সামান্য হিন্ট দিয়ে রেখেছি। আল্টিমেটলি পুলিশকে তো লাগবেই। তা ছাড়া পদে-পদে কত ইনফরমেশন চাইতে হচ্ছে...।" চায়ে চুমুক দিয়ে চোখে একটা রহস্যময় হাসি ফোটাল মিতিন, "তোর বাবাকেও একটা ফোন লাগিয়েছিলাম।"

"আমার বাবাকে? কেন গো?"

"হঠাৎ মনে পড়ল, তোর বাবার একবার পারসিয়ান ভাষা শেখার খুব ঝোঁক চেপেছিল। ভাবলাম, সেই সূত্রে যদি কোনও পারসি বন্ধুটন্ধু থাকে...!"

"আছে?"

"অবশ্যই। এক পারসি অধ্যাপকের সঙ্গেই নাকি তোর বাবার বেজায় খাতির। ভদ্রলোকের নাম রতন দস্তুর। কপালটা আমার এমনই ভাল, ওই রতন দস্তুর নাকি টানা আট বছর পারসি ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। কলকাতার পারসিকুলের হাড়হদ্দ তাঁর নখদর্পণে।"

"তো? পারসিদের খোঁজখবর জেনে কী হবে?"

"বা রে, রুস্তমজি মানুষটি কেমন, বাজিয়ে দেখতে হবে না? তাঁর সম্পর্কে ডিটেলে জানলে কোনও সমাধানসূত্র তো মিলতেও পারে!"

"মানে?"

"মানেটা পরে শুনিস। এখন ঝটাপট মুখটুখ ধুয়ে আয়, নাস্তা রেডি হচ্ছে।"

ভ্যাবলা মুখে দাঁত মাজতে গেল টুপুর। পেস্ট লাগাল ব্রাশে, দৃষ্টি বাথরুমের আয়নায়। হঠাৎ এ কী খেয়াল মিতিনমাসির? রুস্তমজিকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে জাগল যে বড়? রুস্তমজি যেমনই হন, অপহরণের সঙ্গে তাঁর কী যোগ? নাকি মিতিনমাসি রুস্তমজির পরিবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান? কোন দিকে গড়াচ্ছে মিতিনমাসির সন্দেহ? রুস্তমজির কোনও আত্মীয়স্বজন...? মাত্র এক কোটি টাকার লোভে নিশ্চয়ই রুস্তমজির ভাই অপকর্মটি করাননি! তাঁর নিজেরই তো অগাধ সম্পত্তি। তা হলে? কলকাতার পারসিমহলের কেউ? গাড়িটা টাওয়ার 'অফ সাইলেন্সে গিয়েছিল বলেই কি এমন একটা ধারণা জন্মাল মিতিনমাসির? কিন্তু কাল তো ওই পয়েন্টটাকে সেভাবে আমলই দেয়নি!

না, মিতিনমাসির থই পাওয়া দুষ্কর। কখন যে কোন দিকে মগজ ছোটাছুটি করে! অবশ্য মিতিনমাসির আন্দাজ যে খুব একটা ভুল পথে চলে না, এ প্রমাণ তো টুপুর কাল রাত্তিরেও পেয়েছে। রুস্তমজির আগেই ফোন এসে গেল প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের। রনির পুরনো আই-কার্ডটি নাকি ঠিকঠাকই আছে, চাইলে প্রিয়াঙ্কাম্যাডাম মিতিনমাসির বাড়ি এসে দেখিয়ে যেতে পারেন। খুব কাকুতি-মিনতিও নাকি করছিলেন মহিলা, যাতে পুলিশকে না জানানো হয়, যেন তাঁর চাকরিটা বজায় থাকে...। মিতিনমাসি অবশ্য তাতেও বিশেষ গলেনি, বরং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য প্রিয়াঙ্কাম্যাডামের উপর এখনও বেশ ক্ষুব্ধ। তবে সম্ভবত মিতিনমাসির সন্দেহের তালিকা থেকে তিনি বাদ পড়েছেন।

টুকটাক চিন্তাগুলো মাথায় নাড়াচাড়া করতে-করতেই টুপুর খাওয়ার টেবিলে এল। কমিক্স মুখে একমনে দুধ-কর্নফ্লেক্স খাচ্ছে

ঝুমঝুম। পার্থ খবরের কাগজে মগ্ন। আরতি পাহাড়প্রমাণ ফ্রেঞ্চ-টোস্ট বানিয়ে রেখে গেল, প্লেটে-প্লেটে তুলে দিল মিতিন।

খাবারের গন্ধেই বুঝি চোখ তুলল পার্থ। টেবিলের আহার্য বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে-করতে বলল, "আজও কি তোমাদের হোল-ডে আউটিং? দুপুরে খেতে ফিরছ না?"

"সম্ভাবনা কম। হাতে তো মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা।" মিতিন টম্যাটো সসের বোতলটা টানল। চোখ তেরচা করে বলল, "তুমি কি আজ আমাদের সঙ্গে থাকছ না?"

"থাকতেই পারি। প্রেসে একটা ফোন করে দিলেই তো আমি ফ্রি।" পার্থকে রীতিমতো চনমনে দেখাল, "বাই দা বাই, কোন পথে আজ যাত্রা শুরু?"

"প্রথমে রুস্তমজির অফিস যাব।"

"কেন?"

"প্রশ্ন নয়। গেলেই দেখতে পাবে।"

"রুস্তমজি কি আজই মুক্তিপণের টাকাটা রেডি করছেন?"

"কাল রাতে তো তাই বললেন।"

"তবে কিডন্যাপারদের ফরমায়েশ মতো টাকার ব্যবস্থা করতে কিন্তু কালঘাম ছুটে যাবে বেচারার।" পার্থ একখানা ফ্রেঞ্চ-টোস্ট তুলল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "কত ফ্যাচাং, ভাবো। বাবুরা নতুন নোট নেবেন না, হাজার টাকার নোট চলবে না, গোটাটাই চাই পাঁচশো আর একশোয়। ওভাবে এক কোটি ক্যাশ জড়ো করা সোজা কথা নাকি?"

টুপুর মুখ বেঁকিয়ে বলল, "লোকগুলো মহা শয়তান। কাল রাত্রিরে রুস্তমজিকে টাকার অর্ডার দিল, কিন্তু কোথায় দিতে হবে কিছুতেই ভাঙল না।"

"কিডন্যাপারদের তো ওটাই নিয়ম। খেলিয়ে-খেলিয়ে হুকুম জারি

করে, উলটোপালটা চরকি খাওয়ায়। এই যদি বলে ‘টালায় এসো’, তো দু’ঘণ্টা পরে বলবে ‘টালিগঞ্জে অপেক্ষা করছি’। কখনওই সোজা পথে হাঁটবে না, মানুষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।”

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকগুলো পাকা খেলুড়ে। বারবার পাবলিক বুথে যাচ্ছে, ভুলেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে না।”

“হুম। ওতে যে নেটওয়ার্ক দেখে বাবুদের অবস্থানটি ধরা সহজ হয়।” পার্থ চোখ সরু করল, “আচ্ছা মিতিন, কাল কোন বুথ থেকে ওরা ফোন করেছে, ট্রেস করা গেল?”

“শিয়োর। দমদমের যশোর রোড থেকে এবং এটি আগের বুথটার কাছেই।”

টুপুর অবাক হয়ে বলল, “এত তাড়াতাড়ি তুমি জানলে কীভাবে?”

“ভেরি সিম্পল। ওই নাম্বারে জাস্ট একটা কল।”

“ও মা, তা হলে আগের বার অনিশ্চয় আঙ্কলের সাহায্য নিলে কেন?”

“পুলিশকে একটু ছুঁইয়ে রাখতে হয়। নইলে কাল যখন হেল্প চাইব, অনিশ্চয়দার গোঁসা হতে পারে।” বলতে-বলতে মিতিনের নজর বুমবুমে। চোখ পাকিয়ে বলল, “অ্যাই, তুই হাঁ করে কী গিলছিস রে?”

বুমবুমের পিলে-চমকানো জবাব, “কেসটা স্টাডি করছি।”

টুপুরের চোখ বড়-বড়, “তুই জানিস কেসটা কী?”

“জানি তো। রনি বলে একটা ছেলে স্কুল থেকে কিডন্যাপড হয়েছে। এক কোটি টাকা র‍্যানসম চেয়েছে দুষ্টু লোকগুলো। মা ওই পাজি লোকগুলোকে ধরবে।”

“খুব হয়েছে। এখন দুধটুকুন শেষ করে ওঠো তো!” মিতিন লঘু ধমক দিল ছেলেকে, “গিয়ে স্কুলের বইখাতা ঠিকঠাক গুছিয়ে নাও। স্কুলবাস আসার মুহূর্তে এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায় গেল, এসব যেন শুনতে না হয়।”

টুপুর বলল, "আর শোন, স্কুলবাসে ওঠা-নামার সময় খুব সাবধান। চেনা-অচেনা কেউ ডাকলেও যাবি না। সোজা বাসে উঠবি, আর বাস থেকে নেমে স্ট্রেট বাড়ি।"

"জানি। তোকে জ্ঞান দিতে হবে না।"

আলোচনার আসর থেকে হঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বেশ ক্ষুণ্ণ হল বুমবুম। তবে মা'র ভয়ে চলেও গেল টুপুরকে একটা ভেংচি কেটে।

ছেলেকে দেখতে-দেখতে পার্থ তারিফের সুরে বলল, "বুমবুমের কী আই-কিউ দেখেছ? চুপচাপ থাকে, কিন্তু সব অবজার্ভ করে।"

"এবং মগজে গেঁথে নেয়।" মিতিন আলতো হাসল, "ভাল গোয়েন্দাদের এই ফোটোগ্রাফিক মেমারিটা থাকা একান্তই জরুরি। একবার যা দেখবে বা শুনবে, সেটা ভোলা চলবে না।"

"বুমবুম বড় হয়ে তা হলে ডিটেকটিভ হবে বলছ?"

"উঁহু, তার জন্য অনেক চর্চা দরকার। আসলে বাচ্চাদের ফোটোগ্রাফিক মেমারিটা থাকে। এর সঙ্গে ঘটনা পরম্পরা সাজানো, সেগুলোকে সঠিক উপায়ে বিশ্লেষণ করার জন্য চাই দীর্ঘ অভ্যাস। নইলে শুধু গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েই থাকতে হবে টুপুরের মতো।"

টুপুরের আঁতে লাগল কথাটা। আহত মুখে বলল, "আমি কি কিচ্ছু বিশ্লেষণ করতে পারি না?"

"পারিস? আচ্ছা বল তো, কাল সারাদিনে কেসের কোন পয়েন্টটা তোকে বেশি স্ট্রাইক করেছে?"

"স্কুলের ওই আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যাপারটা?" বলেই জোরে-জোরে মাথা নাড়ল টুপুর, "না না, ওই কালো হন্ডা সিটি..., মানে যেটা ভাড়া করা হয়েছিল।"

"ভেবেচিন্তে বল।"

"বুঝেছি। তুমি নিশ্চয়ই ফোন-বুথে আসা লোক দুটোর কথা বলছ? যারা সাইকেলে...!"

"তুত, ওগুলো তো কেসের সূত্র, ক্লু। স্ট্রাইকিং পয়েন্টটা আলাদা।"

"যেমন?"

"আমরা যে কেসটা টেকআপ করেছি, ক্রিমিনালরা তা জানল কী করে?"

"এটা কী এমন কঠিন? ঘটনাটা জানে তো মাত্র চারজন। রুস্তমজি, লীলাম্যাডাম, বি এম ডব্লিউর ড্রাইভার, আর কাজের মেয়েটি।" বলেই টুপুর তড়াক লাফিয়ে উঠল, "তারক, তারক। ড্রাইভার তারকই তো সোর্স।"

"আর-একজনকে বাদ দিলি। রনির স্কুলের প্রিন্সিপাল-ম্যাডাম।"

"উনি কেন জানাতে যাবেন?" উত্তেজনায় আঙুল নাচাল টুপুর, "তারকই বলেছে।"

"অত সহজে দুয়ে-দুয়ে চার করিস না। তারকই বা জানবে কী করে যে আমি ডিটেকটিভ? আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়, লেটারবক্সে, কোথাও তো পেশাটা লেখা নেই। রুস্তমজিও নিশ্চয়ই তারককে আমাদের পরিচয় দেননি।"

"তবু... মনে তো হতেই পারে। রনিকে পাওয়া যাচ্ছে না... তারপরই আমাদের ডাকা হল...!"

"ভুল করছিস টুপুর। দু'জন মহিলা, তার মধ্যে একজন স্কুলগার্ল, এদের ঝট করে ডিটেকটিভ বলে ধরা যায় কি?"

"অনুমান তো করাই যায়।"

"উঁহু, খটকাটা থেকেই যাচ্ছে।"

টুপুর চুপ করে গেল। মিতিনও খাচ্ছে নীরবে। পার্থ দু'জনকে ঝলকে দেখে নিয়ে বলল, "এবার আমি দু'-একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে, তবে তাড়াতাড়ি। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।"

"যশোর রোডের বুথটায় তুমি কখন কল করেছিলে?"

"কাল রাত্তিরেই। রুস্তমজির ফোন আসার মিনিট পনেরো পর।"

"অর্থাৎ অ্যারাউন্ড সাড়ে দশটা? ওপাশে কে ফোন ধরেছিল?"

"একজন মহিলা, নাম নীলিমা বসাক। তাকে আমি জিজ্ঞেসও করেছি, ন'টা কুড়ি থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কে বা কারা বুথে ফোন করতে এসেছিল। মহিলা জানিয়েছেন, একজনই এসেছিল, সাইকেলে। বয়স বছর চল্লিশ। চেহারা নেহাতই সাদামাটা এবং মহিলা তাকে আগে কখনও দেখেননি।"

"সে যাই হোক, দুটো ফোনকলের ঘটনা কি প্রমাণ করে দিচ্ছে না যে, দুষ্কৃতীরা কাছেপিঠে কোথাও থাকে? অন্তত লেক টাউন থেকে খুব দূরে নয়?"

"হতে পারে।"

"তা হলে তো কেসের সমাধান হয়েই গিয়েছে। এবার অনিশ্চয়দাকে জানিয়ে দাও। গোয়েন্দা বিভাগের আই জি ওই এলাকায় খানাতল্লাশি চালাক। কালো হন্ডা সিটিও বেরিয়ে আসবে, সঙ্গে রনিও।"

"কী সহজ পন্থা!" মিতিন দু'দিকে মাথা নাড়ল, "মাঝখান থেকে রনির প্রাণটা যাক আর কী!"

"আহা, তুমি আর রুস্তমজি দু'জনেই তো নিশ্চিত, ওদের খুনখারাপিতে যাওয়ার মুরোদ নেই!"

"ঠিক কথা। তবে ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রবল হলে তারা মরিয়া

হয়ে কী কাণ্ড ঘটাবে তা কি আগে থেকে বলা যায়? সুতরাং ওই ঝুঁকিতে আমি যাবই না।" মিতিন যেন সামান্য দম নিয়ে বলল, "তা ছাড়া ওই ঝুঁকি নিয়ে কোনও লাভও নেই।"

"কেন?"

"ক্রিমিনালরা যথেষ্ট চতুর। আমরা যে দুটো বুথেরই লোকেশন বের করে তাদের ধাওয়া করতে পারি, তারা ভাল মতোই জানে। তবু তারা দুটো কাছাকাছি বুথ থেকে ফোন করছে। সাইকেলও খানিক তফাতে রাখতে পারত, যাতে বুথ-মালিকের চোখে না পড়ে। কিন্তু রাখেনি। কেন? কারণ, তারা চায়, আমরা যেন ধরেই নিই তারা ধারেকাছে থাকে। যেখান থেকে সাইকেলে আসা-যাওয়া করা যায়।"

"তার মানে, রনিকে আরও দূরে কোথাও রেখেছে?"

"অন্তত তুমি যেরকমটা অনুমান করছ, সেরকম কোথাও নেই। ওরা চায়, অন্ধের মতো খুঁজে-খুঁজে আমরা নাকাল হই। ইতিমধ্যে টাকা দেওয়ার সময়টাও চলে আসুক। তখন মুক্তিপণটা নিয়ে, রনিকে ফেলে রেখে তারা চম্পট দেবে।"

পার্থ ভারী নিরাশ হল। গোমড়া স্বরে বলল, "তবে তো ফোনবুথের ক্লু কোনও কাজেই লাগবে না!"

"কিছুই ফ্যালনা নয় স্যার। যদি তাকে ঠিক-ঠিক ইউজ় করা যায়।"

ছোট্ট একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে মিতিন ঢুকে গেল স্নানে। পার্থ আর টুপুর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কী যে ধাঁধায় তাদের ফেলল মিতিন!

রুস্তমজির অফিস একটি বহুতল বাড়ির পঞ্চম তলায়। প্রবেশপথে কাচের দরজা। পেরোলেই রিসেপশন কাউন্টার, সাবেকি পি বি এক্স বোর্ড নিয়ে এক বাঙালি তরুণী সেখানে বিদ্যমান। অফিসটিও বেশ পুরনো ধাঁচের। প্রকাণ্ড ঘরখানায় আধুনিক ধারার কিউবিক্‌ল-টিউবিক্‌ল নেই, ছড়ানো-ছেটানো টেবিলে কাজ করছে জনাতিরিশেক কর্মচারী। কিছু-কিছু টেবিলে কম্পিউটার মজুত।

মিতিন রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে বলল, "আমরা একটু মিস্টার জরিওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"প্রয়োজনটা জানতে পারি?"

"একটা চ্যারিটির ব্যাপারে এসেছি। উনি ডোনেশন দেবেন বলেছিলেন।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি?"

"ইয়েস, এগারোটায়।"

ছোট্ট পি বি এক্স বোর্ডখানার সুইচ নামিয়ে কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলল মেয়েটি। তারপর ঘাড় হেলিয়ে মিতিনদের বলল, "প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যান। মিস্টার জরিওয়ালার চেম্বার একদম শেষে। গিয়ে সেক্রেটারিকে স্লিপ দিন, উনি স্যারের কাছে পাঠাবেন।"

রুস্তমজির ঘরের ঠিক বাইরেটায় তাঁর একান্ত সচিব অশোক মজুমদারের প্রকোষ্ঠ। কাচ দিয়ে ঘেরা। এখানেও টেবিলে কম্পিউটার আর অজস্র কাগজপত্র এবং টেলিফোন।

ল্যান্ডলাইনে কথা বলছিলেন অশোক মজুমদার। বয়স বছর

পঞ্চাশ, মাথায় হালকা টাক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পুরু লেন্সের ওপারে চোখ দুটো কেমন ড্যাবাড্যাবা, নিষ্প্রাণ।

মিতিন-পার্থর সঙ্গে টুপুরের মতো এক কমবয়সি আগন্তুককে দেখেও কোনও জিজ্ঞাসা ফুটল না অশোক মজুমদারের মুখমণ্ডলে। রিসিভারে হাত চেপে বাড়িয়ে দিলেন দর্শনার্থীদের স্লিপ। চটপট ফোনালাপ শেষ করে ঢুকলেন রুস্তমজির রুমে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে ভাবলেশহীন স্বরে বললেন, "যান ভিতরে।"

রুস্তমজির নিজস্ব কক্ষটি ভারী ছিমছাম, সাদামাটা। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীসুলভ জাঁকজমক নেই কোথাও, বরং একটু যেন সেকেলে ধরনের। কাঠের আলমারি, স্টিলের ক্যাবিনেট ছাড়া আসবাব বলতে একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর ক'টা চেয়ার। দেওয়ালে দুটো ফোটো ঝুলছে। চোগা চাপকান, টুপিধারী পারসি ভদ্রলোকটি সম্ভবত রুস্তমজির বাবা। অন্যটি এক শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসীর। জরথুস্ত্র।

একটি মোটা কুরসিতে বসে ছিলেন রুস্তমজি। উঠে দাঁড়িয়ে পার্থর সঙ্গে আলাপ করলেন। আসন গ্রহণ করতে বললেন মিতিনদের। বসতে-বসতে টুপুরের মনে হল, আজ যেন কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে রুস্তমজিকে! ও হ্যাঁ, চোখে আজ সোনালি ফ্রেমের চশমা! পরশু তো ছিল না।

মিতিনের মনেও বুঝি একই প্রশ্ন জাগল। জিজ্ঞেস করল, "এটা কি আপনার রিডিং গ্লাস?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম। তবে সামান্য মাইনাস পাওয়ারও আছে।"

"সব সময় পরেন না বুঝি?"

"একেবারেই পরতাম না। ইনফ্যাক্ট, আজ থেকেই শুরু করলাম।" বলতে-বলতে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন রুস্তমজি। চোখ কচলে বললেন, "খুব অসুবিধে হচ্ছে। তবে ডাক্তারের হুকুম, সারাক্ষণ চোখে লাগিয়ে রাখতে হবে।"

"প্রথম-প্রথম ওরকম অস্বস্তি হয়। সয়ে যাবে আস্তে-আস্তে।"

"হুম!" রুস্তমজি একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "তা ম্যাডাম, আপনাদের প্রোগ্রেস কদ্দূর?"

"এগোচ্ছে। কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি। আপনার টাকার বন্দোবস্ত কমপ্লিট?"

"আজ বিকেলের মধ্যে পুরোটা রেডি হয়ে যাবে।"

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার জরিওয়ালা, কীভাবে ব্যবস্থাটা করলেন যদি জানতে পারতাম...!"

কয়েক সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে মিতিনকে দেখলেন রুস্তমজি। শুকনো হেসে বললেন, "আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারছি ম্যাডাম। কিন্তু টাকার সোর্স আপনাকে যে বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, ব্যবসায়ীদের নানা সময়ে এই ধরনের কাঁচা টাকার প্রয়োজন হয় এবং কোনও প্রশ্ন ছাড়াই সেই টাকা জোগান দেওয়ার লোকও আছে কলকাতায়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার এই টাকা জোগাড়ের সংবাদ কাকপক্ষীও জানে না। কীভাবে করছি, কোত্থেকে করছি, কিচ্ছু না। এমনকী, লীলাকেও কথাটা ভাঙিনি। এখন সমস্যা শুধু একটাই। পাঁচশো আর একশো মিলিয়ে তো, টাকার আয়তনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

পার্থ মাথা দুলিয়ে বলল, "অর্থাৎ ক্যারি করার অসুবিধে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, সাহেবজি। কীভাবে নিয়ে যেতে হবে, ঝোলায় না ব্রিফকেসে, এখনও তো জানায়নি। প্লাস আমাকে আমার গাড়িতে যেতে অ্যালাও করবে কি না তাও তো বুঝছি না। যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ় করতে বলে ট্যাক্সি বা বাস গোছের কিছু, তা হলে হয়তো প্রবলেমে পড়ে যাব।"

"তা বটে। ওভাবে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও তো আছে।"

“আমি আর ওসব নিয়ে ভাবতে চাই না, সাহেবজি।” রুস্তমজির মুখখানা ভারী ফ্যাকাশে দেখাল। “সত্যি বলতে কী, ভাবনা করার ক্ষমতাও বুঝি লোপ পাচ্ছে। এবার বড় অসহায় বোধ করছি যেন।”

“স্বাভাবিক। এমন একটা সঙ্কটে পড়েছেন!”

“একটা নয় সাহেবজি, অনেক। নিজের কষ্ট চেপে এক দিকে স্ত্রীকে সামলাচ্ছি, অন্য দিকে বাইরের লোকের সামনে নরমাল থাকতে হচ্ছে, এ যে কী কঠিন! অফিসে আসতে প্রাণ চাইছে না, তবু তো জোর করে আসছি। যাতে আমার অফিসের কেউ কিছু আঁচ না করতে পারে। এই তো, সকালে এক বন্ধু ফোন করেছিল। হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলতে হল। এভাবে বুকে পাথর চেপে কি নিশ্বাস নেওয়া যায়?”

“কিন্তু স্যার, রনির মিসিং হওয়ার খবর তো আরও দু’জন জানে। তাদের মাধ্যমে কানাকানি হওয়া তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়।”

“আশঙ্কাটা আমার মাথায় ছিল। পরশুই দু’জনকে তাই কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছি। বলেছি, যদি কেউ সামান্যতম মুখ খোলে, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করব।”

“তবু খবরটা কিন্তু চাউর হয়েছে, মিস্টার জরিওয়ালা। না হলে গোয়েন্দা নিয়োগের সমাচারটি ক্রিমিনালদের কানে পৌঁছোল কীভাবে?”

“আমার ধারণা, ওরা আন্দাজে একটা ঢিল মেরেছে। লীলাকে ভয় দেখিয়ে বোধহয় বুঝে নিতে চাইছে, সত্যি-সত্যি আমি কারও সাহায্য নিচ্ছি কি না। কারণ, কাল রাতে যখন ফোনটা করল, তখন কিন্তু আর গোয়েন্দার প্রসঙ্গ তোলেনি।”

“গুড অবজারভেশন,” মিতিন এবার নাক গলাল কথোপকথনে। চোখ কুঁচকে বলল, “এমন একটা চাল ক্রিমিনালরা দিতেই পারে।

কারণ, ওরা জানে, আপনার চেয়ে ম্যাডামকে কাবু করা বেশি সহজ।"

"লীলাও কিন্তু ওদের কাছে গোয়েন্দা নিয়োগের কথাটা স্বীকার করেনি। একটাই কথা শুধু বলে গিয়েছে, 'আমি কিছু জানি না। আপনারা আমাকে ছেলে ফিরিয়ে দিন।' "

"আচ্ছা মিস্টার জরিওয়ালা, ওরা কি ম্যাডামকে আর রনির গলা শুনিয়েছিল?"

"না।"

"আপনাকে? কাল রাতে?"

"উঁহু।"

"বোঝা গেল প্রথমবারও ফোনের সময় রনি ধারেকাছে ছিল না। ওরা টেপ করা গলা শুনিয়েছে।"

"বটেই তো।" টুপুর উৎসাহিত স্বরে বলল, "ফোনবুথের ভদ্রলোক তো কোনও বাচ্চার কথা বললেনও না। তা ছাড়া রনি নিশ্চয়ই তখন বুঝে গিয়েছে, সে বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে। সুতরাং তাকে পাবলিক প্লেসে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভবই না।"

"একটা কঠিন অঙ্কের সমাধান করলি তো!" মিতিনের ঠোঁটে যেন হালকা বিদ্রূপ। পরক্ষণে হাসি মুছে গলায় প্রশ্ন ফুটল, "আপনি কিন্তু লীলাম্যাডামের কাছে আসা ফোনটার নাম্বার এখনও দেননি, মিস্টার জরিওয়ালা।"

"ও হ্যাঁ, একদম ভুলে গিয়েছি।" রুস্তমজিকে যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত দেখাল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে বললেন, "এখানে নোট করা আছে, লিখে নিন। তবে এটাও একটা পাবলিক বুথেরই নাম্বার। আমি ডায়াল করে দেখেছি।"

কথাবার্তার মাঝেই দরজায় অশোক মজুমদারের কণ্ঠ, "আসতে পারি স্যার?"

"কী ব্যাপার?"

"জামশেদপুর ডিলারের একটা চালান সই করানোর ছিল। আজই জিনিস পাঠাতে হবে।"

"আপনিই তো সই মেরে দিতে পারতেন, অশোকবাবু।"

"তবু নতুন পার্টি তো স্যার, আপনি যদি একবার...!" বলতে-বলতে চালানের বইটি রুস্তমজির টেবিলে রাখলেন অশোক মজুমদার। ঝুঁকে কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছেন রুস্তমজি, ফের অশোকের গলা, "চশমাটা পরে নিন স্যার।"

"সরি। অভ্যেস হয়নি তো, খেয়াল থাকছে না।" রুস্তমজি ফের চশমা চড়ালেন। সই করতে-করতে বললেন, "ফ্রেমটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কানে লাগছে।"

"আমি তো আপনাকে বলেছিলাম স্যার, কোনও বড় দোকান থেকে করান। আপনি শুনলেন না।"

"বউবাজারে ওই চশমার দোকানটার সঙ্গে আমাদের কত বছরের সম্পর্ক বলুন তো! বাবা-মা দু'জনেই ওদের কাস্টমার। ছোট থেকে দেখছি, বউবাজারের মেটকাফ স্ট্রিটে আমাদের পবিত্র অগ্নিমন্দিরে গেলে বাবা একবার অন্তত 'দাস অ্যান্ড কোম্পানি'-র দোকানে ঢুকবেনই। ঐতিহ্যটা কি হুট করে ভাঙা যায়?"

কথাটা যেন অশোক মজুমদারের পছন্দ হল না। বিরস মুখে বললেন, "তা হলে আর কী! কষ্ট করে পরুন ক'দিন। নেক্সট যেদিন মন্দিরে যাবেন, দেখিয়ে নেবেন।"

"আজ আপনার মুড অফ মনে হচ্ছে?" রুস্তমজি টিপ্পনী কাটলেন, "হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন বুঝি?"

"আমার প্র্যাকটিস আছে স্যার। মিসেস তো প্রায়ই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি যায়।"

"এবার তারা ফিরছে কবে?"

"রবিবারের আগে নয়।"

"এ ক'দিন হোম ডেলিভারি আনিয়ে নিন। মেজাজ শরিফ থাকবে।"

প্রসঙ্গটায় যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন অশোকবাবু। আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রুস্তমজির ঠোঁটে একফালি হাসি, "দেখেছেন তো, কী সিরিয়াস টাইপ! তবে আমার ভালমন্দের দিকে কিন্তু খুব নজর। পুরনো লোক তো, প্রায় আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছেন।"

"সেরকমই তো মনে হল," মিতিনও মৃদু হাসল। "এখানে কতদিন চাকরি করছেন?"

"বছর কুড়ি। যবে থেকে কার্পেটের বিজনেসটা টেকআপ করেছি, প্রায় তখন থেকে।"

"ও।"

মিতিন আর প্রশ্নে গেল না। ঠান্ডা মাথায় চমৎকার সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করল গতকালের কার্যবিবরণী। কে জানে কেন, ভাড়ার গাড়ির বিষয়টা এড়িয়ে গেল কায়দা করে। এর পর কালপ্রিটদের ফোন এলে রুস্তমজিকে কী কী জেনে নিতে হবে, তাও শেখাল ভালভাবে।

নীচে নেমে সোজা পার্কিং-লট। রুস্তমজির বি এম ডব্লিউ গাড়ির জানলায় তারক সিটে ঢুলছিল। তাকে ডেকে তুলল।

মিতিনদের দেখে তারক হতচকিত। মাথায় টুপিটি চড়িয়ে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। শশব্যস্ত মুখে বলল, "ইয়েস ম্যাডাম!"

মিতিন সরু চোখে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কে?"

"আজ্ঞে... মানে...!" মিতিনের চোখে চোখ রেখেও তারক দৃষ্টি নামিয়ে নিল, "আপনাকে তো ঢাকুরিয়া থেকে আনলাম।"

"কেন আপনার মনিবের বাড়ি গিয়েছিলাম বলুন তো?"

চমকে তাকিয়েও তারক ফের নতমস্তক। নিরুত্তর। নখ খুঁটছে।

মিতিনের স্বর সামান্য কঠোর হল, "বুঝতে পারছেন কী, আমি খুব সুবিধের লোক নই? এখন যা যা জানতে চাইব আশা করি জবাব মিলবে?"

"বলুন?"

"পরশুদিন ঠিক ক'টায় রনির স্কুলে পৌঁছেছিলেন?"

"বিকেলে?"

"নয়তো কি সকালের কথা বলছি? কখন আপনি বাচ্চাটাকে আনতে গিয়েছিলেন?"

"যেমন যাই, তিনটেয়।"

"উঁহু, মিথ্যে বলবেন না।"

"দু'-পাঁচ মিনিট হয়তো লেট হয়েছিল।"

"বাজে কথা। আপনি সাড়ে তিনটের আগে পৌঁছোননি।"

"হতেও পারে। ঘড়ি দেখিনি।"

"কবজিতে রিস্টওয়াচ, তাও দেখেননি?"

তারক উত্তর দিল না। গোঁজ মেরে রইল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মিতিন গলা একধাপ চড়াল, "আপনার দেরির কারণেই কিন্তু রনি নিখোঁজ হল। অর্থাৎ রনি হারিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।"

"ও, স্যারের ছেলে হারানোর কেসে আপনি আমাকে জড়িয়ে দিতে চাইছেন?" নার্ভাস তারক হঠাৎই তেরিয়া। মুখ-চোখ আমূল বদলে গেল। আঙুল নেড়ে বলল, "কৈফিয়ত আমার তৈরি আছে ম্যাডাম। পরশু সাহেবের কাজ করতে গিয়েই আমার দেরি হয়েছিল।"

"কী কাজ?"

"সাহেবের চশমা ডেলিভারি নেওয়ার ছিল বউবাজার থেকে।

খামোকা দোকানে আমাকে বসিয়ে রাখল। তিনটের আগে নাকি ওদের কারখানা থেকে জিনিস আসে না। সেই চশমা নিয়ে যেতে-যেতে আমার তো দেরি হতেই পারে।"

"আগে রনিকে তুলে নিয়ে চশমার দোকানে যাননি কেন?"

"তখন কি জানতাম, একদিন লেট হলে রনি হাপিস হয়ে যাবে?"

পার্থ ফস করে বলে উঠল, "আপনি যে সত্যি-সত্যি বউবাজারে আটকে গিয়েছিলেন, এটা প্রমাণ করতে পারবেন?"

"সাক্ষীসাবুদ রাখতে হবে এমনটা তো ভাবিনি। তবু খোঁজ করে দেখতে পারেন।" তারক গজগজ করল, "মনে যদি কু মতলব থাকত, কবেই তো রনিকে গায়েব করতে পারতাম।"

মিতিন যেন শুনেও শুনল না। জিজ্ঞেস করল, "রনির আই-ডি কার্ড তো গাড়িতেই থাকে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ড্যাশবোর্ডে রাখা ছিল। এখন ম্যাডামের কাছে।" তারকের স্বর ধীরে ধীরে নরম হল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "রনির এখনও কোনও খোঁজ পাননি, না?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন বলল, "আপনি ক'দ্দিন মিস্টার জরিওয়ালার গাড়ি চালাচ্ছেন?"

"প্রায় তিন বছর। বি এম ডব্লিউটা কেনার আগে থেকে। তখন সাহেবের ফোর্ড গাড়িটা চালাতাম।"

"আর রাকেশ কতদিন কাজ করছেন?"

"আমার চেয়ে অনেক কম, বছরখানেক।"

"রনির সঙ্গে কার বেশি ভাব, আপনার না, রাকেশের?"

"অবশ্যই আমার। গাড়িতে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে বকবক করে। কোন ভিডিয়ো গেমস কীভাবে খেলতে হয়, স্কুলে ক্রিকেটম্যাচে ও কত রান করেছে, কোন সিনেমাটা ভয়ের, কোনটা হাসির, সব

আমাকে বলা চাই। যথেষ্ট চালাক-চতুর ছেলে। ওকে যে কেউ ভুলিয়েভালিয়ে তুলে নেবে, ভাবতেও পারিনি।"

"হুম, তা রাকেশ কেমন?"

"এমনিতে মন্দ নয়। তবে ভীষণ ফাঁকিবাজ। ঘনঘন ডুব মারে। মেমসাহেব নিজেও গাড়ি চালান তো, সেইজন্য ওর আরও সুবিধে।"

"সাহেব নিজে চালান না গাড়ি?"

"খুব কম। ক্বচিৎ-কখনও হয়তো কোনও পার্টিতে গেলে আমায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। তখনই যা...!"

"আচ্ছা, রাকেশ কি মিছে কথা বলে ছুটি নেন?"

"সেটা তো বলতে পারব না। তবে ফাঁকিবাজদের তো একটু গপ্পো বানানোর অভ্যেস থাকে।"

"দেশে যাওয়ার নাম করে কলকাতায় বসে নেই তো?"

"কে জানে?" বলেই তারকের চোখ সরু, "কেন বলুন তো? রাকেশকেও কি আপনি সন্দেহ করছেন?"

"বাদ দেওয়ারও তো কারণ দেখি না। কাজটা তো কারও একার নয়, বেশ শলাপরামর্শ করেই হয়েছে।"

"মানে?" কথায়-কথায় খানিক সহজ হল তারক, আবার আড়ষ্ট রীতিমতো। হাতজোড় করে বলল, "দয়া করে আমাকে এর মধ্যে টানবেন না ম্যাডাম। আমি কিন্তু সত্যিই কিছু জানি না। এমনই কপাল, একদিন যেতে লেট হল, আর সেদিনই সর্বনাশটা ঘটল?" সাহেব-মেমসাহেবের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত। কী মনোকষ্টে যে ভুগছি, সেটা যদি জানতেন!"

"কিন্তু আমার যে কয়েকটা খটকা থেকে যাচ্ছে তারকবাবু।" মিতিন চোখ নাচাল, "কাইন্ডলি সেগুলো একটু ক্লিয়ার করবেন?"

"কী কী খটকা?"

"সেদিন ম্যাডামকে তো স্কুল থেকে আগে সাহেবের অফিসে নিয়ে আসা উচিত ছিল। অথচ আপনি ম্যাডামকে বাড়ি ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেন?"

"এরকম বলেছি? কই, মনে তো পড়ছে না।"

"তারপর ধরুন, আপনি সাহেবের কাজেই গিয়েছিলেন এবং তার জন্য আপনার দেরি হয়েছে। অথচ কথাটা আপনি সাহেব-মেমসাহেবকে জানাননি। কেন?"

"বিশ্বাস করুন, আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। ওঁরা যা নার্ভাস ছিলেন, তখন যদি কথাটা বলি, ওঁরা হয়তো আমাকেই...! তাই ভয় পেয়ে...!"

"হুম।" মিতিন আগাপাশতলা দেখল তারককে। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন হানল, "আমাদের চৌরঙ্গিতে আনার সময় আপনার মোবাইলে পরপর দুটো কল এসেছিল। কার-কার?"

"একটা আমার বাড়ি থেকে, দিদির ফোন। তাড়াতাড়ি ফিরব বলেছিলাম। দেরি দেখে ফোন করছিল। দ্বিতীয় ফোনটা মজুমদারসাহেবের। জানতে চাইছিলেন, স্যারের চশমা পেয়েছি কি না।"

"হুম!" মিতিন চোখ ঈষৎ তেরচা করল, "আচ্ছা তারকবাবু, রনিকে আনতে যাওয়ার সময় কখনও কাউকে সঙ্গে নিতেন কি? মানে অফিসের কেউ?"

"ওরে বাবা, স্যারের গাড়িতে যাকে-তাকে তুলব? একবার সুজয়বাবুকে গাড়িতে উঠিয়ে যা বকুনি খেয়েছিলাম!"

"কে সুজয়বাবু?"

"মজুমদারসাহেবের ছোট ভাই। ক্যাশে কাজ করতেন।"

"এখন নেই?"

"ছেড়ে দিয়েছেন।" তারক একটু দম নিল, "একবার মজুমদার সাহেবের জ্বর। অফিসে আসছিলেন না। তখন স্যার আমাকে

ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে একটা ফাইল আনতে পাঠিয়েছিলেন। ওদিকের রাস্তাঘাট তো তেমন চিনি না, ভেবেছিলাম সুজয়বাবু তো ওই বাড়িতেই থাকেন, ওঁকে সঙ্গে নিলে সুবিধে হবে। কিন্তু ভাইকে সাহেবের গাড়িতে দেখে মজুমদারসাহেবের সেদিন কী চোটপাট! সেই থেকে স্যার-ম্যাডাম না বললে কাউকে গাড়িতে ওঠাই না।”

“মজুমদারসাহেবকেও নয়?”

“উনি এ গাড়ি চড়েন না। তা ছাড়া তাঁর তো নিজের গাড়ি আছে, সানত্রো।”

মিতিন এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে বলল, “কোন গাড়িটা?”

“এখন ক'দিন আনছেন না। ব্রেকের কী গন্ডগোল হয়েছে, সারাতে দিয়েছেন।”

“ও!” মিতিন ঠোঁট সামান্য সুচলো করল, “চশমাটা কি পরশুই সাহেবকে দিয়েছিলেন?”

“না ম্যাডাম। ওই ঘটনার পর মাথাতেই ছিল না। কাল বিকেলে ফেরার পথে মনে পড়ল, তক্ষুনি দিয়ে দিয়েছি।”

তারককে আর কোনও জেরায় গেল না মিতিন। একটুক্ষণ ভাবল কী যেন। তারপর অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটা লাগাল নিজেদের গাড়ির দিকে।

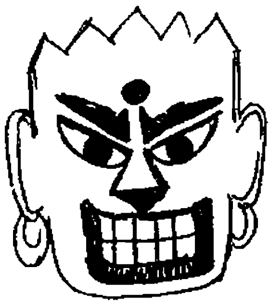

দুপুর বারোটা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। দোকানিরা খাবার সাজাচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিটের ফুটপাথে। বিরিয়ানি থেকে ঝালমুড়ি, কী আছে আর কী নেই! অফিসবাবুদের টিফিন। গাড়ি চালাতে-চালাতে পার্থর

সেদিকেই নজর। লোভী-লোভী গলায় বলল, "এখন নিশ্চয়ই আমাদের লাঞ্চব্রেক?"

"হ্যাঁ স্যার। পেট পুরে খেয়ে নাও। তোমাদের এখন টানা পাঁচ ঘণ্টা ছুটি।"

"কেন? কেন? কেন?"

"অবনীদা এস এম এস পাঠিয়েছেন। মিস্টার দস্তুরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে বিকেল ছ'টায়। ময়দানে, পারসি ক্লাবে। ততক্ষণ তোমরা খাও আর চরকি কাটো। আমি কয়েকটা কাজ সেরে আসি।"

টুপুর, পার্থকে কোনও প্রশ্নের সুযোগই দিল না মিতিন। তাড়া লাগিয়ে নামিয়ে দিল কাছের শপিং মলটায়। নিজে ড্রাইভিং সিট দখল করে বলল, "বাইই, ঠিক সময়ে তোমাদের ডেকে নেব।"

নিমেষে লাল মারুতি হাওয়া। পার্থ হাত উলটে বলল, "আর কী, চল আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা ছকি। পাঁচ ঘণ্টা তো মেলা সময়, কী করে যে কাটবে!"

"আমরা আইনক্সে একটা পিকচার দেখতে পারি।"

"গ্র্যান্ড আইডিয়া। তার আগে কিছু সাঁটাই চল।"

ফুডকোর্টটি বাজারের চার তলায়। চিনা, জাপানি, কন্টিনেন্টাল, মোগলাই, হরেক খানার ছড়াছড়ি। দু'খানা পুরুষ্টু পিৎজা আর ব্রাউনি নিয়ে গুছিয়ে বসল পার্থ। পিৎজা থেকে খানিকটা চিজ চেঁচে নিয়ে মুখে পুরে বলল, "তোর মাসিটা গেল কোথায় বল তো?"

টুপুরও আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। উঁহু, মগজ খেলছে না। ঠোঁট উলটে বলল, "কে জানে!"

"ফালতু ছুটে মরছে। ওই তারককে আর-একটু কড়কালেই সব হুড়হুড় বেরিয়ে পড়ত।"

"কাজটা তা হলে তারকেরই বলছ?"

"সন্দেহ আছে কোনও? চশমার দোকানটা তো ওর অ্যালিবাই। ব্যাটা জেনেশুনেই দেরিতে গিয়েছে। যাতে রনি নির্বিবাদে লোপাট হয়।"

"অর্থাৎ তারকের একটা গ্যাং আছে।"

"অথবা তারক গ্যাং-এ আছে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, রনির আই-ডি কার্ডটা তারকই সাপ্লাই দিয়েছে। কার্যসিদ্ধি হতেই কার্ডটা ফের ব্যাক টু তারক।"

"কীভাবে?"

"গোটা ঘটনাটা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। রনিকে গাড়িতে তুলে ক্লোরোফর্ম শোঁকানো হল। ব্যস, রনি অজ্ঞান। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি নিয়ে একটু অপেক্ষা। ওদিকে তারকও সময় মেপে বেরোল চশমার দোকান থেকে এবং পথে আই-ডি কার্ডটা কালেক্ট করে নিল। তারকের এগেনস্টে আর কোনও প্রমাণ রইল না।"

"কিন্তু চেনা লোকটি কে? যাকে দেখে রনি অবলীলায় উঠে পড়ল গাড়িতে?"

"পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে ওটাও উগরে দেবে তারক। তোর মাসি কেন যে এক্ষুনি ব্যাটাকে গারদে ঢোকাল না!"

"আমারও খুব অবাক লাগল, জানো। তারককে কেমন হেলায় ছেড়ে দিল মিতিনমাসি।"

"কোনও একটা প্ল্যান নিশ্চয়ই ভাঁজছে।"

গবেষণার মাঝেই উঠে গিয়ে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে এল পার্থ। আহারপর্ব সেরে দৌড়োল সিনেমা হলে। বেছেবুছে একটা ইংরেজি সিনেমায় ঢুকল। দারুণ মজার ছবি। একের পর-এক উদ্ভট কাণ্ড ঘটছে, হো হো, হি হি হাসছে পার্থ-টুপুর। হাসির জোয়ারে অপহরণ কাণ্ডটি প্রায় মাথা থেকে উধাও।

শো ভাঙল সাড়ে তিনটেয়। এবার কী করে? ঘুরে-ঘুরে খানিকক্ষণ

উইন্ডো শপিং করল দু'জনে। তারপর ঢুকল বইয়ের দোকানে। পার্থ পছন্দ করল দাবা খেলার একটি বই, টুপুর নিল দু'খানা আগাথা ক্রিস্টি। কাউন্টারে বিল মেটাচ্ছে পার্থ, তখনই মিতিনের মিস্‌ড কল।

দুদ্দাড়িয়ে শপিং মলের গেটে এসে টুপুর থ'। গাড়িতে মিতিনমাসির পাশে বাবা!

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "অবনীদাকে তুলে আনলাম, বুঝলি। পারসি বন্ধু আছে অবনীদার, অথচ ময়দানে পারসি ক্লাবটা কখনও দেখেননি!"

"কোনও উপলক্ষ ঘটেনি যে।" হাই মাইনাস পাওয়ার চশমার ওপারে অবনীর চোখ চকচক, "আমি কিন্তু আজ দারুণ থ্রিল্‌ড। এই প্রথম কোনও কেসে তোমার কাজে লাগছি।"

"দয়া করে মিস্টার দস্তুরের সামনে উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ করবেন না। আমার পরিচয় নিয়েও আড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু আমি যে বলে ফেলেছি তুমি গোয়েন্দা?"

"তাতে ক্ষতি নেই। শুধু কী কেস করছি না জানলেই ভাল।"

"কেসটা যে কী, আমাকেও তো খুলে বলোনি মিতিন।"

"আপাতত নয়, রহস্যজালেই মোড়া থাক।"

"যা তোমার অভিরুচি। তুমি তো বরাবরই রহস্যময়ী।"

শ্যালিকা-জামাইবাবুর রঙ্গরসিকতার মাঝেই স্টার্ট দিল গাড়ি। মিতিনই স্টিয়ারিং-এ। জওহরলাল নেহরু রোড বেয়ে পেরোল পার্ক স্ট্রিটের মোড়। বাঁয়ে মেয়ো রোড ধরল। খানিক এগিয়ে পাশাপাশি দু'খানা ক্লাবের তাঁবু। মাঝখানটা চিরে সরু পথ, পারসি ক্লাবে পৌঁছোনোর রাস্তা।

টেন্টের গেটে থামল গাড়ি। নেমেই মনটা যেন ভরে গেল টুপুরের। চারপাশ কী সবুজ। কংক্রিটের এই শহরে ময়দানটা যেন

সত্যিই মরূদ্যান। নাগরিক কোলাহল নেই, পাখির ডাক শোনা যায়, নরম হাওয়ায় জুড়িয়ে আসে শরীর। অদূরে রেড রোড ধরে হু হু গাড়ি ছুটছে, অথচ তাদের যান্ত্রিক শব্দ পৌঁছোচ্ছে না এখানে। প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া-গুলমোহরের মিছিল। লাল-হলুদ-বেগুনি ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কী অপরূপ যে লাগছে!

ক্লাবের অন্দরেও প্রচুর গাছগাছালি। আম, জাম, পামট্রি। বেড়ার ধারে গন্ধরাজ গাছটা তো ফুলে-ফুলে সাদা হয়ে আছে। আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ!

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন প্রোফেসর রতন দস্তুর। অবনীরই মতো মধ্যবয়সি। গায়ের রং টকটকে লাল, খাড়া নাক, ব্যাকব্রাশ চুল, লম্বা-চওড়া মানুষটার দেহে জিন্স-টি-শার্ট। ভারী আন্তরিক ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরলেন অবনীকে। ঝড়ের গতিতে সেরে ফেললেন আলাপ-পরিচয় পর্ব। লতানো গাছের তোরণ পেরিয়ে সবাইকে এনে বসালেন লনটায়।

জনাকয়েক পারসি মহিলা-পুরুষ রয়েছেন সবুজ লনে ইতিউতি ছড়ানো চেয়ার-টেবিলে। তাঁবুর পিছনে, ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলছে কচিকাঁচারা। সম্ভবত বাবা-মা'র সঙ্গে এসেছে। তাদের সরু গলায় উল্লাস শুনতে বেশ লাগছে।

টুপুরের মতো মিতিন-পার্থও চারদিকটা দেখছিল। প্রশংসার সুরে পার্থ বলল, "জায়গাটা ভারী সুন্দর তো! কতটা স্পেস! বাস্কেট বলের কোর্ট রয়েছে, ক্রিকেট পিচ।"

"শুধু খেলার লোকই যা কমে গিয়েছে।" রতন দস্তুর আলতো হাসলেন, "একসময় ক্লাবটা কী জমজমাট ছিল, ভাবতে পারবেন না। আমাদের ছেলেবেলায় তো বিকেলে লনটা গিজগিজ করত। এখন আর ক'জনই বা আসে!"

পার্থ তাঁবুটার দিকে আঙুল দেখাল, "আপনাদের টেন্টটাও কিন্তু বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে।"

"ওটাকে বলে অ্যান্টিক লুক।" রতন চোখ টিপলেন, "উনিশশো আটে তৈরি হয়েছিল ক্লাব। গোটা পূর্ব ভারতে এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে খানদানি আড্ডা। সেঞ্চুরি পেরিয়েছে তো, তাই এখন প্রাচীনত্বের গরিমা ঠিকরে বেরোচ্ছে।"

"সারালে কিন্তু বেশ ঝকঝকে লাগবে।"

"দরকার কী, দিব্যি তো চলছে," রতনের হাসি চওড়া হল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? আমরা পারসিরা, একটু রক্ষণশীল। দুমদাম কিছু বদলে ফেলা আমাদের ধাতে নেই। এই তো দেখুন না, সেই কত বছর আগে পারস্যদেশ ছেড়েছি। অথচ সেখানকার অজস্র রীতিনীতি আজও আঁকড়ে ধরে বসে আছি। আমাদের অগ্নিমন্দিরে এখনও পারসি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। পারসি সম্প্রদায়ের বাইরে আমাদের বিয়ে-থা'র চল নেই বিশেষ। যদি বা হয়, পারসি সমাজ মোটেই সেটাকে ভাল চোখে দেখে না।"

"আজকালকার দিনেও অত মানামানি চলে?"

"চলছে তো, চলে আসছে। এভাবেই তো আমরা বেশ টিকে আছি।" বলেই হাতের ইশারায় ক্লাবের বেয়ারাটিকে ডাকলেন রতন। কফি আর চিকেন পকোড়ার অর্ডার দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। মিতিনকে বললেন, "ইয়েস ম্যাডাম, আর আপনাকে বোর করব না। এবার কাজের কথাটা শুনি।"

মিতিন হেসে বলল, "অবনীদা বললেন, আপনি নাকি টানা আট বছর পারসি ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন? তা হলে তো নিশ্চয়ই অনেককেই চেনেন?"

"বলতে পারেন। ক্লাবের শতকরা পঁচানব্বই জনকে তো বটেই।

তবে ক্লাবের সেক্রেটারি হওয়ার সূত্রে নয়। আমার একটা অন্য পরিচয়ও আছে।"

"কীরকম?"

"আমরা, দস্তররা হলাম পুরোহিতের বংশ। পারসি সমাজে পুরোহিতের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। তবু নানান কাজেকর্মে আমাদের ডাক তো পড়েই। যেমন ধরুন, বিয়ে-শাদি দেওয়া...!"

অবনী বলে উঠলেন, "তুমি বিয়ে দাও নাকি?"

"না না, আমি ওসবে নেই। তবে আমার দাদা এখন কলকাতার একমাত্র মোবেদ। শুধু বিয়ে দিতে নয়, দাদাকে সব আচার-অনুষ্ঠানেই যেতে হয়। দাদার সুবাদে আমারও সবার সঙ্গে জানাশোনা।"

"ও!" মিতিন একটু দম নিয়ে বলল, "আমি কলকাতার একজন বিশিষ্ট পারসি ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"কে বলুন তো?"

"শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা।"

"রাস্টি, রাস্টি?" রতন দস্তুর বেজায় অবাক, "তার আবার কী হল?"

"কিছু মনে করবেন না মিস্টার দস্তুর, আমার তদন্তের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। শুধু এটুকু বলতে পারি, রুস্তমজির অসম্মান হতে পারে এমন কিছু আমি খুঁজছি না।"

"ও, তা কী জানতে চান?"

"রুস্তমজি মানুষটি কেমন?"

"এক কথায় বললে, এক্সেলেন্ট। আমাদের কলকাতার পারসি সমাজের গর্ব। প্রাণে দয়ামায়া আছে, প্রচুর দান-ধ্যান করে, অফিসেও মালিক হিসেবে খুব সুনাম। বাড়ির যে-কোনও অনুষ্ঠানে অফিসের বেয়ারাটিকে পর্যন্ত নেমন্তন্ন করে। তবে একটু মাথা গরম টাইপ। বিশেষত, কেউ বেইমানি করলে রাস্টি ছেড়ে কথা বলে

না। শুধু এই কারণেই মুম্বইয়ের তিন-তিনটে রইস ডিলারকে ছাঁটাই করেছে। তারা নাকি লুকিয়ে অন্য কোম্পানির জিনিস বেচছিল। এই তো, মাস চারেক আগে অফিসেও একজনের চাকরি নট করল। লোকটা নাকি ভাউচার জাল করে টাকা তুলত। শুনেছি, লোকটা ওর খুব রিলায়েবল স্টাফের রিলেটিভ। সে নাকি রাস্টির হাতে-পায়েও ধরেছিল, তবু তাকে ক্ষমা করেনি। শুধু তাই নয়, রাস্টি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর কোনও অফিস-স্টাফের আত্মীয়কে চাকরি দেবে না।”

অবনী বললেন, “ওরে বাবা, তুমি দেখছি ভদ্রলোকের নাড়িনক্ষত্র জানো!”

“আমি তো ওকে প্রায় জন্ম থেকেই চিনি। ওর বিয়েটাও তো দিয়েছে আমার দাদা। রাস্টির বউ লীলাও আমার খুব চেনা। আমার ছোট বোনের বান্ধবী।”

মিতিন বলল, “তা হলে তো আপনি মিস্টার জরিওয়ালার আত্মীয়স্বজনের গল্পও বলতে পারবেন!”

“আত্মীয় আর রাস্টির কে আছে তেমন! ছিলেন এক পিসি, তিনি তো বহু বছর যাবৎ অস্ট্রেলিয়ায় সেটেল্‌ড। তাঁর ছেলেমেয়েরা কস্মিনকালে কলকাতায় আসে না। রাস্টির আপন বলতে তো এখন বাবা, মা আর ভাই। ওই ভাইয়ের সঙ্গে অবশ্য রাস্টির একটু খিটিমিটি বেধেছে।”

“কী নিয়ে?”

“ব্যাবসাপত্তর। জিমিই ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছে। তার জাহাজের ব্যাবসায় নাকি মন্দা চলছে ইদানীং। তাই দাদার কার্পেটের বিজনেসে ঢুকতে চায়। রাস্টির বাবাও নাকি জিমির দলে। তাই নিয়ে খানিক মন কষাকষি চলছে শুনেছি।”

“তার মানে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ?” পার্থর কপালে ভাঁজ

পড়ল, "আচ্ছা মিস্টার দস্তুর, রুস্তমজির ভাই কি খুব হার্মফুল? আই মিন, প্রতিশোধপরায়ণ?"

"এটা তো বলতে পারব না। জিমি তো আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট, নেচারটা তাই খুব ভাল জানা নেই।"

"ও! তা মিস্টার জিমি কি কলকাতায় আসা-যাওয়া করেন?"

"আসে বোধহয়। কলকাতায় তো ওর একটা ফ্ল্যাটও আছে।"

"কোথায়?"

"এলিয়ট রোডে।"

"ওনারশিপ?"

"তাই তো শুনেছি। সম্ভবত সেকেন্ড হ্যান্ড।" রতন দস্তুর এতক্ষণে যেন থমকালেন, "এত সংবাদ জানতে চাইছেন কেন? জিমি কি কিছু ঘটিয়েছে?"

"না না। মিতিন জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "রুস্তমজি একটা বাজে বিপদে পড়েছেন। আমি জাস্ট তার কারণটা বের করতে চাইছি। যাক গে, আবার একটু পারসি সমাজের গল্প বলুন। আপনাদের একটা নিউজ পেপার বেরোয় না কলকাতা থেকে?"

"উঁহুঁ, হাউস জার্নাল। দু'খানা। 'গাবাসনি', আর 'আওয়ার ভেঞ্চার'। কলকাতার পারসিদেরই নানান সমাচার থাকে জার্নালে।"

খাবার এসে গেল। চলছে হাত-মুখ, সঙ্গে কথাও। পারসিদের ধর্মগ্রন্থ 'আভেস্তা' সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন রতন দস্তুর। শোনালেন জরথুস্ত্রের বাণী। একটি উপদেশ তো ভারী পছন্দ হল টুপুরের। দারিদ্র্য আর ভিক্ষে করাকে নাকি পারসিধর্মে খুব নিন্দনীয় বলে ধরা হয়।"

গল্পগাছা সাঙ্গ হল প্রায় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। অবনী উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছিলেন, গাড়িতে উঠেই জিজ্ঞেস করলেন, "কী মিতিন, কাজ কিছু হল?"

মিতিন বলল, "আমি তো কাজে যাইনি। কাটাকুটি খেলতে গিয়েছিলাম।"

"বুঝলাম না।"

"এক্ষুনি বোঝার দরকার কী অবনীদা? মেট্রো স্টেশনে নেমে সোজা বাড়ি চলে যান। শুধু দিদিকে গিয়ে বলবেন, আপনার দৌলতেই কেস সল্‌ভ হতে চলেছে।"

অবনী ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন, "এটাও বুঝলাম না।"

মিতিন আর কথায় গেল না, গাড়ি চালাচ্ছে চুপচাপ। বাড়ি ফিরে সোজা ঢুকে গেল নিজের স্টাডিতে। খাওয়ার আগে আর বেরোলই না। ডাইনিং টেবিলেও বড় অন্যমনস্ক। রুটি ছিঁড়ছে, মুখে পুরছে, চিবোচ্ছে, তবু কোনও ক্রিয়াতেই যেন মন নেই।"

আহার সেরে মিতিন সবে আঁচাচ্ছিল, তখনই বেজে উঠল মোবাইল। যেন এই ফোনটারই প্রতীক্ষায় ছিল এভাবে দৌড়ে গিয়ে তুলল। কানে চেপে শুনল প্রথমটা, তারপর অস্ফুটে বলল কী যেন। তারপর ফোন অফ করে দাঁড়িয়ে রইল নিথর।

টুপুর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল গো, রুস্তমজির?"

"হুঁ!" মিতিনের ঠোঁট নড়ল, "ক্রিমিনালরা টাকা দেওয়ার সময়টা এগিয়ে এনেছে। কাল ভোর পাঁচটায় কিট্‌সব্যাগে ভরে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তিপণ এবং রুস্তমজিকে যেতে হবে একা। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে।"

"কোথায়?"

"বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে। সঠিক লোকেশন কাল ভোরে বলবে।"

"ও। আমরা তা হলে এখন কী করব?"

"ওরা চলে ডালে-ডালে, মিতিন চলে পাতায়-পাতায়। যা, তোরা

শুয়ে পড়। ঠিক রাত তিনটেয় ডাকব।" বিদ্যুদ্‌বেগে মিতিন ফের স্টাডিতে, মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

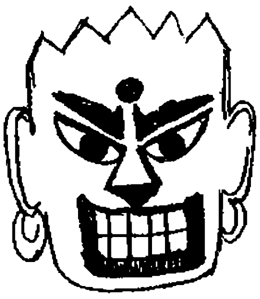

ভোরের আলো ফুটছে সবে। পৃথিবীতে এখন এক তরল আবছায়া, পশ্চিম আকাশে ঝুলে আছে ফ্যাকাশে চাঁদ। পাখিরা আড়মোড়া ভাঙছে, এখনও তারা বাসা ছাড়েনি।

শুনশান ভি আই পি রোড ধরে ছুটছিল লাল মারুতি। কাঁটায়-কাঁটায় সত্তর কিলোমিটার বেগে। গাড়ি চালাচ্ছে পার্থ, পিছনে মিতিন, টুপুর। একটু আগেও মিতিন সামনে ছিল, উলটোডাঙার মোড়ে জায়গা বদল করল। ফাঁকা রাস্তায় সামনের সিটের লোককে নাকি মানুষ আগে নজর করে।

রাত থাকতে উঠেছে টুপুর, কিন্তু চোখে তার ঘুমের লেশমাত্র নেই। কেসের অন্তিম মুহূর্ত প্রায় এসে গেল, উত্তেজনায় সে টানটান। তাকাচ্ছে ইতিউতি।

পার্থর দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছিল রেয়ারভিউ মিররে। বেশ সংশয়ের সুরে বলল, "ব্যাপারটা কী হল? পিছনে রুস্তমজির গাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না?"

"উনি উলটোডাঙা থেকে পাঁচ মিনিট পরে রওনা দিয়েছেন। একই স্পিডে চালাচ্ছেন গাড়ি।"

"এমন নির্দেশ কেন?"

"বুদ্ধিটা সামান্য খাটাও, বুঝে যাবে।"

"দুটো গাড়ির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রাখতে চাও, তাই তো?"

"প্লাস, গন্তব্যস্থলটি রুস্তমজির মিনিট পাঁচেক আগে আমাদের পেরোতে হবে। কারণ, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যত্রতত্র গাড়ি ঘোরানো যায় না। ডিভাইডারের নেক্সট কাটিং পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি টার্ন করাতে একটু সময় লাগে। ওই টাইমটুকু হাতে রাখা দরকার।

"অ!"

ভি আই পি ছেড়ে গাড়ি এবার যশোর রোডে। ডাইনে বিমানবন্দর। বিকট শব্দ তুলে একটা ভোরের প্লেন আকাশে উড়ল। ভেসে চলেছে পশ্চিম পানে। এরোপ্লেনটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এসে পড়ল বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে।

পার্থ ফ্লাইওভারে উঠছিল। মিতিন বলল, "লোকেশনটা খেয়াল আছে তো?"

"ইয়েস ম্যাম। বাঁয়ে লাল সাইনবোর্ড। টায়ারের বিজ্ঞাপন।"

"ঠিকঠাক চালিয়ো। ওখানে যেন স্পিড কমিয়ো না।"

"দাঁড়াও। আগে দ্যাখো, ওখানে আদৌ কেউ আছে কিনা। এখনই হয়তো রুস্তমজিকে ফোন করে বলবে, আমরা বালি ব্রিজে থাকব!"

"উঁহুঁ। ওরা আর ঝুঁকি নেবে না। নার্ভাস হয়েছে, এখন কোনওমতে টাকাটা হাতাতে পারলে বাঁচে। নইলে সময়টা দুম করে এগিয়ে আনত না।"

টুপুর ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বাজতে সাত। "আমরা আগে চলে এলাম না তো?" বলতে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "না না, ওই তো... ওই তো কালো হন্ডা সিটি।"

"দেখেছি।" মিতিন ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলল, "চটপট মাথাটা নামিয়ে নে।"

তেমন মনঃপূত না হলেও বাধ্য সৈনিকের মতো আদেশ পালন

STD

করল টুপুর। মিনিটখানেক পর ঘাড় উঁচিয়ে বলল, "ধুস, কোনও মানে হয়? গাড়িটায় কে আছে দেখাই তো হল না!"

"অধৈর্য হোস না টুপুর। কিচ্ছু পালাবে না। আমরা এক্ষুনি ওখানে ফিরছি।"

কিন্তু পথবিভাজিকার পরবর্তী ছেদ এল প্রায় চার কিলোমিটার গিয়ে এবং এমনই কপাল, সেখানে গাড়ি ঘোরাতেই সামনে একটি ট্রাক। হর্ন দিলেও পথ ছাড়ছে না। চলেছে গজেন্দ্রগমনে। অসহায় ক্ষোভে মাথা ঝাঁকাল পার্থ। মিতিনের মুখ থমথমে। চোয়াল শক্ত হচ্ছে ক্রমশ।

বেশ খানিকটা দূর থেকে ফের নজরে পড়ল কালো হন্ডা সিটি! ঠিক তার পিছনেই রুস্তমজির গাড়ি। এবং রুস্তমজি কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

ঘ্যাচাং ব্রেক কষে মারুতি থামাল পার্থ। সঙ্গে-সঙ্গে নেমেও পড়ল সকলে। রাস্তা টপকে ছুটল ওপারে।

রুস্তমজির সামনে গিয়ে মিতিন বলল,"কী হল কেসটা? গাড়ি রয়েছে, অথচ...!"

বিহ্বল মুখে রুস্তমজি বললেন, "গাড়িটা ফেলে রেখে গেল।"

"মানে?"

"পালিয়েছে।"

"ক'জন ছিল?"

"প্রথমে একজনই। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগ চাইল, দিয়ে দিলাম। অমনি পিছন থেকে একটা মোটরবাইক। ব্যাগ নিয়ে মোটরবাইকে ব্যাক করে গেল দু'জনে।"

টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, "আর রনি?"

"জানি না। রনিকে তো দিল না।"

"গাড়িটা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। রনি নেই। সামনের সিট, পিছনের সিট, দুটোই তো ফাঁকা।"

পার্থ কালো গাড়ির জানলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। নীলচে কাচের ওপারে কিছু ঠাহর করা কঠিন। কী ভেবে দরজার হ্যান্ডেলটা টানল। খুলে গেল দরজা।

এবং কী কাণ্ড! আছে, আছে, রনি আছে। পিছনের সিটের তলায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে রনি।

রুস্তমজি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুললেন ছেলেকে। কোলে নিয়ে ডাকলেন, "রনি, রনি, বেটা...!"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "রনি এখন জাগবে না রুস্তমজি। ওকে হেভি ডোজে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আপনি বরং ওকে নিয়ে গাড়িতে বসুন।"

রুস্তমজি তবু দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলে কোলে। রীতিমতো অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, "কিন্তু শয়তানদের তো ধরা গেল না? আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন...!"

"তারা আমার হাতের মধ্যেই আছে, মিস্টার জরিওয়ালা। আপাতত গাড়িটাকে একবার সরেজমিন করছি। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, গাড়িতে আর-একজন আছে।"

বলেই কালো গাড়ির ডিকি খুলল মিতিন। কীমাশ্চর্যম! সত্যিই সেখানে একটা লোক। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা এবং রনির মতোই অচেতন।

রুস্তমজি হতবাক মুখে বললেন, "এটি কে?"

"ওই হন্ডা সিটির ড্রাইভার। শয়তানরা একেও আটকে রেখেছিল। রনির সঙ্গে ড্রাইভার আর ভাড়া করা গাড়ি, দু'ইই খালাস করে দিয়েছে।"

"ভাড়ার গাড়ি?"

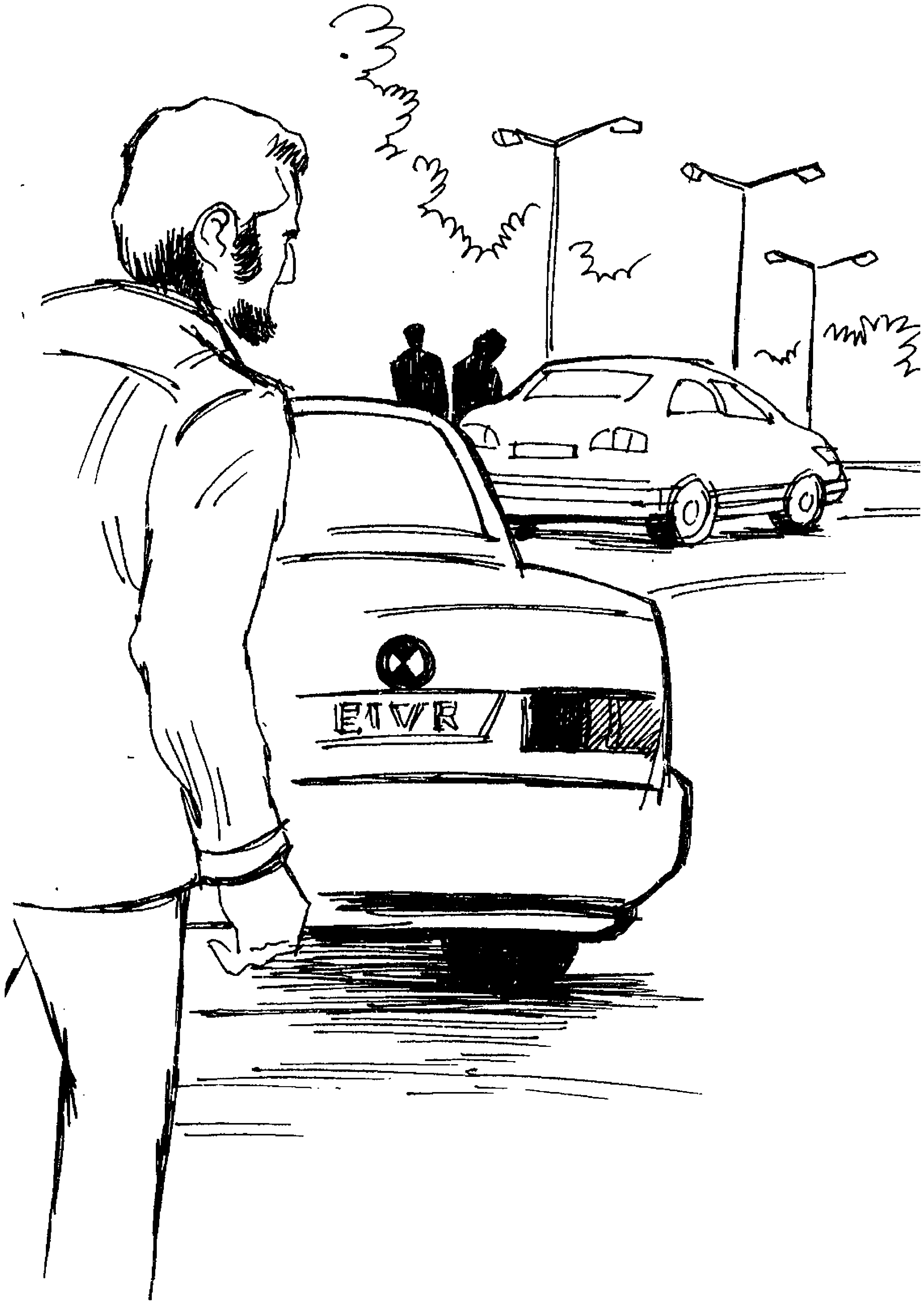

"হ্যাঁ, অবিকল আপনার হন্ডা সিটির মতো দেখতে তো, তাই এই গাড়িটাই ওরা ইউজ় করেছিল। ধোঁকা দিয়ে রনিকে কিডন্যাপ করার জন্য।"

"ও মাই গড!"

মিতিন ঘুরে পার্থকে বলল, "অ্যাই এসো, ধরাধরি করে লোকটাকে বের করি। দড়িদড়াগুলো খোলো। এখানে তো ফেলে রাখা যায় না, ও আমাদের সঙ্গেই চলুক। সজ্ঞানে এলে ওকে অনেক পুলিশি জেরা সামলাতে হবে।"

"আর গাড়িখানার কী গতি?"

"থাকুক পড়ে। লক করে অনিশ্চয়দাকে জানিয়ে দিচ্ছি, লোকাল থানা এসে নিয়ে যাবে। তারপর গাড়ি ছাড়ানো দ্বিজেন হালদারের দায়।"

"দ্বিজেন হালদার?" রুস্তমজির চোখ বড়-বড়। "নামটা খুব চেনা-চেনা লাগছে!"

"ওয়েট করুন, এবার অনেক কিছুই চেনা লাগবে।"

একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুড়ে দিয়ে মিতিন নেমে পড়ল কাজে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমন্ত ড্রাইভার চালান হল মারুতিতে। পার্থ তাকে নিয়ে পিছনে বসল। টুপুর আর মিতিন সামনে।

সিট-বেল্ট বাঁধতে-বাঁধতে মিতিন রুস্তমজিকে বলল, "এবার আপনি আমাদের ফলো করুন।"

রনিকে গাড়ির সিটে শুইয়ে লীলাকে ফোন করছিলেন রুস্তমজি। মোবাইলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, "কোথায় যাব? লীলা তো শুনেই ছটফট করছে! এক্ষুনি রনিকে দেখতে চায়।"

"আর-একটু অপেক্ষা করতে বলুন। জানিয়ে দিন, কালপ্রিটদের গারদে পাঠিয়ে আপনি বাড়ি ফিরছেন।"

"কালপ্রিটদের আর কোথায় পাবেন?"

"বললাম যে, এখনও মুঠোয় আছে। চলুন, এবার এগোই।"

মিতিনের বলার ভঙ্গি এত দৃঢ় যে, রুস্তমজি আর কথা বাড়ালেন না। দ্রুত ফোনালাপ সেরে উঠলেন গাড়িতে। লাল মারুতিকে অনুসরণ করছে বি এম ডব্লিউ। ফের যশোর রোড। ফের ভি আই পি রোড। তারপর রাজারহাট নিউটাউনে ঢুকল গাড়ি। ক্রমশ সল্টলেকের দিকে এগোচ্ছে। অবশেষে এ-বি ব্লকের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে রুস্তমজি হাঁ, "এ কী! এ তো অশোকবাবুর বাড়ি!"

"হ্যাঁ। আপনার বিশ্বস্ত প্রাইভেট সেক্রেটারি!" মিতিনের ঠোঁটে তির্যক হাসি। কেটে-কেটে বলল, "বিস্ময়টা ঝেড়ে ফেলুন মিস্টার জরিওয়ালা। এখন শুধু আপনার নীরবে দেখে যাওয়ার পালা। আসুন।"

"কিন্তু রনি একা গাড়িতে...।"

"ভয় নেই। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আছে।"

বলেই মিতিন হনহনিয়ে অশোক মজুমদারের দরজায়। পাশেই বাড়ির গ্যারাজ, শাটার নামানো। সেদিকে দেখল তাকিয়ে-তাকিয়ে। আঙুল রাখল ডোরবেলে।

পাল্লা খুললেন অশোক মজুমদার স্বয়ং। আগন্তুকদের দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকালেন। তোতলানো স্বরে বললেন, "আ আ...আপনারা?"

"আপনার স্যারের সঙ্গে চলে এলাম। ভিতরে ঢুকতে বলবেন না?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" অশোক মজুমদার সন্ত্রস্ত চোখে একবার দেখলেন গাড়ি দুটোকে। ঢোক গিলে বললেন, "প্লিজ কাম।"

অন্দরে পা রেখে মিতিন সরাসরি বলল, "আপনার ভাইটি কোথায়?"

"কোন ভাই?"

"সুজয়। সুজয় মজুমদার। যিনি মিস্টার জরিওয়ালার অফিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন টাকা চুরির অপরাধে?"

"সে আলাদা থাকে, দোতলায়। আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তাই বুঝি?" মিতিনের স্বরে ব্যঙ্গ, "মুখ দেখাদেখিও বন্ধ নাকি? ডাকতেও পারবেন না?"

"আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও একেবারেই উচ্ছন্নে গিয়েছে।"

"জানি। এখন সে বাচ্চা কিডন্যাপিং-এর ব্যাবসায় নেমেছে। আপনার মালিকের একমাত্র পুত্রটিকে অপহরণের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।"

"কী বলছেন ম্যাডাম?" অশোক মজুমদার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "রনি কিডন্যাপড হয়েছিল নাকি? সুজয় করেছিল?"

"বাচ্চাটা এই বাড়িতে আড়াই দিন আটক রইল, এখান থেকে ভোরে বের করা হল তাকে... অথচ আপনি কিছুই টের পাননি, তাই না?"

"বিশ্বাস করুন, আমি এই কুকাজের বিন্দুবিসর্গ...! ভাবতেই পারছি না, ভাবতেই পারছি না। রনি এখন কোথায়?"

জবাব দিতে হল না মিতিনকে, তার আগেই বাইরে হালকা শোরগোল। প্রায় তৎক্ষণাৎ দুটো লোককে কলার ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকালেন এক পুলিশ অফিসার। সঙ্গে তাঁর চার বন্দুকধারী।

অমনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রুস্তমজি, "এই তো, এই তো সুজয়।"

"খানিক আগে মুখে কালো কাপড় জড়িয়ে ইনি এক কোটি টাকা হাতিয়ে ছিলেন, মিস্টার জরিওয়ালা।"

চোয়াড়ে চেহারার অন্য লোকটির দিকে আঙুল দেখাল মিতিন, "এঁকে চিনতে পারছেন? ইনিই মোটরবাইকে সুজয়কে উঠিয়েছিলেন।"

"ঠিকই তো। এই হলুদ টি শার্ট, নীল জিন্স...!"

"দু'জনেই পাঁচিল টপকে পালাচ্ছিল ম্যাডাম।" ভুঁড়িওয়ালা পুলিশ অফিসারটির গলা গমগম করে উঠল। তৃপ্ত মুখে বললেন, "নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলি?"

"কোথায় রেখেছেন আপনাদের গাড়ি?"

"যেমনটি আই জি সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। পরের রাস্তাটায়।"

"একটু দাঁড়ান। এই লোকটির কোমরেও দড়ি পরাতে হবে।"

মিতিন অশোক মজুমদারের দিকে এগোল, "ইনিই হলেন নাটের গুরু। অপহরণকাণ্ডের মূল মস্তিষ্ক। মিস্টার জরিওয়ালার টাকা এখন এঁরই জিম্মায়।"

কাঁপা-কাঁপা গলায় অশোক মজুমদার বললেন, "আমায় টানছেন কেন? আমি কী জানি?"

"খুলে বলতে হবে? রনিকে অপহরণের দিন বেলা আড়াইটেয় তারককে পাঠালেন রনির স্কুলে। হাতে ধরিয়ে দিলেন চশমার বিলখানা। ভাল মতোই জানতেন, তিনটের আগে চশমা ডেলিভারি হবে না এবং সেটি নিয়ে তারকের পক্ষে সাড়ে তিনটের আগে সেন্ট পিটার্স স্কুলে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। আগেই আপনার গুণধর ভাইকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলেন দ্বিজেন হালদারকে, মিস্টার জরিওয়ালার কোম্পানির নাম করে। আপনাদের অর্ডারমাফিক কালো হন্ডা সিটি চলে গেল বেলেঘাটার টাওয়ার অফ সাইলেন্সে। তারপর সুজয় আর ওই বজ্জাতটি তিনটের আগে সেন্ট পিটার্সের গেটে হাজির। নকল আই-ডি কার্ড আগেই বানানো ছিল। মিস্টার জরিওয়ালার বাড়িতে যাওয়া-আসার সুবাদে সুজয়ও রনির পরিচিত, সুতরাং নির্বিবাদে বাচ্চাটিকে গাড়িতে তুলতে কোনও অসুবিধেই নেই। ছক কষে বউ-

ছেলেমেয়েকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়িতে। অতএব রনি এবং হন্ডা সিটির ড্রাইভারটিকে নির্বিঘ্নে বাড়িতে বন্দি রাখলেন। নিজস্ব সানত্রো গাড়িটিকে টুকিটাকি সারাইয়ের অজুহাতে চালান করলেন কারখানায়। তার জায়গায় আপনার গ্যারাজে লুকোনো রইল কালো হন্ডা সিটি। কী, ঠিক বলছি তো?"

"একেবারেই না। এসব আজেবাজে গল্প ফাঁদার কোনও মানেই হয় না।" অশোক মজুমদার এবার রীতিমতো ক্ষিপ্ত, "দেখুন না গ্যারাজ খুলে, হন্ডা সিটি আছে কি না!"

"থাকার তো কথা নয়। এখন তো ওখানে শোভা পাচ্ছে একটি মোটরবাইক আর সাইকেল।"

মিতিন বাঁকা হাসল, "সাইকেল চেপে টেলিফোন বুথে যাওয়ার বুদ্ধিটা কিন্তু অভিনব। মনে হবে, আরোহীরা আশপাশেরই বাসিন্দা। অথচ আদতে তারা আসছে সল্টলেক থেকে, ফুটব্রিজ ব্যবহার করে। তবে আপনার চালাকিটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না, মিস্টার মজুমদার। প্রথমবার ফোনে রনির কান্নার টেপ শোনানোর আইডিয়াটাও বেশ কাঁচা। আপনার মতো ধুরন্ধর মানুষের কাছে এটা আশা করা যায় না।"

"আপনি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ম্যাডাম। একজন ভদ্রলোককে আপনি অপমান করছেন।"

"ভদ্রলোকের মুখোশ পরে থাকলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না, মিস্টার মজুমদার।"

"খুবই আপত্তিকর কমেন্ট," অশোক মজুমদারের নাকের পাটা ফুলল। দাঁতে দাঁত ঘষে রুস্তমজিকে বললেন, "এই মহিলাকে সংযত হতে বলুন স্যার। ভাই অপরাধ করলে দাদাকেও দোষী ধরা হবে, এ কেমন কথা? উনি যে অভিযোগ আনছেন, প্রমাণ করতে পারবেন?"

"প্রমাণ না রাখার চেষ্টা অবশ্য আপনি চালিয়েছেন আগাগোড়া।

সম্ভবত রনি কিংবা ড্রাইভারটিকেও আপনি দর্শন দেননি। বেমালুম ঠান্ডা মাথায় অফিস যাচ্ছেন, কাজকর্ম করছেন। আপনাকে সন্দেহের অবকাশই বা কোথায়?" মিতিন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "কিন্তু অপরাধীরা যে একটা মোক্ষম ভুল করেছে মিস্টার মজুমদার!"

"কী? কী করেছি?"

"আপনি নয়, ভুলটা আপনার ভাইয়ের। শাগরেদকে দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করানোর পর-পরই উৎসাহের আতিশয্যে সে একটি কল করেছিল আপনার মোবাইলে। বাঙ্গুর অ্যাভেনিউয়ের বুথ থেকে। সেটি কিন্তু আমার রেকর্ডে আছে। পুলিশেরও। ওই বুথ থেকে ছ'টা পঁয়ত্রিশে কেন আপনাকে ফোন করা হয়েছিল, তার কারণ দর্শাতে পারবেন তো?"

জোঁকের মুখে বুঝি নুন পড়ল। অশোক মজুমদারের সমস্ত জারিজুরি খতম। কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়লেন সহসা। জড়িয়ে ধরলেন রুস্তমজির পা। কপাল ঠুকছেন আর বলছেন, "অন্যায় করেছি স্যার। পাপ করেছি স্যার। ক্ষমা করে দিন স্যার। মাথার ঠিক রাখতে পারিনি স্যার।"

একটি শব্দও ফুটল না রুস্তমজির গলায়। না ক্ষোভ, না রাগ, না বিরক্তি। এক পা, এক পা করে সরে এলেন। বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। ধীর পায়ে।

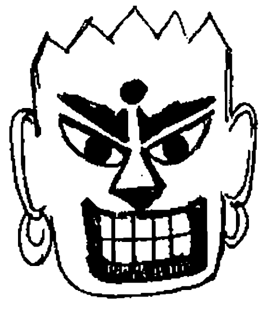

নৈশাহারটি মন্দ হল না আজ। বিপুল আয়োজন করেছিলেন রুস্তমজি। কাবাব, ফ্রাই, রোস্ট, তন্দুর, সঙ্গে অঢেল পরোটা, নান।

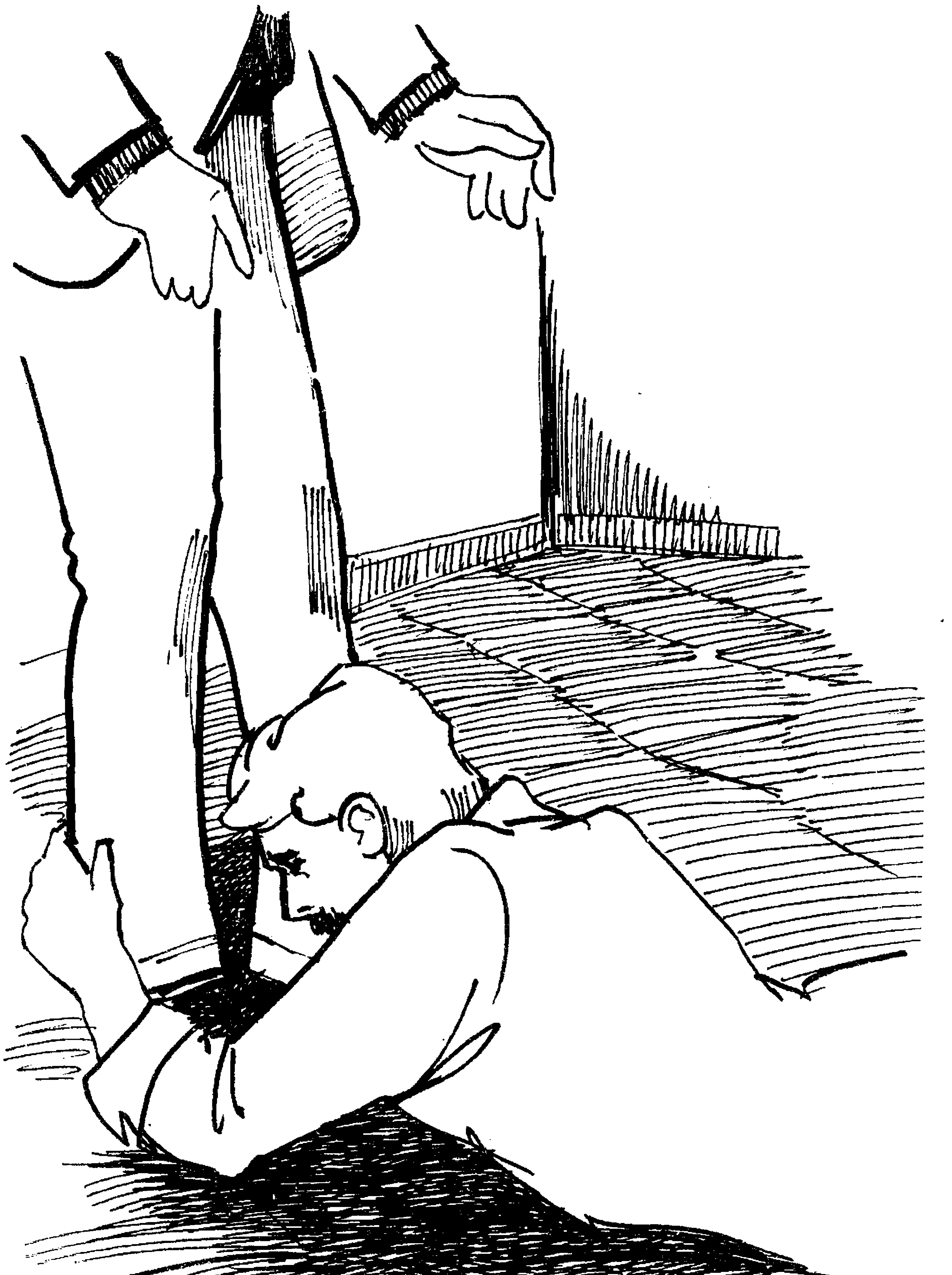

স্বহস্তে সিমুইয়ের মিষ্টি বানিয়েছিলেন লীলা। খাব না, খাব না করেও অনেকটা খেয়ে ফেলল টুপুর। আর পার্থর তো আজ পোয়াবারো। মুখ তার চলছে তো চলছেই। মিতিন না থামালে তাকে বোধহয় ক্রেন দিয়ে চেয়ার থেকে তুলতে হত।

রনি এখনও স্বাভাবিক হয়নি পুরোপুরি। কথাবার্তা বলছে বটে, তবে মাঝে-মাঝেই চমকে-চমকে উঠছে। টুপুর আর বুমবুম অবশ্য তার সঙ্গে কম্পিউটার গেমস খেলল কিছুক্ষণ। বুমবুমের হইহল্লাতেই যা রনির সাড় ফিরছিল খানিকটা। বাচ্চারাই তো বাচ্চাদের মন ভাল করার সবচেয়ে বড় ওষুধ।

বিদায় নেওয়ার সময় রুস্তমজি টুপুরদের সঙ্গে এলেন নীচে। মিতিনকে একটা রঙিন খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এটা রাখুন। আমার আর লীলার তরফ থেকে একটা সামান্য উপহার।"

মিতিন খামটা দেখল। কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কভারে এটা কী লেখা আছে, মিস্টার জরিওয়ালা? আফজুড... আফজুন... আফজায়াদ...!"

"ওটা পারসি ভাষায় কুশল প্রার্থনা। উপহার দেওয়ার সময় আমরা প্রাপকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। অনেক-অনেক ধন্যবাদ।"

গাড়িতে উঠে টুপুরের আর তর সইছিল না। হ্যানোভার কোর্টের গেট পেরিয়েই খুলল খামটা। উল্লসিত স্বরে বলল, "ওয়াও! এ যে পাঁচ-পাঁচ লাখ টাকার চেক গো!"

মিতিন খুশি-খুশি মুখে বলল, "এত দিয়েছেন?"

পার্থ গিয়ার বদলাতে-বদলাতে টুকুস মন্তব্য ছুড়ল, "বেশি কোথায়? ভদ্রলোক তো নিট পঁচানব্বই লাখ মুনাফা করলেন।"

"মানে?"

"এক কোটি তো গিয়েইছিল, তার থেকে ফাইভ পারসেন্ট ছাড়লেন। এনিওয়ে, টাকাটার উপযুক্ত ব্যবহার তো হতেই পারে।"

"কীভাবে?"

"চলো, পুজোয় এবার কন্টিনেন্ট টুর মেরে আসি। ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালি। চাইলে লন্ডনটাও ছুঁয়ে আসতে পারি।"

"সে দেখা যাবে'খন।" বুমবুম ঢুলছে, তার মাথা কোলে টেনে মিতিন বলল, "আগে একটা সলিড ঘুম দেব। পরপর দুটো রাত যা টেনশনে কেটেছে।"

"টেনশনের ছিলটা কী? কেস তো প্রায় জোড়াতালি দিয়ে সল্‌ভ করলে।" পার্থ টিপ্পনী ভাসাল, "যে ব্রহ্মাস্ত্রে অশোক মজুমদারকে শেষমেশ বধ করলে, সেটা তো স্রেফ আন্দাজ!"

"আজ্ঞে না স্যার। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি প্রমাণ ছাড়া কাজ করে না। কাল দুপুরে আমি বেড়াতে যাইনি। অশোক মজুমদারের মোবাইলের কললিস্ট জোগাড় করছিলাম। ওটা ঘাঁটতেই তো ফোন বুথের নাম্বারটা বেরিয়ে এল।"

টুপুরের ভুরু জড়ো হল, "তুমি অশোক মজুমদারের মোবাইল নাম্বার পেলে কোত্থেকে?"

"গেস কর।"

"রুস্তমজি?"

"উঁহু।"

"তা হলে তারক...?"

"হল না।"

"আর কে হতে পারে?" টুপুর মাথা চুলকোচ্ছে।

"পারলি না তো?" মিতিন ঝটাক্‌সে ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল, "দিস ইজ দ্য সোর্স মাই ডিয়ার। কাল অশোক

মজুমদার যখন আমার স্লিপ দিতে রুস্তমজির ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন তাঁর এই কার্ডটি আমি গায়েব করেছিলাম।”

“তুমি কি তখনই অশোক মজুমদারকে সন্দেহ করেছিলে?”

“অনেকটাই। কারণ, স্কুলে গাড়ি পাঠানোটা ওঁর দায়িত্ব। অতএব দেরিতে যদি গাড়ি পৌঁছোয়, দু’জন প্রধান সাসপেক্ট থাকে। একজন তারক, অন্যজন অশোক। ঠিক কি না?”

“তা তারককে বাদ দিলে কী হিসেবে?”

“স্টেটমেন্টে ফাঁক খুঁজে পাইনি, তাই। যদি তারক দলে থাকতেন, তা হলে চশমার দোকানের গল্পটা বলতেন কি? ট্রাফিক জ্যামের অজুহাত দেওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। এবং মোবাইলে অশোক মজুমদার যে তাঁকে কল করেছিলেন, সেটাও চেপে যেতেন। অশোক মজুমদারকে তোর-আমার গল্পটাও তারক শুনিয়েছেন বটে, তবে তা হয়তো নিজের অজান্তেই। অশোক মজুমদারই কৌশলে কথাটা বের করে নিয়েছিলেন।”

“একটা কথা বলব মিতিনমাসি? কললিস্ট চেক করে অশোক মজুমদারকে যখন ধরেই ফেললে, ফালতু-ফালতু বিকেলে আর পারসি ক্লাবে গেলে কেন?”

“প্রয়োজন ছিল রে। একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চাইছিলাম। অশোকবাবুই কুকীর্তির নায়ক, নাকি পিছনে কোনও মেঘনাদ আছে?”

“জিমির খবর নিতে চাইছিলে?”

“যে-কোনও জ্ঞাতিশত্রুর কথাই ভাবনায় ছিল। হয়তো বা জিমিও। তবে জিমি মুম্বই থেকে এসে ভাইপোকে ইলোপ করবে, তাও মাত্র এক কোটি টাকার জন্য, এটা একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।”

“দুনিয়ায় সবই ঘটে, বুঝলে!” পার্থ মাথা দোলাল, “এই

অশোক মজুমদারকেই ধরো না। কতদিনের বিশ্বাসী কর্মচারী। চাকরিটা যথেষ্ট ভাল। নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি আছে, মাস গেলে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে। লোভে পড়ে তাঁরও মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল তো! সোনার ডিমের জন্য আস্ত হাঁসটাকেই জবাই করতে যাচ্ছিলেন।"

"শুধু লোভ নয় মেসো, এখানে প্রতিশোধস্পৃহাও একটা ফ্যাক্টর।" টুপুর ফুট কাটল, "ভাই যে দোষই করুক, তার বরখাস্ত হওয়াটা নিশ্চয়ই অশোকবাবু মানতে পারেননি। অপমানে ধিকিধিকি জ্বলছিলেন। সুজয় হয়তো সেই আগুনে ঘি ঢেলেছিল।"

"না রে টুপুর, রক্তে অপরাধ প্রবণতা থাকলে তবেই এ ধরনের কুকাজ করা সম্ভব। চেহারায়, আচার-আচরণে, যতই সভ্যভব্য হোক, সময়-সুযোগ পেলে এদের আসল রূপটা ফুটে বেরোবেই। না হলে ভাব তুই, এত সুন্দর প্ল্যান করে, হিসেব কষে, ওইটুকু একটা বাচ্চাকে কেউ গুম করতে পারে?"

মিতিনমাসি ঠিকই বলছে। টুপুরের একটা শ্বাস পড়ল। সত্যি, মানুষকে চেনা বড় কঠিন!

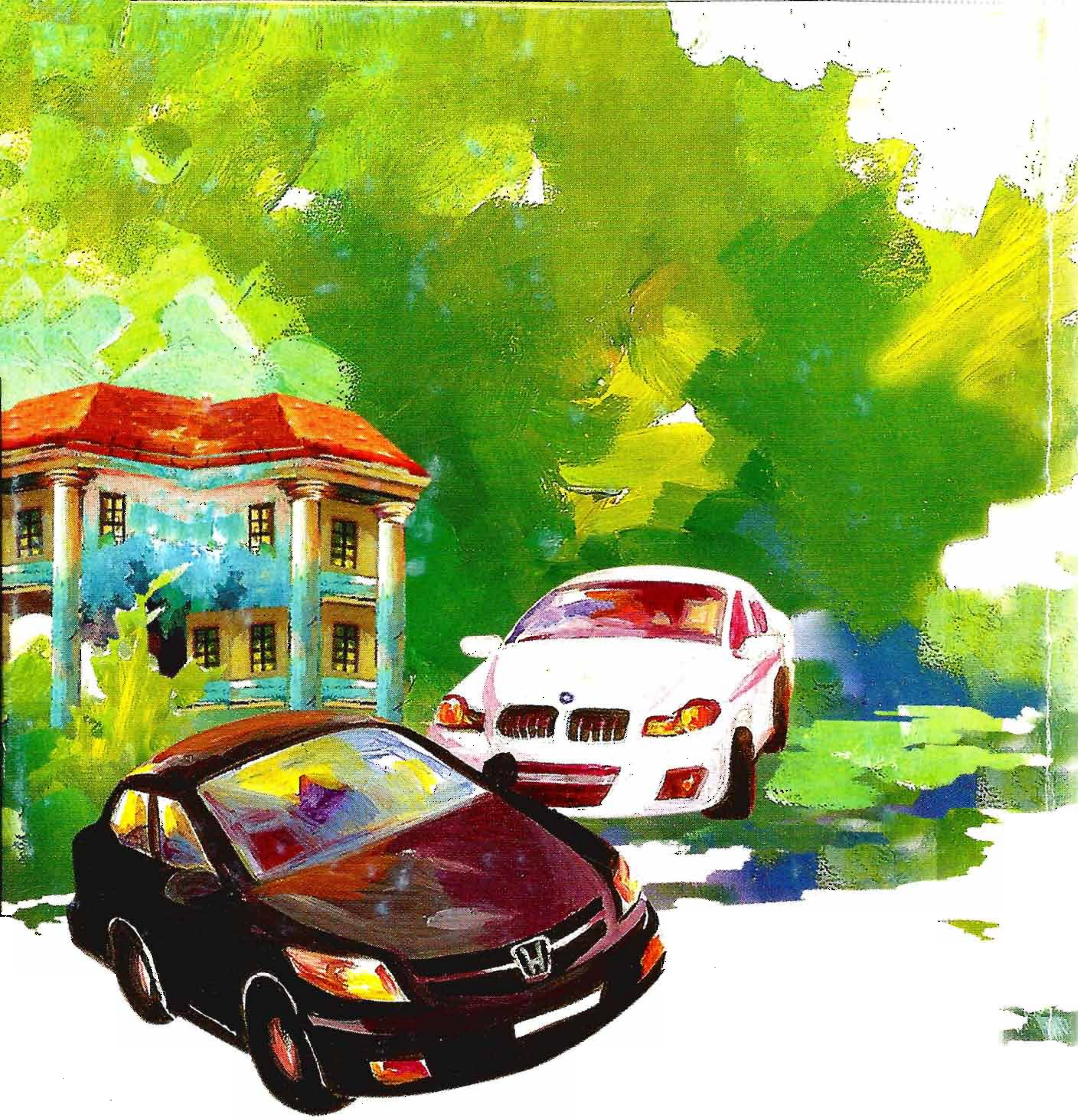

9 789350 400159

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

শিবালিক পর্বতমালা ধরে ছুটছিল গাড়িখানা। গাছগাছালিতে ছাওয়া সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে। চক্রাকার রাস্তা কখনও চড়াই তো কখনও উতরাই। পথের কিনারে গভীর খাদ এই যদি বাঁয়ে তো এই ডাইনে। ভয়ংকর ওই সব খাদের পানে তাকালে গা শিরশির করে, মাথা ঘুরে যায়। টুপুরের অবশ্য চক্কর-টক্কর লাগে না। তা ছাড়া আনন্দে সে এখন রীতিমতো ডগমগ।

পুজোর ছুটিটা যা জমে উঠেছে এবার! জব্বর একখানা চমক দিল বটে পার্থমেসো। আগে কিচ্ছুটি জানায়নি, হঠাৎ সপ্তমীর সকালে ট্রেনের টিকিট নিয়ে হাজির। শুধু টুপুর নয়, টুপুরের মা-বাবাকেও যেতে হবে। দশমীর সন্ধেয় দিল্লি-কালকা মেলে যাত্রা শুরু, তারপর ক'টা দিন হিমাচল প্রদেশে চরকি খেয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরে ব্যাক। টুপুরের তো পোয়াবারো। কলকাতার দুর্গাপুজোটাও মিস হল না, আলটপকা একটা ভ্রমণও জুটে গেল কপালে। তাও হেঁজিপেঁজি বেড়ানো নয়, কুলু, মানালি, রোটাং। টুপুরের স্বপ্নের দেশ।

আজ কাকভোরে ট্রেন থেকে নেমেছে টুপুররা চণ্ডীগড়ে। সেখানেই ভাড়া করা হল এই সাত আসনের গাড়ি এবং তৎক্ষণাৎ রওনা। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ পেরিয়ে পঞ্জাবের রোপারে ব্রেকফাস্ট, তারপর দুপুর-দুপুর মাণ্ডি পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজ। এবার তাদের গন্তব্য কুলু।

গাড়ির একদম পিছনের সিটে মিতিন আর বুমবুম। পথশ্রমে বুমবুম বেশ ক্লান্ত, মায়ের কোলে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছে সে। মাঝের আসনে টুপুর, সহেলি আর অবনী। পার্থ বসেছে ড্রাইভারের পাশে, হাতে হিমাচল প্রদেশের একখানা প্রকাণ্ড ম্যাপ। তীক্ষ্ণ চোখে কাগজখানা দেখছে পার্থ, আর হঠাৎ-হঠাৎ চোখ তুলে তাকাচ্ছে ইতিউতি। যেন মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে পথঘাট!

ম্যাপখানা মুড়ে পার্থ আচমকা চালকের পানে ঘাড় ঘোরাল, "ভাইসাব, অভি তক হম কিতনা কিলোমিটার আয়া?"

চালকটি এক তরুণ শিখ। নাম টিঙ্কু সিংহ। তারস্বরে পঞ্জাবি গান চালিয়েছে টিঙ্কু। গান না বাজালে পাহাড়ি রাস্তায় তার নাকি চোখ বুজে আসে। স্পিকারের আওয়াজ সামান্য কমিয়ে টিঙ্কু বলল, "চণ্ডীগড়সে মাণ্ডি দোসো কিলোমিটার। উসকে উপর তিস-চাল্লিস জোড় লিজিয়ে।"

"তার মানে কুলু এখনও পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার। পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

সহেলি খানিক ঝিমোচ্ছিলেন। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বললেন, "এই সেরেছে। তার মানে অন্ধকারের মধ্যে পৌঁছব? একটা অচেনা, অজানা জায়গায়?"

"তো? জঙ্গলে গিয়ে পড়ছি নাকি? এত বিখ্যাত একটা টুরিস্ট প্লেস! হিমালয়ের একটা প্রধান গেটও বলা যায়।"

"কিন্তু গিয়ে হোটেল খুঁজতে হবে যে। আমাদের তো কোনও বুকিং-টুকিং নেই!"

"ওটা কোনও সমস্যা নাকি?" অবনী এবার ঢাউস বই থেকে মুখ তুলেছেন। নিশ্চিন্ত সুরে বললেন, "তোমার গ্রেট সিস্টার আছে না টিমে? প্লাস, এমন ওস্তাদ ভগ্নিপতি পার্থ?"

"বাহ্-বাহ্, সব দায় বুঝি ওদের, অ্যাঁ? তুমি খালি বসে-বসে ঠ্যাং নাচাবে আর থান ইট গিলবে?"

অভিযোগটা একশো ভাগ সত্যি। পরশু সন্ধেয় ট্রেনে চড়ার পর থেকে কুটোটি নাড়েননি অবনী। মালপত্র তোলা-নামানো, রাতে শোওয়ার বন্দোবস্ত, খাওয়ার জোগাড়, চণ্ডীগড়ে নেমে গাড়ির জন্য ছোটাছুটি, সমস্ত ঝক্কি মিতিন আর পার্থ পালা করে সামলেছে। এদিকে অবনী বইই পড়ে চলেছেন একটানা। সম্প্রতি সমুদ্র সম্পর্কে বেজায় আগ্রহ জেগেছে অবনীর, তাই তিন-তিনখানা ওশিয়ানোগ্রাফির বই নিয়ে চলেছেন পাহাড়ে। টুপুরের বাবার এ হেন বিদঘুটে খেয়ালে টুপুরের মা তো বিরক্ত হতেই পারেন।

অবনী অবশ্য গ্রাহ্যেই আনলেন না সহেলিকে। হাই মাইনাস পাওয়ার চশমাখানা ঠিক করতে-করতে বললেন, "আরে বাবা, ওরা অল্পবয়সি, ওসব কাজ তো ওদেরই মানায়। তার উপর মিতিন হল গিয়ে ডিটেকটিভ। সুপারস্মার্ট লেডি। পার্থও যথেষ্ট চালাকচতুর বিজনেসম্যান। আমার মতো আজীবন ছাত্র ঠেঙানো এক সাধারণ কলেজ মাস্টারের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় নাকি?"

সহেলি রেগে টং। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "তোমার কায়দাবাজির কথা রাখো। সাফ বলে দিচ্ছি, কুলুতে কিন্তু মিতিন-পার্থ মোটেই গাড়ি থেকে নামবে না। তুমি একা গিয়ে একটা ভাল হোটেলের ব্যবস্থা করবে।"

"রাতটা তা হলে গাড়িতেই কাটবে রে দিদি," মিতিন মুচকি হেসে ফোড়ন কাটল, "তারপর ভোর হলে আমাদেরই বেরোতে হবে অবনীদাকে খুঁজতে।"

পার্থ হা-হা হেসে উঠল। টুপুরও হাসছে মিটিমিটি। চোয়াল শক্ত রেখেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না সহেলি, হেসে ফেলেছেন ফিক করে। ব্যস, অবনীকে আর পায় কে! ফের তিনি বইয়ের পাতায় মনোযোগী।

অপাঙ্গে তাঁকে একবার দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "এবার জায়গা বুঝে কোথাও একটু দাঁড়ালে হয় না?"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"স্ন্যাক্স ব্রেক। এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া কিংবা চপ।"

"তুমি এখন খেতে পারবে? দুপুরে না দশ-এগারোখানা রুটি সাঁটালে?"

"সর্বনাশ, তুই গুনছিলি নাকি?" পার্থ হ্যা-হ্যা হাসল, "এমন চমৎকার পাহাড়ি জায়গা! নির্মল বাতাস, নো পলিউশন, যা খাচ্ছি তুরন্ত হজম। পেট ফের হাঁক পাড়ছে রে।"

"পেট ছাড়া আরও অঙ্গ আছে মশাই," মিতিন কুটুস হুল ফোটাল, "চোখ দু'টোকেও একটু ইউজ করো। সিনসিনারিগুলো দ্যাখো।"

"দেখার এখন আছেটা কী? মাণ্ডির পর সেই যে শুরু হল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। দু' ঘণ্টা ধরে তো পাহাড়ই গুনে যাচ্ছি। তাও যদি একখানা আইস-পিক চোখে পড়ত!"

"সঙ্গে-সঙ্গে যে বিপাশা নদীটা চলেছে, সেটা নজরে পড়ছে না?"

"বিপাশা তো এখন সারাক্ষণ পাশে-পাশে থাকবে ম্যাডাম। কুলু-মানালি ছাড়িয়ে সেই রোটাং পাস পর্যন্ত। কতবার যে ওর সঙ্গে মোলাকাত হবে!"

"বেশ তো। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে যে লেকটা পড়ল, সেটাও তোমার মনে ধরল না?"

"উহল নদীর পান্ডো-ড্যাম?" পার্থর উদাসী জবাব, "মন্দ নয়, তবে কুলু হল গিয়ে ভ্যালি অফ গড্স। দেবদেবীদের উপত্যকায় আমি আরও সুন্দর কিছু এক্সপেক্ট করি।"

"মিলবে-মিলবে," মিতিন আশ্বাস দিল, "পৌঁছে দ্যাখো।"

কথোপকথনের মাঝেই সূর্য ঢাকা পড়েছে এক পাহাড়ের আড়ালে। মাথার উপর ঝকঝক করছে আকাশ, তবু আলো যেন মরে এল সহসা। দ্রুত ছায়া ঘনাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে, দূরে-দূরে, দেখা যায় ছোট-ছোট গ্রাম। আলোছায়া মাখা চাষের খেতগুলোও যে এখন কী অপরূপ!

টুপুর একদৃষ্টে বাইরেটা দেখছিল। অস্ফুটে বলে উঠল, "বিউটিফুল। ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি!"

পার্থ ফের ম্যাপে ডুবেছে। জিজ্ঞেস করল, "কী রে?"

MODY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (MITS)
(Deemed University u/s 3 of the U.G.C. Act, 1956)

ADMISSIONS 2011-12 ....ONLY FOR GIRLS
LAKSHMANGARH-332311, Distt. Sikar (Rajasthan) Ph: (01573) 225001 (12 Lines) Extn. (223/210/401) Fax: (01573) 225044
E-mail: dean.fasc@mitsuniversity.ac.in / Visit us at: www.mitsuniversity.ac.in

FACULTY OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE

B.B.A. / B.Com (Hons.)
B.Sc. (Hons.) Biotechnology
B.Sc. (Chem., Zoo., Biotech)
B.A. (Hons.) Economics
B.A. (Hons.) English
B.A. (Hons.) Psychology

B.A. (Hons.) French
B.A. (Hons.) Vedic Astrology
B.A. (English, Political Sc., Sociology, Garment Production & Export Mgt. Any three).
B.C.A. (Maths not Required)
Eligibility: A Pass in 10+2

M.Sc. (Chemistry)
M.Sc. (Biotechnology)
M.Sc. (Microbiology)
M.Sc. (Information Technology)
(Maths not required)
Eligibility: Minimum 50% in graduation

Application form can be downloaded from www.fascmits.ac.in. Application forms (with prospectus) are also available at the designated branches of Oriental Bank of Commerce (OBC). For details of branches, refer to the website.

Last date of Admission: 24th July 2011
Admission desk:
09950000974 / 09887780960 / 09414664006 / 01573-225879

ATUL

One Foreign Language compulsory for all Programmes (Chinese, French, German, Japanese, Spanish) On Campus, Regular CA/ CPT/ CAT/ MAT coaching available by professionals

"একবার চোখটা ঘোরাও না। দৃশ্যগুলো মনে হচ্ছে, কেউ যেন তুলি দিয়ে এঁকেছে।"

"ন্যাচারাল বিউটি তো আছেই রে। নইলে এখানকার মানুষরা এমনি-এমনি জন্ম-আর্টিস্ট হয়!" পার্থ বিজ্ঞ স্বরে বলল, "জানিস নিশ্চয়ই, কুলু উপত্যকায় পেন্টিংয়ের একটা নিজস্ব ধারা আছে। লোকাল শিল্পীরা এক-একজন তো রীতিমতো তুখোড়। এমন-এমন ছবি আঁকে, সাহেবরা পর্যন্ত ভিরমি খেয়ে যায়। কত বিদেশি টুরিস্ট যে এখান থেকে ছবি কিনে নিয়ে যায়!"

সহেলি নড়েচড়ে বসলেন, "আমরাও দু'-একটা কিনতে পারি। ড্রয়িংরুমে একটাও ভাল পেন্টিং নেই, যদি পছন্দসই কিছু পাওয়া যায়।"

"নো প্রবলেম। এখন তো কুলুতে বিখ্যাত দশেরার মেলা চলছে, ওখান থেকেই বেছেবুছে নিতে পারবেন।"

"বিখ্যাত কেন বলছ? খুব বড় মেলা নাকি?"

"অতি বৃহৎ। ভারতে যে ক'টি আন্তর্জাতিক মেলা বসে, তার মধ্যে কুলুর দশেরার মেলা অন্যতম। দেখবেন, কী এলাহি আয়োজন!"

সত্যি, কুলুতে পৌঁছে চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। পাহাড়ে ঘেরা শহরখানা আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। বড় রাস্তার গায়েই সমতলে বিশাল এক মাঠ, সেখানেই বসেছে মেলা। গিজগিজ করছে মানুষ, মাইক বাজছে, লোকজনের হইহল্লায় চতুর্দিক গমগম।

রাস্তার একধারে গাড়ি লাগিয়েছে টিঙ্কু। জানলার কাচ নামিয়ে পার্থ উল্লসিত স্বরে বলল, "ওয়াও! মেলা তো জমে ক্ষীর!"

টুপুর চকচকে চোখে বলল, "ঝপ করে এক পাক ঘুরে নিলে হয় না?"

"উঁহু, এখন কোথাও নয়। আগে হোটেল। পরশু বিকেল থেকে শুধু দৌড় চলছে, খানিক জিরিয়ে তবে ঘোরাঘুরি," বলেই সহেলি ঠেলছেন অবনীকে, "কী গো, এবার থাকার ব্যবস্থাটা করো।"

অবনী কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "আ-আ-আমি? এই ভিড়ে কোথায় যাব?"

পার্থ হেসে বলল, "আহা, থাক-থাক। অবনীদাকে রেহাই দিন। আমি দেখছি।"

তড়াক লাফিয়ে পার্থ রাস্তায়। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। মিতিন গলা বাড়িয়ে বলল, "মেলার মাঠটার নাম ঢালপুর ময়দান। এটাই কুলুর সেন্ট্রাল প্লেস। কাছেই গভর্নমেন্টের টুরিস্ট সেন্টার পাবে, আগে সেখানে খোঁজ নাও।"

হনহনিয়ে এগোল পার্থ। এদিকে বুমবুমের ঘুম ভেঙেছে, জেগেই তিনি একের পর-এক বায়না জুড়ছেন! চিপ্‌স চাই, কোল্ডড্রিংক খাবে। অদূরে মেলায় অতিকায় নাগরদোলা দৃশ্যমান, এক্ষুনি তাতে চড়বে বলে রীতিমতো ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিল। মিতিন তাকে ধমকে-ধামকে থামাচ্ছিল, পার্থ ফিরে এসেছে। হাত উলটে বলল, "নো চান্স। সরকারি সমস্ত লজ ভর্তি।"

"তা হলে কী হবে?"

"ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ঢালপুর ময়দানের আশপাশে অসংখ্য হোটেল, একটা না-একটাতে ঠিক ঢুকে যাব। আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গা ফিট করে ফেলছি।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আমি যাব?"

"নো নিড। পার্থ মুখার্জি এই কেসে একাই কাফি।"

মেসো চলে যাওয়ার পর টুপুর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নেমেছে বুমবুমকে নিয়ে মিতিনও। দোকান থেকে মিতিন চা এনে দিল দিদি-জামাইবাবুকে। টুপুর আর বুমবুমকে চিপ্‌সের প্যাকেট। টিঙ্কুকেও চা খেতে ডাকল মিতিন। গেলাস হাতে গল্প জুড়েছে দু'জনে।

টুপুরের অল্প-অল্প শীত করছিল। গায়ে কার্ডিগান চাপানো, তবুও। হাত দু'টো সামনে জড়ো করে টুপুর দেখছিল মেলাটাকে। স্থানীয় মানুষদের গায়ে কী রং-বেরঙের পোশাক! ছেলেদের মাথায় রঙিন টুপি, মেয়েরা সেজেছে রুপোর গয়নায়। ওই টুপিগুলো নিশ্চয়ই কুলু টুপি? দেশি-বিদেশি পর্যটকরাও টুপি পরে ঘুরছে। মেলায় এসে ছেলেমানুষ বনে গেছেন বড়রাও, অনেকেই ভেঁপু বাজাচ্ছেন। এমনকী, সাহেব-মেমরাও। বিচিত্র বাজনা বাজাতে-বাজাতে একদল পাহাড়ি মেয়ে-পুরুষ পাক খাচ্ছে মেলাটাকে। কেউ-কেউ নাচ জুড়েছে। সবাই মিলে গানও গাইছে কী একটা। কচিকাঁচাদের উল্লাসের অন্ত নেই, তারাও চলেছে পিছু-পিছু।

জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎই হন্তদন্ত পায়ে পার্থর আবির্ভাব। গোমড়া মুখে বলল, "ব্যাড নিউজ। ভেরি ব্যাড নিউজ। কোথাও ঠাঁই নেই। সব ক'টা হোটেল উপচে পড়ছে।" সমাচার শুনে সহেলির মুখ পাংশু। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ট্রেনে কতবার বললাম, হোটেল বুকিং না করে বেরনোটা মোটেই উচিত হয়নি।"

"প্যানিক করিস না তো দিদি। পার্থর এলেম বোঝা গেল, এবার আমি একটু চেষ্টা করি?" মিতিন গাড়ির দরজা খুলে ধরল, "এসো-এসো, উঠে পড়ো সকলে। জলদি-জলদি।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "কোথায় যাবে?"

"কোয়েশ্চেন পরে। চটপট বোসো তো সিটে।"

ফের চলা শুরু। মাঠ ছাড়িয়ে, শাঁ শাঁ আরও খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল গাড়ি। খাড়াই বেয়ে উঠছে ধীরে-ধীরে। এদিকটায় তেমন আলো-টালো নেই, বেশ অন্ধকার-অন্ধকার। সরু পথের দু' ধারে ঘরবাড়ি আছে বটে, তবে লোকজন দেখা যায় না বিশেষ। এক-আধজন যাও চোখে পড়ল, তাও সাদা চামড়ার। চড়াই বেয়ে উঠছে হেঁটে-হেঁটে।

টুপুর চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "এদিকেও হোটেল আছে নাকি? এত নির্জনে?"

মিতিনের নির্বিকার জবাব, "মনে হয় না।"

পার্থ অসহিষ্ণু স্বরে বলল, "তা হলে আমরা চলেছি কোথায়?"

"প্রাইভেট কটেজে।"

"মানে?"

"এখানকার অনেক স্থানীয় মানুষ টুরিস্টদের ঘর ভাড়া দেয়। আমাদের টিঙ্কু সিংহ এরকম তিন-চারটে কটেজের সন্ধান জানে।"

"তাই নাকি?"

"ইয়েস। এতক্ষণ তো টিঙ্কুর কাছ থেকে এসবই জানছিলাম। এখন দেখি কপাল ঠুকে।"

প্রথম বাড়িটায় বিফল মনোরথ হতে হল। দ্বিতীয়টাতেও। অবশেষে তৃতীয় একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় দু'খানা ঘর মিলেছে। নীচে সপরিবার বাড়িওয়ালার বাস। খাবার-দাবার তারাই বানিয়ে দেবে। তবে দর অতি চড়া। অবনী বললেন, "রাতটুকু এখানেই ঘাঁটি গাড়া যাক, সকালে অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে।"

পার্থ-মিতিনেরও তাই মত। একমাত্র সহেলি যা একটু খুঁতখুঁত করছেন। মেলাটা এখান থেকে অনেকটা দূর হয়ে যাবে কিনা। অবশ্য শেষমেশ মেনেও নিলেন। এই কটেজ ছাড়া এখন আর গতি কী!

বাড়িওয়ালার নাম বিভব শর্মা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। কথাবার্তায় সজ্জন। নিজে দোতলায় উঠে খুলে দিলেন ঘর দু'টো। পার্থ আর টিঙ্কু মালপত্র নামাল গাড়ির ছাদ থেকে। সকলে মিলে ধরাধরি করে তুলল উপরে।

সুটকেস-টুটকেস ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পার্থ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে সোফায়। অলস মেজাজে বলল, "এখন একটু কফি পেলে দারুণ হত।"

মিতিন বলল, "যা তো টুপুর, নীচে গিয়ে বলে আয়।"

টুপুর উঠতে গিয়েও থমকেছে। নীচ থেকে একটা গলার আওয়াজ আসছে না? কে যেন গাঁকগাঁক করে চেঁচাচ্ছে? বিভব শর্মা কী যেন বললেন অনুচ্চ স্বরে, পরক্ষণে চিৎকার আরও চড়ে গেল।

টুপুর সভয়ে বলল, "ঝগড়া বেধেছে নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" মিতিনের ভুরুতে হালকা ভাঁজ, "চল তো দেখি।"

মিতিনের পিছন-পিছন একতলায় নেমে আরও কুঁকড়ে গেল টুপুর। একটা রোগা, ঢ্যাঙামতো লোক চড়াও হয়েছেন বিভব শর্মার

ঘরে। বয়স বছর পঞ্চাশ। টিকলো নাক। বাবরি চুল। পরনে চুস্ত-পাঞ্জাবি, গায়ে কুলু শাল। সভ্যভব্য চেহারার মানুষটা আঙুল তুলে শাসাচ্ছেন বিভবকে। নরম গলায় তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন বিভব শর্মা। কিছুই শুনলেন না ভদ্রলোক, হঠাৎ দুদ্দাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

মাথা নামিয়ে বসে আছেন বিভব শর্মা। হলটা কী?

॥ ২ ॥

কটেজের দু'খানা ঘরই ভাড়ার সঙ্গে মানানসই। ফায়ারপ্লেস, ইংলিশ খাট দিয়ে সাজানো দিব্যি আরামদায়ক কামরা। দরজা-জানলায় লম্বা-লম্বা পর্দা, মেঝেয় মোটা কার্পেট, এক সেট সোফা, কারুকাজ করা সেন্টারটেবিল, ওয়ার্ড্রোব, ড্রেসিংটেবিল, টিভি, শাওয়ার-গিজার-কমোড বসানো ঝকঝকে বাথরুম, সবই মজুত। এমনকী, লেখাপড়া করার চেয়ার-টেবিলও। সেখানে শোভা পাচ্ছে কম্পিউটার। বিদেশি পর্যটকদের মন কাড়ার জন্যই বুঝি এতসব বন্দোবস্ত। দেওয়ালে খান দুয়েক পেন্টিংও ঝুলছে। পাহাড়ের দৃশ্য, পাহাড়ি মানুষের মুখ, বিপাশা নদী। আঁকার মান নেহাত মন্দ নয়, তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে।

সারাদিন পর এমন একটা আস্তানা পেয়ে সকলেরই শরীর বেশ ছেড়ে গিয়েছে। কেউ আর বেরনোর নামটি করছে না। উষ্ণ-উষ্ণ জলে হাতমুখ ধুয়ে যে যার মতো তরতাজা হয়ে নিল খানিকটা। এখন সকলে মিলে জড়ো হয়েছে এক ঘরে। কফি আর গরম-গরম চিকেন পকোড়াও হাজির, হাত মুখ দু'ইই চলছে সমান তালে। বসেছে গল্পের আসর।

নীচের ঘটনাটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। যে ভদ্রলোক এসে চেঁচামেচি করছিলেন, তিনি নাকি একজন স্থানীয় শিল্পী। নাম বৈজনাথ রাই। এই কটেজেই নাকি দু'জন লোক এসে উঠেছিল, তারা তিনখানা ছবি আঁকতে দিয়েছিল বৈজনাথকে। আজ সকালে বৈজনাথের বাড়ি থেকে ছবি তিনটে নিয়েও এসেছে লোকগুলো। তখন নাকি বলেছিল, সন্ধেবেলা কটেজে এসে টাকা নিয়ে যেতে। এখন বৈজনাথ এসে দেখছেন, চিড়িয়া উধাও। মাঝখান থেকে বেচারার কড়কড়ে চল্লিশ হাজার টাকা চোট! এর পরেও বৈজনাথ ক্ষিপ্ত না হয়ে পারেন?

অবনী ভারী মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "ছি-ছি, শিল্পীকে কেউ এভাবে ঠকায়? লোকগুলো মহা পাজি তো!"

সহেলি বললেন, "ওরকম বদমাশ টুরিস্টও আসে তা হলে?"

"টুরিস্টদের মধ্যে সব ধরনের চিজই থাকে," পার্থ টুপুরের দিকে ফিরল, "লোকগুলো এ দেশি না ফরেনার?"

"খাঁটি ভারতীয়। মিস্টার শর্মা তো বললেন, দু'জনেই নাকি মুম্বইওয়ালা। পরিচয় দিয়েছিল বিজনেসম্যান।"

"চিটিংবাজির কারবার করে বোধ হয়। তা হোটেলে না উঠে এখানে আড্ডা গেড়েছিল যে বড়?"

"কে জানে! হয়তো আমাদের মতোই জায়গা না পেয়ে।"

"কবে এসেছিল?"

"বারো দিন নাকি ছিল এখানে।"

"মানে পুজোর আগে থেকে? স্ট্রেঞ্জ! তখন তো মেলাও শুরু হয়নি? বারো দিন ধরে টাউনের কোনও হোটেল না পাওয়াটা যেন কেমন-কেমন লাগছে।" পার্থ মিতিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, "কী গো, তোমার ইনটিউশন কী বলে?"

"ওদের হয়তো এরকম জায়গাই পছন্দ," মিতিন হাত উলটোল, "অনেকেই তো ভিড়ভাট্টা পছন্দ করে না। বেড়াতে এসে নির্জনতা খোঁজে।"

"মিটারও তো এখানে কম ওঠেনি! শুধু রুম-চার্জই দিয়েছে প্রায় লাখ খানেক!"

"দিয়েছে। তাদের খেয়াল।"

"তুমি কি এর মধ্যে কোনও রহস্য পাচ্ছ না?"

মিতিন হেসে ফেলল, "তুমি কি আমাকে খোঁচাচ্ছ?"

"নাহ্। জাস্ট তোমার ডিডাকশানটা বুঝতে চাইছি।"

"সরি। একটা মাত্র সমীকরণ থেকে এক্স-ওয়াই-জেডের সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।"

টুপুর বলল, "আমার কিন্তু মনটা খচখচ করছে, মিতিনমাসি। যারা লাখ টাকা শুধু ঘরভাড়াই দেয়, তারা বৈজনাথ রাইয়ের মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা মেরে দেবে?"

"এই প্রশ্নটায় দম আছে," মিতিন কফিতে শেষ চুমুক দিল, "তবে কী জানিস, মানুষ বড় আজব জীব রে। কোটি-কোটি টাকা যার রোজগার, অথচ সেও হয়তো কাজ করিয়ে লোককে পয়সা দেয় না। হায়দরাবাদের নিজামের কথাই ভাব। লাখ-লাখ টাকা খরচা করে পার্টি দিতেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে এঁটো খাবারও ফেলে দেওয়ার জো ছিল না। তাঁর কর্মচারীদের ওসব গিলতে হত। অথচ তিনি তখন পৃথিবীর এক নম্বর বড়লোক। গ্যারাজে তাঁর লাইন দিয়ে রোল্‌স রয়েস।"

"বুঝেছি। তুমি ব্যাপারটাকে আমল দিচ্ছ না," পার্থকে কিঞ্চিৎ হতাশ দেখাল। পরক্ষণে সামান্য উজ্জীবিত স্বরে বলল, "আর একটা স্ট্রাইকিং পয়েন্ট আছে কিন্তু। তোমরাই বললে, বৈজনাথ রাই বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন। পাওনা আরও চল্লিশ। অর্থাৎ তিনটে ছবির জন্য মোট ষাট হাজার। লোকাল একজন আর্টিস্টের পক্ষে দামটা কি একটু বেশি ঠেকে না?"

"আমার মনে হয় না।"

"কেন জানতে পারি?"

"কারণ, বৈজনাথজির পেন্টিংয়ের হাত যথেষ্ট ভাল। ওই রকম একটা অ্যামাউন্ট উনি দাবি করতেই পারেন।"

"বৈজনাথজি কেমন আঁকেন, তুমি জানলে কী করে?"

"দেওয়ালের ছবিগুলো দেখে।"

"এগুলো বৈজনাথজির আঁকা নাকি?"

"ইয়েস স্যার। শুধু কান নয়, চোখ দু'টোও খোলা রাখো। ছবির কোনায় বৈজনাথ রাইয়ের দস্তখত আছে মশাই।"

পার্থ ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। টুপুরও হাঁ। ইস, মিতিনমাসির পর্যবেক্ষণশক্তিটা যে কেন এখনও টুপুর আয়ত্ত করতে পারল না?

চিকেন পকোড়া শেষ। সহেলি একটা হাই তুলে বললেন, "তোমাদের রহস্য খোঁজা এবার থামাও। একটু কাজের কথা হোক।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "যেমন?"

"এখানে যাব, ওখানে যাব, বললেই তো হবে না। আমাদের এগজ্যাক্ট টুর-প্ল্যানটা কী?"

"কালকের দিনটা আমরা কুলুতেই থাকছি। লোকাল যা-যা দ্রষ্টব্য তা তো দেখবই। খানতিনেক মন্দির আছে, তার মধ্যে বিজলেশ্বর মহাদেব টেম্পল তো যথেষ্ট ফেমাস। বিপাশার পারেও ঘুরব। তারপর বিকেল থেকে মেলা। আপনিও প্রাণ খুলে শপিং করতে পারবেন।"

"আমি কিন্তু জায়েন্ট হুইল চড়বই," বুমবুম প্রায় লাফিয়ে উঠেছে, "আর আমার একটা লাল-সবুজ টুপিও চাই।"

"হবে-হবে," হাত তুলে ছেলেকে আশ্বাস দিল পার্থ। ফের সহেলিকে বলল, "তারপর ধরুন, পরশু সকালে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। স্ট্রেট টু মানালি। সেখানে থ্রি নাইট হল্ট। একদিন তো রোটাং পাস যেতে আসতেই কেটে যাবে। একদিন চুটিয়ে মানালি সফর। হিড়িম্বার মন্দির, বশিষ্ঠ-আশ্রম, গোল্ডেন আপেলের বাগান, টিবেটিয়ান মনাস্ট্রি।"

পার্থ একটু সময় নিয়ে বলল, "এরপর যে প্ল্যানটা আছে, আমরা দু'ভাবে বাকি টুরটা সারতে পারি। রোটাং পেরিয়ে যেতে পারি কেলং। লাহুল-স্পিতির একমাত্র শহর। রুটটা একটু টাফ, তবে জায়গাটা নাকি দারুণ। ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্যিখানে ভ্যালি অফ গ্লেসিয়ার। মানে বুঝছেন তো? হাতের নাগালে বরফ। তা ছাড়া চন্দ্রভাগার ভাগা নদীটাকে ওখানে পেয়ে যাবেন।"

"কেলংয়ের নাম আর একটা কারণেও করা যায়," মিতিন বলে উঠল, "কলকাতায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা ছোড়ার অপরাধে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ধরা পড়েছিলেন ওই কেলংয়ে।"

"হ্যাঁ। ওখানে তাঁর একটা স্ট্যাচুও আছে বলে শুনেছি," পার্থ মাথা নাড়ল, "যাই হোক, কেলং একটা অপশন। দ্বিতীয় চয়েস, আমরা মানালি থেকে সিমলা চলে যেতে পারি। মোটামুটি আরও তিনটে দিন সিমলা আর তার চারপাশটা উপভোগ করে ট্রেনে ব্যাক টু কালকা। চণ্ডীগড়ের বদলে কালকা থেকেই নয় কলকাতা ফিরব।"

"মন্দ নয় আইডিয়াটা," সহেলি বললেন, "সিমলা-কালকা ট্রেনজার্নিটা নাকি খুব সুন্দর। একশো-দেড়শোখানা টানেল পড়ে পথে, সেটাও এক অভিজ্ঞতা।"

মিতিন ফুট কাটল, "প্লাস, তুই সিমলাতে প্রাণের সুখে শপিং করতে পারবি।"

অবনী হা-হা করে হেসে উঠলেন, "খাসা বলেছ। তোমার দিদি বাজার করা ছাড়া তো কিছু বোঝে না। ওর কাছে ভ্রমণ মানেই কাঁড়ি-কাঁড়ি জিনিস কেনা। আর ফিরে গিয়ে ডেকে-ডেকে সকলকে বিলোনো।"

"তোমার তাতে কী? তুমি চুপ করো তো। হাতে করে ছোটখাটো কিছু নিয়ে গেলে লোকে কত খুশি হয় জানো?"

"এখান-ওখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী আছে? কলকাতায় তো সবই পাওয়া যায়। চাইলে কুলুর পেন্টিংও।"

কর্তা-গিন্নিতে জোর তর্ক বেধেছে। তাঁদের থামাতে পার্থ তড়িঘড়ি বলে উঠল, "এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ড। আমার একটা থার্ড প্ল্যানও আছে।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "যথা?"

"গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক। দুরন্ত জঙ্গল। সিমলা, কল্পা, কাজা, মানালি আর কুলুর ঠিক মধ্যিখানে। ওখানে প্রচুর ভাল-ভাল স্পট আছে। নানা ধরনের বন্যপ্রাণীরও দর্শন মিলবে।"

"ওরে বাবা, আমি ওসব জঙ্গল-টঙ্গলে নেই," সহেলি প্রতিবাদ করে উঠলেন, "মানালি থেকে সিমলার পরিকল্পনাটাই থাক।"

"আমি বলি কি," অবনী গলা ঝাড়লেন, "এত ছোটার কি কোনও প্রয়োজন আছে? কুলুতেই দু'-তিন দিন জিরোই, তারপর নয় মানালি ঘুরে বাড়ির পথে রওনা দেব। তিন-চার দিন না থাকলে কি কোনও জায়গা ঠিকঠাক চেনা যায়, তোমরাই বলো?"

"অ্যাই, তোমার আয়েশিপনা ছাড়ো তো। সকলের সঙ্গে যখন বেড়াতে বেরিয়েছ, তাল রেখে দৌড়তে হবে। ঘরে আরামসে বই নিয়ে বসে থাকবে, ওটি হচ্ছে না।"

"শুধু কি নিজের জন্য বলছি? বাচ্চাদের ধকলের কথা একবার ভাবো।"

"টুপুর আর মোটেই ছোট নেই। বুমবুমও তোমার মতো ইয়ে নয়, যথেষ্ট শক্তপোক্ত।"

আবার একচোট বিবাদ বাধার উপক্রম। সামাল দিতে ফের ঝাঁপিয়েছে পার্থ। প্রসঙ্গ বদলাতেই বুঝি রাতের মেনুর কথা পাড়ল। মিতিন পুটুস-পুটুস টিপ্পনি কাটছে। ঘরের পরিবেশ পলকে ঝরঝরে। সহেলি উঠে গেলেন পাশের ঘরে। নৈশাহার আসা পর্যন্ত খানিক গড়িয়ে নেবেন। অবনীও জাবদা বইখানা খুলেছেন। বুমবুম টিভি চালিয়ে দিল। রিমোট টিপে-টিপে ঠিক একটা কার্টুন চ্যানেল বার করে ফেলেছে। কলকাতায় হলে টুপুরও হয়তো পরদায় চোখ রাখত, কিন্তু হিমালয় ভ্রমণে এসে ইচ্ছে করছে না। পায়ে-পায়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বাইরের সরু প্যাসেজটুকু জুড়ে টানা কাচের জানলা। বন্ধ জানলার কোনও এক ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছে ঠান্ডা-ঠান্ডা। আজ অক্টোবরের এগারো। অর্থাৎ এখনও আশ্বিন। আর মাসখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই এই কুলু উপত্যকা ঢেকে যাবে বরফে। ঢালপুর ময়দানখানা কেমন যে দেখাবে তখন?

ছবিটা কল্পনা করতে-করতে টুপুর কাচে চোখ রেখেছে। অদূরে আর একটা পাহাড়। অন্ধকারে পাহাড়টা নজরে পড়ার কথা নয়, তবে এমন বিন্দু-বিন্দু আলো ফুটে আছে গায়ে! নিশ্চয়ই বাড়িঘরের আলো। কিন্তু মনে হয় আকাশের তারাগুলো যেন নেমে এসেছে নীচে। নাকি আকাশটাই তারাদের নিয়ে!

"কী রে, কাচে নাক ঠেকিয়ে কী দেখছিস?"

টুপুর চমকে তাকাল। মিতিনমাসি।

হেসে টুপুর বলল, "সামনের পাহাড়টাকে গো। কী দুর্দান্ত লাগছে!"

"কুলু ভ্যালির তো এটাই বিশেষত্ব। যেদিকে তাকাবি, সেই দিকটাই বিউটিফুল। কোন-কোন হিমালয়ান রেঞ্জ কুলু ভ্যালিকে ঘিরে রেখেছে, ভাব। উত্তরে পীরপঞ্জাল, পুবে পার্বতী, পশ্চিমে বরাভাঙ্গাল আর দক্ষিণে ধৌলাধার। এদের মাঝখানে কুলু কার্পেটের মতো ছড়িয়ে আছে। একসময়ে এটা ছিল সেন্ট্রাল এশিয়ার গেটওয়ে। কুলু, মানালি, রোটাং, কেলং পেরিয়ে লাদাখ হয়ে ব্যবসায়ীর দল যাতায়াত করত নিয়মিত। এই পথের নাম ছিল গ্রেট ইন্ডিয়ান সিল্ক রুট।"

"এখন আর রাস্তাটা নেই?"

"ব্যবহার হয় না। আজকাল তো প্লেনেই লোকে যাতায়াত করে, খামোখা এত দুর্গম পথ কেন পাড়ি দেবে? একমাত্র ট্রেকিং যারা করে তারাই এখন..."

কথার মাঝেই হঠাৎ বুমবুমের উত্তেজিত ডাক, "মা, তাড়াতাড়ি এসো, দেখে যাও কী পেয়েছি!"

মিতিন-টুপুর দৌড়ল ঘরে। গিয়ে দেখল বুমবুম কম্পিউটারে বসে। তার হাতে একটি পেনড্রাইভ।

ভুরু কুঁচকে মিতিন বলল, "ওটা কোত্থেকে পেলি?"

"এই তো, টেবিলের ড্রয়ারে ছিল।"

পার্থ একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। উঠে এসেছে। বুমবুমের হাত থেকে পেনড্রাইভটা নিয়ে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বলল, "আট জি বি মেমারি। নির্ঘাত আগের লোক দু'টো ফেলে গিয়েছে।"

"খুবই সম্ভব। হয়তো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে, খেয়াল করেনি।"

"দেখব নাকি, কী আছে এতে?"

অবনী বই পড়া থামিয়ে পিটপিট তাকাচ্ছিলেন। বললেন, "অন্যের প্রাইভেট ডকুমেন্ট দেখা কি শোভন হবে? আমাদের উচিত বিভব শর্মার কাছে ওটা জমা করে দেওয়া।"

"রাখুন তো আপনার উচিত-অনুচিত। তারা কোন নীতিটা মেনেছে? যত সব ফোরটোয়েন্টি!" বলতে-বলতে বুমবুমকে হটিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল পার্থ। কম্পিউটার চালু করে পেনড্রাইভের কর্ড লাগাল জায়গা মতো। উৎসাহী গলায় বলল, "দেখা যাক, ব্যাটাদের কোনও গোপন তথ্য আবিষ্কার করা যায় কিনা!"

কম্পিউটার সচল হতেই পেনড্রাইভখানা লোড করে ফেলল পার্থ। মাউস টিপতেই বিস্ময়। ছবি, সার-সার ছবি। নিছক ফোটোগ্রাফ নয়, ক্যামেরাবন্দি একগুচ্ছ পেন্টিং, সবক'টারই বিষয়বস্তু পর্বত। সম্ভবত হিমালয় নিয়ে আঁকা। অনভিজ্ঞ চোখও বলতে পারে, কোনও দক্ষ শিল্পীর কাজ। একটি ছবিতেও রং চড়া নয়। নীল, বাদামি, লাল, সবুজ, সবই বেশ হাল্কা-হাল্কা। আলোছায়ার খেলাও আছে ছবিতে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

অবনী বললেন, "এ তো কোনও বড় আর্টিস্টের এগজিবিশন থেকে তোলা ফোটো।"

"হুম," মিতিন বিড়বিড় করল, "খুব পাওয়ারফুল ডিজিটাল ক্যামেরায় এবং সবক'টা ছবিই মনে হয় জলরঙে আঁকা।"

পার্থ বলল, "মোট সাঁইত্রিশটা আছে। তার মধ্যে তিনটেতে ক্রস মার্ক। কেন বলো তো?"

"হ্যাঁ। কেমন অদ্ভুত ঠেকছে," মিতিনকে যেন সামান্য চিন্তিত দেখাল, "বৈজনাথ রাইকে তিনখানা ছবি আঁকার অর্ডার দিয়েছিল না লোক দুটো?"

"তাই তো। ঠিকই তো," পার্থ ঢকঢক মাথা নাড়ল, "কিন্তু আঁকা ছবি কেন আবার আঁকতে বলবে? কপি করাচ্ছিল?"

"হতে পারে," অবনী বললেন, "অনেকে তো ভাল ছবির কপি দিয়েও ঘর সাজায়।"

"তাই কি?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "ব্যাপারটা নিয়ে তো এবার

ভাবতে হচ্ছে।”

মিতিনমাসির এই স্বর ভীষণ চেনা। টুপুরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নির্ঘাত রহস্যের গন্ধ পেয়েছে মিতিনমাসি।

॥ ৩ ॥

মাত্র বিশ-তিরিশ ফিট নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা বিপাশা ঝমঝম শব্দ বাজিয়ে। এবড়োখেবড়ো ঢাল বেয়ে সেদিক পানে নামছিল টুপুর। সঙ্গে বুমবুম। মিতিন-পার্থও আসছে পিছন-পিছন। সতর্ক পায়ে। চার মূর্তিরই পোশাকে আজ ভারী মিল। পরনে জিন্স আর জ্যাকেট। পায়ে স্নিকার। সহেলি-অবনী উপরে দাঁড়িয়ে। দু'জনেই দেখছেন টুপুর-মিতিনদের অবতরণ।

সহেলি চেঁচিয়ে বললেন, “অ্যাই, সাবধানে-সাবধানে। নীচে শুধু পাথর! একটা হোঁচট খেলেই কেলেঙ্কারি ঘটবে।”

“কিছু হবে না মা,” টুপুর গলা তুলে বলল। আরও নেমে একটা বড়সড় প্রস্তরখণ্ডের উপর ব্যালান্স করে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে সন্তর্পণে ছুঁল বহতা ধারাকে। পলকে আঙুল সরিয়ে নিয়েছে। হাত ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, “উপ্স, কী ঠান্ডা!”

পার্থর কাঁধে ক্যামেরা। শাটার টিপছে পটাপট। নদীর গতিপথে ক্যামেরা তাক করে বলল, “হবে না? ডাইরেক্ট বরফগলা জল। রোটাংয়ের হিমবাহ থেকে রওনা দিয়ে কতটুকুই বা এসেছে!”

“কী স্বচ্ছ গো জলটা! কাচের মতন। তলার নুড়িপাথর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।”

“নদী যতক্ষণ পাহাড়ের কোলে, ততক্ষণ সে এরকমই। নোংরা তো হয় সমতলে গিয়ে।”

“তা বটে।”

নিজের মনে মাথা দোলাল টুপুর। সত্যি, পাহাড়ে বুঝি কোনও মালিন্যই টিকতে পারে না। নদীর জলে, নদীর পারে, কত ছোট-বড় পাথর, তারাও যেন চকচক করছে। সূর্য এখন পশ্চিম গগনে। তার নরম রোদ্দুর যেন পালিশ মারছে পাথরে। জলেও সোনালি আভা ঝিকমিক।

সকাল থেকে টুপুর যা দেখছে, সবই তো অপরূপ। ঘুম থেকে উঠে যেই না জানলার পরদা সরাল, অমনি সামনে সবুজ পাহাড়। পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া। নীচে শ্যামল উপত্যকা, মধ্যিখান দিয়ে বয়ে চলেছে রুপোলি আঁকাবাঁকা নদী। তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তারপর তো জলখাবার খেয়ে ন'টা নাগাদ বেরনো হল, তখন থেকে ডুবে আছে নিসর্গশোভায়। মেন রোডে গাড়ি থেকে নেমে তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে গেল। ওই পথটাও কী সুন্দর! দু' পাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র নাম না-জানা ফুল, কত যে তাদের রঙের বাহার! বিজলেশ্বর মন্দিরে যাওয়াটাও বৃথা হয়নি। বিপাশা আর পার্বতী নদী যেখানে মিলেছে, সেই জায়গাটাও যে কী দারুণ লাগে উপর থেকে। বাড়তি জুটল মন্দিরের গল্পটা। প্রতি বছর নাকি বাজ পড়ে শিবলিঙ্গটি চুরমার হয়ে যায়। আর পুরোহিত নাকি ছাতুর সঙ্গে মাখন মিশিয়ে সেটিকে ফের জুড়ে দেন। ওই রাস্তাটা খানিক গোলমেলে ছিল। সঙ্গে টিঙ্কু সিংহ থাকায় অবশ্য তেমন অসুবিধে হয়নি। এই গোটা উপত্যকাটাই এমন হাতের তালুর মতো চেনে টিঙ্কুভাই।

সেই টিঙ্কুই এবার হাত নেড়ে-নেড়ে ডাকছে টুপুরদের। সহেলি বিকেল-বিকেল মেলায় ঘোরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবনীও বুঝি তাড়াতাড়ি মেলা দেখে কটেজে ফিরতে চান। ওশিয়ানোগ্রাফির বই বোধ হয় টানছে তাকে।

পার্থ-টুপুর কারওই কিন্তু এখন নদী ছেড়ে নড়ার ইচ্ছে নেই। দুপুরে পেট পুরে পরোটা-কাবাব খেয়েছে, এখন একটু পাথরে বসে রোদ পোহালে ভাল লাগবে। তবে সহেলি অধৈর্য হলে তো উপায় নেই। পায়ে-পায়ে সকলকে উপরে উঠতেই হয়।

গাড়িতে বসে বুমবুম একটা ছোট্ট পাথর বার করেছে পকেট থেকে। পার্থকে দেখিয়ে বলল, “একদম ফিশের মতো দেখতে না?”

পাথরটা নাড়াচাড়া করে পার্থ নাক চুলকে বলল, “জীবাশ্ম হতে পারে।”

“মানে?”

“মাছের ফসিল।”

টুপুর অবাক গলায় বলল, “কুলুতে মাছের ফসিল?”

“থাকতেই পারে। গোটা হিমালয়টাই তো এককালে সমুদ্রের তলায় ছিল। মাত্র কয়েকশো কোটি বছর আগে একটা স্থলভূমি যখন এসে এশিয়ায় জুড়ে যায়, তখনই ধাক্কার চোটে হিমালয় ঠেলে উঠেছে। অতএব সামুদ্রিক মাছের ফসিল হিমালয়ে পাওয়া কোনও আশ্চর্যের নয়।”

মিতিন অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এতক্ষণে তার গলা বেজেছে, “কল্পনাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধ হয়।”

“কেন? হিমালয় তৈরি হওয়ার ইতিহাসটা কি ভুল?”

“না। তবে মাছের ফসিল-টসিল কুলুর মতো জায়গায় মিলবে না। সেগুলো পাওয়া যেতে পারে আরও অনেক উঁচুতে, বরফের রাজ্যে।”

পার্থ আমতা-আমতা করে বলল, “একটা-দু'টো পিস হয়তো নদীর স্রোতে চলে এসেছে।”

“জলে ভাসতে-ভাসতে? নাকি গড়াতে-গড়াতে?”

ব্যঙ্গটা শুনে গুম হয়ে গেল পার্থ। আর কথাটি বলছে না। গাড়ি ঢালপুর ময়দানে পৌঁছে গিয়েছে। বেজার মুখে নামল সিট থেকে। একে-একে অন্যরাও। বুমবুম তো তিরবেগে ছুটেছে মেলার পানে, টুপুর ধাওয়া করল তাকে। সকালে অনেকটা হেঁটে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন সহেলি, সামনে দেদার দোকানপাট দেখে তাঁর হাঁটু-কোমরের ব্যথা উধাও, জ্বলজ্বলে মুখে কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মেলাখানা সত্যিই তারিফ করার মতো। হরেক জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছে পাহাড়ি মানুষরা। মুখোশ, টুপি, শাল, শাড়ি, সোয়েটার, জ্যাকেট আর গয়না তো আছেই, সঙ্গে হাতে বানানো আরও কতরকম যে সামগ্রী! বেশ কিছু তাঁবু পড়েছে মেলার মাঠে। একটি তো রীতিমতো জমকালো। মাথায় অনেক পতাকা উড়ছে। ওই তাঁবু নাকি কুলুর রাজার। এক জায়গায় সিমেন্টের গ্যালারিতে চলছে নাচাগানা। কোথাও নানান ঠাকুর-দেবতার মূর্তি।

টুপুর মূর্তিগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বুমবুমের হাত খামচে ধরে। একটা পিতলের প্রতিমা দেখিয়ে পার্থকে জিজ্ঞেস করল, “ওটা কোন ঠাকুর গো মেসো?”

“সম্ভবত মানালির হিড়িম্বা টেম্পলের দেবী,” পার্থর গোমড়া জবাব, “ঠিক বলছি কিনা তোর মাসির কাছে জেনে নে।”

মিতিন হেসে ফেলল, “না-না, ঠিকই বলছ। ওটা হিড়িম্বা মন্দিরের দুর্গা।”

“এখানে আনা হয়েছে কেন?”

“কুলুর দশেরা মেলায় এটাই তো রেওয়াজ,” পার্থর জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাবটা ফিরে এসেছে। চোখ নাচিয়ে বলল, “গোটা উপত্যকার নানান গ্রাম থেকে এখানে দেবদেবীদের আনা হয় দশমীর দিন। টানা দশ দিন দেবদেবীরা এখানেই থাকেন।”

“দশেরায় রাবণবধ হয় না?”

“হয়। তবে দশমীতে নয়, মেলার শেষ দিন। স্টাইলটাও আলাদা রকম। রাবণের কোনও পুত্তলিকা পোড়ানো হয় না। তার বদলে রাবণের সিম্বল হিসেবে ঘাসের স্তূপে আগুন ধরানো হয় বিপাশার পারে। আর সেদিন বসে দেবতাদের দরবার। লোকাল লোকজন যে যার পছন্দমতো দেবতার কাছে মনস্কামনা জানায়। সেদিন নাকি মহা ধুমধাম...”

পার্থর বক্তৃতায় বাধা পড়ল। বুমবুম টানছে বাবাকে। এক্ষুনি তার নাগরদোলা চাই, ক্যান্ডিফ্লস চাই, রঙিন টুপি চাই।

মিতিন বলল, “তুমি যাও বুমবুমকে নিয়ে। আমি আর টুপুর একটু চরকি মারি।”

“কেন? টুপুর জায়েন্ট হুইল চড়বে না?”

টুপুরের খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু মিতিনমাসির সঙ্গ ছাড়তেও মন চাইছে না যে। কালকের পেনড্রাইভখানা দেখার পর থেকে মিতিনমাসি কী ভাবছে, কী করবে, বুঝতে হবে তো। সারাদিন মাসির সঙ্গে সেঁটে না থাকলে যদি কিছু মিস হয়ে যায়!

মাথা ঝাঁকিয়ে টুপুর বলল, "এখন থাক। পরে না হয়..."

"অ্যাজ ইউ উইশ!"

বুমবুম-পার্থ চলে গেল। অবনী আর সহেলিও কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন কে জানে! মিতিনের পাশে-পাশে হাঁটছিল টুপুর। এক প্রকাণ্ড চেহারার তিব্বতি কুলুর পোশাক বিক্রি করছে। মেয়েদের হাঁটুঝুল উলের জামাগুলো বেশ বাহারি। দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছিল টুপুর, হঠাৎ কাঁধে মিতিনের চাপ।

টুপুর ঘাড় ফেরাল, "কী গো?"

"ওই দ্যাখ।"

মিতিনমাসির দৃষ্টি অনুসরণ করে টুপুরের চোখ বড়-বড়। খানিক তফাতে, একটু ফাঁকা মতো জায়গায়, এক দাড়িওয়ালা সাহেবকে চেয়ারে বসিয়ে কে তার প্রতিকৃতি আঁকছে?

টুপুরের স্বর ঠিকরে উঠল, "কালকের সেই বৈজনাথ রাই না?"

"ইয়েস। আয় তো আমার সঙ্গে।"

আঁকায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বৈজনাথের ঠিক পিছনটাতে গিয়ে দাঁড়াল মিতিন। নিঃশব্দে দেখছে শিল্পীর কারিকুরি। বৈজনাথও সাহেবের মুখোমুখি একটি টুলে আসীন, হাতে পিচবোর্ডের উপর সাদা কাগজ, একবার করে চোখ উঠিয়ে দেখছেন সাহেবকে, পরক্ষণে চলছে তাঁর স্কেচ পেনসিল। এতই মগ্ন, মিতিন-টুপুরদের উপস্থিতি টেরই পাচ্ছেন না তিনি। মিনিট দশেক মতো সময় লাগল, সাহেবের পোর্ট্রেট তৈরি। তেমন তাক লাগানো না হলেও সাহেবকে দিব্যি চেনা যায় ছবিতে। সাহেবও বেজায় খুশি। মানিব্যাগ খুলে ঝটাকসে দু'খানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন বৈজনাথকে। তারপর করমর্দন সেরে স্কেচখানা নিয়ে হাঁটা লাগিয়েছেন।

সাহেব সরে যেতেই মিতিনের স্বর বেজে উঠল, "আপ তো বহুত বড়িয়া আর্টিস্ট হ্যায় বৈজনাথজি!"

পাজামা-পাঞ্জাবির উপর হাতকাটা কুলু-জ্যাকেট পরিহিত বৈজনাথ টাকাটা রাখছিলেন পকেটে। চমকে তাকিয়ে বললেন, "আপলোগ?

আপলোগ কো কঁহি দেখা হ্যায়?"

"হ্যাঁ," মিতিন হিন্দিতেই বলল, "বিভব শর্মাজির কটেজে। গতকাল সন্ধেবেলা আপনি গিয়েছিলেন।"

সন্দিগ্ধ চোখে মিতিনকে একবার জরিপ করলেন বৈজনাথ। টুপুরকেও। তারপর গুমগুমে গলায় বললেন, "হ্যাঁ, যেতে হয়েছিল। কিন্তু আপনারা কে?"

"টুরিস্ট। বাঙালি। কলকাতা থেকে আসছি," বলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করল মিতিন। তারপর নরম স্বরে বলল, "কাল শর্মাজির মুখে আপনার ঘটনাটা শুনলাম, খুব খারাপ লেগেছে। আপনার মতো একজন শিল্পীকে এভাবে চিট করাটা ভীষণ খারাপ কাজ।"

বৈজনাথ খুশি হয়েছেন কথাটা শুনে। ঠোঁটে এক চিলতে দার্শনিক হাসি ফুটে উঠল। হাত উলটে বললেন, "কী আর করা? আমাদের নসিবই তো এরকম। ঠকাটাই তো শিল্পীদের নিয়তি।"

"কিন্তু লোক দু'টোর তো শাস্তি পাওয়া উচিত। পুলিশে কমপ্লেন করেছেন?"

"লাভ কী? তারা তো হাওয়া! তা ছাড়া আমার তো কোনও লিখিত চুক্তিও নেই।"

"আপনার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয়েছিল কীভাবে?"

"আমি কাছেই থাকি, শাস্ত্রীনগরে। ওরা নিজেরাই আমার বাড়িতে এসেছিল।"

"কবে?"

"দিন পনেরো আগে।"

"ওরা আপনার ঠিকানা কী করে...?"

"দেখুন ম্যাডাম, আমি এক নগণ্য শিল্পী," বৈজনাথ সামান্য হাসলেন, "তবে একেবারে ফ্যালনা নই। আমার কয়েকটা পেন্টিংয়ের ফোটো ইন্টারনেটে আপলোড করা আছে। তাই দেখে কেউ-কেউ আমার ছবি কিনতেও চায়। তাদের কথা ভেবেই ইন্টারনেটে নাম-ঠিকানা দিয়ে রেখেছি।"

"ও, তার মানে নেট থেকে জোগাড় করেছে? আমি ভাবলাম, বিভব শর্মাই হয়তো আপনার কথা..."

"না-না। ওরা তো প্রথমে আমার কাছে এসেছিল। আমিই ওদের কটেজের হদিশটা দিই। বলেছিলাম, ওখানে আমার কিছু ভাল কাজের স্যাম্পেল পাবে। ওগুলো দেখে আমার কাজের দাম ঠিক করুক।"

"কিছু মনে করবেন না। আপনার ছবি মোটামুটি কী রকম দামে বিক্রি হয়?"

"ঠিক নেই। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনেরো, বিশ...। এখানে আর তো কেউ জলরঙে আঁকে না, আমার ছবির তাই একটা ডিমান্ড আছে," বৈজনাথের কণ্ঠে বেশ গর্বের সুর। পলকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "আসুন না, এখানে আমার স্টল আছে, আপনারাও দেখতে পারেন।"

দোকানটা পাশেই। খুপরি মতো জায়গা। গোটা দশেক বাঁধানো পেন্টিং ঝুলছে সেখানে। সবই কুলুর আশপাশের দৃশ্য।

ছবিগুলোয় চোখ বোলাতে-বোলাতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "লোক দু'টো আপনাকে কি এই ধরনের ছবিই আঁকতে বলেছিল?"

"না-না। ওরা তো কপি করতে দিয়েছিল, ম্যাডাম।"

"কপি?" মিতিন চোখ কুঁচকেছে, "কার ছবি?"

"রোয়েরিখ সাহেবের।"

"কুলুর কাছে যাঁর আর্ট গ্যালারি ছিল?"

"এখনও আছে। নগ্গরে। তাঁরই কয়েকটা পেন্টিং আমায় দেখাল কম্পিউটারে। বলল, ওর মধ্যে থেকে তিনখানা আমায় বানিয়ে দিতে হবে।"

"আপনি রাজি হয়ে গেলেন?"

"প্রথমটায় আপত্তি করেছিলাম। কারও ছবি নকল করা তো আমার পেশা নয়। আমি করিও না। রোয়েরিখ সাহেবের মতো ফেমাস পেন্টারের ছবি হলেও না। কিন্তু ওরা এমন ভাবে ধরল, প্রায় জোর করে কুড়ি হাজার টাকা হাতে গুঁজে দিল। বলল, আরও চল্লিশ দেবে," বৈজনাথ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "আমারই কসুর। ছবি ডেলিভারির সময় পুরো টাকা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।"

বৈজনাথের বিরস মুখখানা দেখে খারাপ লাগছিল টুপুরের। অনুচ্চ স্বরে মিতিনকে বলল, "মা তো ছবি-ছবি করছিল, এখান থেকে একটা কিনে ফেলবে নাকি?"

মিতিন পলক ভাবল কী যেন। তারপর বলল, "থাক, পরে দেখা যাবে।"

"কিন্তু কাল সকালেই তো আমরা মানালি চলে যাচ্ছি।"

"আবার আসতেও তো পারি।"

"কেন?"

"বা রে, এই পথ দিয়েই তো ফেরা। মেলা তো তখনও চলবে। তা ছাড়া আমার সিক্সথ সেন্স বলছে...।"

"কী?"

"কিছু না। চল, তোর মা-বাবা কোথায় গেল খুঁজি। দেখি গিয়ে, কী কেনাকাটা হল।"

টুপুর টের পাচ্ছিল, মিতিনমাসি কী যেন একটা চেপে গেল। মনে-মনে একটু অভিমানই হল টুপুরের। কেন যে মিতিনমাসি ঝেড়ে কাশে না!

॥ ৪ ॥

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সহেলিদের ঘরে আড্ডা বসেছে। গায়ে কম্বল-টম্বল জড়িয়ে বেশ একখানা জম্পেশ আসর। বৈজনাথজির দুখভরা কহানি শোনাল টুপুর। অবনী জানালেন, কীভাবে আজ মেলায় তাঁর পকেট ফাঁক হয়েছে। সহেলির দরাদরির দাপটে কেমন নাস্তানাবুদ হচ্ছিল পাহাড়ি দোকানদাররা, তাও বর্ণনা করলেন রসিয়ে-রসিয়ে। বুমবুমের তো এখনও নাগরদোলার ঘোর কাটেনি, সে বসে-বসেই দুলছে। পার্থর উচ্ছ্বাস পাহাড়ি নাচাগানা নিয়ে। ডিজিটাল ক্যামেরায় ষাট-সত্তরটা ফোটো তুলেছে, ডিসপ্লের বোতাম টিপে-টিপে দেখাচ্ছে সকলকে।

অবনী জিজ্ঞেস করলেন, "ওই জায়গাটার ফোটো তুলেছ? যেখানে পশুবলি হয়?"

পার্থ বলল, "এমা, না তো! মিস হয়ে গেল?"

সহেলি বললেন, "ভালই হয়েছে। ওই রক্তারক্তির ফোটো ক্যামেরায় থাকার কোনও দরকার নেই।"

"তা বললে হবে?" অবনী বললেন, "কুলুতে রক্তপাত তো কম হয়নি। কখনও শিখরা অ্যাটাক করেছে, তো কখনও ব্রিটিশরা। এখানকার বহু শান্তিপ্রিয় মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে কুলু রাজ্যকে বাঁচাতে গিয়ে।"

"আহা, ওই খুনজখমের ফোটো তো কবেই ইতিহাস। ওসব প্রসঙ্গ এখন আবার তোলা কেন?"

"কিন্তু একটা জায়গাকে চিনতে গেলে তার সব দিকই জানতে হয়। মনে রেখো, আমোদ-আহ্লাদ, নাচাগানা, পুজো-আচ্চা, কেনাবেচা যেমন মেলার অঙ্গ, তেমনই ছাগল-ভেড়া-শুয়োর-মোষ হত্যাও আর একটা অঙ্গ। পার্থর ক্যামেরায় সমস্ত কিছুরই এভিডেন্স থাকা উচিত।" অবনী লেকচারটা দিয়ে ভারী পুলকিত হয়েছেন। চোখ নাচিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে প্রজ্ঞাপারমিতা, আই মিন, জ্ঞানের দেবী, আমি কি ভুল বলছি?"

মিতিন আলগা হাসল। তারপর হঠাৎই আলটপকা বলে উঠল, "আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম অবনীদা।"

"কী বলো তো?"

"কালকের টুর প্ল্যানটা যদি একটু বদলাই।"

পার্থ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "কী রকম? কী রকম?"

"ধরো, যদি সোজা মানালি না গিয়ে আমরা একবার নগ্গরে ঢুঁ মেরে যাই? খুব একটা অফ-রুটে তো যেতে হবে না, পথে কাতরেইন থেকে মাত্র ছ'-সাত কিলোমিটার ঢোকা।"

"কী আছে সেখানে?"

"অনেক কিছুই। এককালে কুলুরাজ্যের রাজধানী ছিল নগ্গর। আপ টু সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি। রাজা সিধ্ সিংহের তৈরি পাঁচশো বছরের পুরনো একটা দুর্গ রয়েছে। কাস্লটার বিশেষত্ব হল, ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পেও ওটার কিস্সু হয়নি। প্লাস, রাজার প্রাসাদ। বেশ কয়েকটা মন্দির। রোটাং পাস আর হিমালয়ের কিছু চূড়োও দেখা যায় নগ্গর থেকে। সুন্দর-সুন্দর আপেলবাগানও আছে," মিতিন একটা বালিশ কোলে টানল, "তবে ওগুলো দেখার জন্যে আমি তত আগ্রহী নই। আমার ইন্টারেস্ট, রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারি।"

"নগ্গরেই বুঝি গ্যালারিটা?" অবনী নড়েচড়ে বসলেন, "তা হলে তো যেতেই হয়। এত কাছে এসে ওটা না দেখা তো গ্রেট লস্।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "রোয়েরিখ কি খুব বিখ্যাত শিল্পী?"

পার্থর পাল্টা প্রশ্ন, "তুই বুঝি আগে ওঁর নাম শুনিসনি?"

"না। আজ অবশ্য বৈজনাথজি বলছিলেন।"

"দেবিকারানি কে জানিস নিশ্চয়ই?"

"উঁহু।"

"ফেমাস অ্যাকট্রেস। উনিশশো তিরিশ আর চল্লিশের দশকে গোটা ভারতবর্ষ কাঁপিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ফ্যামিলির মেয়ে। দারুণ রূপসি ছিলেন। রোয়েরিখ ছিলেন সেই দেবিকারানির বর।"

"তুমি বোধ হয় পুরোটা জানো না পার্থ," অবনী নাক গলালেন, "তুমি যাঁর কথা বলছ, তিনি স্‌ভেতোস্লাভ রোয়েরিখ। ইনিও পেন্টার ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবার খ্যাতি ভুবনজোড়া। নাম নিকোলাস রোয়েরিখ। দুনিয়ার বহু নামী-দামি গ্যালারিতে নিকোলাসের আঁকা ছবি আছে। আমার অনুমান, পেনড্রাইভের ছবিগুলো নিকোলাস সাহেবেরই পেন্টিং। কারণ যত দূর জানি, নিকোলাসের সব ছবিরই বিষয়বস্তু হিমালয়। তাঁর ছেলে স্‌ভেতোস্লাভও হিমালয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন বটে, তবে পাহাড়ের মানুষ আঁকায় তাঁর উৎসাহ বেশি ছিল। তা ছাড়া তাঁর পেন্টিংয়ের সংখ্যাও অনেক কম।"

মিতিন বলল, "আপনার আন্দাজটাই ঠিক। নিকোলাসেরই সাঁইত্রিশটা ছবি থেকে বেছে-বেছে তিনখানা কপি করতে দেওয়া হয়েছিল বৈজনাথজিকে।"

"তো?" পার্থর চোখ সরু, "তার সঙ্গে আমাদের নগ্গর যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

"আছেও বটে। আবার নেইও বটে।"

"হেঁয়ালি করছ কেন? সাফ-সাফ বলো।"

"দ্যাখো, বিখ্যাত শিল্পীর ছবি কপি করা কোনও গর্হিত কাজ নয়। এরও একটা বাজার আছে এবং মোটামুটি ভালই বিক্রি হয়। লোক দু'টোর কাছে নিকোলাস রোয়েরিখের পেন্টিংয়ের ফোটো ছিল, ওরা তা থেকে কপি করাতেই পারে। তবু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।"

"কী রকম?"

"প্রথমত, অ্যাকর্ডিং টু শর্মাজি, লোক দু'টো এসেছিল মুম্বই থেকে। কেন? মুম্বই শহরে কি কপি করার লোকের আকাল পড়েছে? এই সাধারণ কাজটা করাতে তাদের কিনা ছুটে আসতে হল সুদূর কুলুতে? ইন্টারনেটে ঘেঁটে একজন কুলুর আর্টিস্টের সন্ধান করে তাঁকে দিয়ে আঁকাতে হল? দ্বিতীয়ত, কাজটার জন্য তারা যে পারিশ্রমিক অফার করল, সেটাও মোটেই স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ কিনা বৈজনাথজিকে টাকার টোপ ঝুলিয়ে প্রলুব্ধ করা হল। কেন?"

টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, "শুধু তাই নয় মিতিনমাসি, ছবি তিনটের জন্য তারা বারো দিন ধরে এত দামি কটেজে রয়ে গেল!"

"কারেক্ট। এখান থেকেই আসে তিন নম্বর প্রশ্ন। যদি বৈজনাথজির টাকা মারার হিসেবটা বাদও দিই, তা হলেও লোক দু'টোর খরচখরচা, ইনক্লুডিং মুম্বই-কুলু যাতায়াত কম-সে-কম আড়াই তিন লাখের ধাক্কা। এক-একটা কপি তবে তারা কত দামে বেচবে? লাখ টাকার কমে তো পোষাবেই না। কিন্তু তা কি সম্ভব? কেউ কি কোনও ছবির কপি অত টাকা দিয়ে কেনে? কিনবে?"

"তাই তো। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে," পার্থ দু'-এক সেকেন্ড ভেবে বলল, "আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, ওরা ছবি তিনটেকে আসল পেন্টিং বলে বেচবে? ছবিগুলোকে যথাসম্ভব নিখুঁত করার জন্য এখানকার একজন শিল্পীর দ্বারস্থ হয়েছিল?"

"সেই সম্ভাবনা তো আছেই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, যদি তার চেয়েও কোনও খারাপ মতলব এঁটে থাকে।"

"আর কী হতে পারে?"

"ভাবছি। নগ্গরে গিয়ে দেখি না একবার," মিতিন বালিশ ফের পাশে রেখে বলল, "আবার এমনও হতে পারে, আমি মিছিমিছি টেনশন করছি। লোক দু'টো হয়তো সত্যিই বড়লোক ব্যবসাদার। ছবি-টবির শখ আছে। নিকোলাস রোয়েরিখের অরিজিনাল পেন্টিং তো পাওয়া দুরূহ, তাই আসার আগে নেটে খোঁজখবর করে নিয়ে বৈজনাথজিকে কপির অর্ডার দিয়েছিল। তারপর যখন মনে হয়েছে বেশি টাকা দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, তখন ছবি হাতিয়ে ভাগলবা। অর্থাৎ সিম্পল কেস অফ চিটিংবাজি। আবার বৈজনাথজিও সম্পূর্ণ ঠকেছেন তাও নয়। তিনটে ছবি কপি করার জন্য কুড়ি হাজার তো মিলেছে।"

পার্থ বলল, "তুমি তো এবার ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিচ্ছ! একবার বলছ লোক দু'টোর ধান্দা খারাপ, আবার বলছ বদমতলব নাও থাকতে পারে।"

"নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।"

অবনী বললেন, "সে যাই হোক, নিকোলাস রোয়েরিখের পেন্টিংয়ের ব্যাপারে আমার কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কিছুদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে ওঁর লাইফটা পড়ছিলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং! আদতে তো উনি রাশিয়ান। কিন্তু দেশে যথেষ্ট খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও বলশেভিক বিপ্লবের পর উনি ভারতে পালিয়ে আসেন বউ হেলেনা আর দুই ছেলেকে নিয়ে। স্‌ভেতোস্লাভ, মানে যিনি দেবিকারানিকে বিয়ে করেন, তিনি হলেন গিয়ে ছোট ছেলে। ভারতে এসে নিকোলাস এমনই হিমালয়কে ভালবেসে ফেলেছিলেন, বাকি জীবনটা ওই নগ্গরেই কাটিয়ে দেন। একটা আশ্রম মতো করে থাকতেন, পরে সেখানেই হয় তাঁর আর্ট গ্যালারি। কুলুর লোকদের হস্তশিল্পও তাঁকে খুব টানত। সেগুলো সংগ্রহ করে নগ্গরে একটা মিউজিয়ামও বানিয়েছিলেন নিকোলাস। নামটা সম্ভবত উরুস্বতী সংগ্রহশালা। এমন ভাবে পাহাড়িদের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন যে, সবাই তাঁকে মুনি-ঋষিদের মতো সম্মান করত। নামই হয়ে গিয়েছিল, মহর্ষি নিকোলাস। উনি মারা গিয়েছিলেন..."

"তুমি এবার থামবে?" সহেলি মৃদু ঝামরে উঠলেন, "কলেজে ক্লাস নিয়ে-নিয়ে এমন অভ্যেস হয়েছে, বক্তৃতা শুরু করলে একটা পিরিয়ডের কমে বাকি্য বন্ধ হয় না।"

"নিকোলাস সম্পর্কে যদি তুমি পড়ো..."

"আমার দরকার নেই। কাল তো নগ্গর যাবই, সেখানে গিয়েই নয় তাঁকে বুঝে নেব।"

বক্তৃতা শেষ করতে না পেরে অবনী যেন মনঃক্ষুণ্ণ। বেজার মুখে বাথরুমে চলে গেলেন।

পার্থ বলল, "আমরাই বা আর বসে থাকি কেন? ও ঘরে আমাদের কম্বলগুলো তো ওয়েট করছে, গিয়ে এবার ঢুকে পড়লেই হয়।"

মিতিন বলল, "তার আগে ঝামেলাটা মিটিয়ে এলে হত না?"

"কোনটা?"

"কটেজের পেমেন্ট-টেমেন্টের ব্যাপারটা।"

"সে তো কাল সকালেই সারতে পারি। ব্রেকফাস্ট-টেকফাস্ট না করে তো বেরোচ্ছি না।"

"সকালের জন্য ফেলে রাখার দরকার কী? তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকব," মিতিন উঠে দাঁড়াল, "চলো না, শর্মাজির সঙ্গে একটু গপ্পোসপ্পোও করে আসি।"

পার্থ হাত ওলটাল, "ওকে। মহারানির যা মর্জি।"

টুপুর পোঁ ধরল, "আমিও যাব।"

"চল।"

নীচের অফিসঘরটি ছেড়ে অন্দরে ঢুকে গিয়েছিলেন বিভব শর্মা।

দরজায় টোকা দিতে বেরিয়ে এসেছেন। সুট-টাইয়ের বদলে পরনে ঘরোয়া পোশাক। চোস্ত সাহেবি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ স্যার?"

একগাল হেসে পার্থ বলল, "তেমন গুরুতর কিছু নয়। হিসেবপত্র চোকাতে এলাম।"

"এখন?" বিভব স্মিত মুখে বললেন, "আমার তো এখনও বিল তৈরি হয়নি!"

"বানিয়ে ফেলুন। আমরা বসছি ততক্ষণ," মিতিনের ঠোঁটেও হাসি, "কাল সকালের ব্রেকফাস্ট চার্জটা আমরা নগদ দিয়ে যাব।"

"যা আপনাদের অভিরুচি।"

কুলু শালখানা গায়ে ভাল করে সাপটে টেবিলে বসলেন বিভব। ক্যালকুলেটরে হিসেব কষছেন দু' রাত্তিরের থাকার সঙ্গে ডিনার, ব্রেকফাস্ট, চা-কফি।"

উলটো দিকের চেয়ার থেকে ঝুঁকে দেখছিল মিতিন। কাজের মাঝেই আলাপ জুড়ল, "আজ মেলায় বৈজনাথজির সঙ্গে দেখা হল।"

"তাই নাকি? এখনও নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন?"

"রাগের চেয়েও বোধ হয় দুঃখ পেয়েছেন বেশি।"

"আমারও তো বদনাম হয়ে গেল।"

"কেন?"

"আমাদের কুলুতে বৈজনাথজির খুব সম্মান। তাঁকে কিনা দাগা দিল আমারই দু'জন বোর্ডার?"

"আপনি কি ওদের আগে থেকে চিনতেন?"

"একেবারেই না। আমার কটেজে তো এই প্রথম উঠল এবং আগেও নাকি কখনও কুলুতে আসেনি।"

"দু'জনেই তো মুম্বইয়ের? মরাঠি?"

"পদবি দেখে মনে হয় একজন মহারাষ্ট্রের, নবীন তারকুণ্ডে। অন্যজন পঞ্জাবি, সুখদেব ভাটিয়া," বিভবের আঙুল থেমেছে। চোখ তুলে বললেন, "দু'জনকেই তো ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। কথাবার্তা খুব সুন্দর, কোনও রকম বেলেল্লাপনা করেনি। সঙ্গে একটা মারুতি ভ্যান ছিল বটে, তবে বড় একটা বেরোত না। এই হয়তো আশপাশে হেঁটে-হেঁটে ঘুরছে, ক্যামেরায় ফোটো তুলছে।"

"তার মানে আর পাঁচটা টুরিস্টের মতো নয়?"

"এখানে সব রকম লোকই আসে। অবশ্য মূলত আমার বোর্ডাররা বেশির ভাগই বিদেশি। কেউ হয়তো সারাদিন টো টো করে, আবার কেউ হয়তো একটি বারের তরেও ভ্যালিতে নামে না। এই তো, পরশু সকালের ফ্লাইটে এক ইতালিয়ান ভদ্রলোক আসছেন, রবার্তো জোয়ান্নি। গত বছরও একবার এসেছিলেন এরকমই সময়ে। উনি আবার শুধুই শিল্পকলার ভক্ত। দশেরার মেলা থেকে কত কী যে কিনে নিয়ে গেলেন। তার মধ্যে বৈজনাথজির ছবিও তো ছিল।"

ফের হিসেবে মাথা নামাল বিভব শর্মা। একটা কাগজে বকেয়া টাকার অংশটা লিখে বাড়িয়ে দিলেন পার্থকে। হেসে বললেন, "কাল কম্পিউটারে পাকা বিলটা বানিয়ে দেব। অসুবিধে নেই তো?"

"কিছুমাত্র না।"

টাকা মিটিয়ে উপরে এল তিনজন। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে তুলে নিজেদের বিছানায় নিয়ে গেল পার্থ। টুপুরকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে মিতিনও গেল শুতে।

অবনী-সহেলির নাক ডাকছে। টুপুরের কে জানে কেন ঘুম আসছিল না। বাইরে একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ। হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যাচ্ছে শব্দ, আবার শুরু হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। কম্বল সরিয়ে টুপুর জানলায় এল। বন্ধ কাচের ওপারে এক মনোরম জ্যোৎস্না। চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। অদূরে, পাহাড়টার গায়ে আলোর পাতলা সর। চোখ যেন ফেরানো যায় না। তাকিয়ে আছে টুপুর, তাকিয়েই আছে।

পরদিন বেরোতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। এক বিকেলেই যা রাজ্যের জিনিস কিনেছেন সহেলি, গোছগাছ করতে প্রাণান্ত। এটা যেন না ভাঙে, ওটা যেন দুমড়ে না যায়। তারপর জলখাবার সেরে, সকলকে তৈরি করে মালপত্র গাড়ির ছাদে তোলো রে, বাঁধো রে, সেও তো কম হাঙ্গামা নয়।

কুলু থেকে নগ্গর, পথে চড়াইটাই বেশি। কাতরেইনের পর বিপাশা পেরোল গাড়ি। তারপর থেকে রাস্তা বেজায় ভাঙাচোরা। যথেষ্ট সাবধানে চালাচ্ছে টিঙ্কু, তবু সহেলি সিঁটিয়ে বসে। বাইরে চন্দ্রখনি পাহাড়ের অপরূপ শোভা, সেদিকেও তাকাচ্ছেন না।

নগ্গরে পৌঁছে পথঘাটের খানিক উন্নতি হল। কংক্রিটের চড়াই, কুলুরাজার দুর্গ পেরিয়ে, যখন গাড়ি রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারির কাছে এল, সূর্য তখন মাঝ আকাশে।

কিন্তু দোতলা বাড়িটার সামনে এ কী দৃশ্য?

দু'-দু'খানা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে! নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট মিউজিয়াম পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ!

॥ ৫ ॥

পার্থ নেমে দেখতে গিয়েছিল। উত্তেজিত মুখে ফিরেছে। বিস্ফারিত চোখে বলল, "কেলেঙ্কারি কাণ্ড! কাল রাত্তিরে নাকি চোর এসেছিল আর্ট গ্যালারিতে।"

সহেলি প্রায় আঁতকে উঠেছেন, "কী সর্বনেশে কথা! এখানে চোর-ছ্যাঁচোড় আছে নাকি?"

"মন্দ লোক কোথায় নেই দিদি?" মিতিন থামাল সহেলিকে। পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে বোঝা গেল? দরজা-জানলা কিছু ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ। পিছনের একটা জানলা। শুধু কাচ নয়, লোহার গ্রিলও নাকি কেটেছে।"

"রাতে পাহারা ছিল না?"

"থাকে তো। আর্মড গার্ড। তার নাকি রাত আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি। সকালে যার ডিউটি সে নাকি এসে রাতের গার্ডটাকে দেখতে পায়নি। এপাশে-ওপাশে খুঁজছিল, তখনই আবিষ্কার করে ভাঙা জানলাটা। ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে এখানকার কর্তাকে জানায়। তিনি এসে পুলিশে ফোন করেন। তারপর পুলিশ চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় লোকটাকে। একটা ঝোপের মধ্যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায়।"

"ও," মিতিন একটুক্ষণ ঝুম মেরে রইল। ফের প্রশ্ন করেছে, "তা কী-কী খোওয়া গিয়েছে?"

"সেটাই তো ভারী অদ্ভুত। এখানকার ম্যানেজারসাহেব নাকি গ্যালারি ঘুরে দেখেছেন। কিছুই নাকি চুরি যায়নি।"

"তাই বুঝি? চোর তা হলে এল কেন?"

"গড নোজ। পুলিশও তো অবাক।"

"কে বলল তোমায় এত সব?"

"সিকিওরিটির লোক। সে বেচারা তো ঘাবড়েছে জোর। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জানতে হল। ভিতরে নাকি পুলিশের বড় অফিসার আছেন। ম্যানেজারসাহেবের সঙ্গে তাঁর বাতচিত চলছে এখন," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "আর কী, গ্যালারি আজ বন্ধ। চল, আমরাও কাটি।"

অবনী হতাশ গলায় বললেন, "ছবিগুলো তা হলে দেখা যাবে না?"

"উপায় নেই অবনীদা। ওরা নাকি ভিজিটর অ্যালাউ করছে না। আমাদের আগে তিন-চারটে গাড়ি এসেছিল, তারাও ব্যাক করেছে।"

"হুম," মিতিন আবার ভাবল দু'-এক সেকেন্ড। ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বলল, "আমি একবার ট্রাই নিয়ে দেখব?"

"লাভ নেই। চৌকাঠও পেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ।"

"তবু দেখি, এসো তো সঙ্গে।"

দোতলা বাড়িটার দিকে এগোল মিতিন। টুপুর-পার্থও চলেছে পিছু-পিছু। যেতে-যেতে বাড়িটাতে চোখ বোলাচ্ছিল টুপুর। বেশ বড়সড়ই। পুরনো, তবে বোঝা যায় রক্ষণাবেক্ষণ ভাল। বারান্দায় উঠেই প্রকাণ্ড দুয়ার বন্ধ। মাথায় প্লেট সাঁটা 'নিকোলাস রোয়েরিখ হল'। তিন-চারজন উর্দিধারী ঘোরাফেরা করছে বারান্দায়, তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে মিতিন সোজা অফিসের দরজায়।

গলা বাড়িয়ে মিতিন বলল, "মে আই কাম ইন?"

"হোয়াই?" অন্দর থেকে ইংরেজিতেই পালটা প্রশ্ন উড়ে এল, "দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা এখন ব্যস্ত?"

"সেই জন্যই তো আসতে চাই। আমি বোধ হয় আপনাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি।"

"তাই নাকি?" স্বরটা খানিক নরম হল, "আসুন।"

ছিমছাম আধুনিক অফিসঘর। কাচের টেবিল, কম্পিউটার, রিভলভিং চেয়ার শোভিত। দেওয়ালে বেশ কয়েকটা ফোটোগ্রাফ। তিন দাড়িওয়ালা সাহেব, এক স্বর্ণকেশী মেম আর রূপসি দেবিকারানি। টুপুর আন্দাজে বুঝে নিল, কালো টুপি পরা সাধু-সাধু চেহারার মানুষটি নিশ্চয়ই নিকোলাস রোয়েরিখ। বাকি দু'জন সম্ভবত তাঁর ছেলে, সোনালি চুল শ্বেতাঙ্গিনী নিকোলাসের স্ত্রী হেলেনা।"

ঘুরনচেয়ারে কপালে হাত চেপে বসে মধ্যবয়সি ম্যানেজার সাহেব। উলটো দিকে এক আই পি এস। ফরসা শক্তপোক্ত চেহারা, সরু গোঁফ, নিখুঁত কামানো গাল, বয়স বছর চল্লিশ। তিনিই ভারী গলায় বললেন, "শুনি আপনাদের বক্তব্য।"

"একটু সময় লাগবে," মিতিন ঠোঁটে হাসি-হাসি ভাব ফোটাল, "বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

শুধু মিতিন নয়, পার্থ-টুপুরও ঝুপঝাপ বসল চেয়ারে। গলা ঝেড়ে মিতিন বলল, "আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে আমার হাজব্যান্ড আর বোনঝি। বাইরে গাড়িতে আমার দিদি-জামাইবাবু আর ছেলে রয়েছে। আমরা কুলু-মানালি বেড়াতে এসেছি।"

"ওকে। ওয়েলকাম টু আওয়ার ভ্যালি। আমি কুলুর এস-পি আশুতোষ শাহ। নাউ প্রসিড।"

"শুনলাম, কাল রাতে কে বা কারা এই গ্যালারিতে হানা দিয়েছিল?"

আশুতোষ যেন পলক জরিপ করলেন মিতিনকে। কেটে-কেটে বললেন, "ইয়েস। থ্যাঙ্ক গড, কিছু চুরি যায়নি। তবে ঘটনাটায় আমরা বিশেষ বিচলিত।"

"আমিও। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের ধারণাটা সঠিক নয়।"

"মানে?"

"এক সেকেন্ড," বলেই ঝটাক ঢাউস ব্যাগখানা খুলল মিতিন। পেনড্রাইভটা বের করে আশুতোষকে বাড়িতে দিয়ে বলল, "আপনি কি এটা একটু চালাবেন?"

"কী আছে এতে?"

"প্লিজ, একবার ওপেন করে দেখুন।"

ম্যানেজারকে পেনড্রাইভখানা দিলেন আশুতোষ। অন করা হল কম্পিউটার। যথাস্থানে পেনড্রাইভ লাগানোর পর ছবির ঝাঁক ফুটে উঠেছে মনিটরে।"

ম্যানেজার বিস্মিত স্বরে বললেন, "এ তো নিকোলাস সাহেবের পেন্টিং।"

"গ্যালারিতে নিকোলাস সাহেবের ক'টা পেন্টিং আছে?"

"সাঁইত্রিশটা।"

"এখানে দেখুন, সাঁইত্রিশখানা ছবিই আছে।"

"হ্যাঁ তো! তাই তো!"

"ভাল করে লক্ষ করুন। সাঁইত্রিশটার মধ্যে তিনখানা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা আছে। উইথ ক্রস মার্কস।"

"হ্যাঁ, আছে।"

"আপনি কি অনুগ্রহ করে ওই তিনটে পেন্টিং আর একবার চেক করে আসবেন? পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে?"

ম্যানেজার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকিয়ে। একবার মিতিনকে দেখছেন, একবার আশুতোষকে। ঢোক গিলে বললেন, "আপনি কী সন্দেহ করছেন, ম্যাডাম?"

"দেখে আসুন না, প্লিজ।"

আশুতোষ উঠে দাঁড়িয়েছেন। ম্যানেজারকে বললেন, "চলুন, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।"

দু'জনে বেরিয়ে যেতেই পার্থ নিচু গলায় বলল, "জোর একটা ঢিল ছুড়ে দিলে তো! লাগে তুক, না লাগে তাক!"

"না স্যার। দুইয়ে দুইয়ে চারই হয়, পাঁচ নয়।"

এক মিনিট গেল, দু' মিনিট, চার মিনিট। চোরা টেনশনে ছটফট করছিল টুপুর। বসে থাকতে পারল না, উঠে গিয়ে ফোটোগ্রাফগুলো দেখছে কাছ থেকে। পরিচয় দেওয়া আছে ফোটোর তলায়। জন্ম-মৃত্যুর তারিখও। জানা গেল নিকোলাসের বড় ছেলের নাম ইউরি।

টুপুর চাপা গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "ইউরিও কি পেন্টার?"

"না। উনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। এশিয়া আর ইউরোপের মোট তিরিশখানা ভাষা জানতেন। সংস্কৃত আর তিব্বতি ভাষায় ইউরির লেখা ডিকশনারিও আছে।"

"ফ্যামিলিটা হেভি তো! প্রত্যেকেই রত্ন!"

"তবে বাবাই সবার সেরা। কাল রাত্তিরে ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখছিলাম, নিকোলাস রোয়েরিখ শুধু চিত্রশিল্পী নন, দার্শনিক, কবি, লেখক ও ভূপর্যটক। মধ্য এশিয়া থেকে এই হিমালয়, এরিয়াটার মধ্যে উনি প্রায় বারো হাজার মাইল হেঁটেছেন।"

পার্থ বলল, "আমিও একটা ইন্টারনেটের ইনফরমেশন দিতে পারি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্মারকচিহ্নগুলো রক্ষা করার জন্য নিকোলাস রোয়েরিখ একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরে ওই ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। রোয়েরিখ প্যাক্ট।"

টুপুর বলল, "সত্যি, কুলুতে না এলে এত খবর..."

বাক্য শেষ হল না। হুড়মুড়িয়ে ঢুকেছেন ম্যানেজার। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "গজব হো গয়া! গজব হো গয়া!"

মিতিন তাড়াতাড়ি বলল, "শান্ত হোন স্যার। কী দেখলেন বলুন?"

"ওই তিনখানা ছবি বদল হয়ে গিয়েছে! পিছন থেকে ফ্রেম খুলে আসলি পেন্টিং হটিয়ে নকলি ছবি পুরে দিয়ে গিয়েছে শয়তানরা। আমি এখন কী করি? আমি এখন কী করব? ওফ্, আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করছে।"

"আহা, আপনি ভেঙে পড়লে তো চলবে না। মন শক্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করুন।"

আশুতোষ শাহ দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আস্তে-আস্তে চেয়ারে এসে বসলেন। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মিতিনকে। খর গলায় বললেন, "আপনি পেনড্রাইভটা কোত্থেকে পেয়েছেন?"

"হাতে এসে গেল," মিতিন নিরুত্তাপ, "চান্স অকারেন্স।"

"জবাব ঠিকঠাক পেলাম না। খুলে বলুন।"

"কুলুর এক প্রাইভেট কটেজে। যেখানে আমরা উঠেছিলাম। আগে যারা ছিল, তারা ফেলে গিয়েছিল। সম্ভবত ভুল করে।"

"পেনড্রাইভ দেখে আপনি বুঝে ফেললেন, এখানে ছবি চুরি হবে?"

"না। তবে একটা কোনও গড়বড় হতে চলেছে, এমনটা আমি অনুমান করেছিলাম।"

"আশ্চর্য অনুমানশক্তি তো আপনার!" আশুতোষের গলায় শ্লেষ, "আপনি কী করেন বলুন তো? সি বি আই-টি বি আইতে আছেন নাকি?"

"উঁহু। তবে প্রায় ওই ধরনেরই কাজ," মিতিন ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিল, "এতে আমার পেশা লেখা আছে।"

কার্ডখানায় চোখ রেখে থমকেছেন আশুতোষ। বিড়বিড় করে বললেন, "ডিটেকটিভ এজেন্সি? থার্ড আই? আপনি চোর-ডাকাত ধরে বেড়ান?"

"রহস্যের সমাধানও করি," মিতিন আলতো হাসল, "তবে পদে-পদে আপনাদের সাহায্য তো লাগেই। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অনেক অফিসারের সঙ্গেই আমায় যোগাযোগ রাখতে হয়। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের আই জি অনিশ্চয় মজুমদার তো আমায় অত্যন্ত

স্নেহ করেন। আমার মোবাইলে ওঁর নাম্বার আছে, কথা বলে দেখবেন?"

"না-না, প্রয়োজন নেই," আশুতোষের মুখের কাঠিন্য অনেকটা কেটেছে। কী একটা ভাবলেন যেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "এনিওয়ে, আপনাকে ধন্যবাদ। ভাগ্যিস পেনড্রাইভটা আপনার হাতে পড়েছিল! নইলে ছবির বদল তো ডিটেক্টই হত না।"

"হ্যাঁ। পাকা হাতের নকল তো, চট করে তফাত বোঝা দায়।"

"আপনি জানলেন কী করে? আপনি তো নকল ছবি দেখতে যাননি?"

"কারণ ছবিগুলো যিনি কপি করেছেন, তাঁকে আমি চিনি। তাঁর হাতের কাজ আমি দেখেছি। তাঁকে যে ছবিগুলো আঁকতে দেওয়া হয়েছিল, তাও আমি জানি।"

"কে তিনি?"

"এখানকারই এক আর্টিস্ট। কুলুর শাস্ত্রীনগরে বাড়ি। নাম বৈজনাথ রাই।"

"আপনি তাঁর সন্ধান পেলেন কী ভাবে?"

সংক্ষেপে বৈজনাথের কাহিনিটা আশুতোষকে বলল মিতিন। শুনে আশুতোষ মহা উত্তেজিত। বললেন, "জব্বর একটা ক্লু দিয়েছেন তো! এক্ষুনি আমি বৈজনাথকে পাকড়াও করছি।"

মিতিন বলল, "কেন? কোন গ্রাউন্ডে?"

"যে লোকগুলো চুরির সাসপেক্ট, উনি তাদের নকল ছবি সাপ্লাই দিয়েছেন। এটাই তো যথেষ্ট কারণ।"

"কিন্তু বড়-বড় পেন্টারের ছবি কপি করা তো কোনও অপরাধ নয়।"

"হতে পারে। তবে সেই ছবি যখন কোনও গ্যালারিতে আসলের জায়গায় ঠাঁই পায় গ্যালারির কর্তাদের অগোচরে, তখন সেটা আর আদৌ নির্দোষ থাকে কি? তা ছাড়া বৈজনাথকে ধরে আনার আর একটা যুক্তিও আছে। পেটে চাপ দিলে ভুসভুস করে দুই চোরের হদিশ বেরিয়ে আসতে পারে।"

"আমি কিন্তু যতটুকু দেখেছি, বৈজনাথকে আমার খুব একটা সন্দেহজনক মনে হয়নি। ইচ্ছে হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই পারেন। তবে তার আগে কি লোক দু'টোকে চেজ করা বেশি জরুরি নয়?" মিতিন সোজা হয়ে বসল, "চুরি তো হয়েছে সেই রাত্তিরবেলা, তাই না?"

"হ্যাঁ। দু'টো নাগাদ। যদি সিকিওরিটি গার্ডের জবানবন্দি সঠিক হয়।"

"কেন মিস্টার শাহ? তার কি ভুলভাল স্টেটমেন্ট দেওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

"বিলক্ষণ। আতঙ্কে তার যা জবুথবু দশা! কিছুই তো তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। প্রচুর ধমকে-ধামকে, বাবা-বাছা করে, জানা গেল, একটা শব্দ শুনে সে নাকি ওই সময় গ্যালারির পিছন দিকে দৌড়েছিল, তখনই দু'টো লোক তার উপর ঝাঁপায়। তারপর তার হাত-পা-মুখ বেঁধে, শ'খানেক মিটার তফাতে এক ঝোপে ফেলে দেয়। ওই গার্ডের কথার উপর নির্ভর করে একেবারে ঠিকঠাক সময়টা কি বোঝা সম্ভব?

"তাও যদি সময়টা রাত তিনটে বা রাত একটাও হয়, তা হলেও তো ন'-দশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। চোর দু'টো পালানোর জন্য কত সময় পেয়ে গিয়েছে ভাবুন!"

"হুম্!" আশুতোষের কপালে মোটা ভাঁজ পড়ল, "যদি মান্ডি পৌঁছে গিয়ে থাকে, তা হলে তো আমার নাগালের বাইরে। মান্ডি থেকে সিমলা, চণ্ডীগড়, কাংড়া ভ্যালি, যেদিকে খুশি পালাতে পারে।"

"তা হলে উপায়?"

নাক কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন আশুতোষ। ঠোঁট ছুঁচলো করে বললেন, "সনাতন পদ্ধতিতে এগোই। এখনই চারদিকে মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমনকী চণ্ডীগড়েও।"

"রোটাং পাস? ওদিক দিয়েও তো..."

"হ্যাঁ। কেলংকেও জানাব। সর্বত্র রেড অ্যালার্ট জারি হয়ে যাক। পথে প্রতিটি গাড়ি চেক করুক পুলিশ," আশুতোষের চোয়াল শক্ত হল, "আর ব্যাটারা যদি কোনও ভাবে কুলুভ্যালিতে থাকে, তা হলে তো আমার মুঠোয়। বেরনোর সব রাস্তা সিল করে দিচ্ছি। বাই দা বাই, লোক দু'টোর যেন কী গাড়ি?"

"মারুতি ভ্যান।"

"কালার? নম্বর?"

"সেগুলো তো বিভব শর্মা, মানে কটেজের মালিক বলতে পারবেন।"

"তাঁর নম্বর আপনাদের কাছে আছে?"

"কার্ড আছে।"

"দিন। লোকাল টিভি চ্যানেলকেও খবর পাঠাচ্ছি, আধ ঘণ্টা পর পর যেন নিউজটা প্রচার করে।"

"লোক দু'টোর আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু নামটুকু যা আছে। সেটাও ফল্স হতে পারে।"

"নো প্রবলেম। বিভব শর্মার সঙ্গে কথা বলছি। বাছাধনদের ছাড়া নেই।"

"পালানোর আর একটা পথও কিন্তু আছে মিস্টার শাহ্। ভুন্টার এয়ারপোর্ট।"

"সেখানেও নির্দেশ চলে যাচ্ছে। এখন অবশ্য আর ফ্লাইট নেই। সকালের ফ্লাইটে যদি না পালিয়ে থাকে! এনিওয়ে, দেখছি।"

মিতিনের থেকে কার্ডটা নিয়ে তড়াক চেয়ার ছাড়লেন আশুতোষ। দ্রুত পায়ে বেরোচ্ছেন বাইরে। মিতিন প্রায় পিছন-পিছন দৌড়ল, "মিস্টার শাহ, একটা অনুরোধ ছিল।"

আশুতোষ ঘুরে তাকালেন, "বলুন?"

"যদি ভাঙা জানলার ওদিকটা একটু সরেজমিন করি, আর সিকিওরিটিটার সঙ্গে একবার কথা বলি?"

"খুব কৌতূহল হচ্ছে নাকি?"

"বোঝেনই তো, ধান না ভানলে ঢেঁকির শান্তি হয় না!"

আশুতোষ হেসে ফেললেন, "ওকে। দেখুন ঘুরে-ঘুরে।"

॥ ৬ ॥

রোয়েরিখ শিল্প প্রদর্শশালার সামনের প্রাঙ্গণে এখনও পুলিশের জটলা। অদূরে টুপুরদের গাড়ি। ফাঁকা। অবনী, সহেলি, বুমবুম, কেউ নেই। গেলেন কোথায় সকলে?"

খানিকটা তফাতে পুলিশ জিপের ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিল টিঙ্কু। ভিতর থেকে টুপুরদের বেরিয়ে আসতে দেখে এগিয়ে এসেছে। ঘাড় চুলকে বলল, "বড়াসাবরা সকলে উপরে গিয়েছেন। মিউজিয়াম দেখতে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "উরুসবতী?"

"হাঁ জি। উধার ভি বহুত বড়িয়া-বড়িয়া চিজ আছে।"

"কতক্ষণ গিয়েছেন?"

"আধা ঘণ্টা," টিঙ্কু ঘড়ি দেখল, "এই গ্যালারি তো আজ আর খুলবে না। ওদের ডেকে আনব? এখন রওনা দেবেন?"

"একটু পরে। আমরা আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকছি।"

টিঙ্কুর চোখে-মুখে পলকা বিস্ময়। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

মিতিন পার্থকে বলল, "তুমিও মিউজিয়ামটা ঘুরে আসবে নাকি?"

"কতটা উঠতে হবে?"

"বোধ হয় এক-দু'শো মিটার। চাইলে যেতে পার। আমি ততক্ষণ এদিকে..."

"আমাকে ভাগাতে চাইছ?"

"তা কেন? ভাবছিলাম না দেখে পরে যদি আফশোস করো!"

"তুমি যাবে না?"

"তোমাদের মুখে ডিটেলে শুনে নেব।"

"বুঝলাম। তুমি কেসটায় ভিড়তে চাইছ!"

"ঠিক তা নয়। জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা। কীভাবে কী ঘটল।"

"বেড়াতে বেরিয়ে মিছিমিছি বখেড়ায় ঢুকছ। করো যা খুশি।"

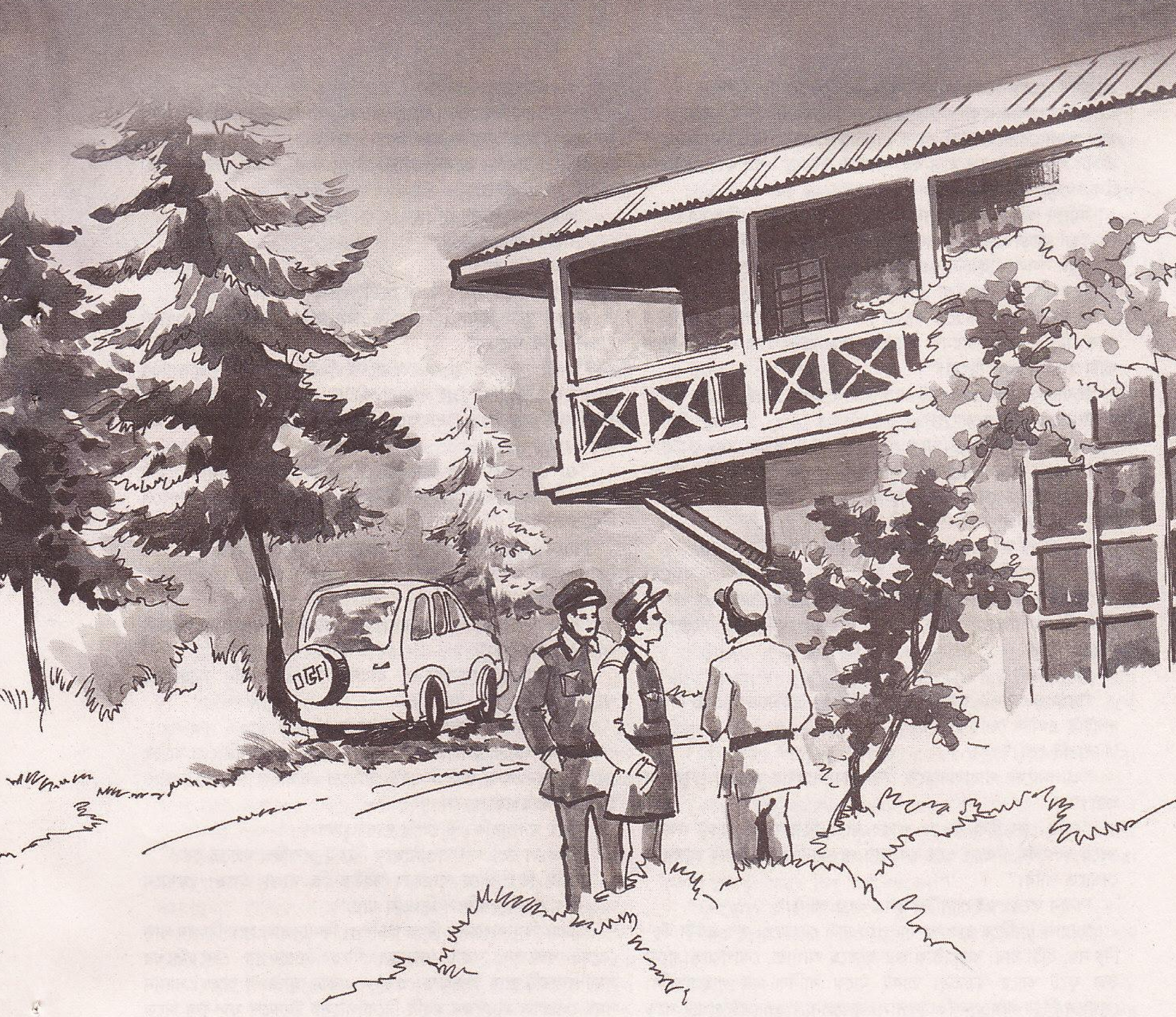

ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে পার্থ চলে গেল। দেবদারু আর পাইনে ছাওয়া উপরে ওঠার রাস্তাটা ধরেছে। মিতিন হাসল মৃদু! টুপুরকে বলল, "দাঁড়া এক সেকেন্ড। ম্যানেজারসাহেবকে ডেকে আনি।"

টুপুর মনে-মনে বেজায় খুশি। পার্থমেসোকে সরিয়ে তাকে সঙ্গে রাখল মাসি! অর্থাৎ কিনা তাকেই মিতিনমাসি সত্যিকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাবছে! কিন্তু লোক দু'টোকে মাসি এখন ধরবে কী করে? পুলিশই বা কোথায়-কোথায় ধাওয়া করবে? নিজের বাহনে বসে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে চতুর্দিকে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন আশুতোষ শাহ। তবে তাতেই কি সাফল্য মিলবে? এমন তো হতে পারে, লোক দু'টো মারুতি ভ্যানখানা ছেড়ে দিয়েছে! বাসে বা অন্য কোনও উপায় যদি ধাঁ মেরে থাকে?

ভাবনার মাঝেই মিতিনের পুনরাগমন। ভীত-সন্ত্রস্ত ম্যানেজার সাহেবসহ। টুপুরকে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে গ্যালারির পিছন পানে চলল মিতিন। হাঁটতে-হাঁটতে ভদ্রলোককে বলল, "আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি স্যার।"

"আমি কিষানলাল দুগ্‌গার।"

"কত দিন গ্যালারির চার্জে আছেন?"

"তা প্রায় ষোলো বছর। শুধু আর্ট গ্যালারি নয়, পুরো হল, এস্টেটটারই আমি দেখাশোনা করি। এখানকার ট্রাস্টি বোর্ড আমাকে নিয়োগ করেছেন," কিষানলাল জোরে শ্বাস ফেললেন, "এর আগে কখনও এরকম বাজে ঘটনা ঘটেনি। ট্রাস্টি বোর্ডকে যে আমি কী কৈফিয়ত দেব?"

"ইন্টারনেটে দেখছিলাম, বোর্ডে নাকি অনেক বিদেশিও আছেন?"

"হ্যাঁ। নানান দেশের। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, চিন, জাপান। শুরুতে তো বোর্ডে দু'জন বাঙালিও ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু আর রবীন্দ্রনাথ টেগোর।"

টুপুর চমৎকৃত। বলল, "ও বাবা, এ তো তা হলে সত্যিই বিশাল ব্যাপার!"

"অবশ্যই।"

এক প্রকাণ্ড সিডার গাছের কাছে এসে থামলেন কিষানলাল। টুপুরকে বললেন, "ওই পাথরের মূর্তিগুলো দেখছ, এঁরা কুলুর রক্ষক। স্থানীয় মানুষদের এরকমই বিশ্বাস, কালী, কার্তিক, নরসিংহ, সকলেই কুলুর অভিভাবক। ঘোড়ার পিঠে মূর্তিটা গুগা চহ্বাণের। ইনি সমস্ত দেবতাদের নেতা। এখানকার ভাঙাচোরা মন্দির থেকে নিকোলাস সাহেব মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে এনেছিলেন। পুরোহিত এসে এখনও

প্রতিদিন পুজো করেন, শাঁখ বাজান, মূর্তিতে চন্দন লেপেন।"

কথায়-কথায় একটু যেন সহজ হয়েছেন কিষানলাল। খোলামেলা মন্দিরখানা পেরিয়ে পায়ে-পায়ে বাড়িটার পিছনে পৌঁছেছেন। সামনেই একটা গ্যারাজ, দেখে মনে হয় সারানো হয়েছে সম্প্রতি। গ্যারাজের ঠিক পরেই কাচভাঙা জানলা।

মিতিন আঙুল তুলে বলল, "ওটাই ব্রেক করেছিল নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। নিখুঁত কেটেছে। দেখুন, পাশে কাচটাও পড়ে।"

টুপুর বলল, "কাচটা তো আস্তই আছে। এত সুন্দর ভাবে কাটল কী করে?"

জায়গাটা পরখ করতে-করতে মিতিন বলল, "পেশাদার হাতের কাজ। নির্ঘাত সঙ্গে ডায়মন্ড পয়েন্টেড যন্ত্র ছিল। তবে লোহার গরাদ কাটা হয়েছে হ্যান্ড ড্রিলে।"

কিষান বললেন, "তখনই বোধ হয় আওয়াজ হয়েছিল। যা শুনতে পেয়ে প্রসাদ দৌড়ে আসে।"

একটা জিনিস কিন্তু চোখে পড়ার মতো," মিতিন ঘাড় ঘোরাল, "আপনাদের জানলাটা শুরু হয়েছে মাটির প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু থেকে। জানলার হাইটও মোটামুটি ছ' ফুট। এত বড় একটা অংশ একেবারে মাপে-মাপে কাটা রীতিমতো কঠিন কাজ।"

"বোধ হয় জানলার কারনিসে চড়েছিল।"

"কিন্তু কারনিসও তো বেশ সরু। দাঁড়ানো মুশকিল," বলতে-বলতে ঘাসে উবু হয়ে বসেছে মিতিন। আঙুল চেপে-চেপে দেখল কী যেন। কিষানলালকে ডেকে বলল, "এখানে ছোট-ছোট দু'টো গর্ত রয়েছে।"

"কিসের?"

"সম্ভবত সঙ্গে ফোল্ডিং মই এনেছিল। মেটালের। মই রাখার দাগটাই এখানে তৈরি হয়েছে।"

"তাই তো!"

"আপনাদের পাহারাদারকে ঠিক কোনখানটায় অ্যাটাক করেছিল ওরা?"

"সেটা তো ঠিক বলতে পারব না," কিষানলাল একটু থমকে থেকে বললেন, "তবে ওকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে, সেই জায়গাটা দেখাতে পারি।"

"চলুন তবে। ওই স্থানটিও দর্শন করে আসি।"

গ্যারাজ পেরিয়ে হাত দশেক পরে ঢাল নেমেছে। খুব একটা উঁচু-নিচু নয়, হাঁটা যায়। অল্প গিয়ে শুরু হয়েছে আগাছা, ঝোপঝাড়। বুনো ফুল ফুটে আছে যত্রতত্র। তারই মাঝে খানিক ঘন গাছগাছালি। সেখানে গিয়ে থামলেন কিষানলাল। বললেন, "ওখানেই প্রসাদ পড়ে ছিল।"

টুপুর বিস্ময়ের সুরে বলল, "এত দূর টেনে এনেছে?"

"তাও তো প্রসাদের কপাল ভাল। আর পাঁচ-ছ' হাত গেলেই খাদ। ফেলে দিলে প্রসাদের আর চিহ্নই থাকতে না।"

"যাক বাবা, লোক দু'টো আর যাই হোক, খুনে নয়।"

"প্রসাদের বন্দুকটাও হাতায়নি। ঝোপের পাশে পড়ে ছিল।"

মিতিন কোনও মন্তব্য করল না। চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করছে ঝোপঝাড়। তরতরিয়ে কয়েক পা হাঁটল। সামনে যাচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল কী যেন। তারপর হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "এবার আপনাদের প্রসাদের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক।"

চওড়া কাঁধ, মাঝারি হাইটের হিমাচলি প্রসাদ ডোগরা এখন একটি টুলে বসে। পরনের নীল উর্দি ধুলোমাটি মাখা। কেমন যেন ঝিমোচ্ছে মাথা নামিয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বন্দুকধারী।

পাহারাদারদের ঘরটিতে ঢুকে মিতিন কিছুক্ষণ স্থির চোখে জরিপ করল প্রসাদ ডোগরাকে। অল্প গলা উঠিয়ে বলল, "এই যে প্রসাদজি, শুনছেন?"

মুখ তুললেন বছর পঞ্চাশের মানুষটি। অতি কষ্টে চোখ খুলে বললেন, "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব যে।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কিষানলাল ঈষৎ কড়া স্বরে বললেন, "সিধে হয়ে বোসো প্রসাদ। ম্যাডাম যা প্রশ্ন করবেন তার জবাব দাও।"

সামান্য টানটান হলেন প্রসাদ। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "হাঁ ম্যাডামজি, বোলিয়ে?"

"কাল যখন শব্দটা পেলেন, তখন ঠিক কোথায় ছিলেন?"

"বাহার। ব্যালকনিমে।"

"একাই ছিলেন?"

"হাঁ জি। মেওয়ালাল তখন মিউজিয়ামে চরকি দিচ্ছিল।"

মিতিন ঘুরে কিষানলালকে জিজ্ঞেস করল, "রাতে কি এখানে দু'জন গার্ডই থাকে?"

"কাল সোমবার ছিল। আমাদের মিউজিয়াম আর গ্যালারির সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই পাহারাদারিটাও সেদিন একটু ঢিলে থাকে। অন্যদিন উপরে-নীচে দু'জন করে সিকিওরিটি ঘোরে। সোমবারই শুধু একজন।"

"ও। চোর তা হলে আটঘাট বেঁধেই এসেছিল," মিতিন ফের প্রসাদে ফিরল, "যারা আপনাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের দেখলে চিনতে পারবেন?"

"রাতের আন্ধেরায় আচ্ছাসে মালুম হয়নি ম্যাডাম। আর ও লোগ তো প্রথমেই আঁখে পট্টি ডেলে দিল।"

"চেঁচালেন না কেন?"

"বহুত ডর গয়া থা ম্যাডাম। ওরা বলছিল, আওয়াজ করলেই জানে মেরে দেবে।"

"তার মানে, মুখ-হাত-পা বাঁধার সময়ও আপনি আটকাতে পারেননি?"

ঘাড় নামিয়ে দু' দিকে মাথা নাড়লেন প্রসাদ।

মিতিন আবার প্রসাদকে জরিপ করে বলল, "আপনি তো বাড়ির ফ্রন্টে ছিলেন আর ওরা নিশ্চয়ই গাড়িতে এসেছিল! আগে কোনও ইঞ্জিনের আওয়াজ পাননি?"

"নেহি ম্যাডামজি। ও লোগ শায়দ পয়দল..."

"তা হলে তো আপনার সামনে দিয়েই ঢুকেছিল বলতে হয়!"

"নেহি জি। পিছে যাওয়ার আউর ভি রাস্তা আছে। যেখানে সাহেবের সমাধি, ওঁহিসে ভি ওঠা যায়।"

মিতিন কিষানলালের দিকে তাকাল। কিষানলাল সায় দিলেন ঘাড় নেড়ে। বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম। নীচে প্রোফেসর রোয়েরিখের সমাধিক্ষেত্রটি প্রায় অরক্ষিত। ওখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। নানান সময় লোকাল মানুষজন মহর্ষি নিকোলাসের উদ্দেশে ফুল-টুল দিতে যায়। তারা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না, যেদিক-সেদিক থেকে উপরে উঠে পড়ে। মূলত তাদের কথা ভেবেই ওপাশটা সেভাবে ঘেরা হয়নি।"

"ও," মিতিন ফের প্রসাদকে নিয়ে পড়ল, "ভাইসাব, লোকগুলো আপনাকে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাই তো?"

"হাঁ জি।"

"আপনার হাত ধরে টেনেছিল? না পা ধরে?"

প্রসাদ যেন এবার থতমত। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন।

মিতিন নিচু হয়ে বলল, "স্মরণ করুন, স্মরণ করুন।"

ফ্যাকাসে ঠোঁট নড়েছে প্রসাদের। ঘোর-ঘোর গলায় বললেন, "ইয়াদ নেহি ম্যাডাম। ডরকে মারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।"

"হুঁ," মিতিন সোজা হল, "কৌতূহল মিটেছে মোটামুটি। এবার কি আপনার অফিসে গিয়ে একটু বসতে পারি?"

"শিওর। তার আগে একবার গ্যালারিতে যাবেন নাকি?"

"ওখানে তো শুধু নিকোলাস সাহেবেরই পেন্টিং?"

"ছেলেরও আছে। আই মিন, স্ভেতোস্লাভ সাহেবের। এগারোটা।"

"এখন আবার গ্যালারি খুলবেন? আমার হাজব্যান্ড আর জামাইবাবুরও ছবিগুলো খুব দেখার ইচ্ছে। ওরা মিউজিয়াম থেকে ফিরলে নয়... যদি তখন আপনার অসুবিধে না থাকে।"

"নো প্রবলেম। তা হলে এখন একবার দোতলায় চলুন।"

গিয়ে লাভই হল টুপুরের। উপরতলাটাও কম দর্শনীয় নয়। মূল বাড়ি ঘিরে একটি সম্প্রতি নির্মিত বারান্দা, সেখান থেকে কাচের জানলা দিয়ে দিব্যি দেখা যায় অন্দরটা। এদিকে-ওদিকে রোয়েরিখদের থাকার ঘর, দারুণ সুন্দর-সুন্দর আসবাব, কাঠের তাকে বই, অসংখ্য শো-পিস, পেন্টিং, স্কাল্পচার। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড স্ফটিকও রাখা আছে।

টুপুর আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল, "দেবিকারানিও কি এখানেই থাকতেন?"

"অল্পদিনের জন্য ছিলেন। তারপর উনি আর স্ভেতোস্লাভ ব্যাঙ্গালোরে চলে যান, মানে এখনকার বেঙ্গালুরু।"

"কেন?"

"বেঙ্গালুরুতেও রোয়েরিখদের অনেক সম্পত্তি ছিল। ওঁরাই দেখাশোনা করতেন সম্পত্তিটার। বিশাল জমি, আঙুরখেত।"

কথা বলতে-বলতেই নেমেছে তিনজনে। অফিস ঘরে ফিরে কিষানলালের মুখে আবার চিন্তার মেঘ। করুণ স্বরে বললেন, "কী হবে ম্যাডাম? ছবি তিনটে উদ্ধার হবে তো?"

"যদি কালপ্রিটরা ধরা পড়ে!" মিতিন ঠোঁট ওলটাল, "সেটা তো এস পি সাহেবের দায়িত্ব।"

"আপনি তো দেখলেন, কথা বললেন। কী বুঝছেন?"

"প্রচুর ছক-টক কষে লোক দু'টো এগিয়েছে।"

"তা তো বটেই। কিন্তু আপনি তো একজন গোয়েন্দা, আপনি একটু আলাদা করে ব্যাপারটা দেখতে পারেন না?"

"উচিত হবে কী? মিস্টার আশুতোষ শাহ ক্ষুণ্ণ হবেন। চটেও যেতে পারেন।"

"এস পি সাহেবকে জানানোর দরকার কী? তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে তো আপনার একটা সুসম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজন পড়লে তখন না হয়..." কিষানলাল দরজার দিকে ঝলক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, "আসলে কী জানেন ম্যাডাম? পুলিশের উপর আমার তেমন আস্থা নেই। ওরা যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তাই বলছিলাম।"

"দেখি, আপনাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি।"

"প্লিজ ম্যাডাম। আপনার মুভমেন্ট বলে দিচ্ছে, আপনি কতটা এফিশিয়েন্ট। প্লাস, ঘটনার আগে থেকেই আপনি ব্যাপারটা গেস করেছেন," টেবিলে পড়ে থাকা পাথরের পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করছেন কিষানলাল। স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, "তিন-তিনখানা রোয়েরিখ সাহেবের পেন্টিং! ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কত যে দাম কে জানে! হয়তো পাঁচ কোটি, হয়তো দশ কোটি, হয়তো তার চেয়েও বেশি!"

"কিছু মনে করবেন না মিস্টার দুগ্গার, এমন মূল্যবান জিনিসকে আপনারা এত হেলাফেলা করে রেখেছেন কেন? আর একটু টাইট সিকিওরিটির বন্দোবস্ত করা কি উচিত নয়? আরও আশ্চর্যের বিষয়, গ্যালারি থেকে যে কেউ পেন্টিংয়ের ফোটো তুলে নিতে পারে?"

"সে তো ইন্টারনেটেই দেওয়া আছে ম্যাডাম!"

"উঁহু। পেনড্রাইভের ফোটোগুলোর কোয়ালিটি আলাদা। দেখেই বোঝা যায়, অতি উচ্চমানের প্রফেশনাল ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরায় তোলা।"

"হ্যাঁ, সেটা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবে পেশাদার ক্যামেরায় ফোটো তোলার অনুমতি কিন্তু আমরা দিই না। ওই পারমিশন দেওয়ার মালিক হিমাচল প্রদেশের সরকার। কিংবা মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ দা রোয়েরিখস।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। বছরে দু'-চারজনের বেশি ওই ধরনের ক্যামেরা নিয়ে আসেও না। তাদেরও অধিকাংশ বিদেশি।"

"গত এক-দু' বছরে যাঁরা ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের তালিকা আপনার কাছে আছে?"

"অবশ্যই। আমি নিয়মিত রেজিস্টার মেনটেন করি।"

"কাইন্ডলি যদি লিস্টটা একটু দেখান।"

"অসুবিধে কী! এ তো গোপনীয় কিছু নয়।"

উঠে বেঁটে আলমারিটা খুলে একটা লম্বা বাঁধানো খাতা নিয়ে এলেন কিষানলাল। মিতিনকে দিয়ে বললেন, "এতেই আছে। সিরিয়ালি।"

শেষ থেকে শুরু করল মিতিন। হঠাৎই চোখের মণি স্থির। পরক্ষণে দৃষ্টি স্বাভাবিক। রেজিস্টার ফেরত দিল কিষানলালকে। আলমারিতে খাতাখানা তুলছেন কিষানলাল, ফের আশুতোষ শাহর আবির্ভাব। গমগমে গলায় বললেন, "আপনি এখনও যাননি?"

মিতিন হেসে বলল, "আমার টিম উপরের মিউজিয়ামে। তারা ফিরলেই..."

"এবার কোথায় প্ল্যান? মানালি?"

"তেমনই তো ইচ্ছে।"

"যান, এনজয় দা টুর। এদিকে আমি ততক্ষণ দুই ওস্তাদকে তাড়া করি। স্ট্র্যাটেজি রেডি। বন্দোবস্তও কমপ্লিট। শুধু প্রাইভেট গাড়ি নয়, কুলু থেকে বেরনোর বাস, ট্রাক, সব চেক করতে বলেছি," আশুতোষ ঘড়ি দেখলেন, "যাই, এবার কুলু যাত্রা করি। ওই বৈজনাথ রাইকে ঝটপট কব্জা করতে হবে। নইলে তিনি আবার কখন উধাও হয়ে যান!"

"একটা সাজেশন রাখব এস পি সাহেব?"

"বলুন?"

"বৈজনাথজি ভাল পোর্ট্রেট আঁকেন। যদি তাঁকে দিয়ে লোক দু'টোর স্কেচ করিয়ে নেন।"

"ওটা তো ঘাড় ধরে করাব," আশুতোষ চোখ তেরচা করলেন, "তবে বৈজনাথের স্কেচের উপর কি পুরোপুরি নির্ভর করা যায়? তিনি যদি নিজেই অপকর্মে যুক্ত থাকেন, তা হলে তো ভুলভাল ছবি এঁকে আমাদের মিসগাইডও করতে পারেন।"

"না, মিস্টার শাহ, বৈজনাথজি বোধ হয় অতটা খারাপ লোক নন। কথা বললেই বুঝবেন।"

"এটা কি ডিটেকটিভের সার্টিফিকেট?"

"ধরুন তাই," মিতিন মৃদু হাসল, "আর একটা কথাও বলতে পারি। প্রসাদ নামক পাহারাদারটিকে আর একবার কড়া করে জেরা করুন। হয়তো আরও কিছু তথ্য পাবেন।"

"বলছেন? তা হলে ব্যাটাকে তুলেই নিয়ে যাই?"

"আর জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট। আপনার মোবাইল নম্বরটা যদি দেন।"

"লিখে নিন।"

মোবাইলে নম্বরটা তুলছিল মিতিন, তিরবেগে ঘরে বুমবুমের প্রবেশ। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "কী গো মা, চলো। আর কতক্ষণ এখানে থাকবে?"

আলতো করে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল মিতিন, "তোদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট? এবার খিদে পেয়েছে, অ্যাঁ?" খিদে শব্দটা বুঝি নাড়িয়ে দিল টুপুরকে। উত্তেজনায় টের পায়নি এতক্ষণ, সত্যিই পেট চুঁইচুঁই করছে।

॥ ৭ ॥

"সে কী রে! আমরা মানালি যাচ্ছি না?"

"তাই বললাম নাকি? হাতে তো এখনও অঢেল দিন, পরে যাব। বেড়াতে বেরিয়ে শুধু হুটোপুটি করে ছোটাটা তো কোনও কাজের কথা নয়। নগ্গরে যখন এলামই, একটা রাত কাটাতে দোষ কী! দেখতেই তো পাচ্ছ, জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। আজ চতুর্দশী, চাঁদের আলোয় আরও অপূর্ব লাগবে।"

"আমি মিতিনের দলে। এক রাত কেন, তিন রাত্তিরও এখানে থাকতে পারি। আদৌ মানালি না গেলেই বা কী এসে যায়! মানালিও পাহাড়, নগ্গরও তাই। ওখানে থেকেও বরফে ঢাকা হিমালয় দেখবে, এখান থেকেও।"

"অ্যাই, তুমি চুপ করো তো, শুধু আয়েশ করার ধান্দা।"

"বটেই তো। ছুটি কাটাতেই তো এসেছি। আরাম করব না কেন!"

সহেলি আর অবনীতে ফের ঝগড়া বেধে যাচ্ছিল, পার্থ থামিয়েছে হাত তুলে। হেসে সহেলিকে বলল, "দেখাই যাক না দিদি, যদি এখানে একটা ভাল হোটেল পাওয়া যায়। বিকেলে নয় কাস্‌লটা ঘুরে আসব।"

অবনী ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ, ওখানে আর একটা মিউজিয়ামও আছে।"

"আমি আর মিউজিয়ামে নেই। একটা দেখেই আমার ঠ্যাং ব্যথা করছে।"

"তুমি লোকাল মার্কেটে যেয়ো। দরাদরি করে মেমেন্টো কেনো।"

বিচিত্র মুখভঙ্গি করলেন সহেলি। দেখে সকলে হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই আবার দুপুরের আহারে মন দিয়েছে। নগ্গরের এই ভোজনালয়টি একান্তই নিরামিষ। খাবার-দাবারের পদও খুব বেশি নেই। ফুলকপির একটা ঝাল-ঝাল তরকারি, বেগুন ভর্তা আর তড়কা ডাল। গরমাগরম পরোটার সঙ্গে তাই হাপুসহুপুস খাচ্ছে সকলে। এমনকী, ঝালের কষ্ট ভুলে বুমবুমও। পেটে যখন ছুঁচো ডন দেয়, তখন সব খাবারই তো অমৃত।

টিঙ্কুও খাচ্ছিল পাশের টেবিলে। পরোটা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে পার্থ তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে পছন্দসই হোটেল কোথায় আছে, জানো?"

"বহুত মিলেগা। উপরের কাস্‌লেই থাকতে পারেন, ওখানে তো এখন হোটেল হয়ে গিয়েছে।"

"ভাল?"

"বহুত বড়িয়া। লেকিন বহুত মেহেঙ্গা।"

"মাঝামাঝি কিছু নেই?"

"পেয়ে যাবেন। এই বাজারেই ঢুঁড়লে।"

"হোটেল থেকে হিমালয়ের চুড়ো দেখা যাবে তো?"

"জরুর।"

খাওয়া সেরে টিঙ্কুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পার্থ। বিল মেটাতে গিয়ে মিতিন আলাপ জুড়েছে হিমাচলি হোটেলমালিকের সঙ্গে। মৌরি চিবোতে-চিবোতে প্রশ্ন করল, "এখন তো নগ্গরের পিক সিজন, তাই না?"

"কোথায় আর মরশুম ম্যাডাম! নগ্গরে তো তেমন টুরিস্টই আসে না।"

"কেন? এখানে তো অনেক কিছু দ্রষ্টব্য আছে? রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারি!"

"পাহাড় বেড়াতে এসে কত জন আর তসবির পসন্দ করে বলুন। সকলে তো কুলু-মানালি ছোটে। হয় কিছু বিদেশি আসে, নয় দু'-চারটে খ্যাপা মানুষ।"

"খ্যাপা?"

"নয়তো কী! পিঠে বোঝা চাপিয়ে এ-পাহাড় ও-পাহাড় চরে বেড়াচ্ছে।"

"ও, আপনি ট্রেকারদের কথা বলছেন?"

"হাঁ জি। ওরাই সব থেকে বেশি আসে। নগ্গর থেকে অনেক স্পটে যাওয়া যায় কিনা।"

"যেমন?"

"চন্দ্রখনি পাস যেতে পারেন। মালানা গ্রাম যদি পায়ে হেঁটে যান, তিন দিন লাগবে। চাইলে মালানা দিয়ে মণিকরণ যাওয়া যায়, পথে পড়বে রসোই পাস। আবার মণিকরণ পেরিয়ে ক্ষীরগঙ্গা যেতে পারেন। সব ক'টাই খুব ফেমাস ট্রেকিং রুট," বলতে-বলতে ভদ্রলোক একবার মিতিনদের দলটাকে দেখে নিলেন। হেসে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই ট্রেক করতে আসেননি?"

"একেবারেই নয়। আমরা ছবি দেখার পার্টি।"

"ঢুকতে দিল? ওখানে তো আজ অনেক পুলিশ। রাতে নাকি চোর-টোর এসেছিল!"

"আপনি জানেন?"

"ছোট জায়গা ম্যাডাম, খবর কানে এসেই যায়। তবে একটা কথা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ম্যাডাম। এই পাহাড়ের লোকেরা কেউ রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারিতে চুরি করতে যাবে না। সবাই এখনও ওঁকে ভক্তি করে।"

"চোর তা হলে বাইরের কেউ?"

"বিলকুল।"

"তা বাইরের লোক রাতদুপুরে এসে চুরি করবেই বা কী করে? অত রাতে পালাবেই বা কোথায়?"

"কে জানে! হয়তো পয়দল চন্দ্রখনি পাসের দিকে চলে গেল। কিংবা এখান থেকে কাতরেইন যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, পথে বিপাশা পড়ে। নদী টপকালেই পাতলিখুল, তারপর কাতরেইন আর কতটুকু!"

পার্থ ফিরেছে। এসেই মিতিনকে তাড়া লাগাতে শুরু করল, "চলো-চলো, হোটেলরুমে আগে বডি ফেলি। তারপর বেরিয়ে যার সঙ্গে খুশি বকর-বকর কোরো।"

হোটেলটা কাছেই। বাজার পেরিয়ে ছোট্ট টিলার মাথায়। পিছনে উত্তর দিক পুরো খোলা এবং সত্যি-সত্যি সেখান দিয়ে বরফে ঢাকা হিমালয়ের একটা ফালি দৃশ্যমান। ঘর দু'খানাও চলনসই। কুলুর কটেজের মতো বাহারি না হলেও খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, ওয়ার্ড্রোব, সবই আছে। একটা করে ছোট টিভিও।

বিছানা পেয়ে সহেলির হাঁটু-কোমরের ব্যথা যেন বেড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে শুয়ে পড়েছেন। অবনী বসলেন বই খুলে। বুমবুম যথারীতি টিভিতে।

টুপুরের চোখ জড়িয়ে আসছিল। ঘুম কাটাতে পাশের কামরায় এল। এ ঘরেও পার্থ টিভি খুলবে-খুলবে করছে। হাতে রিমোট। টুপুরকে দেখে বলল, "কী রে, মাসির ল্যাজ, এবার তোদের কী প্ল্যান?"

মিতিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। টুপুরের হয়ে জবাব দিল, "আপাতত নগ্গর দর্শন।"

"নো টুপি প্লিজ। খোলসা করে বলো তো, কেন রয়ে গেলে নগ্গরে?"

"বুঝতে পারছ না? চুরির কিনারা করতে গেলে এই নগ্গরে একটু থাকা দরকার। অর্থাৎ কিনা অকুস্থল থেকে খুব একটা দূরে যাওয়া সমীচীন নয়।"

"কোমর বেঁধে নেমেই পড়লে তা হলে?"

"ছাড়তে পারছি না যে। পরপর এমন সব ক্লু এসে যাচ্ছে!"

"যেমন?"

"সেই পেনড্রাইভ থেকে তো শুরু হয়েছে। তারপর বৈজনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ছবি কপি, ছবি চুরি..."

"তো?"

"আরও আছে। এখনই ভাঙছি না।"

"যা ইচ্ছে করো। শুধু মাথায় রেখো, এ কেসে তোমার কিন্তু এক পয়সাও রোজগার নেই।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় অর্থ ছাড়াও কেস করে স্যার। মগজের খিদে মেটানোর বাসনাও তো থাকে মানুষের, নয় কি?"

পার্থ লাগসই একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ বুমবুম হাজির। তিড়িংবিড়িং লাফাতে-লাফাতে বলল, "টিভিতে ছবি চুরির খবরটা দেখাচ্ছে গো মা!"

চোখ সরু করে পার্থ বলল, "তুই কী করে জানলি?"

"চ্যানেল চেঞ্জ করতে গিয়ে চোখে পড়ল। চালাও না টিভি, দ্যাখো।"

হ্যাঁ, বুমবুমের সংবাদ সঠিক। স্থানীয় চ্যানেলে এক মহিলা গম্ভীর মুখে পরিবেশন করছেন ছবি চুরির এপিসোড। নবীন তারকুণ্ডে আর সুখদেব ভাটিয়া নামে দুই ব্যক্তি নাকি সম্ভাব্য চোর। গোটা উপত্যকা জুড়ে খোঁজ চলছে ওই দুই ব্যক্তির। তল্লাশি করা হচ্ছে মান্ডিগামী এবং রোটাংগামী প্রতিটি যানবাহন। লোক দু'টোর সন্ধান দিতে পারলে হিমাচল প্রদেশ সরকার পুরস্কার প্রদান করবে বলেও ঘোষণা করা হল।

টুপুর তারিফের সুরে বলল, "এস পি সাহেব দারুণ প্রম্প্ট তো!"

পার্থ অবজ্ঞাভরে বলল, "কিন্তু ব্রেনে ঘিলুটা একটু কম।"

"কেন?"

"চুরির বিষয়টা জানানোই তো কাফি ছিল। সঙ্গে বড় জোর লোক দু'টোর নাম আর অ্যাওয়ার্ড, ব্যস। পুলিশ কী অ্যাকশন নিচ্ছে, তা সর্বত্র চাউর করা তো বোকামি।"

"চোর সাবধান হয়ে যাবে বলছ?"

"অফ কোর্স। তারা আর গাড়িঘোড়া ধরবেই না। অন্য কোনও উপায়ে পালানোর তাল করবে।"

"কীভাবে? পায়ে হেঁটে? নাকি উড়ে? আকাশপথে? জানো কি, দুপুর বারোটার পরে কুলু থেকে আর কোনও প্লেন ছাড়ে না?"

"জানার প্রয়োজন নেই। তবে কাজটা যে উচিত হয়নি, এ আমি জোর গলায় বলব।"

"আমার কিন্তু উলটোটাই মনে হয়," এবার মিতিনের ঠোঁট নড়েছে, "অ্যানাউন্সমেন্টে হয়তো সুফলই মিলবে।"

"কী রকম?"

"লোক দু'টো যদি টিভি দেখে, আমার ধারণা, দেখবেই, তা হলে তাদের দু' তরফা বিপদ। ঘাপটি মেরে থাকতেও ভয় পাবে, দুম করে বেরিয়ে পড়ারও সাহস হবে না। এরকম মুহূর্তেই অপরাধীরা ভুলভাল কাজ করে বসে।"

"সবটাই কিন্তু নির্ভর করছে একটা অনুমানের উপর," টুপুর টুপুস মন্তব্য জুড়ল, "আমরা ধরেই নিচ্ছি, লোক দু'টো এখনও কুলু ভ্যালিতে আছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা হয়তো বহু আগেই পগার পার।"

"অসম্ভব। কুলুর আশপাশে দুই মক্কেলকে থাকতেই হবে।"

"কেন?"

"সে আর একটা অঙ্ক। আমি অলরেডি কষে রেখেছি," মিতিন ঠোঁট চেপে হাসল, "দাঁড়া, আশুতোষ শাহকে একটা ফোন লাগাই।"

মোবাইলে নম্বর খুঁজে টিপল মিতিন। ইচ্ছে করেই বুঝি মাইক্রোফোন অন করল, যাতে পার্থ, টুপুর শুনতে পায়।

বারকয়েক রিং বাজার পর ওপারে আশুতোষের মার্জিত কণ্ঠস্বর, "ইয়েস ম্যাডাম? পৌঁছে গিয়েছেন মানালি?"

"না মিস্টার শাহ। আজ আমরা নগ্গরে থাকাটাই মনস্থ করলাম," মিতিনের মুখ হাসি-হাসি, "হোটেলে এন্ট্রি নিয়েই আপনার কর্মকুশলতা দেখছি। টিভিতে জোর প্রচার চলছে তো!"

"হা হা। আমি আরও অনেক দূর এগিয়েছি। বৈজনাথ রাই এখন আমার সামনে। লোক দু'টোর স্কেচ বানাচ্ছেন।"

"দ্যাটস গ্রেট! কেমন বুঝলেন বৈজনাথকে?"

"সম্ভবত ইনোসেন্ট। বাট নো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স। শিল্পীরা যেমন হয় আর কী," আশুতোষ অল্প থেমে থেকে বললেন, "কেসে আর একটা ব্রেক থ্রু হয়েছে ম্যাডাম। পাজি দু'টো যে গাড়িতে কুলু থেকে বেরিয়েছিল, সেই মারুতি ভ্যানটিকে ট্রেস করা গিয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"ওরা কুলু ছেড়ে সোজা মানালি গিয়েছিল। সেখানে উঠেছিল মানালসু নদীর ধারে একটি গেস্টহাউসে। নাম, দা গোল্ডেন মুন।"

"জানলেন কী করে?"

"আরে, গাড়ির ড্রাইভার তো আমাদের জিম্মায়। মানালি থানায় জবানবন্দি দিয়েছে। তার বক্তব্য, লোক দু'টো নাকি গেস্টহাউসে উঠেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। লোকটার স্টেটমেন্টও আমি ক্রসচেক করে নিয়েছি গোল্ডেন মুনে টেলিফোন করে। ওখানকার ম্যানেজারই জানাল, গেস্টহাউসে ওরা নাকি মোটে একটা দিন ছিল। সোমবার দুপুরে লাঞ্চ সেরে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়।"

"অন্য কোনও গাড়ি নিয়ে?"

"না। গাড়ি ছাড়াই। সঙ্গে নাকি বিশেষ মালপত্র ছিল না। জাস্ট দু'জনের দু'টো হ্যাভারস্যাক আর দু'টো হ্যান্ড-লাগেজ। এবার আমি পতা লাগাচ্ছি, ওরা মানালি থেকে অন্য কোনও গাড়ি নিয়েছিল কিনা।"

"চমৎকার! আপনি তো ঝড়ের গতিতে ছুটছেন!"

"হা হা হা।"

"চালিয়ে যান। গ্যালারির পাহারাদার প্রসাদের কী সমাচার?"

"কাস্টডিতে এনেছি। কুলুতে। বৈজনাথের স্কেচ আঁকা শেষ হোক, তারপর প্রসাদকে নিয়ে পড়ছি।"

"ছাড়ি তা হলে। মাঝে-মাঝে ফোনে বিরক্ত করব কিন্তু।"

"আরে না। আপনি হলেন গিয়ে ডিটেকটিভ। মাঝে-মাঝে আপনার কাছ থেকেও তো ইনপুট পেতে পারি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

টেলিফোনটা অফ করে একটুক্ষণ চোখ বুজে রইল মিতিন। ফের মোবাইলে আর একটা নম্বর টিপছে। আবার মাইক্রোফোন চালু। এবার অপর প্রান্তে বিভব শর্মা। হাউমাউ করছেন, "আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল ম্যাডাম!"

মিতিন নির্বিকার, "কেন? কী হল?"

"আপনি কেন এস পি সাহেবকে আমার নাম্বার দিলেন ম্যাডাম? উনি তো আমাকে বহুত আঁখ দেখাচ্ছেন। প্রাইভেট কটেজ চালাই, পুলিশ নজর দিলে বেওসা চালাব কী করে? কাঁহা-কাঁহাসে গেস্ট আসে আমার কটেজে, তাদের কে যে কেমন আমি কী ভাবে জানব?"

"তা তো বটেই।"

"কিন্তু এস পি সাহেব তো ও কথা মানছেন না। রোয়েরিখ গ্যালারিতে কোনও পেন্টিং চুরি হয়েছে, ওই তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া নাকি কালপ্রিট। তা এতে আমার কী কসুর বলুন? অথচ এস পি সাহেব আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চাইছেন। বিজনেস তো আমার চৌপাট হয়ে যাবে।"

"আহা, লোক দু'টো ধরা পড়লেই তো আপনি..."

"পুলিশ কি আসলি ক্রিমিনালকে ধরতে পারে কখনও? তারা কোথায় ভেগেছে কৌন জানে! মাঝখান থেকে আমি ফালতু-ফালতু..." বিভব শর্মার স্বরে তীব্র ক্ষোভ, "টাইমটাই আমার খারাপ যাচ্ছে। এমন একটা ভরা মরশুমে আমার কটেজ বিলকুল খালি!"

"দুঃখ করছেন কেন? কালই তো একজন আসছেন!"

"না ম্যাডাম। ওতেও গড়বড়। এই তো দুপুরে সাহেবের মেসেজ এল, ভিসা নিয়ে কী প্রবলেম বেধেছে, একদিন পর উনি দিল্লিতে নামছেন। অতএব কাল নয়, উনি কুলু আসবেন পরশু। ভাবুন, অলরেডি বুকিং ফিরিয়ে দিয়েছি, এখন কালও হোল-ডে যদি ফাঁকা যায়..."

"আফশোস করবেন না শর্মাজি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপনি প্লিজ এস পি সাহেবকে একটু বলে দিন, আমি বুরা আদমি নই।"

"কী আশ্চর্য! আমি বললেই বা তিনি মানবেন কেন?"

"এস পি সাহেবের মুখে সব শুনেছি ম্যাডাম। আপনার পরিচয়, পেশা...। মনে হল, উনি আপনার কথাকে ওজন দেবেন," বিভব শর্মা ক্ষণিক চুপ থেকে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমার এই অপদস্থ হওয়ার পিছনে আপনারও কিছুটা দায়িত্ব আছে।"

"কীভাবে?"

"রুমে যে একটা পেনড্রাইভ পেয়েছিলেন, সেটা কি আমায় জানানো উচিত ছিল না? আমি তো ওটাকে থানায় জমা করতাম।"

"করতেন কী?"

"চান্সই তো পেলাম না। নিজেকে প্রমাণ করব কী করে!"

আর কথা না বাড়িয়ে মিতিন কুট করে লাইনটা কেটে দিল। পার্থ, টুপুর মন দিয়ে শুনছিল ফোনালাপ, ব্যঙ্গের সুরে পার্থ বলল, "শর্মা একটু বেশি ঘ্যানঘ্যান করছেন না?"

"যা বলেছ," টুপুর সায় দিল, "পেনড্রাইভ হাতে পাননি বলে কেন এত হাহুতাশ? তারকুণ্ডেদের সঙ্গে ওঁর যোগসাজশ থাকা মোটেই বিচিত্র নয় মিতিনমাসি।"

"বিভব শর্মাকে একদম ভিলেন ঠাউরে ফেললি?" মিতিন দু' দিকে

মাথা নাড়ল, "না রে, লোকটার একটাই গলদ। বড্ড লোভী। হয়তো তার জন্যই ওকে আরও সাফার করতে হবে।"

শেষ বাক্যটি পুরোপুরি বোধগম্য হল না টুপুরের। আর কী দুর্ভোগ থাকতে পারে বিভব শর্মার?

॥ ৪ ॥

নগ্গরে আঁধার নেমেছে বহুক্ষণ। কুলুর মতো জমজমাট নয় নগ্গর, বরং সন্ধে হতেই চতুর্দিকে যেন কেমন ঘুম-ঘুম ভাব। অল্পস্বল্প দু'-চারজন টুরিস্ট ঘুরছে ইতস্তত, সবই প্রায় শ্বেতাঙ্গ। বাজারে দোকানপাটেরও ঝাঁপ পড়ে গেল ঝপাঝপ। দূরে, খাড়া উত্তরে, এক পাহাড়ে টিপটিপ আলো। ওই জায়গাটার নাম নাকি জগৎসুখ। একদা ওখানেই নাকি রাজধানী ছিল কুলুরাজ্যের। নগ্গরেরও আগে।

গায়ে শাল জড়িয়ে হোটেলের কাচঘেরা বারান্দা থেকে পাহাড়টাকে দেখছিল টুপুর বিরস মেজাজে। বিকেল থেকে সময়টা আজ বিচ্ছিরি কাটছে। টুপুরদের হোটেলে বসিয়ে রেখে কোথায় যে গায়েব হল মিতিনমাসি, এখনও তার পাত্তা নেই। গাড়িটাও নেয়নি, অর্থাৎ কাছেপিঠে আছে নির্ঘাত। আবার বোধ হয় গ্যালারিতেই গিয়েছে, একে-ওকে-তাকে জেরা করছে। অথবা চুরির জায়গাতেই অনুসন্ধান চালাচ্ছে নতুন করে। টুপুরকে ছাড়াই। কোনও মানে হয়? মাঝখান থেকে টুপুরকে কিনা বেরোতে হল বাবা-মা-পার্থমেসোদের সঙ্গে। বড্ড নীরস ঘোরাঘুরি। বাবা তো সারাক্ষণ উরুসবতী মিউজিয়ামের গল্প শুনিয়ে গেলেন টুপুরকে। ওখানে নাকি শুধু শিল্পকলা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাও চলে। হিমালয়ের গাছপালা আর শিকড়বাকড় থেকে এক সময় যে ওষুধ-বিষুধ তৈরি হত, তা নিয়ে নানা পরীক্ষা, বায়োকেমিস্ট্রি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান...। চমৎকার একখানা লাইব্রেরিও আছে নাকি সেখানে। পার্থমেসো তো আরও একপ্রস্থ গল্পের ঝাঁপি। ব্রিটিশরা নাকি কুলু উপত্যকার দখল নিয়েছিল মাত্র পৌনে দু'শো বছর আগে। তারও পরে নগ্গরে অনেকটা জমিজমা কেনেন এক ব্রিটিশ কর্নেল। নাম রেনিক। তাঁর হাতেই নাকি কুলুতে আপেল চাষের শুরু। রোয়েরিখ সাহেবের বাড়ি-টাড়ি নাকি সেই কর্নেল সাহেবেরই বানানো। এক সময় মান্ডিরাজাকে সব বেচেবুচে দিয়ে রেনিক ইউরোপ চলে যান। রাজা বাড়িঘর দেখভাল করার ভার দেন আর এক সাহেবকে। তা সাহেবের কপাল মন্দ। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নাকি একই দিনে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মারা যান। তারও পরে আসেন রোয়েরিখরা। মান্ডিরাজার কাছ থেকে বাড়িঘর সমেত গোটা সম্পত্তিটা কিনে ফেলেন এবং ধীরে-ধীরে তাঁরা কুলুরই মানুষ বনে যান।

কিন্তু এত সব জেনে টুপুরের কী লাভ? মিতিনমাসি বলে, "হাবিজাবি তথ্য ঢুকিয়ে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিস না। তাতে দরকারের সময়ে আসল বিষয়টি খুঁজতে অসুবিধে হবে। রোয়েরিখদের বাড়ির ইতিহাস জেনে কি চোর ধরার ক্লু মিলবে? ফুঃ।"

নগ্গরের চূড়ায় রাজা জগৎ সিংহের দুর্গ-কাম-প্রাসাদটা অবশ্য মন্দ লাগেনি টুপুরের। পাথরের দুর্গটায় পা রাখলেই কেমন গা ছমছম করে। প্রাসাদ থেকে নীচের উপত্যকার দৃশ্যও ভারী মায়াময়। আজ বিকেলে ওটুকুই যা টুপুরের প্রাপ্তি।

তারপর থেকে তো হোটেলে ফিরে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে থাকা। বাইরে নেমে যে একটু হাঁটবে টুপুর, তারও কি জো আছে? একে কনকনে ঠান্ডা, তায় শনশন হাওয়া! ভালই বেগ আছে বাতাসের, ছুরির মতো কেটে-কেটে লাগে গায়ে। বোঝাই যায়, নগ্গর কুলুর চেয়ে অনেকটা উঁচুতে।

ভিতর থেকে হঠাৎ পার্থ ডাকছে, "অ্যাই টুপুর! টুপুর!"

টুপুর অনিচ্ছাভরে সাড়া দিল।

"দেখে যা, কী আনিয়েছি। ঠান্ডা হয়ে যাবে, আয় চটপট।"

রুমে ফিরে মুখচোখ সামান্য উজ্জ্বল হল টুপুরের। প্রকাণ্ড প্লেটে রাশিখানেক পেঁয়াজি আর আলুর চপ। মা খেতে আরম্ভ করেছেন, বুমবুম তুলব-তুলব করছে, পার্থমেসোর মুখ চলছে কচকচ। একটা পেঁয়াজি তুলে কামড় দিল টুপুর। বসেছে সহেলির পাশে। ভুরু নাচিয়ে বলল, "এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এমন মুখরোচক খাদ্যবস্তু মিলল কোত্থেকে?"

বইয়ে নিমগ্ন ছিলেন অবনী। তবু ঠিক শুনতে পেয়েছেন। ভারিক্কি গলায় বললেন, "পাণ্ডবরা এই অঞ্চল এড়িয়ে গিয়েছেন, তাই বা বলি কী করে? লোকাল হিস্ট্রি অনুযায়ী মানালির জঙ্গলে হিড়িম্ব রাক্ষসকে মেরে তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন ভীম। শুধু তাই নয়, মহাভারতের এক কাঁড়ি ঋষি এই লোকালিটিতে থাকতেন। এমনকী মহাভারতের লেখক বেদব্যাসও। ইনফ্যাক্ট, বিপাশা নদীর নামও..."

"আমি শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই না," সহেলি দু' কান চাপলেন, "জ্ঞান বিতরণ থামিয়ে এবার আলুর চপ খাও তো।"

"খেপেছ? আপেলের দেশে এসে ওই সব কুখাদ্য গিলব? একে ভাজাভুজি, তায় কী তেল তার ঠিক নেই!"

"উহুঁ। মেটিরিয়াল তেমন খারাপ নয়," পার্থ অবনীকে আশ্বস্ত করতে চাইল, "আমি এই হোটেলের রন্ধনশালায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়েছি দাদা।"

টুপুর তামাশা জুড়ল, "তোমার তো হেভি ক্যালি!"

"অবশ্যই। রাতে কী মেনুর বন্দোবস্ত করলাম জানিস তো?"

"কী?"

"কষা মুরগি, হাতে গড়া রুটি, পাঁপড়, চাটনি, আচার। ব্রয়লার নয়, বিশুদ্ধ কুলু চিকেন।"

টুপুর উল্লাসধ্বনি করতে যাচ্ছিল, তখনই মঞ্চে মিতিন। ঘরে ঢুকেই হালকা সুরে বলল, "বাহ, দিব্যি সাঁটাচ্ছ তো তোমরা!"

প্রায় চেঁচিয়ে উঠে টুপুর বলল, "ছিলে কোথায় এতক্ষণ?"

"বলছি-বলছি। আগে পেটে একটু দানাপানি পুরি। প্রচুর হেঁটেছি, হাই ডোজের ক্যালরি চাই এখন।"

কাঁধের ব্যাগ টেবিলে রেখে নির্বিকার মুখে চপ খাচ্ছে মিতিন। তর সইছিল না টুপুরের, ছটফট করছে। ফের বলল, "কোথায় গিয়েছিলে, জানাতে আপত্তি আছে নাকি?"

"আদৌ না," মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "এখানেই এদিক-ওদিক করছিলাম। দু'-চারজনের সঙ্গে কথাও বলতে হল।"

"অভিযানটা কি খুবই গোপনীয়?"

"সঙ্গে নিইনি বলে বড় চটে আছিস দেখছি। ওরে বোকা, কোথাও-কোথাও আমায় একাই ছুটতে হয়। ওতে মুভমেন্টটা ইচ্ছেমতো করা যায় রে।"

পার্থ বলল, "ভাঁজ না মেরে পয়েন্টে এসো। পাক্কা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কোন রাজকার্যে ছিলে, অ্যাঁ?"

"একের পর-এক সূত্র জোগাড় করলাম। এবার তাদের জোড়া লাগাব।"

"যেমন?"

"বিশদেই বলি তা হলে। অবনীদা, বোর হবেন না কিন্তু," মিতিন গুছিয়ে বসল, "দুপুর থেকে আমায় একটা প্রশ্ন তাড়া করছিল। লোক দু'টো কীভাবে পরপর স্টেপ ফেলেছে? কুলু থেকে মানালি পৌঁছে তারা তো গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর কী করল? তারপর কী করল?"

"ভেবে কিছু পেলে?"

"একটা আউটলাইন খাড়া করলাম। আমার যুক্তি বলল, লোক দু'টো নিশ্চয়ই আর গাড়িভাড়া করবে না। কারণ, ড্রাইভারসহ গাড়ি সব সময়ই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে থেকে যাবে। অতএব তারা নগ্গর আসার জন্য মানালি থেকে নির্ঘাত বাস ধরেছে। মানালি থেকে নগ্গরে লাস্ট বাস আসে রাত আটটায়।"

টুপুর বলল, "তারকুণ্ডেরা আটটার সময় নগ্গরে পৌঁছে গিয়েছিল?"

"সম্ভবত।"

"কিন্তু চুরি তো হয়েছে গভীর রাতে! সেই দু'টো-তিনটেয়!"

"কারেক্ট। এই ছ'-সাত ঘণ্টা তারা তা হলে ছিল কোনখানে? নগ্গরের পথে-পথে তো নিশ্চয়ই ঘোরেনি! অথচ তারা নগ্গরেই ছিল! কীভাবে তা সম্ভব?"

"তুমিই বলো।"

"তারা যদি এমন কোনও ভেক ধরে, যাতে লোকজনের চোখে পড়লেও সন্দেহ না জাগে! এক্ষেত্রে ট্রেকার সাজা সবচেয়ে সোজা। পিঠে একটা হ্যাভারস্যাক থাকলেই যথেষ্ট। সঙ্গে টুপি, গ্লাভস, লাঠি। হ্যাভারস্যাকে ট্রেকিংয়ের সরঞ্জাম আছে, না ডাকাতির, তা কে আর বুঝছে!"

"তেমন কোনও ছদ্মবেশীর সন্ধান পেলে?"

"নিখুঁত ভাবে কেউ বলতে পারল না। তবে এখানে একটা ধাবা সাড়ে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানে দু'জন শিখ নাকি আহার সেরেছিল এবং তাদের পোশাক-আশাক দেখে ট্রেকারই মনে হচ্ছিল।"

"তারকুণ্ডেরা সর্দারজি সেজেছিল?"

"হ্যাঁ। এনকোয়্যারির পরের ধাপে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।"

"কী রকম?"

"আসছি সে প্রসঙ্গে। ধাপে-ধাপে," মিতিন আর একখানা পেঁয়াজি তুলল প্লেট থেকে। চিবোতে-চিবোতে বলল, "রাতের খাওয়া সেরে তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া পাড়ি জমাল গ্যালারিতে। সামনে দিয়ে ঢুকল না, নীচের সমাধিস্থল থেকে উঠে এল উপরে, বাড়ির পিছনে। সিকিওরিটি গার্ড প্রসাদকে ওরা আগেই হাত করে রেখেছিল।"

"কেমন করে শিওর হলে?"

"কারণ, টেনেহিঁচড়ে ঝোপ অবধি নিয়ে যাওয়ার গল্পটা বানানো। যেখানে প্রসাদ পড়েছিল, তার আশপাশে এমন কোনও চিহ্ন পাইনি, যা দেখে মনে হয় লোকটাকে হিঁচড়াতে-হিঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ, লোকটা কিন্তু খাদের ধারে ছিল, অথচ খাদে পড়েনি! অর্থাৎ হাত-মুখ বাঁধার ঘটনাটা পুরো সাজানো। ঝোপে তাকে রাখাও হয়েছে সাবধানে," মিতিন সামান্য দম নিয়ে ফের বলল, "তবে হ্যাঁ, প্রসাদ কিন্তু নাটকটার জন্য সাংঘাতিক কিছু পয়সাকড়ি পায়নি। হয়তো দু'-চারশো, বা বড়জোর হাজার। এবং যে ছবিগুলো বদল হতে চলেছে, তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে প্রসাদের এখনও কোনও আন্দাজ নেই।"

"বুঝলাম। লোকটা বোকা পাপী।"

"কতকটা তাই। এ ছাড়া লোকটাকে তারকুণ্ডেরা ভয় দেখিয়েও থাকতে পারে। হয়তো প্রসাদ ভেবেছে, বাধা দিলেও তো প্রাণের আশঙ্কা, তার চেয়ে বরং ক'টা টাকা নিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নয় পড়েই থাকি। আমার বিশ্বাস, পুলিশের রুলের গুঁতোয় তার মুখ থেকে সত্যিটা এতক্ষণে বেরিয়েও গিয়েছে।"

"মিস্টার শাহকে ফোন করে তা হলে জেনে নাও।"

"কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, এই ডিডাকশানের ভুল-ঠিকে কিছু যায় আসে না," মিতিন মৃদু হাসল, "এবার আমি পরের ধাপে। চুরির পর তারকুণ্ডেরা গেল কোথায়?"

পার্থ বিজ্ঞের সুরে বলল, "নগ্গর-কুলুর ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে, এটাই স্বাভাবিক।"

"হ্যাঁ। যদি তারা নিজেদের জন্য চুরি করে। আই মিন, তারা নিজেরা যদি ছবি তিনটে বেচার প্ল্যান করে থাকে।"

"নিজেরাও সংগ্রহে রাখতে পারে।"

"নো চান্স। ওই ছবি যারা কালেকশানে রাখে, তারা মারুতিভ্যান ভাড়া করে না। তারা অনেক রইস হয়।"

"ওরা তো কুলুতে রইসি চালেই ছিল!"

"কারণ, তাদের কেউ একজন ওভাবে থাকতে বলেছিল। ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে। নির্জনে। এবং বিভব শর্মারই কটেজে।"

"কেন? কেন? কেন?"

"সব কেনর জবাব এক্ষুনি মিলবে না স্যার। শুধু এটুকু জেনে রাখো, এত দামি ছবি ছুটকো-ছাটকা ক্রিমিনালরা মার্কেটে বেচতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"কারণ, তাদের সেই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। যারা এই ধরনের ছবি কেনে, ওরা নিয়ে গেলে ছবিগুলোকে আসল বলে মানবেই না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে নামীদামি পেন্টারের অরিজিনাল ছবি কেনাবেচার জন্য আলাদা কিসিমের চিড়িয়া থাকে। তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া ওই রকমই এক মক্কেলের হয়ে কাজটা করেছে।"

"কে সে?"

"পরে জেনো। যাই হোক, আবার তারকুণ্ডে-ভাটিয়ায় ফিরি। মেঘের আড়ালের মেঘনাদটির হাতে চুরির জিনিস তুলে দিতে হবে বলেই কুলু ভ্যালিতে থেকে যেতে হয়েছে জোড়া বজ্জাতকে। কিন্তু কোথায় তারা থাকতে পারে? কুলুতে যাওয়ার ঝকমারি আছে। যে-কোনও মুহূর্তে বৈজনাথের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা। তা ছাড়া কুলুতে এখন যা ভিড়, হোটেল পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।"

"আশ্চর্য, বিভব শর্মার কটেজেই তো উঠতে পারে!"

"দু'টো অসুবিধে। এক, যদি ছবি বদল ধরা পড়ে যায়, তা হলে তো পেনড্রাইভটি দেখে বিভব শর্মাই ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। দ্বিতীয় ঝামেলা, স্বয়ং বৈজনাথ। যিনি ছবির কপি করেছেন, কিন্তু পুরো টাকা পাননি।"

"তা বটে। ছ্যাঁচড়া অপরাধীদের এটাই হচ্ছে মুশকিল, এমন কিছু-কিছু গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলে!"

অবনী অনেকক্ষণ বই মুড়ে রেখেছেন। মন দিয়ে শুনছিলেন আলোচনা। খানিকটা অধৈর্য ভাবে বলে উঠলেন, "বুঝেছি-বুঝেছি। তারা কুলুতেও যাবে না, নগ্গরেও থাকবে না। তা হলে যাবে কোথায়?"

"এটাই মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন," মিতিন গালে আঙুলের টোকা দিল, "আমার মন বলছিল, কুলু, নগ্গর, মানালি, কোথাও না গিয়ে চতুর্থ একটা জায়গা বেছে নেবে। যেখানে রাত্তিরেই বা কাকভোরে তাদের পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব। কোনও যানবাহন ছাড়াই।"

"কোথায় সেটা?"

"কাছাকাছির মধ্যে কাতরেইন আছে। যেখানে হোটেল-টোটেল পাওয়া যায়। ব্যস, মনে হওয়া মাত্র চলে গেলাম কাতরেইন।"

"সে তো সাত-আট কিলোমিটার দূর! গেলে কীভাবে? তুমি তো গাড়িও নাওনি? পায়ে হেঁটে?"

"পাহাড়ি রাস্তায় অতটা হাঁটা কি সহজ কথা! একটা অটো ধরে নিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, কাতরাইনে হোটেল খুব বেশি নেই। যেতে-যেতে ভাবছিলাম, ওরা যদি হেঁটে কাতরেইন গিয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই শর্টকাট রুটটা ধরেছে। কিন্তু তার জন্য তো পাথর বেয়ে-বেয়ে বিপাশা পেরোতে হয়। আমি বিপাশার নিয়ারেস্ট হোটেলটাতেই প্রথমে খোঁজ নিলাম। এবং কী কপাল, লেগেও গেল।"

"মানে? ওখানে পেলে লোক দু'টোকে?"

"উঁহু। পাখি উড়ে গিয়েছে। শুধু জানা গেল, দুই সর্দারজি ট্রেকার ভোর চারটেয় এসেছিল হোটেলটায়। তারা নাকি কুলু ভ্যালিতে হিচ-হাইকিং করে বেড়াচ্ছে। হেঁটে-হেঁটেই নাকি তারা হিমালয়ের এই অঞ্চলটা চষে ফেলবে।"

"কী গুলবাজ রে বাবা!" সহেলি আর নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ বড়-বড় করে বললেন, "জিভে মিথ্যে কথার খই ফোটে!"

"চোর-ডাকাতরা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তো আর থাকত না রে দিদি। আমাকেও বসে-বসে আঙুল চুষতে হত।"

টুপুর অধীর হয়ে বলল, "আহা, আসল খবরটা শোনাও না। ওরা কখন কাতরেইন ছেড়েছে? সকালেই?"

"তা হলে কি আগাম টাকা দিয়ে হোটেলে উঠত? আর পাঁচটা হিচ-হাইকারের মতো পথের ধারেই বসে থাকত দু'জনে," মিতিন কেটে-কেটে বলল, "তারা হোটেল থেকে ভেগেছে বিকেল সাড়ে তিনটেয়।"

পার্থ বলল, "অর্থাৎ টিভিতে ঘোষণা শুরু হওয়ার পর?"

"ইয়েস স্যার। টিভি দেখে ওরা নিশ্চয়ই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল এবং বোধ হয় তাদের নাটের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগও করে এবং তার নির্দেশ অনুসারেই তড়িঘড়ি ওই পলায়ন," মিতিন গাল ছড়িয়ে হাসল,

"শুনে খুশি হবে, ওরা কোথায় যাচ্ছে তাও বলে গিয়েছে হোটেল-মালিককে।"

পার্থ, টুপুরের গলা কোরাসে বেজে উঠল, "কোথায়?"

"মানালি। যাওয়ার আগে নাকি একটা হোটেলের নাম-ধামও বলেছে। সস্তার জায়গা। শিবালিক লজ।"

"এ তো দারুণ খবর রে!" সহেলির হাসি আর ধরে না, "চল, আমরাও তা হলে কাল সকালে মানালি রওনা দিই।"

অবনী বললেন, "না। আগে পুলিশকে জানাও। পুলিশ ক্যাঁক করে ধরুক, তারপর নয় তুমি সিনে হাজির হও।"

"আমি একটা অন্য প্রস্তাব দেব, অবনীদা?" মিতিনের হাসি চওড়া হল, "শুনলেই অবশ্য দিদি ফায়ার হয়ে যাবে।"

"কী?"

"আমরা বরং কাল আবার কুলুতেই যাই।"

সহেলি চেঁচিয়ে বললেন, "কেন?"

"কারণ, ওরা মানালি যায়নি। পুলিশকে মিসলিড করার জন্য মানালির কথা বলেছে," মিতিনের স্বর দৃঢ় হল, "ওরা কুলুর আশপাশে থাকবে। থাকতেই হবে। অন্তত কালকের দিনটা।"

॥ ৯ ॥

আজ আর দেরি করতে দেয়নি মিতিন। ঝটপট লটবহর গাড়িতে তুলে সকাল দশটার মধ্যে সোজা কুলু। প্রথমে জেলাপুলিশের সদর দপ্তর। সেখানে তখনও আসেননি আশুতোষ। অগত্যা যেতে হল তাঁর বাংলোয়।

কাছেই পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যিখানে এস পি সাহেবের বাসস্থান। তেমন একটা দেখনবাহার নয়, তবে আয়তনে বেশ বড়সড়। বাড়ি ঘিরে সবুজ ভেলভেটের মতো ঘাসের লন। গেটে প্রহরী দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে মিতিন বলল, "অবনীদা, একটু ওয়েট করতে হবে কিন্তু।"

অবনী খুশি মনে বললেন, "আমার কোনও অসুবিধে নেই। বরং তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করো। তিনি অল্পেই অধৈর্য হয়ে পড়েন কিনা।"

অমনি সহেলির প্রশ্ন, "তোদের কতক্ষণ লাগবে?"

"আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা।"

"অত?"

"এক কাজ করুন না," পার্থ বলল, "আপনি, অবনীদা আর বুমবুম ততক্ষণ রাজবাড়িটা দেখে আসুন। তিনশো বছরের পুরনো প্রাসাদ।"

"চড়াই ভাঙতে হবে না তো?"

"না-না। গেট পর্যন্ত গাড়ি চলে যাবে।"

বুমবুম গোঁজ মুখে বলল, "তার আগে আমার চিপ্‌স চাই।"

"পাবে-পাবে।"

অবনীদের নিয়ে টিঙ্কু রওনা দেওয়ার পর রাইফেলধারী মারফত খবর পাঠাল মিতিন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকেছেন আশুতোষ। নিজস্ব অফিসঘরটিতে বসালেন মিতিন-পার্থ-টুপুরকে। মুচকি হেসে বললেন, "আপনারা তা হলে মানালিভ্রমণ ক্যানসেলই করলেন?"

"না তো। তবে আজ বোধ হয় যাচ্ছি না," মিতিন স্মিত মুখে বলল, "আসলে চুরিটা আমায় এমন হন্ট করছে। যে সে জিনিস তো নয়, ওই সব ছবি আমাদের জাতীয় সম্পদ।"

"বুঝেছি। কেসটা আপনাকে গেঁথে ফেলেছে।"

"প্রায়। শেষ না দেখে নড়তে মন চাইছে না।"

"তা হলে তো আপনাকে আরও দু'-চারটে সমাচার দিতেই হয়। তার আগে বলুন চা না কফি?"

"ঠান্ডাটা আজ বেড়েছে। কফিই ভাল।"

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন আশুতোষ। গদি আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "একটা-একটা করে শোনাই? প্রথমত, আপনার অনুমান সঠিক। প্রসাদ লোকটি মোটেই নির্দোষ নয়। চোর দু'টো ওকে সত্যিই হাত করেছিল। অ্যাকর্ডিং টু প্রসাদ, ওরা নাকি রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আচমকা এসে ওকে রিভলভার দেখায়। ওর রাইফেলও নাকি কেড়ে নিয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে লোক দু'টোর প্রস্তাবে প্রসাদ রাজি হয়ে যায়। কোথায় বেঁধে ফেলে রাখলে সহজে কারও চোখে পড়বে না, তা নাকি প্রসাদই দেখিয়ে দিয়েছিল তখন। তবে পেয়েছে নাকি মোটে পাঁচশো টাকা।"

"ওরা যে ছবি চুরি করতে এসেছে, প্রসাদ কি জানতেন?"

"সেটা এখনও স্বীকার করছে না। বলছে, যা কিছু ঘটেছে, সবই নাকি তার অজ্ঞাতসারে। তাকে ঝোপে রেখে আসার পরে। তখন নাকি এতই ঘাবড়ে ছিল, কোনও কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি!"

"প্রসাদকে ছেড়ে দিয়েছেন?"

"প্রশ্নই আসে না। আজ ওকে কোর্টে তোলা হবে। আরও সাত দিন পুলিশ কাস্টডি চাইছি।"

"হুম। আর আপনার দ্বিতীয় সংবাদ?"

"চোর দু'টো বৈজনাথ সম্পর্কে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়ে তাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে এসেছিল।"

"জানি তো। ওরা ইন্টারনেটে বৈজনাথজির নাম-ঠিকানা পেয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, বিভব শর্মার কটেজে ওঠার আগেই নাকি ওরা বৈজনাথজির সঙ্গে যোগাযোগ করে।"

"এক সেকেন্ড," আশুতোষের ভুরুতে পলকা ভাঁজ, "আপনাকে এ কথা কে বলল?"

"বৈজনাথজি স্বয়ং। মেলায় যখন দেখা হয়েছিল।"

"রং। ওরা কটেজে ওঠার পর বৈজনাথের কাছে যায়।"

"তাই কি?"

"ইয়েস। ভাড়া নেওয়া মারুতিভ্যানটির ড্রাইভার খুব জোরের সঙ্গে কথাটা জানিয়েছে।"

"বৈজনাথজি তা হলে মিথ্যে বললেন?" টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ইস, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।"

"হয়তো বৈজনাথকে চোর দু'টো ওরকমই বলেছিল। মানে ওই সব ইন্টারনেটের গল্প।"

কফি এসে গিয়েছে। সঙ্গে বড় প্লেটে কাজু। হাতের ইশারায় মিতিনদের নিতে বলে একটা কাপ টানলেন আশুতোষ। ছোট চুমুক দিয়ে বললেন, "আরও একটা খবর। বিভব শর্মার কটেজে ওদের আগাম বুকিং ছিল। টানা বারো দিনের। অর্থাৎ চুরির দিনটাও আগেই ফিক্স করা ছিল।"

টুপুর চমকিত। মিতিনের অবশ্য কোনও হেলদোল নেই। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "পেমেন্টটাও নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স করা ছিল?"

"হ্যাঁ। রুম-রেন্টটা। ক্রেডিট কার্ডে। ভায়া ইন্টারনেট।"

"ক্রেডিট কার্ডের নম্বরটা নিয়েছেন?"

"স্লিপ আছে বিভব শর্মার কাছে। রেখে দিতে বলেছি," আশুতোষ গলা ঝাড়লেন, "বিভব শর্মার বদ মতলব থাকলেও তো ওই নম্বর লুকোতে পারবে না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সব বলে দেবে।"

"ঠিক। একদম ঠিক," মিতিনের ঠোঁটে হাসি, "আপনি তো খুব ভাল এগোচ্ছেন।"

"কিন্তু আসল কাজটাই তো বাকি। এত রাস্তা আটকালাম, গাড়িঘোড়া সার্চ করলাম, টিভিতে নিউজ হল, পাজি দু'টোর এখনও নো ট্রেস। এই মেলার ভিড়ে গলে বেরিয়ে গেল কিনা সেটাই এখন আমার দুশ্চিন্তা।"

"টেনশন করবেন না মিস্টার শাহ। তারা এখনও কুলু ডিস্ট্রিক্ট ছাড়েনি।"

"কী করে বলছেন?"

"নিজের গোয়েন্দাবুদ্ধি দিয়ে," মিতিন নড়ে বসল, "বাই দা বাই, বৈজনাথজির স্কেচ দু'খানা একটু দেখতে পারি?"

"অবশ্যই। আজই তো ফোটোকপি করে গোটা ভ্যালিতে ছড়িয়ে দেব। সমস্ত প্রমিনেন্ট প্লেসে টাঙানো থাকবে। বাসস্ট্যান্ড, এয়ারপোর্ট, সর্বত্র।"

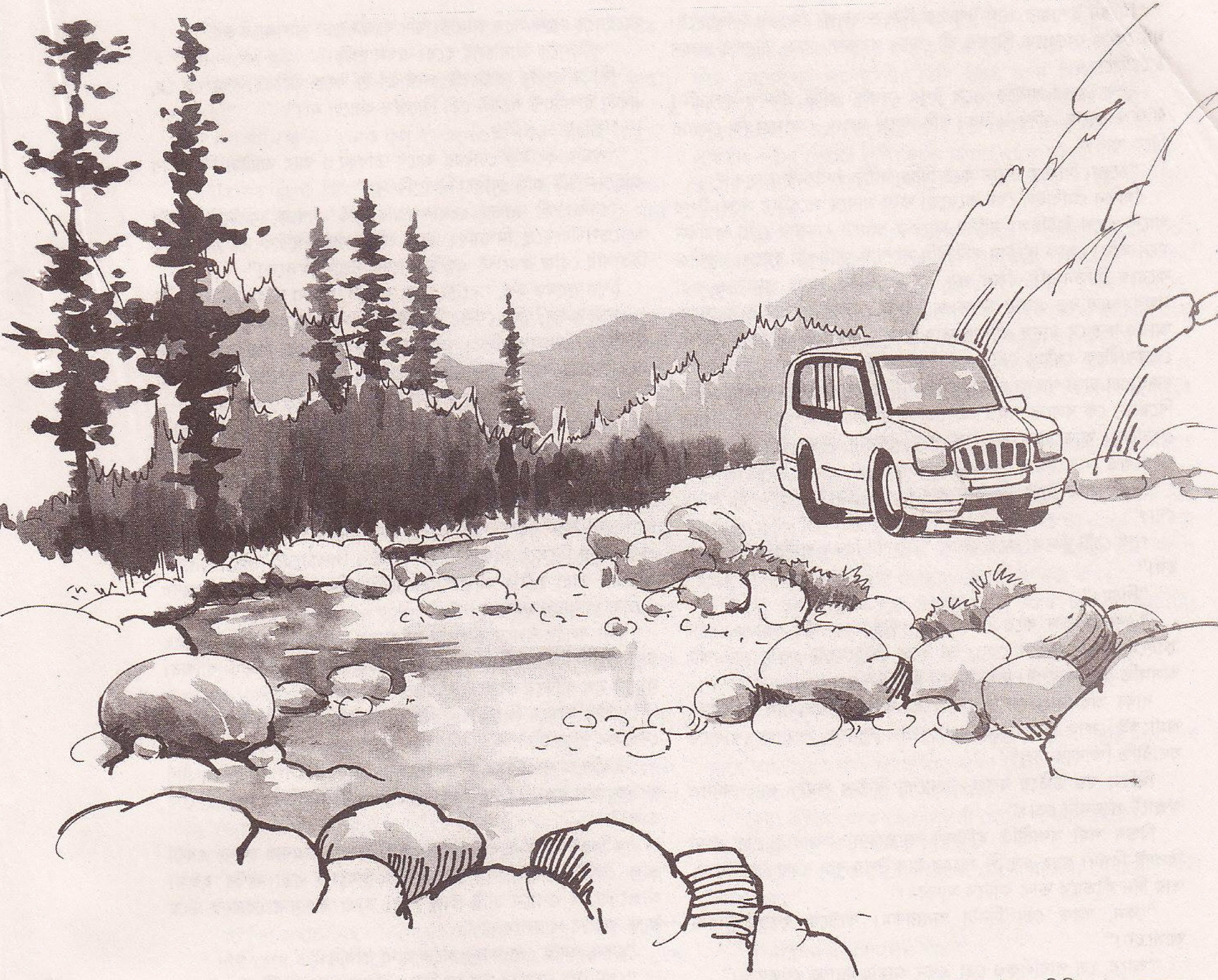

বলতে-বলতে ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বের করেছেন আশুতোষ। মুখটা খুলতেই দু'খানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে দুই মূর্তির অবয়ব। স্কেচপেনসিলে আঁকা। মিতিন মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছিল ছবি দু'টো। ঝুঁকে পড়ে পার্থ আর টুপুরও। ছবি অনুযায়ী নবীন ডিগডিগে রোগা। চৌকো মুখ, চোখ খুদে-খুদে, নাকের নীচে সরু গোঁফ। আর সুখদেব গোলগাল, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো। কারও চেহারায় তেমন বিশেষত্ব নেই, যা দিয়ে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

আশুতোষ যেন হাল্কা শ্লেষের সুরে বললেন, "মুখস্থ করে নিচ্ছেন নাকি? যাতে পথেঘাটে দেখলেই চিনতে পারেন?"

"এই ছবি দেখে তা সম্ভব নয়," মিতিন দু' দিকে মাথা নাড়ল, "দু' জনের মুখেই অনেক গোঁফ-দাড়ি লাগাতে হবে। সঙ্গে মাথায় পাগড়ি।"

"কেন?"

"কারণ, ওরা সর্দারজির ছদ্মবেশে আছে যে।"

একটুক্ষণ বুঝি বাক্যস্ফূর্তি হল না আশুতোষের। তারপর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বললেন, "আ-আ-আপনি জানলেন কী করে?"

সংক্ষেপে নগ্গর আর কাতরেইনে সংগৃহীত প্রতিটি তথ্যই আশুতোষকে বলল মিতিন। লোক দু'টো যে মানালি যাবে বলেছে, সেটাও জানাতে ভুলল না এবং ওই কারণেই যে মিতিন ফের কুলুতে ফিরেছে, তাও শুনিয়ে রাখল।

আশুতোষ মুগ্ধ স্বরে বললেন, "আপনি তো ডেঞ্জারাস মহিলা! একাই পুলিশের কাজ করে দিচ্ছেন?"

"না-না, তাই কি পারি?" মিতিন যেন বিনয়ের অবতার, "আমি শুধু সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করতে চাই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। আমি এক্ষুনি চতুর্দিক চষে ফেলছি। প্রতিটি সর্দারজিকে..."

"ভুলেও ও কাজটি করবেন না মিস্টার শাহ। তাতে হিতে বিপরীত হবে। কালপ্রিটরা আরও সতর্ক হয়ে যাবে," মিতিন ঠান্ডা স্বরে বলল, "যদি আমার পরামর্শ নেন, টেলিভিশনের ঘোষণাও বন্ধ করে দিন। পারলে খবর চাউর করুন, সম্ভাব্য দুই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে তলে-তলে অনুসন্ধান চালিয়ে যান।"

"আইডিয়াটা মন্দ নয়। অপরাধীরা নিশ্চিন্ত বোধ করলে তাদের ধরতে সুবিধে হয়।"

"এখন তা হলে আসি?"

"কুলুতে থাকছেন তো? নাকি চলে যাচ্ছেন?"

"দেখি!"

মিতিন ইশারায় পার্থ-টুপুরকে উঠতে বলল। নিজেও দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও কী ভেবে থমকাল যেন। তারপর হনহন হাঁটা দিয়েছে।

কম্পাউন্ডের বাইরে এসে টুপুর দেখল, গাড়ি এখনও ফেরেনি। পার্থ তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ঘড়ি দেখে বলল, "আমরা কি মেলার দিকে যাব?"

"চলো। দিদিকে ফোন করে দিচ্ছি, গাড়ি ওখানেই আসুক।"

মিতিন মোবাইল বের করেছে। কথা সারছে সহেলির সঙ্গে। টুপুর পাশে-পাশে হাঁটছিল। মাসির কাজের ধারাটা বোঝার চেষ্টা করছিল মনে-মনে। লোক দু'টোর গতিবিধি সম্পর্কে খানিকটা হয়তো আন্দাজ করেছে মিতিনমাসি, কিন্তু শুধু তা দিয়েই কি ওদের পাকড়াও করা সম্ভব? এত বড় একটা উপত্যকা, এখন মেলার সময় বাইরে থেকে আরও কত যে মানুষ এসেছে তার হিসেব নেই। তার মধ্যে থেকে দুই ভেকধারীকে খোঁজা তো খড়ের গাদায় ছুঁচের সন্ধান করার চেয়েও দুরূহ। তা ছাড়া পাহাড়-পর্বতের কোন ফাঁকফোকর দিয়ে তারা পিঠটান দিয়েছে, কে বলতে পারে! এ তো বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করে বেড়ানো! আড়চোখে পার্থমেসোকে একবার দেখল টুপুর। মেসোর কপালেও যেন চিন্তার রেখা।

নিচু গলায় টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ও মেসো, তুমি কী ভাবছ গো?"

পার্থ ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, "একবার বিভব শর্মার কাছে গেলে হয়।"

"গিয়ে?"

"একবার ক্রস করে দেখা যেত। ভদ্রলোক যদি কোনও ভাবে ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তা হলে স্টেটমেন্টে একটা না-একটা অসঙ্গতি ধরা পড়বেই। তখনই চাপ দিয়ে..."

বাক্য অর্ধসমাপ্ত থেকে গেল। কী কাণ্ড, মিতিনমাসি যে বিভব শর্মাকেই ফোন লাগিয়েছে! এবং পার্থ-টুপুরকে সংলাপ শোনাতে যথারীতি স্পিকার চালু!

মিতিন স্বর উঠিয়ে বলল, "হ্যালো মিস্টার শর্মা? আর কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়েননি তো?"

বিভব শর্মা যথারীতি হাউমাউ জুড়েছেন, "আমার তো এখন বিপদই বিপদ। স্বয়ং এস পি সাহেব যার উপর বুরা নজর ফেলেছেন, তার দিন কীভাবে ভাল কাটবে ম্যাডাম?"

"কেন, আজ তো দিনটা অন্যরকম। কটেজে ফরেন টুরিস্ট আসছেন।"

"আরে, সে পাবলিকও তো এখন আমায় ল্যাজে খেলাচ্ছে।"

"সে কী? আজও আসছেন না বুঝি?"

"না, আসবে। তবে এবেলা নয়, রাত্তিরে।"

"স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণ কী করবেন সাহেব? ভুন্টারে প্লেন সব ল্যান্ড করে তো সকালবেলায়।"

"জানি তো। ভোরে আজ রবার্তো সাহেবকে রিংও করেছিলাম, দেখি লাইন বন্ধ। তারপর তো সাহেবেরই ফোন এল। খানিক আগে। কুলুতে ঢুকতে নাকি সাহেবের রাত ন'টা-দশটা বাজবে, আমি যেন কামরা রেডি রাখি।"

"তা হলে বোধ হয় বাই রোড আসছেন।"

"হতে পারে। সাহেবের খেয়াল। যাক গে, আমিও স্থির করেছি, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। দু' দিনের ঘরভাড়া তো নেওয়াই আছে, নয় আজ আর কাল একখানা রুম ফাঁকা রাখব।"

"সাহেব বুঝি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?"

"ক্রেডিট কার্ডে। থ্রু ইন্টারনেট।"

"হুম। আর কী খবর? বৈজনাথজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল!"

"খেপেছেন? আর ওর সংস্রবে থাকি? পুলিশের কোন চক্করে ফেঁসে যাব, ঠিক আছে?"

"সেই তারকুণ্ডেরাও আর নিশ্চয়ই ফোন-টোন করেনি?"

"না ম্যাডাম। যদি ভুল করেও যোগাযোগ করে, আমি এস পি সাহেবকে সঙ্গে-সঙ্গে জানাব। যদি বলেন তো আপনাকেও।"

"পুলিশকে জানালেই হবে। এখন ছাড়ি।"

মিতিন লাইন কাটতেই পার্থ হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, "এ হে হে, একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট তো জিজ্ঞেস করলে না!"

"কী?"

"শর্মার কটেজে ঢোকার আগে তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া নিজেদের আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিল, কি না।"

"জেনে কী লাভ? দেখাক আর নাই দেখাক, কটেজে একটা অ্যাড্রেস দিয়েছে নিশ্চয়ই! এবং তারা এত নির্বোধ নয় যে, সেই ঠিকানায় খোঁজ করলেই এক্ষুনি তাদের সন্ধান মিলবে!"

টুপুর সহমত হল, "বটেই তো। আসল ঠিকানা তারা দেয় নাকি?"

পার্থ বলল, "তা কেন? দিতেই বা অসুবিধে কোথায়? তারা তো জানত না প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় বলে এক ডিটেকটিভ ঠিক পরে-পরেই কটেজে উপস্থিত হবে! প্লাস, পেনড্রাইভটাও তারা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে ফেলে যায়নি!"

"ঠিকই বলছ," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "তাদের আসল নাম-ঠিকানা দিতেও কোনও সমস্যা ছিল না, নকল দিতেও নয়। তারা তো স্ট্রেট নগ্গর যেত, গ্যালারির ছবি পালটে মানে-মানে কেটে পড়ত। আমরা না জানালে চুরিটাই হয়তো আবিষ্কার হত না সঙ্গে-সঙ্গে। পরে যখন ব্যাপারটা ধরা পড়ত, তখন তো আর তাদের টিকি ছোঁয়ার উপায় নেই। সেই হিসেবে বিভব শর্মার কটেজও পিকচারের বাইরে থাকত। অতএব তারা সঠিক আত্মপরিচয় দেখিয়েছিল কিনা, তা আমাদের ধর্তব্যে আনারও দরকার নেই।"

কথা বলতে-বলতে ঢালপুর ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে টুপুররা। মিনিট দু'-তিনেকের মধ্যে টিঙ্কু সিংহের গাড়িও হাজির। বুমবুম মুখ বাড়িয়ে ডাকছে টুপুরদের।

গাড়ির সামনে গিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী অবনীদা, কেমন দেখলেন রাজবাড়ি?"

সহেলি আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন, "খুব খারাপ। অমন জরাজীর্ণ দশা জানলে কখনও যেতাম না। তার চেয়ে রঘুনাথজির টেম্পলটা ঢের ভাল।"

"মন্দিরও ঘুরে এলেন বুঝি?" পার্থ হাসল, "এবার চলুন, একটা ভাল রেস্তরাঁ দেখি। সকালের টোস্ট-অমলেট তো কখন হজম। আশুতোষের ওখানে চাট্টি কাজু দিল। তাও আপনার বোনের ভয়ে দাঁতে কাটতে পারলাম না।"

"কেন, আমি তো কাজু খেতে মানা করিনি!"

"প্লেট তো তোমার সামনে ছিল। এগিয়ে তো দাওনি!"

পার্থর বলার ভঙ্গিতে সবাই হাসছে। বুমবুমও। হাসতে-হাসতে গাড়িতে উঠল টুপুররা। টিঙ্কুকে বলতেই সে গাড়ি নিয়ে সোজা কুলুর আখারা বাজারে। একটা সাজানো-গোছানো বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি-চিকেনের অর্ডার দেওয়া হল। সঙ্গে স্থানীয় নদীর ট্রাউট মাছের ফ্রাই। পাশেই দু'খানা টেবিল জড়ো করে আহার সারছে জনা দশেক সর্দারজি। মেনু রুটি-মাংস।

তেরচা চোখে তাদের দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "কে জানে এদের মধ্যেই তারকুণ্ডেরা আছে কিনা!"

টুপুর বলল, "যাঃ, এই দঙ্গলে তারা ঢুকবে কী করে?"

মিতিন যেন আনমনা ছিল। পার্থ-টুপুরের কথায় চমকে তাকিয়েছে। টিঙ্কু একই সঙ্গে খেতে বসেছে, ফস করে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে অনেক সর্দারজিও আসেন নাকি?"

"কুলু টাউনে খুব একটা নয়। ওঁরা বোধ হয় মণিকরণ যাচ্ছেন।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "মণিকরণে কি আপনাদের কোনও তীর্থস্থান আছে?"

"হাঁ বহিন। গুরুনানকজি মণিকরণে ছিলেন কিছুদিন। ওখানে বড় গুরদোয়ারা আছে। তিন-চার হাজার আদমি এক সাথ থাকতে পারে।"

অবনী বললেন, "মণিকরণ হিন্দুদেরও তীর্থস্থান। একটা উষ্ণ কুণ্ডও আছে।"

"এক সেকেন্ড অবনীদা," মিতিন ফের ফিরেছে টিঙ্কুতে, "মণিকরণের রুটটা কী ভাই?"

"ভুন্টার আর কুলুর মাঝামাঝি মেন রোড থেকে একটা রাস্তা ঘুরেছে।"

"তার মানে ভুন্টার থেকে কুলু না এসেও মণিকরণ যাওয়া যায়?"

"হাঁ জি।"

মিতিনের চোখ যেন জ্বলে উঠল। পলকেই অবশ্য স্বাভাবিক। বিড়বিড় করে বলল, "কুলুতে আর সময় নষ্ট নয়। সকলে খেয়ে নাও চটপট। এবার মণিকরণ।"

॥ ১০ ॥

পার্বতী নদী চলেছে পাশে-পাশে। প্রায় গোটা পথ ধরে। নাচতে-নাচতে। ঝমরঝমর শব্দ বাজিয়ে। রাস্তার অন্য ধারে পাহাড়ি জঙ্গল। রীতিমতো ঘন। অরণ্যের ছায়ায় চড়াই উতরাই, সবই কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। যেন রহস্যমাখা।

টুপুর বিভোর হয়ে নিসর্গ দেখছিল। তারা যে চোর ধরতে চলেছে, তা বুঝি এখন স্মরণেই নেই। বাঁয়ে, খরস্রোতা নদীর ওপারে, কী মনোরম উপত্যকা! মাঝে-মাঝেই ঘন সবুজ চারণভূমি। চরছে ভেড়া-ছাগলের পাল। আরও খানিক দূরে খাড়া-খাড়া পাহাড়। পাইন-চির-দেবদারুতে ছাওয়া। চোখে পড়ে আপেল বাগান, শস্যশ্যামল মাঠ। হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে ধবধবে সাদা পাহাড়চূড়া, আবার হারিয়েও যাচ্ছে পরমুহূর্তে। আহা রে, এই তো স্বর্গ!

আপন মনে টুপুর বলে উঠল, "আমাদের টুর প্রোগ্রামে মণিকরণ ছিল না কেন?"

পার্থ বলল, "সত্যি, না এলে খুব লস হত কিন্তু। দিব্যি একটা জঙ্গলও দেখা হয়ে গেল।"

সহেলি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত স্বরে টিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ গো, এই পাহাড়ে কি জন্তুজানোয়ার আছে?"

"হাঁ জি," টিঙ্কু ঘাড় নাড়ল। পাহাড়ের একটা বাঁকে স্টিয়ারিং ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, "চিতা, ভল্লুক, হরিণ। তবে রাস্তায় নামে না, থোড়া দূর-দূর থাকে।"

অবনী বললেন, "শুনেছি এখানে নাকি কস্তুরীমৃগ দেখা যায়?"

"হাঁ জি। এক টাইপের বিল্লি ভি আছে। গায়ে মিঠা-মিঠা স্মেল।"

"সিভেট? সে তো খুব বিরল প্রাণী!"

"হাঁ জি। এখানে বহুত কিসিমের জানোয়ার আছে, পাখি আছে।"

পার্থ চোখ বড়-বড় করে বলল, "গুরু নানক এই সব জঙ্গল ভেদ করে এসেছিলেন?"

"একা নন, সঙ্গে আরও লোক ছিলেন। মণিকরণে পৌঁছে তাঁদের খুব খিদে পায়। কাছে চাল-আটা থাকা সত্ত্বেও উনুনের অভাবে রান্না করতে পারছিলেন না। তখন গুরু নানক একটা প্রকাণ্ড পাথর সরিয়ে গরম জলের ধারাটা বার করে দেন। জলের তাপ এত বেশি, চাল-ডাল সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যায়। এখনও তো গুরদোয়ারার খাবার-দাবার ওই গরম জলে রান্না হয়।"

সহেলি বললেন, "ভারী মজার ব্যাপার তো! আমরাও মণিকরণের জলে চাল ফুটিয়ে দেখতে পারি।"

"অসুবিধে নেই। তবে একটু সালফারের গন্ধ পেতে পার," অবনী মতামত জানালেন, "হট স্প্রিংয়ে প্রচুর গন্ধক থাকে তো।"

"আহা, ওই জলে রান্না তা হলে লোকে খায় কী করে?"

টিঙ্কু বলল, "সহি বাত। রোজ কত আদমি গুরদোয়ারাতে খাচ্ছে, রামমন্দির ধরমশালাতেও খেতে যাচ্ছে।"

"রাম কোত্থেকে এলেন?" অবনীর ভুরুতে বিস্ময়, "মণিকরণে তো শিবের থাকার কথা।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কারণ, এটা শিবের এলাকা। মণিকরণ নামটা কী করে হয়েছে শুনবি? শিব আর পার্বতী একদিন এখানে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পার্বতীর কান থেকে মণিকুণ্ডল খসে পড়ে। শেষনাগ নামের এক সাপ সেই মণিকুণ্ডলটি নিয়ে পাতালে ঘাপটি মারে। শিব তো রেগে কাঁই, অমনি বসে গেলেন কঠোর তপস্যায়। ধ্যানের দাপটে তাঁর তৃতীয় নয়ন ফুঁড়ে বেরোলেন নয়নাদেবী। তিনি গিয়ে হানা দিলেন পাতালে। শেষনাগ তো বেজায় ঘাবড়ে গেল, একগাদা মণি উপহার দিয়ে তুষ্ট করতে চাইল শিবকে। তা মহাদেবের তো লোভ-টোভ নেই, তিনি শুধু পার্বতীর গয়না পেয়েই খুশি। বাকি মণিগুলোকে পাথর বানিয়ে গরম জলের ধারাটিকে ঢেকে দিলেন শিব। ওই মণির সূত্রেই জায়গাটা হল।"

"বেড়ে গল্প তো!" পার্থ হেসে ফেলল, "কেসটা কেমন যেন মিতিনদেবীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না? রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারি থেকে রত্ন হাপিশ করে এক জোড়া শেষনাগ চম্পট দিয়েছে, আশুতোষ শাহ বসেছেন কঠোর তপস্যায়, তাঁরই তেজে বলীয়ান হয়ে থার্ড আইয়ের মিতিন ওরফে নয়নাদেবী চলেছেন রত্ন উদ্ধারে!"

অবনী হো হো হেসে উঠলেন, "এখন প্রশ্ন হল, এই শেষনাগরা কি আদৌ ঘাবড়েছে? আশুতোষের চরণে গিয়ে কি সমর্পণ করবে ছবি তিনখানা?"

"সে গুড়ে বালি। মিতিনদেবীকে ভেল্কি দেখাতেই হবে। নইলে শেষনাগদের কবজায় আনা মুশকিল।"

যাকে নিয়ে এত মশকরা, সেই মিতিনের উদাসী চোখ জানলার বাইরে। কানে কিছু ঢুকছে কিনা বোঝা দায়। হঠাৎই কী ভেবে যেন দৃষ্টি ঘোরাল। দূরমনস্ক স্বরে টিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই, বলো তো, মণিকরণ থেকে আর কোথায়-কোথায় যাওয়া যায়?"

"কুলু ছাড়া মণিকরণে বাসরুট তো আর একটাই ম্যাডাম। মণিকরণ থেকে বারসোনি।"

"জায়গাটা কত দূর?"

"মণিকরণ পেরিয়ে আরও বারো-চোদ্দো কিলোমিটার।"

"কী আছে সেখানে?"

"হাইডেল প্রোজেক্ট। পার্বতীর জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর আছে পাহাড়ের মাথায় জমলু মহাদেবের মন্দির।"

"বারসোনিতে থাকার কী বন্দোবস্ত?"

"নেই। ওখান থেকে হেঁটে পুলগাঁ গেলে বাড়িঘর মেলে।"

"কাছাকাছি আর কোনও জায়গা?"

"মণিকরণ থেকে হেঁটে ক্ষীরগঙ্গা যেতে পারেন। যেখানে পার্বতী নদীর শুরু।"

"আর?"

"দু'-চারজন মালানাতেও যায়।"

"সেখানে কী আছে?"

"মালানা এক আজব উপত্যকা ম্যাডাম। বহুকালের পুরনো। লোকে বলে, সিকান্দার শাহের কিছু সৈন্য ওখানে রয়ে গিয়েছিল। তাদের বংশধররাই নাকি মালানার বাসিন্দা।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "সিকান্দার শাহ.....মা-মানে কি গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার?"

"হাঁ জি। মালানার মানুষ নিজেদের মতো আইনকানুন বানিয়ে নিয়েছে। কেউ ওদের বিরক্ত করে না। ওখানে নাকি রাশি-রাশি ধনরত্ন, কিন্তু কোনও চুরি-ডাকাতি নেই। পাহারারও প্রয়োজন হয় না। ওরা কথা বলে কানাশি ভাষায়। ভোট দিয়ে নিজেরাই নিজেদের নেতা নির্বাচন করে, তারা ওদের দেখভাল করে।"

"মালানায় হোটেল-টোটেল আছে?"

"না জি। ট্রেকিং পার্টি গিয়ে তাঁবুতে থাকে। বাইরের লোকদের ব্যাপারে ওরা ভীষণ কড়া। গাঁয়ের মধ্যে বাঁধানো রাস্তা ছাড়া কাউকে হাঁটতে দেবে না। ওদের কাউকে আপনি ছুঁতে পারবেন না। কোনও জিনিসে হাত লাগালে হাজার টাকা জরিমানা।"

"এমন আবার হয় নাকি?" টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। জিজ্ঞাসু চোখে পার্থর দিকে তাকাল। পার্থর আগে অবনীই বললেন, "এরকম কিছু-কিছু উপজাতি কিন্তু এখনও টিকে আছে ভারতে। এই তো, লাদাখের কাছে একটা গ্রামে বাস করে আট-দশ ঘর খাঁটি আর্য

পরিবার। অসমে আছে কিছু থাইল্যান্ডের অধিবাসী। মুর্শিদাবাদ না ঢাকা কোথায় যেন কয়েকটা পর্তুগিজ পরিবারও আছে বলে শুনেছিলাম।"

মিতিন ফের কী যেন ভাবছিল। টিঙ্কুকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ট্রেকারদের মালানা যেতে কতক্ষণ লাগে?"

"এক দিনে পৌঁছনো খুব কঠিন ম্যাডাম। অনেকটা দূর। কম করে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার। রাস্তা বলতেও তো প্রায় কিছু নেই, পাহাড় ধরে এগোতে হয়।"

"ও।"

মিতিন আবার চিন্তার সাগরে। এমন গম্ভীর করে রেখেছে মুখখানা, কথা বলতে সাহস হয় না। ট্রেকিং রুটের খবর কেন নিচ্ছিল, তা জানারও উপায় নেই। অগত্যা কী আর করা, কৌতূহল গিলে প্রকৃতির শোভা দেখছে টুপুর।

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ টিঙ্কুর গলা, "একটা সওয়াল করতে পারি ম্যাডামজি?"

মিতিনের বদলে পার্থর প্রশ্ন, "কী?"

"আমি জানি, কাল নগ্গরে তসবির চুরি হয়েছে। তখন থেকেই দেখছি, ম্যাডামজির সঙ্গে পুলিশের খুব জান পহেচান। ম্যাডামজি কি এনকোয়্যারি করছেন?"

"হুম। ম্যাডাম একজন গোয়েন্দা। চোর ধরায় ওস্তাদ।"

"সচ্?" টিঙ্কুর চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। মাথা দুলিয়ে বলল, "ওউর এক বাত। ম্যাডামজি কি কোনও সর্দারকে সন্দেহ করছেন?"

"ঠিক তা নয়। তবে যারা চুরি করেছে, তারা সর্দারজি সেজেছিল। এখনও বোধ হয় সেই বেশেই আছে।"

"মণিকরণ সাহিবে তাদের ধরবেন?"

"দেখা যাক। যদি ইতিমধ্যে না ভেগে থাকে।"

"লেকিন...ওরা তো কাসোল থেকেও পালাতে পারে।"

"কাসোল?" মিতিনের ঘাড় হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো ঘুরেছে, "সেটা কোথায়?"

"এই তো, সামনেই। মণিকরণের তিন-চার কিলোমিটার আগে। ওখানেই তো দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড। দিল্লি, চণ্ডীগড়, সিমলা, কোথাকার না বাস ছাড়ে। বহুত আচ্ছা সার্ভিস। রাতে স্টার্ট করে, সকালে পৌঁছে দেয়।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ জি। কাসোল ভি বড়িয়া টুরিস্ট স্পট। পার্বতী নদী, জঙ্গল, পাহাড়, সুন্দর-সুন্দর ভিউ। অনেক ফরেনার তো মণিকরণের বদলে কাসোলেই থাকে। ভাল-ভাল লজ আছে।"

উৎসাহ নিয়ে বলছে টিঙ্কু। কিন্তু মিতিনের যেন আর আগ্রহ নেই। ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করল। কী একটা নম্বর টিপতে গিয়েও থেমেছে মাঝপথে। মোবাইল ফের ব্যাগে চালান করে আপন মনে বলল, "নাঃ, মণিকরণই যাওয়া যাক।"

তা মণিকরণ পৌঁছতে আরও আধ ঘণ্টাটাক লাগল। প্রথমেই শিখদের বিশাল গুরুদ্বার। মণিকরণ সাহিব। টিঙ্কু গাড়ি থামাবে কিনা জিজ্ঞেস করল, না বলল মিতিন। আর একটু এগোতেই পার্বতী নদীর ব্রিজ, তারপর মূল জনপদ। ছোট, তবে বেশ জমজমাট শহর। প্রচুর দোকানপাট, দু' পা অন্তর মন্দির, পথের ধারে যত্রতত্র উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করছে লোকজন। হালকা একটা গন্ধও ভাসছে বাতাসে। তুবড়ি-তুবড়ি ঘ্রাণ। নিশ্চয়ই সালফারের। চতুর্দিকে পেল্লাই উঁচু-উঁচু পাহাড় যেন জেলখানার পাঁচিল হয়ে ঘিরে রেখেছে মণিকরণকে। শুধু পুব দিকেই যা একটুকু ফাঁক। সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে হিমালয়ের বরফ চুড়ো। ওই পথেই লাফাতে-লাফাতে নামছে পার্বতী। স্রোতের কী গর্জন, বাপস!

মিতিনের নির্দেশে টিঙ্কু বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে গেল গাড়ি। দরজা খুলতে-খুলতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি এখন জায়গাটা ঘুরে দেখবে?"

সহেলি বললেন, "আগে একটু জিরিয়ে নিলে হত না?"

"পাশেই তো ধরমশালা। আপাতত ঢুকে পড়ো।"

"আমরা হোটেল নেব না?"

"সে হবে'খন। এখন ফ্রেশ তো হয়ে নাও। তারপর টাউনটা দ্যাখো।"

"আর তুই?"

"পরে জয়েন করছি।"

টুপুর মাসির সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। রয়ে গেল পার্থ আর বুমবুমও। সহেলি-অবনীকে নিয়ে রামমন্দির ধরমশালায় গেল টিঙ্কু।

বুমবুম বড়-বড় চোখে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি কি এখনই চোর ধরবে?"

"আগে একটু চা তো খাই।"

মিতিন পায়ে-পায়ে বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানটায় ঢুকল। টুপুর আর বুমবুমকে চিপ্‌স কিনে দিয়ে পার্থর সঙ্গে চুমুক দিচ্ছে মশলাদার চায়ে। আয়েশ করে। সামনেই একটা বাস দাঁড়িয়ে। প্রায় ফাঁকা। একটা-একটা করে লোক উঠছে। এক অল্পবয়সি পাহাড়ি ছেলে যাত্রীদের মালপত্র তুলে দিচ্ছে ছাদে। বাসটাকে দেখতে-দেখতে মিতিন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "এটা যাচ্ছে কোথায়?"

"কুলু। আখারা বাজার।"

"ছাড়বে কখন?"

"টাইম তো সাড়ে তিনটে। তবে লাস্ট বাস তো, গাড়ি বোঝাই না হলে নড়বে না।"

"সে কী? সাড়ে তিনটের পরে আর বাস নেই?"

"একটা ছিল। তার ইঞ্জিন গড়বড় করছ। আজ যাবে না।"

"ও।"

মিতিন আবার নির্লিপ্ত মুখে চুমুক মারছে কাচের গ্লাসে। টুপুর খানিক অসহিষ্ণু স্বরে বলল, "আমরা এখানে বসে আছি কেন?"

"চান্স নিচ্ছি।"

"কিসের চান্স?"

"আলটপকা আশমান থেকে যদি কিছু খসে পড়ে!"

পার্থ গজগজ করে উঠল, "ফালতু টাইম নষ্ট করছ কিন্তু। এভাবে গা এলিয়ে দিলে কালপ্রিটদের হদিশ পাবে?"

"তা হলে কী করা উচিত শুনি?"

"গুরদোয়ারায় গিয়ে খোঁজ নাও।"

"কীভাবে?"

"এই যেমন ধরো, লোক দু'টো যদি কাতরেইন থেকে তিনটে-সাড়ে তিনটেয় রওনা দেয়, তা হলে তারা এখানে কখন পৌঁছেছে? অ্যারাউন্ড সন্ধে সাত-আটটা? আমরা যদি গুরদোয়ারায় গিয়ে চেক করি, সন্ধে সাতটার পর কারা কারা এসেছে।"

"প্রথমত, তারা অ্যালাও করবে কেন? দ্বিতীয়ত, যদি তোমার আবদার শুনে পুলকিত হয়ে নামধাম জানায়ও, দেখে কিছু বোঝা যাবে কী? নাকি তুমি জনে-জনে ডেকে দাড়ি টেনে দেখবে?"

বুমবুম হি হি হাসছে। পার্থ গুম। দু'-চার সেকেন্ড পরে ফের বলল, "তবু...ওই গুরদোয়ারাই কিন্তু লুকনোর আসলি জায়গা। ওখানে প্রচুর লোক থাকে। তা ছাড়া ভিতরে যদি না-ও যাই, সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। দু' মক্কেল যদি ভুলক্রমেও তখন গুরদোয়ারা থেকে বেরোয়..."

"অমনি তাদের চিনে ফেলবে? সকালের স্কেচ দু'টোয় মনে-মনে দাড়ি-পাগড়ি লাগিয়ে?"

"তা হলে তুমি চাইছটা কী? মণিকরণে এলে কেন?"

টুপুর বলল, "অন্তত পুলিশের কাছে চলো। তারপর তাদের নিয়ে..."

"অ্যাই, চুপচাপ বসবি? না পোষায় তো তোরা দু'জনে সোজা উষ্ণ কুণ্ডে যা। গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে থাক। চমৎকার মাসাজ হবে।"

টুপুর গোঁজ হয়ে গেল। পার্থ রেগেমেগে দোকানের বাইরে। গোমড়া মুখে আকাশ দেখছে। ঠিক তখনই ভোজবাজি!

মিতিন তড়াক লাফিয়ে উঠেছে বেঞ্চি ছেড়ে। তির বেগে ছুটছে

বাসটার দিকে। গালপাট্টাধারী এক রোগা সর্দারজি পাহাড়ি ছেলেটাকে একটা বোঁচকা দিচ্ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরেছে লোকটার হাত। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, "নবীন তারকুণ্ডে, ইয়োর টাইম ইজ ওভার।"

চমকে তাকিয়েছে লোকটা। পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে চোখা হিন্দিতে তেড়ে উঠল, "কে তারকুণ্ডে? আপনিই বা কে?"

"চালাকি করবেন না তারকুণ্ডে। কড়াটা আপনি অন্য হাতে পরেছেন। প্রকৃত শিখ কখনও এই ভুলটা করে না।"

লোকটা আরও চমকেছে। পরিবর্ত ক্রিয়াতেই বুঝি কড়াখানা লুকোতে চাইল। খিঁচিয়েও উঠেছে সঙ্গে-সঙ্গে, "কী আজেবাজে বকছেন?"

আর একজন স্বাস্থ্যবান সর্দারজি একটু তফাতে ছিল। তড়িঘড়ি এগিয়ে এসেছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, "হচ্ছেটা কী এখানে? তীর্থস্থানে এসে আপনি আমাদের সঙ্গে অসভ্যতা করছেন?"

প্রথমজন আঙুল তুলে শাসাল, "যান-যান এখান থেকে। নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।"

"তড়পে লাভ নেই। গোটা বাসস্ট্যান্ড পুলিশ ঘিরে রেখেছে। মানে-মানে দু'জনে সারেন্ডার করেন তো ভাল। নইলে..."

"কী করবেন, অ্যাঁ?"

সম্ভবত রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল তারকুণ্ডে, তবে সময় পেল না। জনা পাঁচেক সাদা পোশাকের পুলিশ ঝটিতি ঘিরে ফেলেছে দুই মূর্তিমানকে। মুহূর্তে পরিয়ে দিল হাতকড়া। টানতে-টানতে নিয়ে চলেছে থানায়।"

মিতিন পার্থকে ঠেলল, "এবার নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি টেনে দেখতে পার।"

টুপুর হতভম্ব মুখে বলল, "তু-তু-তুমি...পুলিশকে কখন...?"

মিতিন হাত ঝাড়ছে। টুপুরের গালে আলতো টোকা দিয়ে বলল, "এখনও অনেক কিছু দেখতে পাবি রে।"

॥ ১১ ॥

একটার পর-একটা ঘটনা ঘটেই চলেছে নাটকীয় ভাবে। টুপুররা থানায় পৌঁছতে না-পৌঁছতে হঠাৎ আশুতোষ শাহের উদয়। তিনি নাকি মিতিনদের পর-পরই রওনা দিয়েছিলেন কুলু থেকে। পথে গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ায় এইমাত্র এসে পৌঁছলেন। মিতিনমাসির সঙ্গে বাক্যালাপে বোঝা গেল, তাঁর নির্দেশেই মণিকরণের পুলিশ আজ তৎপর ছিল। কোথায় কখন কী ভাবে পুলিশকে হাজির থাকবে হবে, তাও নাকি এস পি সাহেবকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল মিতিনমাসি। কুলু ছাড়ার আগেই। শুধু কোন ফাঁকে যে মিতিনমাসি ফোনটা করেছিল, সেটা এখনও টুপুরের অজানা। ইস, কেন যে টুপুর প্রতিটি মুহূর্তে মাসিকে অনুসরণ করতে পারে না!

এখন শুরু হয়েছে আর একপ্রস্থ নাটক। রীতিমতো পিলে চমকানো। তারকুণ্ডে আর ভাটিয়ার ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলেছে পুলিশ, তল্লাশির পালাও শেষ। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মণিকরণ থানার ও সি সুদেশ বাংরু। তন্নতন্ন করে হাতড়েও তিনি তারকুণ্ডেদের কাছ থেকে ছবিগুলো বের করতে পারেননি।

আশুতোষ শাহ ধমকে উঠলেন, "চোর ধরা পড়ল, অথচ তাদের কাছে ছবি নেই, এ হতে পারে?"

"ওদের বডি পর্যন্ত সার্চ করলাম স্যার। ব্যাগ থেকে শুধু তিন বানডিল ডলার মিলেছে। মোট তিরিশ হাজার। গুনে দেখেছি।"

"এত ডলার পেল কোত্থেকে?"

"দু'টোই খুব পাজি, কিছুতেই মুখ খুলছে না।"

"সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না, আঙুল বেঁকান। রুলের গুঁতো দিন।"

"সে কী আর বলতে হবে স্যার? কিন্তু দু'জনেই যেন ঠোঁটে তালা লাগিয়েছে।"

"প্রেশার জারি রাখুন। একদম ঢিলে দেবেন না।"

"ওকে স্যার।"

সুদেশ বাংরু বেরিয়ে যেতেই আশুতোষের গলা থেকে একরাশ হতাশা ঝরে পড়ল, "যাঃ, লোক দু'টোকে ধরা কি তা হলে বৃথা গেল ম্যাডাম?"

মিতিনের কোনও হেলদোল নেই। অবিচলিত স্বরে বলল, "তা কেন মিস্টার শাহ? চুরির প্রমাণ তো মিলেছে।"

"কোথায়?"

"ডলারগুলো! ছবির বিনিময়ে ওদের যা জুটেছে।"

"অর্থাৎ ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছে বলছেন?"

"অবশ্যই। ছবি এখন মূল অপরাধীর জিম্মায়।"

"সর্বনাশ, তাকে এবার পাব কোত্থেকে?"

"টেনশন করবেন না, সে বাছাধন এখনও পালায়নি।"

"মণিকরণেই আছে?"

"উহুঁ। কুলুতে। আপনার বাংলোর এক-দু' কিলোমিটারের মধ্যেই।"

"মানে?"

"পুরোটা জানতে হলে এক্ষুনি যে আমাদের কুলু যেতে হবে মিস্টার শাহ।"

ওসির চেয়ারে বসে ছিলেন আশুতোষ। তড়াক লাফিয়ে উঠেও কুণ্ঠিত মুখে বললেন, "কিন্তু ম্যাডাম, সন্ধে নেমেছে। অন্ধকারে এখন কুলু যাবেন? তা ছাড়া সারাদিন আপনাদের যা ধকল চলছে..."

"উপায় নেই স্যার। রাত পোহালেই পাখি উড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।"

"তাই নাকি?" আশুতোষের ভুরুতে ভাঁজ, "আপনি শিওর, ছবি পাওয়া যাবে?"

"একশো শতাংশ নিশ্চিত।"

"কুলুতে ঠিক কোথায় যাবেন বলুন তো?"

"বিভব শর্মার ডেরায়।"

শুনেই বেজায় চমকেছেন আশুতোষ। পরক্ষণে দৃষ্টিতে একটা জিঘাংসার ভাব ফুটে উঠল, "তাই বলুন। শর্মাই তা হলে কালপ্রিট! আমারও লোকটার উপর সন্দেহ ছিল।"

মিতিনের ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, "চলুন তা হলে। আমিও আমার ব্যাটেলিয়ানকে রেডি করে ফেলি।"

থানা থেকে বেরনোর আগে উঁকি দিয়ে একবার তারকুণ্ডেদের দেখে এল টুপুর। অবিকল বৈজনাথের স্কেচের মতো না হলেও চেহারায় অনেকটাই মিল। মুন্ডু ঝুঁকিয়ে গারদে বসে আছে লোক দু'টো, সামনে সুদেশ বাংরু কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে।

বুমবুমও গিয়েছিল টুপুরের সঙ্গে। চোখ বড় করে বলল, "এরা তা হলে আসল চোর নয়?"

"উঁহু। এদের একজন বস আছে, আমরা এখন তাকে ধরতে যাব।"

"মানে কটেজের মালিকটাই?"

"হ্যাঁ রে।"

ঘাড় নেড়ে টুপুর বলল বটে, কিন্তু এখনও তার ধন্দ কাটছে না। সত্যি বলতে কী, মাসির কাজের ধারা এবার যেন কেমন-কেমন! ধরে নেওয়া যাক, বিভব শর্মার হাতে ছবি জমা দিয়ে তারকুণ্ডেরা মণিকরণে গা ঢাকা দিতে এসেছিল এবং এখান থেকেই কাসোল-টাসোল হয়ে চম্পট দিত দু'জনে। একেবারে হিমাচল প্রদেশের বাইরে। আর সেটা ঠেকাতেই বুঝি মিতিনমাসির তড়িঘড়ি মণিকরণে গমন। কিন্তু ছবিসমেত বিভব শর্মাকে মুঠোয় না পুরে আগে তারকুণ্ডে-ভাটিয়াকে তাড়া করা কেন? পাখি উড়ে যাওয়া ব্যাপারটাই বা কী? বিভব শর্মা পালাবেন নাকি? লোকটার মতলব কীভাবে আগাম অনুমান করল মিতিনমাসি? কোনও ক্লু পেয়েছে? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ভালমানুষের মুখোশ পরা বিভব শর্মাকে ছবিচুরি-চক্রের পান্ডা হিসেবে সন্দেহ করছে, এটাও মিতিনমাসি কাউকে ঘুণাক্ষরে টের পেতে দিল না? উলটে শর্মার হয়ে সাফাই গাইছিল!

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফের টিঙ্কুর রথে আরোহণ। টুপুররা ফিরছে কুলুতে। সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে আশুতোষ শাহের জিপ। পাইলট-কারের মতো। কোজাগরী পূর্ণিমার

চাঁদও চলেছে সঙ্গে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দর্শন দেয় হঠাৎ-হঠাৎ, আবার হারিয়েও যায়। লুকোচুরি খেলছে যেন। অন্ধকারের নির্জনতায় পার্বতীর আওয়াজও বুঝি বেড়ে গিয়েছে চতুর্গুণ। যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

বাইরে কনকনে ঠান্ডা। জানলার বন্ধ কাচ বাষ্প মেখে ঝাপসা। টুপুর তবু ওই কাচেই চোখ রেখে বাইরেটা দেখছিল। বাকিরা কেউ ঢুলছে, কেউ বা নিছকই চোখ বুজে বসে। সত্যি তো, একদিনে এত ছোটাছুটি কারও পোষায়! আজই মণিকরণ ছাড়তে হবে শুনে সহেলি তো প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন, এখনও তাঁর মুখে সেই অসন্তোষের ছোঁয়া। অবনীর নিশ্চিন্ত ঢুলুনি দেখে রাগটা বুঝি আরও বেড়ে গেল। গুমগুমে গলায় বলে উঠলেন, "কুলুতে তো হোটেল মেলার চান্স নেই। সুতরাং আজ নিশ্চয়ই গাড়িতেই রাত্রিবাস?"

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না-না, মিস্টার শাহের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন।"

"কোথায়? হাজতে?"

"যাঃ, কী যে বলেন!" পার্থ হেসে ফেলল, "আমরা উঠব সার্কিট হাউসে। ভি আই পি আস্তানায়। আরামসে ঘুমোতে পারবেন।"

"সে কপাল কী করে এসেছি! মিতিনের যদি বাই চাপে, তো রাত দু'টোয় হয়তো রওনা হতে হল কোথাও!"

"টেনশন করবেন না দিদি। মিতিনের বায়না আর শুনবই না। রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে কাল আমরা মানালি যাব। যাবই।"

যাকে নিয়ে সহেলির এত গজগজ, সেই মিতিন কিন্তু নিশ্চুপ। ঝড়ের আগে আকাশের মতো থমথম করছে তার মুখখানা। গাড়ি কুলুতে ঢোকার পর টানটান হয়ে বসল। বিভব শর্মার কটেজে চার চাকা থামতেই তড়াং নেমেছে। আশুতোষ শাহের সঙ্গে সোজা গেট ঠেলে অন্দরে। পিছনে দমচাপা উত্তেজনা নিয়ে টুপুর আর পার্থ।

আশুতোষকে দেখে বিভব শর্মার মুখ নিমেষে পাংশু। আমতা-আমতা করে বললেন, "স্যার, আপনি...? ম্যাডামের সঙ্গে...?"

"ভেবেছেন কী, অ্যাঁ? কুলুর মানুষ হয়ে বদমতলব আঁটছিলেন?" আশুতোষ গর্জে উঠেছেন, "বের করুন, বের করুন ছবিগুলো।"

"ছ-ছ-ছবি... কী ছবি?"

"ন্যাকা সাজবেন না। আপনি তো নাটের গুরু।"

"কী বলছেন স্যার? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"এক মিনিট। আমি বলছি," আশুতোষকে টপকে মিতিন সামনে এল। কেজো গলায় বিভব শর্মাকে বলল, "আপনার সেই ইটালিয়ান সাহেবটি এসেছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। বিকেলেই পৌঁছে গিয়েছেন। সাড়ে চারটে নাগাদ।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"রুমে। এসেই বললেন তাঁকে যেন বিরক্ত করা না হয়। রাত দশটায় উনি নীচে নেমে ডিনার সেরে যাবেন।"

"কোন ঘরটায় আছেন উনি?"

"বাঁ দিকেরটায়। কেন ম্যাডাম?"

জবাব না দিয়ে মিতিন আশুতোষকে ডাকল, "চলুন। চটপট।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় টোকা দিল মিতিন। মিনিট দুয়েক পর পাল্লা খুলল। নীলচে চোখ, টকটকে রং, মাঝারি উচ্চতার রবার্তো জোয়ান্নি একবার মিতিনকে দেখলেন, একবার সুট-টাই পরিহিত আশুতোষকে। রুক্ষ স্বরে বললেন, "কী চাই?"

"আপনাকেই," মিতিনের সপ্রতিভ উত্তর, "ভিতরে যেতে পারি?"

"অবশ্যই না। আমি এখন ব্যস্ত আছি।"

"কিন্তু আমাদের যে ঢুকতে দিতে হবেই মিস্টার জোয়ান্নি। আপনার ঘরটা তল্লাশ করা যে খুবই জরুরি।"

"কেন?" এবার রবার্তো যেন নাড়া খেয়েছেন। চোখ সরু করে বললেন, "কে আপনারা?"

আশুতোষ শাহকে দেখিয়ে মিতিন বলল, "ইনি কুলু ডিস্ট্রিক্টের সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। আমাদের কাছে খবর আছে, আপনি নিকোলাস রোয়েরিখের তিনখানা ছবি চুরি করিয়েছেন। এখন কি মানে-মানে ছবিগুলো ফেরত দেবেন? নাকি আমরাই খুঁজে নেব?"

রবার্তো মন দিয়ে শুনলেন কথাগুলো। তারপর হঠাৎই হা হা হেসে উঠেছেন, "কী আজগুবি অভিযোগ! আমি একজন ভারতপ্রেমী বিদেশি। ওই ধরনের নোংরা কাজ আমি কখনও করতে পারি?"

রবার্তোর বাচনভঙ্গিতে আশুতোষ বেশ হকচকিয়ে গিয়েছেন। অস্বস্তি ভরা চোখে তাকাচ্ছেন মিতিনের দিকে। যেন বলতে চাইছেন, মিতিনের কোনও ভুল হয়নি তো?

মিতিন কিন্তু অটল। ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি তা হলে রুম সার্চ করতে বাধ্য করছেন?"

"না-না, আপনারা দেখতেই পারেন। প্লিজ কাম ইনসাইড। আমার সামান্য লাগেজ তো সামনেই পড়ে। খুলে দেখে নিন।"

সত্যিই মালপত্র তেমন নেই রবার্তোর। একটা ক্যামেরার ব্যাগ আর একখানা হ্যাভারস্যাক। ঈষৎ দ্বিধা নিয়ে আশুতোষ হাত লাগালেন অনুসন্ধানে। পার্থও। ক্যামেরার ব্যাগ থেকে বেরোল ভাঁজ করা তেপায়া স্ট্যান্ডসহ একটি অতি মূল্যবান ডিজিটাল ক্যামেরা। সঙ্গে খাপে একগুচ্ছ টেলিলেন্স। হ্যাভারস্যাকে রয়েছে সাহেবের জামাকাপড়, বই আর দৈনন্দিন ব্যবহারের কিছু টুকিটাকি। আসল জিনিসগুলো না পেয়ে আশুতোষ খুলে-খুলে দেখছেন ওয়ার্ড্রোব, ড্রয়ার, ড্রেসিংটেবিল। পার্থ ছুটল বাথরুমে। সিস্টার্নের ঢাকা, গিজারের মাথা। কিছুই নিরীক্ষণ করতে ভুলল না। টুপুর উঁকি দিল নিভে থাকা ফায়ারপ্লেসের অন্দরে। খাট, বিছানা, সরিয়ে-সরিয়েও দেখলেন আশুতোষ। নাঃ, ছবিগুলো কোথাও নেই।

চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছিলেন রবার্তো। বললেন, "এখনও কিন্তু কার্পেট তুলে দেখা হয়নি। আমি কি হেল্প করব?"

আশুতোষের মুখ লাল। হিন্দিতে চাপা গলায় মিতিনকে বললেন, "এইভাবে আমাকে বেইজ্জত করার কোনও মানে হয়?"

মিতিন রা কাড়ল না। আস্তে-আস্তে ক্যামেরাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাড় হেলিয়ে রবার্তোকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বুঝি প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার?"

"পুরোপুরি নই। তবে ফোটো তোলা আমার নেশা।"

"ও," মিতিন তেপায়া স্ট্যান্ডখানা হাতে তুলে নিল, "পাহাড়ের ফোটো তুলতেও কি আপনি স্ট্যান্ড ব্যবহার করেন?"

"কখনও-সখনও করি বইকি। সানরাইজ, সানসেটের সময়ে ওটা খুব কাজে লাগে।"

ঝপ করে একটা পায়ার তলায় হাত রাখল মিতিন। চাড় দিয়ে ঘোরাতেই খুলে গিয়েছে পায়া। ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে বের করল একখানা ছবি। রোল করে পোরা ছিল পায়াটায়।

পাকানো ছবিটা খুলতে-খুলতে মিতিন বলল, "কায়দাটা ভালই নিয়েছিলেন মিস্টার জোয়ান্নি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।"

রবার্তোর মুখ-চোখ পলকে বদলে গিয়েছে। দৃষ্টি দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে যেন। হিংস্র রাগে মিতিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, ত্বরিত পায়ে সরে গেল মিতিন। সঙ্গে-সঙ্গে আশুতোষের হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। সেফটি ক্যাচ তুলে দিয়ে বললেন, "ডোন্ট মুভ। একচুল নড়লে গুলি করতে বাধ্য হব।"

ক্যামেরা স্ট্যান্ডের বাকি দু'টো পায়া থেকে মিতিন বের করল আরও দু'খানা পেন্টিং। তার হাতে যেন এখন তিন টুকরো হিমালয়। জলরঙে আঁকা। প্রতিটি ছবির তলায় নিকোলাস রোয়েরিখের স্বাক্ষর।

মিতিন বিদ্রুপের সুরে বলল, "রাতটা আর সকাল হল না মিস্টার জোয়ান্নি। ভুন্টার থেকে কাল ভোরের ফ্লাইট আপনাকে ছাড়াই উড়বে। শুনে কষ্ট পাবেন, তিরিশ হাজার ডলার সমেত আপনার দুই এজেন্টও এখন পুলিশের হেফাজতে।"

রবার্তো জোয়ান্নি ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। তাঁর কাঁধ দু'খানা ঝুলে গিয়েছে।

॥ ১২ ॥

রোটাং পাসের পথ যথেষ্ট দুর্গম। রাস্তাটা অসম্ভব খাড়াই এবং বেশ

ভাঙাচোরা। টিঙ্কুর প্রাণপণ চেষ্টাতেও গতি বাড়ছিল না, গোঁক-গোঁক করছে গাড়ি। একটা করে বাঁক পেরোয়, চরকি খেয়ে যায় মাথা। একই সঙ্গে খুলে যায় হিমালয়ের নব-নব রূপ।

অবশেষে কাল বিকেলে মানালি পৌঁছেছে টুপুররা। উঠেছে একটি চমৎকার হোটেলে। হিড়িম্বা টেম্পলের কাছে। আবার ম্যাল, বিপাশাও দূরে নয়। ঘরের জানলা খুললেই পিছনে এক আপেল-বাগান। লাল আভা মাখা সোনালি আপেল গাছ থেকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। তার ওপারে হিমালয়। সার-সার বরফে ঢাকা চুড়ো যেন পাহারা দিচ্ছে সুন্দরী মানালিকে। এসেই কাল রাতে টুপুররা গিয়েছিল বিপাশার পারে। সেও এক মনোহর অভিজ্ঞতা। চাঁদের কিরণে ঝিকঝিক করছে বিপাশা। যেন কুচি-কুচি হিরে ভাসছে স্রোতে। জ্যোৎস্না মেখে বরফে ঢাকা পাহাড়ও কী স্নিগ্ধ তখন!

মানালি আসার পথে টুপুরদের আর একবার যেতে হয়েছিল নগ্গর। আশুতোষ শাহ আর কিষানলাল দুগ্গারের সনির্বন্ধ অনুরোধে। এমন চর্বচোষ্য খাওয়া হল, পার্থমেসোর প্রায় হাঁসফাঁস দশা। মিতিন উপহার পেল স্থানীয় শিল্পীর আঁকা হিমালয়ের একখানা ছবি। কিষানলাল নাকি রোয়েরিখ মেমোরিয়াল ট্রাস্টে আবেদনও রেখেছেন, নিকোলাসের পেন্টিং উদ্ধারের জন্য যেন একটা সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় মিতিনকে। থার্ড আইয়ের কার্ডও রেখে দিলেন কিষানলাল। আর আশুতোষ শাহ উদ্যোগ নিয়েছেন মিতিনকে একটা সংবর্ধনা জানানোর। হিমাচল প্রদেশ সরকারের তরফ থেকে। সম্ভবত ফেরার সময়ে টুপুরদের আর একবার থামতে হবে কুলুতে।

সে যাই হোক, সকলেরই মন আজ খুশিতে ঝলমল। পথের কষ্ট কেউ গায়েই মাখছেন না। সহেলি পর্যন্ত ঠাট্টা-ইয়ার্কি জুড়েছেন অবনীর সঙ্গে। বুমবুমও আজ মোবাইল গেমে মত্ত নয়। হিমালয়ের এমন অমোঘ টান, সেও মোহিত হয়ে দেখছে পাহাড়-পর্বত।

পার্থ নিজের জায়গায়। সামনের সিটে। ঝাঁকুনি খেতে-খেতে একটু আগে গান ধরেছিল, আকাশভরা সূর্যতারা। তার বেসুরো গলা শুনে টিঙ্কুও হেসে খুন। সঙ্গীত ছেড়ে পার্থ এবার মজায় মেতেছে। হঠাৎই টুপুরকে বলল, "তোর মাসির কিন্তু হেভি ক্যালি। হিমালয়ে এসেও একটা কেস জুটিয়ে ফেলল তো!"

টুপুর বলল, "মেন ক্রেডিটটা কিন্তু বুমবুমের। ভাগ্যিস ও পেনড্রাইভখানা পেয়েছিল!"

"আরে, শুধু পেনড্রাইভেই হয়? ওই পেনড্রাইভ খেলিয়ে-খেলিয়ে কেমন একটা কেস বানিয়ে নিল। সেটা একবার ভাব। সাধে কী বলি, তোর মাসির মাথায় জিলিপির প্যাঁচ!"

টুপুর হি হি হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "একটা প্রশ্ন কিন্তু তোমায় করা হয়নি মাসি।"

মিতিন স্মিত মুখে বলল, "কী রে?"

"ওই জোয়ান্নি সাহেব তোমার সন্দেহের তালিকায় ঢুকলেন কীভাবে? বিভব শর্মার কটেজে আসছেন শুনেই কি...?"

"ঠিক তা নয় রে। নামটা মাথায় রয়ে গিয়েছিল। আর্ট গ্যালারির রেজিস্টারে পেশাদার ফোটোগ্রাফারদের তালিকায় ওই নাম চোখে পড়তে সন্দেহটা দানা বাঁধে। তারপর যেই শুনলাম, তারকুণ্ডেদের ঘরভাড়া ক্রেডিট কার্ডে মেটানো হয়েছে, তখনই বুঝলাম, অন্য কেউ টাকা পাঠিয়েছে। কারণ, অত টাকা দেওয়া তারকুণ্ডেদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত তাদের স্টেটাস তাই বলে। পরে তো বিভব শর্মার কাছ থেকে বিল নিয়ে দেখাও গেল, ওদের আর রবার্তো জোয়ান্নির ক্রেডিট কার্ডের নম্বর এক।"

"হ্যাঁ। মিস্টার শাহ তো দু'খানা স্লিপই সিজ করলেন।"

"তারকুণ্ডে-ভাটিয়ার সঙ্গে রবার্তোর যোগাযোগের ওটাই তো মোক্ষম প্রমাণ রে।"

আলোচনার মাঝে সহেলি ধমকে উঠেছেন, "অ্যাই, তোরা কেসের গপ্পো থামাবি? এমন সুন্দর প্রকৃতির মাঝে চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে বকর-বকর ভাল লাগে?"

হক কথা। টুপুর থেমে গেল। হেঁচকি তুলে টুপুরদের গাড়িও থেমেছে। রোটাং পাসের মাথায়।

গাড়ি থেকে নামল টুপুর। সঙ্গে-সঙ্গে কনকনে হাওয়ার প্রবল ঝাপটা। গিরিপথ বেয়ে কী জোর বাতাস বইছে রে বাবা! ঝটিতি কুলু-টুপিতে টুপুর ঢেকেছে কান-মাথা। গলা পর্যন্ত টেনে দিল ফুলহাতা পশম জ্যাকেটের জিপার। তবু যেন বাধা মানছে না, হাড়ে গিয়ে বিঁধছে হিমকণা।

টুপুর কোনওক্রমে স্থিত করল নিজেকে। অমনি চোখ জুড়ে এক অনবদ্য দৃশ্য। দু' সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কত দূর যে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে গিরিপথ! ওই পথ দিয়েই বুঝি এক সময় বাণিজ্যে যেত বণিকের দল! ওই রাস্তা দিয়েই কত যে মানুষ প্রথম পা রেখেছে ভারতের মাটিতে!

ভাবতে গিয়ে দুম করে নিকোলাস রোয়েরিখকে মনে পড়ল টুপুরের। নিকোলাস সাহেব এই সব রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। পায়ে হেঁটে। পাহাড়কে ভালবেসে রয়ে গিয়েছিলেন এই দেশে। আর এই হিমালয়কেই তিনি এঁকে গিয়েছেন জীবনভর।

হায় রে, কেন যে রবার্তো জোয়ান্নিরাও আসে এই দেশে!

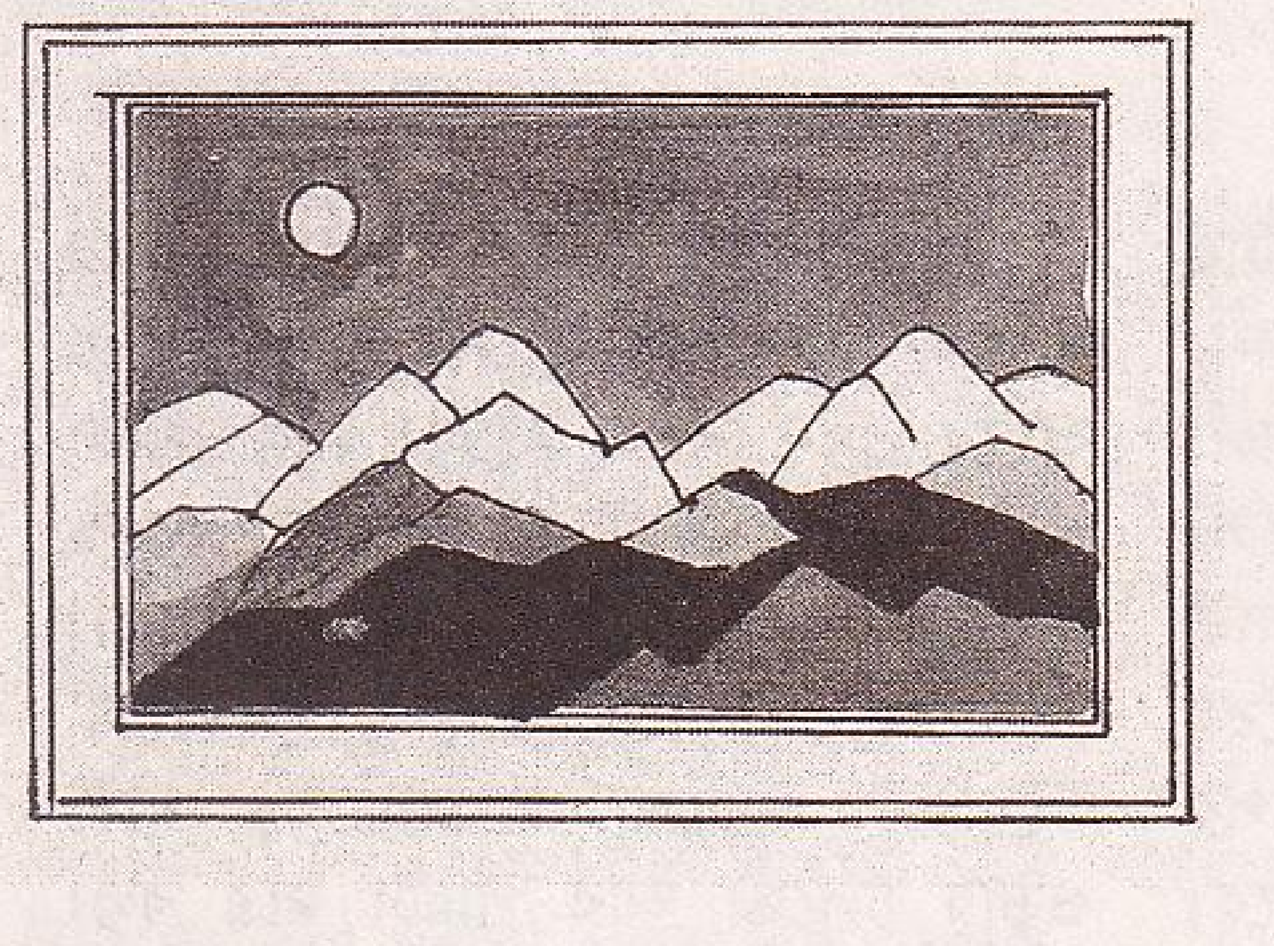

সম্পূর্ণ উপন্যাস

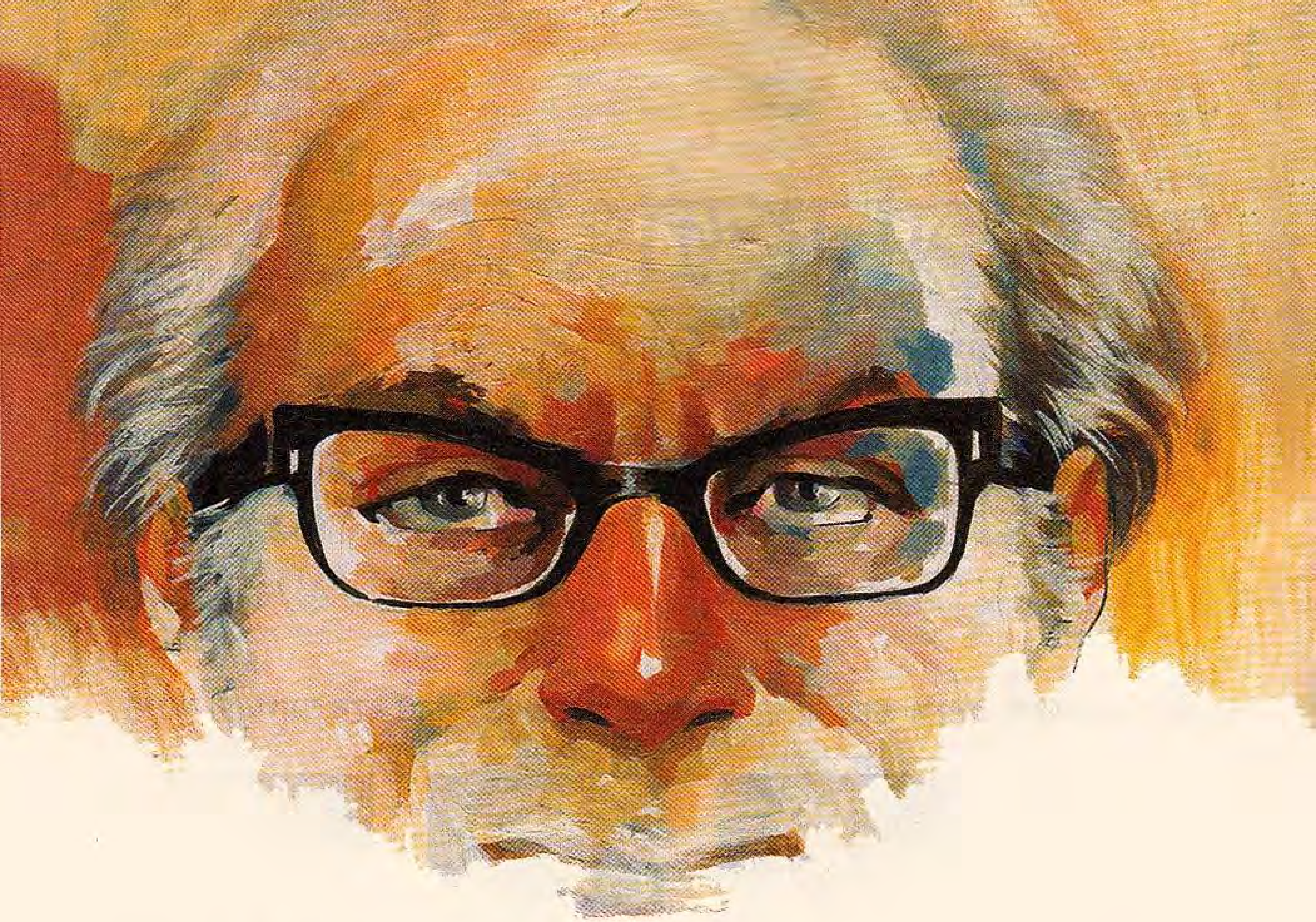

মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এবার গরমের ছুটিতে মিতিনমাসির বাড়িতে বেড়াতে এসে ভারী ফাঁপরে পড়েছে টুপুর। ভেবেছিল শুয়ে-বসে-গড়িয়ে বেশ কেটে যাবে দিনগুলো। আয়েশ করে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, চলবে অফুরন্ত গল্প-আড্ডা, শখ করে নিত্যনতুন পদ রাঁধবে মিতিনমাসি, মাঝেমধ্যে হোটেল-রেস্তরাঁয় ভূরিভোজ খাওয়াতে নিয়ে যাবে পার্থমেসো। আর যদি কোনও কেস-টেস এসে গেল তো সোনায়

সোহাগা। উত্তেজনার আঁচে সেঁকে নিতে পারবে নিজেকে। কিন্তু কোথায় কী? মিতিনমাসির হাত এখন বেবাক ফাঁকা এবং এক আজব ভূত চেপেছে মাথায়। টুপুর নাকি বেজায় প্যাংলা হয়ে যাচ্ছে, তার শরীরস্বাস্থ্য মজবুত করা নাকি বেজায় জরুরি। ব্যস, ভাবামাত্র কাজ। তৈরি হয়ে গেল টুপুরের ডেলি রুটিন। আর তারই জের সামলাতে বেচারা টুপুরের রীতিমত নাজেহাল দশা।

কী যে সব ফতোয়া জারি করেছে মিতিনমাসি! কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটায় শয্যাত্যাগ, আদা-গুড় ভেজানো ছোলা সহযোগে খানিক কাঠবাদাম ভক্ষণ, তারপর বেরিয়ে পড়ো মাসির সঙ্গে প্রভাতী ভ্রমণে। নামেই ভ্রমণ, আসলে হাড়ভাঙা খাটুনি। পেল্লাই রবীন্দ্র সরোবরটিকে হনহনিয়ে দু'বার পাক মারা, তারপর হরেকরকম শারীরিক কসরত...। বাড়ি ফিরে দুধ-কর্নফ্লেক্স, ডিমসেদ্ধ, কলা। দু' ঘণ্টা পরে ফলের রস। দুপুরে প্রচুর শাকসবজি, কম তেলমশলার মাছ, সঙ্গে এক বাটি টক দই। বিকেল চারটেয় এক ঘণ্টা যোগাসন। ফের ফল-দুধ। লুচি-পরোটা-চপ-কাটলেট একেবারে বন্ধ। তার বদলে স্টু-সুপ কিংবা ইডলি-ফিডলি গোছের কিছু। নৈশাহারেও প্রায় একই ধরনের অখাদ্য। তাতেও মুক্তি নেই, খাওয়ার পর ফ্ল্যাট-বাড়ির ছাদে গিয়ে হাঁটতে হচ্ছে আধঘণ্টা। বুমবুম তো খাবার দেখলেই ওয়াক তুলছে। একমাত্র পার্থমেসোরই কোনও হেলদোল নেই। প্রেসে গিয়ে মোগলাই-খানা সাঁটাচ্ছে দেদার, শুধু বাড়িতে ভালমানুষটি সেজে থাকছে। এমন একটা গরমের ছুটি এ বাড়িতে কখনও কাটেনি টুপুরের। সাত দিনেই মনটা পালাই-পালাই করছে।

আজও সকালটা একই ভাবে শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্র সরোবরে চক্কর কেটে, ব্যায়াম-ট্যায়াম করতে-করতে জিভ প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। গাছে-গাছে কোকিল ডাকছে, ফুরফুরে হাওয়াও দিচ্ছে, কিন্তু টুপুর যেন কিছু টের পাচ্ছিল না। খানিক তফাতে লাফিং ক্লাবের এক দল সদস্য বিকট কায়দায় হাসির অনুশীলন চালাচ্ছে, সেদিকেও তাকানোর অবকাশ নেই। ঘামে ভিজে জ্যাবজ্যাবে হয়ে গেছে তার ট্র্যাকসুট, তবু মাসির নির্দেশ মতো হাত-পা ছুড়ছে এক মনে।

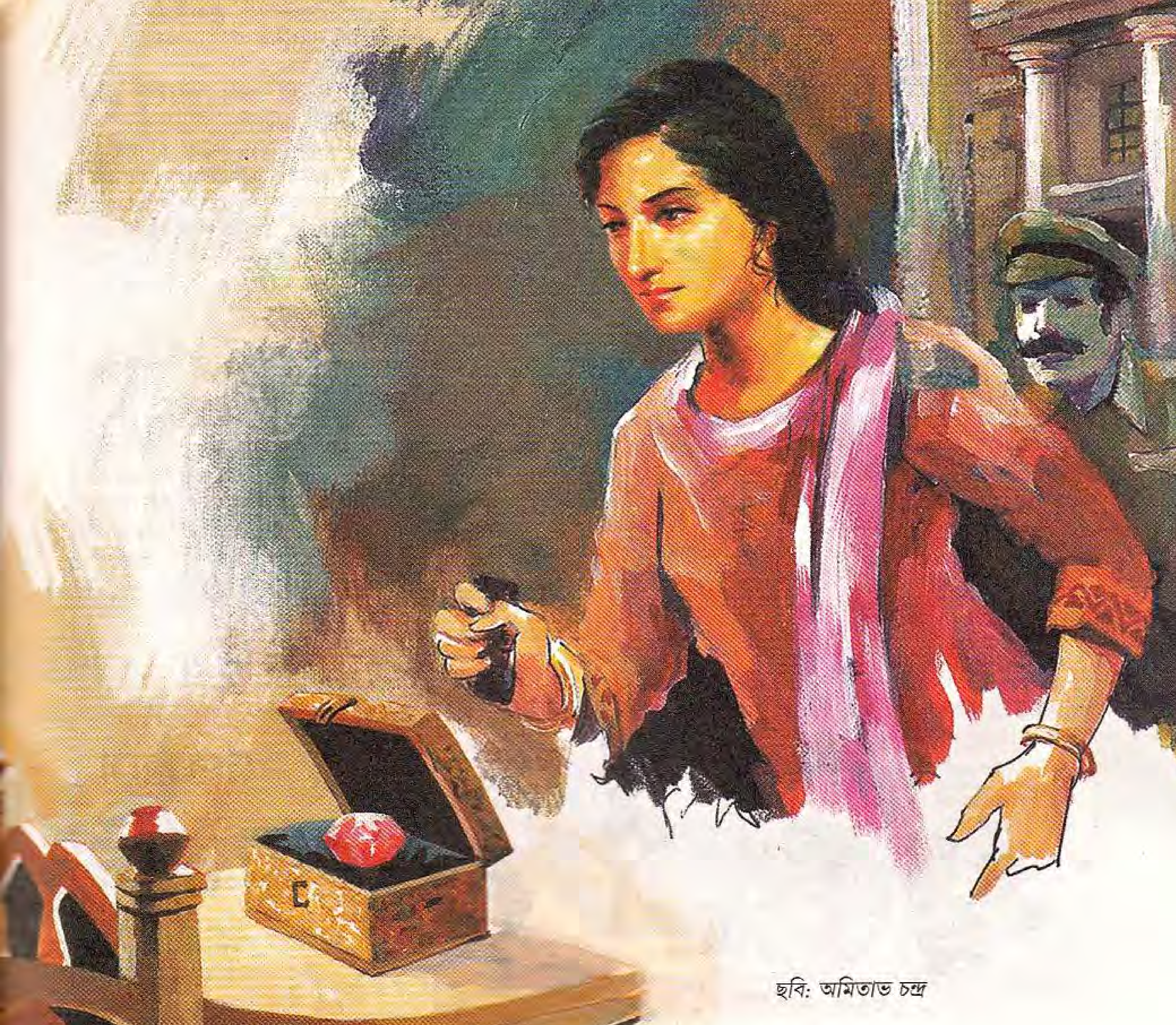

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

হঠাৎই শরীরচর্চায় বিঘ্ন ঘটল। বড়-বড় পা ফেলে কে উনি আসছেন এদিকে? অনিশ্চয় আংকল না?

হ্যাঁ, জাঁদরেল পুলিশ অফিসার অনিশ্চয় মজুমদারই বটে। একেবারে সামনে এসে একগাল হাসলেন অনিশ্চয়, "জানতাম ম্যাডামকে এখানেই পাব।"

মিতিন ধনুকের মতো বাঁকাচ্ছিল দেহটাকে। সিধে হয়ে বলল, "সুপ্রভাত। আপনি হঠাৎ লেকে যে বড়? মর্নিংওয়াক ছেড়ে দিয়েছিলেন না?"

"আবার ধরেছি। মধ্যপ্রদেশটা যে হারে বেড়ে চলেছে...!"

"তো? ওই মধ্যপ্রদেশই তো আপনাদের শোভা দাদা। ভুঁড়ির সাইজ দিয়েই তো আপনাদের কর্মদক্ষতা মাপা হয়।"

অনিশ্চয় সন্দিগ্ধ চোখে বললেন, "ঠাট্টা করছেন না তো?"

"ছি ছি, তাই কখনও করতে পারি?" মিতিন মজা করার সুরে বলল, "তো এখন রোজই আসছেন নিশ্চয়ই?"

"এভরি সানডে। কোনও রোববারই বাদ দিই না।"

"গুড। ভেরি গুড। ওয়েস্টলাইনের উন্নতি কিছু হল?"

"পাক্কা তিন মিলিমিটার কমেছে। খুব একটা মন্দ নয়, কী বলেন?" নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা হেসে উঠলেন অনিশ্চয়। হাসিমুখে তাকালেন টুপুরের দিকে, "কী গো মিস ওয়াটসন, তোমার কী সমাচার? এক্সারসাইজ করে কতখানি তাগদ বাড়ল? পারবে মাসির সঙ্গে কুস্তি লড়তে?"

জবাব দিল না টুপুর। লাজুক-লাজুক মুখে হাসল একটু।

অনিশ্চয় ফের ফিরেছেন মিতিনে, "তা আপনার প্রফেশনের হালচাল কেমন? জালে এখন ক'খানা ক্লায়েন্ট?"

"একটিও না। কলকাতার লোকজন খুব ভাল হয়ে গিয়েছে। ক্রাইম করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অগত্যা সারাদিন মাছি তাড়াচ্ছি।"

"অর্থাৎ সুখেই আছেন। এদিকে আমরা পুলিশরা তো চুরিডাকাতি, খুনখারাপি সামলাতে-সামলাতে জেরবার হয়ে যাচ্ছি," বলেই কয়েক সেকেন্ড চুপ। কী যেন ভাবছেন অনিশ্চয়। বললেন, "আপনার হাত তা হলে এখন শূন্য?"

"বিলকুল।"

"একটা কেস আপনাকে দিতে পারি, বুঝলেন। একেবারেই ফাঁপা। তবে আপনাকে চালান করলে আমার মাথা একটু হালকা হয়।"

"কী রকম? কী রকম?"

"এক পাগলা বুড়ো আমায় বহুত বোর করছেন। তাঁর ফোনের ঠেলায় আমি জেরবার। অথচ ভদ্রলোকের সমস্যায় পুলিশের কিছুই করার নেই। সত্যি বলতে কী, আদৌ কোনও সমস্যা আছে বলে আমার মনেও হয় না। তা আপনি তো পেশাদার গোয়েন্দা, দেখুন যদি ওঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আশ্বস্ত করতে পারেন।"

"অর্থাৎ আমাকে কাউন্সেলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে?"

"অনেকটা সেই রকমই। তবে ওঁর কথাবার্তা থেকে যদি কোনও রহস্য খুঁজে বার করতে পারেন, সেটা আপনার বাড়তি লাভ।"

"কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?"

"মার্কুইস স্ট্রিটে। নাম ডেভিড যোশুয়া।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোল, "ইহুদি নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন তো। কলকাতায় এখন ইহুদিরা ডোডো পাখির মতো দুর্লভ। ইনি সেই বিরল প্রজাতিরই একজন।"

"হুঁ, এ শহরে এখন ইহুদির সংখ্যা সাকুল্যে একশো হবে কিনা সন্দেহ," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "তা প্রবলেমটা কী ভদ্রলোকের?"

"কিছুই না। আবার অনেক কিছু। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, কেউ সারাক্ষণ ওঁর উপর নজর রাখছে। সে মিস্টার যোশুয়া আর তাঁর স্ত্রীকে না মেরে ছাড়বে না। মাঝে-মাঝেই নাকি তাঁর কাছে ঘোস্ট কল আসে। কে নাকি তাঁকে শাসায়। অথচ ওই নম্বরে মিস্টার যোশুয়া কল করে দেখেছেন, নম্বরটাই নাকি নেই।"

"যে ভয় দেখাচ্ছে, সে কেন মারবে তা কি বলেছেন মিস্টার যোশুয়া?"

"তিনি তো এক-এক সময়ে এক-এক কথা বলেন। কখনও বলেন আমার বাড়িটাকে গ্রাস করতে চায়। কখনও বলেন, আমার গোটা বংশটাকেই নিকেশ করে দেবে। আমার তো মনে হয়, সব কিছুই ওঁর মনগড়া ধারণা। যদিও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি উনি এমন কিছু অর্থবান ব্যক্তি নন যে, ওঁকে হত্যা করে কারও কোটি-কোটি টাকা নাফা হবে।"

"তবু উনি যখন ভয় পাচ্ছেন, পুলিশের তরফ থেকে তো ওঁকে একটা প্রোটেকশন দেওয়া উচিত।"

"তুৎ, কী প্রোটেকশন দেব? যে কেউ ওরকম বললেই কি বাড়ির দরজায় চারজন করে পুলিশ দাঁড় করিয়ে রাখা যায়? পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কি খেয়েদেয়ে আর কোনও কাজ নেই?" অনিশ্চয় মুখ বাঁকালেন, "বরং এই সব ঝুটঝামেলা আপনারা সামলাতে পারবেন।"

মিতিন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ভদ্রলোক করেন কী?"

"একসময়ে গ্রেট ইন্ডিয়া হোটেলের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। পোদ্দার কোর্টের কাছে আরও দু'খানা বাড়িও ছিল। সেখান থেকে কিছু ভাড়া-টাড়াও পেতেন। সেই বাড়ি দু'টো এখন বেচে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদ থেকে সংসার চলে।"

"কে-কে আছেন সংসারে?"

"এখন তো শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই থাকেন। একটিমাত্র ছেলে, সে বিদেশে সেটল্‌ড।"

"ও। তা এই ভদ্রলোকের মৃত্যুভয় কবে থেকে শুরু হয়েছে?"

"এগজাক্টলি বলতে পারব না। তবে মনে হয় দু'-তিন মাস," অনিশ্চয় একটু থেমে থেকে বললেন, "অবশ্য ভয় পাওয়ার বোধ হয় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। মিস্টার যোশুয়া আর তাঁর স্ত্রী লন্ডনে ছেলের কাছে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ফিরেছেন বছর খানেক আগে। তিনি ফেরার পরপরই তাঁর ভগ্নিপতি মারা যান, তার মাস কয়েক পরে দিদি। দু'টোই প্লেন ডেথ। হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু কেন যেন মিস্টার যোশুয়ার ধারণা হয়েছে, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি।

আর সেই ধারণা থেকেই মৃত্যুভয়ের সূত্রপাত। আপনিই বলুন ম্যাডাম, কেউ যদি এরকম অযথা ভয় পেতে শুরু করে পুলিশ কী করবে?"

"তা বটে। মিতিনকে একটু যেন চিন্তান্বিত দেখাল। কপাল কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে, ভদ্রলোকের ফোন নম্বরটা আমায় দিন, আমি যোগাযোগ করে নেব। তার আগে আপনি মিস্টার যোশুয়াকে আমার কথাটা জানিয়ে রাখুন।"

"শিয়োর। আমি আজই বলে দিচ্ছি।"

মোবাইল থেকে মিস্টার যোশুয়ার নম্বরটা বার করে মিতিনকে দিলেন অনিশ্চয়। তিনি চলে যাওয়ার পর টুপুর বলল, "কেসটা তুমি নিয়ে নিলে?"

"হাতে তো এখন তেমন কাজকর্ম নেই। দেখি না ব্যাপারটা একটু নাড়াচাড়া করে।"

"কী দেখবে? মানে এগজাক্টলি তুমি কী করবে?"

"জানি না। আগে মিস্টার যোশুয়ার সঙ্গে মোলাকাত তো হোক, তারপর তো বোঝা যাবে।"

বাড়ি ফিরে পার্থকে বলামাত্র সে রীতিমত উত্তেজিত। চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম বললে? ডেভিড যোশুয়া? ইনি কি এলিস যোশুয়ার কোনও রিলেটিভ?"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কে এলিস যোশুয়া?"

"কিছুই জানো না দেখি। জেনারেল নলেজটা একটু বাড়াও," পার্থ পায়ের উপর পা তুলে নাচাচ্ছে, "সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়ে জাপানিরা যখন দক্ষিণ এশিয়ায় বম্বিং শুরু করে, তখন বার্মা মানে এখন যাকে বলে মায়ানমার, সেখান থেকে অনেক ইহুদি পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। এলিস যোশুয়া ছিলেন তাঁদেরই একজন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে গ্র্যান্ড হোটেলে চাকরি নিয়েছিলেন। তবে জানোই তো ব্যবসা করাটা ইহুদিদের রক্তেই আছে। তাই কিছুদিন পরে চাকরি-বাকরি ছেড়ে পার্ক স্ট্রিটে তিনি একটা ঘ্যামচ্যাক রেস্তরাঁ খুলে বসেন। কোন রেস্তরাঁ জানো? ট্রিংকাস।"

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "ওমা, সে তো এখনও চলছে।"

"তবে এখন বোধ হয় অন্য কেউ কিনে নিয়েছে," পার্থ গলা ঝাড়ল। তারপর বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভঙ্গিতে মিতিনকে বলল, "যাক গে, গোড়াতেই তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া ভাল। টাকাপয়সার ব্যাপারে ইহুদিরা কিন্তু খুব হিসেবি। ভয়ংকর চিপ্পুস। ওরা নগদানগদি ছাড়া লেনদেন করে না। আশীর্বাদ পর্যন্ত ধারে দেয় না। সুতরাং কেস হাতে নিলেই টাকাপয়সার ব্যাপারটা ফয়সালা করে নেবে।"

মিতিন হেসে বলল, "আহা, দেখি আগে কেসটার কোনও সারবস্তু আছে কিনা?"

"ওই দেখতে যাওয়ার জন্যও ফি চার্জ করবে।"

"সে হবেখ'ন। এখন বলো আজ ব্রেকফাস্টে কী খাবে?"

"নতুন একটা কেস পাচ্ছ, সেই অনারে একটু মুখবদল হোক।"

"উত্তম প্রস্তাব। সেদ্ধ ডিমের বদলে আজ তা হলে পোচ হতে পারে।"

"কেন, একদিন লুচি তরকারি খেলে কী হয়? রবিবারের সকালে টোস্ট-ফোস্ট পোষায়?"

"বেশ। আজ না হয় রুটিন ব্রেক।"

বুমবুম 'ইয়ায়া' করে উল্লাস দেখিয়ে উঠল। পার্থ আহ্লাদে আটখানা। মুচকি হেসে অন্দরে চলে গেল মিতিন।

টুপুরের মনে হল একটা কাজের খোঁজ পেয়ে মিতিনমাসিও বেশ পুলকিত। কিন্তু কাজটা যে ঠিক কী? কোনও রহস্য আছে কি আদৌ?

॥ ২ ॥

প্রথম দর্শনে বাড়িখানা হতাশই করল টুপুরকে। জাদুঘরের পিছন দিকের এই রাস্তাটায়, শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে, এত জীর্ণ এক অট্টালিকা এখনও যে টিকে আছে টুপুর ভাবতেই পারে না। সত্যি বলতে কী, পেল্লায় উঁচু পাঁচিলটার অন্দরে আদৌ ঘরবাড়ি আছে কিনা তাই তো ঠাহর করা মুশকিল। ভাগ্যিস ভাঙাচোরা গেটের ধারের থামটায় পাথরের ফলকের উপর বড়-বড় হরফে বাড়ির নম্বর লেখা। নইলে বোধ হয় ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হত।

গাড়িটাকে ফটকের দিকে ঘুরিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল মিতিন। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখন সবে পাঁচটা দশ।"

পাশেই পার্থ। আজ রবিবার বলে সেও যোগ দিয়েছে অভিযানে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সো হোয়াট? চলো, ঢুকে পড়ি।"

খোলা ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি থেকে নামল টুপুররা। এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে টুপুর আরও নিরাশ। মূল বাড়িখানা ঘিরে জমি আছে অনেকটা। কিন্তু সেখানে ফুল নেই, বাগান নেই, শুধু ঝোপঝাড় আর আগাছা। বোঝাই যায় মোটেই রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। বাড়িটারই বা কী ছিরি! আকারে যথেষ্ট ঢাউস এবং দোতলা। গায়ে চেকনাই তো দূরস্থান, পলস্তারা পর্যন্ত খসে-খসে পড়ছে। এমন একটা ভগ্নস্তূপে এসে আজকের বিকেলটাই বরবাদ হল না তো?

অদূরে এক গাড়িবারান্দার মতো জায়গা। সম্ভবত গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক দীর্ঘাকৃতি প্রবীণ আবির্ভূত হয়েছেন সেখানে। মুখমণ্ডলে ধবধবে সাদা দাড়ি, পরনে ঢলঢলে পাজামা আর এই গরমেও লম্বা ঝুলের কোট। মাথায় ফেজটুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সব মিলিয়ে যেন কেমন-কেমন। সময়ের সঙ্গে যেন নিতান্ত বেমানান।

হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। বিচিত্র বাংলা উচ্চারণে বললেন, "আমিই ডেভিড যোশুয়া। অধীনের গৃহে পদধূলি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

মিতিন হাতজোড় করে নমস্কার করল। পার্থ আর টুপুরের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল মিস্টার যোশুয়ার। গাড়িবারান্দার লাগোয়া তিন ধাপ লাল সিঁড়ি। গৃহকর্তার সাদর আহ্বানে সিঁড়ি পেরিয়ে ড্রয়িংহলে এল টুপুররা।

বিশাল হলঘরখানায় পা রেখে টুপুরের চক্ষুস্থির। বাইরের হতশ্রী দশার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। দেওয়াল খানিক রংজ্বলা বটে, তবে আসবাবপত্র ঝকঝক করছে। কাঠের সাবেকি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সোফাসেট, পাথর বসানো সেন্টারটেবিল, পুরনো কিন্তু পরিচ্ছন্ন কার্পেট, সিলিং থেকে ঝুলছে কাচের বাতিদান, কারুকাজ করা স্ট্যান্ডল্যাম্প, প্রাচীনতার গন্ধ মাখা শোকেস, লম্বা-লম্বা জানলায় ভারী-ভারী পরদা...। এক পাশে একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালে খান চারেক অয়েল পেন্টিং। সব ক'টা ছবিতেই দাড়িওয়ালা টুপিধারী পুরুষ। তাঁদের পরনেও মিস্টার যোশুয়ার ছাঁদেরই পোশাকআশাক। বেশ টের পাওয়া যায়, ঘরের আবহাওয়া একটু অন্যরকম। সময় যেন বহু বছর ধরে থমকে আছে এখানে।

টুপুরদের বসতে বলে ডেভিড জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তো গরমের দিন, প্রথমে একটু শরবত নেবেন কি?"

মিতিন বিনয়ের সুরে বলল, "যদি আপনার অসুবিধে না হয়...।"

"কী বলছেন ম্যাডাম? অতিথিদের আপ্যায়ন করা তো ইহুদিদের ধর্ম," স্মিত মুখ ডেভিডের স্বর সামান্য উচ্চগ্রামে উঠল, "যতীন, একবার শুনে যাও তো।"

বাক্য ফুরনোর আগেই বছর তিরিশের যতীন উঁকি দিয়েছে দরজায়। চেহারা একেবারেই কাজের লোকের মতো নয়, বরং দেখে বাড়ির একজনই মনে হয়। পরনে তার জিন্স-টিশার্ট, হাতে ঘড়ি, চুল বেশ কায়দা করে ছাঁটা।

মনিবের নির্দেশ নিয়ে সে চলে যেতেই মিতিন জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি বাঙালি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আমার এক বাঙালি বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছেন। ভাল ছেলে। আমাদের এই বুড়োবুড়ির দেখভাল করে।"

পার্থ অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলার জন্য উসখুস করছিল। ফস করে বলে উঠল, "যদি কিছু মনে না করেন... মিস্টার এলিস যোশুয়া কি আপনাদের কেউ হন? মানে যিনি ট্রিংকাসের মালিক ছিলেন?"

"পদবি যখন যোশুয়া, আত্মীয় তো বটেই," কাঠের দোলচেয়ারে

বসলেন ডেভিড। হেলান দিয়ে বললেন, "এলিস ছিলেন আমার দুরসম্পর্কের কাকা। এলিসের ঠাকুরদা ছিলেন আমার বাবার ঠাকুরদার ফার্স্ট কাজিন। আমরা সিরিয়া থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। ওর পূর্বপুরুষ গিয়েছিলেন রেঙ্গুন। ওরা কলকাতায় আসার পর আমার বাবাই তো এলিসকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই ১৯৪৪ সালে। তখন আমি খুবই ছোট। বছর দশেক।"

"আপনার তো তা হলে অনেক বয়স?"

"সেভেনটি এইট চলছে।"

"দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। মনে হয় বড় জোর সত্তর-টত্তর..."

শুনে ভারী খুশি হয়েছেন ডেভিড। দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, "নিয়ম কানুন মেনে চলি, শরীরের যত্ন নিই, তাই অসুখবিসুখ বড় একটা কাছে ঘেঁষে না।"

"আপনারা তো বাগদাদি ইহুদি, তাই না?"

"কলকাতায় প্রায় সব ইহুদিই তো বাগদাদি। অল্প কয়েক ঘর বেনে ইজরাইলিও ছিল। তবে এখন তারা প্রায় সকলেই ভারত থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। একমাত্র টিকে আছেন জ্যাকব পরিবার। তাঁরাও তো শুনলাম আমাদের পবিত্র ভূমিতে চলে যাচ্ছেন।"

"মানে ইজরায়েলে?"

মৃদু ঘাড় নাড়লেন ডেভিড। একটু উদাস স্বরে বললেন, "কলকাতায় আমরা এখন ইহুদিরা আছি উনচল্লিশ জন। সংখ্যাটা এবার ছত্রিশে নেমে যাবে।"

ঘরের পরিবেশ একটু যেন ভারী হয়ে যাচ্ছিল, কথা ঘোরানোর জন্যই মিতিন সরব হয়েছে, "মিস্টার যোশুয়া, আমরা কি এবার আপনার সমস্যাটার ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটানো তো ঠিক নয়।"

ডেভিড সোজা হয়ে বসলেন, "আপনাকে নিশ্চয়ই মিস্টার অনিশ্চয় মজুমদার খানিকটা বলেছেন?"

"আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বিশদে।"

একটুক্ষণ চিন্তা করলেন ডেভিড। তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বড় বিপন্ন বোধ করছি।"

"কেন?"

"গত সাত-আট মাসের মধ্যে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল...।"

"যেমন?"

"প্রথমে আমার দিদির হাজব্যান্ডের মৃত্যু।"

"কী হয়েছিল তাঁর?"

"আমাদের ডাক্তার তো বলল হার্ট অ্যাটাক। যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি, কিন্তু আব্রাহামের শরীর-স্বাস্থ্য ছিল আমার চেয়েও মজবুত। নো প্রেশার, নো শুগার, নাথিং।"

"এরকম তো হয় মিস্টার যোশুয়া। কোনও সিম্পটম নেই, অথচ দুম করে করোনারি অ্যাটাক হয়ে গেল।"

"সে আমি জানি ম্যাডাম। কিন্তু আব্রাহামের মৃত্যুটা...। সেদিন এ বাড়িতে একটা পরব চলছিল। প্রার্থনার পর খানিকক্ষণ গানবাজনাও হল। আমাদের ইহুদি সমাজের বাইরেরও অনেকে সেদিন এসেছিলেন। আব্রাহাম তাঁদের সঙ্গে কত হাসিগল্প করলেন। আমাদের ডাক্তারের বাঁশি বাজানো শুনে দারুণ তারিফ করলেন। অথচ সেই মানুষটাই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে ধড়ফড়িয়ে শেষ।"

"হার্ট অ্যাটাকের কেসে এমনও তো হরবখতই ঘটে মিস্টার যোশুয়া। আপনার জামাইবাবুর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। হয়তো ওঁর শরীর সেদিনকার আমোদ-আহ্লাদের ধকল নিতে পারেনি...।"

"ডাক্তারেরও একই অভিমত। আমি কিন্তু মানতে পারিনি। তখনই মনে হয়েছিল মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।"

"সঙ্গে-সঙ্গে জানাননি কেন?"

"পুলিশকে তো জানিয়েছিলাম। পোস্টমর্টেমও হয়েছিল।"

টুপুর জোর চমকেছে। অনিশ্চয় আংকল এ তথ্যটা তো দেননি! মিতিনেরও চোখে বিস্ময়, "তাই নাকি? তা পোস্টমর্টেমে কী পাওয়া গেল?"

"কিছুই না। সেই ডাক্তারও বললেন, হার্ট বন্ধ হয়েই...।"

"হুম।" মিতিনের কপালে পলকা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল, "এর পর আপনার দিদির মৃত্যু?"

"ইয়েস। দিদি মারা গেলেন আর একটা পরবের দিন। সেদিন তো অনুষ্ঠান চলাকালীনই ক্যাথলিন হঠাৎ...। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এ ঘরে সবে ঢুকেছে, অমনি কেমন যেন একটা আওয়াজ করে উঠল, তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেদিনও ডাক্তার বাড়িতে মজুত। আমাদের অনুষ্ঠানেই ছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু তখন আর ক্যাথলিন বেঁচে নেই। এমনই কপাল, চিকিৎসা করানোর সুযোগটা পর্যন্ত মিলল না।"

"এই মৃত্যুটাও আনন্যাচারাল মনে হয়েছে আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"এবারও পোস্টমর্টেম করিয়েছিলেন?"

"তুলেছিলাম কথাটা। তবে উপস্থিত সবাই আমাকে ধমকে-ধামকে থামিয়ে দিল। আমারও মনে হল এবারও যদি কাটাছেঁড়া করে কিছু না পাওয়া যায়...," ক্ষণকাল নীরব থেকে ডেভিড ফের বললেন, "আচ্ছা ম্যাডাম, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই দু'টো উৎসবের রাতে প্রাণ হারালেন, এর মধ্যে কি আপনি কোনই যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না?"

"আপনি কি পেয়েছেন?"

"কিছু তো পেয়েছি। নইলে আর ছটফট করছি কেন? ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে আপনিও হয়তো...।"

"কী রকম?"

"তা হলে আর একটু ডিটেলে বলি। আমার দিদির হাজব্যান্ড আব্রাহাম মাটুক, যাঁর পুরো নাম আব্রাহাম এলিজা এদিকিয়েল মাটুক, ছিলেন এক বিখ্যাত ইহুদি ব্যবসায়ী পরিবারের বংশধর। এক কালে চিনদেশে আফিম পাঠানোর কারবার ছিল তাঁদের। নিজস্ব জাহাজও ছিল। পরে আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার পর ওঁরা কাপড়ের কারবার শুরু করেন। এখন সব বেচেবুচে দিয়েছিলেন, তবে আব্রাহামের টাকাপয়সা কম ছিল না। যেহেতু আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের কোনও ছেলেপুলে নেই, আব্রাহামের মৃত্যুতে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি চলে আসে আমার দিদির নামে এবং দিদি মারা যাওয়ার পর আমিই এখন ওঁদের ধনসম্পদের মালিক। এই ব্যাপারটা আমার কেমন গোলমেলে ঠেকছে।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "সে কী? কেন?"

"কারণ ক্যাথলিন আগে মারা গেলে আব্রাহামের কানাকড়িও আমার নামে আসত না। আইন অনুযায়ী আব্রাহামের ভাইপোরা পেত সব কিছু।"

"আব্রাহামরা ক' ভাই?"

"তিন। দু' ভাই অনেককাল আগে অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিলেন। এখন ভাইপোরা সব সিডনির পাকাপাকি বাসিন্দা।"

"তারা এ দেশে আসে না?"

"একেবারেই না। তাদের এই শহরের উপর কোনও টানই নেই। যদিও এখানেই তারা স্কুলজীবনটা কাটিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ইহুদি স্কুল থেকে তারা পাশ-টাশ করেছিল।"

"উম," পার্থ বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল, "তা হলে তো একটা কথা বলতেই হচ্ছে মিস্টার যোশুয়া। যদি ওই দু'টো মৃত্যুতে সত্যিই কোনও গড়বড় থাকে...!

"আছে। আমি নিশ্চিত।"

"তা হলে সাসপেক্টের তালিকায় প্রথম নামটা কার হবে জানেন তো? আপনার।" পার্থ ডেভিডের দিকে আঙুল দেখাল, "কারণ, মৃত্যুর ক্রম অনুসারে আপনিই একমাত্র লাভবান ব্যক্তি।"

"জানি তো। সত্যি বলতে কি, আব্রাহামের ভাইপোরা তো আমার উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। আভাসে ইঙ্গিতে সে কথা জানিয়েওছে ফোনে," একটু যেন নিষ্প্রভ শোনাল ডেভিডের গলা, "তবে এতে আমি

দোষের কিছু দেখি না। আব্রাহামের পর ক্যাথলিন মারা যাওয়াতে লাভ তো আমার হয়েছেই। বিপুল লাভ। টাকাপয়সার কথা বাদই দিন, এই বাড়িখানা, চারপাশের জমি সবই তো ছিল আব্রাহামের। ভাগ্যের খেলায় সবই এখন আমার।"

পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বলেন কী? তা হলে আপনার নিজের বাড়িটা কোথায়?"

"ছিল। এজরা স্ট্রিটে। একটা অংশে থাকতাম, বাকিটুকু দোকান-টোকানকে ভাড়া দেওয়া ছিল। তিন বছর আগে বেচে দিয়ে উঠে এসেছিলাম এ বাড়িতে আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের জোরাজুরিতে। বুড়ো বয়সে একসঙ্গে থাকলে দিনগুলো খানিক আনন্দে কাটবে, এরকমই ভেবেছিলাম আমরা। জিহোভা সেই সুখটাও বেশিদিনের জন্য দিলেন না। এখন মনে হয় আমরা যদি এ বাড়িতে না আসতাম, তা হলে হয়তো...।"

কথা শেষ হল না, শরবতের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে যতীন। সঙ্গে এক বয়স্কা মহিলা, তাঁর হাতে আর একখানি ট্রে। তাতে কাজু কিশমিশ খেজুর সাজানো। ট্রে দু'খানা টেবিলে নামিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা। ইংরেজিতে বললেন, "আমি র‍্যাচেল যোশুয়া। ডেভিডের স্ত্রী।"

॥ ৩ ॥

ভদ্রমহিলার চেহারাটি দেখার মতো। বয়স হয়ে গিয়েছে, তবু এখনও কী টকটকে রং। নাক-চোখ-মুখও বেশ কাটা-কাটা। বোঝাই যায় একসময়ে দারুণ সুন্দরী ছিলেন। লম্বাও আছেন বেশ, তবে বয়সের ভারে সামান্য কুঁজো যেন। পরনে ঘিয়ে রঙের ঢলঢলে পাজামা, ফুলহাতা লম্বা ঝুল মেরুন কুর্তা। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি।

টুপুরদের উলটো দিকের সোফায় বসে র‍্যাচেল বললেন, "ডেভিড আপনাদের মাথা ধরিয়ে দিয়েছে তো? সেই একই প্রসঙ্গ কচলাচ্ছে নিশ্চয়ই?"

মিতিন বলল, "না না, আমি ওঁর কাছে আপনাদের ফ্যামিলির গল্প শুনছিলাম।"

"তার সঙ্গে এটা এখনও বলেনি, যোশুয়া পরিবার এবার কলকাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে?"

"ঠাট্টা কোরো না র‍্যাচেল।" ডেভিড রীতিমত আহত হয়েছেন। গোমড়া গলায় বললেন, "কেন মানতে চাইছ না, আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের মৃত্যুটা এমনি-এমনি হয়নি? মাটুকরা খতম হয়েছে, এবার যোশুয়াদের পালা। এবার নিশ্চয়ই আমাকে মরতে হবে।"

"ফের ওই কথা?"

"একশোবার বলব। হাজারবার বলব। আমি মৃত্যুর সিগনাল পাচ্ছি।"

"কে পাঠাচ্ছে? তোমার সেই ভূতুড়ে ফোনটা?"

"অবশ্যই। আমাকে তিন-তিনবার জানিয়েছে, এ বাড়িতে ফের মৃত্যু হানা দিচ্ছে।"

"আর কলটা এমন একটা নম্বর থেকে আসছে, যা একেবারেই ভুয়ো। তোমায় টেলিফোন কোম্পানি পর্যন্ত বলছে ওই নম্বরটাই নেই।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," মিতিন এবার দু' হাত তুলে থামিয়েছে র‍্যাচেলকে, "ওই টেলিফোনের কেসটা একটু বুঝে নিতে দিন। সত্যিই কি আপনি থ্রেটনিং কল পেয়েছেন মিস্টার যোশুয়া?"

"বললাম তো, একবার নয়, তিন-তিনবার। দু'বার পুরুষের গলায়, একবার মহিলার গলায়।"

"আপনার মোবাইলে?"

"না। ল্যান্ডলাইনে। আমি মোবাইল ব্যবহার করি না।"

"ও হ্যাঁ। মিস্টার মজুমদার তো আপনার ল্যান্ডলাইন নম্বরটাই আমায় দিয়েছেন," মিতিন অপ্রস্তুত মুখে হাসল, "তা হলে নিশ্চয়ই আপনার ল্যান্ডলাইনে কলার আইডি আছে?"

"না হলে আর নম্বরগুলো পাচ্ছি কোত্থেকে? কিন্তু কল ব্যাক করলে প্রত্যেকবার একই জবাব। দিস নাম্বার ডাজ নট এগ্‌জিস্ট।"

"তিনটে ফোন নিশ্চয়ই তিনটে আলাদা নম্বর থেকে এসেছে?"

"ঠিক তাই।"

"ফোনে এগজাক্টলি কী বলছে?"

"ডেথ ইজ কামিং। বিওয়্যার ডেভিড।"

"তিনবারই এক ডায়লগ?"

"হুবহু এক। মিস্টার মজুমদারকে তো জানিয়েছিলাম। নম্বর তিনটেও দিয়েছি। উনিও তো ট্রেস করতে পারেননি।"

"পারবেন কোত্থেকে?" র‍্যাচেল ফুট কাটলেন, "তোমার কলার আইডিটা বোগাস। ফোনগুলোও মনগড়া। তোমার ভীমরতি ধরেছে, বুঝলে?"

ডেভিড গোঁজ। মুখে আর বাক্যটি নেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কলহের মাঝে পড়ে মিতিনরাও চুপ। টুপুর আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে কড়িকাঠওয়ালা সিলিংয়ের দিকে। সেখানে চার ডানার লম্বা ডাঁটি ফ্যান ঘুরছে ঘটাং ঘট। পার্থ অবশ্য নিজস্ব কাজে ব্যস্ত। শরবত শেষ করে নিবিষ্ট মনে কাজুবাদাম চিবোচ্ছে।

একটু পর র‍্যাচেলই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন, "কতবার করে ডেভিডকে বোঝাচ্ছি খামোখা এসব ভয়-টয় পাওয়ার দরকার কী? ছেলে তো লন্ডন থেকে ডাকছে। এই যক্ষপুরী আগলে না থেকে সব বিক্রিবাটা করে সাইমনের কাছে চলে গেলেই তো হয়।"

"আপনাদের ছেলে কতদিন লন্ডনে আছেন?"

"তিরিশ বছর। আগে শেয়ারের বিজনেস করত, এখন স্পোর্টস গুড্‌সের দোকান খুলেছে। আমরা পাকাপাকি ভাবে চলে গেলে সাইমন যে কী খুশী হবে!" র‍্যাচেল ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "কিন্তু ডেভিডের ওই এক গোঁ। আব্রাহামের মতো সেও কলকাতা ছেড়ে নড়বে না। যে শহরে জন্মেছে, সেখানেই নাকি ওকে মরতে হবে। নারকেলডাঙার গোরস্থানে শুতে না পারলে ওর আত্মা নাকি শান্তি পাবে না। অথচ দেখুন, বাড়ি-জমি বিক্রি করে আমরা এখন কত আরামে লন্ডনে গিয়ে থাকতে পারি। ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে, নাতি-নাতনি আছে। জানেনই তো, আমরা ইহুদি দেশদেশান্তরে ঘুরে মরা জাত। তাই আত্মীয়স্বজনের মাঝে থাকতে পেলে আমাদের যা আনন্দ হয়, তেমনটা আর কিছুতে নয়। এই ডেভিডের জেদের জন্য সে সুখটুকুও আমার কপালে নেই।"

ডেভিড বিরক্ত স্বরে বললেন, "আমি তো এবার মরছি। তুমি তারপর যা খুশি কোরো।"

"করবই তো। সব বিক্রি করে চলে যাব।"

পার্থ চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, আপনাদের এরকম একটা জায়গায় বাড়ি, প্রোমোটাররা জ্বালাতন করে না?"

"করে না আবার! ডেভেলপার আর প্রোমোটারদের লাইন তো সেই কবে থেকে লেগে আছে," র‍্যাচেলের গলায় উষ্মা ঝরে পড়ল, "আব্রাহাম তো তাদের সোজা হাঁকিয়ে দিত। এখন ডেভিডও সেই রাস্তায় হাঁটছে। আরে শ্যামচাঁদবাবু তো ঘরের লোক। তিনিও তো কবে থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। তাকেও তো পাত্তা দিচ্ছে না।"

মিতিন ঈষৎ ভুরু কুঁচকোল, "কে শ্যামচাঁদ?"

"শ্যামচাঁদ অগ্রবাল। আব্রাহামের খুব বন্ধু। সেই সূত্রে ডেভিডেরও। ভদ্রলোক অগ্রবাল কনস্ট্রাকশনের মালিক।"

"মিস্টার আব্রাহাম কী করে শ্যামচাঁদের বন্ধু হলেন? উনিও কি বাড়ি তৈরির লাইনে ছিলেন কখনও?"

"একেবারেই না। আব্রাহাম সঞ্চয়ের টাকা সুদে খাটাতেন। শ্যামচাঁদ ছিলেন ওর ক্লায়েন্ট। এখন শ্যামচাঁদবাবুর বয়স হয়েছে, তিনি আর ব্যবসা দেখেন না, ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন এ বাড়িতে এসে তাসের আড্ডা জমান। ওই খেলতে খেলতেই অনেকবার বাড়ি-জমির কথা তুলেছেন।"

"ও। মিস্টার আব্রাহামের তাসের নেশা ছিল বুঝি?"

"ডেভিডেরও আছে।"

"আর কে-কে আসেন খেলতে?"

"আমাদের সমাজের আছেন দু'-তিনজন। এ ছাড়া এক বাঙালি প্রোফেসর। আমরা লন্ডন থেকে ঘুরে আসার পর থেকে তো দেখছি ডাক্তারবাবুও আসছেন রোজ।"

পার্থ গোল-গোল চোখে তাকাল, "বাঙালি প্রোফেসর, ডাক্তার, তাঁরা এই পাড়ায় এসে তাস খেলেন?"

"এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?" অনেকক্ষণ পর ডেভিডের স্বর ফুটল, "প্রোফেসার হিরণ্ময় সেন আরবি পড়াতেন। আব্রাহামও এই ভাষায় যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সেই সূত্রে দু'জনের আলাপ। এবং ফ্রেন্ডশিপ। হিরণ্ময়বাবুই তো যতীনকে দিয়েছেন। আর ডাক্তারবাবুর প্র্যাকটিসে তেমন মন নেই। কাছেই তালতলায় থাকেন। বিকেল পর্যন্ত চেম্বার করে চলে আসেন আড্ডায়।"

"আজ তাঁরা আসবেন না?"

"উঁহু, শনি-রবি আসর বন্ধ থাকে।"

"কেন?"

"শনিবার স্যাবাথ। আমাদের পবিত্র বিশ্রামের দিন। জিহোভা পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় ওই দিনটাই অবসর নিয়েছিলেন তো। আমরাও ওই দিন তাস-টাস ছুঁই না। রোববারটাও আজকাল পুরো রেস্ট নিই," ডেভিডকে এতক্ষণে একটু চাঙ্গা দেখাল, "আমরা যে শুধু তাস খেলি তা নয়, সঙ্গীতচর্চাও হয়। আব্রাহাম পিয়ানো বাজাত। আমি অল্পস্বল্প ভায়োলিন জানি। ডাক্তারবাবু বাঁশিতে ওস্তাদ। র‍্যাচেল মাঝে-মাঝে গান করে। দিব্যি জমে যায় সন্ধেগুলো। এই সব নেশার টানেই তো পড়ে আছি কলকাতায়। লন্ডনে গেলে এমনটা কি পাব?"

"থামো তো," র‍্যাচেল ঝামটা দিয়ে উঠলেন, "বকতে শুরু করলে তোমার কথা আর ফুরোয় না।"

"সে তো তোমারও। কথা কি তুমি কম বলো?"

"তোমার মতো মাত্রাজ্ঞান হারাই না," র‍্যাচেল বিচিত্র মুখভঙ্গি করলেন, "জানেন, লন্ডনে গিয়ে কী কাণ্ড করেছিল? ওখানে ইহুদিদের একটা খুদে জমায়েত হয়েছিল। স্পেন, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি নানান দেশের ইহুদি এসেছিল সেখানে। সুযোগ পেয়ে তাদের মাঝে ডেভিড এমন একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল।"

"আষাঢ়ে বলছ কেন? আমি মিছে কথা তো কিছু বলিনি।"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো, এ বাড়িতে গুপ্তধন আছে?"

"অসম্ভব কী? আব্রাহাম স্বয়ং আমায় বলেছে। তা ছাড়া আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, মাটুকদের এ বাড়িতে যা আছে, মূল্য দিয়ে তার হিসেব করা যাবে না," ডেভিড রীতিমত জোরের সঙ্গে

বললেন কথাগুলো। মাথা দুলিয়ে ফের বললেন, "আর মাটুকদের ঘরে যে মহামূল্যবান সম্পদ থাকবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। ওদের বংশের কথাটা ভাবো। যে সে নয়, স্বয়ং শ্যালোম কোহেন ওদের পূর্বপুরুষ।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "শ্যালোম কোহেন কে?"

"আমাদের কলকাতার ইহুদিদের আদি পুরুষ। একজন নমস্য ব্যক্তি। জন্মেছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পোয়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বাগদাদ-বসরা হয়ে ইংরেজদের জাহাজে চেপে মুম্বই এসে পৌঁছন। ওখান থেকেই মেসোপটেমিয়ায়, এখন যাকে বলে ইরাক, ব্যবসা চালাতেন। মুম্বই থেকে যান সুরাট। তারপর লখনউ। অবশেষে কলকাতায় এসে থিতু হন। এই কলকাতায় বসে উনি হিরে, সিল্ক, নীল আর ঢাকাই মসলিনের বিশাল কারবার ফেঁদেছিলেন। লখনউতে বসবাসের সময়ে শ্যালোম ছিলেন সেখানকার নবাবের খাস মণিকার। হিরেজহরত খুব ভাল চিনতেন কিনা। শোনা যায় লখনউ থেকে চলে আসার সময়ে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন শ্যালোম। তাঁর কোনও ছেলে ছিল না, ছিল তিন মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়েছিল ডোয়েক পরিবারে, একজনের সদ্‌কা, তৃতীয়জনের মাটুক। তিন জামাইকে ধনরত্ন সমান ভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন শ্যালোম। সুতরাং আব্রাহামদের এই বাড়িতে মণিমুক্তো থাকা মোটেই বিচিত্র নয়।"

"কিন্তু এর মধ্যে গুপ্তধন আসছে কোত্থেকে," পার্থ তর্ক জুড়ল, "মণিমুক্তো যাই থাকুক, তা নিশ্চয়ই মিস্টার আব্রাহামের কাছেই...।"

"না," র‍্যাচেল বলে উঠলেন, "আব্রাহামরাও চার-পাঁচ পুরুষ ধরে ওই ধনরত্নের গল্পই শুনে আসছেন। কেউ তেমন কিছু চোখেও দেখেননি, হাতেও পাননি।"

"সেই জন্যই তো বলা হচ্ছে গুপ্তধন," ডেভিড প্রায় লুফে নিলেন কথাটা। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "শ্যালোম কোহেনের জামাই দানিয়েল মাটুক নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন। শুনেছি শ্যালোমের মণিমাণিক্যের মধ্যে একখানা পাথর ছিল বদখ্‌শানি চুনি। যার জুড়ি নাকি দুনিয়ায় নেই।"

"যত্ত সব আজগুবি গপ্পো," র‍্যাচেল ফের বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "খামোকা তুমি গুজবটাকে উসকে দাও। কী দরকার ছিল লন্ডনের আসরে ওই কাহিনি শোনানোর? বক্তৃতাটা আবার সিডি করে এনে আব্রাহামকে উপহার দিলে।"

"আহা, আব্রাহাম তো তাতে খুশিই হয়েছিল।"

"মোটেই না। মজা পেয়েছিল। সিডিটা বন্ধুদের দেখিয়ে কত হাসাহাসি করেছিল মনে নেই?"

"তুমি ঠিক বলছ না র‍্যাচেল। কেউ হাসেনি। সবাই আগ্রহ নিয়ে দেখেছে।"

"যদি ঠিক ভাবো তো তাই। আমার আর কিছু বলার নেই।"

র‍্যাচেলের প্রতিবাদে ডেভিড যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বসে আছেন ঘাড় ঝুলিয়ে। একটু পরে মাথা তুলে মিতিনকে বললেন, "আপনি আমাকে কী ভাবছেন জানি না। হয়তো পাগল-টাগলই মনে করছেন। কিন্তু আমার অন্তর যা বলছে, সেটাই আপনাকে জানালাম।"

মিতিন মৃদু স্বরে বলল, "আমি বুঝতে পারছি মিস্টার যোশুয়া। কিন্তু..."

"শুনুন ম্যাডাম," মিতিনকে থামিয়ে ডেভিড বলে উঠলেন, "যাঁরা চলে গিয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে আপনার আর কিছু করার নেই। তবে এখন আপনাকে একটা কাজের আগাম দায়িত্ব দিয়ে রাখতে চাই। যদি অদূর ভবিষ্যতে আমি মারা যাই এবং মৃত্যুটা যদি স্বাভাবিকও হয়, আমি চাই আপনি তার তদন্ত করুন। র‍্যাচেলের সামনেই বলছি, আপনার জন্য একটা পারিশ্রমিক ধার্য করা থাকবে, র‍্যাচেল আপনাকে সেটা দিয়ে দেবে। আশা করি আপনি এই প্রস্তাবে সম্মত?"

মিতিন সামান্য থতমত মুখে ঘাড় নেড়ে দিল।

ডেভিড কোটের পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে বাড়িয়ে দিলেন, "অনুগ্রহ করে এটা রাখুন।"

"কী আছে এতে?"

"সামান্য কিছু অর্থ।"

"কিসের জন্য?"

"আপনি যে আমার জন্য সময়টুকু ব্যয় করলেন, তারই পারিশ্রমিক।"

"এ মা, না না। আমি তো মিস্টার মজুমদারের কথা শুনে আপনার সঙ্গে শুধু আলাপ করতে এসেছিলাম।"

"মাপ করবেন ম্যাডাম। আমরা ইহুদিরা বিনা মূল্যে কোনও কাজ করি না। করাইও না। তবু যদি আপনার বাধো-বাধো ঠেকে, টাকাটা অগ্রিম হিসেবে ধরে নিন। ক'দিন পরেই তো আপনাকে তদন্তে নামতে হবে, আমি জানি।"

টুপুর থ। জ্যান্ত অবস্থায় নিজের মৃত্যুরহস্য তদন্তের টাকা দিচ্ছেন আগ বাড়িয়ে। এমন আজব মানুষ টুপুর জীবনে দ্যাখেনি।

॥ ৪ ॥

রাতে খেতে বসে পার্থ বলল, "বুঝলি টুপুর, ভেবে দেখলাম, আমাদের ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে।"

টুপুর আহারে মন দিয়েছিল। আজ নৈশভোজের পদ একটু অন্যরকম। ডেভিড যোশুয়ার বাড়ি থেকে ফিরে কী যে খেয়াল চাপল মিতিনের, সটান ঢুকে গেল কিচেনে। নিজেই হাত লাগাল রান্নাবান্নায়। সবজি-টবজি সেদ্ধ করে গ্রেভিওয়ালা চাউমিন বানাল। সঙ্গে লেমন চিকেন। দু'টোই দারুণ হয়েছে। মিতিন মাসির হাতে কী জাদু আছে কে জানে। যাই রাঁধুক, টুপুরের মনে হয় অমৃত। নুন-মিষ্টি-টক-ঝাল সবই যেন নিখুঁত।

একটা চিকেনের টুকরো কাঁটায় গেঁথে টুপুর মুখ তুলল। ভুরু বাঁকিয়ে বলল, "কোন ধারণাটা গো?"

"ওই যে তখন বলছিলাম না ডেভিড যোশুয়া মানুষটা বদ্ধ পাগল? ওঁর মাথার চিকিৎসা হওয়া দরকার?"

হ্যাঁ, আলোচনাটা ওই লাইনেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বটে। মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িটা থেকে বেরিয়েই পার্থমেসোর সে কী হাসি, "তোর মাসি আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল রে টুপুর! ফাঁকতালে পাঁচ হাজার টাকাসুদ্ধ একটা খাম মিলে গেল। ডেভিড যোশুয়ার তো মোটেই ডিটেকটিভের প্রয়োজন নেই, ওঁর তো আসলে দরকার একজন সাইকায়াট্রিস্ট। যিনি কিনা বৃদ্ধের মন থেকে বিটকেল মৃত্যুভয়টা উপড়ে ফেলতে পারেন। ফোকটে বিপুল সম্পত্তি মিলে গেছে বলে কোথায় উনি ধেইধেই নাচবেন তা নয়, নিজেই একটা আতঙ্ক তৈরি করে সেই জুজুর ভয়ে কাঁপছেন।"

টুপুরও মেসোর তালে তাল দিয়েছে সারাক্ষণ। মিস্টার যোশুয়ার কথাবার্তা আগাগোড়াই তার কেমন অসংলগ্ন ঠেকেছে। মাঝখানে কোত্থেকে একটা গপ্পোও আমদানি করে ফেললেন ভদ্রলোক। ওই উপাখ্যান নিয়েই না টুপুর মাসির সঙ্গে ঠাট্টা জুড়েছিল, "ভবিষ্যতে গুপ্তধন উদ্ধার করে মোটা রোজগারের আশা ছেড়ে দাও গো মিতিনমাসি! বরং পড়ে পাওয়া পাঁচ হাজার টাকার চটপট সদগতি করে ফেলি চলো! বুমবুমকে তুলে নিয়ে ঘ্যামচ্যাক একটা ডিনারই হোক না কোথাও একটা!"

মিতিন অবশ্য জবাব দেয়নি। আলগা হেসেছে শুধু। পার্থর এখনকার মন্তব্যেও তার কোনও ভাবান্তর নেই। চুপচাপ খাইয়ে চলেছে বুমবুমকে।

সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে টুপুর বলল, "এখন কী ধারণা হচ্ছে? ভদ্রলোক সুস্থ? যা বলেছেন সব খুব যুক্তিপূর্ণ?"

"তা হয়তো নয়। তবে কী জানিস?" পার্থ খানিকটা চাউমিন চালান করল মুখে। চিবোতে-চিবোতে বলল, "একেবারে বাতিল করাটাও বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।"

"কেন?"

"কারণ, ইহুদিদের নেচারটা যে জানি। ওরা হাড়কেপ্পন হয়। অবশ্য কারণও আছে। চিরকাল ওদের এমন তাড়া খেয়ে-খেয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরতে হয়েছে, বেহিসেবি হওয়ার ওদের জো ছিল না। উলটে যখন

যেটুকু পেয়েছে, আঁকড়ে থেকেছে প্রাণপণে। আর সেই অভ্যেস থেকেই ওদের হাত থেকে জল গলতে চায় না।" ভিনিগারে ডোবানো কুচো লঙ্কা তুলল পার্থ। মুখে পুরে বলল, "সুতরাং ডেভিড যোশুয়ার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়াটা একেবারেই অকারণ ভাবা কঠিন।"

"কিন্তু দু'টো মৃত্যুই তো নরমাল ডেথ। ডাক্তারও তাই বলছে, পোস্টমর্টেমও...।"

"তবে উৎসবের রাতেই পটাপট দু'জন মারা গেলেন, এটা একটু সন্দেহজনক তো বটেই!" পার্থ গলা ঝাড়ল। মিতিনকে বলল, "কী গো, তুমিও নিশ্চয়ই এই লাইনে ভাবছ?"

"নাহ্। মিতিন ঘাড় নাড়ল, "আমি অন্য একটা কথা চিন্তা করছি।"

"খুবই স্বাভাবিক। আমরা যা ভাবব, তুমি তা ভাববে না। কারণ, তুমি টিকটিকি। তোমার দৃষ্টি তো ঘুরপথেই যাবে।"

ব্যঙ্গটা গায়ে না মেখে মিতিন বলল, "আমি ভাবছি মিস্টার যোশুয়ার শঙ্কাটা যদি সত্যিই হয়, তা হলে মৃত্যুর ক্রমটাও নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? সেই উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?"

"সিম্পল। মিস্টার যোশুয়ার মানে আব্রাহামদের সম্পত্তি চলে আসা।"

"কিন্তু মিস্টার যোশুয়াকে সম্পত্তিটা পাইয়ে দিতে কেউ একজন চাইবে কেন? তার কী ইন্টারেস্ট?"

"এর একটা জবাব আমি দিতে পারি। জানি না তোমার মনঃপূত হবে কিনা," পার্থ দাঁতের ফাঁক থেকে মুরগির কুচি বার করল। থালার কোণে রেখে বলল, "আমার মনে হচ্ছে মিস্টার যোশুয়া নিজের ইন্টারেস্টে তোমাকে ইউজ করতে চাইছেন।"

"মানে?"

"ধরতে পারলে না? ইহুদিরা টাকাপয়সার ব্যাপারে বেজায় সাবধানি। যা একবার পায়, কোনও ভাবেই তা হারাতে চায় না।"

"ইহুদি চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান না দিয়ে কাজের কথাটা বলো।"

"আরে বাবা, ভদ্রলোকের দিদি জামাইবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক হোক কি অস্বাভাবিক, আজ নয় তো কাল নানা রকম জল্পনা হবে। মিস্টার যোশুয়াই তো বললেন, অলরেডি আব্রাহামের ভাইপোদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। অতএব তিনি গোটা প্রসঙ্গের গোড়াতেই জল ঢেলে দিতে চান। যাতে ভবিষ্যতে ওঁর ছেলেরও ওই সম্পত্তি পেতে কোনও হ্যাপা পোহাতে না হয়। কোনও মামলা-মকদ্দমায় না ফাঁসে। তাই ভেবেচিন্তে এই ডিটেকটিভ নিয়োগের পরিকল্পনা।"

"এতে ডিটেকটিভের কী ভূমিকা?"

"কিছুই না। তুমি কিছু করবেও না। করার কথাও নয়। তবে ডেভিড যোশুয়ার লাভই লাভ। পুলিশ-ডিটেকটিভ ছুঁইয়ে রেখে, মাত্র পাঁচ হাজার টাকা খসিয়ে, পাকাপাকি লোকের মুখ বন্ধ করে দিলেন।"

মিতিন স্থির চোখে তাকিয়ে আছে পার্থর দিকে। যেন ভাবছে কিছু। যেন পার্থর কথাগুলো ঠিক হজম করতে পারছে না।

টুপুরেরও একটু-একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "মিস্টার যোশুয়া কি এতই প্যাঁচোয়া লোক? দেখে মনে হয় না কিন্তু।"

"মানুষ চেনা কি অতই সোজা রে? চোখ লাগে। আর সেই চোখ তোর মাসি ছাড়া আরও কারও-কারও আছে।"

এই বিদ্রুপটাকেও আমল দিল না মিতিন। বুমবুমের ভোজন শেষ, তাকে মুখ ধুতে পাঠিয়ে টুকটুক করে নিজের খাবার নিচ্ছে প্লেটে। মাসির উদাসীন ভাবটাই ভারী রহস্যময় লাগছে টুপুরের। মাসিকে একটু খোঁচানোর জন্য ফের কথা শুরু করল মেসোর সঙ্গে। ঝুঁকে বলল, "আর মিসেস যোশুয়াকে তোমার কেমন লাগল? উনিও কি গভীর জলের মাছ? মিস্টার যোশুয়ার মতোই?"

"না, না। তুলনায় উনি অনেক সাদামাটা। বরকে বকাঝকা করে একটু আনন্দ পান। কথাও একটু বেশি বলেন। দেখলি না, গুপ্তধনের গল্পটা উনিই শুরু করলেন?"

"উনি আর বললেন কোথায়? বরং উনি তো নিজেই বিশ্বাস করেন না।"

"করা উচিতও নয়। কবে দুশো বছর আগে কার পূর্বপুরুষ হিরেজহরত বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁর বাড়িতে মণিমুক্তো লুকনো আছে, এমনটা ভাবাই তো মূর্খামি। আমারও তো কোনও এক পূর্বপুরুষ রাজার খাজাঞ্চি ছিলেন। লাখ-লাখ টাকা, ঘড়া-ঘড়া মোহর নিয়ে তিনি নাকি নাড়াচাড়া করতেন। তা বলে কি আমাদের বাড়িতেও ওসব থাকবে? নাকি আছে?"

"সরি স্যার।" মিতিন এবার নড়ে বসেছে, "তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

"তার মানে তুমি গুপ্তধনের গল্পটা খেয়ে গিয়েছ?"

"একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছি না। কারণ, তোমার পূর্বপুরুষের গল্পটির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু শ্যালোম কোহেন একজন ঐতিহাসিক ফিগার। এবং তিনি মোটেই হেঁজিপেঁজি লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আরবিভাষী ইহুদি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি ব্যবসা করে এত টাকা কামিয়েছিলেন, তিনি একজন আর্মেনিয়ানকে পনেরো হাজার টাকা ধার দেন। এবং নিজেও সুরাটে বাইশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনে ফ্যালেন। মনে রেখো, তখনকার বাইশ হাজার মানে এখনকার বাইশ কোটির শামিল। শুধু তাই নয়, মিস্টার যোশুয়া যা বলেননি, উনি শুধু লখনউয়ের নবাবেরই মণিকার ছিলেন না। পঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের দরবারেও হিরে-জহরতের সমঝদার হিসেবে তাঁর বিপুল খাতির ছিল। আর তাঁর জামাইরাও কম বিখ্যাত নন। তাঁর বড় জামাই মোজেস ডুয়েক ভারতের অনেক রাজা-মহারাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। আরও জেনে রাখো, কলকাতায় ইহুদিদের যে কবরখানাটি আছে সেটিও শ্যালোম কোহেনেরই অবদান। জমিটা ছিল এক নবাবের। তিনি বিনা মূল্যে জমিটি দান করতে চেয়েছিলেন কোহেনকে। কিন্তু ইহুদিদের তো দান নেওয়ার প্রথা নেই, তাই জমির বিনিময়ে আঙুল থেকে সোনার আংটি খুলে নবাবকে দিয়েছিলেন শ্যালোম। তাঁর রাশি-রাশি ধনসম্পদ নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।"

পার্থ আশ্চর্য মুখে বলল, "তুমি এত জানলে কোত্থেকে?"

"ইন্টারনেট ঘেঁটেই পেলাম। মার্কুইস স্ট্রিটে যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি।"

"ওখানে মাটুকদের কথা পেয়েছ কিছু? কিংবা যোশুয়া?"

"সেভাবে কিছু নেই। তবে দু'টো পরিবারেরই উল্লেখ আছে। যোশুয়ারা সম্ভবত পুরোহিতের বংশ। কারণ, যোশুয়া নামের অর্থই পুরোহিত।"

"কেসটা মনে হচ্ছে তোমাকে বেশ আকর্ষণ করেছে?" পার্থ খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাসে চুমুক দিল। ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, "তুমি কি তা হলে এবার থেকে হার্ট অ্যাটাকেরও তদন্ত করবে?"

"প্রয়োজন বোধ করলে নিশ্চয়ই করব। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার পর আমারও কৌতূহল কিছু বেড়েছে, এ আমি অস্বীকার করি কী করে!"

"কী এত ইন্টারেস্টিং পেলে বলো তো? ওই ঘোস্ট কলের ব্যাপারটা? যে ভুলভাল নম্বরগুলো ট্রেসই করা যায় না?"

"অবশ্যই সেটা একটা কারণ। র‍্যাচেল যাই বলুন, মিস্টার যোশুয়াকে আমার মোটেই ভীমরতিগ্রস্ত মনে হয়নি। আর একজন আটাত্তর বছর বয়সের মানুষের কাছে বারবার ভুয়ো কল আসাটাও তো কম আশ্চর্যজনক নয়। তারপর ধরো, মিস্টার যোশুয়ার বিচিত্র সঙ্গীসাথী। কেউ ব্যবসাদার, কেউ আবার অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার...। তাঁরা আবার একদিকে তাসুড়ে, অন্য দিকে সঙ্গীতপ্রেমী। সব কিছু মিলিয়ে আমি যেন কেমন একটা মিস্ট্রির গন্ধ পাচ্ছি।"

পার্থ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। টিভির রিমোট হাতে বসেছে সোফায়। পুরনো দিনের হিন্দি ফিল্মের সুরেলা গান চলছে একটা চ্যানেলে, সেখানেই গেঁথে গেল। টুপুরেরও পাশে গিয়ে বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে উপায় নেই এখন। তাকে এবার ছাদে গিয়ে হাঁটতে হবে। মিতিনমাসির অর্ডার।

আধ ঘণ্টাটাক পায়চারি করে ফিরল টুপুর। পার্থমেসো তখন চোখ

গোল-গোল করে বিশ্রী একটা কুস্তি দেখছে টিভিতে। আর মিতিনমাসি নিজস্ব অফিসঘরের খুপরিটায় কম্পিউটারে নিমগ্ন। অগত্যা শুয়ে পড়া ছাড়া টুপুরের আর কাজ কী!

পরদিন থেকে আবার সেই নিস্তরঙ্গ জীবন। মর্নিংওয়াক, ব্যায়াম, অখাদ্য খাওয়া আর গরমের ছুটির হোমওয়ার্ক নিয়ে বসা। ডেভিড যোশুয়াকে নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্যই করছে না মিতিনমাসি। একটা উত্তেজনার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হল ভেবে টুপুর তো রীতিমত হতাশ। এর মধ্যে মাঝে-মাঝেই কলকাতার ইহুদিদের সম্পর্কে পার্থমেসোর জ্ঞান শুনতে হচ্ছে টুপুরকে। ১৮৮১ সালে নাকি কলকাতায় প্রথম ইহুদি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে নাকি এখন একটাও ইহুদি ছাত্র নেই। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতায় ইহুদিদের সংখ্যা নাকি পৌঁছেছিল ছ' হাজারে। তখন নাকি তারা একটা সমিতি গড়েছিল। খেলাধুলো করার নিজস্ব ক্লাব। 'সেমা' নামে নাকি একটা মাসিক পত্রিকাও বের করত তারা। এরকম হাজারও রকম হাবিজাবি তথ্য গিলতে-গিলতে টুপুরের তো কান ঝালাপালা।

হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেল আমূল। এমনিতে প্রতিদিনই সকাল পাঁচটায় উঠে পড়ে টুপুর। সেদিনও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু স্নিকার পরে বেরনোর আগে হঠাৎ ফোন। মিতিনমাসিই গিয়ে ধরেছে। টুকরো-টুকরো কথা বলে ফোন রেখে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। কপাল টিপে ধরেছে।

মাসিকে এতটা বিচলিত বড় একটা দেখেনি টুপুর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল গো?"

"মার্কুইস স্ট্রিট থেকে," মিতিন শুকনো গলায় বলল, "ডেভিড যোশুয়া যে ভয়টা পাচ্ছিলেন প্রায় সেটাই ঘটেছে।"

"মানে? ডেভিড যোশুয়া মারা গেলেন নাকি?"

"না। মৃত্যু হয়েছে র‍্যাচেল যোশুয়ার। কাল রাতে।"

॥ ৫ ॥

বাড়িটা আজ অদ্ভুত রকমের নিঝুম। আগের দিনও যে খুব সাড়াশব্দ ছিল তা নয়, কিন্তু আজ যেন কেমন ছমছম করছে। নাকি টুপুরেরই মনে হল এমনটা? র‍্যাচেল যোশুয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে বলে? হবেও বা।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়িতে পা রাখতেই যতীনের মুখোমুখি। মলিন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। নীরবে দেখিয়ে দিল দোতলায় ওঠার রাস্তা।

উপরে এসে মিতিন আর টুপুর থমকাল ক্ষণেক। ডান দিকের প্রথম ঘরটায় চার-পাঁচজন মানুষ। প্রত্যেকেই বয়স্ক এবং পোশাক চিনিয়ে দিচ্ছে তাঁরা সকলেই ইহুদি।

সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অতি নিম্ন স্বরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না?"

"আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আর এ আমার বোনঝি ঐন্দ্রিলা। আমরা মিস্টার যোশুয়ার ডাক পেয়ে এসেছি।"

"ও। আপনি বুঝি ডিটেকটিভ? ডেভিড আমাকে আপনার কথা বলছিল বটে।" ভদ্রলোক সামান্য মাথা নোওয়ালেন, "অধীনের নাম এপ্রাহিম নাহুম।"

"আমি আপনাকে চিনি। নিউ মার্কেটের দোকানে অনেকবার দেখেছি।"

"আমি ধন্য। আবার এ কী মিসহ্যাপ হল বলুন তো? একই পরিবারে এক বছরে তিন তিনজনের মৃত্যু," এপ্রাহিম ব্যথিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন, "এখন তো মনে হচ্ছে, ডেভিড যা বলে সেটাই ঠিক। সত্যিই অশুভ কিছু একটা ঘটছে এ বাড়িতে।"

"হ্যাঁ। ঘটনাটা খুব উদ্বেগজনক।"

"আমরাও কয়েকজন মিলে সেটাই বলাবলি করছিলাম। কিছুতেই মানতে পারছি না, কাল সন্ধেবেলা যাঁকে সুস্থ হাসিখুশি দেখলাম, রাতেই কিনা শুনতে হল সে আর নেই?"

"কাল সন্ধেবেলা মিসেস যোশুয়ার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। শুধু র‍্যাচেল কেন, আমরা সমস্ত ইহুদিরাই তো মিলিত হয়েছিলাম আমাদের মঘেন ডেভিড সিনাগগে। কাল-পরশু দু' দিনই।"

"কোনও বিশেষ পরব ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। শাভুয়ত। তেত্রিশশো বছর আগে এই দিনই আমরা সিনাই পর্বতে দৈববাণী শুনেছিলাম। এখন তো কলকাতায় আমাদের কোনও পুরোহিত নেই, সমাজের মাথা হিসেবে আমাকেই এই দু'দিন প্রার্থনা পরিচালনা করতে হয়েছে। কাল তো প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর র‍্যাচেলের সঙ্গে আমার দু'-একটা বাক্যবিনিময় হল, তারপর র‍্যাচেল আর ডেভিড চলে এল বাড়িতে। তারপর রাত বারোটায় হঠাৎ ডেভিডের ফোন। খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ভোর হতে না-হতে ছুটে এসেছি," এপ্রাহিমের গলার স্বর সামান্য দুলে গেল, "র‍্যাচেলকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। খুবই ধর্মপ্রাণ ভাল মেয়ে ছিল। ডেভিড আর র‍্যাচেলের জুড়িটাও ছিল খুব মজবুত। একে অন্যকে চোখে হারাত। এখন যে বেচারা ডেভিডের কী হবে? কী করে যে ওর দিন কাটবে?"

"মিস্টার যোশুয়া এখন কোথায়?"

"এই ঘরেই আছে।"

"আমরা কি ভিতরে যেতে পারি?"

সামান্য ইতস্তত করে এপ্রাহিম বললেন, "আসুন। তবে অনুগ্রহ করে জুতোটা খুলে...। আর দয়া করে ওখানে কোথাও বসবেন না। আমরা ইহুদিরা এগুলো খুব মানি তো।"

মিতিনের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকে টুপুর দেখল প্রকাণ্ড একটি খাটে শুয়ে আছেন র‍্যাচেল। দেখে বোঝাই যায় না দেহে প্রাণ নেই, যেন ঘুমিয়ে আছেন। পাতলা একটা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। খাটের পাশে একখানা বেঁটে টুলে ডেভিড। খাটের অন্য প্রান্তে আর একটি নিচু আসনে এক প্রবীণা ইহুদি। ঘরের বাকিরা মেঝের কারপেটে আসীন। র‍্যাচেলের মাথার দিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি মোমবাতি। সকালের আবছা-আবছা আলোমাখা ঘরে ওই দীপশিখা যেন শোকের আবহকে আরও গভীর করেছে।

খাটের কাছে গিয়ে একদৃষ্টে র‍্যাচেলের শায়িত দেহখানা দেখছিল মিতিন। ডেভিড যোশুয়া মৃদু স্বরে বললেন, "আমি আপনারই প্রতীক্ষা করছিলাম। চলুন, নীচে গিয়ে বসি।"

বেরনোর আগে ঝটিতি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল টুপুর। ড্রয়িংরুমের মতো না হলেও এ ঘরখানাও বিশাল। দু'-দু'খানা জাঁদরেল কাঠের আলমারি, চারখানা চেয়ার সমেত একদিকে গোল টেবিল, চেস্ট অফ ড্রয়ার, পুরনো ওয়ালপেপারে মোড়া দেওয়ালে লোহার সিন্দুক, ডেভিড আর র‍্যাচেলের যুগল ছবি....। অল্পবয়সি সুন্দরী র‍্যাচেলের ছবিও আছে একখানা। এক কিশোরের সঙ্গে। সম্ভবত কিশোরটি র‍্যাচেলের ছেলে। আছে আরও বেশ কয়েকটি পারিবারিক ফোটোগ্রাফ। ঘরে একধারে একটা মানুষপ্রমাণ আয়না। সাদা কাপড়ে ঢাকা। কেন ঢেকেছে? ইহুদিদের নিয়ম কি?

একতলার ড্রয়িংরুমে এসে সোফা নয়, সরাসরি কারপেটে বসে পড়লেন ডেভিড। আজও তাঁর পরনে কালো কোট। তবে বুকের কাছে ডান দিকটা ছেঁড়া। ইহুদিদের শোকের চিহ্ন। ডেভিডের দেখাদেখি মিতিন আর টুপুরও বসল কারপেটে।

ডেভিড নরম গলায় বললেন, "কিছু মনে করবেন না। শোকের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের উচ্চাসনে বসার নিয়ম নেই।"

মিতিন বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। মিসেস যোশুয়ার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। এই মুহূর্তে আপনাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা নেই।"

ডেভিড নিশ্চুপ।

মিতিন আবার বলল, "আপনার ছেলে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে

গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। রাতেই তাকে জানিয়েছি। সম্ভবত আজ লন্ডন থেকে ফ্লাইট ধরবে। আশা করছি, কাল পৌঁছে যাবে," বলতে-বলতে স্বরটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল ডেভিডের, "দেখলেন তো আবার মৃত্যু এসে কেমন হানা দিল এ বাড়িতে?"

"হুঁ।"

"ঠিক আবার সেই পরবের দিন। যাওয়ার কথা ছিল আমার, ভুলক্রমে র‍্যাচেল চলে গেল।"

"মিস্টার নাহুম বলছিলেন, আপনারা কাল সন্ধেবেলা সিনাগগে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। এপ্রাহিমই তো টেন কম্যান্ডমেন্ট্স পাঠ করল। তারপর বাড়ি ফিরে বেশ আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছিল। গানবাজনা, হাসি-রঙ্গ। তারপর কী যে হয়ে গেল!"

"কে-কে এসেছিল কাল?"

"যারা সাধারণত আসেন। আমাদের বন্ধুরা। ইহুদি সমাজের ছিল মাত্র দু'জন। বেঞ্জামিন আর সারা। আপনারা তো সারাকে দেখলেন। উপরে আমার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন।"

"উনি বুঝি আপনার মিসেসের খুব বন্ধু ছিলেন?"

"হ্যাঁ। ওরা দু'জনে মিলেই তো খাবার-টাবার সার্ভ করছিল। তখনও র‍্যাচেল রীতিমত হেইল অ্যান্ড হার্টি।"

"অসুস্থ হলেন কখন?"

"শরীর খারাপ তো দেখিনি। অন্তত আমার নজরে পড়েনি।"

"তা হলে কী করে মারা গেলেন? কখন মারা গেলেন?"

"সময় তো সঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত তখন এগারোটা বাজে। কাল তো খুব গরম ছিল, সকলকে বিদায় জানিয়ে আমি একটু বাইরেটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ যতীন এসে বলল, ম্যাডামের গতিক ভাল ঠেকছে না, আপনি এক্ষুনি একবার উপরে যান। দোতলায় উঠে দেখি র‍্যাচেল যেন কেমন অদ্ভুত ভাবে বসে আছে চেয়ারে। মুখ ঝুঁকে পড়েছে টেবিলে। দু' হাত ঝুলছে দু' দিকে। ভীষণ ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করলাম। সে বেচারা তখনও বাড়ি পৌঁছয়নি, কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাক করে এল। র‍্যাচেলের নাড়ি দেখেই বলল সব শেষ।"

"তক্ষুনি আমাকে ফোন করলেন না কেন?"

"আমার মাথা কাজ করছিল না ম্যাডাম। তা ছাড়া আমাদের ইহুদিদের অনেক নিয়মকানুন আছে। নিজেদের সমাজের লোকজনদের খবর দিতে হয়, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থার জন্য জানাতে হয়। প্রথমে সারা-বেঞ্জামিনকে ফোন করেছিলাম, তারপর একে একে...। মৃতদেহ তো একা ছাড়ার নিয়ম নেই, তাই রাতভর আমরা ওখানেই আছি।"

"ডাক্তারবাবু কি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছেন?"

"না। বললে হয়তো লিখে দিত। আমি নিইনি," ডেভিড একটু চুপ থেকে বললেন, "তখনই ডাক্তারকে বলে দিয়েছি এবার আমি কারও আপত্তি শুনব না। র‍্যাচেলের বডির পোস্টমর্টেম আমি করাবই। ওর মৃত্যুর সঠিক কারণ আমি জানতে চাই। ডাক্তারও বলল, রাত্তিরটা ভাবুন। যদি সিদ্ধান্ত বদলান, তো সকালে এসে সার্টিফিকেট দিয়ে যাব। নইলে পোস্টমর্টেমের জন্য রেফার করব।"

"ও। তা এখন কী ভাবছেন?"

"আমি সিদ্ধান্তে অটল। ডাক্তারও এক্ষুনি এসে পড়বে। তারপর পুলিশকে...," ডেভিডের গলাটা করুণ হয়ে গেল, "ম্যাডাম, আপনার তো অনেক চেনাজানা, দেখুন না যদি বলে-কয়ে আজকের মধ্যে পোস্টমর্টেমটা করিয়ে দিতে পারেন, তা হলে বড় উপকার হয়।"

"কালই কবর দিতে চান, তাই তো?"

"না। আগামী কাল শনিবার। স্যাবাথ। ওই দিন আমাদের কবর দিতে নেই। আগামী কালটা র‍্যাচেল পিস হ্যাভেনের বরফের বিছানায় ঘুমোবে। আশা করছি, তার মধ্যেই সাইমনও পৌঁছে যাবে। তারপর রোববারই...। আমি সেভাবেই সব কিছু রেডি করতে বলেছি নাথানকে।"

"কে নাথান?"

"যে আমাদের কবর দেওয়ার ব্যাপারস্যাপারগুলো দেখভাল করে। খুব ভাল ছেলে। এই তো, খবর পেয়ে সকালেই এসেছিল...।"

কথার মাঝেই দরজায় এক গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সি। এক হাতে ব্রিফকেস, অন্য হাতে হেলমেট। মিতিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সসম্ভ্রমে বললেন, "আপনিই তো সেই বিখ্যাত মহিলা ডিটেকটিভ?"

মিতিনের ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি, "আপনি আমায় চেনেন?"

"টিভিতে দেখেছি। অপরাধীদের মানসিকতা নিয়ে আপনি একটা টক শো-তে ছিলেন। আমি তো নানা ধরনের রোগী চরিয়ে খাই। তার মধ্যে খুনি-বদমাশও থাকে। আপনার বক্তব্যটা শুনতে তাই বেশ লাগছিল।"

"ও। আপনিই তা হলে মিস্টার যোশুয়াদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান?"

"ওই পরিচয়টা এখন গৌণ হয়ে গিয়েছে। হেলমেট পাশে রেখে ডাক্তারবাবু বসে পড়েছেন কারপেটে, "আমি রণেন সামন্ত। এঁদের পরিবারেরই একজন। তাই না ডেভিড?"

"বটেই তো। বন্ধুও বটে। ছোট ভাইও বটে। তুমি পাশে-পাশে থাকো বলে কত ভরসা পেতাম। কিন্তু তুমি এবারও শেষরক্ষা করতে পারলে না।"

"আমার কপাল ডেভিড। কেন যে সুস্থ লোকগুলো এভাবে চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়!" রণেন সামন্তর মুখ ম্রিয়মাণ। অনুচ্চ স্বরে বললেন, "কী ঠিক করলেন? পোস্টমর্টেমই তো?"

"সেটাই তো উচিত। মনে যখন একটা খটকা আছে, মীমাংসা একটা হয়ে যাওয়াই ভাল।"

পাশে রাখা ব্রিফকেসখানা খুললেন রণেন। ডেভিডের ইচ্ছেমাফিক খসখস কলম চালাচ্ছেন। মিতিন একটু দূরে উঠে গিয়ে ফোন করল অনিশ্চয় মজুমদারকে। সংক্ষেপে জানাল ঘটনাটা এবং ময়নাতদন্তের জরুরি প্রয়োজনটুকুও। ফিরে এসে ডেভিডকে বলল, "চিন্তা করবেন না। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এসে যাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। যদি ময়নাতদন্তে কিছু পাওয়া যায়...। আমি নিশ্চিত কিছু একটা পাওয়া যাবেই। আপনি কেসটার তদন্ত করবেন তো?"

"আমি আপনার পাশে আছি মিস্টার যোশুয়া," শোকার্ত বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে রণেনের দিকে ফিরল মিতিন, "আপনাকে কি একটা-দু'টো প্রশ্ন করতে পারি ডক্টর সামন্ত?"

"শিওর। ডেভিডের পরিবারের স্বার্থে আপনি আমায় হাজারটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন।"

"কাল রাত্তিরে আপনি যখন ফিরে এলেন, তার কতক্ষণ আগে মিসেস যোশুয়া মারা গিয়েছে বলে আপনার ধারণা?"

লেখা শেষ করে কাগজখানা প্যাড থেকে ছিঁড়ছিলেন রণেন। একটা ভাঁজ করে ডেভিডকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার ডাক্তারি জ্ঞান বলছে বড়জোর মিনিট পনেরো-কুড়ি। কারণ, তখনও ম্যাডামের বডি ওয়াজ নট দ্যাট কোল্ড।"

"তা হলে মিসেস যোশুয়ার মৃত্যুর সময়টা কী রকম দাঁড়াচ্ছে?"

"ডেভিডের ডাক পেয়ে আমি এ বাড়ি এসেছিলাম এগারোটা পাঁচে। অতএব ম্যাডামের ডেথটা কোনও ভাবেই দশটা পঞ্চাশের আগে নয়।"

"আচ্ছা, মিস্টার আব্রাহাম, মিসেস আব্রাহাম এবং মিসেস যোশুয়া, তিনটে মৃতদেহই তো আপনি দেখেছেন? তিনটে মৃত্যুই কি অবিকল এক রকম বলে আপনার মনে হয়েছে?"

"হ্যাঁ। মোটামুটি সিমিলার। তিনজনেরই আকস্মিক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু।"

"ব্যাপারটা কি খুব স্বাভাবিক?"

"অস্বাভাবিকই বা বলি কী করে। তেমন কোনও প্রমাণ তো পাইনি। তবে...।"

"কী তবে?"

"কিছু-কিছু আনন্যাচারাল ডেথেও হার্ট অ্যাটাকই ঘটে। কিন্তু আদতে সেটা খুন।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন যদি ব্লাডে এয়ার বাব্‌ল ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়। তারপর ধরুন, এমন কিছু বিষ আছে যা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে রক্তে মিশলে হার্ট চিরতরে থেমে যাবে। পোস্টমর্টেমে তা ধরা পড়া কঠিন। অনেক সময়ে ভিসেরা পরীক্ষাতেও তা পাওয়া যায় না।"

"কী বিষ?"

"আছে নানান রকম। আফ্রিকানরা গাছগাছালি থেকে তৈরি করে। তিরের ফলায় মাখানোর জন্য। ওই তির সামান্য ক্ষত তৈরি করলেও মৃত্যু এবং সেই মৃত্যু সিম্পল হার্ট অ্যাটাকই দেখাবে।"

"হুম," মিতিন কী যেন ভেবে নিয়ে ডেভিডকে বলল, "মিস্টার যোশুয়া, আপনি যে ভয় দেখানো কলগুলো পেয়েছিলেন, সেই নম্বর তিনটে আমায় দিতে পারেন?"

"এক্ষুনি? আমাকে তো উপরে গিয়ে নোটবুক দেখে..."

"নো প্রবলেম। আমায় ফোনে জানিয়ে দেবেন।" মিতিন ব্যাগ খুলে নিজের কার্ডটা বাড়িয়ে দিল, "এখানে ল্যান্ডলাইন ছাড়া আমার মোবাইল নম্বরও আছে। আমরা তবে আপাতত চলি?"

ডেভিড আর রণেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের গাড়ি পর্যন্তও পৌঁছয়নি মাসি-বোনঝি, পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। লাফিয়ে নামলেন এক অফিসার, দুই কনস্টেবলকে নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন বাড়ির অন্দরে।

মিতিন স্টার্ট দিল গাড়িতে। গেটের মুখে থামতে হল। প্রবেশ করছে আর একখানা প্রাইভেট কার। পিছনের সিটে এক বয়স্ক অবাঙালি ভদ্রলোক। ফরসা গোলগাল মুখ, মাথাজোড়া টাক, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

মিতিন ফিসফিস করে বলল, "সম্ভবত শ্যামচাঁদ অগ্রবাল।"

"দাঁড়িয়ে গেলে হত না?" টুপুরের চোখ চকচক, "ভদ্রলোককে একটু বাজিয়ে দেখতে।"

"এক্ষুনি কী দরকার। দেখা তো হবেই। আজ নয়তো কাল," গাড়িটাকে কাটিয়ে বেরিয়ে এল মিতিন। ঈষৎ আনমনা মুখে বলল, "একটা পুরনো কেস মনে পড়ছে, বুঝলি।"

"কী গো?"

"বছর কুড়ি আগে ভাগলপুরে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল। ওখানে রইস বাঙালি পরিবারগুলোয় গুরু সেজে বসেছিল সাধুটা। তখনই বেশ কয়েকটি পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। সাধুটাই কিছু একটা করছে ভেবেছিল পুলিশ। কিন্তু ধরতে পারেনি। পরে দেখা গিয়েছিল, ওই পরিবারগুলোর অনেক ধনরত্নই ওই সাধুবাবার মতো নিপাত্তা। বছর চারেক আগে গোয়াতেও সিমিলার ইন্সিডেন্ট ঘটেছিল। তিন-চারটে পর্তুগিজ পরিবারে পরপর অদ্ভুত ভাবে কয়েকটা মৃত্যু। সেখানেও একজন সাসপেক্ট ছিল, ধরা পড়েনি।"

"সেই সাধু কি এবার কলকাতায় হানা দিয়েছে? অস্বাভাবিক মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালাচ্ছে?"

মিতিন জবাব দিল না। আদৌ টুপুরের প্রশ্নটা শুনল কি, বুঝতে পারল না টুপুর।

॥ ৬ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল এখনও ফুরোয়নি। নারকেলডাঙার ইহুদিদের কবরখানা থেকে ফিরছিল টুপুররা। দুপুর আড়াইটে নাগাদ মেগন ডেভিড সিনাগগ ঘুরিয়ে গোরস্থানে আনা হয়েছিল সাদামাঠা কাঠের কফিনে ভরা র‍্যাচেলের দেহ। একটু আগে প্রার্থনা-টার্থনা সেরে তাঁকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট একটা জমায়েত মতো হয়েছিল, চলে গিয়েছেন সকলে। শুধু টুপুররাই রইল আরও খানিকক্ষণ। ঘুরে-ঘুরে দেখছিল ভিতরটা। ঝোপঝাড় জঙ্গল মতো হয়ে গিয়েছে, তারই মাঝে-মাঝে কত অজস্র কবর। কোনওটার উপরে উঁচু-উঁচু সৌধ, আবার কোনওটায় বা ছোট-ছোট ফলক। প্রতিটি সমাধিতেই দুর্বোধ্য হিব্রু ভাষায় কিছু লেখা। তার নীচে ইংরেজিতে নাম-ধাম-জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। নামগুলো দেখতে-দেখতে, পড়তে-পড়তে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়, পুরনো কলকাতার একটা ছবি ভেসে ওঠে চোখের পরদায়। পার্থ তো দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছিল গোরস্থানের পাহারাদারটির সঙ্গে। মিতিন না তাড়া লাগালে তাকে হয়তো সন্ধের আগে বেরই করা যেত না।

আজ স্টিয়ারিংয়ে পার্থ। শিয়ালদহ ফ্লাইওভার পেরিয়ে আলগা প্রশ্ন ছুড়ল, "এখন কি সোজা গৃহে প্রত্যাবর্তন?"

পিছনের সিট থেকে মিতিন বলল, "উঁহু। একবার মার্কুইস স্ট্রিটে যাব।"

"কী হবে গিয়ে? শোকের বাড়ি... ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিরা ভিড় করে আছে।"

"তা হোক। অনেকেই থাকবে... সম্ভব হলে আজই একটু কথাবার্তা বলব।"

"প্রয়োজন আছে কোনও? পোস্টমর্টেমে তো কিছুই মেলেনি।"

সত্যিই তাই। এবারও ময়নাতদন্তে কোনও অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। সাধারণ হার্ট অ্যাটাক বলেই রায় দিয়েছেন মর্গের ডাক্তার। গতকাল খবরটা পেয়ে গুম হয়ে গিয়েছিলেন ডেভিড। পরে অবশ্য তিনি মিতিনকে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুল নড়তে রাজি নন, নিজের মতো করে তদন্ত চালাক মিতিন। টুপুরও অবশ্য ভেবে পাচ্ছিল না এর পর মিতিনমাসির কী-ই বা করার থাকতে পারে।

পার্থকে জবাব দিতে গিয়ে মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল সামান্য। ভারী গলায় বলল, "পোস্টমর্টেমের রিপোর্টই ধ্রুব সত্য নয়। তার চোখেও তো ধুলো দেওয়া যায়।"

পার্থর পাশ থেকে টুপুর বলে উঠল, "তুমি কি ওই ডক্টর সামন্তর কথা ধরে বসে আছ? মিসেস যোশুয়ার বডিতে এয়ার বাব্‌ল ঢোকানো হয়েছে? কিংবা কোনও জটিল বিষ-টিস্‌?"

অসম্ভব তো নয়?"

"কিন্তু তা হলে তো বডিতে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন থাকবে। তেমন কিছুও তো মেলেনি।"

পার্থ বলল, "একদম ঠিক। যত ছোট ক্ষত হোক, মৃত্যুর পর সেখানে একটা কালো স্পট হবেই।"

"সরি। এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তা ছাড়া মিসেস যোশুয়ার যা বয়স, তাতে এমনিতেই চামড়ায় নানা স্পট থাকতে পারে। সুতরাং একটা কালচে ফুটকি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব," মিতিন সিটে হেলান দিল। দৃষ্টি গাড়ির বাইরে মেলে দিয়ে বলল, "তবে ডেডবডির একটা-দু'টো অস্বাভাবিকতা কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি।"

"যেমন?"

"প্রথমত, মিসেস যোশুয়ার মৃত্যু যদি এগারোটায় ঘটে থাকে, আমি তাঁকে দেখেছি তার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে। এই সময়ের মধ্যে মৃতদেহ শক্ত হতে শুরু করে ঠিকই, কিন্তু অতটা বিবর্ণ হওয়ার তো কথা নয়। তা ছাড়া ওঁর হাতের একটা অংশ চাদরের বাইরে ছিল। সেখানে কবজির কাছের জায়গাটা একটু যেন বেশি কালচে দেখাচ্ছিল।"

"ঘরে তো তেমন আলো ছিল না। তুমি তার মধ্যেই বুঝতে পারলে?"

"একেবারে নিশ্চিত নই। তবু মনে হল...," মিতিন বাইরে থেকে মুখ ফেরাল, "এবার সক্কলকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স থেকে তো কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এমনকী, প্রমাণও।"

পার্থ ঠাট্টা ছুড়ল, "একেই বলে নেই কাজ তো খই ভাজ!"

"ভুলে যেও না, খই ভেজেও অনেকের পেট চলে মশাই।"

হালকা হাসিঠাট্টায় কেটে গেল বাকি পথটুকু। মিস্টার যোশুয়ার

ফটকে যতীন দাঁড়িয়ে। মিতিন অবাক মুখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কেন?"

"স্যার আমায় থাকতে বলেছেন। যদি চেনাজানা কেউ আসে, ভিতরে নিয়ে যেতে।"

পার্থকে ভিতরে গাড়ি রাখতে বলে মিতিন গেটেই নেমে পড়ল। দেখাদেখি টুপুরও। যতীনের সামনে এসে মিতিন বলল, "তোমার মুখ-টুখ তো খুব শুকনো হয়ে আছে। ম্যাডামের মৃত্যুতে তুমিও দেখছি খুব শক পেয়েছ?"

যতীন অল্প মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, "ম্যাডাম আমায় বড় স্নেহ করতেন। প্রায় ছেলের মতো দেখতেন। আমার আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

"বুঝতে পারছি। তা তুমিই তো বৃহস্পতিবার রাতে স্যারকে গিয়ে প্রথম দুঃসংবাদটা দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। নীচ থেকে গ্লাস-প্লেট জড়ো করে উপরের রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই নজরে এল ম্যাডাম যেন কেমন করছেন।"

"ঠিক কী করছিলেন উনি?"

"বুক চেপে ধরে জোরে-জোরে শ্বাস টানছেন। আর মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। তারপর আচমকাই ঘাড়টা কেমন ঝুলে গেল, উনি নেতিয়ে পড়লেন।"

"অর্থাৎ তখনও উনি জীবিত?"

"হ্যাঁ। তবে স্যার আসার পরে আর বোধ হয় প্রাণ ছিল না।"

"সময়টা মনে আছে?"

"তখনও এগারোটা বাজেনি। স্যার ডাক্তারবাবুকে ফোন করার পর বড় ঘড়িতে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল।"

"তখন তো বাড়িতে আর কোনও অতিথি নেই?"

"না। দশটার পর থেকেই তো একে-একে চলে গেলেন। সাড়ে দশটার পর বাড়ি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।"

"মোট ক'জন ছিলেন সেদিন?"

"স্যার আর ম্যাডামকে বাদ দিয়ে পাঁচজন। বেঞ্জামিন সাহেবরা স্বামী-স্ত্রী, প্রোফেসর স্যার, শ্যামবাবু, আর ডাক্তারবাবু।"

"কে কার পর বেরিয়েছিলেন, তোমার মনে আছে?"

"দাঁড়ান, একটু চিন্তা করে বলি," যতীনের চোখ সরু হল। ঠোঁটখানা ছুঁচলো করে বলল, "প্রথমে গেলেন প্রোফেসর স্যার, তারপর স্যার-ম্যাডামরা, তারপরে শ্যামবাবু আর ডাক্তারবাবু তো একসঙ্গে গল্প করতে-করতে...।"

"তা কী করে হয়? ডাক্তারবাবুর তো স্কুটার, শ্যামবাবুর তো মোটরগাড়ি?"

"ঠিক কথা ম্যাডাম। তবে যে-যার গাড়িতে ওঠার আগে অনেকক্ষণ কথা বলছিলেন, আমি দেখেছি। স্যারও তো ছিলেন সঙ্গে। ওঁরা চলে যাওয়ার পরও স্যার দাঁড়িয়ে রইলেন।"

"হুম, সেদিন সন্ধে থেকে কী-কী ঘটেছিল একটু বলবে?"

"স্যার আর ম্যাডাম তো বেঞ্জামিনসাহেবের গাড়িতে ওঁদের ধর্মস্থানে গিয়েছিলেন। ফিরলেন প্রায় আটটায়। বাকিরাও তার পরপরই এলেন। দুপুরে আমি আর মেমসাহেব কিছু খাবার তৈরি করে রেখেছিলাম। সেগুলো পরিবেশন করা হল। বেঞ্জামিনসাহেব বাড়িতে তৈরি করা রেড ওয়াইন এনেছিলেন, আমি সেটা গ্লাসে-গ্লাসে ঢেলে দিলাম। উৎসবের রাতে নাকি ওটা খেতে হয়। তারপর গানবাজনা, গল্পগুজব হচ্ছিল। তখন আমি ওঘরে ছিলাম না। পরে পার্টি শেষ হওয়ার মুখে-মুখে ডেভিডস্যার আমায় একবার ডেকেছিলেন। র্যাচেল ম্যাডামের হাতের গ্লাসটা কী করে যেন পড়ে ভেঙে গিয়েছিল, অনেকটা পানীয় পড়েছিল ওঁর গায়ে। আমাকে বললেন কাচ-টাচগুলো পরিষ্কার করতে। ম্যাডামকে একটা তোয়ালেও এনে দিলাম হাত আর ড্রেস মোছার জন্যে।"

"তারপর?"

"আর তো তেমন কিছু ঘটেনি। বেঞ্জামিন সাহেবরা চলে যেতে ম্যাডাম উঠে গেলেন উপরে। তারপর তো পার্টিও শেষ হয়ে গেল।"

"এর পর ম্যাডামকে ফের দেখলে একেবারে শেষ সময়ে? তাই তো?"

জবাব দেওয়ার আগে যতীন সহসা শশব্যস্ত। একটা পুরনো মারুতি ঢুকছে। চাপা স্বরে বলে উঠল, "প্রোফেসরস্যার এসে গিয়েছেন।"

ফটকের মুখ থেকে সরে দাঁড়াল মিতিন। যতীনকে বলল, "ওঁর সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দাও।"

আলাপের পালা সাঙ্গ হতেই যতীন ফের গেটে গিয়ে দাঁড়াল। মিতিনদের দেখে হিরণ্ময় যেন তেমন খুশি নন। কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, "ডেভিড কিন্তু তিলকে তাল করছে। পুলিশ-ডিটেকটিভের ঝামেলায় না জড়ালেই ভাল করত।"

সাদামাঠা চেহারার চশমাধারী বছর সত্তরের হিরণ্ময়কে একবার জরিপ করে নিল মিতিন। শান্ত স্বরেই বলল, "মিস্টার যোশুয়াকে আপনার মতামতটা জানিয়েছিলেন কী?"

"বহুবার। শুধু ডাক্তারই ওর তালে তাল দিয়ে যাচ্ছে," হিরণ্ময় আস্তে-আস্তে এগোচ্ছেন গাড়িবারান্দার দিকে। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "তা সন্দেহের কিছু পেলেন?"

"খুঁজছি।"

"বেশ। চালিয়ে যান অনুসন্ধান।"

"আপনার দেওয়া যতীন ছেলেটি কিন্তু বেশ স্মার্ট।"

হিরণ্ময় যেন চমকে তাকালেন। পরক্ষণে গলা ঝেড়ে বললেন, "একটু চালাক-চতুর না হলে কি বুড়োবুড়িদের সামলেসুমলে রাখতে পারে?"

"ঠিক," মিতিন মৃদু হাসল, "তা আপনিও কি ডাক্তারবাবুর মতো কাছাকাছিই থাকেন?"

"খুব দূরে নয়। আমার বাড়ি ভবানীপুর। সাত নম্বর নন্দন রোডে।"

"নিজেদের বাড়ি?"

"জেরা করছেন নাকি?" হিরণ্ময় খর চোখে তাকালেন, "আমার কিন্তু এসব একদম পছন্দ নয়। আর এ বাড়ির বর্তমান পরিবেশ আপনার কৌতূহলের পক্ষে একেবারেই বেমানান।"

কথাগুলো বলেই বাড়ির অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন হিরণ্ময়। দু'-এক সেকেন্ড থমকে থেকে মিতিনরাও প্রবেশ করল একে-একে। ডেভিড আর সাইমন ড্রয়িংরুমের কারপেটে বসে। হিরণ্ময়ও স্থান নিয়েছেন তাঁদের পাশে।

মিতিন নিচু স্বরে ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কতক্ষণ আগে ফিরলেন?"

"সময়ের আর হিসেব নেই ম্যাডাম। আধঘণ্টাটাক হবে।"

"আমরা এসে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?"

"না-না। আপনারা শবানুগমন করেছেন। আজ আপনারা এই পরিবারের সম্মাননীয় অতিথি। রেবেকা, মানে আমার সাইমনের বউ, ডিমসেদ্ধ তৈরি করছে। অনুগ্রহ করে খেয়ে যাবেন। এটা আমাদের রীতি।"

হিরণ্ময় সামান্য অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, "সরি ডেভিড। আমারও আজ সিমেট্রিতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বাড়িতে লোক এসে গেল বলে বেরোতে পারলাম না।"

"তো কী আছে? মনে-মনে তো তুমি পাশেই ছিলে। নিশ্চয়ই র্যাচেলের আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করেছ?"

"অবশ্যই। তবে নিজের হাতে কবরে মাটি দিতে পারলাম না, এ আক্ষেপ আমার রয়েই গেল," হিরণ্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নরম গলায় বললেন, "তোমাদের তো আরও সাতদিন শোক পালন করতে হবে, তাই না?"

"সূর্যাস্তের আগে ফিরেছি। সুতরাং আরও ছ' দিনই যথেষ্ট। তবে এখন তো ধাপে-ধাপে অ্যাভেলিউট চলবে। সাত দিন, তিরিশ দিন, এক বছর। সাইমনরা অবশ্য তিন দিন পরে ফিরে যাচ্ছে। ওর ব্যবসা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, রেবেকার অফিস।"

"হ্যাঁ প্রোফেসর। আমার কোনও উপায় নেই," বছর পঞ্চাশের

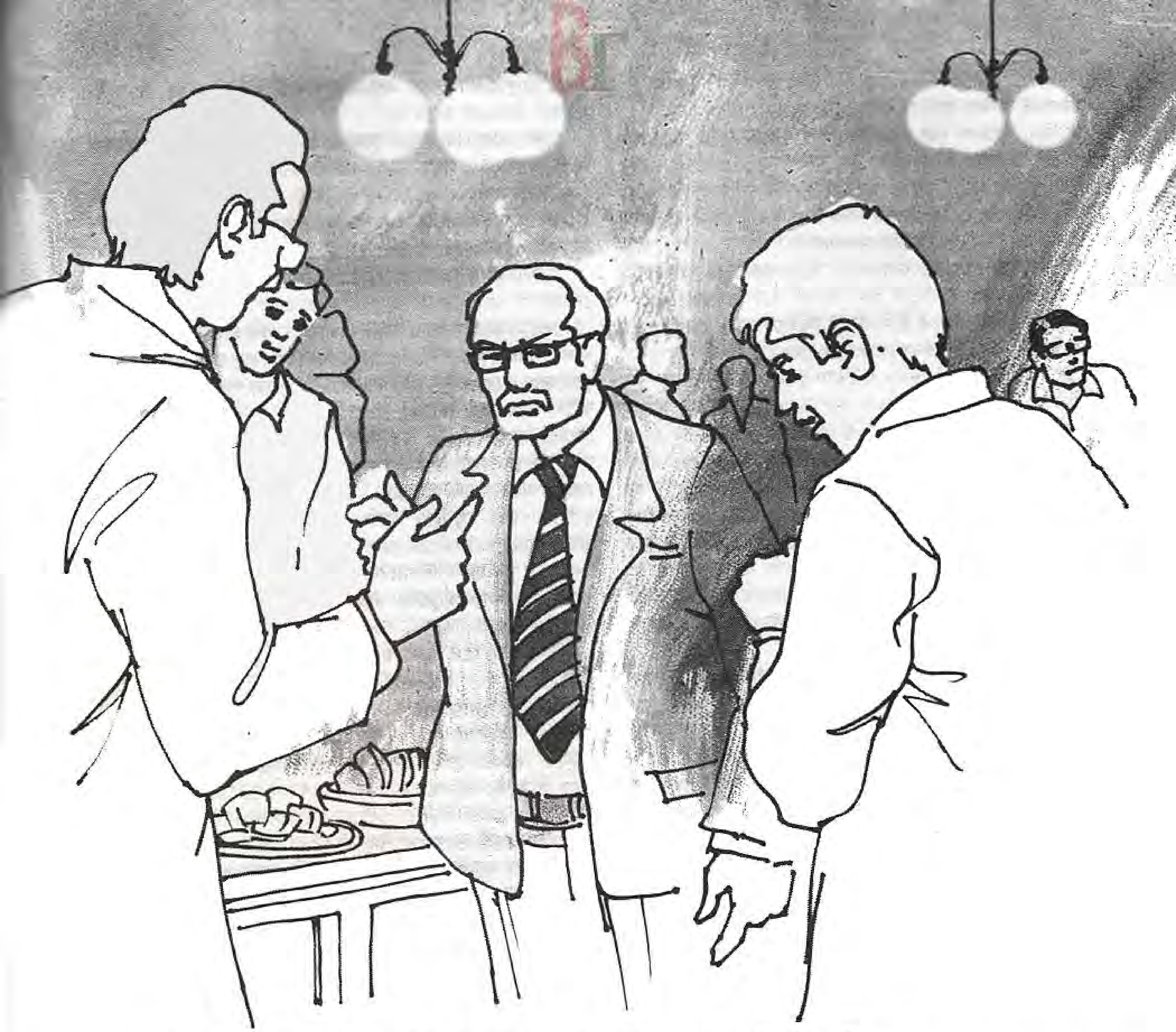

সাইমনের স্বর শোনা গেল। ডেভিডের মতোই তাঁর পরনে এখনও কবরখানার পোশাক। ফুলহাতা কালো কোটের বাঁ দিকে বোতামঘর লম্বা করে কাটা। মুখমণ্ডলে দু'-তিন দিনের না কামানো দাড়ি। চুল উসকোখুসকো। চোখে উদভ্রান্ত ভাব। নিচু গলায় বললেন, "বাবাকে কতবার বলছি, এবার ঘরদোরে তালা মেরে দাও। বেঞ্জামিন আংকলকে চাবি দিয়ে পাকাপাকি চলে এসো লন্ডনে। শুনছেনই না।"

"এক্ষুনি-এক্ষুনি তা হয় নাকি? র‍্যাচেল এই শহরে শেষ নিশ্বাস ফেলল। তার প্রথম বছরের ক্রিয়াকর্ম না হলে কি আমি নড়তে পারি?"

"এ সবই তোমার বাহানা। আমি কি আজ প্রথম তোমায় চলে আসতে বলছি? এই শহরের আর আছেটা কী? ডেভেলপার আর ধান্দাবাজ প্রোমোটারে চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। শহরের মধ্যিখানে এই জমিবাড়ি নিয়ে তুমি প্রতিদিন তাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছ।"

"আমিও তো ডেভিডকে তাই বলি," হিরণ্ময় বলে উঠলেন, "মোটামুটি ভাল দাম পেলে বেচে দিয়ে ছেলের কাছে চলে যাও।"

"মাঝখান থেকে আমি মাকে হারালাম," সাইমন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "এখন বলছ মাকে নাকি কেউ মেরে দিয়েছে। লন্ডনে থাকলে এমনটা কখনও ঘটত না।"

ডেভিড অসহায় স্বরে বললেন, "রাগ করছিস কেন? জিহোভা তার কপালে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন।"

"ভাগ্যের দোহাই পেড়ো না ডেভিড," হিরণ্ময় ঈষৎ বিরক্ত মুখে বললেন, "অত যদি জিহোভার উপর বিশ্বাস, তা হলে ডিটেকটিভ লাগিয়েছ কেন?"

"বা রে, আমাকে প্রাণের ভয় দেখানো ফোন আসছে, তারপর বাড়িতে একের পর-এক মৃত্যু...। আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব?"

"ওটাও তোমার আর একটা ওজর," সাইমন গজগজ করছে, "ওরকম ফোন কি আমিও পাইনি? সেভ ইওর পপ! রিমুভ হিম ফ্রম ক্যালকাটা!"

"তোমার কাছেও ফোন গিয়েছে?" ডেভিডের চোখে বিস্ময়, "কই, বলোনি তো?"

"তুমি আরও নার্ভাস হতে পার ভেবে জানাইনি। তবে ইহুদিরা তো তাদের জন্মলগ্ন থেকে এই ধরনের শাসানি শুনে আসছে, তাই আমলও দিইনি খুব একটা।"

"কোত্থেকে গিয়েছিল ফোনটা? নিশ্চয়ই কলকাতা?"

"না। একটা স্ট্রেঞ্জ নম্বর। সম্ভবত আমেরিকার।"

মিতিন বহুক্ষণ ধরে শুনছিল তিনজনের কথোপকথন। হঠাৎ বলে উঠল, "কবে পেয়েছিলেন ফোনটা স্মরণে আছে কী?"

সাইমন সামান্য চিন্তা করে বললেন, "তা বেশ কয়েক মাস আগে

হবে।"

"নিশ্চয়ই মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর আগে নয়?"

"না-না। আংকল তো গেলেন রোশ হাসান্নার সময়ে। তখন আমাদের ইহুদিদের পরব চলছিল। ইন ফ্যাক্ট ফোনটা পেয়েছি সম্ভবত ক্যাথলিন আন্টির মৃত্যুর পর। এ বছর জানুয়ারির শেষে।"

"আপনিও তো মোটামুটি ওই সময় থেকেই...?" মিতিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, "তাই না মিস্টার যোশুয়া?"

বৃদ্ধ মানুষটি অস্ফুটে বললেন, "হুঁ। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে...।"

মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। চোখ ঘুরিয়ে দেখছে ঘরের সকলকে। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তার চোয়াল।

॥ ৭ ॥

তিন-তিনটে দিন কেটে গেছে। তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে, আদৌ এগোচ্ছে কি না, কিছুই বুঝতে পারছিল না টুপুর। মিতিনমাসি হয় ঘণ্টার পর-ঘণ্টা কম্পিউটারে বসে থাকে, নয়তো মোবাইলে বকবক করে এর-ওর-তার সঙ্গে। হুটহাট বেরিয়েও যাচ্ছে যখন-তখন। কখনও তিন ঘণ্টা, কখনও পাঁচ ঘণ্টা। জিজ্ঞেস করলেও সদুত্তর মেলে না। মুচকি হেসে বলে, "এখন চলছে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ। বাসমতী চাল ঘেঁটে দেখছি কাঁকর মেলে কিনা।" এরকম হেঁয়ালিভরা জবাব শুনলে আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়?

বৃহস্পতিবার সকালে মিতিনের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর দেখা গেল। জলখাবারের টেবিলে টোস্ট চিবোতে-চিবোতে বলল, "এবার তো রণক্ষেত্রে নেমে পড়তে হয় রে টুপুর।"

মাসির কাছে ক'দিন পাত্তা না পেয়ে টুপুর মনে-মনে বেশ আহত ছিল। অভিমানী সুরে বলল, "কেন? পাঁজিতে বুঝি এবার শুভক্ষণ বেরিয়েছে?"

"অনেকটা তাই," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "সাইমনের যাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কাল সন্ধেবেলার ফ্লাইটে তিনি সপরিবার ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন।"

"তোমার এনকোয়ারির সঙ্গে সাইমনের কী সম্পর্ক?"

"কিছুই না। তবে মিস্টার যোশুয়া নিষেধ করেছিলেন কিনা। তাঁর ছেলে চাইছিলেন না শোকের সময়ে এসব তদন্ত-টদন্ত হোক," মিতিন ডিমসেদ্ধ ভেঙে মুখে পুরল, "একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে।"

"কী রকম?"

"আমিও খানিকটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নিলাম।"

"যেমন?"

"যতীনের সম্পর্কে খানিকটা খোঁজখবর নিলাম।"

"কী জানলে?"

"ও চাকরি করছে এক বছরেরও কম। ডেভিড আর র‍্যাচেল ছেলের কাছ থেকে ফেরার পর যতীন মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছে।"

"তো?"

"তিনটে মৃত্যুর সময়েই যতীন মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে মজুত। সুতরাং ফাউল প্লে যদি কিছু ঘটে থাকে, সে তার সাক্ষীও বটে, সাসপেক্টও বটে। তারপর ধর প্রোফেসর, ডাক্তার, শ্যামচাঁদ সকলের সম্পর্কেই কিছু-কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি।"

"কী রকম? কী রকম?"

"ছটফট করছিস কেন। সময় হলেই জানতে পারবি। শুধু শুনে রাখ তিনজনের কেউই নিখাদ ভালমানুষ নন।"

পার্থ নীরবে খাচ্ছিল। খেতে-খেতেই খবরের কাগজের শব্দজব্দে ব্যস্ত। পুটুস করে বলে উঠল, "ওরকম ভাসা-ভাসা কিছু ইনফরমেশন আমিও দিতে পারি।"

"তাই বুঝি?"

"ইয়েস ম্যাডাম টিকটিকি। যেমন ধরো, কলকাতার ইহুদি সমাজে একটা চালু গুজব আছে। মাটুকদের যে কী ধনরত্ন আছে, তা নাকি মাটুকরা নিজেরাই জানে না।"

"কে বলল তোমায়? কোনও ইহুদির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ নাকি?"

"সরি। কলকাতার কোনও ইহুদিরই আমার বন্ধু হওয়ার বয়স নেই। সকলেই সত্তরের ওপারে। মাত্র এক পিসেরই বয়সটা কম। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ সে কে?"

"নাথান?" টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "যে কবরখানাটা পাহারা দেয়?"

"ওকে অত সামান্য ভাবিস না। ও কলকাতার সমস্ত ইহুদি পরিবারেরই কেয়ারটেকার। তাদের বিপদেআপদে ডাক পেলে অমনি ছুটে যায়। আর কেউ মারা গেলে সমাধি দেওয়া পর্যন্ত সব দায়িত্ব ওর কাঁধে। নাথানের বাবা-মা মারা গিয়েছেন, দাদা-দিদিরা সব চলে গিয়েছে ইজরায়েলে, ও একা কলকাতার ইহুদিদের জন্য পড়ে আছে। সব ইহুদি পরিবারই ওকে কিছু-কিছু মাসোহারা দেয়, তাতেই ওর চলে কোনও মতে। পার্থ হাতের কাগজখানা সরিয়ে রাখল। মুখে একটা ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে বলল, "কাল বিকেলে গিয়েছিলাম নারকেলডাঙায়। নাথানের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছি। দেখলাম, ও এখানকার সব ইহুদি পরিবারেরই হাঁড়ির খবর রাখে। নাথানই আমায় বলল, আব্রাহাম মাটুকের ওই বাড়িতে গুপ্তধন থাকা মোটেই আশ্চর্যের নয়।"

"তুমিও তা হলে এখন ব্যাপারটা বিশ্বাস করছ?"

"ইয়েস। তবে আর একটা কথাও বলল নাথান। শুধু আব্রাহাম নন, তাঁর বাপ-ঠাকুরদারাও কোনও কালে গুপ্তধন খোঁজার চেষ্টা করেননি। ইহুদিদের ধর্মে নাকি বলে, পরিশ্রম করে যেটা পাবে, সেটুকুই তোমার প্রাপ্য। পূর্বপুরুষরা লোকচক্ষুর আড়ালে যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকেন, তবে ধরে নিতে হবে জিহোভা চান না ওটা কেউ পাক।"

"এবার আমি তোমাকে কিছু জানাই?" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "যাঁর সুবাদে মাটুকদের আর্থিক প্রতিপত্তি, সেই শ্যালোম কোহেন শুধু বাণিজ্যই করতেন না। আর পাঁচটা ইহুদিদের মতো তাঁর সুদের ব্যবসাও ছিল। কারবারটা শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও চলত। এক আফগান তাঁর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। সেই আফগান ছিল অনেক খনির মালিক। এখন যেখানে আফগানিস্তান-তাজিকিস্তানের বর্ডার, সেখানেই বদখ্‌শান প্রদেশে ছিল খনিগুলো। দামি-দামি পাথর মিলত বদখ্‌শানের খনিতে। সেই আফগানটি ধার শোধ করার সময় কোহেনকে সুদের বদলে দিয়েছিল এক বিশাল সাইজের চুনি। অতএব কোহেনের ছোট জামাইয়ের পরিবারে ওই চুনিটি থাকাও মোটেই আশ্চর্যের নয়।"

টুপুরের চোখ চকচক করে উঠল, "তা হলে কি আমরা সেই চুনি উদ্ধারে নামব এবার?"

"ওটা পরে ভাবব। আপাতত আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, তিনটে মৃত্যুর কারণ খোঁজা।" চা রেখে গিয়েছে আরতি। মিতিন কাপে চুমুক দিল, "এখন ফের সেই কাজই শুরু হবে।"

"মৃত্যুগুলো যে স্বাভাবিক নয়, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?"

"আগে খরগোশগুলোকে তো সংগ্রহ করি। তারপর দেখা যাক জুড়ে ঘোড়া হয়, না গাধা।"

"অর্থাৎ এখন চলবে ডেটা কালেকশন, তাই তো?" টুপুর উৎসুক চোখে তাকাল, "তা হলে আজ আবার আমরা ডেভিডসাহেবের বাড়ি যাচ্ছি?"

"তার আগে একবার শ্যামচাঁদ অগ্রবালের সঙ্গে মোলাকাত হওয়া দরকার।"

"কেন?"

"ধর, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাল ভাবে আলাপ জমানো। সেদিন কবরখানায় তো দু'টো- একটার বেশি কথা হয়নি।"

মিতিনমাসির কিছু যে একটা উদ্দেশ্য আছে, বুঝতে অসুবিধে হয়

না। টুপুর আর খোঁচাল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, "কখন বেরোচ্ছি আমরা?"

"দুপুরে। খাওয়া-দাওয়ার পরে সরাসরি ওঁর বাড়িতেই যাব।"

শ্যামচাঁদ অগ্রবালের নিবাসটি একেবারে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের উপরে। পুরনো এক পাঁচতলা বাড়ির গোটা দোতলাটা জুড়ে থাকেন শ্যামচাঁদ। গিয়ে বেল বাজাতেই দরজা খুললেন এক বয়স্কা মহিলা। মিতিন ফোন করে দিয়েছিল, মহিলা পরিচয় জেনে নিয়ে সামনের ঘরখানাতেই মাসি-বোনঝিকে বসিয়ে চলে গেলেন অন্দরে।

ঘরখানা মোটেই দেখার মতো নয়। ক্যাটকেটে সবুজ দেওয়াল, দামি-দামি আসবাব, কিন্তু সেগুলো রাখার কোনও ছিরিছাঁদ নেই, মাথার উপর পুরনো ফ্যানখানার যথেষ্ট বিবর্ণ দশা। একদম বড় রাস্তার উপর হওয়া সত্ত্বেও এই ভরদুপুরেও কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার। শ্যামচাঁদ যে এক ধনী মানুষ, ঘরখানা দেখে আন্দাজ করা কঠিন।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর দর্শন মিলল বছর সত্তরের মানুষটির। পরনে ধুতি-ফতুয়া। হাতে চৌকো মতো স্টিলের পানের ডিবে।

সোফায় বসতে-বসতে শ্যামচাঁদ বললেন, "হঠাৎ আমাকে কেন জরুরত পড়ল ম্যাডাম?"

মিতিন হেসে বলল, "জানেন নিশ্চয়ই, ডেভিডসাহেব আমাকে কী কাজে লাগিয়েছেন?"

"শুনেছি। লেকিন আমি কীভাবে আপনাকে মদত করতে পারি?"

"আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার জবাব দিলেই চলবে। তার বেশি আর কিছু দরকার নেই।"

"বহুত আচ্ছা, বলুন কী জানতে চান?"

"আপনার কী মনে হয়, পরপর তিনটে মৃত্যু হওয়াটা খুব স্বাভাবিক? না ডালমে কুছ কালা আছে?"

"ফালতু-ফালতু ওইস্যা ভাবব কেন? আমি তো কোনও কারণ দেখি না।"

"একটা কারণ কিন্তু এক্ষুনি বলতে পারি মিস্টার অগ্রবাল। বাড়ির লোকেরা পরপর এভাবে মারা গেলে ডেভিড সাহেব এ দেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হবেন। তখন সস্তায় জমি-বাড়িটা হাতিয়ে সেখানে পেল্লাই কিছু তৈরি করা এবং বিপুল মুনাফা অর্জন।"

"কী যে বলেন ম্যাডাম? এই কারণে কেউ কারও প্রাণ নিতে পারে?"

"পারে বইকী মিস্টার অগ্রবাল। আমিই তো একটা ঘটনা জানি। কলকাতারই এক নামী ডেভেলপার আলিপুরে একটা জমির দখল নিতে চাইছিল। সেখানে আদ্যিকালের এক বাড়িতে বাস করতেন একজন বৃদ্ধা। তিনি কিছুতেই বিক্রি করতে রাজি হচ্ছিলেন না। হঠাৎই তাঁকে একদিন বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই ডেভেলপারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করে বৃদ্ধার নাতি। অনেক কায়দাকানুন করে ডেভেলপার কেসটিকে ধামাচাপা দেয়। তবে সে আর প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায় থাকেনি। ছেলেদের হাতে বিজনেস ছেড়ে দিয়ে সে এখন শুধু উপদেষ্টার ভূমিকায় আছে," মিতিন ঝুঁকল একটু। চোখ সরু করে বলল, "আপনি তো ওই লাইনেই ছিলেন। চেনেন নাকি ডেভেলপারটিকে?"

অলস মেজাজে সোফায় উপবিষ্ট শ্যামচাঁদের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে সহসা। নার্ভাস গলায় বললেন, "তার সঙ্গে এই মৃত্যুগুলোর কী সম্পর্ক?"

"আছে কিনা কে বলতে পারে?"

"ওটা ফল্‌স কেস ছিল। আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"আবার জড়িয়ে যাবেন। কারণ, আপনি একাধিকবার মার্কুইস স্ট্রিটের জমি-বাড়ি কিনতে চেয়েছেন?"

"বিশ্বাস করুন, সিরিয়াসলি কিছু বলিনি। ওটা শ্রেফ কথার কথা। আব্রাহাম আমার পুরনো বন্ধু, তাই জাস্ট আলগা ভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম।"

"সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ। আপনি কিনতে আগ্রহী ছিলেন, তারপর একজন-একজন করে মারা যাচ্ছেন। অতএব সন্দেহের একটা তির আপনার দিকে যায় বইকী মিস্টার অগ্রবাল।"

শ্যামচাঁদের মুখখানা চুপসে-মুপসে এতটুকু। গলা দিয়ে আর স্বর ফুটছে না।

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "তা হলে মিস্টার অগ্রবাল, এবার যে প্রশ্নগুলো করব তার ঠিক-ঠিক উত্তর আমায় দেবেন তো?"

"বলুন না কী জানতে চান," শ্যামচাঁদের গলা মাখনের মতো নরম, "আমি তো আপনাকে কো-অপারেটই করতে চাই।"

"ডেভিড যোশুয়ার সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়?"

"আব্রাহামের সূত্রে অনেক বছর ধরেই চেনাজানা ছিল। অন্তত বছর পনেরো। তবে ডেভিড মার্কুইস স্ট্রিটে পাকাপাকি চলে আসার পর থেকে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তাও ধরুন, প্রায় তিন বছর হল।"

"পুরোপুরি সত্যি কিন্তু বললেন না। ডেভিডসাহেবের সঙ্গে তিন বছরের বেশি সময় ধরেই আপনার ঘনিষ্ঠতা। কারণ, তাঁর এজরা স্ট্রিটের বাড়ি আপনার অগ্রবাল কনস্ট্রাকশনই কিনেছে এবং সেখানে একটি শপিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে।"

শ্যামচাঁদের মুখ পলকে রক্তশূন্য। আমতা-আমতা করে বললেন, "ওই আর কী, তিন বছরের বেশি, মোটামুটি চার বছর।"

"কী দামে কিনেছিলেন?"

"দু' কোটি।"

"মাত্র?"

"ওঁর বাড়িতে অনেক টেনেন্ট ছিল। তাঁদেরও বহুত রুপিয়া দিতে হয়েছে।"

"ভয় দেখিয়ে তাঁদের তোলেননি নিশ্চয়ই? মস্তান-টস্তান লাগাননি?"

"ছি ছি, কী যে বলেন ম্যাডাম! আমি ওরকম আদমি নই। আমি বহুত শান্তিপ্রিয় আছি। এখন তো কারবার থেকেও মন উঠিয়ে নিয়েছি। সচ বাত।"

"সত্যি হলেই ভাল। তা মিস্টার আব্রাহামের সঙ্গে তো আপনার কারবারের সূত্রেই যোগাযোগ হয়েছিল, তাই না?"

"হাঁ। বহুত সাল পহেলে। বিশ-বাইশ বরস তো হবেই। আগে একটা পার্টনারশিপ ফার্ম ছিল, তখন সবে নিজের কোম্পানি খুলেছি। আব্রাহাম তখন বহুতবার আমাকে লোন দিয়েছেন। ইন্টারেস্ট বেশি নিতেন, লেকিন তুরন্ত টাকা মিলত ওঁর কাছ থেকে। যে-কোনও অ্যামাউন্ট। বিশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ, এক ক্রোর, যা আমি চাইতাম।"

"তা সেই সুদের কারবারীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়ে গেল?"

"একদিনে হয়নি। ধীরে-ধীরে হল। বহুত সাচ্চা ইনসান ছিল তো। হকের পাওনা ছাড়ত না, তবে আমাকে বিজনেসে বুদ্ধি-টুদ্ধি দিত। অনেক পড়াশোনা ছিল, আচ্ছা পিয়ানো বাজাত। ওর মউত-এ আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।"

"মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর রাতটা আপনার মনে আছে?"

"জরুর। মাসটা ছিল সেপ্টেম্বর। সেদিন ওদের বাড়িতে নিউ ইয়ার্সের পার্টি চলছিল।"

টুপুর বলে উঠল, "সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়ার্সের পার্টি?"

"ইহুদিদের ক্যালেন্ডার একেবারে আলাদা রে টুপুর," মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "শুরু হয়েছে খ্রিস্টাব্দের তিন হাজার সাতশো ষাট বছর আগে থেকে। মাসগুলোর নামও অন্যরকম। ইংরেজি বা রোমান প্যাটার্নের নয়। আরবি ধাঁচের।"

"ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। নিউ ইয়ারকে ওরা বলে 'রোস হাসান্না'। দু' দিন ধরে চলে উৎসব। তা সেটা ছিল শেষ দিন। ক্যাথলিন আর র‍্যাচেল দুই মেমসাহেব আচ্ছা-আচ্ছা খানা বানিয়েছিল। কেক আইসক্রিম...। আমার জন্য স্পেশ্যাল নিরামিষও ছিল। তো হল কী, ওদের ভাষায় গান-টান হল, আব্রাহাম বড়িয়া পিয়ানো বাজাল, আঙুর আর বেদানার শরবত খেলাম সবাই। শেষে আইসক্রিম খেতে গিয়ে আব্রাহামের গায়ে খানিকটা পড়ে গেল। নয়া ড্রেস খারাপ হয়ে গেল বলে আব্রাহামের কী মন খারাপ, আমরা তাই নিয়ে একটু হাসাহাসি করলাম। তারপর যাওয়ার সময় মিসেস আব্রাহাম আমাদের সবাইকে

একটা করে গিফ্‌ট দিলেন। আমি পেয়েছিলাম একটা কাঠের উট। ডাক্তার পেল চকোলেটের বাক্স। সেনসাহেবকে বোধ হয় কিতাব-টিতাব...।"

"তারপর?"

"পার্টি খতম হল রাত দশটায়।"

"মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর খবরটা পেলেন কখন?"

"সেই রাতেই। বারোটা, সাড়ে বারোটায়।"

"কে জানিয়েছিলেন? মিস্টার যোশুয়া?"

"না। ডাক্তার। ডক্টর সামন্ত।"

"তখনই কি পোস্টমর্টেমের সিদ্ধান্ত হয়েছিল?"

"তেমন তো কিছু বলেনি ডাক্তার। পরদিন ভোরবেলা গিয়ে শুনলাম বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো হচ্ছে। ক্যাথলিন মেমসাহেবের বুঝি আপত্তি ছিল, তবু ডেভিডের জোরাজুরিতে...। ডাক্তারও তো ডেভিডের ইচ্ছেয় সায় দিয়ে রিপোর্ট লিখল।"

"হুম," মিতিন ঘাড় দোলাল, "মিসেস আব্রাহামও তো এক পরবের দিন মারা গেলেন?"

"হাঁ। সেদিনও ওদের কী একটা যেন ছিল। ওই রাত্তিরে ওরা এক আজব কিসিমের কেক বানায়। পোস্ত-টোস্ত দিয়ে।"

"এটা কোন মাসে হয়েছিল?"

"জানুয়ারিতে। মাত্র ক' মাস আগে আব্রাহাম মারা গেছে তো, তাই খুব একটা আমোদ-আহ্লাদ হয়নি। আব্রাহামের উদ্দেশে প্রার্থনাও করলাম সেদিন। আমি অবশ্য সেদিন বেশিক্ষণ ছিলাম না, তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। সকালে ডেভিডের ফোন পেয়ে মিসেস আব্রাহামের খবরটা জানলাম।"

"মিসেস আব্রাহামের তো পোস্টমর্টেম হয়নি?"

"না ম্যাডাম। তবে সেবারও ডেভিডের খুব ইচ্ছে ছিল পোস্টমর্টেম করানোর। কেউ রাজি হয়নি বলে নাকি চেপে গিয়েছিল।"

"মিস্টার আব্রাহামের সময়ে কেউ ময়নাতদন্তে আপত্তি করেনি?"

"করেছিল বইকী। ওদের সমাজের কেউই চায়নি আব্রাহামের কাটাছেঁড়া হোক।"

"তা হলে মিসেস আব্রাহামের বেলায় কেন সেভাবে জোর করলেন না মিস্টার ডেভিড?"

"আমি কী করে বলব? ওর মনে কী ছিল আমি কী করে জানব?"

"হুম্‌," অনেকক্ষণ ঝুঁকে বসে ছিল মিতিন, এবার সোফায় হেলান দিয়ে বলল, "আচ্ছা শ্যামচাঁদজি, প্রোফেসর আর ডাক্তারকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?"

"ডাক্তার বিলকুল সিধাসাদা। তবে প্রোফেসর একটু নাকউঁচু আছে। আমার পড়ালিখা কম বলে আমায় নিয়ে কভি-কভি ঠাট্টা ভি করেন। আমি অবশ্য গায়ে মাখি না।"

"আপনি কি জানেন, মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে গুপ্তধন আছে?"

"সিডিতে ডেভিডের ইন্টারভিউটা শুনে জেনেছি।"

"সেটা কোন মাসে?"

"ডেভিড যেন কবে লন্ডন থেকে ফিরল? হাঁ, আগের বছর জুলাই-অগস্ট হবে।"

"মিস্টার আব্রাহামকে তো আপনি জমি-বাড়ি বিক্রির কথা বলেছিলেন। মিস্টার ডেভিড যোশুয়াকে ওরকম কোনও প্রস্তাব দিয়েছিলেন নাকি?"

"কভি নেহি। তবে বহুত প্রোমোটারের ওই মকানের উপর লোভ আছে। আমি জানি," বলেই শ্যামচাঁদ একটু গলা নামালেন, "দেখুন ম্যাডাম, ওই তিনজনের মউত্‌ নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু একটা বাত আমার মনে খচখচ করছে।"

"কী?"

"প্রোফেসরসাব যে লড়কাটাকে কাজের জন্য আব্রাহামকে দিয়েছিলেন, সে আসার পর থেকেই কিন্তু এক-এক করে তিনজন মারা গেল। জানি না, এ কোইনসিডেন্ট ভি হতে পারে!"

"অর্থাৎ আপনি বলছেন প্রোফেসরসাহেবই হয়তো কিছু...।"

"আমি কুছু বলছি না। যা মনে হল তাই বলে দিলাম। এখন আপনি ভাবুন এতে কোনও গড়বড় আছে কিনা।"

শ্যামচাঁদের ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি। মিতিন আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

॥ ৮ ॥

বেলা চারটে বাজে। জ্যৈষ্ঠের সূর্য এখনও দারুণ প্রখর। শ্যামচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির এসিটা চালিয়ে দিয়েছিল মিতিন, তাপটা তাই সেভাবে টের পায়নি টুপুর। মার্কুইস স্ট্রিটে পৌঁছে দরজা খুলে নামতেই গায়ে যেন আগুনের হল্‌কা। ঝটিতি গাড়িবারান্দার নীচে এসে তবে শান্তি। আদ্যিকালের কাঠামো তো, ছায়াতে শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

বেল বাজাতেই যতীন। খানিকটা যেন অবাক মুখেই বলল, "এখন আপনারা?"

মিতিন কেজো গলায় বলল, "এলাম। দরকার আছে।"

"ও। আসলে সাহেবের তো এখন শোকের সময় চলছে, বাইরের লোক তো বড় একটা আসছে না।"

"তাই বুঝি? তা সাহেব কোথায়?"

"উপরে।"

"তা হলে তো তাঁকে একবার ডাকতে হবে।"

"বসুন। খবর দিচ্ছি।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নীচে নেমেছেন ডেভিড। তবে একা নন, সঙ্গে সারা আর বেঞ্জামিন।

দাড়ি-গোঁফ ছাঁটা প্রবীণ বেঞ্জামিনের পরনে ইহুদি পোশাক। সারার অঙ্গে কালো গাউন। আজও কারপেটে আসন গ্রহণ করলেন তিনজনে। দেখাদেখি টুপুর-মিতিনও। ডেভিডের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে। বোঝাই যায়, এখনও র‍্যাচেলের মৃত্যুশোকটা সামলে উঠতে পারেননি।

কাতর স্বরে ডেভিড জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি তদন্ত শুরু করেছেন?"

"এই তো...সবে মাত্র...।"

"আর কি তার প্রয়োজন আছে? বেঞ্জামিন বলছিল...।"

"শুধু আমি নই," বেঞ্জামিনের ঘড়ঘড়ে স্বর বেজে উঠল, "আমি আর সারা দু'জনেই বোঝাচ্ছিলাম ডেভিডকে। এভাবে আপনজনদের চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখের। কিন্তু মৃত্যুগুলো নিয়ে অনর্থক শোরগোল তুলেই বা কী লাভ? বরং জিহোভার কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন শোক সইবার শক্তি দেন।"

সারা নরম গলায় বললেন, "সেই সঙ্গে র‍্যাচেলের আত্মাও শান্তি পায়।"

"আমি আর একটা পরামর্শও দিচ্ছিলাম ম্যাডাম," বেঞ্জামিন বললেন, "র‍্যাচেল যতদিন ছিল, ততদিন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ডেভিডের পক্ষে এখন তো আর কলকাতায় একা-একা থাকা সম্ভব নয়। এখন ওর শোকের প্রথম পর্ব চলছে। আমরাও রোজ আসছি। এখন তো বাড়িতে রান্নাবান্নার নিয়ম নেই, সারা খাবার-দাবারও তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরাও তো বুড়োবুড়ি, আমাদের পক্ষে এভাবে চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। এর পর হয়তো নিয়মিত আসতেই পারব না। তখন কে ওর দেখাশোনা করবে? শুধুমাত্র যতীনের ভরসায় এখানে পড়ে থাকা কি ওর পক্ষে সম্ভব? আপনিই বলুন?"

সারা বলে উঠলেন, "তাই বেঞ্জামিন বলছিল, আর কোনও ওজরআপত্তি নয়। ডেভিডের এখনই পাকাপাকি ভাবে লন্ডন চলে যাওয়াটাই সমীচীন।"

মিতিনের ভুরুতে পল্‌কা ভাঁজ, "আর এই জমি-বাড়ির কী হবে?"

"সে ব্যাপারটাও ভেবেছি। বাড়ি-জমি বিক্রি নিয়ে এখন টেনশন করার কোনও প্রয়োজন নেই," বেঞ্জামিন বললেন, "আপাতত আমিই দেখাশোনা করব। যদি ডেভিড পারমিশন দেয়, তা হলে এদিকে

কোনও প্রোমোটার-টোমোটারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারি। তারা না হয় ই-মেলে সাইমনের সঙ্গে দরদাম স্থির করবে। তারপর একবার বাপ-ছেলে একসঙ্গে এসে ব্যাপারটা চূড়ান্ত করে চলে যাক।"

"ভালই তো প্রস্তাবটা," মিতিন আড়চোখে দেখল ডেভিডকে, "তা মিস্টার যোশুয়া কি রাজি?"

"নিমরাজি মতো হয়েছে।"

"ও। তা কবে চলে যাবেন ঠিক করেছেন কিছু?"

"আগামী রোববার শোকের প্রথম পর্বটা চুকবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তিরিশ দিন বা এক বছরের রীতিনিয়ম নয় লন্ডনেই পালন করবে।"

"অতি উত্তম," মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "তবে যতদিন উনি আছেন, ততদিন একটু ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি।"

সারা বা বেঞ্জামিন কেউ যেন বিশেষ প্রীত হলেন না। গোমড়া মুখে সারা বললেন, "কী তদন্ত করবেন? করার আছেটা কী?"

"তেমন কিছু নয়। জাস্ট কিছু খোঁজখবর আর ক'টা প্রশ্নটশ্ন। মিতিন গলা ঝাড়ল, "যেমন ধরুন, তিনটে মৃত্যুর দিনই তো আপনারা ছিলেন, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েছিল কি?"

"একেবারেই না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনটেই হার্ট অ্যাটাকের কেস।"

"ব্যস, ওইটুকুই? শুনলাম, মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর দিন তার গায়ে হঠাৎ আইসক্রিম পড়ে গিয়েছিল? র‍্যাচেল ম্যাডামের গায়ে পড়েছিল লাল পানীয়ের গ্লাস? ভেঙে চুরচুর হয়ে গিয়েছিল?"

"পার্টিতে তো ওরকম হরবখতই ঘটে। ক্যাথলিনের গায়েও তো ফলের রস পড়েছিল। তারপর দিব্যি গটগটিয়ে উপরে গেল, ড্রেস বদলাল। যখন ফের সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে, তখনই দুম করে...।"

"ঘটনাটা কতক্ষণ পর ঘটেছিল স্মরণে আছে কি? আই মিন, গায়ে ফলের রস পড়ার কতক্ষণ পর হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল?"

"পনেরো-বিশ মিনিট তো হবেই। কিংবা আরও বেশি। ধরুন প্রায় আধ ঘণ্টা," বেঞ্জামিন বিরক্ত স্বরে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? আর জেনেই বা কী হবে আপনার?"

জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "উনি কি গায়ে ফলের রস মাখা অবস্থাতেই ড্রেস বদলাতে চলে গিয়েছিলেন?"

"আজব প্রশ্ন!" এবার সারা যেন একটু ঝেঁঝে উঠলেন, "এমনটা হয় নাকি? আমি মুছে দিয়েছিলাম।"

"আপনার রুমালে?

"না। কে একজন যেন দিল।"

"কে?"

"সে কি আর মনে আছে? থাকা সম্ভব?"

"একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন।"

"সরি," সারার কণ্ঠে এবার বিদ্রুপ, "চার মাস পরে আপনাকে বলতে হবে জানলে নিশ্চয়ই মনে গেঁথে রাখতাম। কিন্তু এখন তো সেটা আর পারব না।"

মিতিন চটল না। শান্ত ভাবেই বলল, "তবু একবার ভেবে দেখুন। প্রোফেসরসাহেব? ডাক্তারবাবু? মিস্টার অগ্রবাল? কিংবা যতীন?"

"যে কেউই হতে পারে। বেঞ্জামিন বা ডেভিড হতেই বা আপত্তি কী!" সারার বলিরেখা ভরা কপালে আরও ভাঁজ বাড়ল, "ওই রুমালটা কি খুবই রহস্যময়?"

মিতিন কোনও উত্তর দিল না। বেঞ্জামিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "মিস্টার আব্রাহাম আর মিস্টার যোশুয়ার লোকাল বন্ধুদের আপনারা তো বহুকাল চেনেন, তাই না?"

"প্রোফেসরসাহেব আর মিস্টার অগ্রবালের সঙ্গে অনেক বছরেরই আলাপ। ডাক্তার তো এ বাড়িতে হালে আসছে। অবশ্য তার আগেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।"

"কীভাবে?"

"আমাদেরই সমাজের আর একজনের বাড়িতে। এলিয়াস আসের। তার বোধ হয় মাসখানেক পর ওকে এই বাড়িতে দেখলাম।"

"ও। তা এঁরা লোক কেমন?"

"কেউই খারাপ নয়। দুনিয়ার সকলেই ভাল। শুধু মিস্টার অগ্রবাল একটু ধান্দাবাজ টাইপ। শুনেছি নিজের স্বার্থে খারাপ কাজ করতে পারেন। তবে...," বেঞ্জামিন সামান্য দম নিলেন, "আব্রাহাম বা ডেভিডের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা তেমন নয়। এখানে তো খোলা মনেই মেলামেশা করেন। অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়।"

ডেভিড অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে। সামনে যে এত কথা হচ্ছে, কিছুই যেন তাঁর কানে যাচ্ছে না। হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বললেন, "এসব প্রসঙ্গ আজ থাক না ম্যাডাম। আমার আর ভাল লাগছে না।"

"বেশ। থাক তবে," মিতিন অল্প কাঁধ ঝাঁকাল। মৃদু স্বরে বলল, "আপনার কাছে অন্য একটা রিকোয়েস্ট ছিল মিস্টার যোশুয়া।"

"বলুন?"

"আপনাদের এই বাড়িটা প্রথম দিন থেকে আমায় খুব টানছে। যদি অনুগ্রহ করে একটু ঘুরে দেখার অনুমতি দেন। বিশেষ করে দোতলার ঘরগুলো।"

ডেভিড ভাবলেন ক্ষণেক। তারপর বললেন, "চলুন সঙ্গে।"

পায়ে-পায়ে দোতলায় উঠল মিতিন আর টুপুর। ডেভিড-সারা-বেঞ্জামিনের পিছু-পিছু। প্রথমেই সেই ঘর, যেখানে মারা গিয়েছিলেন র‍্যাচেল। চেয়ার, টেবিল, টিভি, আলমারি, খাট, ড্রেসিংটেবিল সর্বত্রই চোখ বোলাল মিতিন। তারপর এসেছে পাশের ঘরে। এই কামরাখানা তেমন বড় নয়। তবে পুরনো আসবাবে মোটামুটি সুসজ্জিত। এ ঘরেই এখন বাস করছেন ডেভিড। আরও দু'খানা ঘর আছে দোতলায়। তালাবন্ধ অবস্থায়।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "ঘর দু'টো কি বন্ধই থাকে?"

ডেভিড বললেন, "হ্যাঁ। ওগুলো আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের ঘর। ক্যাথলিনের মৃত্যুর পর আমি দু'টোতেই তালা মেরে দিয়েছি।"

"আর একদমই খোলা হয় না?"

"র‍্যাচেল খুলত। প্রতি সপ্তাহে একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাফসুতরো করাত যতীনকে দিয়ে। ঘর দু'টো কি দেখতে চান?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়...।"

কোমর থেকে চাবির ভারী গোছা বের করলেন ডেভিড। খুলছেন বাঁ দিকের প্যাসেজের তৃতীয় ঘরখানা। মোটামুটি বড়ই। সাজানো-গোছানো। যত্নআত্তির ছাপ বেশ স্পষ্ট। মাথার উপর ছোট একটা ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে অজস্র বিবর্ণ হয়ে আসা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। বিশাল পালঙ্ক, আলমারি, পাথর বসানো ড্রেসিংটেবিল, ফ্রেমে বসানো দোলআয়না, সবেতেই কেমন মনকেমন করা প্রাচীন-প্রাচীন গন্ধ।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তের ঘরটিতে ঢুকে টুপুরের চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। কী পেল্লাই সাইজ রে বাবা! নীচের ড্রয়িংহলটার চেয়েও বড়। আরও আশ্চর্য, অত বড় ঘরে আসবাব প্রায় নেই বললেই চলে। ঘরের প্রায় মধ্যিখান দিয়ে তিন-তিনখানা সরু থাম উঠে গিয়েছে সিলিং পর্যন্ত। তাদের গায়ে বিচিত্র কারুকাজ। থামের ওপারে দু' খানা ভারী আরামকেদারা, একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে বই, বই, রাশি-রাশি বই।

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "এত বই? এটা লাইব্রেরি নাকি?"

"ঠিক ধরেছ," ডেভিড বললেন, "এ বাড়ি যিনি তৈরি করেছিলেন, এটা ছিল তাঁরই লাইব্রেরি।"

"কে তিনি? কী নাম?"

"শ্যালোম কোহেনের নাতি। স্যামুয়েল এজরা মাটুক। আব্রাহামের ঠাকুরদার বাবা। আব্রাহাম তার প্রপিতামহের ধারাটা বজায় রেখেছিল, এ ঘরেই কাটাত দিনের বেশির ভাগ সময়টা। প্রোফেসর এলে তো রীতিমত লেখাপড়ার আড্ডা জমে যেত এ ঘরে।

মিতিন কাছে গিয়ে থামগুলো দেখছিল। ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "থামের গায়ে ভারী সুন্দর ডিজাইন তো?"

"না-না, ওগুলো ডিজাইন নয়," ডেভিড প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওগুলো আমাদের ধর্মীয় লিপি। বাঁ দিকের থামে লেখা আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। মধ্যিখানে আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ

তালমুদ। আর একেবারে ডান দিকেরটায় রয়েছে আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন 'টোরা'। সবই আমাদের পবিত্র হিব্রু ভাষায় লেখা।"

বেঞ্জামিন বললেন, "স্যামুয়েল খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন তো, তাই ঘরেই ধর্মগ্রন্থ পাঠের বন্দোবস্ত করেছিলেন।"

ডেভিড বললেন, "শুনেছি সিরিয়া থেকে একজন লিপিকার আনিয়েছিলেন। ঘরের মাঝখানে থাম তিনখানা তুলে তাকে দিয়ে ধর্মগ্রন্থ খোদাই করিয়েছিলেন।"

"তার মানে এটা শুধু লাইব্রেরিই নয়, প্রার্থনার ঘরও বলা যায়," বলতে-বলতে হঠাৎ মিতিন ত্বরিত পায়ে ঘরের দরজায়। বিরস গলায় বলে উঠল, "তুমি এখানে কী করছ যতীন? কিছু বলবে?"

চৌকাঠের ওপারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা যতীন বেজায় থতমত। মিনমিন করে বলল, "না মানে... জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আপনারা শরবত-টরবত খাবেন কিনা?"

"ধন্যবাদ। কিছু লাগবে না। তুমি যেতে পার।"

প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছে যতীন। সেদিকে দু'-এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মিতিন আবার ফিরেছে, "এ বাড়িটার বয়স কত হল?"

"দেড়শোর চেয়ে কিছু কম। একশো ছেচল্লিশ।"

আর একবার থাম তিনটে নিরীক্ষণ করে দেওয়ালের বইগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল মিতিন। আলতো হেসে বলল, "সমস্ত বই-ই কি স্যামুয়েলসাহেবের সংগ্রহ?"

"সে তো বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে আব্রাহামও খুব বই-টই কিনত। সেগুলোও এখানে আছে কিনা। ওটা প্রোফেসরসাহেবই বলতে পারবেন। আমি তো খুব একটা পুস্তকপ্রেমী নই। অ্যাকাউন্টস লাইনের লোক, হোটেলের জমাখরচের হিসেব করে-করেই জীবন কেটে গিয়েছে।"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে," মিতিন আলগা ভাবে বলল, "ঘরখানা দেখে বেশ আনন্দ পেলাম। চলুন, এবার যাওয়া যাক।"

দোতলার রান্নাঘরখানায় একবার উঁকি মেরে নীচে নামল সকলে। হালকা পায়ে একটু ঘুরল একতলাটা। তারপর ডেভিডদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মিতিন আর টুপুর।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। পথে অফিসযাত্রীদের থিকথিকে ভিড়। ধীর গতিতে নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল মিতিন। টুপুর আড়ে-আড়ে দেখছিল মাসিকে। ধুরন্ধর শ্যামচাঁদ আর খিটখিটে বেঞ্জামিনের সঙ্গে কথা বলে লাভ হল কি কিছু? নাকি দিনটা বেকার গেল আজ? মাসির মুখ দেখে তো কিছুই ঠাহর করার জো নেই।

টুপুর সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী গো, কী বুঝছ? মিস্টার যোশুয়া তো বোধ হয় আর কেস নিয়ে এগোতে চাইছেন না?"

"অতই সোজা? আর কি পিছনোর জো আছে?"

"কেন নেই?"

"হাঁউ মাঁউ খাঁউ রহস্যের গন্ধ পাঁউ। কী বুঝলি?" টুপুর দু' দিকে মাথা নাড়ল। হেঁয়ালি করে কী যে সুখ পাচ্ছে মিতিনমাসি!

॥ ৯ ॥

রাত্তিরে আর কেসটা নিয়ে মাসির সঙ্গে কথা হল না টুপুরের। বাড়ি ফিরে সন্ধেবেলা পার্থমেসোকে আজকের অভিযানের আনুপূর্বিক বিবরণ শোনাল। সগর্বে নিজস্ব নানান মতামত জাহির করল পার্থমেসো। কিন্তু মিতিন সেদিকে ঘেঁষলই না। সে হঠাৎই কম্পিউটারে বেজায় ব্যস্ত। নৈশাহারের সময়টুকু ছাড়া নিজের খুপরি থেকে বেরলই না। কত রাতে যে শুয়েছে মাসি, তাও জানে না টুপুর।

সকালে এক বিচিত্র কাণ্ড। পার্থ সবে খেয়েদেয়ে নিজের প্রেসে গিয়েছে, ক'দিন বইখাতা নিয়ে বসা হচ্ছে না বলে টুপুর তখন হোমটাস্ক নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত, হঠাৎই ল্যান্ডফোন ঝনঝন।

মিতিন আজও সকাল থেকে কম্পিউটারে। টুপুর গিয়ে রিসিভার তুলেছে। ও প্রান্তে ডেভিডের গলা থরথর, "ম্যাডাম মুখার্জি আছেন?"

উদ্বেগজনক কিছু ঘটেছে আঁচ করে টুপুর বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"ওঁকে এক্ষুনি একটা খবর দেওয়া দরকার। আবার সেই ভুতুড়ে ফোনটা..."

"কী বলেছে আপনাকে?"

"না-না, আমাকে নয়। আমাদের প্রোফেসরসাহেবকে। আর কী আশ্চর্য, ফোনটা আমার ফোন থেকেই গিয়েছে!"

"তাই?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র প্রোফেসরসাহেব আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনিও তো মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না," ডেভিডের গলা কাঁপছে, "আমার খুব নার্ভাস লাগছে। তুমি এক্ষুনি মাসিকে জানিয়ে দাও।"

"নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।"

ফোনটা রেখেই টুপুর দেখল মিতিনমাসি বেরিয়ে এসেছে গলতা ছেড়ে। উত্তেজিত মুখে তাকে ডেভিডের কথাগুলো জানাল টুপুর। কিন্তু শুনেও মিতিনের কোনও হেলদোল নেই। অলস মেজাজে বসেছে সোফায়।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "কী গো, তুমি কি কলটাকে পাত্তা দিচ্ছ না?"

"দিচ্ছি তো।"

"তা হলে বসে পড়লে যে বড়? প্রোফেসর সেনের নম্বর তো আছে তোমার কাছে। জিজ্ঞেস করো ব্যাপারটা।"

"ছটোপাটির কী আছে? প্রোফেসর তো পালাচ্ছে না। বরং ফোনটা নিয়ে একটু ভাবি, কেমন?" বলেই মিতিন হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে। হতবুদ্ধির মতো মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল টুপুর। ঠোঁট উলটে ঘরেই চলে যাচ্ছিল, ফের ফোনের ঝংকার। এবার ল্যান্ডলাইন নয়, মিতিনের হাতের মোবাইল।

চোখ না খুলেই বোতাম টাপল মিতিন, "হ্যাঁ প্রোফেসর সেন, বলুন।"

বাহা রে বা, ফোনের ওপারে প্রোফেসর সেন স্বয়ং! খুবই হাউমাউ করছেন ভদ্রলোক। কথা বোঝা না গেলেও কণ্ঠস্বরটি শোনা যায়। মিতিন অবশ্য হুঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি, বটে ছাড়া বলছে না কিছু। তবে মাসির শেষ বাক্যে এইটুকু বোধগম্য হল, ভদ্রলোক এখনই আসছেন বাড়িতে।

টুপুর কিছু শুধোবার আগেই মিতিন বলে উঠল, "জানার জন্যে পেট ফুলছে তো?"

"বলার হলে বলো।"

"শোন, ভদ্রলোকের কাছে ফোন গেছে খানিকক্ষণ আগে। দশটা পনেরো নাগাদ। মেয়েলি গলায় কেউ একজন বলেছে, সেভ ডেভিড। টেল হিম টু লিভ কলকাতা।"

"মিস্টার যোশুয়ার নম্বর থেকে? মেয়েলি গলায়?"

"ইয়েস।"

"স্ট্রেঞ্জ! কী করে হয়?"

"অনেক কিছুই হয় রে টুপুর। চুপচাপ খেলা দেখে যা," বলেই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়েছে। ফোন লাগাচ্ছে ডেভিড যোশুয়াকে।

ওপারে সাড়া পেতেই গম্ভীর স্বরে বলল, "ফোন কলের নিউজটা পেয়েছি। দেখছি। এবার আমি আপনাকে ক'টা কথা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনুন। আমি জানি, ইহুদিরা শোকের প্রথম সাত দিন কোনও জামাকাপড় কাচাকুচি করে না। সুতরাং র‍্যাচেল ম্যাডাম মৃত্যুর দিন পার্টিতে যে পোশাকটি পরেছিলেন, এখনও নিশ্চয়ই সেটা ধোওয়া হয়নি? আপনি পোশাকটি আলাদা করে রাখুন, আমি আজই গিয়ে নিয়ে আসব। কারণটা আপনি পরে শুনবেন। মনে থাকবে নিশ্চয়ই?"

মিতিন ফোন অফ করতেই টুপুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "তুমি র‍্যাচেল ম্যাডামের ড্রেস দিয়ে কী করবে?"

"মাথা খাটা," মিতিন হালকা হাসল, "বুঝতে পারবি। আর মগজে

থিলু না থাকলে গিয়ে অঙ্ক কর।"

টুপুর আরও বেজার। গোমড়া মুখে ঘরে গিয়ে বীজগণিত নিয়ে বসেছে। কিন্তু মন দেবে কী করে? বাইরের ঘর টানছে না?

আধঘণ্টার মধ্যে বেলের আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এল টুপুর। হ্যাঁ, প্রোফেসর হিরণ্ময় সেনই বটে। বয়স্ক লোকটিকে যেন বেশ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে আজ। মিতিন আপ্যায়ন জানাতেই ধপ করে বসে পড়লেন সোফায়। চশমা খুলে কাচ মুছছেন।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?"

"না-না। আপনি তো বলেই দিলেন স্কুলের উলটো দিকের বাড়ি।"

"চা-শরবত কিছু চলবে?"

"না। শুধু এক গ্লাস জল।"

টুপুর জল এনে দিয়েছে। গ্লাসটুকু নিঃশেষ করে একটু বুঝি থিতু হলেন হিরণ্ময়। রুমালে মুখ মুছছেন।

মিতিন বসেছে মুখোমুখি। ঠোঁটে শুকনো হাসি টেনে বলল, "এবার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়েছে মিস্টার যোশুয়া অকারণে ভয় পাননি?"

"তাই তো দেখছি," হিরণ্ময় ঢোক গিললেন, "কিন্তু আমাকে ফোন করা কেন?"

"বোধ হয় দুষ্টু লোকটার ডেভিডের উপর করুণা হয়েছে প্রোফেসর সেন। এই শোকের সময় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে চায় না। তাই হয়তো বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে মিস্টার যোশুয়াকে শাসানোর পন্থা নিয়েছে," মিতিনের স্বর ক্রমশ কঠিন, "এবার নিশ্চয়ই এও বুঝতে পারছেন, মিস্টার আব্রাহাম, ম্যাডাম ক্যাথলিন, ম্যাডাম র‍্যাচেলের মৃত্যু সম্ভবত অস্বাভাবিক?"

"আমি কিস্সু বুঝতে পারছি না। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আপনি তো মোটেই নরম ধাতের মানুষ নন প্রোফেসর সেন।"

"আচ্ছা, এমন নয় তো, ডেভিডের ফোন থেকে কোনও মহিলা আমায় ফোনটা করেছেন? ডেভিডের অজান্তে?"

"কে করতে পারে?"

"মিসেস বেঞ্জামিন তো ও বাড়িতে সর্বদাই যাওয়া-আসা করেন।"

"সরি প্রোফেসর সেন। সারাম্যাডাম ফোনটা করেনি।"

"কী করে জানলেন?"

"কারণ, মিসেস বেঞ্জামিন আজ ও বাড়িতে যাননি। মিস্টার যোশুয়াকে আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছি।"

"তা হলে?"

"এমন নয় তো, মিস্টার যোশুয়ার ল্যান্ডলাইন থেকে আপনার কাছে কোনও ফোনই যায়নি? আপনি বানিয়ে বলছেন?" মিতিন গলার স্বর আরও দৃঢ় করেছে, "আপনার মোবাইলে নম্বরটা আছে?"

"না মানে...ফোনটা তো এসেছিল আমার ল্যান্ড লাইনে... হয়তো কলার আইডি ঘাঁটলে পাওয়া যাবে।"

"অর্থাৎ পরিষ্কার প্রমাণ নেই।"

"কিন্তু আমি মিথ্যে কেন বলব?"

"কারণ, আপনি মানুষটি যে একটু গোলমেলে। সাটুক পরিবারের সঙ্গে যে আপনার এতদিনের মেলামেশা তা তো অকারণে নয়।"

"মানে?"

"নিজের অতীত ইতিহাসটা একটু ভাবুন। আজ থেকে বারো বছর আগে আপনি একটা অভিযানে গিয়েছিলেন। বেশি দূরে নয়, মালদায়। গৌড়ে। আপনার ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে। ওখানে তখন অনেক খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। মাটির নীচ থেকে সুলতানি আমলের বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রাও মিলেছিল। বহুমূল্য সেই মুদ্রাগুলো হঠাৎ খোওয়া যায়। অভিযোগটা আপনার ঘাড়ে চেপেছিল কিন্তু। কিছুই হয়তো প্রমাণ হয়নি, কিন্তু আপনার টিম মেম্বারদের বিশ্বাস, আপনিই সেগুলো সরিয়েছিলেন।"

"বাজে কথা। মিথ্যে অপবাদ।"

"আপনি তা বলতেই পারেন। তবে কিনা আপনার মতো সন্দেহজনক অতীতের একজন মানুষ যখন যেচে একটি ইহুদি পরিবারের সঙ্গে আলাপ জমায়, আর সেই ইহুদি পরিবারটায় যদি গুপ্তধন-টুপ্তধন থাকে, তখন ব্যাপারটা একটু কেমন-কেমন লাগে না?"

"কী বলছেন আপনি? আব্রাহামের সঙ্গে আমার কত বছরের বন্ধুত্ব, ও আমাকে আরবি ভাষা শিখিয়েছে, ওর লাইব্রেরিতে বসে আমরা পড়াশোনা করতাম...।"

"বটে? নিছক জ্ঞানচর্চার কারণেই কি তবে যতীনকে ও বাড়িতে নিয়োগ করিয়েছিলেন? তাও আবার কিনা মিস্টার যোশুয়া গুপ্তধনের কাহিনিটা বিদেশেও শুনিয়ে এলেন তারপর? সেই যতীনও অষ্টপ্রহর সকলের উপর নজর রাখছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে অন্যদের কথা গিলছে এবং আপনার কাছে সেটা পৌঁছে দিচ্ছে," মিতিনের স্বরে মৃদু ধমক, "একটি বর্ণও আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

হিরণ্ময় রীতিমত মিইয়ে গেছেন। আমতা-আমতা করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।"

"সে আপনি পুলিশকে বলবেন। কারণ, আপনার দেওয়া লোকটি কাজে যোগ দেওয়ার পরই তিন-তিনজন মানুষ মারা গেলেন তো। ব্যাপারটা কতটা কাকতলীয় পুলিশ তো সেটা জানতে চাইবেই।"

"সর্বনাশ," হিরণ্ময়ের কপালে হাত, "পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছে নাকি?"

"না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের," মিতিন চোখ তেরচা করল, "যাক গে, যদি মনে পাপ নাই থাকে, সাফ-সাফ আমার প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। কিছু গোপন করবেন না কিন্তু।"

"প্রশ্নই আসে না। বলুন কী জানতে চান?"

"মৃত্যুর দিন মিস্টার আব্রাহামের গায়ে অনেকটা আইসক্রিম পড়ে গিয়েছিল। কীভাবে?"

আচমকা এ হেন জিজ্ঞাসায় হিরণ্ময় থতমত। তারপর অপ্রতিভ স্বরে বললেন, "সত্যি বলতে কী, দোষটা আমারই ছিল।"

"কীরকম?"

"কারপেটে না কিসে যেন হোঁচট খেয়ে এমন ভাবে আব্রাহামের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, ওঁর পুরো আইসক্রিমটাই...," হিরণ্ময় অপরাধী-অপরাধী মুখ করে বললেন, "অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে মুছেও দিয়েছিলাম।"

"আপনার রুমাল দিয়ে?"

"বের করতে যাচ্ছিলাম। তার আগে কে যেন এগিয়ে দিল।"

"কে? ডেভিড? বেঞ্জামিন? র‍্যাচেল? ডাক্তার? ক্যাথলিন? শ্যামচাঁদ? যতীন?"

"বোধ হয় ডাক্তার। না-না, বোধহয় ডেভিড। নাকি র‍্যাচেলই বোধ হয়...। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"আর এবার র‍্যাচেলম্যাডামের বেলায়? কে রুমাল দিলেন?"

"যতীন তো তোয়ালে এনেছিল। তার আগে অবশ্য দু'-তিনজন মিলে হাত-টাতগুলো মুছে দিচ্ছিল।"

"তাঁরা কারা?"

"ওই তো, সারা, ডাক্তার। তারপর আমিও রুমালটা দিলাম। যতীন তখন ভাঙা কাচগুলো সরাচ্ছিল।"

"মিস্টার অগ্রবাল হাত লাগাননি?"

"দূর দূর, শ্যামচাঁদের ওসব সেন্স আছে নাকি? অফিস বাড়ি-টাড়ি বানিয়ে অনেক পয়সা কামিয়েছে বটে, তবে প্রোমোটার হওয়ার ওর যোগ্যতা নেই।"

"আপনি কি অনেক প্রোমোটারকে চেনেন?"

"দু'-চারজনকে। আমার এক ভাইপোই তো...," বলেও কথাটা গপ করে গিলে নিলেন হিরণ্ময়। সতর্কভাবে বললেন, "তারা কেউই শ্যামচাঁদের মতো হাঙর-কুমির নয়। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আর্কিটেক্ট, প্রত্যেকেই সভ্যভব্য ব্যবসাদার।"

"হুম, ব্যাপারগুলো মোটামুটি বোঝা গেল," মিতিন ঠোঁট চাপল, "এবার আপনি আসতে পারেন।"

"তা হলে ফোনটার ব্যাপারটা কী হল?" হিরণ্ময়ের স্বরে ইতস্তত ভাব, "ডেভিডের কি তা হলে সত্যিই বিপদ?"

"এক্ষুনি বলা কঠিন। চারপাশে যা চাঁদের হাট নিয়ে বিচরণ করছেন ভদ্রলোক!" মিতিনের স্বরে চোরা হুল, "দেখছি কদ্দূর কী করতে পারি।"

ক্ষুব্ধ মুখে উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়। এক পা, এক পা করে দরজার দিকে এগোচ্ছেন। পিছন থেকে মিতিন ডাকল, "এক সেকেন্ড। যতীনের মোবাইল নম্বরটা দিয়ে যান তো।"

হিরণ্ময়ের নিস্প্রভ মণি পলকের জন্য জ্বলে উঠল। পরক্ষণে স্বাভাবিক। ফোন নম্বরটা আউড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ করে এসে টুপুর বলল, "ভদ্রলোকের উপর তুমি কিন্তু খুব অত্যাচার করলে।"

মিতিন নির্বিকার মুখে বলল, "প্রয়োজন ছিল।"

"যদি কোনও অপরাধ ঘটেও থাকে, এঁকে কি সন্দেহের তালিকায় রাখলে?"

"ফালতু কথা ছাড়," মিতিন উঠে দাঁড়াল, "খেয়ে উঠে বেরোতে হবে।"

॥ ১০ ॥

বাড়িটা গলির ভিতরে। ছোট্ট, কিন্তু দোতলা। বাইরে থেকে জানলা, দরজা আর দোতলার বারান্দার টানা রেলিং দেখে বোঝা যায় তালতলা অঞ্চলের আর পাঁচটা বাড়ির মতো পুরনোও বটে। তবে সম্প্রতি কলি ফেরানো হয়েছে। নতুন রঙের ছোঁয়া পেয়ে বাইরেটা এখন রীতিমত চকচকে। সদর দরজা খোলা। ঢুকতেই বাঁয়ে একটা সাইবার কাফে। ডান দিকে ডাক্তারের চেম্বার। সেখানে কাঠের নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে রণেন সামন্তর নাম।

মিতিন পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। অন্দরে একটি মাত্র ছোকরা বসে। মোবাইল নিয়ে কী যেন খুটখাট করছে।

মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "ডাক্তারবাবু নেই?"

ছোকরা মুখ তুলেছে। স্বরে বাড়তি ওজন এনে বলল, "বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঠিক ছ'টায় নামবেন। দেখাতে হলে নাম লিখিয়ে যান।"

"একটা অন্য কাজ ছিল," মিতিন নিজের ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিল, "এটা ডাক্তারবাবুকে গিয়ে দিন। উনি বুঝতে পারবেন।"

মোবাইল চর্চায় ব্যাঘাত ঘটায় ছোকরা বেশ বিরক্ত। কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিতিন-টুপুরকে জরিপ করল একবার। তারপর অন্য একটা দরজা দিয়ে গিয়েছে অন্দরে।

রোগীদের জন্য পাতা বেঞ্চিতে বসল মিতিন আর টুপুর। সামনেই খোলা জানলা। গরাদের ওপারে বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। বেশ কিছু লতানে গাছ গজিয়ে সেখানে। হাল্কা বেগুনি ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। দেখতে বেশ লাগছে।

ছোকরার প্রায় পিছন-পিছন হন্তদন্ত পায়ে রণেন সামন্ত উপস্থিত। অপ্রস্তুত স্বরে মিতিনকে বললেন, "একটা ফোন করে আসবেন তো! তা হলে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বসানো যেত। একা মানুষ বাস করি, উপরটা বড্ড অগোছালো হয়ে থাকে।"

"নো প্রবলেম। এখানেই বসছি।"

"না-না, আমার চেম্বারে আসুন।"

পাশেই একখানা পুঁচকে ঘর। একদিকে রোগী পরীক্ষার লম্বাটে বেড, অন্য দিকে টেবিল-চেয়ার। ডাক্তারের চেয়ারটি গদি-মোড়া। ঘরের কোণে একটি ছোট বেসিনও দৃশ্যমান।

মিতিনরা বসতেই ডাক্তার হাসি-হাসি মুখে বললেন, "হঠাৎ এই অভাজনকে কী দরকার পড়ল ম্যাডাম?"

মিতিন হাসল, "এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম আপনাকে একটা খবর জানিয়ে যাই।"

"কী?"

"মনে হচ্ছে মিস্টার যোশুয়াদের কেসটায় এবার ইতি টানতে হবে।"

"কেন, তদন্ত শেষ?"

"মোটামুটি।"

"কী বুঝলেন?"

"আমার কয়েকটা দিন বৃথাই নষ্ট হল।"

"তিনটে মৃত্যুর কোনওটাতেই কোনও রহস্য খুঁজে পেলেন না?"

"সেরকমই তো দাঁড়াচ্ছে," মিতিন ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বলল, "শুধু একটা ব্যাপারই কেমন খচখচ করছে।"

"কী বলুন তো?"

"তিনটে মৃত্যুর আগে একটা করে মাইনর ইনসিডেন্ট ঘটেছে এবং সেগুলো প্রায় সিমিলার।"

"আপনি কোন ঘটনার কথা বলছেন?"

"মনে করে দেখুন। তিনজনেরই গায়ে মৃত্যুর আগে কোনও না-কোনও খাবার বা ড্রিঙ্কস পড়েছিল। সেই খাদ্য বা পানীয় থেকে যদি এমন কোনও বিষক্রিয়া ঘটে থাকে, যার এফেক্ট সাধারণ পোস্টমর্টেমে ধরা পড়বে না। কমন হার্ট ফেলিওরই দেখাবে।"

"আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম, এরকম একটা আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না," ডাক্তার মিতিনের কথায় সায় দিলেন, "তো এখন আর সে ব্যাপারে তো কিছু করা যাবে না। একমাত্র বডিগুলোকে গোর থেকে তুলে যদি ফের টেস্ট করা যায়, তবে হয়তো...।"

"না-না, ওসব হাঙ্গামা করা আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া মিস্টার যোশুয়াও এখন আর কেসটা নিয়ে প্রসিড করতে তেমন আগ্রহী নন।"

"ওমা, তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কাল তো বলছিলেন এবার পাকাপাকি লন্ডনে চলে যাবেন।"

"পুওর সোল। ডেভিড কলকাতাকে খুব ভালবাসত," ডাক্তার ঝুঁকলেন সামান্য, "তা উনি বাড়িটা বিক্রির বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন?"

"করবেন নিশ্চয়ই। আপনার চেনাজানা আছে কেউ?"

"আমি তো একেবারেই অন্য লাইনের লোক। তবে ডেভিড বললে একটু খোঁজখবর করে দেখতে পারি।"

"করাই তো উচিত। আপনি বন্ধুলোক। মিস্টার যোশুয়ার আপনার উপর অগাধ আস্থা," বলতে-বলতে মিতিন থামল একটু। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, "সত্যি বলতে কী, সেই কারণে আপনি আমারও খুব ভরসার পাত্র। তাই আপনার একটু গাইডেন্স চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"তদন্ত তো এবার থেমেই যাবে। তবু একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছে," মিতিনের চোখ সরু, "আচ্ছা, আইসক্রিম কিংবা শরবত যা-ই গায়ে পড়ুক না কেন, তার ট্রেস নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির পোশাকে থাকবে?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ। থাকা উচিত।"

"তা হলে তো... মিস্টার আব্রাহাম আর ম্যাডাম ক্যাথলিনের পোশাক এখন আর অবিকৃত অবস্থায় মিলবে না, কিন্তু র‍্যাচেলম্যাডামের ড্রেস তো মজুত। এখনও ধোওয়া-কাচা হয়নি। তাই ভাবছি পোশাকটাকে ফরেনসিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি," মিতিন কৌতূহলী চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাল, "আইডিয়াটা কেমন?"

"ভাল। ভালই তো। আপনার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। তা কবে পাঠাচ্ছেন ফরেনসিকে?"

"শুভস্য শীঘ্রম। এক্ষুনি বন্দোবস্তটা করে ফেলি," বলেই মোবাইল বের করে মিতিন টকটক নম্বর টিপল। টুপুরকে হতবাক করে অবিকল সকালের বয়ানে মিস্টার যোশুয়াকে পোশাকটি সংরক্ষণের নির্দেশ দিল আবার। বাড়তি শুধু যোগ করল, পোশাকের প্যাকেটটি যেন নিচুতলার ড্রয়িংরুমে রাখা থাকে, পুলিশ কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর ফোন অফ করে স্মিত মুখে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত। যদি কিছু না পাওয়া যায় আমাদের সকলের মনের ধন্দটা কেটে যাবে, ঠিক কিনা?"

"একদম ঠিক। ডেভিডের মনেও স্বস্তি আসবে। তা উনি অ্যারেঞ্জ

করে রাখছেন তো?"

"এক্ষুনি করবেন বললেন। যতীন নাকি আজ ছুটি নিয়ে তার সোনারপুরের বাড়িতে গিয়েছে। রাত দশটার আগে ফিরবে না। তাই উনি নিজের হাতেই...।"

"ও," ডাক্তার হাসলেন, "তা আপনারা এখন যাবেন কোথায়? বাড়ি?"

"হুঁ, ক'জন গেস্ট আসার কথা," মিতিন কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, "ছ'টা তো বাজে। আপনারও তো রোগী দেখার সময় হয়ে এল।"

"আমার প্র্যাকটিসে তেমন আগ্রহ নেই। সকালে ঘণ্টা দুয়েক বসলাম, বিকেলে এক ঘণ্টা। একা মানুষ তো, এতেই চলে যায়।"

"মিস্টার যোশুয়ার বাড়িতে আপনার প্যাডটা দেখছিলাম। আপনি তো একসময় মিলিটারির ডক্টর ছিলেন, তাই না?"

"প্রায় কুড়ি বছর। গোটা ইন্ডিয়া চষে বেড়িয়েছি। এই তো বছর দুয়েক হল কলকাতায় ফিরেছি।"

"বাড়িটা কি আপনার নিজের?"

"ওই আর কী। হাতে তো কিছু পয়সাকড়ি পেয়েছিলাম, সস্তায় বাড়িটা কিনে নিয়েছি।"

"সাইবার কাফেটা কি ভাড়া দিয়েছেন?"

"দিলাম। যা আসে সেটুকুই লাভ।"

"শেষ একটা কৌতূহল। মিস্টার আব্রাহামের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল কী ভাবে?"

"নাহুমসাহেবের দোকানে যেতাম। সেখানেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব।"

"ও। চলি তা হলে আজ? ফরেনসিক রিপোর্টটা পেলে অবশ্যই আপনাকে জানাব। হোপফুলি কিছু মিলবে না।"

"আমিও সেই আশাই করি।"

বাড়ির দরজা পর্যন্ত মিতিনদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন ডাক্তার। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে গাড়িতে চাপল মিতিন আর টুপুর। মাসির আজকের কাজকর্ম, কথাবার্তা সবই কেমন ধোঁয়াশার মতো লাগছিল টুপুরের। দুপুরে বেরিয়ে আজ সোজা গেল মিস্টার যোশুয়ার বাড়ি। তাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে একটা প্যাকেট নিয়ে এল। সেটা নিয়ে জমাও করে এল লালবাজারে অনিশ্চয় মজুমদারের কাছে। প্যাকেটটাতে কি তা হলে র‍্যাচেলম্যাডামের ড্রেস ছিল না? অন্য আর

কিছু টেস্ট করতে দিয়ে এসেছে? তুৎ, সব জায়গায় টুপুরকে গাড়িতে বসিয়ে রাখলে টুপুর রহস্যখানা ভেদ করবে কী করে?

মিতিন গাড়ি স্টার্ট দিতেই টুপুর প্রশ্ন ছুড়ল, "তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো? তুমি তো নিজেই ফরেনসিক টেস্টের প্ল্যান করেছ। আবার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?"

মুচকি হেসে মিতিন বলল, "আমি তো আনাড়ি ডিটেকটিভ। একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেব না?"

"কিন্তু দুপুরে লালবাজারে ওই প্যাকেটটা?"

"আহ্, এত বকবক করিস কেন? সকালে যে বললাম, চুপচাপ খেলা দেখে যা!"

অগত্যা মুখে কুলুপ আঁটতেই হয় টুপুরকে। মনে যদিও অজস্র প্রশ্ন বুড়বুড়ি কাটছে। মাসি যখন বাড়ি না গিয়ে মিউজিয়ামের পাশের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করল, তখনও যেন খানিকটা অভিমানেই রা কাড়ল না টুপুর। মার্কুইস স্ট্রিটের দিকে যখন হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল মিতিন, তখনও না।

মিস্টার যোশুয়ার গেট দিয়ে ঢুকেই হঠাৎ যেন মিতিনের ভোল বদলে গিয়েছে। টুপুরের হাত ধরে টানল, "দাঁড়াও, আমরা এখন বাড়ির ভিতরে যাব না।"

টুপুর ভার গলায় বলল, "কেন? আমি সঙ্গে আছি বলে?"

"দুর বোকা। আয় আমার সঙ্গে।"

টুপুরকে টানতে-টানতে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে এল মিতিন। বলল, "একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়।"

"কী করব বসে-বসে?"

"আস্তে-আস্তে এক থেকে দু' হাজার গোন। মনে-মনে।"

মাসির এ কী আজব খেলা? তবে তার নির্দেশ তো অমান্য করার জো নেই, নিঃশব্দে আওড়াচ্ছে সংখ্যা। বিকেলও পড়ে আসছে ক্রমশ।

দেড় হাজার পর্যন্ত গোনা হল না, তার আগেই জোর চমক। ডাক্তারের স্কুটার ঢুকছে! টুপুর বিস্মিত মুখে বলে উঠতে যাচ্ছিল, "এ কী!" মিতিন হাতের ইশারায় তাকে বলল, চুপ।

গাড়িবারান্দার নীচে স্কুটার রেখে ডাক্তার বেল বাজালেন। মিস্টার যোশুয়া এসে দরজা খুললেন। ভিতরে ঢুকে গেলেন ডাক্তার।

আরও মিনিট পাঁচেক পর গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল মিতিন। নিঃসাড়ে। পিছু-পিছু টুপুর।

তখনই কী আজব কান্ড! একখানা প্যাকেট হাতে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তার! মিতিনকে দেখামাত্র তাঁর মুখখানা ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছে, "আ আ আপনারা?"

"আপনারই প্রতীক্ষায়," মিতিন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "এত সহজে আপনি ফাঁদে পা দেবেন ভাবতে পারিনি।"

"কী ফাঁদ? কিসের ফাঁদ?"

"ওই প্যাকেটে ম্যাডাম র‍্যাচেলের ড্রেস নেই মিস্টার সামন্ত। এতক্ষণে সেটি ফরেনসিক ল্যাবে পৌঁছে গিয়েছে। তখন আপনার চেম্বার থেকে যে ফোনটা করেছিলাম, সেটা একেবারেই ফল্‌স। অন্য প্রান্তে কেউ ছিল না।"

"ও। তাতে আমার কী?"

"কিছুই যদি না থাকে, প্যাকেটটা চুরি করতে ছুটে এসেছেন কেন?" এক পা, এক পা করে এগিয়ে গেল মিতিন। তীব্র স্বরে বলল, "সরি রণেন সামন্ত, ওরফে ভাগলপুরের জয় মহারাজ, ওরফে পানাজির রবার্ট ডিকস্টা... আপনার জারিজুরি খতম।"

"কী সব আলতু ফালতু নাম বলে যাচ্ছেন? তারা কে?"

"পুলিশের গুঁতো খেলে সব স্মরণে এসে যাবে," দু'জনের চড়া গলার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন ডেভিড যোশুয়া। গোল্লা-গোল্লা চোখে বোঝার চেষ্টা করছেন ব্যাপারটা। মিতিন ঘুরে তাঁকে বলল, "আপনার সন্দেহটা অভ্রান্ত মিস্টার যোশুয়া। আপনার বোন, ভগ্নিপতি এবং স্ত্রী, তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই নৃশংস খুনিটি হলেন আপনার এই পরম বিশ্বাসভাজন বন্ধুবর।"

"যত সব আজেবাজে কথা। আমার ফালতু বুকনি শোনার সময় নেই," বলেই ঝটিতি স্কুটারে চেপেছেন রণেন সামন্ত। অমনি মিতিন পথ রোধ করে দাঁড়াল। কঠোর স্বরে বলল, "ভুলেও পালাবার চেষ্টা করবেন না। তালতলা থানার পুলিশ এ বাড়ি ঘিরে রেখেছে।"

রণেন মরিয়া হয়ে বললেন, "আপনি আমাকে এভাবে হ্যারাস করতে পারেন না। আমি একজন রেসপেক্টেবল ডাক্তার। আপনি আমায় অপমান করছেন।"

"চুপ করুন। আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা যে ভুয়ো, সেটাও আর জানতে বাকি নেই।"

ডেভিড যোশুয়া বিড়বিড় করে বললেন, "ও ডাক্তারই নয়?"

"মোটেই না। জন্মে কোনও দিন মিলিটারিতে চাকরিও করেননি," মিতিন তর্জনী তুলে রণেনকে দেখাল, "আদতে ইনি একজন সিরিয়াল কিলার। অল্প কয়েকজন ধনী বৃদ্ধকে বেছে নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁদের খুন করেন। তারপর সেই এলাকা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ভাগলপুরে উনি চারজন বাঙালি বৃদ্ধকে মেরেছেন, পানাজিতে তিন পর্তুগিজ বৃদ্ধাকে। কলকাতায় টার্গেট ছিলেন আপনারা। ইহুদিরা। আপনার খুব কপাল ভাল, আপনি অন্তত বেঁচে গেলেন। যেভাবে উনি বিষপ্রয়োগে একের পর-এক হত্যালীলা চালিয়েছেন।"

"আমি বিষ দিয়েছি? যা খুশি বললেই হল?" রণেন সামন্ত এখনও ফোঁস ফোঁস করছেন, "প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ আপনার বাড়িতেই আছে সামন্তমশাই," মিতিনের ঠোঁট বেঁকে গেল, "আপনার ওই জংলা ফুলের গাছগুলোকে আমি কি চিনতে পারিনি ভেবেছেন? ওগুলো তো স্ট্রোফানথাস। লতানে গাছগুলো মূলত আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়। ভারতেও মেলে অল্পস্বল্প। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে। ওই ফুলেরই বীজ থেকে তৈরি করা যায় প্রাণঘাতী বিষ আওয়াবেন। যার এক মিলিগ্রামও শরীরের কোষে প্রবেশ করলে এক ঘণ্টারও কম সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ওই বিষ মগজে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ঢুকতে দেয় না। বিষটা ভারী অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পরে পোস্টমর্টেম হলে বিষের আর কোনও চিহ্নই মেলে না শরীরে। তখন সাধারণ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বলে রায় দেন মর্গের ডাক্তার। কিন্তু ম্যাডাম র‍্যাচেলের পোশাকে তো আওয়াবেনের চিহ্ন মিলবেই। নয় কি মিস্টার সামন্ত?"

"এখনও বলছি, আপনি কিন্তু আমায় মিথ্যে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।"

"দেখা যাক, আপনার বাড়ি তল্লাশি করলে ওই বিষের সন্ধান মেলে কিনা," বলতে- বলতে মোবাইল তুলে একটা ফোন। অবিলম্বে পুলিশ অফিসার ঢুকছেন গেট দিয়ে। রণেনের ঘাড় ঝুলে গেল।

॥ ১১ ॥

রবিবারের সন্ধে। সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়েছে ইহুদি প্রথামাফিক যোশুয়া পরিবারের প্রথম সাতদিনের শোক পালন। মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িটায় আজ ছোট্ট একটা জমায়েতের আয়োজন করেছেন ডেভিড। পার্থ আর টুপুরকে নিয়ে এসেছে মিতিন। সারা আর বেঞ্জামিনও হাজির। ডেভিডের বিশেষ আমন্ত্রণে পুলিশকর্তা অনিশ্চয় মজুমদারও উপস্থিত। নীচের ড্রয়িংরুমেই সকলে জড়ো হয়েছিলেন, মিতিনের পীড়াপীড়িতে সবাই মিলে উঠে এসেছেন দোতলায়। আব্রাহাম মটুকের লাইব্রেরিতে। বেঁটে-বেঁটে টুল আনা হয়েছে এ ঘরে, গোল হয়ে বসেছেন সাতজন।

ডেভিডের মুখ-চোখ এখনও মোটেই স্বাভাবিক নয়। রীতিমত মুষড়ে আছেন প্রবীণ মানুষটি। মাত্র ক'দিনে তাঁর কপালের বলিরেখা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। বিমর্ষ স্বরে বললেন, "ডাক্তারই যে অপকর্মগুলো করছে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ম্যাডাম। যাই হোক, রহস্য ভেদ করে অপরাধীকে ধরার জন্যে আপনাকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ তো আমাদের তরফ থেকেও প্রাপ্য," অনিশ্চয় মজুমদারের গমগমে গলা বেজে উঠল, "আপনার দৌলতে কী

জাঁদরেল একখানা ক্রিমিনাল পাকড়ানো গেল, বাপস্! যা যা আপনি বলেছিলেন অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গিয়েছে। তালতলার বাড়িখানা রেড করে আমরা তো স্তম্ভিত। দোতলায় আস্ত একখানা ল্যাবরেটরি বানিয়ে রেখেছিল ওই রণেন সামন্ত! স্ট্রোকানথাস গাছের এক কাঁড়ি শুকনো ফল, তার বীজের গুঁড়ো থেকে বানানো বিষ, ব্যুরেট, পিপেট, টেস্টটিউব, নানান কেমিক্যাল, সব এখন আমাদের জিম্মায়। ওর আর নড়নচড়নের রাস্তা নেই। ফরেনসিক রিপোর্টটা এলেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাবে। তবে...।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোল, "কী তবে?"

"লোকটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে ম্যাডাম। রুম সার্চ করে ওর লেখাপড়ার সার্টিফিকেটগুলোও মিলেছে। দুর্ধর্ষ স্টুডেন্ট ছিল এককালে। হায়ার সেকেন্ডারিতে লেটার মার্কস, গ্র্যাজুয়েশনে কেমিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস!"

"প্রতিভাবান বলেই তো অমন তুখোড় মগজ। শুধু শর্টকাটে টাকা রোজগারের ফন্দি এঁটে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলল," মিতিনের ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি, "ভাবুন, কেমন মানুষ! বইপত্র ঘেঁটেঘুঁটে এমন একটা বিষ খুঁজে বের করল, রুটিন ময়নাতদন্তে যার সন্ধানই মিলবে না। তারপর একটা-একটা লোককে টার্গেট করছে। বিষ দেওয়ার আইডিয়াটাও কী নিপুণ। গায়ে কোনও পানীয় বা আইসক্রিম গোছের কিছু কায়দা করে ঢেলে দাও, তারপর হইচই জটলার মাঝে নিজের বিষ মাখানো রুমালখানা ধরিয়ে দাও কারও হাতে। মোছার সঙ্গে-সঙ্গে বিষ ঢুকে যাবে শরীরে, তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জীবন শেষ। পানীয় কিংবা আইসক্রিম পরীক্ষা করে কোনও লাভ নেই, তাতে কোনও বিষ মিলবে না। শুধু রুমালটাকে হাপিস করে ফেললেই কেল্লা ফতে, আর কোনও প্রমাণ নেই।"

অনিশ্চয় বললেন, "ভাগ্যিস ড্রেসটা ফরেনসিকে পাঠানোর কথা আপনার মাথায় এসেছিল। অন্য দু'বার তো নর্মাল মৃত্যু ভেবে...।"

"এবারও সেভাবেই চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু অপরাধের চিহ্ন তো কোথাও না- কোথাও থেকেই যায়, তাই না মজুমদারসাহেব?"

"হুম, ড্রেসটা সরিয়ে ফেলতে পারলে সামন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেত। বুদ্ধিটা সামন্তর মাথায় আসেনি। ভেবেছিল আর দু'বারের মতো এবারও ঘুঘু ধান খেয়ে পালিয়ে যাবে।"

বেঞ্জামিন ধন্দ মাখা মুখে শুনছিলেন কথাগুলো। হঠাৎ মিতিনের দিকে ফিরে বললেন, "ম্যাডাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কি গোড়াতেই বুঝেছিলেন মৃত্যুগুলো অস্বাভাবিক?"

"না," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "সন্দেহটা আমার দানা বাঁধে র‍্যাচেল ম্যাডামের মৃতদেহখানা দেখে। ওঁর হাতে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নীলচে ছোপ ছিল। তা ছাড়া, যত সামান্যই হোক, বডিতে পচন ধরতে শুরু করেছিল। বিষের প্রভাব না থাকলে মৃত্যুর মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে যা হওয়ার কথা নয়। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখে তাই খুব হতাশ হইনি। শুধু নেচার অফ পয়জনটা আমায় ভাবাচ্ছিল। সেটাও তো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে গেল।"

"কীভাবে?"

"এই যে তিন ভিকটিমের গায়ে পানীয় কিংবা আইসক্রিম পড়ার সমাচারটি। বুঝলাম একটি দুর্ঘটনাও কাকতালীয় নয়। পিছনে কোনও ঝানু মাথার প্ল্যান আছে। তখনই আমার নিজস্ব পুরনো ক্রাইম রেকর্ডগুলো ঘাঁটতে লাগলাম। দেখলাম, ভাগলপুর আর গোয়াতেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একই ধরনের অপমৃত্যু ঘটেছিল। সেখান থেকেই দুয়ে-দুয়ে চার করে-করে এগিয়েছি।"

পার্থ তেরচা চোখে বলল, "তখন অনেকে নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহের তালিকায় ছিলেন? শ্যামচাঁদ অগ্রবাল, প্রোফেসার সেন, হয়তো বা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বেঞ্জামিনও?"

"আজ্ঞে না স্যার। যখনই জানলাম রণেন সামন্ত এ বাড়ির লেটেস্ট আগন্তুক এবং কলকাতার ইহুদি সমাজে তার যথেষ্ট মেলামেশা আছে, তখন থেকে সামন্তই আমার একমাত্র টার্গেট।"

এবার টুপুর আপত্তি জানিয়েছে। বলল, "তা হলে তুমি শ্যামচাঁদ অগ্রবাল আর প্রোফেসার সেনকে অত জেরা করলে কেন? কড়া-কড়া কথা শোনালেই বা কেন?"

"ওরে বোকা, ওঁদের অতীত দুষ্কর্মের কথা বলে হ্যামার না করলে ওঁরা সুড়সুড়িয়ে কি সত্যি কথাগুলো আওড়াতেন? কোন পার্টিতে কী ঘটেছিল নিখুঁত ভাবে স্মরণ করতেন কি? সামন্ত যে সর্বদাই খানিকটা নেপথ্যে থাকছে তাও কি জানা যেত?" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "তা ছাড়া দু'জনকে একটু সমঝানোর দরকারও ছিল। মিস্টার যোশুয়া আর মিস্টার আব্রাহাম মাটুকের বন্ধু হিসেবে ওঁরা আসতেন বটে, কিন্তু কেউই তো খুব সুবিধের লোক নন। শ্যামচাঁদবাবু ছটফট করছিলেন সস্তায় জমি-বাড়িটা কেনার জন্যে। আর প্রোফেসর সেনের লোভ ছিল গুপ্তধনে। যতীনকে এ বাড়িতে ঢোকানোর সেটাই কারণ। যাতে সে সর্বদা এই বাড়ির লোকজনের উপর নজরদারি চালাতে পারে।"

"আর ভুতুড়ে ফোনের ব্যাপারটা? ওটাও কি যতীনকে দিয়ে...?"

"আরে না। যতীন অত সব জটিল কায়দা জানবে কোত্থেকে?" মিতিন ঠোঁট চাপল, "ওটাও রণেন সামন্তর প্যাঁচ।"

"কীরকম?"

"ইন্টারনেট ঘাঁটলে দেখতে পাবি, 'স্পুফ কার্ড' বলে একটা সিস্টেম আছে। ওতে নিজের নম্বর গোপন রেখে যে-কোনও একটা নম্বর লাগিয়ে যত্রতত্র ফোন করা যায়। পুলিশ তো বটেই, আমরা গোয়েন্দারাও অনেক সময় ওই পদ্ধতির আশ্রয় নিই। তাই না অনিশ্চয়দা?"

"ইয়েস," অনিশ্চয় মাথা দোলাচ্ছেন, "মিস্টার যোশুয়া যখন প্রথম কমপ্লেনটা করেছিলেন, তখনই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল। কেসটায় তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি তো।"

"আমি কিন্তু প্রথমেই ধরেছিলাম," মিতিন হাসছে, "ইন ফ্যাক্ট, আমার ল্যাপটপ থেকে ওই প্রসেসেই তো একটা ফোন করলাম প্রোফেসর সেনকে। মস্ত একটা লাভও হল। প্রোফেসর সেনের ছুটে আসা দেখে পাকাপাকি ভাবে সন্দেহ থেকে ওঁকে বাতিল করা গেল।"

পার্থ চোখ সরু করে বলল, "তা রণেন সামন্তকেও একটা ফোন লাগালে না কেন?"

"খেপেছ? নির্ঘাত বুঝে যেত ওকে ট্যাপ করা হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে উড়ে পালাত। ভাগলপুর বা গোয়ার মতো।"

ডেভিড পাথরের মতো মুখ করে বসে। মিতিনকে ধন্যবাদ জানানোর পর আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। দীর্ঘক্ষণ পর ফের তাঁর স্বর শোনা গেল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "এই শহরে প্রায় না থাকার মতো করে আমরা কয়েক ঘর মাত্র ইহুদি টিকে আছি। তাদের মধ্যে তিন-তিনজন অকারণে প্রাণ হারাল। স্রেফ আমার দোষে। স্রেফ আমার দোষে।"

"কী যা তা বলছ?" বেঞ্জামিন সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "তোমার কী দোষ?"

"ওই যে গুপ্তধনের গল্প ফাঁদা। ভেবে দ্যাখো তারপর থেকেই একজন-একজন করে...।" ডেভিড ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "অথচ আদৌ হয়তো ওই গুপ্তধনের কোনও অস্তিত্বই নেই!"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না মিস্টার যোশুয়া," মিতিনের স্বর যথেষ্ট দৃঢ়, "যা রটে, তার সবটাই কিন্তু মিথ্যে নয়। মিস্টার আব্রাহাম মাটুকের এই বাড়িতে গুপ্তধন থাকার কিন্তু সমূহ সম্ভাবনা।"

"আপনি কি ঠাট্টা করছেন ম্যাডাম? কোথায় আছে সেই মণিমাণিক্য?"

জবাব না দিয়ে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিতিন। পায়ে-পায়ে গিয়েছে ঘরের মধ্যিখানে। সরু-সরু থাম তিনটের সামনে। মাঝের থামখানা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে-করতে বলল, "এর গায়েই তো আপনাদের আদি ধর্মগ্রন্থ তালমুদ খোদাই করা আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমাদের পবিত্র হিব্রু ভাষায়।"

আস্তে-আস্তে থামটাকে আলগা ভাবে ঠুকল মিতিন। এক জায়গায় থেমেছে আঙুল। সেখানে সামান্য চাড় দিতেই, কী আশ্চর্য, খুলে গিয়েছে থামের ঢাকনা। হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স বের

করে আনল মিতিন। গম্ভীর গলায় বলল, "আগের দিনই পরখ করে গিয়েছিলাম, থামের ওই অংশটুকু ফাঁপা। এবার আপনি দেখুন তো মিস্টার যোশুয়া, কাঠের বাক্সখানাও ফাঁপা কিনা।"

কাঁপা-কাঁপা হাতে বাক্সখানা নিলেন ডেভিড। খুলছেন সন্তর্পণে। ছোট্ট ডালাখানা উন্মোচিত হতেই সাত জোড়া চোখ বিস্ময়ে শিহরিত। পায়রার ডিমের সাইজের অপরূপ এক পাথর শোভা পাচ্ছে আধারে। কী তার দ্যুতি! গা দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে গোলাপি আভা, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

ডেভিড অস্ফুটে বলে উঠলেন, "এ তো সেই চুনি!"

"হ্যাঁ। বদখ্শানি চুনি। কম সে কম দেড়শো ক্যারেট তো হবেই। এর জুড়ি দুনিয়ায় দ্বিতীয় মিলবে কিনা সন্দেহ।"

ডেভিডের দু' হাতের আঁজলায় ঝকমক করছে চুনিটা। নির্নিমেষে দেখছেন ডেভিড। তাঁর দু' চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে অঝোরে।

টুপুরের মনটা ভারী হয়ে এল।

ফেরার পথে স্টিয়ারিংয়ে পার্থ। গাড়ি চালাতে-চালাতে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। তার বেসুরো সঙ্গীতে টুপুরের মনখারাপ উধাও, সেও হেসে উঠছে খিলখিল।

মিন্টো পার্কের মুখটায় এসে মিতিন বলল, "প্রাণে খুব পুলক জেগেছে? মিস্টার যোশুয়ার চেকখানা দেখে খুশিতে একেবারে আত্মহারা?"

"মোটেই না," পার্থ ঠাট্টা ছুড়ল, "আমার মজা লাগছে তোমার ব্যাখ্যান শুনে। যা গুলগাপ্পি মেরে তুমি কেসটা সল্‌ভ করলে।"

"মানে?"

"ওই যে বললে, পুরনো ক্রাইম রেকর্ড দেখেই নাকি তুমি বুঝে গেলে জয় মহারাজ, রবার্ট ডিকস্টা আর রণেন সামন্ত তিনজনই একই ব্যক্তি! এ তো স্রেফ গোঁজামিল। তোমার কাছে তাদের ছবি নেই, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোনও ইনফরমেশন নেই। শুধু মৃত্যুর ধরনে মিল আছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়াটা কি যুক্তিতে মানায়?"

"কোনও তথ্যই হাতে ছিল না ভাবলে কী করে?" মিতিনও পালটা আক্রমণ জুড়েছে, "অত কাঁচা কাজ প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি করে না মশাই। তিন ওস্তাদের মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর আছে বইকী। আর সেটাই রণেন সামন্তকে চিনিয়ে দেওয়ার মূল সূত্র।"

"কী?"

"জয় মহারাজ উত্তম বংশীবাদক ছিল। রবার্ট ডিকস্টাও তাই। ওই গুণটা তাদের অ্যাসেট, আবার ওই গুণটাই বাঁশিবাজিয়ে রণেনকে চিনিয়ে দেওয়ার একটা বড় ক্লু। বুঝেছ মশাই?"

"অ। তা হলে তো তোমার প্রশংসা করতেই হয়," পার্থ ঠোঁট ছুঁচলো করল, "সেদিক দিয়ে দেখলে তো বলতেই হবে তোমার মগজের পূর্ণ মর্যাদা তুমি পেলে না। মিস্টার যোশুয়া তোমায় ঠকিয়েছেন।"

"যাহ্, কী যে বলো? পঞ্চাশ হাজার টাকা কম নাকি?"

"মিস্টার যোশুয়ার কাছে তো নস্যি। ফোকটে দিদি-জামাইবাবুর বিশাল সম্পত্তি পেয়ে গেলেন। খুনি ছাড়াও তুমি তাঁকে একটা পঞ্চাশ লাখি চুনি খুঁজে দিলে। বিনিময়ে এক লাখও তো মিলল না। সাধে কি প্রবাদ আছে, ইহুদিরা হাড়কিপটে হয়!" পার্থ হ্যা হ্যা হেসে উঠল। রগুড়ে সুরে বলল, "সামন্তই ওর যোগ্য ওষুধ। টেলিফোনে ভয় দেখাত, বেশ করত।"

পার্থর কথায় হঠাৎই একটা প্রশ্ন জেগেছে টুপুরের মনে। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, রণেন সামন্ত ভয় দেখানো ফোনটা করত কেন? চুপিসাড়ে সকলকে একের পর-এক নিকেশ করে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল।"

"লোকটা ওভার কনফিডেন্ট এবং ওস্তাদ খেলুড়ে। এক ঢিলে দু'টো পাখি মারতে চেয়েছিল।"

"কীরকম? কীরকম?"

"প্রথমত, মিস্টার যোশুয়া ফোনটা পেয়ে সকলকে জানাবেন, কিন্তু ফোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারার দরুন তাঁর কথাকে কেউ আর আমলই দেবে না। মৃত্যুগুলোকে খুন-খুন বলে চেঁচালেও না। ভাববে বুড়ো মানুষটা ভুলভাল বকছে। জানত, সাধারণ পোস্টমর্টেমে বিষটা ধরা পড়বে না, তাই আব্রাহামের ময়নাতদন্তটা করিয়ে দিয়েছিল। অতএব ক্যাথলিনের ক্ষেত্রে তেমন আর জোরাজুরিও করতে পারেননি মিস্টার যোশুয়া। আমি পিকচারে না এলে র‍্যাচেলম্যাডামের মৃত্যুটাও নির্ঘাত চাপা পড়ে যেত। সেকেন্ড কারণ, মৃত্যু আর ফোন, ফোন আর মৃত্যু, এতেই ভয়ে আধমরা হয়ে যাবেন ডেভিডসাহেব। সেই সুযোগে রণেন সামন্ত ইহুদি বৃদ্ধটির আরও কাছের লোক হয়ে উঠবে। সময় বুঝে তাঁকে মারার আগে জমি-বাড়ি বিক্রির জন্য মোক্ষম চাপ দেবে। আমার স্থির বিশ্বাস, প্রোমোটার ওর ফিট করাই ছিল। তার কাছ থেকেও সম্ভবত টাকা খেয়েছে। পুলিশের জেরায় এবার সেটাও প্রকাশ হবে।"

"তৃতীয় একটা উদ্দেশ্যও ছিল," পার্থ শিস দিচ্ছে। চোখ নাচিয়ে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো কী?"

"বুঝতে পারছি না।"

"তোর মাসিকে পঞ্চাশ হাজার পাইয়ে দেওয়া। যাতে আমরা এই চিটপিটে গরমে এক্ষুনি হুস করে একবার দার্জিলিং বেড়িয়ে আসতে পারি," পার্থ চোখ টিপল, "কী রে, যাবি তো?"

টুপুর খুশিতে বাক্যহারা। নিস্তরঙ্গ গ্রীষ্মের ছুটিটা যে শেষমেশ এভাবে জমে উঠবে, কে জানত!

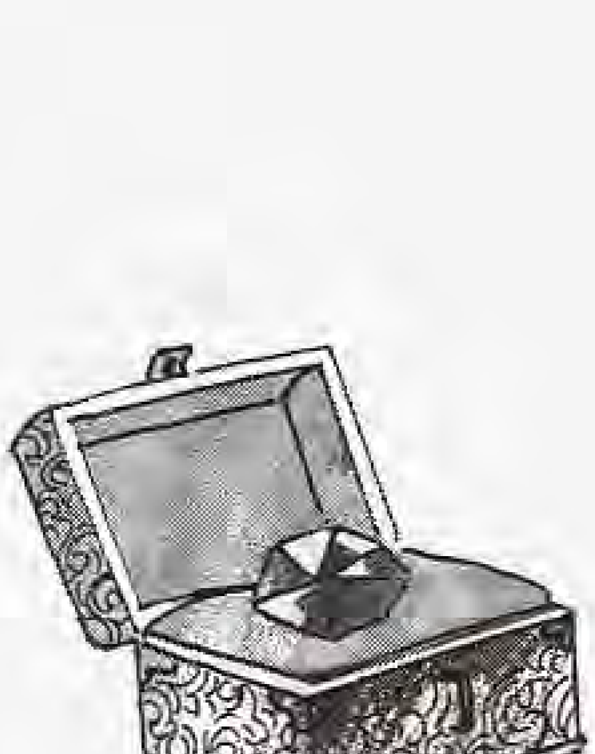

সম্পূর্ণ উপন্যাস

টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দূরপাল্লার কোনও ট্রেনের কামরা যে এত ফাঁকাও যায়, টুপুরের ধারণা ছিল না। হাওড়া থেকে ছাড়ছে গাড়ি, যাবে সেই অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি। অথচ টুপুরদের টু টিয়ার এসি কোচের খান পঞ্চাশেক বার্থে যাত্রীসংখ্যা কিনা সাকুল্যে দশ! ওঠার সময়ও দেখেছে টুপুর, গোটা ট্রেনটাতেই লোকজন নেই বিশেষ।

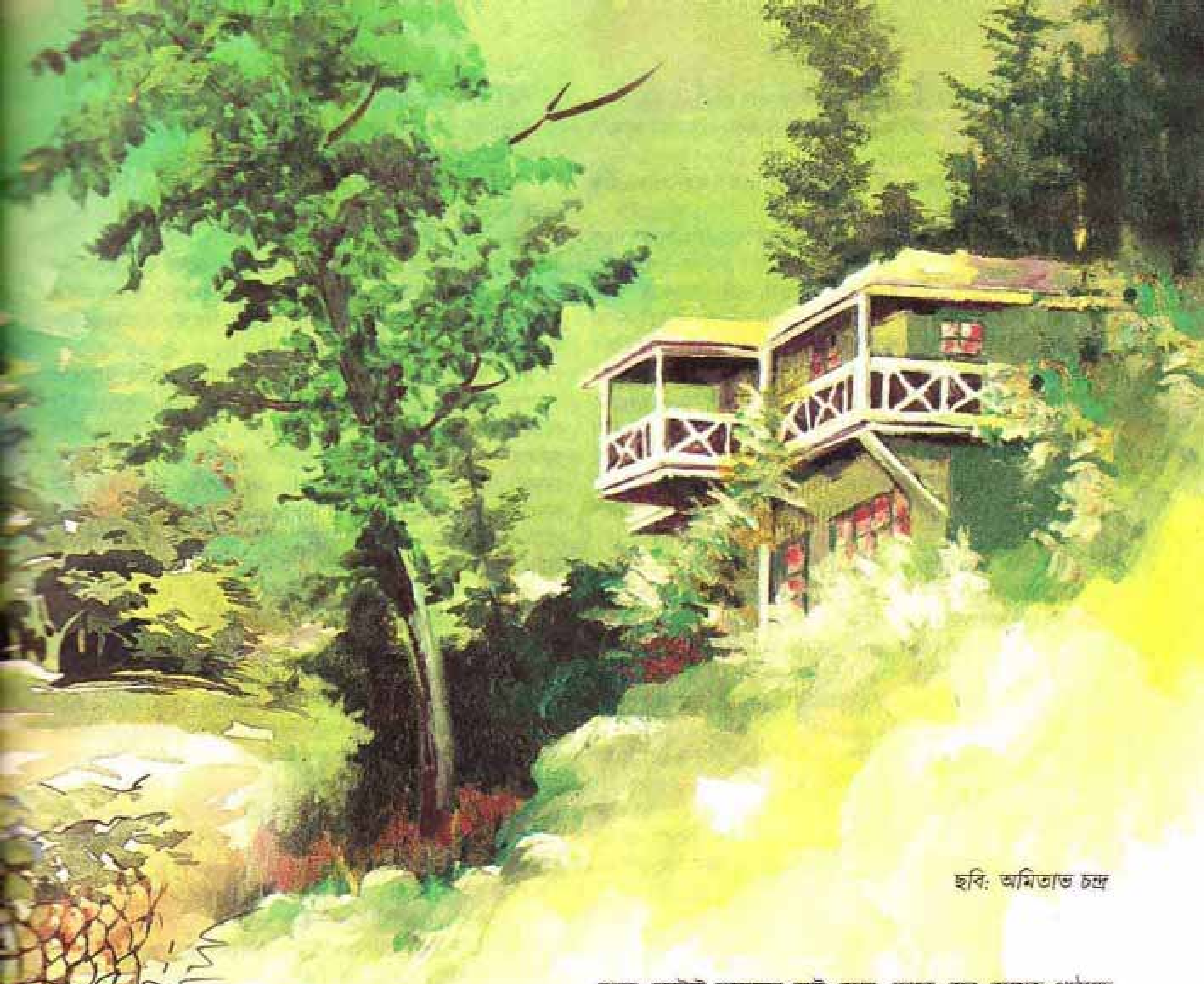

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

এত নির্জন গাড়িতে রাতদুপুরে ডাকাতিফাকাতি হবে না তো? অবশ্য তেমন একটা কিছু ঘটলে তো টুপুরেরই পোয়াবারো। ডাকাতরা আর তাদের কাছ থেকে কী-ই বা নেবে? দু'খানা মোবাইল ফোন, ঘড়ি, কিছু টাকাপয়সা আর পার্থমেসোর দামি ডিজিটাল ক্যামেরাটা। ওই ক্যামেরাখানা পার্থমেসোর প্রাণ। ওটা খোয়া গেলে বেচারা খুব দুঃখ পাবে। তবে ডাকাতরা তো ওইটুকু নেবেই। নইলে তাদেরই বা পোষাবে কেন! তবে ডাকাতদের সঙ্গে যদি মিতিনমাসির মুখোমুখি টক্কর হয়, যে অভিজ্ঞতা টুপুরের ভাঁড়ারে জমবে, তার দাম তো ওই ক্যামেরার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার সূত্রে মিতিনমাসির কাছে আজকাল রিভলভার তো থাকেই। অস্ত্রটা যদি বের করে, কী প্রতিক্রিয়া হবে ডাকাতদলের? পালাবে দুড়দাড়িয়ে? নাকি জোর ফাইট হবে একখানা?

উফ, ভাবতেই রোমাঞ্চ! একটা কাল্পনিক ডাকাতির আশঙ্কায় ফুরফুরে মেজাজ আরও তর হয়ে গেল টুপুরের। জঙ্গল পাড়ি দেওয়ার পথে এমন একটা শিহরন জাগানো চিন্তা মনটাকে যেন টনকো করে দেয়।

জুলজুল চোখে সঙ্গীদের এক ঝলক দেখে নিল টুপুর। মিতিনমাসির হাতে লেটেস্ট মডেলের আই ফোন, কাকে যেন মেসেজ পাঠাচ্ছে টুকুস টুকুস। বুমবুম কমিক্সে বিভোর। হাওড়া স্টেশনের স্টল থেকে খান তিনেক 'ছোটা ভীম' কিনে দেওয়া হয়েছিল, তারই একখানা গিলছে গোগ্রাসে। ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত বেজায় ব্যস্ত ছিল পার্থমেসো। ট্রলি সুটকেসগুলো নীচের বার্থের তলায় চালান করে, চেন-তালা লাগিয়ে এখন সে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে এল। প্যান্টশার্ট ছেড়ে পরে নিয়েছে পাজামা-পাঞ্জাবি। এত রাতেও কফি খেল তারিয়ে-তারিয়ে। চলন্ত ট্রেন থেকে মন দিয়ে দেখছে বাইরের অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুরেছে পার্থমেসো। ভুরু নাচিয়ে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবি মনে হচ্ছে?"

টুপুর হাসি-হাসি মুখে বলল, "ট্রেনটা বড্ড চুপচাপ! রাত্তিরে একটা এক্সাইটিং কিছু হলে দারুণ লাগবে, তাই না?"

"কীরকম উত্তেজনা চাইছিস তুই?"

"এই ধরো, ডাকাতি, রাহাজানি গোছের কিছু।"

"যত্ত সব ক্যাডাভ্যারাস চিন্তা," পার্থ ঠোঁট ওলটাল। "তার চেয়ে বরং ভাব, ট্রেন খড়্গপুর পৌঁছলে নেমে ডিমসেদ্ধ খাব, সঙ্গে একটু পুরি-সবজিও চলতে পারে।"

"এক্ষুনি খাওয়া-খাওয়া করছ? এই না হাওড়া স্টেশনে একপ্লেট বিরিয়ানি সাঁটালে?"

"সে তো অলরেডি হজম হতে শুরু করেছে। স্পেসটা আবার ভরাট করতে হবে যে," বলেই পার্থর একগাল হাসি, "কাল থেকে তো জঙ্গলে বাস। পেটে কী পড়বে কে জানে! তার আগে উদরে

যতটুকু যা ভালমন্দ লোড করে নেওয়া যায় আর কী।"

"আমরা কোন ফরেস্টে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু এখনও আমায় বলোনি মেসো!"

"আরে, সে তো জানতেই পারবি। এখন একটু সাসপেন্সে থাক না।"

টুপুরের ভিতরের ছটফটানি যেন আরও বেড়ে গেল। সন্ধে থেকে এই এক ডায়ালগ আওড়ে চলেছে পার্থমেসো। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই, আগাম কোনও জানান দেওয়া নেই, আচমকা আজ বিকেলবেলা টুপুরদের হাতিবাগানের বাড়িতে হাজির। গিয়েই তাড়া লাগাচ্ছে, 'তিন-চার দিনের জাঙ্গল টুর। আজই রাত সাড়ে এগারোটায় ট্রেন, চটপট জামাকাপড় গুছিয়ে নে'। কিন্তু জঙ্গলটা যে কোথায়, হঠাৎ যাওয়াই বা হচ্ছে কেন, কিছুই ঝেড়ে কাশল না এখনও। তবে হ্যাঁ, স্কুলে সবে ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পড়াশোনার চাপ কম, এসময়ে মিতিনমাসির সঙ্গে ছোট্ট একটা ভ্রমণ তো টুপুরের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। সুতরাং, আর কথা বাড়ায়নি টুপুর। পাঁচ মিনিটে তৈরি হল। বাবা-মাকে টা টা করে অবিলম্বে পার্থমেসোর সঙ্গে ফুড়ুৎ।

কিন্তু ট্রেনে চড়ার পরেও এই হেঁয়ালির কী অর্থ?

মেসোকে ছেড়ে মাসিকে ধরল টুপুর। আদুরে গলায় বলল, "কী গো, তুমিও আমার সঙ্গে লুকোছাপা করবে?"

মিতিন মোবাইল থেকে চোখ তুলল। হাসছে মিটিমিটি। বলল, "কৌতূহলে ফুটছিস তো?"

বুমবুম ফস করে বলে উঠল, "আমি জানি আমরা কোথায় যাচ্ছি। কটকে।"

টুপুরের গুলিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, "কটকে তো জঙ্গল নেই।"

"জানিস তা হলে?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "এবার তো তা হলে তোর জিওগ্রাফির ফান্ডাটা একটু পরখ করতে হয়। কটকেই আমরা নামব। তবে জঙ্গলটা সেখান থেকে আরও শ'খানেক কিলোমিটার দূরে।"

"সিমলিপাল?"

"তুত, সিমলিপাল হলে থোড়াই ট্রেনে চাপতাম! কলকাতা থেকে বম্বে রোড ধরে গাড়িতে চলে যেতাম।"

"তা হলে কি কেওনঝাড়?"

"উঁহু, কেওনঝাড় তো যায় জাজপুর থেকে।"

"বুঝেছি, নন্দনকানন যাওয়া হচ্ছে।"

"তোর মাথা। ওটা একটা জঙ্গল নাকি? জাস্ট ওপেন এয়ার চিড়িয়াখানা। তা ছাড়া নন্দনকানন তো ভুবনেশ্বরে।"

নাহ, আর কোনও জঙ্গলের নাম মনে আসছে না টুপুরের। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আমি পারব না।"

"আর একটু ক্লু দিই?" পার্থ গলাখাকারি দিল। "জঙ্গলটা মহানদীর পারে। নদীর ওপারে ফুলবনি জেলা, এপারে আঙুল।"

ফুলবনি নামটা শোনা-শোনা বটে, তবে আঙুল টুপুরের একেবারেই অচেনা। হতাশ মুখে টুপুর বলল, "সরি। ওড়িশার ম্যাপ আমার মুখস্থ নেই।"

"তুই একটি লেডিজ ফিঙ্গার। সাতকোশিয়ার নাম শুনেছিস?"

"না।"

"ভূগোলে তুই লাড্ডু পাবি। অত বড় একটা ফরেস্ট। বাঘ, ভালুক, হাতি, বাইসন, লেপার্ড, কী আছে, আর কী নেই!"

"আসলটাই তো বললে না," পার্থ মন্তব্য জুড়ল, "ওখানে ঘড়িয়াল সংরক্ষণের চমৎকার বন্দোবস্ত আছে।"

"ঘড়িয়াল?" টুপুর চোখ কুঁচকাল, "মানে যে কুমিরগুলো মাছ খায়?"

"অনেকটা ঠিক বলেছিস। ঘড়িয়াল মাছই খায়। দেখতেও প্রায় কুমিরেরই মতো। তবে ওরা পুরোপুরি কুমির নয়, প্রজাতিটা আলাদা।"

"ও! তা সাতকোশিয়ার জঙ্গলটা কেমন? খুব ঘন?"

"গেলেই দেখতে পাবি।" মিতিন এবার একটু তাড়া লাগাল, "এখন শুয়ে পড় তো দেখি, অনেক রাত হয়েছে।"

"আহ, খড়্গপুরটা যাক না," পার্থ নড়েচড়ে বসল, "ডিমসেদ্ধটা খেয়ে তারপর না হয়...।"

"উঁহু, বাকি রাতটুকু উপোসই থাকো।"

হুকুম জারি করে বুমবুমের হাত থেকে কমিক্সের বই কেড়ে নিল মিতিন। রেলের কর্মচারী চাদর, বালিশ, তোয়ালে কম্বল রেখে গিয়েছে। উপরের বার্থে পাতা হল বুমবুমের বিছানা। পার্থও চড়েছে আপার বার্থে, তোড়জোড় করছে নিদ্রার।

টুপুর বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরছে পায়ে-পায়ে। ফাঁকা কুপগুলো দেখতে-দেখতে। হঠাৎ গতি শ্লথ হল সামান্য। একটা কুপে দু'টো গাট্টাগোট্টা লোক এখনও জেগে। তাস খেলছে দু'জনে। টুপুর থমকানো মাত্রই দু' জোড়া চোখ মুহূর্তে তেরচা। দৃষ্টিটা যেন কেমন-কেমন। আর পাঁচটা সাধারণ যাত্রীর মতো নয়। দু'জনেরই চুলে কদমছাঁট, হাতে মোটা স্টিলের বালা। এই চৈত্র মাসেও একজনের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, অন্যজনের ফ্ল্যাপ-হাতা বুশশার্ট। একজনের গোঁফ জোড়া রীতিমতো তাগড়াই, অন্যজনের নিখুঁত কামানো মুখে চোরা হিংস্রতার ঝিলিক।

গুঁফো লোকটি সহসা দাঁত ছড়িয়ে বলে উঠল, "কী খুকি, এখনও ঘুমোওনি যে?"

গলাটা মোটেও বাজখাঁই নয়, বরং যেন ভাঙা-ভাঙা, ফ্যাসফেসে। তবু তার স্বর শুনে বুকটা ধক করে উঠেছে টুপুরের। তাড়াতাড়ি সরে এল। সিটে ফিরে হাঁপাচ্ছে অল্প-অল্প। খানিক দম নিয়ে মিতিনকে বলল, "দু'টো অদ্ভুত লোক আছে কিন্তু কামরায়। আমাদের পাশের পাশের কুপটায়।"

"জানি," গলা অবধি কম্বলে ঢেকে শুয়ে ছিল মিতিন। চোখ বুজে। বোজা চোখেই বলল, "একজনের নাম কর্মবীর ঘোষ, অন্যজন শক্তিধর সমাদ্দার।"

"তুমি ওদের চেনো নাকি?"

"প্যাসেঞ্জার লিস্টে নাম দেখেছি।"

"দু'জনকেই বেশ সন্দেহজনক মনে হল।"

"কেন? রাতে পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে রুটি-তড়কা খেল বলে?"

"তুমি জানলে কী করে?"

"কিছুই তো দেখিস না। আমরা যখন রেলওয়ে ক্যান্টিনে বিরিয়ানি খাচ্ছিলাম, ওরা পিছনের টেবিলেই ছিল। দু'জনেই খুব খাইয়ে। দশটা বারোটা করে রুটি নিয়েছে।"

"ও। তবু, লোক দু'টো..."

"আর যাই হোক, তুই যা ভাবছিস তা নয়। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড় দেখি।"

মিতিনমাসির কথায় টুপুর খানিকটা আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে কই। মাঝে-মাঝেই টুকরোটাকরা আওয়াজ ভেসে আসছে গলার। একজন বোধ হয় উঠল সিট ছেড়ে, টুপুরদের কুপের সামনে দিয়ে জুতো মশমশিয়ে গেল দূরের বাথরুমটায়। কেন গেল ওদিকে? পুরো কামরা সরেজমিন করতে? যাক, ফিরছে লোকটা। আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে পড়ল? নাকি কোনও মতলব ভাঁজছে?

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়ল টুপুর। কত মাঠঘাট, কত নদনদী পেরিয়ে ছুটছে ট্রেন, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলছে ঝমঝমিয়ে, টুপুর তখনও গভীর নিদ্রায়।

নাহ, ডাকাতি লুঠতরাজ কিছুই হয়নি। টুপুরের ঘুম ভাঙল মিতিনমাসির ঠেলাঠেলিতে, "কী রে, ওঠ। মুখটুখ ধুয়ে নে। কটক তো এসে গেল, এবার নামতে হবে।"

ওমা, তাই তো! সকাল তো হয়ে গিয়েছে। টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠল। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দৌড়ল বেসিনে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে ফিরছে, তখনই ফের চমক। কর্মবীর আর শক্তিধর ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি।

ওরাও কটকে নামছেন?

হয়তো ওঁদের নামটা স্রেফ কাকতালীয়। টুপুর জোরে-জোরে মাথা নাড়ল। তবু মনটা যেন কেন খচখচ করছে।

॥ ২ ॥

জঙ্গলের দোরগোড়ায় পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। টুপুররা কটকে নেমেছিল সকাল সাড়ে আটটায়। তারপর সাকুল্যে একশো কিলোমিটারও আসেনি, তবু যে কীভাবে চলে গেল গোটা দিনটা!

প্রথম সময় নষ্ট হল গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে। কটকের বাদামবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে বেশ কয়েকখানা জিপ দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোনওটাই পার্থমেসোর পছন্দ হয় না। চেহারা মনোমতো হলে দরে বনে না, দর ঠিক হলে চালককে দেখে নাক সিঁটকোয়। শেষমেশ যে গাড়িটাকে মনে ধরল তার চালকটির একমাত্র গুণ, তিনি ভাল বাংলা বলতে পারেন। পার্থমেসোর সাফ কথা, তিন-তিনটে দিন প্রায় অষ্টপ্রহর থাকব, তার সঙ্গে আমি সারাক্ষণ ওড়িয়া, হিন্দি চালাতে রাজি নই। বলব এক, সে বুঝবে আর-এক। এতে নাকি বেড়ানোর আনন্দই অর্ধেক মাটি হয়ে যায়।

যাই হোক, বিভূতি নামের সেই ড্রাইভারটিকে নিয়ে যাত্রা শুরু। কিন্তু এন এইচ ফাইভ ধরে তেরো কিলোমিটার গিয়ে এন এইচ বিয়াল্লিশে পড়ার পরই টের পাওয়া গেল, বিভূতিবাবু অত্যন্ত সাবধানি চালক। বাহনের গতি তিনি তিরিশ কিলোমিটারের উপরে ওঠাতেই চান না। মসৃণ রাজপথ ধরে অমন টিকুর টিকুর করে চলা যে কী দুঃসহ! গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছে পার্থমেসোর সাম্প্রতিক নেশাটি। একটা দামি ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছে, সঙ্গে একগাদা টেলিলেন্স। চলতে-চলতে কোনও দৃশ্য চোখে লাগল তো ব্যস, ওমনি গাড়ি থামাও। নেমে ফোটো তুলছে তো তুলছেই। পথে পড়ল ঢেঙ্কানল, ছুটল রাজবাড়ির ফোটো নিতে। এই করতে-করতে গাড়ি যখন আঙুলের বনদফতরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দুপুর প্রায় শেষ। কলকাতা থেকেই বনবাংলোর বুকিং করে রেখেছিল মিতিনমাসি, তবু সরকারি দফতরে গিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে আনতে খানিকটা সময় তো খরচ হয়ই।

তবে মধ্যাহ্নভোজটি চটপটই সারা হয়েছিল আজ। খুবই সরল মেনু। আঙুলের এক পঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে তন্দুরি রুটি আর কষা মাংস। কিন্তু আহার সেরে আর-একটি অভিযানে নামতে হল যে পার্থমেসোকে। সাতকোশিয়ার জঙ্গলে নাকি খাওয়াদাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নেই, নিজেদের রেশন নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ফর্দ বানানোই ছিল পার্থমেসোর, ঘুরে-ঘুরে বাজার করতে লাগল আঙুলে। চাল, ডাল, নুন, ঘি, তেল, চা, চিনি, আলু, পটল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন, প্যাকেট-প্যাকেট মশলা, বিস্কুট, পাউরুটি, আটা, ময়দা, এমনকী কেজিখানেক বেসনও। সকাল-বিকেল বেগুনি, পেঁয়াজি খেতে হবে যে! জ্যান্ত মুরগি কেনারও ইচ্ছে ছিল, মিতিনমাসি আর টুপুরের প্রবল আপত্তিতে বাতিল হয়ে গেল প্ল্যানটা। অগত্যা ডিমই ভরসা। ড্রাইভার সমেত পাঁচজন মানুষের জন্য পার্থমেসো প্রায় শ'খানেক ডিম কিনে ফেলল। ওমলেট খাবে, পোচ খাবে, ডালনা হবে, ডিমের খিচুড়ি হবে। কত কী যে তার ইচ্ছে! বিভূতিবাবু আগাগোড়াই ভাবলেশহীন ছিলেন, তিনি পর্যন্ত পার্থমেসোর ভোজনের পরিকল্পনা শুনে হাসছেন খুকখুক।

এভাবেই এগোতে-এগোতে টুপুররা অবশেষে পৌঁছেছে পম্পাসারে। এখান থেকেই সাতকোশিয়া জঙ্গলের শুরু। রয়েছে বনবিভাগের চেকপোস্ট, সেখানে জাবেদা খাতায় যাত্রীদের নাম, ঠিকানা, গাড়ির নম্বর, সব লেখার পর জঙ্গলে ঘোরার অনুমতি মেলে।

লেখালিখির কাজটা মিতিনমাসিই সারছিল। টুপুর আর বুমবুম ঘুরে-ঘুরে দেখছিল চারদিকটা। এখনও তেমন একটা জঙ্গল-জঙ্গল ভাব আসেনি। তবে সামনেই যে গভীর অরণ্য, এখানেই যেন তার আভাস মিলছে অল্প-অল্প। চতুর্দিক বেশ নির্জন, পাখির কিচিরমিচির ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বসন্তের গাছগাছালি লালে লাল হয়ে আছে ফুলে-ফুলে। একটা বুনো গন্ধও আসছে যেন।

হঠাৎই টুপুরের চোখ গিয়েছে চেকপোস্টে টাঙানো সাইনবোর্ডটায়। জ্বলজ্বল করছে জঙ্গলের নাম, 'সাতকোশিয়া গর্জ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি'।

নিজের মনে টুপুর অস্ফুটে বলল, "স্যাংচুয়ারি মানে তো অভয়ারণ্য। কিন্তু গর্জ ব্যাপারটা কী?"

বুমবুম বিজ্ঞের মতো বলল, "এখানে বাঘের গর্জন শোনা যায় তো, তাই নাম হয়েছে গর্জ।"

ক্যামেরা কাঁধে পার্থ শাটার টিপছিল এলোমেলো। ছেলের জবাব শুনে হা হা হেসে উঠেছে, "বেড়ে বলেছিস তো! তোর হেডে মনে হচ্ছে ব্রেন আছে!"

টুপুর সন্দিগ্ধ চোখে বলল, "গর্জন থেকে গর্জ?"

"আরে, না রে না। গর্জ তো ইংরিজি শব্দ, মানে গিরিখাত।"

"ওড়িশার জঙ্গলে আবার গিরিখাত আসে কোত্থেকে?"

"উঁহু, জঙ্গলে গিরিখাত নয়। গিরিখাতে জঙ্গল।"

"মানে?"

"আমরা এখন আর সমতলে নেই। প্রায় হাজার ফিট উঠে এসেছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতে আরও খানিকটা ওঠানামা হবে। এটা পূর্বঘাট পর্বতমালার একটা অংশ। সেই পূর্বঘাটেরই কয়েকটা পাহাড়ের মধ্যে গিরিখাতে গড়ে উঠেছে এই জঙ্গলটা। ম্যাপ যা বলছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে মহানদী।"

বিভূতি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পার্থর বর্ণনা শুনছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে সাত ক্রোশ পথ গিয়েছে মহানদী। মানে, চোদ্দো মাইল। আর ওই সাত ক্রোশ থেকেই জঙ্গলের নাম সাতকোশিয়া।"

পার্থ ঘাড় নাড়ছে। জিজ্ঞেস করল, "এখানে নাকি আগে তিনখানা জঙ্গল ছিল?"

"সে তো মহানদীর এপার-ওপার মিলিয়ে। এখন সবক'টা একসঙ্গে নিয়ে সাতকোশিয়া। তবে এপারের জঙ্গলটি বেশি ঘন। জন্তুজানোয়ারও এপারেই বেশি।"

"দেখা যায় কাউকে? নাকি সবাই জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকে?"

"কপালে থাকলে চোখে পড়বে স্যার। হরিণ তো পাবেনই, বাইসনও মিলতে পারে। এখন তো মহুয়াফুল ফোটার সময়। ভল্লুক মহুয়া খেতে খুব ভালবাসে, তাই তাদেরও হয়তো দেখা পেতে পারেন।"

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "আর বাঘ? হাতি?"

"ওরা একটু দূরে-দূরে থাকাই ভাল, বুঝলে খোকা। বিশেষ করে হাতি।"

"কেন? হাতি তো খুব ভাল। লোকে তো হাতির পিঠে চড়ে।"

"জঙ্গলের হাতি মোটেই সেরকম শান্তশিষ্ট নয়, খুব রাগী। সামনে পড়লে খেপে গিয়ে আস্ত আমাদের জিপগাড়িখানা উলটে দিতে পারে," বিভূতি চোখ ঘোরালেন, "তবে বাঘ এ জঙ্গলে বেশি নেই। যা আছে বেশিরভাগই চিতা। তারাও বড় মারাত্মক। কাউকে যদি জঙ্গলে একা পেয়ে যায়, বিশেষ করে বাচ্চাদের..."

বুমবুমের মুখ শুকিয়ে আমসি। ছেলের ভাবান্তর নজরে পড়েছে পার্থর। এগিয়ে এসে হাত রাখল ছেলের মাথায়, "আহা, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বনজঙ্গলে তুই একা-একা ঘুরবি নাকি? আমরা তো থাকব সঙ্গে।"

অমনি বুমবুমের মুখে হাসি ফিরেছে। সগর্বে বলল, "আমি ভয় পাইনি তো। লেপার্ড এলে আমি ঢিল মেরে তাড়িয়ে দেব।"

"বটে? চল তো ভিতরে, দেখব তোর কত সাহস। ঘরে বসে একবার বাঘের ডাক শুনলেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে।"

শুনেই বুমবুমের মুখ ফের কাঁচুমাচু। বিভূতি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "না গো খোকা। তোমরা যেখানে থাকবে, মানে টিকরপাড়া বনবাংলোয়, ওদিকটায় বাঘ, চিতাবাঘ আসে না বড় একটা। লবঙ্গির

জঙ্গলেই ওদের বেশি উপদ্রব। আর টুলকায়।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "সেগুলো আবার কোথায়?"

"সাতকোশিয়ার ভিতরেই।"

"আমরা সেখানে যাব না?"

"নিশ্চয়ই যাব," পার্থ বলল, "বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। উনি আমাদের গোটা জঙ্গলটাই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাবেন। এই ফরেস্ট তো আপনার হাতের তালুর মতো চেনা। তাই না বিভূতিবাবু?"

"হ্যাঁ স্যার, পুরোটাই আমার নখদর্পণে। প্রতি বছরই পাঁচ-ছ'বার করে আসি কিনা। এই তো পরশু দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এক কলেজের মাস্টারমশাই, আর তাঁর ছাত্র। সাতদিন পর ফিরবেন। কথা হয়েছে, ফোন করে ডাকলে আমি এসে নিয়ে যাব।"

"জঙ্গলে ওঁরা গাড়ি ছাড়াই ঘুরবেন?"

"অনেকেই ওরকম ঘোরে স্যার। অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তা হলে টিকরপাড়ায় আমরা কী দেখতে পাব? শুধুই কুমির? মানে ঘড়িয়াল?"

"হ্যাঁগো দিদিভাই। ঘড়িয়াল তো ওখানে কিলবিল করছে। নদীতে, পাশের খাঁচায়," রোগাসোগা খাটো চেহারা বিভূতির মুখে চিলতে হাসি দেখা গেল। কাঁচাপাকা গোঁফে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, "মাঝে-মাঝে ভারী বিপদ ঘটায় ঘড়িয়ালগুলো। বনবাংলোর বারান্দায় পর্যন্ত চলে আসে। দরজায় ঠকঠক করে।"

দৃশ্যটা মোটেই মজার বলে মনে হল না টুপুরের। ঘরের সামনে কুমির ঘুরে বেড়াবে, এ কেমন জঙ্গল রে বাবা? মাছ খায় বলে মানুষের হাত-পা চেখে দেখবে না, এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।

টুপুরের বুকে একটা হালকা কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, তখনই মিতিন ফিরেছে। কাগজপত্র ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, "চল চল, বাংলোয় ঢুকতে সন্ধে না হয়ে যায়।"

ঝটিতি জিপে উঠে যে যার সিটে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছেন বিভূতি। সরু পিচের রাস্তা ধরে চলেছেন নিজস্ব গতিতে। শেষ বিকেলের রোদ্দুর মেখে শাল-সেগুনের জঙ্গল ভারী মায়াবি এখন।

বাইরেটা দেখতে-দেখতে মিতিন পার্থকে বলল, "তোমার ক্যামেরার ডিটেলটাও চেকপোস্টে এন্ট্রি করাতে হল। ভিডিয়ো না স্টিল, তাও নোট ডাউন করল।"

"তাই নাকি?" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "দারুণ কড়াকড়ি তো!"

"ছাই কড়াকড়ি," স্টিয়ারিং থেকে বিভূতি বলে উঠলেন, "একে বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।"

"কেন? কেন?"

"সাধারণ টুরিস্টের উপর খুব নিয়মকানুন ফলায়। ওদিকে চোরা শিকারিরা গার্ডদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি নিজেদের কাজ হাসিল করে যাচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই তো গত বছরেই দু'-দু'টো চিতাবাঘ মারা পড়ল। তিনটে হরিণও।"

"খবরটা পড়েছি," মিতিন মাথা নাড়ল, "চামড়া ছাড়িয়ে বডিগুলো ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। মোটামুটি এই সময়েই ঘটেছিল, তাই না? কেউ বোধ হয় ধরাও পড়েনি?"

"আপনি তো অনেক খবর রাখেন ম্যাডাম," বিভূতির স্বরে তারিফ। আপনমনেই বললেন, "সত্যি, তখন কত হইহল্লা হল। পুলিশের বড়- বড় অফিসার এসে কী হয়রানিই না করল টুরিস্টদের। কিন্তু পাজিগুলোর টিকিও ছুঁতে পারল না। ওড়িশার পুলিশ একেবারে অপদার্থ।"

"সব রাজ্যের পুলিশই প্রায় সমান বিভূতিবাবু," পার্থর গলায় পলকা ব্যঙ্গ, "এই তো, দু'-তিন সপ্তাহ আগেই দেখলাম আমাদের সুন্দরবনের চোরাশিকারিরা ঢুকে একটা বাঘ মেরেছে এবং চামড়াটি ছাড়িয়ে ভাগলবা। বন দফতর, পুলিশ কেউ কিছু করতে পারল?"

টুপুর করুণ মুখে বলল, "ওই সব লোক কী খারাপ! জন্তুজানোয়ার মেরে তাদের ছাল ছাড়িয়ে নেয়।"

"টাকার জন্য মানুষ কী না করে! একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার দাম তো কম নয়।" পার্থ সামনের সিট থেকে মিতিনের দিকে ঘুরে তাকাল, "মিনিমাম তিন-চার লাখ, কী বলো?"

"জানি না। গবেষণায় আমার স্পৃহাও নেই," মিতিন অল্প হাসল। "তবে তোমায় একটা অন্য খবর দিতে পারি। জঙ্গল টুরে নিউজটা বোধ হয় আমাদের কাজে লাগবে।"

"কী?"

"টিকরপাড়া ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারটি নাকি গতকাল সকাল থেকে হাওয়া। চেকপোস্টের গার্ডরা জানাল।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "তো? আমাদের তাতে কী এল গেল?"

"ওই চৌকিদারটিই টুরিস্টদের রান্নাবান্না করে দিত।"

"অ্যাঁ?" পার্থ এবার জোর ঝাঁকুনি খেয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ! আমাদের খাওয়াদাওয়ার কী হবে তা হলে?"

"এত তুমি ভোজনরসিক," মিতিন টুপুরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, "ক'দিন তুমিই না হয় আমাদের রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে।"

"সে তো আমি পারিই। কুকিং কী এমন কঠিন কাজ? তবে কিনা, বেড়াতে এসে ভেবেছিলাম ঘুরে-ঘুরে একটু ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি করব," বলতে-বলতে হঠাৎ কী ভেবে স্টিয়ারিংয়ের দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছে, "বিভূতিবাবু, আপনি রান্নাবান্না জানেন না?"

জঙ্গল হালকা হয়েছে খানিকটা। ছোট্ট একটা গ্রাম পেরোচ্ছে গাড়ি। ডান দিকে একটি স্কুল। সামনের মাঠে ফুটবল পেটাচ্ছে জনাকয়েক কিশোর। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে বিভূতি মৃদু স্বরে বললেন, "পারি স্যার। অল্পস্বল্প।"

"ভাতের ফ্যান গালতে পারেন?"

"হ্যাঁ।"

"রুটি সেঁকতে পারেন? লুচি, পরোটা ভাজা?"

"তাও পারি। তবে একটু তেড়াবেঁকা হয়।"

"নো প্রবলেম। পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপের মতো হলেও চলবে," পার্থকে বেশ খুশি-খুশি দেখাল, "ডাল, ভাজা, ডিমের ডালনাও পারেন নিশ্চয়ই?"

"করেছি মাঝে-মাঝে। খুব ভাল না হলেও মুখে তোলা যাবে।"

"আর পকোড়াটকোড়া?"

"চেষ্টা করলে হয়তো, ওই বেসনে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দেওয়া তো?"

"ইয়েস। দ্যাটস অল উই নিড!" উচ্ছ্বাসে ইংরিজি বেরিয়ে গেল পার্থর। বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে বলল, "রান্নার দায়িত্বটা তা হলে আপনিই নিন। আমরাও থাকব, হেল্পটেল্প করব। সবাই মিলে ক'দিন ধরে বেশ একটা বনভোজন-বনভোজন চলবে। কী বিভূতিবাবু, রাজি তো?"

ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লেন বিভূতি। নীরব সম্মতিটুকু পেয়ে পার্থ আহ্লাদে আটখানা। ঘুরে টুপুরকে বলল, "তোর মাসি আমায় জব্দ করবে ভেবেছিল। কেমন একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম দ্যাখ। হা হা হা।"

বুমবুম খলখল হেসে উঠল কিছুই না বুঝে। টুপুরও হাসছে মিটিমিটি। গ্রাম ছাড়িয়ে আবার ছেঁড়া-ছেঁড়া জঙ্গলে ঢুকেছে গাড়ি। যেতে-যেতেই বাঁয়ে একখানা বনবাংলো 'পুরানাকোট ফরেস্ট রেস্ট হাউস'। কোনও লোকজন নেই, শুনশান পরিবেশে যেন ঝিমোচ্ছে বাংলোটা। তার একটু পরেই এসে গিয়েছে টিকরপাড়া।

পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি। একটায় বনবিভাগের অফিস কাম ফরেস্ট অফিসারদের ইনস্পেকশন বাংলো। মন্ত্রীসান্ত্রিরাও এসে থাকেন সেখানে। অন্য দু'টো বাংলো সাধারণ ভ্রমণার্থীদের জন্যে। বাংলোর সামনে একটা বড়সড় লন। সেখানে গাড়ি থামতেই বনবিভাগের কর্মচারী হাজির। টুপুরদের বুকিংয়ের কাগজপত্র তিনি

দেখলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর চাবি এনে খুলে দিলেন একটা দু' কামরাওয়ালা স্যুইট। ভিতরে বন্দোবস্ত মন্দ নয়। বড়-বড় খাট, আলমারি, সোফা, ড্রেসিংটেবিল সবই পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। ডাইনিংটেবিল পেতে খাওয়ার জায়গাও করা আছে একখানা। বাথরুম ঝকঝকে, শাওয়ারও মজুত। আরাম করে থাকতে গেলে এর বেশি আর কী-ই বা চাই!

ব্যাগ, সুটকেস ঢোকানো হয়েছে ঘরে। বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে পার্থ। হাঁক ছাড়ল, "টুপুর, বিভূতিবাবুকে বল তো, আমাদের খাওয়ার জিনিসপত্রগুলো যেন গাড়ি থেকে নামিয়ে নেন। আর এখন একটু চা হলে ভাল হয়।"

অমনি মিতিনের ধমক, "অ্যাই, নিজে ওঠো তো। বেচারা এতক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, তুমি গিয়ে বিভূতিবাবুর সঙ্গে হাত লাগাও। রান্নাঘরগুলো ওই দূরে, জিনিসপত্র নিজেই পৌঁছে দিয়ে এসো।"

অগত্যা সুখশয্যা ছাড়তেই হল পার্থকে। টুপুরও পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লনটায়। দিনের আলো প্রায় মরে এসেছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলকাকলিতে জঙ্গল এখন রীতিমতো মুখর। এত শব্দ যে, কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। তাদের বাংলোখানা পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে। অনেকটা নিচ থেকে ভেসে আসছে নদীর আওয়াজ। লন থেকে দেখা যাচ্ছে না নদীটাকে, তাই যেন ওই শব্দে কেমন গা ছমছম করে। খানিকটা দূরে, নদীর ওপারে আবার পাহাড়। সবুজে ছাওয়া। সূর্য বুঝি ওই পাহাড়ের আড়ালে ডুবেছে, ছায়া নেমেছে পাহাড়ে। নদীটাকেও এবার দূরে দেখতে পেল টুপুর। এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের পিছনে। এই ছায়া-ছায়া আলোয় দৃশ্যটা যে কী অপরূপ!

হঠাৎই পাশে বুমবুম। তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। সঙ্গে মিতিনমাসি। হাতে ইনফ্রারেড বাইনোকুলার। খাঁটি জার্মান যন্ত্র, রাতেও দূরের বস্তু দেখা যায় বেশ। একটু লালচে ভাবে, তবে মোটামুটি স্পষ্ট।

বাইনোকুলার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিল মিতিন। হঠাৎ টুপুরকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দূরে মাঠটায় ফোকাস কর। চেনা কিছু পাচ্ছিস?"

টুপুর চোখে লাগাল যন্ত্রটা। নদীর পারে একটা তাঁবু। তার সামনে দু'টো লোক হাত পা ছড়িয়ে শরীরচর্চা করছে।

টুপুরের হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠল। কী কাণ্ড, ট্রেনের সেই মুশকো লোক দু'টো না, কর্মবীর আর শক্তিধর?

॥ ৩ ॥

বাংলোর অদূরে একটা ব্যারাক মতো বাড়ি। টিনের চাল, টানা লম্বা দাওয়া। সেখানেই পর পর তিনখানা রান্নাঘর। গ্যাস, কেরোসিনের ব্যবস্থা নেই, জঙ্গলের শুকনো কাঠ স্তূপ করা আছে দাওয়ায়। ইচ্ছে মতো কাঠ নিয়ে যে যার রান্না সারো।

সেই কাজই চলছিল এখন। ধরানো হয়েছে কাঠের আঁচের উনুন, চলছে রাতের রান্নার প্রস্তুতি। রান্নাঘরের দিকটায় বিদ্যুৎ নেই, জ্বলছে বন দফতরের হ্যাজাক। যথেষ্ট চড়া আলো, কাজ করতে কোনও অসুবিধে হয় না। বিভূতির উপর পুরো ভার ছেড়ে না দিয়ে মিতিন নিজেই নেমে পড়েছে রান্নাবান্নায়। টুপুর আর বিভূতি তাকে সাহায্য করছে হাতে-হাতে। পথশ্রমে আজ ক্লান্ত সবাই, তাই আর রুটিটুটির হাঙ্গামা নয়, সোজা ভাত বসিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে অল্পস্বল্প কিছু ভাজাভুজি আর ডিমের ডালনা, ব্যস।

রান্নাঘরগুলোর পাশে-পাশে ছোট-ছোট খুপরি। তারই একটায় মালপত্র জড়ো করে রেখেছিলেন বিভূতি। আছে বনবিভাগের বাসনকোসনও। তারই একটা ডেকচিতে চাল ধুচ্ছিল টুপুর কচলে-কচলে।

তখনই জিন্স, টিশার্ট পরা এক তরুণের আবির্ভাব। ফরসা রং, সুন্দর স্বাস্থ্য, মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। ভুরু কুঁচকে মিতিন, টুপুরকে সে দেখল একটু। তারপর বিভূতির দিকে চোখ পড়তেই তার ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বলল, "আরে বিভূতিবাবু, আপনি?"

"এই তো আজ আবার চলে এলাম এঁদের সঙ্গে," মিতিন আর টুপুরকে দেখালেন বিভূতি। স্মিত মুখে বললেন, "তা আপনাদের তো আরও ছ'-সাত দিন পরে ফেরার কথা, তাই না?"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "এঁরাই বুঝি পরশু আপনার সঙ্গে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ," বিভূতি মাথা নাড়লেন। যুবকটিকে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মাস্টারমশাই কোথায়?"

"স্যার বাংলোয়। সারাদিন জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি হয়েছে, এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।" বলেই মিতিনকে প্রশ্ন, "আপনারা বুঝি আমাদের পাশের বাংলোয় এলেন?"

"একদম ঠিক। এই খানিক আগে ঢুকেছি," মিতিন ভদ্রতা করে হাসল, "আমরা চারজন।

আমি প্রজ্ঞাপারমিতা, এই আমার বোনঝি ঐন্দ্রিলা, আমার বর আর ছেলে ঘরে। কী করছে তা অবশ্য জানি না।"

মিতিনের কথা বলার সহজ ভঙ্গিতে যুবকটি হেসে ফেলেছে। হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি সুবাহু চৌধুরী। আমার স্যার ইন্দ্রজিৎ সেনের লেজুড় হয়ে এসে পড়েছি এই সাতকোশিয়ায়।"

"এখন, এখানে আগমন নিশ্চয়ই রান্নাবান্নার জন্যে?"

"উপায় কী বলুন! রাতে তো কিছু পেটে দিতে হবে।" সুবাহুর মুখে সামান্য লজ্জা-লজ্জা ভাব, "কী যে ঝকমারিতে পড়েছি। এখানে আসার পরদিন থেকে চৌকিদারটি গায়েব। অগত্যা সেলফহেল্পের পালা চলছে। সকালে ভাতের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ আর রাতে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ ভাত। এই এখন আমাদের দু' বেলার মেনু।"

"খুব কষ্টে দিন কাটছে তা হলে?" মিতিনের যেন একটু মায়া হয়েছে। বলল, "এক কাজ করুন না, আমি ডিমের ডালনা বানাচ্ছি। আজ রাত্তিরটা আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিন।"

সুবাহু যেন হাতে চাঁদ পেল। খুশি-খুশি মুখে বলল, "তা হলে তো খুব ভালই হয়। কিন্তু আপনি বেড়াতে এসে আমাদের জন্যেও পরিশ্রম করবেন?"

"আরে দুর। পাঁচজনের রান্না, সাতজনের রান্নায় খাটুনির হেরফের হয় নাকি?" বলেই মিতিন নির্দেশ ছুড়েছে বিভূতিকে, "আরও কয়েকটা ডিম, আলু এনে সেদ্ধয় ফেলে দিন তো। ওটা হলে ভাত চাপিয়ে দিয়ে বেসন গুলে ফেলুন। বেগুনিটাও আমি ভাজব।"

টুপুর ফুট কাটল, "আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"থাক। সেদ্ধ ডিম, আলুর খোসা ছাড়িয়ে দে, তা হলেও যথেষ্ট।" মিতিন পেঁয়াজ, রসুন, আদা একসঙ্গে থেঁতো করতে-করতে বলল, "তা ভাই সুবাহু, হঠাৎ চৌকিদারটি পালাল কেন?"

"কী জানি। সাত দিন রেঁধে দেওয়ার জন্যে পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম। সেটা নিয়েই তো চৌপাট।"

"মাত্র পাঁচশো টাকা চোট করে আজকাল কি কেউ পালায়? নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। স্থানীয় বিট অফিস কী বলছে?"

"তারা নাকি কিছুই জানে না। ছুটিফুটিরও কোনও দরখাস্ত দিয়ে যায়নি।"

"অর্থাৎ ছুটি নেয়নি। স্ট্রেঞ্জ তো!"

টুপুর বলে উঠল, "হয়তো বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবরটবর এসেছিল। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ..."

"হতে পারে," সুবাহু কাঁধ ঝাঁকাল, "তবে বনদফতরের তো তেমন একটা গা দেখলাম না। আমারও ওকে নিয়ে অত ইন্টারেস্ট নেই। শুধু একটু অসুবিধেয় পড়ে গেলাম, এই যা। তবে ম্যানেজ তো করেই নিচ্ছি। সেদ্ধ খাচ্ছি, স্টকে পাউরুটিফাউরুটি আছে, তেমন দরকার পড়লে চলে যাব পুরানাকোট। সেখানে দোকান তো আছেই।"

"হুম," থেঁতো করা পেঁয়াজ, আদা, রসুন একটা বাটিতে রেখে মিতিন বলল, "কখন আবিষ্কার করলেন লোকটা নেই?"

"সেভাবে তো বলা কঠিন। সকালে চা দিল না, ব্রেকফাস্টও পাচ্ছিলাম না। 'রাজু-রাজু' করে কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম, সাড়া নেই। তারপর কোয়ার্টারে গিয়ে দেখলাম, তালা ঝুলছে।"

"অথচ তার আগের রাত্তিরেও তো সে..."

"দিব্যি ছিল। কী যে হয় এদের, কখন পাখা গজায়!" বলতে-বলতে ঘড়ি দেখল সুবাহু। একটু যেন ব্যস্ত মুখে বলল, "যাই, স্যারকে গিয়ে নেমন্তন্নর সুখবরটা দিই।"

"সেই ভাল। আমরা ততক্ষণ কাজকর্মগুলো সারি। রান্না হয়ে গেলে বিভূতিবাবু আপনাদের ডেকে আনবেন। আমাদের বাংলোতেই সবাই মিলে খাব একসঙ্গে।"

টুক করে ঘাড় নেড়ে চলে গেল সুবাহু। মিতিনরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নাবান্নায়। যখন যে কাজটা করে মিতিনমাসি, সে গোয়েন্দাগিরিই হোক বা ডিম রান্না, সমান মনোযোগে করে। দেখেছে টুপুর। হাতও চলে কী দ্রুত, বাব্বা! ঝটাঝট বেগুন কাটছে, কচাকচ লঙ্কা কুচোচ্ছে। টুপুর চারখানা ডিম ছাড়ানোর আগেই একডজন খোসা জড়ো করে ফেলল। শসা, টম্যাটোয় নুন, লেবু মাখিয়ে স্যালাডও রেডি হয়ে গেল একপ্লেট। তারই সঙ্গে অবিরাম টুকিটাকি নির্দেশও দিচ্ছে টুপুর আর বিভূতিবাবুকে।

মশলা কষিয়ে, কড়ায় ডিম আলু ছেড়ে একটু বুঝি ফুরসত মিলেছে মিতিনের। হাত ধুতে-ধুতে বিভূতিকে জিজ্ঞেস করল, "চৌকিদারটিকে তো আপনি চিনতেন, তাই না?"

"নিশ্চয়ই। এখানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে প্রায়ই আসা-যাওয়া করি, রাজুর সঙ্গে আলাপ না হয়ে পারে!"

"অল্পবয়সি ছেলে বুঝি?"

"একেবারেই ছোকরা। বয়স বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। ওর বাবা ভগীরথ ছিল এখানকার চৌকিদার। হঠাৎ ক'বছর আগে খারাপ ম্যালেরিয়ায় সে মরে গেল, তার জায়গায় চাকরি পেয়েছিল ছেলে।"

"রাজু এমনিতে কেমন, বেশ চটপটে? বুদ্ধিমান?"

"বুদ্ধি কতটা আছে জানি না, তবে খুব ছটফটে। সাহসীও বটে। রাতবিরেতে নাকি একা-একাই জঙ্গলে চরে বেড়াত।"

"ওর কোয়ার্টারটা কোথায়?"

"ওই তো, আপনাদের বাংলো দু'টোর পিছনেই।"

মিতিন আর কিছু বলল না। ডিমের ঝোলে গরম মশলা দিয়ে নাড়ল একটু, তারপর ঢালল গামলায়। বেশি টম্যাটোফম্যাটো দিয়ে খাসা রং বানিয়েছে। বেসনে কালো জিরে মিশিয়ে বেগুনি ভাজাও শেষ। ভাতের দায়িত্বটা বিভূতির উপর ছেড়ে বলল, "এবার এটা আপনি দেখুন, আমি বাংলোয় ফিরি।"

বিভূতি বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম, খুব ধকল গেল আপনার, ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিন।"

"খাবারদাবার, থালা, গ্লাসগুলো কি আমরা এসে নিয়ে যাব?"

"না, না। ছি, ছি। আমি সব পৌঁছে দেব।"

"তখন তা হলে আমার অতিথিদেরও ডেকে দেবেন প্লিজ।"

"সে কি আপনাকে বলতে হবে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিভূতিবাবুর গলা শুনেই বোঝা যায়, তিনি যথেষ্ট বিগলিত। না হয়ে বোধ হয় উপায়ও নেই। একদিকে মিতিনমাসির কর্মকুশলতা, অন্য দিকে সুন্দর ব্যবহার। বিভূতিবাবুর মতো একজন সাধারণ মানুষকে তো বশ করবেই। টুপুরের ভাবতে অবাক লাগে, হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করলে মিতিনমাসির এই ঠান্ডা-ঠান্ডা, গিন্নি-গিন্নি ভাবটা যে কী আমূল বদলে যায়!

জঙ্গলে অন্ধকার বেশ গাঢ় এখন। কৃষ্ণপক্ষের রাত, আকাশে এখনও চাঁদ ওঠেনি। ফটফট করছে তারা। সারাদিন যথেষ্ট তাপ ছিল আজ, এখন একটা নরম হাওয়া বইছে। অনেকটা নীচে নদীর আওয়াজ যেন আরও বেশি প্রকট। ওই শব্দ, স্নিগ্ধ বাতাস আর আলো-আঁধার, মিলেমিশে পরিবেশটাই কেমন অলৌকিক।

লন মাড়িয়ে বাংলোয় এসে টুপুর হাঁ। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার পাশে পার্থমেসো কানে ইয়ারফোন গুঁজে নিমীলিত চোখে মাথা দোলাচ্ছে।

হতবাক মুখে টুপুর বলল, "এ কী গো? আমরা ওদিকে খেটে-খেটে মরছি আর তুমি মজাসে মোবাইলে গান শুনছ?"

গলা পেয়ে ঝটিতি ইয়ারফোন খুলেছে পার্থ। ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমিও কাজ করছিলাম রে!"

মিতিন মুখ বেঁকিয়ে বলল, "দেখেছি, বিট অফিসারের সঙ্গে আড্ডা মারছিলে।"

"একেই বলে টিকটিকির নজর। রাঁধতে-রাঁধতেও চোখ ঘোরে।"

"কী করি বলো, যে পেশার যা অভ্যেস!" ঠাট্টাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলল মিতিন। জিজ্ঞেস করল, "তা কী-কী ইনফরমেশন বাগালে?"

"অনেক কিছু, অনেক কিছু," পার্থ টানটান। উত্তেজিত মুখে বলল, "জানো তো, এখানে নৌকোয় বোটিং করা যায়।"

"বোটিং তো লোকে নৌকোতেই করে। নয় কি?"

"টিজ কোরো না। কাল ভাবছি একটা বোটিং ট্রিপ নেব। তারপর দুপুরে লবঙ্গি। ওখানে নাকি একটা হাতির পাল ঘুরঘুর করছে। গেলে দর্শন মেলা নিশ্চিত।"

"হ্যাঁ, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তারা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"ওফ, এত কমেন্ট করো কেন? এখানে নাকি একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। জঙ্গলের একদম মধ্যিখানে। দিনের বেলা সেখানে খুব একটা থ্রিল নেই। বড়জোর হরিণটরিন চোখে পড়ে। কিন্তু একটু বেশি রাত্তিরে যদি যাওয়া যায়..."

"ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বাঘ এসে তোমার সঙ্গে কানামাছি খেলবে, তাই তো?"

"ফের বিদ্রূপ? আরে, আমাদের চার ব্যাটারির টর্চ আছে না? ওটা জ্বাললে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। সে দেখা যাবে'খন। কালকের ভাবনা কালকে। চৌকিদারের খোঁজ মিলেছে? বিট অফিসার কিছু বললেন?"

"উনি পাত্তাই দিলেন না। ছেলেটা নাকি উড়ুউড়ু টাইপ। মাঝে-মাঝেই দু'-দশ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। ফিরেও আসে। তবে কাজের ছেলে বলে চাকরিটা খোয়া যায় না। এখানকার ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্রটা তো ও-ই দেখাশোনা করে। খাঁচাটাচাগুলো পরিষ্কার রাখা তো সহজ কাজ নয়। সকলে ভিতরে যেতে সাহস পায় না।"

"ও!" ভুরু কুঁচকে মিতিন দু'-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন। তারপর সহজ স্বরে বলল, "তা এবারে একটু গা ঝাড়া দাও। একটা অন্তত দায়িত্ব নাও।"

"কী?"

"বুমবুমকে জাগিয়ে তুলে খাওয়াও।"

শুনেই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে পার্থর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে বুমবুমকে তোলা যে কী কঠিন! টানাহেঁচড়া করে তাকে উঠিয়ে বসালেও পরক্ষণেই সে ফের কাত। ফের লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। অতি কষ্টে তাকে খাড়া করা হল, অমনি সে কান্না জুড়েছে। পার্থ ছুটল তার খাবার আনতে। ভাত, আলু, ডিম চটকে ঝপাঝপ গরাস তোলা হচ্ছে মুখে, চোখ বুজেই গিলছে বুমবুম। কোনও মতে পাত খালি করে আবার সে ঢলে পড়ল ঘুমে।

ইতিমধ্যে টুপুরদের নৈশাহারের ব্যবস্থাও সারা। সব কিছু পরিপাটি ভাবে গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বিভূতি। টুপুর টেবিলে প্লেট সাজাচ্ছে, সুবাহুও তার মাস্টারমশাইকে নিয়ে উপস্থিত।

ইন্দ্রজিতের চেহারাটি বেশ দশাসই। গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু মাথার চুল ধবধবে সাদা। গাল জুড়ে শুভ্র দাড়ি ঝকঝক করছে আলোয়। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষটাকে প্রথম দর্শনেই বেশ ওজনদার পণ্ডিত বলে মনে হয়।

নেমন্তন্নর কথা জানতেন না বলে পার্থ বেশ অবাক হয়েছিল প্রথমটায়। তারপর সামলে নিয়ে দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেলল সুবাহু আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে। কথায়-কথায় জানা গেল, পরিবেশবিদ্যা নিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করছেন ইন্দ্রজিৎ। সুবাহু তাঁর ছাত্র এবং সহকারী।

খেতে বসে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "তা প্রোফেসরসাহেব কি এখানে গবেষণার কাজেই এসেছেন, নাকি নিছক ভ্রমণে?"

ইন্দ্রজিৎ গমগমে গলায় বললেন, "এক ঢিলে দুই পাখি মারছি বলতে পারেন। রেনফরেস্ট নিয়ে কাজ করছি, সাতকোশিয়া দেখারও খুব ইচ্ছে ছিল। ভারতের বৃহত্তম গিরিখাত বলে কথা!"

পার্থ বলল, "তাই বুঝি? এটা তো জানতাম না!"

"অনেকেই জানে না। একমাত্র উত্তর আমেরিকার কলোরাডোতেই এর চেয়ে বড় গিরিখাত আছে। তাও সেটা মোটেই সবুজ নয়। একেবারে ন্যাড়া। এমন ঘন জঙ্গল আর পাওয়া যাবে কোথায়!"

"আপনি বুঝি অনেক দেশ ঘুরেছেন?"

"ওই আর কী! কাজের সূত্রে এ মহাদেশ, ও মহাদেশ তো ঘুরে বেড়াতেই হয়। তবে আমাদের ভারতই সবার সেরা। এত বৈচিত্র্য আর কোথাও নেই।"

শুনে বেশ লাগল টুপুরের। বিদেশ ঘুরে আসা মানুষরা এ দেশের শুধু নিন্দেই করেন। ইন্দ্রজিৎ সেন তো ভারী অন্যরকম।

কৌতূহলী মুখে টুপুর প্রশ্ন করল, "তা সাতকোশিয়ায় এখনও পর্যন্ত আপনি কী-কী দেখলেন স্যার?"

"জন্তুজানোয়ার? একটা চিতল হরিণ আর খান পাঁচেক বুনো শূকর," ইন্দ্রজিৎ মৃদু হাসলেন, "তবে আমি জন্তু দেখতে আসিনি। আমার ইন্টারেস্ট পাহাড়। ছোটনাগপুরের মালভূমি কীভাবে এসে পূর্বঘাটে মিশছে, সেটাই দেখতে চাই। প্লাস, এখানকার গাছপালা স্টাডি করব। পাখিও।"

"এখানে অনেকরকম পাখি আছে বুঝি?"

"ভ্যারাইটির এখানে শেষ নেই, বুঝলে। পাখি আছে এখানে একশো আঠাশ প্রজাতির। গাছ আছে একশো ছাব্বিশ টাইপের। আটানব্বই রকমের গুল্ম। একান্ন ধরনের লতা। এ ছাড়া ওষধি গাছ আছে একশো পঁচিশ রকমের। সামনে যে নদীটা রয়েছে, তাতে তো প্রায় দু'শো রকমের মাছ আছে, জানো?"

পার্থ ঝুপ করে জিজ্ঞেস করল, "সেই জন্যই কি এখানে ঘড়িয়াল প্রকল্প? যাতে ওরা প্রাণ ভরে মাছ খেতে পারে?"

"বোধ হয়। তবে ওই সব সরীসৃপে আমার আগ্রহ নেই। তার চেয়ে প্রজাপতি দেখে বেড়াতে আমার বেশি ভাল লাগে।"

গল্প করতে-করতে খাওয়া শেষ। নৈশভোজের জন্য ইন্দ্রজিৎ বারবার ধন্যবাদ দিলেন মিতিনকে। পার্থ চোয়াল এঁটো করা হাসি উপহার দিল অধ্যাপককে। কাল কোথায়-কোথায় ঘুরবে পার্থরা জেনে নিয়ে বিদায় নিলেন গুরু-শিষ্য।

ওঁরা চোখের আড়াল হতেই পার্থর অন্য মূর্তি, "তোমার আক্কেলটা কী?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"হিসেব করে ডিম এনেছি। ওঁদের দু'খানা করে খাওয়ালে। শেষ দিকে যদি কম পড়ে যায়?"

"তখন ঘড়িয়ালের ডিম এনে দেব। এখনই তো ওদের ডিম পাড়ার সময়," মিতিন হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল, "বিশাল বড়-বড় সাইজ। কুমিরকুলে এদের ডিমই সব চেয়ে প্রকাণ্ড। এক-একখানার ওজন দেড়শো গ্রামেরও বেশি। ভাবতে পার? নদীর পারেই পেয়ে যাবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।"

"থাক, ওই খেয়ে মরি আর কী," বলে বেজার মুখে সরে গেল পার্থ। শুয়ে পড়েছে বুমবুমের পাশে। মশারির ভিতরে। টুপুরেরও আর শরীর চলছিল না, সেও শয্যা নিয়েছে পাশের ঘরে। জঙ্গলে মশারি টাঙানোর মতো জরুরি ব্যাপারটাও খেয়াল নেই।

ভাল মতোই তন্দ্রা এসে গিয়েছিল টুপুরের। হঠাৎই মৃদু ধাক্কা। মিতিনমাসির গলা পেল টুপুর, "কিছু শুনতে পাচ্ছিস?"

কান পাতল টুপুর। অস্ফুটে বলল, "একটা ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। রাতচরা পাখির ডাক বুঝি?"

"উঁহু, ওটা নয়। একটু ভাল করে শোন।"

"হ্যাঁ, তাই তো। একটা গিটার বাজছে যেন! ইংরিজি গানের সুর।"

"হুঁ, মনে হচ্ছে পাশের বাংলোয়।"

নির্ঘাত সুবাহু। টুপুর একটু মজাই পেল। আজব পড়শি জুটেছে তো, মাঝরাতে গিটার বাজায়!

॥ ৪ ॥

চার ভাগে ভাগ করে মোটা জালের খাঁচার ভিতরে ঝিম মেরে পড়ে আছে ঘড়িয়ালগুলো। কোনওটায় এক দেড় ফুটিয়া বাচ্চা, কোনওটা মাঝারি, কোনওটায় বা বেশ বড়সড়। দু'খানা তো রীতিমত প্রকাণ্ড। লেজ সমেত হাত পাঁচেকের কম নয়। খাঁচায় ছোট-বড় জলাধারও আছে বেশ কয়েকখানা। সিমেন্ট বাঁধানো। নানারকম মাছ

ছাড়া আছে জলাধারে। ঘড়িয়ালদের আহারের তোফা বন্দোবস্ত।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় আগে ঘড়িয়াল দেখেছে টুপুর। বুমবুমের জীবনে ঘড়িয়াল দর্শন এই প্রথম। সক্কালবেলায় এমন একটি জীবকে দেখে সে ভারী উত্তেজিত। বড় ঘড়িয়াল দু'টোর নট নড়ন চড়ন ভাব তাকে যেন বেশ ধন্দে ফেলেছে। ফিসফিস করে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই দিদি, ওরা জ্যান্ত না মরা?"

টুপুর বিজ্ঞের মতো বলল, "দুর বোকা, মরবে কেন! ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। হয়তো ঘুমোচ্ছে।"

"যাহ, চোখ তো খোলা!"

"কুমিরঘড়িয়াল চোখ খোলা রেখেই ঘুমোয়।"

"ধারণাটা পুরো ঠিক নয় রে টুপুর।"

ভাই-বোনের কথার মাঝে নাক গলিয়েছে পার্থ। বলল, "কুমিরঘড়িয়ালের আমাদের মতো চোখের পাতা নেই। আছে মণির উপর পাতলা আঁশের মতো একটা স্বচ্ছ আস্তরণ। অতএব ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে বোঝা অসম্ভব।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "মাছদের মতো?"

"অনেকটা সেরকম," পার্থ মাথা দোলাল, "ভাল করে লক্ষ কর টুপুর। কুমির পরিবারের মধ্যে ঘড়িয়াল কিন্তু ইউনিক। এক অদ্ভুত চিজ। দেহের তুলনায় মুখখানা কত সরু দেখেছিস তো? কতখানি লম্বা? পুরো লম্বাটে মুখখানা জুড়ে সার-সার দাঁত। আমাদের মতো বত্রিশ পাটি নয়, একশো দশখানা এবং ভয়ংকর ধারালো।"

বুমবুম বলল, "ওই দাঁত দিয়েই ওরা মাছ কুচিকুচি করে?"

"না রে, মাছ খেতে দাঁত ওদের কাজেই লাগে না। ওদের তো আমাদের মতো কষের দাঁত নেই, তাই চিবোতে পারে না। ওরা খপাত করে ধরে আর গপাত করে গেলে।"

"তা হলে দাঁতগুলো কী কাজে লাগে?"

"মেনলি চোয়াল দু'টো ধরে রাখার জন্য। নইলে তো মুখটা ল্যাতপ্যাত করবে। ঘড়িয়ালের বয়স হলে ওই দাঁতগুলো ক্রমশ ছোট আর মোটা হতে থাকে।"

মিতিন পালা করে একবার ছোট ঘড়িয়াল, একবার বড় ঘড়িয়ালগুলোকে নিরীক্ষণ করছিল। হালকা হেসে পার্থকে বলল, "তুমি যে ঘড়িয়াল এক্সপার্ট, তা তো জানা ছিল না।"

"গুণ আমার অনেক আছে ম্যাডাম। তুমিই যা পাত্তা দাও না।"

"তা গুণটা তোমার, না ইন্টারনেটবাবুর?"

পার্থ হেসে ফেলল, "সত্যি, ইন্টারনেটে সার্চ করে-করে যে কত কিছু জানছি।"

"আর কী-কী শিক্ষা লাভ করেছ?"

"এই যেমন ধরো, এখনও পর্যন্ত যে বৃহত্তম ঘড়িয়ালটিকে পাওয়া গিয়েছে তার দৈর্ঘ্য তেইশ ফুট। সেটাকে উনিশশো চব্বিশ সালে উত্তর প্রদেশের কোশী নদীতে গুলি করে মারা হয়েছিল। তার পরেরটি ছিল জলপাইগুড়ির চেকো নদীতে। তিনিও উনিশশো চব্বিশ সালে মানুষের গুলিতে অক্কা পান। একসময়ে এই ঘড়িয়াল আমাদের উপমহাদেশের নদীতে-নদীতে গিজগিজ করত। সিন্ধু, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, কোথায় না ছিল! এখন চম্বল, শোন আর মহানদী, ব্যস। আর ছুটকোছাটকা কিছু আছে নেপালে। যাট বছর আগে যাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, দু' হাজার ছ'য়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'শো পঁয়ত্রিশে।"

"এত কমে গিয়েছে?" টুপুরের গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "কেন?"

"আমাদের দোষে। এত বেশি মাছ ধরছি, নদীনালা থেকে ওদের খাবার গিয়েছে কমে। ওদের ডিমগুলো পর্যন্ত লোকে উদরস্থ করছে। তা ছাড়া মেরে ফেলাফেলি তো চলছেই অনবরত। ওদের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে নানা ওষুধ তৈরি হয়। আর ওদের চামড়া তো ভীষণ-ভীষণ দামি। শুধু শৌখিন ব্যাগ জুতো আর বেল্টের চামড়া জোগাতে-জোগাতে কত ঘড়িয়াল যে ফুড়ুৎ হয়ে গেল!"

টুপুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের সুখ বিলাসিতার জোগান দিতে গিয়ে কত পশুপাখি যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে! কমে এসেছে বাঘ, লোপ পাচ্ছে গন্ডার। এরকম সংরক্ষণ কেন্দ্র না থাকলে ঘড়িয়ালও পৃথিবী থেকে না মুছে যায়!

পার্থ ক্যামেরা বের করেছে। একটা ছোট ঘড়িয়ালের দিকে তাক করতে-করতে বলল, "সব চেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস? আমরা কথায়-কথায় বলি, লোকটা কী ঘড়িয়াল রে বাবা! অর্থাৎ লোকটা মহা দুষ্টু। অথচ ঘড়িয়াল মোটেই তেমন চালাকচতুর নয়। একটু কায়দা করে মাছ ধরে বটে, কিন্তু বাস করে খোলা বালির উপর। পা চারখানা এতই দুর্বল যে, জোরে নড়াচড়াও করতে পারে না। তাই এদের পটাপট মেরে ফেলাটাও সহজ।"

টুপুর জিজ্ঞেস না করে পারল না, "তা হলে খামোখা এদের ঘড়িয়াল বলে কেন?"

"ঘড়িয়াল নামটা এসেছে ঘড়া থেকে। কলসি ঘড়া, সেই ঘড়া।"

"মানে? এদের তো মোটেই ঘড়ার মতো দেখতে নয়?"

"ভাল করে প্রাণীগুলোর দিকে তাকা। মুখের উপরের দিকটা কেমন শুঁড়ের মতো লম্বা না?"

"হ্যাঁ।"

"ওরই ডগায় একটা ফোলা মতন জায়গা দেখছিস?"

"আছে তো।"

"তার ঠিক নীচেই ওদের নাকের ফুটো। জোরে শ্বাস ফেললে ওই ফোলা জায়গাটা খুলে গিয়ে ঘড়ার আকার নেয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ ওরা ওই ঘড়ার সাহায্যে ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারে। সেই আওয়াজ কখনও-কখনও এতই প্রচণ্ড যে, এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায়। যাকে তুই বলতে পারিস ঘড়িয়ালের বৃংহণ।"

বুমবুম মন দিয়ে বাবার কথাগুলো গিলছিল। ভুরু কুঁচকে বলল, "তা এখন ওরা ডাকছে না কেন?"

"ইচ্ছে হচ্ছে না, তাই। ওরা তো সার্কাসের জোকার নয় যে, আমরা চাইলেই খেলা দেখাবে।"

"ওরা তো খাচ্ছেও না। হাঁ পর্যন্ত করছে না।"

"করবে, করবে। এত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? দেখবি, একবার হাঁ করলে মুখ আর বন্ধই হচ্ছে না। তখন দাঁতগুলো গুনে নিস, কেমন।"

বুমবুমের বুঝি প্রস্তাবটা তেমন মনে ধরল না। দৌড়ে চলে গিয়েছে মা'র কাছে। মিতিন প্রদক্ষিণ করছিল খাঁচাখানা, তার আঁচল ধরে হাঁটছে বুমবুম।

হঠাৎই পিছন থেকে একটা ডাক, "গুড মর্নিং। সকাল-সকালই আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন দেখছি!"

একসঙ্গে সবাই ঘুরে তাকিয়েছে। সুবাহু। পরনে কাল রাতের জিন্স-টিশার্ট। হাত দু'খানা পকেটে ঢুকিয়ে কায়দা মেরে দাঁড়িয়ে।

ফোটো তোলা থামিয়েছে পার্থ। হেসে বলল, "সাতকোশিয়ার পয়লা নম্বর দ্রষ্টব্যটিকেই চাখছি।"

"কেমন টেস্ট?"

"খুব একটা জুতসই নয়। ব্যাটারা একবারও মুখ খুলছে না।"

"ওই তো, ওই তো খুলছে।"

সত্যি তো! চোয়াল ক্রমশ ফাঁক হচ্ছে বড় ঘড়িয়াল দু'টোর। প্রায় একসঙ্গে! ঈষৎ বাঁকা ছোট-বড় দাঁতগুলো বিকশিত হচ্ছে ক্রমশ!

অমনি পার্থকে আর পায় কে! পলকে ক্যামেরা চালু। এদিক থেকে শাটার টিপছে, ওদিকে গিয়ে শাটার টিপছে। টুপুর আর বুমবুমের চোখেও মুগ্ধ বিস্ময়।

মিতিন হাসি-হাসি মুখে সুবাহুর সামনে এল, "আপনি একা যে, প্রোফেসরসাহেব কোথায়?"

"স্যার তৈরি হচ্ছেন। এবার বেরিয়ে পড়ব।"

"কোথায় যাবেন এখন?"

"ঠিক নেই, স্যার যেদিকে বলবেন। কয়েকটা রেয়ার টাইপের প্রজাপতি ট্রেস করেছেন স্যার। সম্ভবত ওগুলোরই সন্ধান চলবে আজ।"

"ও। কাল রাতে গিটার কে বাজাচ্ছিল, আপনি?"

"আপনারা শুনতে পেয়েছেন?"

"জঙ্গলের মধ্যে কানে না এসে পারে? তা ছাড়া পাশাপাশি বাংলো।"

"তা বটে," সুবাহু লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসল, "কাল একদম বসা হয়নি তো, তাই মাঝরাতে। আপনাদের ডিসটার্ব করিনি তো?"

"না না, গভীর রাতে বেশ লাগছিল। আপনার হাত তো খুব ভাল। পেশাদার শিল্পীদের মতো।"

"তেমন কিছু নয়। নিয়মিত চর্চাটা করি, এই যা।"

কথার মাঝে কখন যেন মুখ বন্ধ করে ফেলেছে দুই ঘড়িয়াল। এক তালে। বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "কই, ওরা তো কিছু খেল না?"

"ওদের যা খাওয়ার ঠিক খেয়ে নিয়েছে," পার্থ বলল, "খাঁচার পোকামাকড় সব এখন ওদের পেটে।"

পকেট থেকে হাত বের করে সুবাহু ঘড়ি দেখল, "এবার তবে আমি যাই? আপনারাও প্রাণ ভরে জঙ্গলে চক্কর মারুন।"

পার্থ বলল, "ভাবছি সকালের দিকে একটু নৌকোয় চড়ব।"

"পাবেন কী? একটাই তো নৌকো। সে কখন থাকে, কখন থাকে না।"

সুবাহু চলে গিয়েছে বাংলোর দিকে। টুপুররাও ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে এল। পায়ে-পায়ে পৌঁছল পাহাড়টার কিনারায়। সামনে পাথর কেটে-কেটে নেমে গিয়েছে সিঁড়ি, নীচে সেই মহানদী পর্যন্ত। পাহাড়ের কিনারা থেকে প্রায় শ'দেড়েক ফুট তো হবেই।

মিতিন টুপুরকে বলল, "কী রে, নামবি নাকি? যাবি নদীতে?"

ইচ্ছে তো করছে টুপুরের। আবার একটু-একটু ভয়ও লাগছে যে। মহানদী এখানে মোটেই তেমন সরু নয়। গর্জনেই মালুম হয়, স্রোতও আছে যথেষ্ট। একবার পা পিছলে পড়লে আর রক্ষে নেই।

টুপুর ঢোক গিলে বলল, "কী হবে গিয়ে?"

"মহানদীর জলে একটু চরণ ছুঁইয়ে আসি। এলেবেলে নদী তো নয়, আসছে সেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুর থেকে। কোনও এক হ্রদ থেকে যেন বেরিয়েছে।"

"হ্যাঁ, হ্রদটা ফরশিয়া গ্রামে। এই নদীতেই রয়েছে ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ।" পার্থ বুক ফুলিয়ে বলল, "বাঁধটার নাম নিশ্চয়ই সবাই জানো, হীরাকুদ।"

মিতিন মুখ টিপে বলল, "এটাও কি তোমার ইন্টারনেটের টিপস?"

"না ম্যাডাম, এটা জেনারেল নলেজ," বলে পার্থ ঝুঁকল সামান্য, বলল, "যাও, নদীতে ঘুরে এসো।"

"আর তুমি?"

"আমার এতটা নামা-ওঠার কোনও বাসনা নেই। আমি এখান থেকে ফোটো তুলব।"

মিতিন চটি খুলে তৈরি। দেখাদেখি টুপুরও। বুমবুম বাবার দলে, সে পার্থর হাত ধরেছে। তখনই বিট অফিসারের আগমন। বছর চল্লিশ বয়স, তেলচুকচুকে চেহারা, পরনে নীল প্যান্ট, সাদা বুশশার্ট।

পার্থ বলে উঠল, "গুড মর্নিং স্যার। কাল অত গল্প হল, অথচ আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি।"

"আমি পূর্ণচন্দ্র বেহেরা," ওড়িয়া ছাঁচের হিন্দিতে বললেন, বিট অফিসার। মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাডাম কি স্নানে নামছেন নাকি?"

"ভাবছি। নদীতে ডুব দিলে মন্দ হয় না, কী বলেন?"

"খুব সাবধান। জলে ঘষা খেয়ে পাথরগুলো বড় পিছল হয়ে থাকে কিনা," পূর্ণচন্দ্র একবার নদীর দিকে তাকিয়ে নিলেন, "ভুলেও কিন্তু সাঁতার কাটার চেষ্টা করবেন না। বিপদ ঘটতে পারে।"

"তাঁবুটা তো দেখছি নদীর পারে। ওই জায়গাটা বোধ হয় সেফ, না?"

"সামান্য ইতরবিশেষ আর কি। স্রোতটা কম, তবে ওদিকে ঘড়িয়ালের সংখ্যা বেশি।"

"আহা, ঘড়িয়াল তো মাছ খায়। মানুষ তো ধরে না।"

"সে তো ঠিকই। কিন্তু গায়ের কাছে চোদ্দো-পনেরো ফিট ঘড়িয়াল ঘুরে বেড়ালে জলে নেমে স্বস্তি পাবেন কি?"

"তা হলে ওখানে তাঁবু খাটিয়ে থেকে কী লাভ?"

"যার যেমনটা পছন্দ। ওখানে আমরা একটা নেচার স্টাডি ক্যাম্প খুলেছি। অনেকেই বাংলোর বদলে টেন্টে থাকাটাই প্রেফার করেন।"

পার্থ দুম করে বলল, "আমরা কেন তাঁবু নিলাম না মিতিন?"

"চেয়েছিলাম তো। আঙ্কুলে বলল, এখন নাকি তাঁবুর অ্যাকোমোডেশন নেই।"

"ছিল না তো," পূর্ণচন্দ্র বললেন, "দিন পনেরো আগে একটা ঝড় হয়েছিল, তখন তাঁবুর ছত্রাকার দশা। তারপর থেকে আর দেওয়াই হচ্ছিল না। কাল দুপুরে হঠাৎ দুই ভদ্রলোক এসে হাজির। কাকে ধরেকরে যেন ম্যানেজ করেছেন। তাঁবু তো খাটানোই ছিল না, অফিস থেকে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই লাগিয়ে ফেললেন।"

"ওঁরা কারা? কিছু জানেন?"

"হবে কোনও কর্তাব্যক্তির জান পহেচান। নিজেরা নিজেদের মতো আছেন, এদিকে আসছেনও না," পূর্ণচন্দ্র একটা তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করলেন। পার্থকে বললেন, "ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। নৌকো চড়ায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, জলের তোড়ে বোট ডুবেও যায়। ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন তো, বুঝেশুনে চলবেন।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মনে থাকবে।"

হেলেদুলে অফিসের দিকে চলে গেলেন পূর্ণচন্দ্র। মিতিনদেরও আর নীচে নামা হল না। জলখাবার বানিয়ে বিভূতি ডাকাডাকি করছেন। ঘোরানো রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে-উঠতে টুপুরের নজরে পড়ল, জঙ্গল পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন ঝোলা পিঠে ইন্দ্রজিৎ। সুবাহু চলেছে পিছু-পিছু, কাঁধে গিটারের বাক্স। আজ জঙ্গলেই বাদ্যচর্চা করবে নাকি? হরিণ, বাইসনদের গিটার শোনাবে? দুনিয়ায় কত ধরনের পাগল যে থাকে! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেই প্রাতরাশ সেরে নিল টুপুররা। একটু তেড়াবেঁকা হলেও পরোটা বেশ ভালই বানিয়েছেন বিভূতি। লঙ্কা, পেঁয়াজ সহ আলুভাজাটাও মন্দ নয়। তার সঙ্গে কলা আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে সকলেরই পেট জয়ঢাক। কালই স্থির হয়েছে দিনের রান্নাটা বিভূতিই সারবেন, মিতিন হাতাখুন্তি ধরবে রাতে। দায়িত্ব পেয়ে বিভূতি দারুণ উৎসাহিত। নিজেই উদ্যোগী হয়ে ভোরবেলা কাকে যেন বলে এসেছেন, একটু পরেই এসে যাবে মাছ। মহানদীর। দুপুরে তাই ডিম নয়, ডাল, ভাজাভুজির সঙ্গে আজ মাছের ঝোলের আয়োজন।

এবার নৌকো চড়ার পালা। ঘাটটা বাংলো থেকে খানিক দূরে, তাঁবুর সামনেটায়। মোরাম বিছানো পথ ধরে গিয়ে নামা যায় নদীর দিকটায়। ফুরফুরে মেজাজে শিস দিতে-দিতে দলপতির মতো চলেছে পার্থ। বুমবুম ছুটছে লাফিয়ে-লাফিয়ে। তাকে আজ দুধ খেতে হয়নি, তাই যেন আহ্লাদে ডগবগ। টুপুর হাঁটছিল মিতিনের পাশে-পাশে, তার হাতে মাসির বাইনোকুলার।

তাঁবুর কাছাকাছি এসে ট্রেনের লোক দু'টোর সঙ্গে দেখা। ঝোলা পিঠে বেঁধে তাঁরাও বেরনোর জন্য প্রস্তুত।

তাগড়াই গোঁফ মানুষটি টুপুরকে দেখে বললেন, "তোমরাও এখানে? বাহ, বাহ। কখন এলে কাল?"

"প্রায় সন্ধের মুখে। আপনারা তো কাল দুপুরেই?"

"হ্যাঁ, কটকে নেমে আর দেরি করিনি। জিপ ভাড়া করে প্রায় তক্ষুনি।"

"খুব তাড়া ছিল বুঝি?"

"তা ছিল একটু। ওই বাংলোর সামনে কি তোমাদেরই গাড়ি?"

"হ্যাঁ।" এবার পার্থ জবাব দিল, "সঙ্গে গাড়ি থাকলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর সুবিধে হয়। আপনারা বোধ হয় পৌঁছেই জিপ ছেড়ে দিয়েছেন?"

"আমাদের তো হেঁটে-হেঁটেই কাজ," গুঁফো লোকটা সঙ্গীকে বললেন, "তাই না কর্মবীর?"

এতক্ষণে স্বর ফুটেছে মিতিনের। গুম্ফধারীকে বলল, "ও, আপনিই তা হলে শক্তিধর সমাদ্দার?"

কর্মবীর বিস্মিত মুখে বললেন, "আপনি ওর নাম জানলেন কী করে?"

"ওঁকে দেখে শক্তিধর বলে মনে হল কিনা," মিতিন চোখ তেরচা করল, "আপনি বছর দশেক আগে বক্সিংয়ে একবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সম্ভবত মিড্‌ল ওয়েটে। ঠিক বলছি?"

শক্তিধরের ভুরু জড়ো হল, "হ্যাঁ, তখন কাগজে ফোটো বেরিয়েছিল বটে। কিন্তু অ্যাদ্দিন পরও আপনার মনে আছে?"

"না, না। এখানকার রেজিস্টারেও তো আপনাদের নাম দেখলাম। তা আপনারা এখানে কী কাজে?"

"কাজ? কই না তো," কর্মবীর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমরাও বেড়াতেই এসেছি।

আমাদের দু'জনেরই জঙ্গল খুব প্রিয় কিনা। এই তো, এখন নৌকো নিয়ে বেরোচ্ছি।"

"সে কী, আপনারা নৌকো ভাড়া করে ফেলেছেন?" পার্থ হতাশ মুখে বলল, "আমরা যে ভাবছিলাম! তা ফিরছেন কখন?"

"ঠিক নেই। হয়তো সারাদিনই ঘুরব। ড্রাই লাঞ্চ মজুত করে নিয়েছি।"

বুমবুম হায়-হায় করে উঠল, "এ মা, তা হলে আমাদের নৌকো চড়ার কী হবে?"

"তোমরা কাল যেও," শক্তিধর বুমবুমের গাল টিপে দিলেন। খানিকটা যেন তড়িঘড়ি করে বললেন, "আমরা আসি তা হলে?"

অদূরে অপেক্ষা করছিল ডিঙি নৌকো। দু'জনে গিয়ে চড়তেই বয়স্ক মাঝি যাত্রা শুরু করেছেন। স্রোতের টানে ভালই গতি নিয়েছে ডিঙি। টুপুররা সেদিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে।

একটু পরে পার্থ বলল, "অতঃ কিম?"

টুপুর বলল, "আমরা তা হলে লবঙ্গিতেই রওনা হয়ে যাই।"

"তুৎ, সে তো যাব দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর। গাড়ি ছাড়া তো লবঙ্গি যাওয়া যাবে না, সুতরাং বিভূতিবাবুকে চাই।"

"কেন, তুমি ড্রাইভ করতে পারবে না? কিংবা মিতিনমাসি?"

"আমরা রাস্তা চিনি নাকি? বনেজঙ্গলে কোথায় ঘুরে মরব? তার চেয়ে বরং বাংলোর আশপাশেই চরে বেড়াই। বাংলোর পিছন থেকেই তো ফরেস্টের শুরু, ওদিকেও খানিকটা ঢুঁ মারতে পারি।"

সকালটা ফালতু-ফালতু গড়িয়ে যাক, কারওরই কাম্য নয়। সুতরাং সকলেই রাজি। চটপট বাংলোয় ফিরে পিছনে যাওয়ার রাস্তা ধরেছে। সামান্য একটু চড়াই, তারপর বনপথের শুরু।

উঠতে গিয়ে থমকাল টুপুর। তাদের বাংলোর পিছনে একটা শ্রীহীন ছোট্ট কোয়ার্টার। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিতিনমাসি। ঝুঁকে কী যেন করছে।

টুপুর দৌড়ে এল, "কী গো? কী দেখছ?"

মাটি থেকে একচিলতে গুঁড়ো তুলল মিতিন। আঙুলে ঘষে পরীক্ষা করে দেখছে গাঢ় সবুজ রঙের পাউডার। বিড়বিড় করে বলল, "ক্রোমিয়াম সালফেট!"

"সেটা কী?"

জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "এখন জঙ্গলে ঢুকে কাজ নেই। চল, আবার ঘড়িয়ালগুলোকে দেখি।"

॥ ৫ ॥

অতি ধীরে চলছিল গাড়ি। ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে। ভাঙাচোরা বলাটা ভুল, রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। গহিন অরণ্য চিরে প্রায় মাটির পথ মেরেকেটে সাত-আট হাত চওড়া। কোনও এককালে হয় তো ইটটিট পড়েছিল, এখন তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মুখে কুলুপ এঁটে পথের দু' পাশটা দেখছিল টুপুর। কী গাঢ় নিস্তব্ধতা! এমন নৈঃশব্দের মাঝে কথা বলা বুঝি মানায়ও না। জন্তপ্রাণীর আওয়াজ তো দূরস্থান, শোনা যাচ্ছে না কোনও পাখির ডাকও। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটা পর্যন্ত কানে লাগছে। জঙ্গল ক্রমশ এতই গভীর, স্পষ্টভাবে কিছু দেখার উপায় নেই। এই ঘোর দুপুরেও বনের মাঝে চাপ-চাপ অন্ধকার। হঠাৎ-হঠাৎ ঝোপঝাড় সামান্য নড়ে উঠলেই ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। মনে হয়, এই বুঝি হানা দিল কোনও বুনো জন্তু। মাঝে-মাঝেই পথের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝোরা। সন্তর্পণে সেই জল মাড়িয়ে এগোচ্ছে টুপুরদের জিপ। একবার যেন হরিণের ডাকও শোনা গেল। কিন্তু চোখে এসে ধরা দিল না কেউ।

স্তব্ধতার চাপ কমাতেই বুঝি কথা বলে উঠলেন বিভূতি, "কেমন লাগছে স্যার?"

"দুর্দান্ত," পার্থ পাশের সিট থেকে বলল, "ভেবেছিলাম হালকাপুলকা ফরেস্ট। কিন্তু এ তো দেখছি সিমলিপাল, সারান্ডাকেও হার মানায়। লবঙ্গি আর কদ্দুর?"

"আরও সাত-আট কিলোমিটার তো বটেই।"

"আগাগোড়াই এরকম? মাঝে কোনও ফাঁকা জায়গা নেই? গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফোটো তুলতাম।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আছে বইকি। একটু অপেক্ষা করুন।"

বলতে-বলতে মিনিট কয়েকের মধ্যে জঙ্গল একটু পাতলা হয়েছে। মিলেছে একফালি খোলা প্রান্তর। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ছাড়াও আরও কত লাল-লাল ফুল ফুটে আছে। গাছের পাতাগুলোও যেন লালচে লাগে ফুলের আভায়।

গাড়ি থামতেই টুপুর নেমে হাত-পা ছাড়িয়ে নিল। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে মিতিনের ঘাড় ঘুরছে এদিক-সেদিক। পার্থর শাটার টেপার বিরাম নেই। বুমবুম ঘাড় উঁচিয়ে দেখছে ফুলের মেলা।

হঠাৎ টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দ্যাখো, দূরে একটা হরিণ।"

বুমবুম পলকে সচকিত, "কই রে টুপুরদিদি?"

"ওই তো, বড় শাল গাছটার নীচে। ও'মা! একটা তো নয়, অনেক!"

টুপুরদের শো দেওয়ার জন্যই যেন হাজির হয়েছে চিতল হরিণের পাল। একটুও ভয় পাচ্ছে না মানুষকে। দিব্যি অসংকোচে দাঁড়িয়ে। হালকা বাদামির উপর সাদা-সাদা ছোপ। সুন্দর জীবগুলো কী সরল চোখে তাকাচ্ছে! আচমকা কোথায় যেন মৃদু শব্দ হল, অমনি দুদ্দাড়িয়ে পালাল হরিণের দল, লাফ মেরে-মেরে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "একটা শব্দ শুনেই ওরা হাওয়া মারল যে বড়?"

মিতিন বলল, "ওরা এমনিতেই ভিতু। তা ছাড়া, জঙ্গলের প্রাণীরা আগাম বিপদের গন্ধ পায়। হয়তো কাছেপিঠে নেকড়ে কিংবা প্যান্থার গোছের কিছু এসেছে।"

পার্থ সামান্য বিচলিত হয়েছে। বলল, "আর দেরি নয়। চলো, তা হলে আমরা জিপে উঠে পড়ি।"

মিতিন হেসে বলল, "ভয় পেয়ে গেলে?"

"তা কেন, সঙ্গে আমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা মোটেই সেফ নয়।"

"জন্তুটাকে দেখতে পেলে কিন্তু একটা দুরন্ত স্ন্যাপ নিতে পারতে।"

"চলো, গাড়িতে গিয়ে বসি তো। ওখান থেকেও কিছু মন্দ হবে না।"

বসে অপেক্ষা করাই সার। কোনও চারপেয়েই দর্শন দিল না। তবু টেলিলেন্স লাগিয়ে বেশ কয়েকবার শাটার মারল পার্থ।

বিভূতি ফের স্টার্ট দিয়েছেন গাড়িতে। আবার নিঝুম জঙ্গল। আবার এবড়োখেবড়ো পথ। পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গে বিস্কুটটিস্কুট কিছু এনেছ?"

মিতিন ভ্রুভঙ্গি করল, "এরই মধ্যে খিদে পেয়ে গেল?"

"যা ঝাঁকুনি, বাপ রে! ভাত, মাছের ঝোল হজম হয়ে গিয়েছে।"

"বুমবুমের চিপস আছে, চলবে?"

"দাও দু'-চারটে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক।"

অমনি বুমবুমের বায়না, "আমাকেও দাও, আমাকেও দাও।"

অগত্যা টুপুরই বা আর বাকি থাকে কেন! সেও চলেছে টকঝাল কচুভাজা চিবোতে-চিবোতে।

খানিকটা গিয়ে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "লবঙ্গি থেকে ফিরে আমরা কি আর বেরোব?"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "কোথায় আর যাব?"

"বা রে, তুমিই তো বললে জঙ্গলে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। গভীর রাতে সেখান থেকে নাকি অনেক জন্তু দেখা যায়।"

"উত্তম প্রস্তাব, যাওয়া যেতেই পারে," পার্থ পাশে তাকাল, "কী বলেন বিভূতিবাবু?"

"কোনটায় যাবেন?" বিভূতির পালটা প্রশ্ন।

"মানে? বিট অফিসার যে বললেন, একটাই ওয়াচ টাওয়ার?

হাতিবাড়ি না কোথায় যেন?"

"না তো, আরও দু'টো আছে। কদলিখোলা আর করদাপাড়া। অবশ্য হাতিবাড়ি যাওয়াই ভাল। বাকি দু'টোর দশা সুবিধের নয়।"

"ওখানে বাঘ-ভল্লুক কিছু দেখা যাবে?"

"এখন সম্ভাবনা কম। জলাশয় মতো বানানো আছে, আর আছে নুনের গর্ত। গরম আরও বাড়লে ঝরনাটরনাগুলো একেবারে শুকিয়ে যায়, তখন জানোয়াররা ওখানে জল খেতে আসে। তবে নুন চাটতে আসা দু'-একটা ভল্লুক কিংবা বুনো শূকর দেখতে পাবেন, এটুকু বলতে পারি। আর কপাল খুব ভাল থাকলে হাতি। বাঘ-টাঘ এখন আশাই করবেন না।"

পার্থ বুঝি একটু দমে গিয়েছে। বলল, "হাতি তো বোধ হয় আজই পেয়ে যাব, লবঙ্গিতে।"

"তা হলে আর বিভূতিবাবুকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন?" মিতিন বলে উঠল, "রাত্তিরটা উনি শান্তিতে ঘুমোন। কাল-পরশু তো হাতে থাকছে। তার মধ্যেই একদিন না হয়..."

"জো আপকা মর্জি ম্যাডাম।"

লবঙ্গির বনবাংলো এসে গিয়েছে। জিপ থামতেই দৌড়ে এল চৌকিদার। বুড়ো মানুষ, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, খালি গা, কাঁধে গামছা, গায়ের রং মিশমিশে কালো। মুখে আদিবাসী-আদিবাসী ভাব।

চৌকিদার বিভূতির চেনা। পার্থর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এ হল সুরজ মুন্ডা। সাতকোশিয়ার সব ক'টা বনবাংলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী।"

সুরজ ঘাড় নাড়লেন। ওড়িয়া ভাষায় বললেন, "হাঁ স্যার, পঁয়ত্রিশ বৎসর চাকরি করুছি।"

"বটে? তা হলে তো আপনার কাছে জঙ্গলের অনেক গল্প শোনা যাবে," পার্থ সোৎসাহে বলল, "তার আগে একটু চা পাওয়া যাবে কি?"

"এইনে করি আনুছি," বলেই দৌড়। টুপুররা ঘুরে-ঘুরে দেখল বাংলোটা। তিনটে ঘর, মাঝে ডাইনিং হল, সবই অবশ্য বন্ধ। সামনে খানিকটা খোলা জমি। সেখানে অনেক গাছ। শাল, সেগুন, শিশু কাঁঠাল। একটু দূরে লম্বা দেবদারুও চোখে পড়ল। একখানা পাহাড়ও দৃশ্যমান। পাহাড়ের নীচে খেত, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেশ লাগে দেখতে।

পার্থ বিভূতিকে জিজ্ঞেস করল, "বাংলোটা বন্ধ কেন? কেউ আসে না এখানে?"

"বুকিং দিচ্ছে না। জলের খুব সমস্যা তো এখানে।"

"টুলকায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওখানে তো টুরিস্ট যাচ্ছে। বাঘমুন্ডাতেও।"

"কিন্তু পুরানাকোটে? ওখানে তো রেঞ্জ অফিস, লোকবসতি আছে, তবু বাংলোটা তো শুনশান মনে হল।"

"তার কারণ অন্য স্যার। পুরানাকোটের বাড়িটায় ভূত আছে।"

"হোয়াট?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনাআপনি দরজা খুলে যায়, খাওয়ার প্লেট থেকে খানা উবে যায়, নানারকমের গলা কানে আসে। বনদফতর এখন পারতপক্ষে কাউকে ওখানে পাঠায় না।"

সুরজ চা এনেছেন। হাতে-হাতে কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনামানুকু তো খুব অসুবিধা হইছি।"

পার্থ যেন ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, "কেন? কিসের অসুবিধে?"

"রাঙ্কুতি কি এ? টিকরপদার চৌকিদার তো ছুটিতে যাইছি।"

"যাহ, সে তো নিখোঁজ। তার তো পাত্তাই মিলছে না।"

"রাজু তো পরশু ঘরকো যাইছি। পনেরো দিনের আগে আসিবুনি।"

পার্থ আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে এত খবর কে দিল?"

"সুরজবুড়ার কান বড় লম্বা। জঙ্গলের সব কথা ভাসি আসে।"

"এ তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার!" পার্থর চোখ পিটপিট, "তা আর কী কথা আপনার কানে ভেসে এসেছে?"

"লুকিচুরি করে কেতে-কেতে সব জন্তু মারে। এনে কেই দেখি পারিনি।"

"তাই নাকি? শুনছিলাম বটে গত বছর দু'খানা চিতা খুন হয়েছে।" পার্থ মাথা নাড়ল, "আর কী-কী জন্তুকে টার্গেট করে?"

"এত্তেদিনি হরি মার খেলা। এনে ঘড়িয়া মারুছি।"

"ঘড়িয়া? মানে ঘড়িয়াল?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বলেন কী? এমন নিরীহ মেছো কুমিরদেরও?"

মিতিন মন দিয়ে কথোপকথন শুনছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "অবাক হওয়ার কিছু নেই পার্থ। ঘড়িয়ালের চামড়া যে কত মহার্ঘ, তা টুপুরও জানে।"

"তা বটে। কিন্তু..."

পার্থর তবু যেন মন খুঁতখুঁত। এদিকে চার-চারজন শ্রোতা পেয়ে সুরজ উজাড় করে দিচ্ছেন তাঁর গল্পের ঝাঁপি। সেই অনেক-অনেক বছর আগে রইস লোকজন কীভাবে কাঁধে বন্দুক চাপিয়ে বাঘ, ভল্লুক শিকারে আসত। তারপর এক সময় জন্তু-জানোয়ার মারার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সরকার। রায়গড়া, পম্পাতোলা আর মহানদীর জঙ্গল মিলিয়ে হয়ে গেল একটাই বন। ভাল লোক তো আর আসেই না, এখন শুধু দুষ্টু ছেলে-ছোকরার উপদ্রব। তারা যেখানে-সেখানে পিকনিক করে, গাঁকগাঁক করে গান চালায়, ভয়ে জন্তুরা আর তেমন বেরোয়ই না।

নিজের ভাষায় চলছে সুরজের বকবকানি। প্রথমটা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু ক্রমেই যেন পার্থর বোধগম্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। কেটে পড়ার জন্য ঘন-ঘন ইশারা করছে বিভূতিকে। কোনওক্রমে ছাড়া পেয়ে বিভূতিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন।

গাড়ি চলতেই টুপুরের গলায় আফশোস, "এ মা, আমাদের তো লবঙ্গিতে হাতি দেখা হল না!"

বিভূতি বললেন, "হাতিরা বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকে না। অনবরত স্থান বদলায়। টিকড়পাড়া ফেরার আর একটা রাস্তা আছে। খুব খারাপ পথ। আরও ঘন জঙ্গল। ওই দিক দিয়ে গেলে হয়তো কিছু জানোয়ার চোখে পড়বে। যদি বলেন তো..."

"কোনও দরকার নেই," মিতিন সরাসরি নাকচ করে দিল, "জঙ্গলে তো আসা বুনো-বুনো ভাবটা এনজয় করতে। সেটা তো পুরো মাত্রায় হচ্ছে। জন্তুজানোয়ার দেখার জন্য কলকাতার চিড়িয়াখানাই কি যথেষ্ট নয়?"

পার্থ ক্ষীণ স্বরে বলল, "তবু ন্যাচারাল পরিবেশে বন্যপ্রাণী দেখার মজাটাই তো আলাদা।"

বুমবুম বলল, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।"

মিতিন বলল, "না, এখন সোজা বাংলো। রাতে যদি জাগতে পারো, ওয়াচ টাওয়ারে বসে দেখো।"

অগত্যা আগের পথেই প্রত্যাবর্তন। রুমে এসে কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খেল পার্থ। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চলল বিভূতিকে জপাতে। বিকেলে গরম-গরম পকোড়া চাই কিনা!

লনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিল মিতিন। টুপুরও একটা চেয়ার টেনে বসল পাশে। দেখছে নদীর ওপারের পাহাড়, বাঁক খাওয়া রুপোলি নদী। শেষ সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে জলটা। কাছেই একটা গাছে তিনটে মিশকালো পাখি এ ডালও ডাল করছে। ভীমরাজ নাকি? একটা টিয়ার ঝাঁক মহানদীর ওপার থেকে ফিরছে। ট্যাঁ ট্যাঁ করতে-করতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে।

টুপুর আত্মগতভাবে বলল, "বিকেলটা এখানে দারুণ, তাই না মিতিনমাসি?"

মিতিনের কোনও সাড়াশব্দ নেই। টুপুরের হঠাৎই মনে হল, মাসি যেন বড্ড চুপচাপ। ফেরার পথে গাড়িতেও বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না। কী যেন ভাবছে সারাক্ষণ।

টুপুর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "কী এত চিন্তা করছ গো?"

সামান্য মাথা ঝাঁকাল মিতিন। তারপর বলল, "একটা সংশয় মনে উঁকি দিচ্ছে, বুঝলি।"

"কীরকম?"

"যেমন ধর, রাজু নামের চৌকিদারটির হঠাৎ প্রস্থান। বিট অফিসার কিছুই জানেন না, অথচ সুরজ বলছেন, সে নাকি ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে।"

"হয়তো সুরজ ভুল জানেন। কিংবা রাজু হয়তো বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবরটবর পেয়েছে।"

"কিন্তু বিট অফিসার তো পাশেই থাকেন। তাঁকে বলে যাবে না?"

"উনি তো বলছিলেন, রাজুর নাকি এরকম অভ্যেস আছে।"

"হুম। তারপর ধর, কর্মবীর আর শক্তিধরই শুধু তাঁবুর বুকিং পেলেন।"

টুপুর উৎসুক মুখে বলল, "তুমি কি কোনও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ?"

"উঁহু, তার চেয়েও বেশি। মনে হচ্ছে, কোথাও একটা নোংরা খেলা চলছে। আর সেই খেলাটা খুবই ভয়ংকর।"

"তুমি কী বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি নিজেও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না যে। আবছা-আবছা ক'টা সুতো দেখতে পাচ্ছি শুধু। যতক্ষণ না ওগুলো স্পষ্ট হচ্ছে, জোড়াও যাবে না।"

এক-এক সময়ে কী যেন হেঁয়ালি করে মিতিনমাসি, মাথামুন্ডু ঠাহর করাই দায়। তবে যাই হোক, টুপুরকে এড়িয়ে তো কিছু করবে না মাসি।

ভাবনার মধ্যেই রাশি-রাশি তেলেভাজা হাজির। পাহাড়প্রমাণ বেগুনি, পেঁয়াজি, আলুর চপ, কিছুই বাদ নেই। বড় প্লেটে সাজিয়ে এনেছেন বিভূতি। পাশে উল্লসিত মুখে পার্থ আর বুমবুম। কচর-কচর মুখ চলছে বাপ-ছেলের।

পার্থ আহ্লাদিত স্বরে বলল, "খেয়ে দ্যাখো, তোমার কালকের রাতের বেগুনির চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।"

মিতিন একটা বেগুনি তুলে নিল। কামড় দিয়ে বলল, "মন্দ নয়, তবে নুন একটু কম।"

পার্থ বলল, "ওফ, কিছুতেই প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পার না। একদম নিখুঁত হলে কি প্রেসের ব্যবসায় পড়ে থাকতাম? জমিয়ে তেলেভাজার দোকান দিতাম একখানা।"

"আর নিজেই খেয়ে সাফ করতে," টুপুরও মজা জুড়ল, "আর দিনের শেষে ক্যাশবাক্সে পড়ে থাকত লবডঙ্কা।"

"মোটেই না। তোর মাসি টিকটিকিগিরি করে যা কামায়, তার তুলনায় ঢের বেশি পয়সা আসত," পার্থ আর একটা চেয়ার টেনে বসল। তির্যক সুরে বলল, "কত কেসে যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, হিসেব করে দেখেছিস কখনও?"

এমন একটা অপবাদ মিতিনমাসির আছে বটে। অনেক সময়েই

সরকারি কেসে বিনা পয়সায় খেটে দেয় আই জি অনিশ্চয় মজুমদারের অনুরোধে। এই জঙ্গলেও যদি কোনও রহস্যের সন্ধান পায়, সেটাও কি বেগারখাটা হবে? হয়তো বা!

বিভূতি হাসি-হাসি মুখে পাশের বাংলোটা দেখছিলেন। হঠাৎই বলে উঠলেন, "মাস্টারমশাই আর ছাত্র খুব জঙ্গলে ঘুরছেন দেখি! এখনও ফিরলেন না!"

"রাতে খাওয়ার সময়ে ঠিক গুটিগুটি পায়ে হাজির হবেন," বলেই পার্থ তর্জনী তুলে মিতিনকে বলল, "আজ কিন্তু ওঁদের আর নেমন্তন্ন নয়। নিজেরা যা পারে, রেঁধে খান।"

নিমন্ত্রণ করা, না করার অবশ্য প্রয়োজন হল না। সুবাহু ভিড়লই না রান্নাঘরের দিকে। পুরানাকোট থেকে সম্ভবত কিছু শুকনো খাবার কিনে এনেছে, তাই দিয়েই সারবে নৈশাহার।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পার্থ মন দিয়ে আজকের তোলা ফোটোগুলো দেখছিল। তাকে ঘিরে মিতিন, টুপুর আর বুমবুম। নিজের তোলা ফোটোতে নিজেই ভারী মুগ্ধ পার্থ। বাহ, বাহ, ধ্বনি ঠিকরোচ্ছে গলা থেকে। তার আত্মতারিফের ঘটায় টুপুর তো হেসে খুন। উজ্জ্বল মুখে ক্যামেরাটা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়েছে পার্থ। বলল, "দ্যাখো, ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি কাকে বলে একটু বোঝার চেষ্টা করো।"

সরু চোখে প্রত্যেকটি ফোটো নিরীক্ষণ করছিল মিতিন। পাহাড়, নদী, শাল, সেগুন, আসান, কুরুম, শিরীষ, মহুল গাছে ভরা বন। লাল-লাল ফুল, হরিণ, চকিতে হরিণের পালিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ মিতিনের দৃষ্টি স্থির। একটা ফোটো দেখছে জুম করে। পার্থকে বলল, "এটা একটু ডিপলি ওয়াচ করো তো। গাছের ওপাশে ওটা কী? মানুষ না?"

"হ্যাঁ, তাই তো," পার্থ ঝুঁকল, "দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে যেন!"

মিতিন আরও জুম করল ফোটোটাকে। বিড়বিড় করে বলল, "ওদের হাতে..."

"রিভলভার!" পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "রিভলভারই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা কারা?"

মিতিন বলল, "চিনতে পারলে না? কর্মবীর আর শক্তিধর।"

॥ ৬ ॥

সকালে নৌকো চড়তে-চড়তে বেলা দশটা বেজে গেল। চওড়া পাটাতনে বসেছে টুপুর আর পার্থ। মাঝে বুমবুম। উলটো দিকে সালোয়ার কামিজে মিতিন, গলায় তার বাইনোকুলার। আকাশে আজ বেশ মেঘ, দমকা বাতাস উঠছে হঠাৎ-হঠাৎ। স্রোতের অভিমুখে চলা নৌকো দুলে-দুলে উঠছে। অমন ছটফটে বুমবুম ভয়ে জড়সড়।

টুপুরেরও যে বুক ঢিপঢিপ করছিল না, তা নয়। তবে অন্য একটা চিন্তা তাকে আরও বেশি ভাবাচ্ছে যে। ধরেই রেখেছিল আজ আবার ঘাটের পথে দেখা হবে শক্তিধর আর কর্মবীরের সঙ্গে। কিন্তু কী কাণ্ড, তাঁবু বেবাক ফাঁকা! তাদের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ জেগেছে বলেই কি পালাল লোক দু'জন? শূন্য তাঁবুটা তন্নতন্ন করে খুঁজল মিতিনমাসি। মিলল শুধু একটা ছেঁড়াখোঁড়া কার্বন পেপার। মূল্যবান হিরেজহরতের মতো সেটাই ব্যাগে পুরল মিতিনমাসি। কী কম্মে লাগবে কে জানে!

ওই লোক দু'জন যে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে জঙ্গলে ঢুকেছেন, তাতে আর টুপুরের কোনও সন্দেহ নেই। পার্থমেসোরও না। ক্যামেরার মনিটরে দুই মূর্তিমানকে আবিষ্কার করেই ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল পার্থমেসো। তর্জনী উঁচিয়ে বলল, "ওঁরা নির্ঘাত চোরাশিকারি। জঙ্গলে জন্তু মারতে এসেছেন।"

"আমারও তাই মনে হয়," টুপুর বলেছিল, "হরিণগুলোকে বোধ হয় তাক করছেন। হরিণের চামড়ার যা দাম!"

"হতেই পারে। হয়তো এক-আধটাকে মেরেও ফেলেছেন। আমাদের এখন তা হলে কী করা উচিত?"

"বিট অফিসারকে জানাবে? নাকি পুলিশকে?"

"সরাসরি ওঁদের তাঁবুতে গিয়ে হানাও দিতে পারি।"

"থাক। রাত্তিরবেলা এখন আর শোরগোল তুলে লাভ নেই। অত বীরত্বও দেখাতে হবে না," মিতিনমাসি সরাসরি উৎসাহে জল ঢেলে দিল, "যাও, এখন সবাই শুয়ে পড়ো তো।"

"তুমি ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছ না?"

"নিয়েছি বলেই তো ঘুমোতে বলছি। সকালে তা হলে শরীর-মন তাজা থাকবে। তখন নয় অভিযানে নামব।"

মিতিনমাসিকে আর ঘাঁটায়নি বটে, কিন্তু প্রস্তাবটা মোটেই মনঃপূত হয়নি পার্থমেসোর। আর এখন খাঁ খাঁ তাঁবুটি দেখা ইস্তক তার মুখ রীতিমত গোমড়া। নদীর দু' পাশে সবুজের বাহার, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অরণ্য ক্রমশ উঠে গিয়েছে উপরপানে। গাছে-গাছে কত রঙের যে ফুল! এমন অপরূপ দৃশ্য পার্থমেসো যেন দেখেও দেখছে না। শুধুই যান্ত্রিক ভাবে এলোমেলো শাটার টিপে চলেছে ক্যামেরায়। নদীর ওপারেও নাকি চিতল, শম্বর, নীলগাই, চৌশিঙার দর্শন মেলে। আছে ভল্লুক, আছে হাতির পাল। বনপথ ধরে নাকি প্রায় কটক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়। দাঁড় বাইতে-বাইতে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ মাঝি। পার্থমেসো যেন শুনেও শুনছে না। সাতকোশিয়া সম্পর্কে তার যেন আর আগ্রহই নেই।

তার মাঝেই হঠাৎ মাঝিকে মিতিনের প্রশ্ন, "কাল ওই বাবুদের কতক্ষণ নৌকো চড়ালেন?"

"বেশি নয়, জোর এক ঘণ্টা।"

"মাত্র? তারপর ওঁরা ফিরে এলেন?"

"না তো। ওঁরা এক জায়গায় নৌকো দাঁড় করিয়ে পারে নেমে গেলেন।"

"ওসব জেনে আর কোনও লাভ আছে?" পার্থর বিদ্রূপ উড়ে এল, "সময়কালে কোনও ব্যবস্থা নিলে না, পাখি তো ফুড়ুৎ।"

"অত সোজা নয় স্যার। জঙ্গল ছেড়ে যাবেন কোথায়?"

"যেখানে খুশি। গোয়েন্দাম্যাডাম নিশ্চয়ই দেখেছেন, বাংলোর কাছ থেকেই আঙুলের বাস ছাড়ে। ভোরবেলা যদি সেই বাসে চেপে থাকেন, এতক্ষণে তাঁরা..."

"এক সেকেন্ড। তাঁরা যদি শিকারই করে থাকেন, তা হলে সেই মরা জন্তুটন্তু নিয়েই গিয়েছেন নিশ্চয়ই?"

"তা কেন। চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।"

"রাতারাতি ওই কাজটি সম্ভব নয় পার্থ। জন্তুজানোয়ারের ছাল ছাড়ানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। মেরেই অমনি কাঁধে চামড়া নিয়ে পালানো যায় না। চামড়াটাকে শুকোতে হয়। সময় লাগে। অন্তত তিন-চারদিন।"

"তা হলে হয়তো আছেন কোথাও ঘাপটি মেরে। এখন গোটা জঙ্গল ঢুঁড়ে দেখা কি সম্ভব? কাল রাতেই যদি পাকড়াও করতে পারতাম..."

"কাল রাতে ওঁরা তাঁবুতে ফেরেননি। সোলার ব্যাটারির আলোও জ্বলেনি। আমি দেখেছি।"

পার্থ চুপসে গেল। মিতিন ফের প্রশ্ন ছুড়েছে মাঝিকে, "তা ওঁরা দু'জন কাল নামলেন কোথায়?"

"এই তো, একটু সামনে। মহানদী যেখানে চওড়া হয়েছে, তার শুরুতেই।"

"ও।"

আর কিছু না বলে আইফোনখানা ব্যাগ থেকে বের করল মিতিন। কী যেন দেখছে মনিটরে, আর বারবার তাকাচ্ছে পারের দিকে। বুঝতে না পেরে টুপুর চোখ সরাল বাঁয়ে, সাতকোশিয়ার পাহাড়ে। এখন নদী থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে কেন জায়গাটাকে সাতকোশিয়া গর্জ বলে। খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদী যেন এক সরু গিরিখাত ধরেই বইছে। এমন একটা নদীতে সে এখন নৌকোয়, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ঠিক তখনই বুমবুমের চিৎকার, "অ্যাই টুপুরদিদি, দ্যাখ-দ্যাখ, কুমির!"

"হ্যাঁ, তাই তো!" টুপুরের চোখ বড়-বড়। পারের কাছে একটা পাথরের উপর দিব্যি শুয়ে আছে ঘড়িয়ালটা। গায়ের রং পাথরের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে, হঠাৎ দেখলে ঠাহর করা কঠিন। বেশ পেল্লাই সাইজ। কম করে পনেরো-ষোলো ফুট তো হবেই।

হঠাৎ টুপুরদের চমকে দিয়ে নড়ে উঠল ঘড়িয়ালটা। পাথর ছেড়ে ধীর পায়ে নেমে পড়েছে জলে। অমনি কী তার গতি! জলে গা ভাসিয়ে শাঁই শাঁই ছুটছে।

ঝুমঝুম টুপুরের হাত চেপে ধরল, "অ্যাই দিদি, ও তো নৌকোর দিকেই আসছে! কী হবে এখন?"

বৃদ্ধ মাঝি বলে উঠলেন, "ভয় পেও না খোকা। ওরা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। দ্যাখো, কেমন নৌকোর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে।"

মাঝির কথা মেনেই যেন নৌকোর কাছাকাছি এসে সুড়ুৎ করে ঘুরে গেল ঘড়িয়াল। তারপর চলেছে পাশে-পাশে নৌকোর পাহারাদার হয়ে। যেতে-যেতেই মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘোরাচ্ছে ঘড়িয়াল। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। স্প্রিংয়ের মতো।

ঝুমঝুম বলল, "ও ওরকম করছে কেন?"

মাঝির ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, "মছলি খাচ্ছে বেটা।"

"কোথায় মাছ? দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পার্থর মেজাজ সমে ফিরেছে। হেসে বলল, "দেখতে পেলে আমরাই ঘড়িয়াল বনে যেতাম রে! সাঁতার কাটতে-কাটতেই ওরা আশপাশটা দেখতে পায়। আর সুড়ুৎ-সুড়ুৎ মৎস্য গেলে।"

কথার মাঝেই কখন যেন দিক পরিবর্তন করেছে ঘড়িয়াল। ক্রমশ সরে যাচ্ছে তীরের পানে। হেলেদুলে উঠে পড়ল পারে। আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল তক্ষুনি।

প্রতিটি দৃশ্যই সযত্নে লেন্সবন্দি করেছে পার্থ। খুশি-খুশি মুখে বলল, "ঘড়িয়ালটা বড় লক্ষ্মী রে! না চাইতেই দিব্যি কেমন একটা শো দিয়ে গেল।"

"মুখখানাও ভারী খাসা," টুপুর টিপ্পনী জুড়ল, "ঠিক যেন হিন্দি ফিল্মের ভিলেন।"

"যাহ্, মোটেই ভিলেন নয়। কী চমৎকার শান্ত ব্যবহার। কুমিরঘড়িয়াল সম্পর্কে আমার ধারণাটাই বদলে গেল।"

"বদলানোই তো উচিত," অনেকক্ষণ পর কথা বলল মিতিন। ঘড়িয়ালের দৃশ্যটি উপভোগ করার পর আবার তার দৃষ্টি মোবাইলের মনিটরে। অল্প মাথা দুলিয়ে বলল, "হাঙর, কুমির, সাপ, বাঘ, ভল্লুক, কেউই তেমন খারাপ জীব নয়। এদের চেয়ে বরং মানুষ অনেক বেশি হিংস্র প্রাণী। ওরা আক্রমণ করে পেটের দায়ে। আর মানুষ খেয়ালখুশি মতো জন্তুজানোয়ার হত্যা করে।"

টুপুর উৎসাহী মুখে মাসির কথায় সায় দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জোর দুলে উঠেছে নৌকো। একটা বাঁকের পর হঠাৎই যেন মুখটা খুলে গেল নদীর। অনেকটা চওড়া হয়ে গিয়েছে। প্রায় তিন গুণ। এখন আর পাহাড়ি নদী বলে মনে হচ্ছে না, থইথই করছে জল।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কালকের বাবুরা এখানেই নেমেছিলেন?"

মাঝির ঘাড় নড়ল, "হাঁ দিদি। নেমেই লাফাতে-লাফাতে পাহাড়ে উঠে গেলেন।"

মোবাইলের মনিটরে চোখ রেখে মিতিন পার্থকে বলল, "আমার জি পি এস যা বলছে, এখান থেকে লবঙ্গির জঙ্গল পঁচিশ কিলোমিটার। মানে, কর্মবীর আর শক্তিধরকে যেখানে দেখা গিয়েছে।"

পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, "তো?"

"সকাল ওঁদের ফোটোটা তুলেছিলে অ্যারাউন্ড সাড়ে তিনটেয়। আর ওঁরা এখানে ল্যান্ড করেছিলেন মোটামুটি সাড়ে দশটায়। অর্থাৎ, জঙ্গলের পথে মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছেন।"

"হুম। বোঝাই যাচ্ছে দু'জনেই দারুণ এক্সপার্ট।"

"একটু বেশি মাত্রায় এক্সপার্ট। হিসেবটা আমার মিলছে।"

"কী হিসেব?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন চোখ রাখল বাইনোকুলারে। মন দিয়ে দেখছে কী যেন। পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। মিতিনের মাথায় কিছু যে একটা পাক খাচ্ছে, টের পাচ্ছে দু'জনেই। তবে এখন যে মিতিন আর মুখ খুলবে না, সেটা তারা দু'জনেই জানে।

অগত্যা মাঝির সঙ্গে কথোপকথন চালু করল পার্থ। জিজ্ঞেস করল, "এই নদীই তো কটকে যাচ্ছে, তাই না?"

"হাঁ স্যার। কটক পেরিয়ে সেই পারাদ্বীপে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে।"

"ও। তা কটক এখান থেকে কদ্দূর? মানে এই নদীপথে?"

"তা তিরিশ-চল্লিশ মাইল হবে। দাঁড় টানটে-টানতে মাঝি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। বলিরেখা ভরা কপালে আরও কিছু ভাঁজ পড়ল যেন। পার্থকে বললেন, "বাবু, চলুন, এবার ফেরা যাক।"

"এত তাড়াতাড়ি? কেন?"

"আকাশের মতিগতি ভাল ঠেকছে না। এখানে নদীর স্রোতটাও খুব খারাপ। ঝড় উঠলে নৌকো উলটে যেতে পারে।"

"যাহ্, কিচ্ছু হবে না। আপনি চলুন তো।"

"না পার্থ, ওঁকে জোর কোরো না," মিতিনের স্বর বেজে উঠল, "নদীতে মাঝির কথা অমান্য করতে নেই। উনি যখন আর এগোতে চাইছেন না, তখন ফিরে যাওয়াটাই সঙ্গত।"

পার্থ হতাশ মুখে বলল, "তবে আর কী। হাইকমান্ড যখন নির্দেশ দিয়েছে, চলো এবার উজান পথে।"

তা যেতে এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। স্রোতের বিপরীতে ফিরতে দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ঘাটে যখন টুপুররা নামল, আকাশ মেঘে ছাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় দুলছে জঙ্গলের গাছপালা। ফাঁকা তাঁবুটা একবার আলগা নিরীক্ষণ করে এক দৌড়ে বাংলোয় পৌঁছে গেল ঝুমঝুম আর টুপুর।

বনবাংলোর পিছনের জঙ্গল থেকে নেমে আসছিল সুবাহু। কাঁধে গিটারের বাক্স। টুপুরদের দেখে একগাল হাসি, "তোমাদের সকালের বোটিং প্রোগ্রাম ওভার?"

"হ্যাঁ," ঝুমঝুম ঘাড় দোলাল, "আজ একটা বিরাট ঘড়িয়াল দেখেছি। জ্যান্ত।"

"হা হা হা। জ্যান্ত ঘড়িয়াল তো এখানেও দেখেছ, খাঁচায়।"

"ওগুলো যেন কেমন-কেমন," ঝুমঝুম মুখ বেঁকাল, "মেশিনের মতো হাঁ করে, মেশিনের মতো মুখ বোজে।"

মিতিন-পার্থও এসে গিয়েছে। পার্থ স্মিত মুখে সুবাহুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি একা যে? স্যার আজ বেরোননি?"

"স্যারের একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে।"

"মশাটশা কামড়ায়নি তো? জঙ্গল মসকিউটো কিন্তু হাইলি ডেঞ্জারাস। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া হয়ে যায়।"

"তাই তো ভাবছি। এখনও স্পেসিমেন কালেকশান চলছে, আরও দিন পাঁচেক থাকতে হবে।"

"জঙ্গলে পদে-পদে বিপদ," পার্থ চোখ ঘোরাল, "তার উপর আবার উটকো দু'খানা বিপদ এসে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে।"

"মানে?"

"ওই যে দু'টো লোক তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন, ঘোরতর সন্দেহজনক। এবং বিপজ্জনক।"

"কেন? ওঁরা আবার কী করলেন?"

"জঙ্গলের মধ্যে খোলা রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"তাই নাকি?" সুবাহু থতমত, "আপনারা দেখলেন রিভলভার নিয়ে ঘুরতে?"

"উঁহু। আমার ক্যামেরা দেখেছে," পার্থ গলা নামাল। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিতিনকে দেখিয়ে বলল, "আমার মিসেস তো ডিটেক্টিভ, উনি জঙ্গলে তোলা ফোটোগুলো ঘাটতে-ঘাটতে হঠাৎ বের করলেন, দু'জনেরই হাতে আর্মস।"

চোখের কোণ দিয়ে একবার মিতিনকে দেখে নিয়ে সুবাহু বলল, "খুব অ্যালার্মিং ব্যাপার তো!"

"অবশ্যই। কিছু একটা গড়বড়ে ঘটনা চলছে জঙ্গলে। আমার মিসেস তার স্মেল পেয়েছেন।"

"তাই বুঝি উনি গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছেন?" সুবাহু হাসছে, "আপনাদের বেড়ানো তো তা হলে ডকে।"

"আরে না, এই তো খেয়ে উঠেই আবার বেরোব," বলেই পার্থর হাঁক, "বিভূতিবাবু, আপনার রান্না কদ্দূর?"

"খানা রেডি," বিভূতির জবাব উড়ে এল, "আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন, আমি নিয়ে আসছি।"

পার্থ আর মিতিন ঢুকে গেল রুমে। বুমবুম টানছে টুপুরকে, "অ্যাই, চল না একবার খাঁচার ঘড়িয়ালগুলোকে দেখে আসি।"

"কেন রে?"

"এমনি। ইচ্ছে করছে।"

"আজব বাসনা! খিদেয় পেট চুঁইচুঁই, এখন বাবুর ঘড়িয়াল দেখার শখ জেগেছে!"

পায়ে-পায়ে দুই মূর্তি খাঁচার সামনে হাজির। ছোট-ছোট ঘড়িয়ালগুলো নড়াচড়া করছে বটে, কিন্তু বড় দুই ঘড়িয়াল শুয়ে আছে স্থির।

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই, অ্যাই, তোরা জাগ না।"

ঘড়িয়ালযুগল নিথর।

বুমবুম খাঁচা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, "অ্যাই, ওঠ না, ওঠ না।"

টুপুর হেসে বলল, "কী পাগলামি করছিস? ওরা তোর ভাষা বুঝতে পারবে নাকি?"

"পারতেও তো পারে," পিছনে হঠাৎ সুবাহুর গলা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, "আবার ডাকো। আর-একবার ডাকো।"

কিমাশ্চর্যম! বুমবুম তৃতীয়বার গলা চড়াতেই চোয়াল ফাঁক হতে শুরু করেছে ঘড়িয়ালের। ক্রমশ বড় হচ্ছে হাঁ। আবার আস্তে-আস্তে বুজেও গেল।

বুমবুম আহ্লাদে আটখানা। হাততালি দিচ্ছে। টুপুরও খুশি। তবু কেমন একটা যেন খটকা লাগছিল টুপুরের। হঠাৎই।

॥ ৭ ॥

টুলকার পথও রীতিমতো দুর্গম। শাল, সেগুন শিশুগাছ তো বটেই, আরও কত যে লতা আর ঝোপঝাড়ে ভরে আছে জঙ্গল। মেঘলা আকাশে সূর্যও আজ মুখ লুকিয়েছে। বিকেল হওয়ার আগেই ঘোর আঁধার নামছে পথে। রাস্তাও ভারী উঁচু-নিচু, জিপ প্রায় লাফাতে-লাফাতে চলেছে। কপাল ভাল, পথে দু'খানা বাইসনের দর্শন মিলল। বাঁকানো শিং, মহিষের মতো দেখতে প্রাণীগুলো ভারী শান্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে রাস্তা জুড়ে। পার্থ তো মহা পুলকিত। তক্ষুনি লাফিয়ে নেমে ফোটো তুলতে যাচ্ছিল। নিষেধ করলেন বিভূতি। যতই নিরীহ মনে হোক, বাইসন নাকি অতি ভয়ংকর, বাঘও তাকে সমঝে চলে। বিরক্ত হলে এমন তেড়ে আসবে, পার্থকে শিঙে না গেঁথে ছাড়বে না। আর তা না পারলে ঢুঁসো মেরে-মেরে ক্ষতি করে দেবে গাড়িটার।

অগত্যা গাড়িতে বসেই শাটার টিপছে পার্থ। স্টার্ট বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে থাকার পর সন্তর্পণে একবার মাত্র হর্ন বাজালেন বিভূতি। ভারী অবহেলাভরে গাড়ির দিকে একবার মাত্র তাকাল বাইসন দু'টো, তারপর দুলকি চালে সেঁধিয়ে গেল জঙ্গলে। জিপ ফের চলতে শুরু করার পর বনের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে প্রাণী দু'টোকে খুঁজল টুপুর। নাহ, কোথাও নেই। বড়সড় দুটো বাইসন যেন মিশে গিয়েছে গাছপালায়।

টুপুর নিজের মনেই বলল, "যাহ, পুরো ভ্যানিশ!"

মিতিন বলল, "হ্যাঁ রে। জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীদের নড়াচড়া একদম টের পাওয়া যায় না। হয়তো খুব কাছেই রয়েছে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি না।"

বিভূতি বললেন, "তাই তো জঙ্গলে খুব সতর্ক থাকতে হয়। সর্বদা সজাগ রাখতে হয় চোখ-কান।"

"নিঃশব্দে চরে বেড়ানোর ব্যাপারে হাতি সবচেয়ে সাংঘাতিক।"

মিতিন মাথা নেড়ে সায় দিল, "হঠাৎ দেখবি সামনে এসে হাজির। অথচ তার দু' সেকেন্ড আগেও শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজটা পর্যন্ত পাবি না।"

কথা বলতে-বলতেই ছোট একটা গ্রাম পেরোল গাড়ি। টিনের বোর্ডে নাম ঝুলছে গ্রামের, 'ছোটকাই'। আবার ঘন জঙ্গল শুরু।

বুমবুম প্রশ্ন জুড়েছে, "এখানে লোক থাকে কেন? ভয় করে না?"

টুপুর বিজ্ঞের মতো বলল, "গ্রামের লোকদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তারাও জন্তুজানোয়ারদের ঘাঁটায় না, জন্তুরাও তাই তাদের ক্ষতি করে না।"

"অতটা সিম্পল নয় রে," পার্থ ফোড়ন কাটল, "এখানকার মানুষদের যথেষ্ট লড়াই করে বাঁচতে হয়।"

বুমবুমের চোখ বড়-বড়, "কীরকম লড়াই?"

"যখন যেমনটা প্রয়োজন। ভল্লুক, চিতা তো প্রায়শই হানা দেয় গ্রামে। তখন ওরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরোয়। তবে সব চেয়ে মুশকিল, যখন হাতির পাল চড়াও হয়। খেতের ফসল নষ্ট করে। বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তখন গাঁয়ের লোক দলবেঁধে বেরিয়ে এসে ক্যানেস্তারা পেটায়।"

"তা হলেই হাতিরা পালায়?"

"হ্যাঁ, ওই ক্যানেস্তারার আওয়াজটাকে ওরা একটু ভয় পায় কিনা। অনেক সময় অবশ্য ক্যানেস্তারাতেও কাজ হয় না। তখন ফরেস্ট গার্ডরা এসে..."

বলার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিকট শব্দ। ঘ্যাচাং ব্রেক কষেছেন বিভূতি। লাফিয়ে নেমে পড়লেন সিট ছেড়ে। জিপের পিছন থেকে ঘুরে এসে বললেন, "ঝামেলা হয়ে গিয়েছে স্যার। টায়ার বার্স্ট করেছে।"

পটকা ফাটার মতো আওয়াজটায় বেজায় চমকেছিল টুপুর আর বুমবুম। উদ্বিগ্ন মুখে টুপুর বলল, "তা হলে কী হবে এখন? গাড়ি আর যাবে না? এই জঙ্গলের মধ্যে?"

"ভয় পাচ্ছ কেন? বদলি টায়ার তো সঙ্গে আছে। তোমরা নেমে দাঁড়াও, আমি লাগিয়ে ফেলছি। আর জঙ্গল তো শেষ। টুলকা প্রায় এসেই গিয়েছে। টুলকায় টায়ার সারানোর একজন মিস্ত্রি আছে। তোমরা যতক্ষণ টুলকায় ঘুরবে, আমি ততক্ষণে খারাপ টায়ারটা মেরামত করে নেব।"

সত্যি, টুলকা আর বেশি দূরে নয়। টায়ার বদলে সেখানে পৌঁছতে মিনিট পনেরো মতো লাগল। ছোট্ট জনপদ। ছড়িয়েছিটিয়ে আছে সবজির খেত। মাটির ঘরের পাশাপাশি পাকা বাড়িও আছে অল্প কিছু।

হাঁটতে-হাঁটতে বনবাংলোর দিকটায় গেল টুপুররা। গেটের মুখেই বনবিভাগের এক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা। টুপুররা কিছু বলার আগেই সে দু' হাত নাড়ছে, "কোই রুম খালি নেহি হ্যায়। সব ফুল হ্যায়।"

পার্থ কৌতূহলী মুখে বলল, "বহুত টুরিস্ট আয়া হ্যায় কেয়া?"

"হাঁ সাব। কোঈ জাগাহ নহি মিলেগা। কাল দো সাব আয়ে থে, উনকো ভি হম ওয়াপস ভেজ দিয়া।"

"দো সাব?" মিতিনের ভুরু জড়ো, "দিখনেমে ক্যায়সে থে উয়োলোগ?"

"বহুত তাকতদার। কন্ধামে বহুত বড়া-বড়া ঝোলা থা। এক সাবকা মোটি মোচ থি।"

মিতিন হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করল, "কখন এসেছিলেন তাঁরা?"

হিন্দিতেই জবাব এল, "সন্ধের পর। সাতটা-আটটার সময়।"

"জায়গা না পেয়ে ওঁরা কী করলেন? চলে গেলেন?"

"হাঁ।"

"এখানে আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা আছে?"

"না। তবে অনেকে গ্রামের লোককে বলেকয়ে এক-আধ রাত থেকে যায়। কেউ-কেউ ছোটকাইয়ে কারও বাড়িতে গিয়েও থাকে। যাদের খুব সাহস, তারা জঙ্গলের ওয়াচ টাওয়ারেও রাত কাটায়।"

"ওয়াচ টাওয়ার কত দূর?"

"এখান থেকে অনেকটা। সব চেয়ে কাছে করদাপাড়া। সেটাও তো প্রায় দশ কিলোমিটার।"

"ওঁরা কি কাল সেখানেই..."

"কে জানে! টুলকায় তো আজ সারাদিন দেখিনি," ছোকরা কর্মচারীটির চোখে জিজ্ঞাসা, "আপনারা কি ওঁদের চেনেন?"

"না। জঙ্গলেই আলাপ হয়েছিল। ওঁরা তা হলে এখানে নেই। তাই তো?"

"থাকলে তো দিনে একবার চোখে পড়ত। তা আপনারা কি এখন ফিরে যাবেন?" পার্থ বলল, "উপায় কী!"

"হেঁটে চারপাশ ঘুরুন না। কাছেই একটা সুন্দর ঝরনা আছে, 'ভীমধারা'। ঝরনার ধারে হরিণটরিনের দেখা মিলতে পারে।"

পথনির্দেশ জেনে নিয়ে হাঁটা ধরল টুপুররা। টুলকা থেকে একটা চড়াই মতো রাস্তা উঠে গিয়েছে উপরে। সেই পথ ধরেই চলেছে চারজন। অল্প একটু গিয়েই বাঁক। ঘুরতেই টুলকা অদৃশ্য, সামনে ফের জঙ্গল। তেমন গভীর না হলেও বেশ গা ছমছমে। হঠাৎই বুমবুম জোরে চেপে ধরেছে টুপুরের হাত। আঙুল তুলে গাছের মগডালে কী যেন দেখাচ্ছে।

চোখ তুলে তাকাতেই টুপুরের হৃৎপিণ্ড ধড়াস। বেজির মতো দেখতে ওটা কী? রক্তের মতো লাল দু'খানা চোখ জ্বলছে যেন! গায়ের রং না লাল, না বাদামি। ইয়া মোটা লেজ। তড়াক-তড়াক লাফ মারছে এ ডাল থেকে ও ডালে।

পার্থরও নজরে পড়েছে। ফিসফিস করে বলল, "ভয় পাস না, ওটা জায়ান্ট স্কুইরেল। সাতকোশিয়ার স্পেশ্যাল।"

প্রাণীটা কাঠবিড়ালি শুনে টুপুর খানিকটা আশ্বস্ত হল বটে, তবু একটা বুক ঢিপঢিপ ভাব যেন রয়েই গেল। চলতে-চলতে সাবধানে দেখছে এদিক-ওদিক। বাঁয়ে পাহাড়ের দিকটায় মাঝে-মাঝে প্রকাণ্ড গর্ত। শুকনো ডালপালায় ঢাকা।

টুপুর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কী?"

"বোধ হয় বাঘটাঘদের স্টোরেজ," পার্থ বেমালুম নির্ভয়ে বলল, "গাঁ থেকে গোরু, ছাগল তুলে আনে তো অনেক সময়। বেশি ভিতরে নিয়ে যায় না। মেরে এখানেই ঢাকা দিয়ে রাখে। পরে সময় সুযোগ মতো এসে পেটে চালান দেয়।"

"তার মানে, কাছাকাছি বাঘ আছে?"

"থাকা অসম্ভব নয়। এই জঙ্গলে যে দু'-চারখানা বাঘ টিকে আছে, তারা নাকি টুলকার দিকেই... আর চিতাবাঘ তো আছেই।"

টুপুরের শরীর হিম হয়ে গেল। বুমবুম কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, "আমি আর যাব না।"

যেতে আর হলও না। অদূরে কাঠের ডান্ডার মাথায় তির চিহ্নে নির্দেশিকা, 'ভীমধারার পথ'।

এ রাস্তাটা তবু মন্দের ভাল। সরু বটে, তবে জঙ্গলটা ছেঁড়া-ছেঁড়া। এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে পাহাড়ের প্রান্তে। সেখানে পৌঁছে টুপুর তো বেজায় হতাশ। শুধু টুপুর কেন, সকলেই। কোথায় গেল ভীমধারা? একটু দূরে পাহাড় থেকে একটা জলস্রোত গড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা নেহাতই ক্ষীণ।

পার্থ বিরক্ত মুখে বলল, "দুর-দুর, আসাটাই বৃথা।"

"চৈত্র মাসে পাহাড়ি ঝরনার চেহারা এরকমই হয়। বর্ষায় এরই রূপ একেবারে বদলে যাবে," মিতিন বাইনোকুলারটা চোখে লাগাল। নিচটা দেখতে-দেখতে বলল, "জায়গাটা কিন্তু ভারী সুন্দর।"

"কী ছিরিটা দেখছ? পাহাড়টা ধাপে-ধাপে নেমে গিয়েছে, নীচে এবড়োখেবড়ো পাথর, সেখানে ডোবা মতো হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, ব্যস।"

"আরও দ্রষ্টব্য আছে," মিতিন বাইনোকুলারটা এগিয়ে দিল পার্থকে, "দ্যাখো তো, আর কিছু চোখে পড়ে কিনা?"

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে পার্থ জোর চমকেছে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, "নীচে তো মানুষ! একটা নয়, দু'টো!"

"হুম। কর্মবীর আর শক্তিধর।"

টুপুরও এবার দেখতে পেয়েছে দু'জনকে। খোলা চোখেই। দু'জনে একটা পাথরের উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে। জলের ধারে।

বিস্মিত মুখে টুপুর বলল, "ওঁরা ওভাবে পড়ে কেন? মরে-টরে গেছেন নাকি?"

"মোটেই না, দিব্যি জ্যান্ত আছেন। নড়ছেন," পার্থ বাইনোকুলারটা মিতিনকে ফেরত দিল। চোখ সরু করে বলল, "ওরা তা হলে এখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে?"

"তাই তো দেখছি," মিতিন ঠোঁট চাপল, "চলো তো, গিয়ে কথা বলি।"

"কথা কিসের? গিয়ে কঁ্যাক করে ধরবে। জঙ্গলে রিভলভার নিয়ে ঘুরছে, এ কি মামদোবাজি পায়া হ্যায়?"

"রিভলভার তো আমার সঙ্গেও আছে পার্থ।"

"তোমার ব্যাপার আলাদা। তুমি প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। রাখতেই পার।"

"ওঁদেরও হয়তো লাইসেন্স আছে," মিতিন মৃদু হাসল, "উত্তেজিত হোয়ো না। চলো, আলাপটা একটু ঝালাই।"

পাহাড়ের গা বেয়ে খাঁজ কাটা-কাটা পায়ে চলার পথ। প্রায় সিঁড়ির মতো। সাবধানে পা ফেলে নামল চারজনে। টুপুরদের দেখেই কর্মবীর আর শক্তিধর উঠে বসেছেন।

ভুরু কুঁচকে শক্তিধর বললেন, "আপনারা হঠাৎ এখানে?"

"আপনাদের পিছু-পিছু এসে পড়লাম আর কী," মিতিন হাসছে। সহজ সুরেই বলল, "বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?"

"রেস্ট নিতে তো জঙ্গলে আসিনি। আমরা দণ্ডীবাট করছি।"

পার্থ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, "সেটা কী?"

"পায়ে হেঁটে সাতকোশিয়া পরিক্রমা। পাক্কা সাঁইত্রিশ কিলোমিটার ঘোরা, সহজ কাজ তো নয়।"

"সে তো বটেই। তার সঙ্গে যদি মাঝে-মাঝে হরিণের পিছু-পিছু ঘুরতে হয়, তা হলে তো কাজটা আরও কঠিন।"

একটু যেন চমকালেন কর্মবীর। পরক্ষণে স্বাভাবিক গলাতেই বললেন, "কঠিন পরিশ্রম না করলে দু' বেলা দু'টো অন্ন জুটবে কী করে মশাই? রাতবিরেতে জঙ্গলে কাটাবার ঝুঁকিই বা কেন নেব?"

"আমারও তো সেই প্রশ্ন। এত ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে চক্কর মারছেন কেন?" পার্থ ফস করে বলে উঠল, "আপনাদের মতলবটা কী?"

"আপনাদের সেবা করা," শক্তিধর বিটকেল সুরে হেসে উঠলেন। মিতিনের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে টুলকা এসেছেন?"

"অবশ্যই," পার্থ জবাব দিল, "আমাদের তো হেঁটে-হেঁটে জঙ্গল চষার শখ নেই। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যও নেই।"

ব্যঙ্গটা যেন গায়েই মাখলেন না শক্তিধর। ফের মিতিনকেই বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই এখন টিকরপাড়াতেই ফিরবেন?"

"লিফ্‌ট চান তো?" মিতিন দু' হাত ছড়িয়ে দিল, "ওয়েলকাম। চলে আসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। দণ্ডীবাট তো মোটামুটি শেষ, টিকরপাড়ায় তাঁবুটার বুকিং এখনও আছে। ভাবছি, আজ টিকরপাড়া ফিরেই যাই।"

ঝোলাঝুলি কাঁধে চাপিয়ে উঠে পড়লেন দু'জনে। টুপুর আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মিতিনমাসির আক্কেলটা কী বুঝে উঠতে পারছে না টুপুর। জেনেশুনে দু'টো সন্দেহজনক লোককে জামাই আদরে নিয়ে যাবে এখন? দিব্যি জঙ্গলের গল্পও জুড়ে দিল দুই মক্কেলের সঙ্গে। তবে কর্মবীর আর শক্তিধরের সঙ্গী হওয়ায় একটা বাঁচোয়া। ফের পাহাড়ে চড়তে হল না, শর্টকাট রাস্তা ধরে সবাই ফিরে এসেছে টুলকায়।

টায়ার সারিয়ে সারথিও প্রস্তুত। বিকেল-বিকেলই রওনা দিল জিপ। বনবাংলোয় এসে কর্মবীর আর শক্তিধর চলে গেলেন তাঁবুর দিকে।

সন্ধে নেমে গিয়েছে। বাংলোর লনে বসে চা আর ভাজাভুজি খাওয়া হচ্ছিল। পাশের বাংলোয় আলো জ্বলছে। বেগুনি খেতে-খেতে পার্থ হঠাৎ বলল, "আমাদের কিন্তু একবার প্রোফেসরসাহেবের কাছে যাওয়া উচিত।"

মিতিন কী যেন ভাবছিল। টক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "ঠিক বলেছ। চলো, ভদ্রলোকের একটা খবর নিয়ে আসি।"

বিভূতি রাতের রান্নায় ব্যস্ত। বুমবুমকে তাঁর জিম্মায় রেখে মিতিনরা গিয়েছে পাশের বাংলোয়। দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই পাল্লা খুলেছে সুবাহু। একটু যেন থমথমে মুখ।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "স্যার এখন কেমন আছেন?"

"ভাল নয়, জ্বরটা বেড়েছে।"

"ও, একবার দেখতে পারি স্যারকে?"

"এখন? ওষুধ খেয়ে মশারির মধ্যে শুয়ে আছেন। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছেন।"

"স্যারকে আজ আর ডিসটার্ব না করাই ভাল," সুবাহুর পিছন থেকে বিট অফিসারের স্বর উড়ে এল, "তা ছাড়া আপনারা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছেন। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে বেশি না যাওয়াটাই নিরাপদ।"

মিতিন বিট অফিসারকে দেখে অবাক যেন। বলল, "আপনি? এই বাংলোয়?"

পূর্ণচন্দ্র আলগা হাসলেন, "আমিই তো ডাক্তারবদ্যির কাজ করছি। জঙ্গলে এসে অনেকেই তো এই অসুখে পড়ে, তাই কিছু মেডিসিন আমাদের কাছে মজুতই থাকে। সেগুলোই দিয়ে গেলাম। কমলে ভাল, নইলে কাল ওঁকে নিয়ে আঙুলে ছুটতে হবে।"

পার্থ সুবাহুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা?"

"চিন্তা করবেন না। পূর্ণবাবু সব কিছুর আয়োজন করে দিচ্ছেন।"

আর কথা না বাড়িয়ে নিজেদের বাংলোয় ফিরল মিতিন, টুপুর আর পার্থ। রুমে এসে মেসোর সঙ্গে গল্প জুড়েছে টুপুর। জঙ্গলের মশা নিয়ে। সকালে নদীতে দেখা ঘড়িয়ালটাকে নিয়ে। টুলকা ভ্রমণ নিয়ে। শক্তিধর আর কর্মবীরকে নিয়ে। টিকড়পাড়া ফেরার পথে কর্মবীর আর শক্তিধর কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন, তাই নিয়েও গবেষণার শেষ নেই দু'জনের। একমাত্র মিতিন চুপ। তার যেন কিছুই কানে যাচ্ছে না। সকালে ফাঁকা তাঁবুতে কুড়িয়ে পাওয়া কার্বন পেপারটা ব্যাগ থেকে বের করে আলোয় মেলে দেখল একটু। তারপর ফের সেটি ব্যাগে চালান করে চলে গেল রান্নার তদারকিতে।

কালই জঙ্গলে শেষ দিন। সকালে বাঘমুন্ডা যাওয়ার প্ল্যান। নৈশাহার সেরে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল সকলে। কোত্থেকে যেন একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। খুবই চেনা গন্ধ। জুঁইফুল? উঁহু। কামিনী? রজনীগন্ধা? নাহ, অনেকটা ল্যাভেন্ডারের মতো লাগে যেন। সাতকোশিয়ার জঙ্গলে কি ল্যাভেন্ডার ফোটে? পাশের বাংলো থেকে আজও ভেসে আসছে গিটারের সুর। কী নেশা রে বাবা! স্যারের অসুখেও গিটার বাজানোয় খামতি নেই।

সুরেলা গিটার আর ফুলের সৌরভে কখন যে চোখ জড়িয়ে এসেছিল টুপুরের। মিতিনমাসি যে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখছে দূরের তাঁবুর আলো, টুপুর টেরও পায়নি।

সকালে ঘুম ভাঙল বুমবুমের চিৎকারে। ঠেলছে টুপুরকে, "অ্যাই ওঠ, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

টুপুর চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বলল, "হলটা কী?"

"খাঁচায় বড় ঘড়িয়াল দু'টো নেই। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম এক্ষুনি।"

॥ ৮ ॥

বাংলোর সামনের লনটায় বিট অফিসার পূর্ণচন্দ্র বেহেরা ঘাড় ঝুলিয়ে বসে। পাশেই সুবাহু। তারও মুখে-চোখে প্রবল বিস্ময়। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা বিভূতিও কেমন থতমত মুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনজনের কারও মুখে বাক্যটি নেই।

পার্থমেসোর সঙ্গে আবার একবার খাঁচাটা দেখে ফিরল টুপুর। ভোরবেলা থেকে এই নিয়ে তিনবার দেখা হল খোলা খাঁচাটা। প্রথমে বুমবুমের সঙ্গে, তারপর মিতিনমাসির পিছু-পিছু। খাঁচায় ঢুকে কত কী যে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করল মিতিনমাসি। আঙুল ঘষে-ঘষে কী যেন পরখ করল খাঁচার মেঝেতে। দেখল, মাছবিহীন ছোট্ট-ছোট্ট জলাশয়গুলোও। তা মাসিও যে এরকম ঘটনায় দারুণ চমকেছে, এতে টুপুরের কোনও সংশয়ই নেই।

পার্থও রীতিমতো উত্তেজিত। রাগ-রাগ গলায় পূর্ণচন্দ্রকে বলল, "আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? ঘড়িয়ালগুলোকে পাহারা দেওয়ার জন্য সিকিওরিটি গার্ড রাখেননি?"

পূর্ণচন্দ্র আমতা-আমতা মুখে বললেন, "না, মানে, রাজুই তো ছিল। রাতবিরেতেও গিয়ে ওদের দেখে আসত। ও হঠাৎ চলে গিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে।"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে। খাঁচার দরজা খোলা পড়ে, কেউ নজর করেনি," পার্থ তেরচা চোখে তাকাল, "ঘড়িয়ালদের খাবারদাবার কে দিচ্ছিল এখন?"

"খাবার মানে তো শুধু জ্যান্ত মাছ। স্থানীয় এক ধীবরকে বলা আছে, সে সাপ্লাই দিয়ে যায় নিয়মিত। রাজুর জায়গায় আমিই এখন ছাঁকনিওয়ালা জালে করে ছেড়ে দিচ্ছিলাম ফিশ পুলে।"

"কালও দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, রাত্রি তখন প্রায় ন'টা বাজে।"

"তখনই বুঝি খাঁচার দরজাটা খুলে রেখে এসেছেন?"

"এমনটা হওয়ার কথা নয়। তবে অনেক সময় তো একটুআধটু ফাঁক থেকে যায়। আর ওরা যে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে...।" পূর্ণচন্দ্র কপাল চাপড়াচ্ছেন, "আর মাত্র তিনটে মাস গেলে কোনও অশান্তিই ছিল না।"

"কেন?"

"ওরা পূর্ণবয়স্ক হয়ে গিয়েছিল তো। এ বছরই বর্ষায় ওদের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হত।"

কথোপকথনের মাঝে মিতিন যেন কখন এসে দাঁড়িয়েছিল পিছনে। ফস করে হালকা সুরে বলল, "তা হলে আর দুশ্চিন্তা করছেন কেন? জলের জীব জলেই চলে গিয়েছে, আপনাদের আর টানাটানির পরিশ্রম করতে হল না।"

"তা বললে কি আমার চলবে ম্যাডাম?" মিয়নো স্বরে বললেন পূর্ণচন্দ্র, "নির্ঘাত শোকজ খেতে হবে।"

"রেঞ্জ অফিসে জানিয়েছেন?"

"অবশ্যই, শুনে তো রেঞ্জারসাহেবের কী চোটপাট।"

"সব দোষ আপনাদের ওই রাজুর। ব্যাটা আমাদের পাঁচশো টাকা নিয়ে কোথায় যে চম্পট দিল," অনেকক্ষণ পর সুবাহু মন্তব্য জুড়ল, "রাজু থাকলে এসব কিছু ঘটত না।"

পার্থ বলে উঠল, "সে তো শুনলাম বাড়ি গিয়েছে।"

"তাই নাকি? আপনাকে কে বলল?"

"লবঙ্গির চৌকিদার। সুরজ মুন্ডা না কী যেন নাম। রাজু নাকি পনেরো দিন পর ফিরবে।"

"আশ্চর্য! আমাকে একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেল না," পূর্ণচন্দ্র ঝেঁঝে উঠলেন, "ফিরুক একবার। ওর চাকরি যদি না আমি খেয়েছি!"

"আহা, অত রেগে যাচ্ছেন কেন? ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে," মিতিন শান্ত করতে চাইল বিট অফিসারকে। স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আচ্ছা পূর্ণবাবু, ঘড়িয়াল দু'টো নদীতে গেল কোন পথে?"

"কেন? খাঁচার দরজা পেরোলেই তো রাস্তা।" সুবাহু আগ বাড়িয়ে জবাব দিল, ঘষটে-ঘষটে আর হাত-দশেক গেলেই পাহাড়কিনার। ওখান থেকে পাথর বেয়ে-বেয়ে নদীতে নেমে যাওয়া কুমিরঘড়িয়ালদের পক্ষে কী এমন কঠিন! বাই দ্য ওয়ে, কাল শেষরাতে আমি ঘড়িয়ালের ডাকও শুনেছি।"

"আপনিও শুনেছেন?" পূর্ণচন্দ্রর চোখ উজ্জ্বল হল, "আমারও কানে এসেছে। তখন বোধ হয় রাত তিনটে সাড়ে-তিনটে হবে। ওই সময়ই বোধ হয় পালিয়েছে।"

"ইস, ওই সময় যদি বেরিয়ে আসতেন, তা হলে বোধ হয় দুই ঘড়িয়ালই ধরা পড়ে যেত," মিতিনের গলায় কৌতুকের সুর, "যাক গে, ওই নিয়ে ভেবে তো আর লাভ নেই। বরং গুছিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করুন। এদিকে আমরাও ব্রেকফাস্ট সেরে বাঘমুন্ডায় বেরিয়ে পড়ি।"

"হ্যাঁ, ঘুরে আসুন। বাঘমুন্ডা খুব ভাল লাগবে। চৌকিদার চক্রধরকে ওখানে গাইড করে নেবেন, আপনাদের ভালভাবে ঘুরিয়ে দেবে।"

বিভূতি রান্নাঘরে চলে গেলেন। সুবাহুও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "আমিও রুমে যাই। সকালে এই ঘড়িয়াল-ঘড়িয়াল করে স্যারের টেম্পারেচারটা দেখা হয়নি।"

সুবাহুর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "জ্বর কমেনি প্রোফেসরসাহেবের?"

"ছাড়ছে, আসছে, ছাড়ছে। স্যার খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারছি না কী করি।"

"হুঁ, প্রবলেম। আপনার তো আজ আর কোথাও বেরনো হচ্ছে না?"

"প্রশ্নই ওঠে না। সারাদিন স্যারের কাছেই থাকব।"

মিতিন রুমে ফিরেছে। পার্থ, টুপুর আর বুমবুমও। ঘরে ঢুকেই মিতিন টুকটাক গোছগাছ করছে। গুনগুন গান গাইতে-গাইতে। টুপুর যেন ঠিক পড়তে পারছিল না মাসিকে। ঘড়িয়ালদের অন্তর্ধান এত সহজে মেনে নিল মিতিনমাসি? এমন একটা কাণ্ড ঘটার পরও ফুরফুরে মেজাজে বেড়াতে বেরোচ্ছে, এ যেন মাসির চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না। টুপুরেরই কি তা হলে ভুল? প্রাণী দু'টোর নিখোঁজ হওয়াটা কি নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার? এতে কি কোনও রহস্যই নেই?

ক্ষুণ্ণ মুখে জলখাবার সারল টুপুর। আজ সাদাসিধে মেনু। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা। খেয়ে উঠে গাড়িতে চাপল সবাই। জিপে স্টার্ট দিচ্ছেন বিভূতি, তখনই টুপুর দেখল, শক্তিধর আর কর্মবীর আসছেন বাংলোর দিকে। কাঁধের ঝোলা ছাড়াই।

টুপুরের মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক। ফিসফিস করে মিতনিকে বলল, "এঁরা আসার পরই কিন্তু কাল ঘড়িয়াল দু'টো হাওয়া হয়েছে।"

"তো?"

"না মানে, একটু ক্রস করে দ্যাখো না। যদি কিছু বের করতে পার।"

"ওঁরা আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কেন?"

"কায়দা করেই না হয় জানবে। এঁরা যে সুবিধের লোক নন, তা তো আমরা আগেই দেখেছি।"

"ওঁদের সঙ্গে ব্যাকব্যাক করার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি কাজ আছে। সময় নষ্ট করাটা এখন উচিত হবে না।"

"এক্ষুনি বাঘমুন্ডা যাওয়াটা এতই জরুরি?"

"আহ, চুপচাপ চল তো।"

অগত্যা টুপুরকে ঠোঁটে কুলুপ আঁটতেই হয়। ওদিকে গাড়ি চলতেই বুমবুমের স্বর ফুটেছে, "ঘড়িয়াল দু'টো কিন্তু খুব মজার ছিল তাই না মা?"

"কেন বল তো?"

"পাশের বাংলোর কাকু এসে দাঁড়ালেই মুখ হাঁ করত।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ গো। আমি কতবার খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মুখ খোলেই না, মুখ খোলেই না। কিন্তু কাকুকে দেখলে ওমনি দু'জনে একসঙ্গে..."

"কাকুকে দেখলেই বোধ হয় ওদের খিদে পেত," পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "এখন অবশ্য দু'জনে মহানন্দে নদীর মাছ সাঁটাচ্ছে সেদার।"

"তাই কি?"

মিতিনের আকস্মিক প্রশ্নে হোঁচট খেয়েছে পার্থ। সে ফের মুখ খোলার আগেই মিতিন বিভূতিকে বলল, "আর এগনোর দরকার নেই। গাড়িটা এবার থামান।"

রাস্তার ধারে জিপ দাঁড় করালেন বিভূতি, "কেন ম্যাডাম? বাঘমুন্ডা যাবেন না?"

"এক্ষুনি নয়। অন্য একটা কাজ মনে পড়ে গেল। টিকরপাড়া বাংলো থেকে আমরা কদ্দূর এসেছি?"

"বড়জোর এক-দেড় কিলোমিটার।"

"আমাদের বাংলোর পিছন দিয়ে যে রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছে, সেখানে কীভাবে পৌঁছনো যায়?"

"গাড়ি তো যাবে না। হাঁটতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।"

"ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, বুমবুমকে নিয়ে পুরানাকোট চলে যান। ভূতবাংলোটার কথা বলছিলেন, ওটা দেখিয়ে আবার ঠিক এই জায়গায় ফিরে আসুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসবেন, কেমন?"

বুমবুম চোখ পিটপিট করল, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"বাঘ খুঁজতে। যাবি তুই?"

বুমবুম জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "না। কিন্তু একা-একা ভূতের বাড়ি!"

"ভয় করছে?"

"হ্যাঁ," বুমবুম করুণ মুখে পার্থকে বলল, "বাবা, তুমিও চলো না।"

দলছাড়া হতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না পার্থর। মিতিন যে কিছু একটা করতে চলেছে, সে তো টের পেয়েই গিয়েছে। কিন্তু ছেলের আবদারও তো উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

পার্থ-বুমবুমকে নিয়ে চলে গেল বিভূতির জিপ। তরতরিয়ে ডান দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল মিতিন। টুপুরকে সঙ্গে নিয়ে। শাল, সেগুন, শিশু, গামারের ছায়াঢাকা শুনশান অরণ্য। পায়ের নীচে শুকনো পাতা ভাঙছে খড়মড়। নিস্তব্ধ বনে ওই আওয়াজটুকুই যে কী কানে লাগে! গাছগাছালি তেমন একটা ঘন নয়, তবু প্রতি মুহূর্তে বুক টিপটিপ। মনে হয়, এই বুঝি এসে পড়ল কোনও বুনো জন্তু।

কিছু বলব না, বলব না করেও টুপুর জিজ্ঞেস করে ফেলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি মিতিনমাসি?"

মিতিনের কাঠ-কাঠ জবাব, "আশা করি, এটুকু আন্দাজ করার মতো বুদ্ধি তোর আছে।"

"বাংলোর পিছনের জঙ্গলটায়? কিন্তু কেন?"

"ছেঁড়া-ছেঁড়া সুতোগুলো জুড়তে।"

"মানে?"

"কথা না বলে জোরে পা চালা। আমার হিসেবমতো এখন অনেকটা হাঁটতে হবে।"

ছমছমে অরণ্য চিরে আরও মিনিট দশেক চলার পর একটা মেঠো রাস্তায় এসেছে দু'জনে। বনপথই, তবে মোটামুটি চওড়া। বোঝা যায়, এদিক দিয়ে মানুষ আসা-যাওয়া করে রোজ।

মিতিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ঘোরাল। তারপর একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "আমাদের বাংলোটা পুবে। সুতরাং এখন পশ্চিমে হাঁটতে হবে।"

"কেন?"

"ফের প্রশ্ন? স্টার্ট ওয়াকিং।"

বোধ হয় একশো মিটারও এগোয়নি, জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে শুরু করেছে। রাস্তাটাও এবার পাহাড়ি, পাকদণ্ডীর মতো। চড়াই বেয়ে উঠতে-উঠতে টুপুরের গা ছমছম ভাবটা বেড়ে যাচ্ছিল যেন।

হঠাৎ থমকেছে মিতিন। পরক্ষণেই দৌড়ে গিয়ে একটা পলিথিনের খালি বস্তা কুড়োল জঙ্গল থেকে। আঙুলে তুলে শুঁকল একটু। তারপর আলগোছে জিভে ছোঁয়াল আঙুলটা।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী গো?"

"নুন।"

"জঙ্গলে নুনের বস্তা?"

"হুম। এটা না থাকলে হিসেব মেলে না। মনে হচ্ছে, গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছি।"

বস্তাটা ভাঁজ করে নিয়ে এগোল মিতিন। ছোট্ট একটা বাঁক ঘুরে ফের রুদ্ধ হয়েছে তার গতি। পথের ধারে একটা বড়সড় গর্ত। অনেকটা টুলকায় যেমন দেখেছে।

ঝুঁকে গর্তটা পর্যবেক্ষণ করল মিতিন। দেখছিল টুপুরও। বলল, "ভিতরে তো কিছু নেই গো।"

"ভাল করে লক্ষ কর। আছে। রাশি-রাশি পিঁপড়ে।"

"তাই তো! এত পিঁপড়ে কেন?"

"ওদের খাদ্যবস্তু যে ছিল এখানে।"

"কোনও মরা জন্তুটন্তু?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন উবু হয়ে বসেছে। হাত বাড়িয়ে গর্ত থেকে একটা দড়ি টানল। দড়ির সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আসছে একটা ভাঙাচোরা কাঠের পাটাতন। চার-চারখানা চাকা লাগানো।

পাটাতনটাকে নেড়েচেড়ে দেখল মিতিন। তারপর একটা পাতলা হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। মাথা দোলাতে-দোলাতে বলল, "সব হিসেবই মিলে যাচ্ছে রে।"

"কিসের হিসেব?" টুপুরের ভুরুতে ভাঁজ, "তুমি ঘড়িয়াল অন্তর্ধানের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছ বুঝি?"

"গুড গেস," টুপুরের পিঠে আলগা চাপড় দিল মিতিন। হালকা চালে বলল, "চল, অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ। এবার ফিরি।"

মিতিনের পাশাপাশি হাঁটছিল টুপুর। যেতে-যেতে বলল, "কাল রাত্তিরে ঘড়িয়াল দু'টো চুরি করে এখানেই মারা হয়েছিল। তাই তো?"

"যা মনে আসে বলে যা। শুনছি।"

"তারপর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে চোররা। মাংসটা গর্তে ফেলা হয়েছিল, জন্তুজানোয়ার এসে খেয়ে গিয়েছে," বলেই টুপুরের খটকা লেগেছে। ভুরু কুঁচকে বলল, "তা হলে হাড়গোড়গুলো গেল কোথায়? সেগুলোও কি সাবাড় হয়ে গিয়েছে?"

"তুইই বল।"

টুপুর মগজ হাতড়াল। জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, "হয়তো গর্তে নেই। হয়তো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আর একটু খুঁজলে হয়তো মিলত।"

"ঘোড়ার ডিম," মিতিন এক ফুঁয়ে টুপুরের ধারণাটা উড়িয়ে দিল, "আর কী মনে হচ্ছে বল?"

"ঘড়িয়ালের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল শেষরাতে। তখনই কিংবা তারপর নিশ্চয়ই চুরিটা হয়েছে।"

"অর্থাৎ তিনটে-চারটের সময়। তারপর মাত্র ঘণ্টা ছ'য়েক গড়িয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে দু'-দু'টো ঘড়িয়ালের মাংস কি কোনও জন্তুর পক্ষে চেটেপুটে খেয়ে ফেলা সম্ভব?"

"তাও তো বটে। তা হলে?"

"ভাব, ভাব। ভাবা প্র্যাক্টিস কর। কানে যা শুনবি, সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিস না। তোর কি ধারণা, ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে ওই পাটাতনে চাপিয়ে এতটা দূর পর্যন্ত আনা হয়েছিল? এক-একটা ঘড়িয়ালের ওজন জানিস? অন্তত দেড়শো কেজি। তার উপর অতটা লম্বা, অন্তত বারো-চোদ্দো ফুট।"

টুপুর ভাবনায় পড়ে গেল। এ তো বেশ জটিল ধাঁধা!

॥ ৯ ॥

পুরানাকোট বেড়িয়ে এসে যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল বিভূতির জিপ। তারপর বাঘমুন্ডা ঘুরে ফিরতে-ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। তিন পাহাড়ে ঘেরা গহন জঙ্গল দেখে সকলেই খুশি। কিন্তু বেলা এতই গড়িয়েছে, খিদেয় সকলের পেট চুঁইচুঁই। ভাগ্যিস পার্থ বুদ্ধি করে একছড়া কলা নিয়েছিল সঙ্গে। তাই খেয়ে কোনওক্রমে পিত্তরক্ষা হয়েছিল। ফিরে বাংলোর হাতায় গাড়ি রেখে বিভূতি চললেন রান্না বসাতে। ঘি সহযোগে ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, ভাত আজ দুপুরের মেনু।

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বিট অফিসার এসে উপস্থিত। সকালের শুকনো ভাবটা আর নেই। খুশি-খুশি মুখে পূর্ণচন্দ্র জানালেন, "আমাদের রেঞ্জ অফিসার এসেছিলেন ম্যাডাম। চাকরিটা আমার বেঁচে গেল। সব দেখেশুনে তিনি আমায় ক্লিনচিট দিয়েছেন।"

টুপুরকে অবাক করে মিতিনও হাসল, "বাহ বাহ, এ তো সত্যিই গুড নিউজ। ঘড়িয়াল দু'টো তা হলে নদীতেই চলে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। স্যারেরও তাই মত। তবে খাঁচা খালি থাকবে না। কপিলাসেও আমাদের ঘড়িয়াল প্রকল্প আছে। ওখান থেকে দু'-তিনটে ছানা ঘড়িয়াল আনাবেন কয়েকদিনের মধ্যেই।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। এবার আপনাকে একটা সুসংবাদ দিই?" বাঘমুন্ডার চৌকিদার চক্রধর বলল, "ওর সঙ্গে নাকি কাল দেখা হয়েছিল রাজুর, আঙুলে। রাজু তো আঙুলের কাছেই কোনও একটা গ্রামে থাকে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ডাঙ্গরিতে," পূর্ণচন্দ্রর কপালে পলকা ভাঁজ, "চক্রধরের সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে রাজুর? মানে কবে সে ফিরছে?"

"সেই খবরই তো দিচ্ছি। রাজুর নাকি বাড়ির কাজ মিটে গিয়েছে। আগামীকালই চলে আসবে," মিতিনের হাসি চওড়া হল, "এটাও তো সুসমাচার, নয় কি?" সুবাহু আর প্রোফেসরসাহেবের আর খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে থাকবে না। আপনারও ঘড়িয়ালদের দেখভাল করার ঝক্কি থেকে মুক্তি।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," ফের মুখে উচ্ছ্বাস ফিরেছে পূর্ণচন্দ্রর। মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনাদের আজ বিকেলে কী প্রোগ্রাম?"

"আজ আর কোথাও যাব না। ক'দিন জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে খুব টায়ার্ড। ভাবছি, পিছনের জঙ্গলটায় একটু ঘোরাফেরা করব।"

পূর্ণচন্দ্র হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "সাবধান, বেশি দূরে যাবেন না যেন।"

"কেন?"

"কাল রাত্তিরে বেলিং হচ্ছিল যে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "সেটা আবার কী?"

"শম্বর হরিণের ডাক। অবিকল ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনায় বলে ওই নাম। কোনও হিংস্র জন্তু কাছাকাছি এলে ওরা ওই ডাকটা ছাড়ে। জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের সাবধান করার জন্য।"

"অর্থাৎ, বাঘটাঘ গোছের কিছু একটা এসেছিল?"

"হয়তো এখনও রয়েছে। তক্কে-তক্কে ঘুরছে। খুব চালাক প্রাণী তো, শিকার না পেলে সহজে নড়তে চায় না। আপনাদের সঙ্গে বাচ্চাটাচ্চা আছে, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি।"

"থ্যাঙ্কস," মিতিন বলে উঠল, "আমাদেরও অ্যাডভেঞ্চারের শখ নেই। বন দেখা হল, নৌকোয় চড়লাম, এই তো যথেষ্ট। আজ রাত্তিরে চটপট শুয়ে পড়ব। লম্বা একটা ঘুম দিয়ে কাল সকালে প্রস্থান।"

"সেই ভাল। শরীর ফ্রেশ থাকবে। চাইলে ফেরার পথে একবার কপিলাসও ঘুরে যেতে পারেন। চমৎকার একটা লেক আছে, ছোটখাটো পাহাড়ও আপনাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"

"দেখি কী করা যায়।"

চলে গেলেন পূর্ণচন্দ্র। টুপুররা রুমে এল। মনটা খচখচ করছিল টুপুরের। ঘড়িয়াল দু'টোর জলে চলে যাওয়ার তত্ত্বটাই মেনে নিল মিতিনমাসি? তা হলে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে অত সব অনুসন্ধানের কী অর্থ? বাঘমুন্ডার বাংলোয় চৌকিদারের সঙ্গে মিতিনমাসি আলাদা কথা বলছিল বটে, কিন্তু রাজু যে কালই ফিরছে এ কথাটা তো একবারও বলল না? জঙ্গলে ঢুকে মাসি-বোনঝি কী করছিল তা জানতে কত খোঁচাল পার্থমেসো, কোনও উচ্চবাচ্য করল না মিতিনমাসি। দেখাদেখি টুপুরকেও চুপ মেরে থাকতে হল।

নাহ, সত্যিই মিতিনমাসির মনের তল পাওয়া ভার। খেয়েদেয়ে সেই যে বিছানায় চোখ বুজে শুল, আর ওঠেই না। ডেকে-ডেকে হতাশ হয়ে বুমবুমকে নিয়ে পার্থমেসোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল টুপুর। হাঁটতে-হাঁটতে নদীর ধারে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! কর্মবীর, শক্তিধর তো বেপাত্তাই, তাঁদের তাঁবুটাও আর নেই। বাংলোয় ফিরে পূর্ণচন্দ্রর মুখে শুনল, তাঁরা নাকি সকালেই চেক আউট করে বেরিয়ে গিয়েছেন।

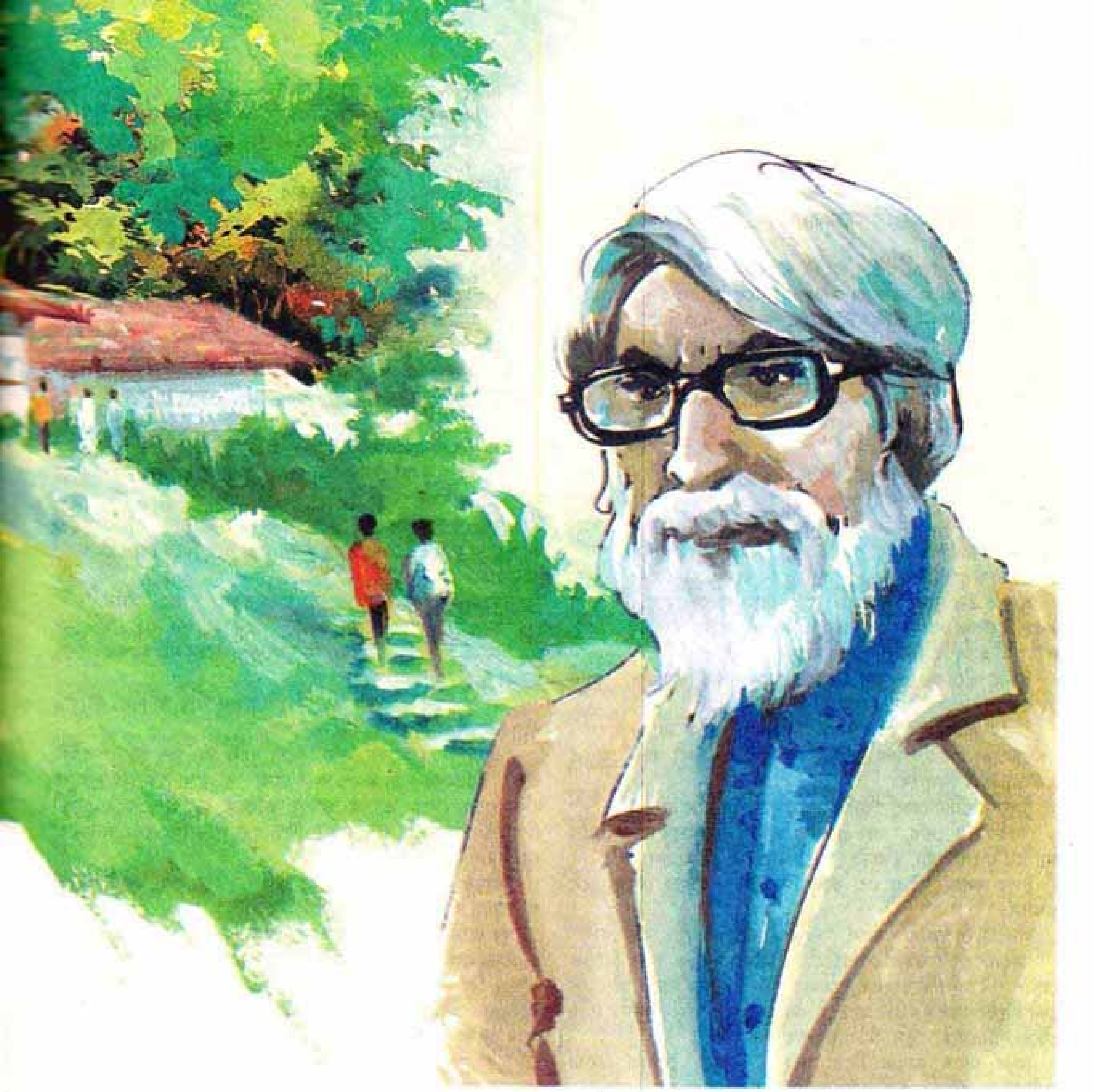

সম্ভবত আঙুলগামী বাসে চড়ে। সংবাদটা মিতিনমাসিকে দেওয়ার পরও তার কোনও হেলদোল নেই। একবার প্রোফেসারসাহেবকে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়ল পার্থমেসো। মিতিনমাসি গা-ই করল না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মিতিন আমূল বদলে গিয়েছে। বুমবুম ঘুমোতেই আলস্য ঝেড়ে ফেলে থমথমে মুখে পায়চারি করছে ঘরে। টুপুর আর পার্থকে রুমে থাকতে বলে আচমকাই কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। তারপর আর ফেরেই না, ফেরেই না। এগারোটা বাজল, সাড়ে এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল। পার্থমেসো তো রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বলল, "কী রে, এবার কী করা যায়?"

টুপুর বলল, "বিট অফিসারকে খবর দেবে? একা-একা যদি জঙ্গলে ঢুকে থাকে, যদি বিপদ-আপদ হয়!"

"নাকি বিভূতিবাবুকে ডাকব? উনি তো জঙ্গলটা চেনেন, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে, সঙ্গে জোরাল টর্চটাও থাকবে..."

"কিন্তু মিতিনমাসি যে বেরোতে বারণ করে গিয়েছে?"

"তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? জঙ্গলে বাঘ-চিতা ঘোরাফেরা করছে জানার পরও?" পার্থমেসো মাথা ঝাঁকাচ্ছে, "উফ, তোর মাসিটা যে কী করে না!"

ঠিক তখনই দরজায় টকটক। দৌড়ে গিয়ে পাল্লা খুলতেই মিতিনমাসি। ঠোঁটে আঙুল চেপে সুড়ুৎ করে ঢুকে এল অন্দরে। একদম নিচু গলায় বলল, "যা বলছি, চুপচাপ শোন। তোরা দু'জনে ঘড়িয়ালের খাঁচাটার ওখানে চলে যা। একসঙ্গে নয়। আগে তোর মেসো, তারপর তুই। খাঁচার ধার দিয়ে একটা রাস্তা উঠে গিয়েছে জঙ্গলে। ওই রাস্তা ধরে উপরে ওঠ। তারপর বাঁয়ে ঘুরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাংলো দু'টোর ঠিক পিছনটায় আয়।"

"আর তুমি?"

"আহ, প্রশ্ন নয়। যা বলছি কর। আর হ্যাঁ, উপরে জঙ্গলেই থাকবি, নীচে নামবি না। সঙ্গে টর্চ নেওয়ার দরকার নেই। বরং আমার বায়নোকুলারটা রাখ। ওটা দিয়ে রাজুর কোয়ার্টারটাকে ওয়াচ করবি।"

"কেন?"

"ফের প্রশ্ন? শুধু খেয়াল রাখবি, গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ যেন না বের হয়।"

বলেই মিতিন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। একটুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল টুপুর আর পার্থ। তারপর বাইরে এসে তাকাল এদিক-ওদিক। না, মিতিন নেই। হুস করে কোথায় যে উবে গেল! কিন্তু তার নির্দেশ তো পালন করতেই হবে। পা টিপে-টিপে লন পেরিয়ে খাঁচার কাছে গেল পার্থ। একটু অপেক্ষা করে টুপুরও। যেতে-যেতে একবার দেখল বিট অফিসারের কোয়ার্টারটা। নিঝুম, অন্ধকার। পূর্ণচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

আঁধার বড্ড গাঢ়। খাঁচার ধারের পায়ে চলা রাস্তাটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। আন্দাজে-আন্দাজে সাবধানি পায়ে উঠছিল টুপুর। সামনে পার্থ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফিট চড়াইয়ের পর অবশেষে সমতল। এবার শুকনো পাতা মাড়িয়ে এক পা, এক পা করে বাঁয়ে। পাতা ভাঙার খড়মড়ে আওয়াজে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াস-ধড়াস। মিতিনের বলে দেওয়া জায়গাটায় যখন পৌঁছল, টুপুর হাঁপাচ্ছে রীতিমতো।

দু'খানা বাংলোই ঢেকে আছে আবছায়ায়। বিষাক্ত পোকামাকড় রুখতে জানলা সব বন্ধ, ভিতর থেকে একটুও আলো আসছে না। রাজুর কোয়ার্টার তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রাতচরা পাখিদের নানারকম ডাক শোনা যায়। খলখল। খ্যাঁচখ্যাঁচ। ঠকঠক। কোথায় যেন একটা শিয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা শিয়াল। আবার একটা। তারপর কোরাসে হুক্কাহুয়া ধ্বনি। একটু পরে থামল শিয়ালের পাল। ঘোর নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের রেশটা যেন রয়ে গেল কানে।

হঠাৎই এক সুরেলা আওয়াজ গিটারের। সুবাহুদের বাংলো থেকে। একটা ইংরিজি গানের সুর বাজাচ্ছে সুবাহু। অবাক হল টুপুর। রাত গভীর না হলে কি গিটার বাজায় না সুবাহু?

মিনিট পাঁচেকও কাটেনি, টুপুরের কানে পার্থর ফিসফিস, "অ্যাই টুপুর, রাজুর কোয়ার্টারের সামনে কে যেন এসেছে।"

চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে চমকাল টুপুর। ও মা, তাই তো! কোয়ার্টারের দোরগোড়ায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে! কী কাণ্ড, আরও একজন এসে গেল যে!

টুপুরের ঠোঁট নড়ল, "কর্মবীর আর শক্তিধর মনে হচ্ছে।"

"কই দেখি, দেখি," পার্থ প্রায় কেড়ে নিল বাইনোকুলারটা। চোখে লাগিয়ে বলল, "হ্যাঁ, দু'জনই তো। নির্ঘাত ওই দুই মক্কেল।"

টুপুর বলল, "ওঁরা তো চলে গিয়েছেন? আবার ফিরে এসে ওখানে?"

পার্থ উত্তেজিতভাবে বলল, "দরজা খুলেছে! ভিতরে ঢুকে গেল।"

আলো জ্বলে উঠল কোয়ার্টারের। মিনিট দু'য়েক পরে নিভেও গেল। পার্থ চাপা স্বরে বলল, "এবার দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে কাঁধে কী যেন নিয়ে। বড়সড় বস্তার মতো," বলতে-বলতে বাইনোকুলার চোখ থেকে নামিয়েছে, "ধুস, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।"

টুপুর গালে আঙুল দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার। ইস, মিতিনমাসিটা যে এখন কোথায় গেল!"

"আমি তোদের সঙ্গেই আছি রে," টুপুরের কাঁধে হঠাৎ মিতিনের হাত। মৃদু স্বরে মিতিন বলল, "চল, কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার নামা যাক।"

"কী কাজ?"

"ঘড়িয়াল চোর ধরা।"

"কর্মবীর আর শক্তিধর?" পার্থ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও গলা নামাল, "কিন্তু ওরা তো পালিয়ে গেল।"

"চোর-ডাকাতরা কি আমাকে ফাঁকি দিয়ে অত সহজে পালাতে পারে?" মিতিনের স্বর শীতল, "এসো আমার সঙ্গে।"

বলেই অন্ধকারে তরতরিয়ে নামতে শুরু করল মিতিন। পার হল রাজুর কোয়ার্টার। তারপর আচমকাই ঘুরে সুবাহুদের বাংলোয়।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "এখানে কেন? কর্মবীর আর শক্তিধরকে কি এখানে পাবে?"

"আহ, প্রশ্ন করিস কেন? মজাটা দ্যাখ।"

দরজায় করাঘাত করল মিতিন। অন্দরে গিটারের আওয়াজটা থামল। সুবাহুর স্বর উড়ে এল, "কে?"

"আমি, মানে পাশের বাংলোর।"

মিনিটখানেক কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলেছে সুবাহু। এত রাতে মিতিনদের দেখে বিস্মিত যেন। বলল, "আপনারা? এখন?"

"কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে যাব তো, ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। আপনি গিটার বাজাচ্ছিলেন, ভাবলাম জেগে আছেন," মিতিন হাসল, "প্রোফেসরসাহেব এখন কেমন? জ্বর নেমেছে?"

"একটু আছে এখনও।"

"এবার পুরোপুরি ছেড়ে যাবে," মিতিন মুচকি হাসল, "আমাদের ভিতরে আসতে বলবেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসুন, আসুন।"

অন্দরে পা রেখে মিতিন তাকাল এদিক-ওদিক, "আপনার গিটারটা দেখছি না যে? স্যারের রুমে রেখে এলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"নিয়ে আসুন না। একটু বাজান, শুনি।"

"না, না," সুবাহু যেন লজ্জা পেল, "তার চেয়ে বরং আপনাদের সঙ্গে খানিক গল্পই করি।"

"গল্প করতে-করতেই নয় শুনব। বাজানোর পরিশ্রমটুকুও আপনাকে করতে হবে না। শুধু একবার ও ঘরে গিয়ে সিডি প্লেয়ারটা আবার চালিয়ে দিন।"

সুবাহুর মুখ পলকে ফ্যাকাসে। থতমতভাবে বলল, "মানে?"

"আশ্চর্য! আমার সোজা কথাটার মানে বুঝলেন না?" মিতিনের স্বর সামান্য রুক্ষ হল, "এখনও কি বুঝতে পারছেন না, আপনার খেল খতম। থুড়ি, আপনাদের।"

"কী বলছেন আবোল তাবোল?" সুবাহু কাঁধ ঝাঁকাল। বিস্মিত গলায় বলল, "কী খেল? কিসের খেল?"

"একটা নয়, অনেক, লম্বা লিস্টে যাচ্ছি না। শুধু বড় খেলাটাই বলি।" মিতিনের গলা ক্রমশ কড়া হচ্ছে, "দু'-দু'খানা নিরীহ দুষ্প্রাপ্য ঘড়িয়ালকে মেরে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে বাক্সবন্দি করে চম্পট দেওয়ার বন্দোবস্তটি পাকা। এটা কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছে। আর তো আপনাদের রেহাই নেই।"

"থামুন তো," সুবাহু তেড়ে উঠল, "কী সব উলটোপালটা অভিযোগ আনছেন? জানেন আমরা কে?"

খুব জানি। বেআইনি পশু-চামড়া চালানের যে আন্তর্জাতিক চক্রটি ভারতের জঙ্গলে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে, আপনারা তাদেরই দুই পান্ডা। রিসেন্টলি সুন্দরবনে একটা সাকসেসফুল অপারেশন করে এসেছেন। এখানেও যেভাবে ঘুঁটি সাজিয়ে ধাপে-ধাপে এগিয়েছিলেন, কাজ হাসিল করে নির্বিবাদে পালিয়ে যেতে পারতেন," মিতিনের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল, "কিন্তু আপনাদের কপাল খারাপ। এই সময়েই আমি বেড়াতে এলাম কিনা। আর আমার পাল্লায় পড়লে আপনাদের মতো ক্রিমিনালদের শ্রীঘর বাস তো অনিবার্য।"

"এই যে, আপনি বেরোন তো এখান থেকে। আউট। আউট," সুবাহু প্রায় গর্জন করে উঠল, "যত্ত সব ফালতু লোকজন! মাঝরাত্তিরে অন্য টুরিস্টদের বাংলোয় এসে হল্লা জুড়েছেন, আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। মানে-মানে কেটে পড়ুন তো।"

"এখনও তেজ কমেনি, অ্যাঁ?" মিতিনও পালটা গলা চড়াল, "যাব নাকি পাশের ঘরে? এখনও নিশ্চয়ই ফলস গিটারের বাক্সটায় চামড়া ভরে উঠতে পারেননি? তা ছাড়া স্কেলিটন দু'টোও তো এখনও রাজুর কোয়ার্টারে পড়ে!"

কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, পাশের ঘর থেকে হঠাৎই ইন্দ্রজিৎ সেনের উদয়। না, কোনও অসুস্থ বয়স্ক প্রোফেসর নয়, দিব্যি এক তাগড়াই জোয়ান। নকল দাড়িগোঁফ উধাও, চোখে চশমাও নেই, হাতে উদ্যত রিভলভার।

চিবিয়ে-চিবিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, "আপনি বড় বেশি জেনে ফেলেছেন। আপনাদের কাউকেই তো আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না।"

"মেরেই ফেলুন তা হলে," মিতিনের কোনও তাপ উত্তাপ নেই।

বাঁকা সুরে বলল, "তারপর বেঁচে বেরোতে পারবেন তো? পেরোতে পারবেন পম্পাসার চেকপোস্ট?"

"এই না হলে মেয়ে টিকটিকির বুদ্ধি! আমরা ওই পথে যাবই না। রিভলভারের নলটা একবার টুপুরকে তাক করল। ইন্দ্রজিৎ পরক্ষণে নল ঘুরিয়েছে পার্থর দিকে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে ম্যাডাম। নদীপথে গিয়ে ওপারে চামুণ্ডিয়ায় নামব। তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না।"

"কিন্তু নৌকোটা যে আর নেই। মাঝিসুদ্ধ নৌকো আমি ভাগিয়ে দিয়ে এসেছি।"

"কী? কী বললেন?" ইন্দ্রজিতের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। রিভলভারের নল মিতিনের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "প্রথম গুলিটা তো তা হলে আপনার কপালেই নাচছে। তারপর ওই দু'টোকে ফিনিশ করে লাশগুলোকে ভাসিয়ে দেব নদীতে। আর কোনও প্রমাণই থাকবে না।"

খচ করে একটা শব্দ হল সেফটি ক্যাচ তোলার। পরক্ষণেই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটাল মিতিন। বিদ্যুৎবেগে জিন্সের পকেট থেকে বের করেছে রিভলভার। ইন্দ্রজিৎকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে সরাসরি গুলি করেছে তার হাতে। ছিটকে গেল ইন্দ্রজিতের অস্ত্র। কঁকাচ্ছে যন্ত্রণায়।

মিতিন গম্ভীর গলায় বলল, "আমার দিকে রিভলভার তোলাটা আমি একটুও পছন্দ করি না। আশা করি, এবার আপনারা সারেন্ডার করবেন।"

বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন কর্মবীর আর শক্তিধর। রিভলভার হাতে মিতিনকে দেখে বললেন, "ও, আপনি একাই দুই বজ্জাতকে সামলে নিয়েছেন?"

"এবার তিন নম্বরটিকে আপনারা পাকড়াও করুন। সে বেচারা ও ঘরে বসে-বসে ঘামছে।"

বিট অফিসার পূর্ণচন্দ্র বেহেরাকে ঘেঁটি ধরে বের করে আনলেন কর্মবীর। নাইলনের দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হল তিনজনকে।

গোটা দৃশ্যটাই কেমন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল টুপুরের। শুধু বুঝতে পারছিল না, সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে।

॥ ১০ ॥

ওফ, রাত একখানা গেল বটে! পুরানাকোট থেকে জিপ হাঁকিয়ে চলে এলেন রেঞ্জারসাহেব। আঙুল থেকে গাড়িভর্তি পুলিশও হাজির। চোরাই মালপত্র সমেত তিন অপরাধীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের গাড়ি যখন রওনা দিল, সাতকোশিয়ার জঙ্গলে তখন ভোরের আভাস। পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। পুব আকাশে লাগছে রঙের ছোঁয়া।

এরকম একটা রোমহর্ষক রাতের পর আর কি বিছানায় যেতে মন চায়? ঘুম তো উবেই গিয়েছে টুপুরের চোখ থেকে। পার্থ আর মিতিনের সঙ্গে সে বসে আছে বাংলোর লনে। চেয়ার পেতে। ফুরফুরে প্রভাতী হাওয়া খাচ্ছে।

বিভূতি চা নিয়ে এলেন। মাঝরাতে হল্লাগুল্লার আওয়াজে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিলেন তিনি। তারপর থেকে গোল-গোল চোখে দেখছেন সব কিছু। শ্রদ্ধামিশ্রিত স্বরে মিতিনকে বললেন, "ম্যাডাম, আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন।"

"এবার আপনি কামাল করুন। জঙ্গলের শেষ ব্রেকফাস্টটা জমিয়ে বানান তো। বেশ মোটা মোটা আলুর পরোটা। যা এখন অনেকক্ষণ পেটে থাকবে। পারবেন?"

চক করে ঘাড় নাড়লেন বিভূতি। হাসি-হাসি মুখে বললেন, "ওই দুই বাবুও কি আসবেন? ওঁদের জন্যও বানাব?"

"না, না। ওঁরা তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। রেঞ্জারসাহেবের সঙ্গে চলে গিয়েছেন। উনিই ওঁদের ফেরার ব্যবস্থা করবেন।"

বিভূতি রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই টুপুর লজ্জা-লজ্জা মুখে বলল, "কর্মবীর আর শক্তিধরবাবুকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আন্দাজই করতে পারিনি ওঁরা বনবিভাগের বিশেষ সুরক্ষা বাহিনীর অফিসার। চোরাশিকারি ধরতে হানা দিয়েছিলেন সাতকোশিয়ায়।"

পার্থ বলে উঠল, "ওঁদের ফোটোটাই তো আরও গন্ডগোল পাকিয়ে দিল। জঙ্গলে রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন, পোচার ছাড়া আর কী ভাবব?"

মিতিন বলল, "দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করতে জানলে ফোটোর রিভলভার থেকেই ওঁদের সঠিক পরিচয় পেয়ে যেতে।"

"কী বিশেষত্ব ছিল?"

"ওগুলো সার্ভিস রিভলবার মশাই। শুধু সরকারি বাহিনীই ওই রিভলভার ব্যবহার করে। তা ছাড়া জঙ্গল ভেদ করে পাঁচ ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার যাওয়া মোটেই চোরাশিকারিদের কম্মো নয়। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ লাগে।"

"অ। তুমি বুঝি তাই দিয়েই দু'য়ে-দু'য়ে চার করেছিলে?"

"উঁহু। পৌনে চার। বাকিটুকু নিশ্চিত হলাম কার্বন পেপারটা থেকে। ডে টু ডে রিপোর্ট লিখে রাখছিলেন ওঁরা সরকারি বয়ানে। কার্বন পেপারটা আলোয় ধরতে স্পষ্ট পড়া গেল। ওই রিপোর্ট থেকেই জানলাম, জঙ্গলে চোরাশিকারি ঢুকেছে এমন একটা ইনফরমেশান পেয়েই ওঁরা হাজির হয়েছিলেন সাতকোশিয়ায়। তবে ওঁরা ভেবেছিলেন, বাঘ, হাতি, কিংবা হরিণটরিন কিছু মারা হবে। আসল টার্গেট যে ঘড়িয়াল, এটা ওঁদের হিসেবেই ছিল না।"

"তুমি আন্দাজটা করলে কী করে? ঘড়িয়াল দু'টো নিখোঁজ হল তাই?"

"আজ্ঞে না স্যার। এখানে পা রাখার পরদিন থেকেই আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল চলছে। চৌকিদার উধাও, কথাটা পম্পাসার চেকপোস্ট পর্যন্ত রটে গিয়েছে, অথচ বিট অফিসারের মোটেও তেমন হেলদোল নেই। আবার ওদিকে লবঙ্গির সুরজ মুন্ডা জানে, রাজু দু' সপ্তাহ ছুটিতে গিয়েছে। এটা কেমন করে সম্ভব?"

"অর্থাৎ বিট অফিসারই ওকে ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাই তো?"

"ইয়েস মাই ডিয়ার ওয়াটসন," টুপুরকে ছোট্ট একটা তারিফ ছুড়ল মিতিন, "বাসে যাওয়ার পথে কাউকে হয়তো বলেছিল রাজু। সেটাই পৌঁছে গিয়েছে সুরজ মুন্ডার কানে। তখনই মনে হল, ধোঁয়া ছাড়া তো আগুন হয় না। সুতরাং রাজুকে বাড়ি পাঠানোর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। তার আগেই রাজুর কোয়ার্টারের সামনে ক্রোমিয়াম সালফেটের গুঁড়ো পেয়েছি। দু'য়ে মিলে গাঢ় হল সংশয়টা।"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বটে," টুপুর বলল, "কিন্তু ক্রোমিয়াম সালফেটে কী হয়?"

পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "মারাত্মক কোনও বিষটিস হবে। জন্তুজানোয়ার মারতে বোধ হয় কাজে লাগে।"

"তোমার জিকের ফান্ডা দিন-দিন কমে যাচ্ছে," মিতিন পলকা ঠাট্টার সুরে বলল, "জন্তুজানোয়ারের কাঁচা চামড়া জলদি-জলদি শুকোতে ওই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার হয় দুনিয়াভর। তখনই মনে হল, ওই কাজে কোয়ার্টারটিকে লাগানোর জন্যই সম্ভবত ভাগানো হয়েছে রাজুকে। সঙ্গে অবশ্য নুনও লাগে। তারও খালি বস্তা তো আমরা পেয়েছি।"

"বুঝলাম," টুপুর মাথা দোলাল, "ওই মতলব থেকেই শেষরাতে গিয়ে ওরা মারল ঘড়িয়াল দু'টোকে। তারপর তিনজনে মিলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জঙ্গলে। সুবাহুদের বাংলোর ভিতরের ঘরটায় যে ভোঁতা-ভোঁতা ছুরিগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো দিয়েই ছাল ছাড়িয়ে মাংস ফেলে দিল গর্তে। আর পাটাতনে চাপিয়ে চামড়া ও কঙ্কালটা নিয়ে এল রাজুর কোয়ার্টারে।"

মিতিন ভুরু নাচাল, "তা হলে পাটাতনটা জঙ্গলের গর্তে পাওয়া গেল কেন?"

"সুবাহুরা আবার ফেলে দিয়ে এসেছিল।"

"তোর মুন্ডু, ঘড়িয়ালের মাংসই বা গেল কোথায়? তোকে কালই বললাম না, কোনও জন্তুর পক্ষে দু' ঘণ্টায় অতখানি মাংস খাওয়া সম্ভব নয়?"

"তা হলে ঘটেছিলটা কী?"

"ওরে বোকা, উলটো করে ভাব। ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজুর কোয়ার্টারে। সেখানে হাড়, চামড়া ছাড়িয়ে পাটাতনে চাপিয়ে মাংসটা ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল ওই গর্তে।"

"তার মানে ঘড়িয়াল দু'টোকে মেরে ওরা আমাদের বাংলোর সামনে দিয়েই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ আমরা কিছু টের পেলাম না?"

"কী করে পাব? আমরা যে তখন সাতকোশিয়ায় আসিইনি।"

"মানে?" পার্থ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকাল, "কী হেঁয়ালি করছ, অ্যাঁ?"

"মোটেই হেঁয়ালি নয়, স্যার। ঘড়িয়াল দু'টোকে মারা হয়েছে আমরা এখানে আসার আগেই। রাজু যেদিন থেকে নেই, সেই দিনই। নিরালা বাংলোয় নিশ্চিন্তে অপারেশানটা চালিয়েছে সুবাহু, ইন্দ্রজিৎ, আর পূর্ণচন্দ্র।"

"যাহ বাবা, কী গুলগাপ্পি ঝাড়ছ? দু'দিন ধরে খাঁচায় যে ঘড়িয়াল দু'টোকে দেখলাম, সেগুলো তা হলে কি? মরা ঘড়িয়ালের ভূত?"

"প্রায় সেরকমই," মিতিন আলতো হাসল, "ওটাই সুবাহুর কেরামতি।"

"কীরকম?"

"কিছুই ঠিকঠাক অবজার্ভ কর না। পাশের ঘরে সিডি প্লেয়ার দেখে তোমাদের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। রাজুর কোয়ার্টারে দু'খানা ঘড়িয়ালের কঙ্কাল দেখে চমকে উঠলে। অথচ ড্রেসিংটেবিলের উপর পড়ে থাকা পলিথিনের বস্তুটির দিকে তোমরা ফিরেও তাকালে না।"

"তুমি কিসের কথা বলছ গো মাসি?"

"দু'খানা খেলনা ঘড়িয়ালের কথা বলছি। যাদের হাওয়া দিয়ে ফোলালে অবিকল আসল ঘড়িয়ালের মতোই দেখায়। সেগুলো এমনই নিখুঁত, বনবিভাগের যে-কোনও কর্মীও আসল-নকলের ফারাকটা বুঝতে পারবে না এবং এমনভাবে তৈরি, যে রিমোটের সাহায্যে মুখ খোলা-বন্ধও করা যায়।"

"ও-ও-ও। সুবাহুই বুঝি রিমোটটা অপারেট করত!"

"ইয়েস মিস ওয়াটসন," মিতিন সায় দিল, "থ্যাঙ্কস টু বুমবুম। ও আমাকে ক্লুটা দিয়েছিল। ওকে গিফট করব বলে পলিথিনের চোপসানো ঘড়িয়াল দু'টো আমি রেঞ্জারসাহেবের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছি। কেস মিটলে রিমোট সহ ওই দু'টো খেলনা উনি আমাকে পাঠিয়েও দেবেন।"

"ওটাই তা হলে তোমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ। অর্থাৎ কিনা খাঁচার ঘড়িয়াল দু'টোর রহস্য ভেদের জন্য তোমার পারিশ্রমিক?" পার্থ হেসে বলল, "কিন্তু কর্মবীর আর শক্তিধরের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করলেটা কখন?"

"আমার প্রতিটি স্টেপ তোমাদের না জানলেও চলবে," মিতিন হাসছে মিটিমিটি, "আমার সব চেয়ে মোক্ষম প্যাঁচটা ধরতে পেরেছ কি?"

"কোনটা? রাতদুপুরে আচমকা হানা দেওয়া?"

"হুঁঁ। ওই যে বিট অফিসারের কানে ভাসিয়ে দিলাম, রাজু কাল ফিরে আসছে, তাতেই তো রাতারাতি মাল সরানোর তাড়া পড়ে গেল। নয়তো ইন্দ্রজিৎ তো দিব্যি জ্বরো রোগীর ভান করে কাজটা ধীরেসুস্থে সারছিল।"

"রাজুর কোয়ার্টারে বসে?"

"নয়তো আর কোথায়! সাধে কি ওকে দেখা যাচ্ছিল না!" মিতিন চোখ ঘোরাল, "তবে বেচারার কাজটা আধখেঁচড়াই রয়ে গেল। চামড়া ও গিটারের বাক্সে ভরে ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু কঙ্কাল দু'টোকে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে উঠতে পারল না।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "চামড়ার নয় অনেক দাম। হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে কী হবে?"

"ঘড়িয়ালের হাড়ের গুঁড়োও বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিকোয়, বিশেষত চিনে। ওই হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে ওরা অনেক ওষুধবিষুধ বানায় কিনা।"

"ও।"

টুপুর যেন অবার খানিক উদাস। পরশুই মিতিনমাসি বলছিল, আর পাঁচটা সরীসৃপের মতোই ঘড়িয়ালের রক্ত ঠান্ডা। মানুষের মতো যে কোনও আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই ঘড়িয়ালদের। তাই পরিবেশের সামান্য বদল হলেই বেচারারা মারা পড়ে দলে-দলে। তার উপরে এভাবে যদি ক্রমাগত সুবাহু, ইন্দ্রজিৎদের মতো মানুষদের লোভের শিকার হয়, ধরাধাম থেকে প্রাণীটাই তো ধীরে-ধীরে মুছে যাবে। মানুষ কি নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দুনিয়ায় টিকতে দেবে না?

পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সকালের প্রথম সূর্য। লনের সবুজ ঘাস নরম হলুদ আলোয় মাখামাখি। তীক্ষ্ণ সুরে ডেকে উঠল একটা মাছরাঙা। মিশকালো ভীমরাজ নেচে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কত যে রংবেরঙের পাখি বেরিয়ে পড়েছে সেজেগুজে। টুপুর আনমনে সকালটাকে দেখছিল।

হঠাৎই বাংলোর বারান্দা থেকে বুমবুমের ডাক, "মা? ও'মা!"

রাতভর দিব্যি ঘুমিয়ে সদ্য জেগেছে বুমবুম। চোখ রগড়াচ্ছে।

টুপুর চেঁচিয়ে বলল, "কী রে, কিছু বলবি?"

"তোমরা ওখানে কী করছ?"

"প্রকৃতির শোভা দেখছি।"

বুমবুম বারান্দা থেকে নেমে এল। কাছে এসে বলল, "আমি কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

"কী রে?"

"ঘড়িয়াল দুটো তো জলে চলে গিয়েছিল, আবার ওরা জল থেকে উঠে এসেছে। আমি নদীর দিকে যাচ্ছি, ওরা আমার পাশে-পাশে যাচ্ছিল। আমি তাকালেই হাঁ করছে, চোখ ঘোরালেই মুখ বুজে ফেলছে," বুমবুম চোখ পিটপিট করছে, "ওরা খুব ভাল। তাই না মা?"

মিতিন নীরব। পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পার্থ। চলে যাচ্ছে বুমবুমের সামনে থেকে।

টুপুর যে এখন কী করে! তার এত কান্না পাচ্ছে কেন!

সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুঃস্বপ্ন বারবার

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

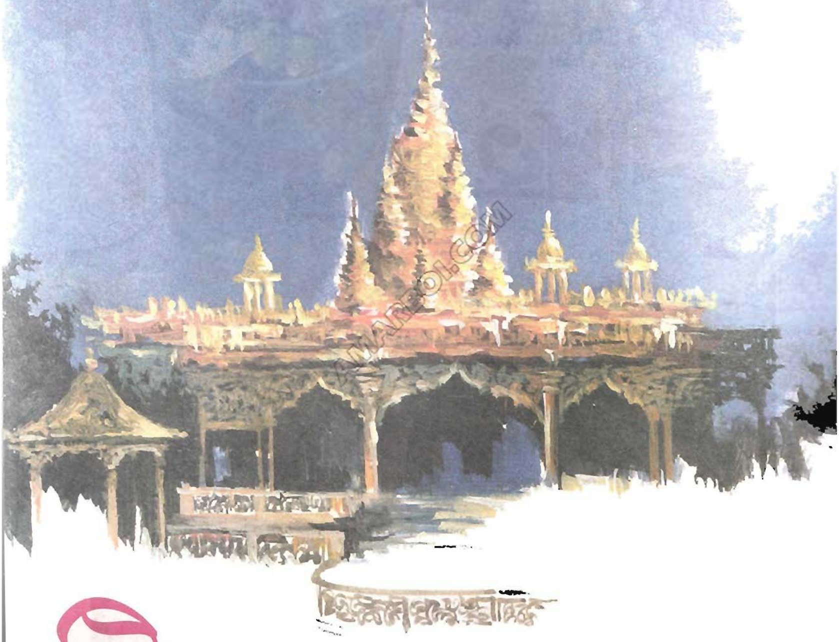

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই স্কুলব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের বাক্সটা বের করল টুপুর। ক্লাসরুমে আহার ব্যাপারটা টুপুরের না-পসন্দ, সোজা গিয়ে বসেছে কম্পাউন্ডের ছাতিম গাছের নীচের বেদিটায়। সেই কোন সোয়া ন'টায় বেরিয়েছে, এখন ঘড়ির কাঁটায় দুটো পার। বহুৎ চোঁ-চোঁ করছে পেট, এক্ষুনি চিলচিৎকার জুড়বে নাড়িভুঁড়ি। থুড়ি ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি-ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, এইভাবেই ভাবতে বলে মিতিনমাসি। এতে নাকি চিন্তাভাবনায় বেশ একটা গোছানো ভাব আসে। কথাটা মনে আসতেই টুপুর সামান্য উদাস। কতদিন দেখা হচ্ছে না মাসির সঙ্গে। সেই গরমের ছুটিতে মাত্র সাতদিনের জন্য গিয়েছিল টুপুর, ব্যস। এমনই পোড়া কপাল টুপুরের, ঠিক তখনই জ্বরে পড়ল মাসি। ব্যস, বেড়াতে যাওয়া চুলোয়, কোনও কেসটেসও এল না, দিনগুলো পুরো বৃথাই গেল টুপুরের। আজকাল তো টুপুরকে ফোন পর্যন্ত করতে পারছে না মাসি! কে জানে, মাসি হয়তো টুপুরকে আর পাত্তাই দিতে রাজি নয়। গোয়েন্দাগিরিতে মাসির সহকারী হওয়ার স্বপ্নটাও বুঝি অপূর্ণই রয়ে গেল এজন্মে।

ঈষৎ বেজার মুখে টুপুর পাত্রটা খুলল। খাবার দেখে আরও খিঁচড়ে গেল মেজাজ। উফ্‌ফ, আজ আবার চাউমিন। তাও হয়তো গিলে নেওয়া যেত, কিন্তু এমন গাদাখানেক সস ছড়িয়েছে মা প্রাণের সুখে! ওই দ্রব্যটি মুখে তুললে ওয়াক না উঠে আসে!

দ্রুত একটা মতলব এঁটে নিল টুপুর। ক্লাসের অনেকেই তো তোলাতোলা করে খায় চাউমিন, তাদের কাউকে গছিয়ে দিতে পারলেই তো ল্যাঠা চোকে, বিনিময়ে তার খাবারটাই নয় সাঁটাবে আজ।

কাকে ধরা যায়? টুপুর তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। জয়, নেহাল, তরাম্নুমলদের দলটা টিফিন বদলাবদলি করেই খায়, সুতরাং, ওখানে ভেড়া যাবে না। শৌভিক তো নির্ঘাৎ টোস্ট এনেছে, শুকনো-শুকনো ওই দ্রব্যটিও টুপুরের দু'চক্ষের বিষ। ওপাশে রিয়া, মণিকা, দেব্যরতিদের দঙ্গলটায় উঁকি দিয়ে দেখবে? বড্ড বেশি সাজগোজের গল্প করে ওরা, টুপুর পছন্দ করে না খুব একটা, তবু আজ না হয়...

আচমকা চোখ আটকেছে শালিনীতে। সামনে খোলা টিফিনকৌটো,

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

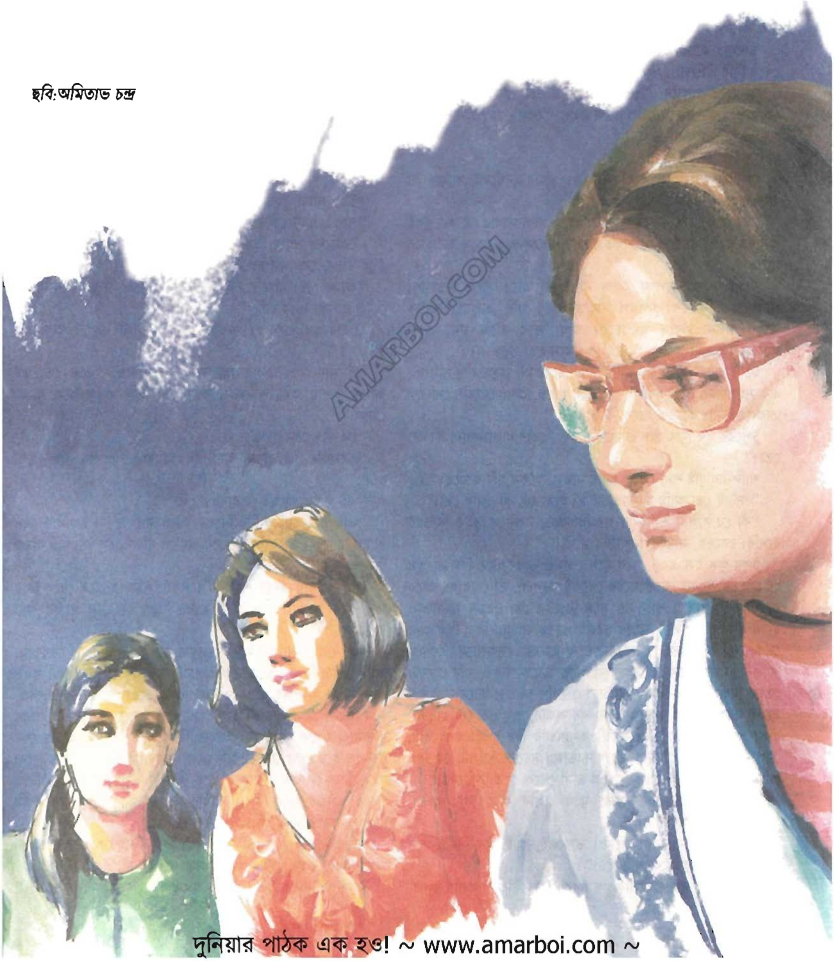

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা কেমন ভ্যাবলার মতো বসে! হাত নড়ছে না, মুখ নড়ছে না, চারদিকের হট্টগোলে দৃষ্টি নেই। হলটা কী? খাবার পছন্দ নয়? কিন্তু শালিনী ঘোরতর নিরামিষাশী, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন কিচ্ছুটি ছোঁয় না, ও কি খাবার বিনিময়ে রাজি হবে?

তবু খিদে বড় বালাই। পায়ে-পায়ে শালিনীর কাছে গেল টুপুর। পিছন থেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "তোর কী মেনু রে আজ?"

"পুরি, হালুয়া, আঙুর আর মুগডালের ভুজিয়া।"

আইব্বাস, সবক'টাই তো টুপুরের প্রিয় আইটেম! আর শালিনীর বাড়ির পুরি-হালুয়ার টেস্টও আলাদা। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা বলে ভারী চমৎকার একটা বাসও বেরোয়! একদিন খাইয়েছিল শালিনী, সাতদিন স্বাদটা লেগে ছিল জিভে।

কিন্তু কীভাবে আজ কথাটা পাড়ে টুপুর? সরাসরি খেতে চাইবে, নাকি কায়দা করে বলবে একটু টেস্ট করা তো? খাবলা মেরে তুলেও নেওয়া যায় খানিকটা। খুব ঠান্ডা মেয়ে শালিনী, রাগও করবে না, মুখে রাও কাড়বে না সম্ভবত, কিন্তু মনে-মনে বিরক্ত তো হবে নিশ্চয়ই।

ভাবনার মাঝে আচমকা শালিনীর গলা, "তুই আমার টিফিনটা খেয়ে নিবি ঐন্দ্রিলা, প্লিজ?"

অভাবিত প্রস্তাবে ঐন্দ্রিলা তথা টুপুর তো প্রায় বিষম খাওয়ার জোগাড়! কোনওক্রমে ঢোক গিলে বলল, "কেন রে, তুই খাবি না?"

"ইচ্ছে করছে না রে।"

"শরীর ভাল নেই বুঝি?"

"শরীর, মন কিচ্ছু ভাল নেই রে। খাবার দেখলেই আমার গা গুলোচ্ছে।"

"তা হলে তো চেষ্টা করে দেখতেই হয়। খাবারদাবার নষ্ট করা খুবই অনুচিত কাজ, নয় কি? বিশেষত যে দেশে লক্ষ-লক্ষ মানুষ অনাহারে থাকে?"

বলেই আর অপেক্ষা করল না টুপুর, হাতে তুলে নিয়েছিল শালিনীর টিফিনবক্স। গপগপ সাবাড় করছে পুরি, হালুয়া, টকাটক আঙুর চালান করছে মুখগহ্বরে। আহ, ভরে যাচ্ছে মন। এমন মনোহারী হালুয়া আগে খেয়েছে কি? মনে তো পড়ে না।

হঠাৎ হোঁচট খেল। শালিনীর আচরণটা কেমন অদ্ভুত না? সামনেই এক সহপাঠিনী তার খাবারটা গোগ্রাসে খাচ্ছে, অথচ মেয়েটা সেদিকে তাকাচ্ছেই না! কী এত ভাবে বিভোর?

টুপুরের মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "তোর ব্যাপারখানা কী বল তো?"

শালিনীর দৃষ্টি শূন্য থেকে ধরায় নামল, "কেন, কী হয়েছে?"

"সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। হয়েছেটা কী বলবি তো।"

"কী যে বলি," শালিনীর স্বর দ্বিধান্বিত, "শুনলে তুইও নিশ্চয়ই হাসবি। রণদেব, জয়িতা, নিশাদের মতো।"

টুপুর ক্ষুব্ধ হল একটু, তবে মুখে কোনও ভাব ফুটতে দিল না। সে যে ক্লাসের অনেক ছেলেমেয়ের থেকেই আলাদা, তা বোধ হয় জানে না শালিনী। অবশ্য শালিনীর সঙ্গে টুপুরের তো তেমন ঘনিষ্ঠতাও হয়নি এখনও। শালিনী তাদের স্কুলেই পড়ছে বরাবর, কিন্তু ছিল অন্য সেকশনে, এ বছরই ক্লাস সেভেনে তাদের সেকশানে এসেছে শালিনী। মাত্র কয়েক মাসেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারত, যদি মেয়েটা তেমন মিশুকে হত। কিন্তু মেয়েটা বড্ড বেশি চুপচাপ ধরনের। কারও সঙ্গেই দরকার ছাড়া কথা বলে না খুব একটা, শুধু ওই হাই হ্যালো, ব্যস। এবছর স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের দিন পেঁয়াজের ছোঁয়া খেল না বলে নজরে পড়ল ওর খাদ্যাভ্যাস, নয়তো শালিনী যে চরম গোড়া নিরামিষাশী, তাও হয়তো অজানা থেকে যেত টুপুরদের।

একমুঠো মুগডালের ভুজিয়া মুখে চালান করে টুপুর বলল, "কথাটা নিশ্চয়ই মজার নয়?"

"একেবারেই না। বরং ভয়ের। ভাবলেই, আই মিন সিনটা মনে পড়লেই আমার বুক কেঁপে উঠছে।"

টুপুর যেন হালকা রহস্যের গন্ধ পেল। ঈষৎ উদগ্রীব গলায় বলল, "কী কথা? কী এমন দৃশ্য? কোথায় দেখেছিস?"

"স্বপ্নে।"

"মানে?" টুপুরের আচমকা হাসি পেয়ে গেল। কোনওমতে গিলে নিয়ে বলল, "স্বপ্ন দেখে কেউ ভয় পায় নাকি?"

"আমিও পাই না, কিন্তু অবিকল একই স্বপ্ন কেউ যদি দিনের পর-দিন দেখে, আর সেই স্বপ্নটা যদি ভয়ঙ্কর হয়।"

"দাঁড়া-দাঁড়া, রোজ তুই সেম স্বপ্ন দেখিস?"

"গত চারদিন তো দেখছি।"

"স্বপ্নটা কী? বলতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই? হাসব না, ওয়ার্ড অব অনার।"

তবু যেন ভরসা পাচ্ছে না শালিনী, নখ খুঁটছে নত মুখে। টুপুরের কপালে ভাঁজ বাড়ল। নাহ, সমস্যাটা গভীরই মনে হচ্ছে। মিতিনমাসির পরামর্শটা মনে পড়ল টুপুরের। যখন কেউ সঙ্কোচের কারণে কোনও কিছু বলতে কুণ্ঠা বোধ করে, তখন বেশি জোরাজুরি করতে নেই, বরং প্রশ্ন বদলে ফেলে তাকে সহজ করে নেওয়া অনেক জরুরি।

টুপুর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, "হ্যাঁরে শালিনী, তোদের বাড়িতে সব্বাই ভেজিটেরিয়ান?"

শালিনী অল্প মাথা নাড়ল, "হুঁ।"

"কেউ কখনও আমিষ খায় না?"

"খেতে পারবেই না।"

"কেন?"

"ধর্মে নিষেধ আছে যে।"

"তোরা বুঝি বৈষ্ণব?"

"উঁহু, আমরা জৈন।"

টুপুরের একটু কৌতূহল জাগল। জৈনধর্ম ইতিহাসে পড়েছে বটে, কিন্তু জৈনদের সম্বন্ধে তার তেমন ধারণা নেই। সামান্য আগ্রহী স্বরে টুপুর বলল, "বাঙালিদের মধ্যে জৈন আছে নাকি?"

"আমরা তো বাঙালি নই। রাজস্থানি। আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে আমরা মারোয়াড়ি।"

"তোর কথা শুনে তো একটুও বোঝা যায় না। একটুও অবাঙালি টান নেই।"

শালিনীর মুখে এবার পাতলা হাসি ফুটেছে, "তাও তো তুই আমার বাবার কথা শুনিসনি। বাবা তো হিন্দি পর্যন্ত বলে বাংলা টোনে।"

"সে কী? কেন?"

"অনেকদিন এ রাজ্যে আছি যে আমরা। বোধ হয় এক-দু'শো বছর।"

"এই কলকাতাতেই? বরাবর?"

"তাই তো জানি। বিকানিরের কাছে নাগৌর না কোথায় যেন আমাদের দেশ। তা আমি সেখানে কখনও যাইনি, সে জায়গার নামও ঠিক জানি না।"

"ও," কথায়-কথায় শালিনী খানিকটা সহজ হয়েছে দেখে টুপুর ফস করে পুরনো প্রশ্নে ফিরে গেল, "তুই কী যেন স্বপ্নের কথা বলছিলি না?"

"হ্যাঁ তো," শালিনী মাথা দোলাল, "পর-পর চাররাত দেখলাম। আমি একটা বিশাল ঘরে ঢুকেছি, ঘরটা এত উঁচু যে, সিলিংটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সেই ঘরে একটা লোক দাঁড়িয়ে। লোকটা কী প্রকাণ্ড, যেন একটা মিনি পাহাড়। ইয়া মোটা গোঁফ আছে লোকটার, চোখ দু'খানাও জাম্বো সাইজের। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আরও যেন বড়-বড় হয়ে গেল চোখের মণিগুলো। আমাকে এক হ্যাঁচকায় শূন্যে তুলে নিল লোকটা, তারপর ছুড়ে দিল সিলিংয়ের দিকে। মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিল। আবার ছুড়ছে, আবার লুফছে। আমি চিৎকার করছি, কিন্তু গলায় কোনও স্বর নেই..."

সত্যিই তো, খুব অস্বস্তিকর স্বপ্ন। টুপুর নিজেকে ওরকম একটা দৃশ্যে কল্পনা করল। উঁহু, মোটেই মজা লাগছে না।

টুপুর গম্ভীরমুখে বলল, "তখনই তোর ঘুম ভেঙে যায় নিশ্চয়ই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু স্বপ্নটা আরও অনেক লম্বা। ওই লোকটা আমাকে এক হাতে ঝুলিয়ে ঘরে পাক খায়। তারপর দেওয়ালের ধারে গিয়ে আর-একটা লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল..."

"যা বাব্বা, দ্বিতীয় একজন? সে এল কোত্থেকে?"

"কী জানি। সে লোকটা দেওয়ালে ঝোলে। ওই লোকটার বডি থেকে একটা লাঠি বের করে আনে, হঠাৎই লাঠিটা খুলে যায়, আর লাঠিটা হয়ে যায় দেওয়াল।"

"তা কী করে সম্ভব?"

"কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে। আমি তো তাই দেখছি," শালিনীর নাকের পাটা ফুলছে উত্তেজনায়, "এর পর যা ঘটে সে তো আরও ভয়ঙ্কর। লোকটা দেওয়ালে লাথি মারে, অমনি কানে তালা লাগা আওয়াজ। আর দেওয়াল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেই গর্তে আমাকে ফেলে দিল... আমি অন্ধকারে পড়ছি, পড়ছি...তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আমি দরদর করে ঘামতে থাকি। বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারি না। সারাদিন স্বপ্নটা চোখে লেগে থাকে, আমার গা শিউরনো ভাবটা কিছুতেই কাটতে চায় না।"

"খুবই বিশ্রী ব্যাপার তো," টুপুর ঠোঁট চাপল, "অবিকল এই স্বপ্ন দেখছিস রোজ?"

"একেবারে সিন টু সিন," শালিনীর মুখ কাঁদো-কাঁদো, "আমার তো এক-এক সময় মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব।"

কী বলে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করবে, ভেবে পেল না টুপুর। স্বপ্নকে আদৌ আমল দেওয়া উচিত কি? মনগড়া ব্যাপারস্যাপার থেকেই তো স্বপ্ন তার ডানা মেলে। কেউ-কেউ অবশ্য বলে বটে ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। তা শালিনী তো স্বপ্ন দেখছে মাঝরাতে। সুতরাং স্বপ্নটাকে স্বচ্ছন্দে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথায় যেন খচখচ করছে। কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না কেন? টুপুরও কি স্বপ্নটাকে বিভীষিকাময় কিছু একটা ভেবে নিল?

ফের শালিনীর গলা বাজছে। একটু যেন বাঁকা সুরেই বলল, "কীরে, শুনেই নার্ভাস হয়ে গেলি?"

"না-না স্বপ্নটা বোঝার চেষ্টা করছি," টুপুর একটু কায়দা করে গলা ঝাড়ল, "তুই কি রিসেন্টলি কোনও ভয়ের সিনেমা দেখেছিস?"

"মোটেই না। আমি হরর মুভি দেখিই না।"

"তা হলে নির্ঘাৎ ঘোস্ট স্টোরি পড়েছিস? এবং বইয়ের পাতার ভূত তোর মগজে সেঁধিয়ে গিয়ে রোজ রাত্রে তোর ঘুমটাকে ডিস্টার্ব করছে।"

"অসম্ভব। আমি ভূতের গল্প, রহস্য গল্প সেই কবে থেকে পড়ছি, কখনও এরকম হয়নি তো।"

"আগে কিছু হয়নি বলে কোনওদিন কিছু হবে না, এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়।"

টুপুর বলল বটে, তবে নিজের কথা নিজের কানেই বড় ফাঁপা ঠেকল যেন। কপালে ভাল, টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। শালিনীকে ফেলে রেখেই ক্লাসের দিকে দৌড়ল টুপুর। অঙ্ক, ভূগোল, ইংরেজি একটি ক্লাসেও পড়ায় মন দিতে পারল না, শালিনীর বিদঘুটে স্বপ্নটাই দখল করেছে মস্তিষ্ক। কিছু যেন একটা অর্থ আছে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। এক স্বপ্ন বারবার ঘুরে আসছে, এটাও তো অস্বাভাবিক। বাড়িতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার একটা বই আছে, দেখেছে টুপুর। স্কুল থেকে ফিরেই বসে যাবে বইটা নিয়ে? নাকি অভিমান ভুলে একটা ফোন করবে মাসিকে?

কাল একটা কিছু জবাব তো দিতেই হবে শালিনীকে, নয় কি?

॥ ২ ॥

বাড়িতে ঢুকেই তো টুপুরের ভিরমি খাওয়ার দশা। মিতিনমাসি এসেছে আজ, সঙ্গে পার্থমেসোও হাজির। এ যে মেঘ না চাইতেই জল।

খাতা বইয়ের ব্যাগ ঘরে ছুড়ে দিয়েই লাফাতে-লাফাতে ফিরল টুপুর। মাসি আজকাল খোঁজ রাখছে না টুপুরের, সেই অভিমান ধুয়েমুছে সাফ। মাসির গা ঘেঁষে টুপুর বসেছে সোফায়, আহ্লাদী সুরে বলল, "তোমরা কতক্ষণ?"

মেসোই উত্তর দিল, "চারটের মধ্যেই ঢুকে যেতাম রে। নিরঞ্জনের মাংসের চপটা নিতে গিয়ে খানিক লেট হয়ে গেল।"

"শুধু চপ নাকি? আরও কত কী এনেছে। সন্দেশ, চমচম, সঙ্গে ডিমের ডেভিল," সহেলির গলায় ছদ্মবিরক্তি, "এই পাহাড়প্রমাণ খাবার কে খাবে? টুপুরের বাবা তো ভাজাভুজি আজকাল ছুঁয়েও দেখে না..."

"কিচ্ছু চিন্তা করিস না দিদি," এবার মিতিনের স্বর ফুটেছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "যে এনেছে, সে কি তোরা শেষ করবি তার তোয়াক্কা করে? একাই চপ-ডেভিলের শ্রাদ্ধ করবে এখন। তুই শুধু বসে-বসে দেখে যা।"

"এই আওয়াজ মেরো না তো," পার্থ মুচকি হাসল, "উত্তর কলকাতায় এলে এগুলো না খেয়ে ফেরে কোন বুরবক? আমাদের সাউথ কলকাতায় থোড়াই এসব সুখাদ্য মেলে।"

"তো আমাদের ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটটা তা হলে বেচে দিই?" মিতিন চোখ টিপল টুপুরকে। ঘুরে পার্থকে বলল, "হাতিবাগান, শ্যামবাজার, বাগবাজার কিংবা ধরো বেলগাছিয়া-পাইকপাড়ার দিকটায় চলে আসি, কী বলো?"

"যাহ, তাই হয় নাকি? আমাদের বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা সব্বাই তো সাউথেই থাকে, হুট করে তাদের ছেড়ে আসা যায় নাকি?"

"আসল কথাটা বলো না," মিতিন ফিকফিক করে হাসছে, "নর্থের ভিড়ভাট্টা তোমার পোষায় না। কিন্তু জিভটা তোমার উত্তরের খাবারের লোভে সদাই লকলক করে।"

"কী অপমানজনক মন্তব্য!" বিটকেল একটা ভ্রূকুটি করল পার্থ। পরক্ষণেই অম্লানবদনে বলল, "আমি অবশ্য গায়ে মাখছি না। কারণ, যেখানকার যেটা ভাল, সেটা গ্রহণ করতে কোনও দ্বিধা নেই। এটা তো মানতেই হবে কাটলেট, ডেভিল, চপ, কবিরাজি বানানোয় উত্তর কলকাতার একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এক-একটা দোকানের বয়স একশো- সোয়াশো বছর। এতদিন ধরে তারা নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করে একটা নিজস্ব গুণমান তৈরি করেছে। আমি তাদের সেই গুণটার কদর করছি মাত্র।"

"বেশি জ্ঞান মেরো না তো," মিতিন হালকা ধমক দিল পার্থকে। ঘুরে টুপুরের মাকে বলল, "চটপট ওকে থালা সাজিয়ে দে। নয়তো ও ভাট বকেই যাবে।"

সহেলি হাসতে-হাসতে চলে গেল রান্নাঘরে। সত্যিই দু'খানা প্লেট-বোঝাই চপ, ডেভিল, মিষ্টি এনে রাখল সেন্টার টেবিলে। সঙ্গে পেঁয়াজ, শশা, বিট আর মাস্টার্ড সস। 'খাও' শব্দটুকু শোনার তর সইল না পার্থর। হলুদ, ঝাঁঝালো সসে চপ ডুবিয়ে পেল্লাই কামড় বসাল একখানা। পরক্ষণে চোখ দু'খানা বুজে গেল। যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি জেগেছে। মুখ নাড়ছে অল্প-অল্প, জিভ যেন চপের পুরের প্রতিটা কণার স্বাদ নিচ্ছে তারিয়ে-তারিয়ে।

টুপুর হেসে ফেলল। ওহ, পেটুক বটে পার্থমেসো। মাসি বলে, মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে না, বাঁচার জন্য খায়। কিন্তু পার্থমেসোর খাওয়ার ভঙ্গিমাটি দেখলে মনে হয়, মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা বোধ হয় শুধু ভোজনেই।

পার্থ ভুরু নাচিয়ে টুপুরকে বলল, "কীরে তোল কিছু। আমার একা-একা খেতে লজ্জা করছে যে।"

টুপুর একখানা ডেভিল নিল প্লেট থেকে। নিরঞ্জন দোকানটা বানায় সলিড, আস্ত ডিম পোরা থাকে, গোটা একখানা ডেভিল খেলে পেট জয়ঢাক অনিবার্য। আধখানা ভেঙে পুরল মুখে, দু'আঙুলে মুদ্রা ফোটাল তারিফের। ঘাড় হেলিয়ে মিতিনমাসিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা নিশ্চয়ই কেবল খাবার কিনতেই আজ পেট্রল পুড়িয়ে এত দূর আসোনি?"

মিতিন ব্যঙ্গের সুরে বলল, "তোর তো দারুণ অবজার্ভেশন! তা হলে এবার বের করে ফ্যাল, কেন এসেছি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপুর বলল, "নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও তোমার কোনও ক্লায়েন্ট আছে? তাকে মিট করে তুমি এখানে..."

"নো, সেনোরিটা, ইউ আর রং। আমরা তোমাদের বাড়িতেই এসেছি। কারণটা ক্রমশ প্রকাশ্য। তার আগে বল তোর স্কুল কেমন চলছে?"

"সো-সো। তবে আজ একটা..." টুপুর থমকাল একটু। শালিনীর প্রসঙ্গটা তুলবে কি এখন? সামান্য দোনামোনা করে বলল, "স্কুলে আজ একটা আজব ঘটনা শুনলাম। একবার মনে হচ্ছে হাস্যকর, আবার কখনও মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় একটা রহস্যের ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পারে..."

"তোকেও কি মাসির রোগে ধরল?" পার্থ দ্বিতীয় চপ তুলল। তেরচা হেসে বলল, "তুই কি স্কুল থেকেই টিকটিকিগিরি ধরবি প্ল্যান আঁটছিস?"

টুপুর মিইয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, "না মানে... আমার এক ক্লাসমেট..."

"খুব বিপদে পড়েছে তো?" পার্থর হাসি চওড়া হল, "ওরে বুদ্ধু, বিপদ মানেই রহস্য নয়। আর অন্যের বিপদের সমাধান করার জন্য তুই স্কুলে যাস না, তুই যাস লেখাপড়া করতে।"

"তাই বলে বন্ধুকে হেল্প করব না?"

"সে তুই নোট দিয়ে হেল্প কর। বই দিয়ে সাহায্য কর। কাল্পনিক রহস্যের গন্ধ খুঁজে কেন সময়টা বরবাদ করবি?"

"আমিও তো সর্বদা সেই উপদেশই দিই, গ্রাহ্য করে মেয়ে?" এবার সহেলির গলা আছড়ে পড়ল, "স্কুলে গিয়েও তিনি সারাক্ষণ গোয়েন্দাগিরি করছেন। কোথায় কে কার সঙ্গে মিসবিহেভ করল, উনি চললেন তাকে শাসাতে। স্কুলের পেয়ারা গাছে কে পেয়ারা পাড়তে উঠবে? আর কে? ঐন্দ্রিলা। গত সপ্তাহে কতটা হাঁটু ছড়ে স্কুল থেকে ফিরেছিল, তোমরা যদি দেখতে? ওদিকে ক্লাসটেস্টের নম্বর দ্যাখ? কোনওটায় ফর্টি পারসেন্ট, কোনওটায় ফিফটি। সায়েন্সে কুড়িতে মাত্র তেরো পেয়েছে, ভাবতে পারিস?"

"আহ দিদি, ওর পিছনে ট্যাকট্যাক করিস না তো। ক্লাসটেস্টে যেমনই হোক, ফাইনাল এগজ্যামে ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। আফটার অল, ব্রেনটা তো টুপুরের খারাপ নয়। একটুআধটু দস্যিপনা না করলে ও লেবদুস বনে যাবে।"

"তুই ওকে আর তোল্লাই দিস না তো। এই আমি সাফ জানিয়ে রাখছি, যদি অ্যানুয়ালে ও ধ্যাড়ায়, মানে প্রথম তিনজনের মধ্যে না আসতে পারে, তা হলে তোমার সঙ্গে ল্যাংবোট হয়ে ঘোরা ওর খতম। শত কাকুতিমিনতি করলেও ওকে আমি ছাড়ব না।"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তাই হবে," দিদির শাসানির বহরে যেন ভারী মজা পেয়েছে মিতিন। দু'হাত তুলে সহেলিকে থামিয়ে টুপুরকে গলা নামিয়ে বলল, "কী হয়েছে স্কুলে?"

মাকে চোরা চোখে দেখে নিয়ে টুপুর উগরে দিল শালিনীর স্বপ্ন উপাখ্যান। মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিল মিতিন। একটু চুপ থেকে বলল, "কী যেন নাম বললি মারোয়াড়ি মেয়েটির?"

"শালিনী। শালিনী শেঠ।"

"শেঠ তো উপাধি। আসল পদবি কী?"

"মানে?"

"আশ্চর্য, এটাও বুঝলি না! শেঠ উপাধিটা ওঁরা কোনও সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু ওঁদের তো একটা বংশগত সারনেম থাকার কথা।"

"আছে হয়তো, জানা হয়নি।"

"ভেরি ব্যাড। তথ্য যখন নিবি, ডিটেলে কালেক্ট করবি।"

ধমক খেয়ে দমল না টুপুর। জোর গলায় বলল, "সবই জোগাড় করেছি। শুধু ওই ছোট্ট পয়েন্টখানা মিস করে গিয়েছি।"

"বটে। কী-কী পেয়েছিস তা হলে বল।"

"যেমন ধরো, শালিনীর বাবার নাম আকাশচাঁদ, মায়ের নাম গৌরী।"

"অপ্রয়োজনীয় তথ্য। আর?"

"শালিনীর কোনও ভাইবোন নেই। ওর ঠাকুরদা, ঠাকুরমাও বেঁচে নেই। ঠাকুরমাকে ও চোখেই দেখেনি। ঠাকুরদাও মারা গিয়েছেন খুব ছেলেবেলায়, তাঁকেও ওর মনে নেই। আগে ওরা থাকত নর্থ ক্যালকাটায়, মানিকতলার কাছে। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর-পরই শালিনীর বাবা উঠে এসেছিলেন দক্ষিণ কলকাতায়। এখন ওরা থাকে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে, একটা চোদ্দোতলা বাড়ির টেন্থ ফ্লোরে। শালিনীর জ্যাঠা এখনও সেই মানিকতলার বাড়িতেই বাস করছেন।"

"অর্থাৎ দুই ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছেন?"

"অনেকদিন।"

"হুম। তারপর?... কী করেন শালিনীর বাবা?"

"সফটওয়্যারের ব্যবসা। ওদের বাড়ির কাছেই। খুব রমরমা কারবার।"

"স্বপ্নটার কথা ও বাবা-মাকে বলেছে?"

"হ্যাঁ, তাঁরা নাকি খুব একটা পাত্তা দেননি।"

"তোরাই বা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?" খাওয়া থামিয়ে চোখ গোলগোল করে মাসি-বোনঝির বাক্যালাপ গিলছিল পার্থ, একটু সুযোগ মিলতেই নাক গলিয়ে দিয়েছে তৎক্ষণাৎ, "কেন যে রোজ একই অদ্ভুতুড়ে স্বপ্ন দেখছে, সেটার জন্যও কি গোয়েন্দাগিরি করতে হবে?"

"যে-কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার পিছনে একটা কিছু কারণ থাকে," মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "আর গোয়েন্দার দায়িত্ব সেই লুকনো কারণটা খোঁজা।"

"আরে, এখানে তো কিছুই ঘটেনি।"

"একই স্বপ্ন বারবার দেখাটাও একটা বিশেষ ঘটনা বই কী," মিতিন নিজের মতে অনড়। দৃঢ় স্বরে বলল, "স্বপ্ন আশমান থেকে টপকায় না স্যার। আমাদের নিত্যদিনের নানান ঘটনাই রূপ বদলে রাতের স্বপ্নে হানা দেয়। কখনও বা অবিকৃত চেহারাতেও আসে। কিন্তু প্রতি রাতে একভাবে ফিরে-ফিরে আসাটা অবশ্যই স্পেশাল মনোযোগ দাবি করে। হয়তো স্বপ্নটার মধ্যে লুকিয়ে আছে কোনও আসন্ন বিপদের সংকেত। শালিনী মেয়েটা মনে-মনে হয়তো..."

"ধুৎ, স্বপ্ন কি সর্বদা নিয়ম মেনে হয় নাকি? কত তুচ্ছ ব্যাপার থেকেও তো স্বপ্নের জন্ম হয়। স্বপ্ন তো অবচেতন মনের একটা মিক্সচার। হয়তো মেয়েটা পথেঘাটে একটা ভয় পাওয়ানো গোছের সামথিং দেখেছিল, সে বি কোনও কাপালিক বা তান্ত্রিক। তার ভাটার মতো চোখ কিংবা চুল ওর মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি করেছিল। তারই একটা ভাঙাচোরা চেহারা ওই স্বপ্নটার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।"

"হতেও পারে। কিন্তু কোনও অনুমানের মধ্যে তো ছেড়ে দিতে পারি না। সুতরাং স্বপ্নটার কার্যকারণ সূত্র মানছে কিনা সেটাও তো বাজিয়ে দেখতে হবে।"

"আমার ঘাট হয়েছে। আমাকে ক্ষ্যামা দাও," মজারু ভঙ্গিতে হাতজোড় করল পার্থ, "তোমাদের যা প্রাণ চায় করো, কিন্তু দরকারি কাজটা আগে সেরে নাও। নয়তো যে উদ্দেশ্যে আসা, সেটাই হয়তো ভুলে যাব।"

মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তুমিই বলো না।"

"ওকে," পার্থ ডেভিলের শেষটুকু চালান করে দিল মুখগহ্বরে। সহেলি চা এনেছে, পেয়ালা-পিরিচ হাতে তুলে নিয়ে বলল, "সহেলিদি, পুজোয় এবার স্পেশাল কোনও প্রোগ্রাম আছে নাকি আপনাদের?"

সহেলি জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "কই না তো। ওই কয়েকটা মণ্ডপে ঘোরা, আর বড়জোর এক-আধদিন কোনও ভাল রেস্তরাঁতে যাওয়া। তাও যদি টুপুরের গেঁতো বাবাটিকে নাড়াতে পারি। তিনি নির্ঘাৎ ওই সময়টিতেই ভারী-ভারী কেতাব খুলে বসার মতলব আঁটবেন।"

টুপুরের বাবা অবনী কলেজে পড়ান। তাঁর দু'টিই নেশা। দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের বই গেলা ও ঘুম। পুজোর ছুটিতে দুটোই যে তিনি পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে চাইবেন, এ তো বলাই বাহুল্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্থ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "এবার যদি অবনীদার সুখে ব্যাঘাত ঘটাই?"

"কীভাবে?"

"রাজস্থানে যদি একটা ট্রিপ করি?"

"ও. মা, রাজস্থান তো আমার স্বপ্ন!" সহেলি আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল, "কবে বেরব? ক'দিনের জন্য যাব? কোথায়-কোথায় ঘুরব?"

"ধীরে-ধীরে। একে-একে বলি তা হলে," মিতিনকে ঝলক দেখে নিয়ে পার্থ গলা ঝাড়ল, "লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন বিকেলে যাত্রা শুরু। প্রথমে দুরন্ত এক্সপ্রেসে নয়া দিল্লি। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে জয়পুর। কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদটা আমরা জয়পুরেই দেখব। তারপর যাব আজমেঢ়, পুষ্কর, যোধপুর, বিকানির, জয়সলমীর হয়ে মাউন্ট আবু। দেন উদয়পুর টক্ক অ্যান্ড চিতোরগড়। দুর্গ দেখার মাঝে টুক করে একটু জঙ্গল সাফারি। রণথম্ভোর ফরেস্ট। অবশেষে ভরতপুর পাখিরালয় ছুঁয়ে ব্যাক টু নিউ দিল্লি এবং রাজধানীতে চড়ে প্রত্যাবর্তন। মোট আঠারো দিন।"

টুপুরের উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। নাচতে ইচ্ছে করছিল টুপুরের। কল্পচক্ষে দেখতে পাচ্ছে দুর্গ, মরুভূমির উটের পাল। সোনালি বালি। রঙিন পাগড়ি পরা তাগড়াই লোকজন।

আচমকা মিতিনমাসির গলা, "শালিনীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করিস তো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাড়িতে নতুন কেউ এসেছে কিনা।"

আজব কৌতূহল তো! স্বপ্নটা তা হলে টানছে মাসিকে। কিন্তু কেন?

॥ ৩ ॥

পরদিন স্কুলে গিয়ে টুপুরের আক্কেল গুড়ুম। শালিনী যেন আচমকাই বদলে গিয়েছে। কাল তো মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি পটে গিয়েছিল টুপুরের। টিফিনের পর ক্লাসেও কথা বলছিল টুকটাক, ছুটির পরও কত গল্প করল...ই-মেল আইডি, মোবাইল নম্বর আদানপ্রদান সবই হল হাসিমুখে। কিন্তু আজ যেন টুপুরকে চিনতেই পারছে না শালিনী। নাকি চিনতে চাইছে না? চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। যেচে কথা বলা তো দূরস্থান, প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর।

হলটা কী শালিনীর? কাল গোটা টিফিনটা সাবড়ে দিয়েছিল বলে আর সে টুপুরের কাছাকাছি ঘেঁষতে রাজি নয়! নাকি স্বপ্নের ঘটনাটা পুরো গুলগাপ্পি। পাছে স্বপ্নটা নিয়ে টুপুর ফের জেরা শুরু করে এবং বানানো গল্পটি ধরা পড়ে যায়, তাই শালিনী দূরে-দূরে থাকছে? মিতিনমাসি একটা রহস্যের গন্ধ পর্যন্ত পেয়েছিল, একদিনে সবই চৌপাট হয়ে গেল?

কিন্তু টুপুর অত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। শেষ না দেখে সে ছাড়বেই না।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজতেই টুপুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল শালিনীর উপর। গেট পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই ধরেছে শালিনীকে। ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "তোর কেসটা কী রে? তুই কোনও কারণে আমার উপরে রাগ করেছিস?"

শালিনী সামান্য থতমত খেয়ে বলল, "কই, না তো।"

"তা হলে আমাকে আজ দেখতেই পাচ্ছিস না যে বড়?... জানিস, তোর স্বপ্নটা নিয়ে কাল আমি বাড়ি গিয়েও কত ভেবেছি, ইনফ্যাক্ট স্বপ্নটার কী অর্থ হতে পারে তাই নিয়ে আমি..."

"আহ, ঐন্দ্রিলা, থাক না," শালিনী থামিয়ে দিল টুপুরকে, "আমি এই জন্যই তোর থেকে তফাতে আছি।"

"মানে?"

"ওই স্বপ্নটা নিয়ে আর আলোচনার ইচ্ছেই নেই আমার।"

"কেন রে?"

"অত কৈফিয়ত দিতে পারব না," শালিনী এবার যেন একটু বিরক্ত, "ধরে নে, আমি কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখিইনি।"

"যাঃ বাবা, কাল যে তুই অত কিছু বললি?"

"ধর, আমি মজা করছিলাম..."

"উঁহু, তুই কাল খুবই সিরিয়াস ছিলি," টুপুর ভুরু কোঁচকাল, "হঠাৎ চেপে যেতে চাইছিস কেন?"

"আহ, ঐন্দ্রিলা আমায় বোর করিস না। আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন রে? স্বপ্নটা নিয়ে কিছু হয়েছে নাকি?"

শালিনী একটুক্ষণ নীরব। তারপর আচমকাই ফুঁপিয়ে উঠল, "আমায় কিচ্ছু জিজ্ঞেস করিস না, প্লিজ।"

টুপুর হতভম্ব। কী বলবে ভেবে পেল না। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শালিনী খপ করে টুপরের হাত চেপে ধরল। নাক টেনে বলল, "এই স্বপ্নটা নিয়ে বাড়িতে কাল খুব অশান্তি হয়েছে রে।"

"কীরকম?" টুপুর ফের কৌতূহলী।

"স্কুলে বন্ধুদের কাছে গল্প করেছি শুনে ছোড়দাদু খুব রাগ করলেন। বললেন, এতে নাকি আমার অমঙ্গল ঘটতে পারে। শুনে অমনি বাবাও..."

"দাঁড়া-দাঁড়া," টুপুর হাত তুলে শালিনীকে থামাল, "ছোড়দাদুর কথা তো কাল বলিসনি। উনিও কি তোদের বাড়িতে থাকেন?"

"না-না, উনি তো সবে গত রবিবার কলকাতায় এসেছেন।"

মিতিনমাসি কি এরকমই কারও আগমনের সম্ভাবনা আন্দাজ করেছিল কাল? কথাটা মনে হতেই টুপুর প্রশ্ন করে ফেলল, "উনি থাকেন কোথায়?"

"ওঁর কোনও ঠিকঠিকানা ছিল না। সন্ন্যাসী মানুষ, পথে-পথেই নাকি থাকতেন। আমার জন্মের ঢের আগেই তো উনি ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন রাজস্থানে এক আশ্রমে বাস করেন। রনকপুরে। কলকাতা ফিরলেন বোধ হয় টোয়েন্টি ইয়ার্স পরে।"

"ও। তা উনি বুঝলেন কী করে স্বপ্নটা অন্যদের বললে তোর ক্ষতি হতে পারে?"

"আমি কী করে বলব? বাবাও ওঁর কথা মেনে নিলেন যে," শালিনীর গলা ধরা-ধরা শোনাল, "ফেসবুকে স্বপ্নটা পোস্ট করেছিলাম তো, সেটা জানতে পেরে বাবা আরও রেগে গিয়েছিলেন। এখন বাবার কড়া হুকুম, আমি যেন স্বপ্নটা নিয়ে কারও সঙ্গে আর ডিসকাস না করি।"

টুপুর আহত স্বরে বলল, "অদ্ভুত হুকুম। একটা স্বপ্ন কী এমন হাতিঘোড়া যে, তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলা নিষেধ?"

"আমি জানি না রে। ছোড়দাদু বারণ করলেন বলেই হয়তো..." শালিনীর স্বর এবার যথেষ্ট করুণ, "অথচ কাল রাতেও আমি স্বপ্নটা দেখেছি।"

"তাই নাকি? একই স্বপ্ন?"

"ছাড়, ভুলে যা," শালিনী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, "ওই স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই হয়তো কোনওদিন হার্টফেল করে যাব। হয়তো সেটাই আমার নিয়তি।"

ভারী দুঃখী-দুঃখী দেখাল শালিনীর মুখখানা। স্কুলবাস হর্ন দিচ্ছে, বাসের পানে দৌড় দিল শালিনী। টুপুরের বাড়ি কাছেই। হাঁটতে শুরু করল মন্থর পায়ে। মেজাজটা যেন বিগড়ে গিয়েছে হঠাৎ। শালিনীর স্বপ্নটা নিয়ে আর এগনো যাবে না জেনে একটা অক্ষম ক্ষোভও জ্বালা ধরাচ্ছে বুকে। মিতিনমাসিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে টুপুরের উপর। ভাববে মেয়েটা অকম্মাই রয়ে গেল। পার্থমেসো অবশ্যি মজা পাবে খুব। মাসি-বোনঝি একসঙ্গে হতাশ হলে মেসো তো তালি বাজাবেই। বাড়ি এসে আর বেরতে ইচ্ছা করছিল না টুপুরের। সহেলি দইবড়া বানিয়েছেন দুপুরে। খুব একটা পছন্দের খাবার না হলেও নির্বিবাদে খেয়ে নিল আজ। এবার বাবার ল্যাপটপখানা খুলে বসলে হয়। মা-বাবাকে না জানিয়ে সম্প্রতি একটা ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে টুপুর। ছোট্ট একটা বন্ধুবৃত্ত তৈরি হয়েছে ফেসবুকে। বিকেলবেলাটাই তাদের সঙ্গে খানিক বৈদ্যুতিন গল্প আড্ডা চালানোর আদর্শ সময়।

ল্যাপটপ চালু করতে গিয়েও থমকাল টুপুর। শিয়রে সমন। কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাস টেস্ট আছে, ইতিহাসের। পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসিদের ভারতে আগমন, তাদের ব্যবসাবাণিজ্য, পলাশির যুদ্ধ এইসব নিয়েই পরীক্ষা। সাল, তারিখ, ঘটনাপ্রবাহ একদম স্মরণে থাকে না টুপুরের, বড্ড গুলিয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ধ্যাড়ায় পরীক্ষায়, মা তাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। মিতিনমাসির শাগরেদি করার যেটুকু যা ছাড় মেলে, তাও হয়তো জুটবে না আর। সুতরাং মানে-মানে বইপত্র খোলাটাই এখন বেশি জরুরি।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে সবে টুপুর পড়ার টেবিলে বসেছে, অমনি মোবাইল ফোনটা ঝনঝন। টুপুরদের স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া বারণ, তাই দিনভর বাড়িতেই পড়ে থাকে ফোনটা। এখন হঠাৎ সচল হল যে বড়? স্কুলের কেউ ডাকাডাকি করছে? শালিনীর সঙ্গে টুপুরের গুজগুজ নিয়ে কৌতূহল? নাকি পাড়ার কোনও বন্ধু?

মনিটরে দৃষ্টি পড়তেই ঈষৎ অস্বস্তি। মিতিনমাসি! কী বলবে এখন সে মাসিকে? একটু গলা ঝেড়ে টুপুর স্বর ফোটাল, "হ্যাঁ, বলো।"

"বলবি তো তুই, তোকে যা জানতে বলেছিলাম..."

"ওসব জেনেটেনে কোনও লাভ নেই গো মাসি। শালিনী স্বপ্নটাকে পুরো গিলে নিয়েছে বাড়ির লোকজনের গুঁতোয়।"

"আহ্, তোকে যা করতে বলেছিলাম সেটা করেছিস কি?"

মাসির গলায় উষ্মার আভাস। টুপুর চটপট শালিনীর ছোড়দাদুর উপাখ্যানটা শুনিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ড ওপ্রান্তে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর ফের মাসির কণ্ঠ, "আমার আন্দাজটা তা হলে ভুল নয়। গড়বড় একটা তা হলে সত্যিই আছে।"

"মানে?"

"এককথায় তো মানে বোঝানো যাবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, শালিনী তার বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে রাতে খাওয়ার সময়। সম্ভবত খেতে বসে উৎসাহ নিয়ে বলছিল, তখনই প্রথমে ওর ছোড়দাদু ওকে ধমকায় এবং তারপর ওর বাবা।"

টুপুর অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তুমি কী করে শিওর হচ্ছ?"

"কারণ শালিনী কাল সন্ধেবেলায় স্বপ্নটা পোস্ট করেছিল ফেসবুকে। তখন ঘড়িতে আটটা ছয়। রাত দশটার পর স্বপ্নটা ফেসবুক থেকে মোছা হয়েছে।"

টুপুরের গলা থেকে বিস্ময় ঠিকরে এল, "তুমি হঠাৎ শালিনীর ফেসবুকে গেলে কেন?"

"ওর স্বপ্নটা আমায় খুব হন্ট করছিল যে। তাই মনে হল মেয়েটার নেচারটা একটু স্টাডি করি।"

"কী বুঝলে ওর ফেসবুক ঘেঁটে?"

"মেয়েটা খুব চাপা ধরনের। খুব বাচ্চাবেলা থেকেই ওর মধ্যে একটা ভয় বাসা বেঁধে আছে। নিজের কোনও ফোটো দেয়নি ফেসবুকে, ওর বয়সি একটা মেয়ের ক্ষেত্রে যা রীতিমতো অস্বাভাবিক। বন্ধুর সংখ্যাটাও খুব কম, সেটাও ওর ফেসবুক করা নেচারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।"

"হ্যাঁ গো মাসি, মেয়েটা একটু আজব ধরনের। নইলে রোজ-রোজ এক স্বপ্ন দ্যাখে!"

"এবং এমন স্বপ্ন যেটা তার বাড়ির লোক জনসমক্ষে চাউর করতে রাজি নয়," মিতিনের স্বর সামান্য উত্তেজিত, "না রে টুপুর, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে পরিবারটায় কিছু গোপন ঘটনা আছে। ওই স্বপ্নটা তারই একটা মূল্যবান সূত্র।"

"... স্বপ্ন...সূত্র..." টুপুর বিড়বিড় করল, "কীভাবে?"

"সেম ড্রিম রিপিট হচ্ছে...অর্থাৎ মেয়েটার মনে এমন কোনও ছবি আঁকা আছে যেটা ফিরে-ফিরে আসছে। আর এটা ঘটছে ওই ছোড়দাদুর আবির্ভাবের পরেই। উঁহুঁ, দিস ইজ় নট কাকতালীয়।"

"কিন্তু মাসি আমরা এগোব কী করে? শালিনীর বাবা মোটেই আমাদের অ্যালাউ করবেন না।"

"তার জন্য উপায় ঢুঁড়তে হবে। তুই শুধু আপাতত শালিনীর উপর ওয়াচ রেখে যা।"

"কিন্তু তুমি..."

"পরে কথা হবে," টুপুরের প্রশ্নটা থামিয়ে দিল মিতিন। বলল, "কাজ আছে, রাখছি।"

এমন আচমকা ফোন কেটে দিল মাসি, টুপুর হতভম্ব। খুব গভীর চিন্তায় থাকলে মাসি এরকম করে দেখেছে টুপুর। কিন্তু চিন্তাটা যে কেন, সেটাই মগজে ঢুকছে না।

কী এমন আছে শালিনীর স্বপ্নটায়। স্মরণ করল টুপুর। একটা দানব টাইপ লোক শালিনীকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে! একটা লোক থেকে দুটো লোক!! দু'নম্বর লোকটি নাকি দেওয়ালে ঝোলে! কোত্থেকে একটা লাঠি বেরিয়ে আসে। তারপর লাঠি, দেওয়াল, গর্ত...এসবের মানে কী? তবে মিতিনমাসি কেসটা নেওয়ার জন্য যেভাবে উতলা হয়ে পড়েছে, নির্ঘাৎ একটা অর্থ বের করে ফেলেছে স্বপ্নটার। সেই অর্থটি অবশ্যই রোমাঞ্চকর। খামোকা মিতিনমাসির মগজের সঙ্গে পাল্লা টানার দরকার কী টুপুরের? কেসটা মিতিনমাসি টুপুরের মাধ্যমেই তো পাচ্ছে, সুতরাং টুপুর তো অনুসন্ধানে থাকবেই।

কিন্তু কী নিয়ে অনুসন্ধান, সেটাই তো ছাই আঁধারে। কোনও মানে হয়!

"ধুৎতেরি," বলে ল্যাপটপখানা অন করল টুপুর। ফেসবুকে গিয়ে দেখল দু'-তিনজন বন্ধু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে জানলায়। আড্ডা জুড়তে গিয়েও কী মনে করে খুঁজতে লাগল শালিনীকে। কী কাণ্ড, মিলছে না কেন? ভুস করে উবে গেল যে। শালিনীর বাবা কি মেয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তালা ঝুলিয়ে দিলেন? ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। বাবা ভদ্রলোকটি নিজে কি আছেন ফেসবুকে?

খুঁজতে না খুঁজতেই মিলেছে সন্ধান। হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে মজুত। আকাশচাঁদ শেঠ। প্রোফাইলটা তো রিটকেলে। শখ, পেশা কিছু দেননি আকাশ। তার বদলে রয়েছে একটা হেঁয়ালিমার্কা ঠিকুজি।

নাগৌর-পটনা-রাজমহল-মুর্শিদাবাদ-মহিমাপুর-ওংগঙ্গা।

হীরামানিক-ফতেস্বরূপ-ওংগঙ্গা। এটা কি কোনও পরিচয় হতে পারে? নাহ এই পাগল পরিবার নিয়ে মগজকে ট্যাক্স করে লাভ নেই। বরং ইতিহাস বইটা খুললে খানিকটা কাজ হয়।

ল্যাপটপকে ঘুম পাড়িয়ে এবার টুপুর পাঠে মনোযোগী। তারই মধ্যে টের পেল বাবা ফিরলেন কলেজ থেকে। ইতিহাসটা বাবার কাছে পড়তে মন্দ লাগে না খুব একটা। ঘটনার পর-ঘটনা এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন অবনী, পুরনো সময়টা যেন চোখের সামনে দেখতে পায় টুপুর। কিন্তু বিপদও আছে। কোর্স, সিলেবাসের কথা মাথায় থাকে না বাবার, ইতিহাসে ডুবে গিয়ে এক প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে যান আর-এক প্রসঙ্গে, তখন তাঁকে বইয়ের পাতায় ফেরানোই মুশকিল। এই তো গত সপ্তাহেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে পাড়ি দেওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন ইউরোপের ইতিহাসে, ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের যুদ্ধে। ভারত তখন অবনীর মন থেকে কোথায় হাওয়া।

তবু টুপুর বাবার কাছে যাওয়ার জন্য উশখুশ করছিল। পলাশীর যুদ্ধের বিশদ ইতিহাসটা মগজে পুরে নিতে পারলে হাফ-ইয়ার্লি, অ্যানুয়ালের প্রস্তুতিটাও হয়ে যাবে একবারে। উঠতে যাচ্ছিল টুপুর, আবার মোবাইল ঝনঝন এবং মিতিনমাসি।

টুপুর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ার আগেই মিতিনের নিরুত্তেজ স্বর, "সোমবার তোদের ছুটি আছে না? জন্মাষ্টমীর? শনিবার স্কুল থেকে ফিরে তৈরি থাকিস।"

"কেন গো? কোথাও যাবে নাকি?"

"মেসো তোকে এখানে নিয়ে আসবে। রোববার আমরা শালিনীর বাড়ি যাব।"

কত যে প্রশ্ন ভুসভুস করছে টুপুরের পেটে। কিন্তু গলার স্বর ফুটছে না কেন!

॥ ৪ ॥

বাড়িটার নাম 'সাদার্ন হাই'। রবীন্দ্র সরোবরের একেবারে সামনেই। গেটের সামনে সবুজ বুলেভার্ডশোভিত রাস্তার ধারে গাড়িখানা পার্ক করল মিতিন। ইশারা করল টুপুরকে, "আয় এবারে ঢুকেই পড়ি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপুরের বুক ধুকধুক করছিল। কাল স্কুলে পাখি পড়ার মতো করে বুঝিয়েছে শালিনীকে। বলেছে, "তোর কোনও চিন্তা নেই, আমার মাসি ভুলেও নিজে থেকে স্বপ্নের কথা তুলবে না। শুধু তোর বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেই চলে আসবে।"

টুপুর যে স্বপ্নটা শালিনীর মুখে শুনেছে, সেটা পর্যন্ত প্রকাশ হবে না, কথা দিয়েছে টুপুর।

অবশ্য মিতিনের যাওয়ার জুতসই একটা কারণ বানাতে হয়েছে। মাসিই তৈরি করে দিয়েছে গুছিয়ে। মিতিন আজ গোয়েন্দা নয়, একজন ইতিহাসবিদ। কলকাতার জৈনদের উপর গবেষণা করছে। ওই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে আকাশচাঁদের বাড়ি যাচ্ছে সে। শালিনীও তাই জানে। আকাশচাঁদও। মাসি যা ওস্তাদ অভিনেতা, স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় মানিয়ে নেবে। কিছুতেই ধরা পড়বে না। টুপুর স্থির নিশ্চিত।

তবু যে কেন নার্ভাসনেসটা কাটছে না। শালিনীকে ঠকাচ্ছে বলে? নাকি মাসির প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠাহর করে উঠতে পারছে না তাই? কাল মাসির বাড়িতে পা রাখার পর না হক পনেরো-ষোলো ঘণ্টা তো কেটেইছে, একবারও কি মাসি বলল স্বপ্নটায় কী রহস্য থাকতে পারে? পার্থ মেসো কত খ্যাপাল, তবু মাসির ঠোঁটে কুলুপ। কী যে হতে চলেছে বুঝতে না পারলে অস্বস্তি তো থাকবেই। উর্দিধারী রক্ষীর খাতায় নাম, ঠিকানা লিখে লিফটে চড়েছে মাসি-বোনঝি। দশতলায় বেরিয়ে সামনেই পিতলের নেমপ্লেট জ্বলজ্বল করছে, আকাশচাঁদ শেঠ।

আজ শাড়ি পরেছে মিতিন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কাচে পাওয়ার নেই বটে, কিন্তু ওই চশমার দৌলতে বেশ একটা অধ্যাপিকাসুলভ ব্যক্তিত্ব এসেছে মিতিনের চেহারায়। শাড়ির আঁচল গুছিয়ে মিতিন বেল টিপল। পাল্লা খুলে গিয়েছে। দরজায় এক বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক। ধবধবে ফরসা, মাঝারি হাইট। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। মাথার সামনের দিকটা প্রায় ফাঁকা। তবে স্বাস্থ্যটি ভারী মজবুত। একঝলক মিতিনকে দেখলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণে টুপুরকেও। তারপর স্মিত মুখে আহ্বান জানালেন দু'জনকে। বসিয়েছেন প্রকাণ্ড লিভিং রুমের নরম সোফায়। আলাপ সাঙ্গ হতেই বিনম্র স্বরে মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "একটু চা খাবেন তো দিদি, নাকি কফি?"

"কিছু না হলেও চলবে," মিতিন সহজ গলায় বলল, "আপনি ব্যস্ত মানুষ। বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। কাজের কথাটুকু সেরেই চলে যাব।"

"তা বললে চলে," আকাশ জোরে-জোরে ঘাড় নাড়লেন, "আপনি আমার মেয়ের বান্ধবীর মাসি। একটু অতিথি সৎকারের সুযোগ তো দিতেই হবে।"

"বেশ, তা হলে কফিই হোক। তবে শুধুই কফি, দুধ-চিনি ছাড়া।"

"আমারও ঠিক ওটাই পছন্দ," টুপুরের দিকে ফিরলেন আকাশ, "আর তুমি? দুধ খেতে পার। ওই দ্রব্যটি আমাদের বাড়িতে অঢেল পরিমাণে মজুত থাকে।"

দুধের নাম শুনলেই গা গুলিয়ে ওঠে টুপুরের। ঢোক গিলে টুপুর বলল, "পেট ভর্তি, একটু ঠান্ডা জল পেলেই যথেষ্ট।"

"আমরা তো ঠান্ডা জল রাখি না," আকাশকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল, "ঠান্ডা জলে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় তো, তাই পারতপক্ষে..."

"জানি," মিতিন মৃদু হাসল, "আপনারা সাধ্যমতো প্রাণীহত্যা এড়িয়ে চলেন। জৈন ধর্মে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অহিংসাকে সব থেকে বেশি মান্যতা দেওয়া হয়।"

"আপনি তো জানবেন বটেই। আমাদের ধর্ম নিয়েই তো আপনি..." আকাশ একমুহূর্ত থামলেন। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "তবে আমি খুব ধার্মিক মানুষ নই। আজকালকার দিনে যেটুকু মানা সম্ভব, সেইটুকুই কোনওমতে পালন করি।"

টুপুর অনেকক্ষণ ধরেই ছটফট করছিল। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের দেওয়াল দেখার ছলে উঁকি দিচ্ছিল আকাশচাঁদের অন্দরমহলে। থাকতে না পেরে বলেই ফেলল আচমকা, "শালিনী কোথায়? ও বেরোচ্ছে না কেন?"

"শালিনী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"সে কী? কাল দুপুরে স্কুল ছুটির সময়েও তো ও ঠিক ছিল। বলল, কাল এখানে এলে আমার সঙ্গে কত গল্প করবে।"

"ও কাল সন্ধে থেকেই কাহিল। শেষ শ্রাবণের কড়া রোদ্দুরে ভাজা-ভাজা হয়ে ফিরল। ফিরেই ঘরে এসি চালিয়েছিল। ব্যস, ঠান্ডা লেগে গিয়েছে।"

"একবার কি ওকে দেখে আসব?"

"উপায় নেই, রাত থেকেই ধুম জ্বর। এখন ও ঘুমোচ্ছে।"

টুপুর বেজায় হতাশ। শালিনীর সঙ্গে মাসির যদি দেখাই না হয়, তা হলে আজ আসাটাই তো বৃথা। যাঃ, সকালটাই মাটি হল আজ। পার্থমেসো খুব খ্যাপাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মাসির কোনও হেলদোল নেই। দিব্যি কথা শুরু করে দিয়েছে আকাশচাঁদের সঙ্গে। হাসি-হাসি মুখে বলছে, "আপনার বাংলাটি ভারী চমৎকার।"

"স্বাভাবিক। সাত-আট পুরুষ বাংলায় আছি," আকাশচাঁদের স্বরে গর্ব ঝরে পড়ল, "আমাদের এক পূর্বপুরুষ পটনা ছেড়ে ঢাকা হয়ে মুর্শিদাবাদে বসবাস শুরু করেন। তারপর তো আমরা আর আমাদের আদি বাসস্থানে ফিরিইনি।"

"পটনা থেকে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম কি হীরানন্দ শাহ?"

"কেন বলুন তো?" আকাশ ঈষৎ থমকেছেন, "তাঁর নাম জেনে কী লাভ?"

"আমি একটা হিসেব মেলাতে চাইছি," মিতিন টানটান হয়ে বসল, "আপনাদের আদি বাসস্থান কি রাজস্থানের ওসনগরে? আপনারা কি জাতে ওসওয়াল?"

"ঠিক, একদম ঠিক। চুরাশি ঘর মারোয়াড়ি বণিকের মধ্যে আমরাই ছিলাম অগ্রগণ্য। তবে এখন আমরা বাঙালিই হয়ে গিয়েছি।"

"হুম। দু'য়ে-দু'য়ে চারই হচ্ছে।"

"কীভাবে?"

"আমার ডেটা অনুযায়ী বিখ্যাত বণিক জগৎ শেঠদের কোনও বংশধর এই শহরেই বাস করছেন," মিতিন আকাশচাঁদের চোখে চোখ রাখল, "এবং অনুমান যদি ভুল না হয়, আপনি ওই জগৎ শেঠ পরিবারেরই একজন।"

পলকের জন্য চোখজোড়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশচাঁদের। পরক্ষণেই যেন নিভে গেল মণিদুটো। ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, "থাক না প্রসঙ্গটা। আমরা কি অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি না?"

মিতিনের ভুরুতে পলকা ভাঁজ, "আপত্তির কারণটা জানতে পারি?"

"কবে ঘি খেয়েছি এখনও তার ঢেকুর তুলব, এ আমার ভাল লাগে না ম্যাডাম," আকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, "একটু বসুন। আমি কফির বন্দোবস্তটা সেরে আসি।" বলেই দ্রুত এল শেপের লিভিং রুমটা ছেড়ে অন্দরে মিলিয়ে গেলেন আকাশ।

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "মূল কথাটা তো আসছেই না মাসি। স্বপ্ন, রহস্য সব ভোঁ ভাঁ হয়ে গেল নাকি?"

মিতিন নিরুত্তর। নির্বিকার। ভাবলেশহীন মুখে দেখছে হলখানা। দূরে দেওয়ালে গাঁথা শ্বেতপাথরের ছোট্ট সিংহাসনে কোন এক ঠাকুরের মূর্তি। পদ্মাসনে বসা দুধসাদা মূর্তিটার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সম্ভবত দামি কোনও পাথর। একদৃষ্টে সেইদিকেই তাকিয়ে আছে মিতিন। মূর্তির একপাশের দেওয়ালে একটা বাঁধানো ফোটো। গোঁফওয়ালা, টাকমাথা এক প্রৌঢ়। মিতিন ছবিটাও দেখছে যেন।

ফিরেছেন আকাশচাঁদ। সামান্য কাঠ-কাঠ স্বরে বললেন, "আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার জৈন সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন না? যতটুকু যা জানি, অবশ্যই বলব।"

মিতিন একটু চিন্তা করে বলল, "তথ্য জোগাড় করাটা তো আমার লক্ষ্য নয়। ইন্টারনেট ঘাঁটলেই তো ভুরি-ভুরি ইনফরমেশন মিলবে। আসলে আমি কলকাতার জৈনদের একটু অন্য ভাবে জানতে চাই। তাদের পারিবারিক কাঠামো, কীভাবে সেটা বদলাচ্ছে কিংবা আদৌ বদলাচ্ছে কিনা, রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশের জৈনদের সঙ্গে তাদের কতটা ফারাক, এইসব আমার গবেষণার বিষয়। তার জন্য আমি এক-একটা জৈন পরিবার বেছে তাদের পরিবারের কাহিনি বিশদে নোট ডাউন করছি। আমি তাদের নাম, পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখব, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি।"

একটু যেন সহজ হলেন আকাশচাঁদ, "আমি তো আপনাকে হেল্পই করতে চাই।" হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইলটা সেন্টার টেবিলে রেখে মিতিন সোফায় হেলান দিয়ে বলল, "কলকাতায় আপনাদের অরিজিনাল বাড়ি কোথায়?"

"উত্তর কলকাতায়। মানিকতলার কাছে গৌরীবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে..."

"আমি চিনি। আপনাদের পরেশনাথের মন্দিরটা তো ওখানেই।"

"পরেশনাথ মন্দিরের খুব কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। অনেকদিনের পুরনো, তা অন্তত দেড়শো বছর তো হবেই।"

"অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ পুরুষ আগের। তখন আপনারা যৌথ পরিবারে ছিলেন নিশ্চয়ই। এখন তো পরিবার টুকরো-টুকরো। বাকিরা কোথায়-কোথায় ছড়িয়ে আছেন?"

"এক-দু'জন চলে গিয়েছেন রাজস্থানে। নাগৌরে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ, লালগোলার দিকে থাকেন কয়েকজন। কেউ বা কলকাতাতেও আছেন।"

"কলকাতার কোথায়?"

"ওই পরেশনাথ মন্দিরের কাছে। বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট। আমাদের পুরনো বাড়িতে।"

"ও। তার মানে বাড়িটা এখনও আছে?"

"ভেরি মাচ। দোতলাটা অবশ্য পুরো ভেঙে রেনোভেট করেছিলেন আমার পিতাজি। সেও প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমার ছেলেবেলায়।"

"ও। তা এখন সেখানে থাকেন কে? আপনার নিকটাত্মীয় কেউ?"

"খুবই আপনজন। আমার বড় ভাই। মানে আমার দাদা।"

"আপনারা দুই ভাই পৃথক হয়ে গিয়েছেন বুঝি?"

"অনেকদিন। আমার মেয়ে তখন বছরখানেকের। সে এখন থার্টিন প্লাস।"

মধ্যবয়সি এক কাজের লোক মিতিনের কফি এনেছে। সঙ্গে বড় প্লেটভর্তি কাজু-কিশমিশ। পাশে গ্লাসে কী এক পানীয়। আকাশচাঁদের অনুরোধে টুপুরকে গিলতে হল পানীয়টা। স্বাদটা অবশ্য মন্দ নয়, দুধের মধ্যে সম্ভবত পেস্তা-বাদামবাটা মিশিয়ে বানানো। তবু ওই দুধ আছে বলেই পেটটা যেন কেমন কিরকির করছে। তাড়াতাড়ি একমুঠো কাজু মুখে পুরে দিল টুপুর।

মিতিন কালোবরণ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। কাপটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ বলল, "যদি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, জবাব মিলবে কি?"

"আগে প্রশ্নটা শুনি!"

"বারো-তেরো বছর আগে আপনার বয়স ছিল বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ। আপনার মেয়ে তখন প্রায় কোলে। ওই রকম একটা সময়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে আলাদা হওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিশেষত আপনাদের মারোয়াড়ি সমাজে," মিতিন অল্প ঝুঁকল, "দাদা-ভাইয়ে একেবারেই বনিবনা ছিল না বুঝি।"

"আমরা একেবারেই অন্য ধরনের মানুষ। দাদা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, ভীষণ রক্ষণশীল ধরনের। সেই ছোটবেলা থেকেই। বাবা যদ্দিন ছিলেন, কোনও রকমে মানিয়ে চলেছি। উনি গত হওয়ার পর আর একত্র বাস সম্ভব হয়নি।"

"এই ফ্ল্যাটখানা কিনে উঠে এসেছিলেন? নাকি এটি পরে কেনা?"

"কোনওটাই নয়। ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন আমার বাবা। অ্যাসেট হিসেবে। ভাল দাম পেলে বেচে দেবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। দাদা আর আমি আপসে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে ফেলি। দাদা আমাদের পুরনো বাড়িটা নেয়, আমি পাই সাদার্ন হাইয়ের এই অ্যাপার্টমেন্ট।"

টুপুরের অসহ্য লাগছিল। মাসির এই একঘেয়ে প্রশ্নমালার কোনও মাথামুন্ডুই খুঁজে পাচ্ছিল না। আকাশচাঁদের পারিবারিক সম্পত্তির খবর জেনে লাভ আছে কোনও? অবশ্য মাসির মনের গতিপথ ঠাহর করা অসম্ভব। উদ্দেশ্য একটা আছে হয়তো, পরে বোঝা যাবে। তখন হয়তো মনে হবে মাসির মতো ভাবতে শেখা কতটা জরুরি।

একই খাতে চলেছে মিতিনের জিজ্ঞাসা, "আপনার দাদা তা হলে গোটা বাড়িটাই পেয়ে গেলেন? সঙ্গে অনেকটা জমিও আছে নিশ্চয়ই?"

"তা আছে। প্রায় এক বিঘা মতো," আকাশচাঁদের ঠোঁটে আবছা ধূর্ত হাসি, "কিন্তু বাড়িটা মেনরোড থেকে অনেকটা ভিতরে। সামনের রাস্তা তেমন চওড়া নয়, সুতরাং প্রোমোটার ছোঁবে কিনা সন্দেহ। ঘরগুলো পেল্লাই-পেল্লাই, ইয়া-ইয়া থাম আছে এককাঁড়ি, বিশাল-বিশাল দরজা-জানলা, ওসব মেনটেন করা কি কম ঝকমারি? তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া কী?" মিতিনের স্বরে একটু ব্যগ্রতা ফুটল, "কোনও বখেড়া আছে বুঝি?"

"ঠিক তা নয়। তবে মালিক তো দাদা একা নয়। ভাগীদার আছে," আকাশচাঁদ মুচকি হাসলেন, "সেই ভাগীদার এসেও গিয়েছে।"

"মানে?"

"জমিবাড়ির মালিক তো ছিল দু'জন। আমার বাবা আর কাকা। কাকা বহুকাল আগে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই বাবা, তারপর দাদা, বাড়িটা একাই ভোগ করছিলেন। কিন্তু গত সপ্তাহে সেই কাকা ফিরে এসেছেন। উনি নিজের অংশ হিসেবে একতলাটা

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

সমরেন্দ্রনাথ মোদক প্রণীত **স্কুল অ্যাটলাস**

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সংগ্রহে রাখার মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় বই

এছাড়া লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

একাদশ আধুনিক ভূগোল (XI) | দ্বাদশ আধুনিক ভূগোল (XII) | ব্যবহারিক ভূগোল (XI) | ব্যবহারিক ভূগোল (XII)

গৌতম বসু প্রণীত **সভ্যতা ও স্বদেশ** (IX, X, XI, XII)

একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ

রাজেন্দ্রনাথ গিরি প্রণীত **সহজ কম্পিউটার** (V, VI, VII, VIII)

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (XI, XII)

M/S. KUNDU GRAND SONS

Publishers & Book-Sellers

10/2B, RAMANATH MAJUMDER STREET, KOLKATA-700009 | Ph : (033) 2241-6563, 6500-6678

চাইছেন। এখন কী সব নাকি করবেন," আকাশচাঁদের হাসি চওড়া হল, "দাদা এখন মহা ক্ষিপ্ত। রোজ দু'বেলা আমার উপর চোটপাট করছে।"

"কেন? আপনি কী দোষ করেছেন?"

"কাকা এসে প্রথমে আমার বাড়িতেই উঠেছিল যে। দাদা তাই ভেবে নিয়েছে..." হঠাৎ আকাশচাঁদের স্বর থেমে গেল। চোখ সরু করে বললেন, "জৈনদের নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এই সব তথ্যও কি আপনার কাজে লাগবে?"

"না-না, আপনি গল্পের মতো করে বলছিলেন, শুনতে বেশ লাগছিল," মিতিনের ঠোঁটে অমায়িক হাসি, "বাই দ্য বাই, আপনারা তো শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন, তাই তো?"

"হ্যাঁ। কলকাতার বেশির ভাগ জৈনই শ্বেতাম্বর। এখানে দিগম্বর সম্প্রদায় অনেক কম।"

"আপনারা সকলেই কি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন?"

"মোটামুটি। তবে অনেকেই তো আজকাল উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, তারা চাকরিবাকরিও করছে। আমাদের মধ্যে ডাক্তার, অ্যাডভোকেটও কম নেই। আমার মেয়েকেই তো ভাবছি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানাব, যাতে ও আমার ব্যবসাটা দেখতে পারে।"

"আপনিও কি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার?"

"নট অ্যাট অল। আমি টেনেটুনে বি কম। কম্পিউটার ছিল আমার নেশা। নিজে-নিজেই শিখে এক্সপার্ট হয়েছি। আগে একা-একাই ওয়েব ডিজ়াইন করতাম। এখন ওই লাইনেই কারবার ফেঁদে বসেছি। বাপ-ঠাকুরদার মতো শেয়ার মার্কেটে আমার আগ্রহ নেই।"

"আপনার দাদা বুঝি শেয়ার লাইনেই?"

"হুঁ।"

"ওঁকে আপনি গোঁড়া বললেন কেন? উনি বুঝি খুব ধর্ম-ধর্ম করেন?"

"সেটা এমন কিছু খারাপ কাজ নয়। দাদার অনেক অন্ধবিশ্বাস আছে। যেমন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেলে নাকি ধর্ম নষ্ট হয়, সন্ধের পর কিছু খাওয়া মানেই প্রাণীহত্যার সম্ভাবনা... জানেন আমার ভাবিজিকে প্রায় চিকিৎসা না করেই মেরে ফেলল। সাধে কি আমার ভাইপো বিদেশ পালিয়ে বেঁচেছে," আবার হোঁচট খেলেন আকাশচাঁদ। ঈষৎ বিরক্ত সুরে বললেন, "আপনি বারবার আমার পারসোনাল ব্যাপারে ঢুকে পড়ছেন কেন বলুন তো?"

"যাঃ বাবা, আপনি তো নিজে থেকেই বলছেন," মিতিন মৃদু হেসে মোবাইলটা তুলে সময় দেখল, "আজ তা হলে চলি। দরকার পড়লে আবার যোগাযোগ করব।"

আকাশচাঁদ অল্প ঘাড় নাড়লেন। মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার কাকার সঙ্গে আলাপ হলে ভাল লাগত। তা তিনি তো বোধ হয় এখন এ বাড়িতে নেই..."

"কাকা কোনও বাড়িতেই নেই। উনি আছেন জৈন ধর্মশালায়। বড়বাজারে।"

"ওখানে গিয়েই ওঁর সঙ্গে দেখা করেন?"

"উনিও আসেন। প্রায় রোজই।"

"আপনি কাকার কথা খুব মেনে চলেন, তাই না?"

আচমকা একটা বেলাইনের প্রশ্নে আকাশচাঁদ কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। টুপুরও কম অবাক হয়নি। কী যে বলতে চায় মিতিনমাসি!

॥ ৫ ॥

দুপুরে মাসির বাড়ির খাওয়াটা মোটেই জমল না টুপুরের। আয়োজন অবশ্য মন্দ ছিল না। ঢাকুরিয়া বাজার থেকে একটা সোয়া কিলো ইলিশ মাছ এনেছিল মেসো। মাসির হাতে ট্রেনিং পাওয়া আরতিদি ভাপা ইলিশটা রেঁধেও ছিল আজ দারুণ। মাছের ডিম আর তেলের স্বাদটাও ছিল মনোহরণ। কিন্তু টুপুরের মুখে রুচলে তো। এমনকী, শেষপাতে সুরেশের অতি সুমধুর রাবড়ি পর্যন্ত জিভে পানসে ঠেকল। মন ভাল না থাকলে যা হয় আর কী। ফুচকাও তো তখন উচ্ছে। শালিনীর বাড়িতে বেইজ্জত হওয়াটা টুপুর কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে। হ্যাঁ, বেইজ্জতই তো। আকাশচাঁদ যাই বলুন, শালিনীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়াটা অপমান হিসেবেই দেখছে টুপুর। মাসি সেই অপমানটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। গোদের উপর বিষফোঁড়া, শালিনীর বাবার সঙ্গে কেন যে অতক্ষণ ধরে হাবিজাবি বকল, সেটা পর্যন্ত টুপুরের কাছে ঝেড়ে কাশছে না। তা হলে মাসির বাড়িতে টুপুরের আর পড়ে থাকার দরকার আছে কি? বরং মেসোকে বললেই হয়, আজ বিকেলেই তাকে হাতিবাগানে পৌঁছে দিয়ে আসুক। বুধবার ম্যাথ্সের ক্লাসটেস্ট, কাল জন্মাষ্টমীর দিনটা না হয় পাটিগণিত-বীজগণিত কষেই কাটাবে।

কথাটা বলতেই ঘুমন্ত বুমবুমকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল টুপুর। দরজা পর্যন্তও যায়নি, মেসোর গলা শুনে পা আটকে গেল।

পার্থমেসো বলছে, "তুমি তা হলে শিওর, আকাশচাঁদ জগৎ শেঠদের বংশধর?"

মিতিনমাসির স্বর উড়ে এল, "টু হানড্রেড পারসেন্ট।"

"কিন্তু পরিচয় গোপন রাখতে চায় কেন?"

"রাখেনি তো। ভদ্রলোকের ফেসবুক প্রোফাইল তো বলেই দিচ্ছে উনি কে?"

"হাউ?"

"নাগৌর-পটনা-রাজমহল-মুর্শিদাবাদ-মহিমাপুরওংগঙ্গা...হিরা-মানিক-ফতে-আনন্দ-মহতাব-স্বরূপ-ওংগঙ্গা। এটাই তো যথেষ্ট।"

"হাউ?"

"হাউহাউ কোরো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। রাজস্থানের এক মরুদ্যান শহর নাগৌর। সেখান থেকে জৈন বণিক হীরানন্দ শাহ এসেছিলেন পটনায়। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে। হীরানন্দের ছেলে মানিকচন্দ পটনা থেকে এলেন বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকা রাজমহলে। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হয়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদে, মানিকচাঁদও তার পিছু-পিছু সেখানে হাজির। ঝানু ব্যবসায়ী মানিকচাঁদের কারবার ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তরে। বেনারস, ইলাহাবাদ, কোরা, জাহানাবাদ, আগ্রা ছাড়িয়ে সেই দিল্লি পর্যন্ত। বাদশাহ ফারুকশিয়ার তাঁকে দেন শেঠ খেতাব।"

"পরে সেটাই হয়ে যায় জগৎ শেঠ, তাই তো?"

"আজ্ঞে না স্যার। দিল্লিতে একটা বড় আকাল হয়েছিল। তখন বাদশাহর হয়ে অজস্র লোককে হুন্ডিতে টাকা ধার দিয়েছিলেন শেঠ মানিকচাঁদের দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ। খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে দিলেন জগৎ শেঠ উপাধি। বংশটার নামই হয়ে গেল জগৎ শেঠ। ওঁদের মতো টাকা তখন গোটা ভারতে একজন বণিকেরও ছিল না। ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ কোম্পানিগুলোও তখন ধারের জন্য জগৎ শেঠের কাছে এসে হাত কচলাত। মুর্শিদাবাদের কাছে মহিমাপুরে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে বাস করতেন জগৎশেঠরা, ধনদৌলত তখন ও বাড়িতে উপচে পড়ত।"

"অ। সেইজন্য মহিমাপুর। কিন্তু ওংগঙ্গা কেন?"

"ওর পরেই সব ফুড়ুৎ হয়ে গেল কিনা। হয়তো সেটা বোঝাতেই..." মিতিন একটু থেমে আচমকা গলা ওঠাল, "দরজার ওপারে কেন, এখানেই চলে আয়।"

টুপুর পলক থতমত, তারপর পরদা সরিয়ে মাসির ড্রয়িংরুমে ঢুকেছে। গোমড়া গলায় বলল, "ভাবলাম তোমাদের জ্ঞানচর্চায় বিঘ্ন ঘটবে, তাই..."

"আড়াল থেকে তোমাদের কথা গিলছিলাম, তাই তো?" মিতিনের ঠোঁটে মুচকি হাসি, "তোকে একটা বেসিক টিপ্স দিই। আড়ি পেতে যখন কিছু শুনবি, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকবি। পরদার ওপারে দাঁড়িয়ে আছিস, অথচ পা দু'খানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনটা যেন আর না হয়।"

টুপুর মনে-মনে জিভ কাটল। মুখে অবশ্য বলল, "ওসব শিখে আমার কী হবে? তুমি তো আমায় অ্যাসিস্ট্যান্ট করছ না?"

AMARBOI.COM

"কী যুক্তিতে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলি?"

"তোমার অ্যাটিটিউডেই বোঝা যায়। তুমি আমার সঙ্গে কিছু আলোচনাই করতে চাইছ না।"

"খুব চটেছিস, অ্যাঁ," মিতিন শব্দ করে হেসে উঠল, "ওরে বোকা, আমি তোকে নিজের মতো করে ভাবনা করার সময় দিলাম। যাতে তোর মনে রহস্যটা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠে আসে। ঘটনাপ্রবাহের অস্বাভাবিক অংশগুলো তোর নজরে পড়ে।"

"আমি তো তেমন কিছু দেখছি না। একমাত্র শালিনীকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া।"

"কেন লুকিয়ে রাখলেন বলে তোর মনে হয়?"

"যাতে ওই উদ্ভট স্বপ্নটা নিয়ে কোনও কথা না ওঠে।"

"এমনটা আকাশচাঁদ ভাববেন কেন? আমি তো গিয়েছি অন্য প্রয়োজনে।"

"হয়তো শালিনী আগেই টুপুরের নামটা বাবাকে বলেছিল। কিংবা তোমরা যাবে শুনে জেরা করে শালিনীর মুখ থেকে জেনে গিয়েছেন, ঐন্দ্রিলা নামের মেয়েটা ওই ব্যাড ড্রিমটি সম্পর্কে অবহিত।" টুপুরের বদলে পার্থই যুক্তি খাড়া করল, "হয়তো উনি ভেবেছেন, শালিনী সামনে এলে ঐন্দ্রিলা, আই মিন টুপুর, হয়তো প্রসঙ্গটা তুলে বসতে পারে।"

"তো?"

"তাই টু বি অন দ্য সেফ সাইড, উনি শালিনীকে আড়ালে..."

"দাঁড়াও-দাঁড়াও, স্বপ্নটার একটা বিপদ ঘটার মতো সাইডও আছে তা হলে?"

"থাকতেও পারে। অন্তত শালিনীর বাবা তাই মনে করেন। শালিনীর দাদুটিও।"

"আমি তো সেই সাইডটাই খুঁজছি মশাই। আর সে ব্যাপারে ওই দাদুটির কী ভূমিকা, সেটাও আমাকে জানতে হবে।"

"কিন্তু কেন?" টুপুর অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "এখানে তো কোনও ক্রাইমটাইমের ব্যাপার নেই মাসি।"

"শুধু অপরাধ আর ক্রিমিনালের সন্ধান করাই কি আমার থার্ড আইয়ের কাজ? যে-কোনও রহস্যের জট খোলাই তো তৃতীয় নয়নের লক্ষ্য," মিতিনের হাসি-হাসি মুখে পলকা ছায়া, "তা ছাড়া শিগগিরি একটা অপরাধ ঘটবে কিনা, সে সম্পর্কেও তো নিশ্চিত হতে চাই। কারণ, বিপদে যে পড়তে পারে, সে এক অতি নিরীহ বালিকা।"

টুপুর আশঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি শালিনীর কথা বলছ?"

"অবশ্যই। স্বপ্নটা সে দেখেছে যে এবং এখনও দেখছে। নিশ্চয়ই অকারণে নয়।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোল। দেওয়াল ঘড়িটা দেখল এক ঝলক। আঙুল তুলে টুপুরকে বলল, "এই সময়টায় শালিনী সম্ভবত একা আছে। ওকে একটা মেসেজ কর তো।"

"কী লিখব?"

"বেশি কিছু নয়। লুকিয়ে ফোন কর, ভেরি আর্জেন্ট।"

"যদি উত্তর না আসে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, আসবে।"

"ধরো এলো, কী বলব?"

"সেটা তুই আমার উপর ছেড়ে দে। কথা তো বলব আমি।"

সন্দিগ্ধ চোখে মাসিকে দেখতে-দেখতে ঘর থেকে মোবাইলটা নিয়ে এল টুপুর। টুকটুক বোতাম টিপে রাখল পাশে। হৃৎপিন্ডে লাবডুব। এই বুঝি বেজে উঠল।

মিতিন হাসছে, "অত টেনশন করিস না। ওর একটু সময় লাগবে," বলেই পার্থর দিকে ফিরেছে। সহজ গলায় বলল, "আমাদের যেন কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?"

পার্থর চোখ পিটপিট। একটু মাথা চুলকে বলল, "জগৎ শেঠ?"

"হ্যাঁ, জগৎ শেঠ। ওঁদের ধনরত্ন নিয়ে তো গল্পগাছা কম নেই। ব্যবসা শুরু নিয়েও উপাখ্যান আছে। হীরানন্দ শাহ নাকি পটনা এসেছিলেন প্রায় শূন্যহাতে। একদিন ঘুরতে-ঘুরতে পটনার কাছে এক জঙ্গলে ঢুকে দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হীরানন্দ, হঠাৎ ঘুম ভাঙে এক আর্তনাদ শুনে। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে দ্যাখেন, কাছেই এক ভাঙাচোরা প্রাসাদ, তার অন্দরে এক অসুস্থ বুড়ো লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। হীরানন্দ সেই বৃদ্ধের খুব সেবাশুশ্রূষা করেন। কিন্তু বুড়ো লোকটি বাঁচেননি। তাঁর সৎকার করার পর হীরানন্দ আবিষ্কার করেন, বিপুল টাকাপয়সা রেখে গিয়েছেন ভদ্রলোক।"

"বুঝেছি। সেই টাকা খাটিয়েই জগৎ শেঠদের রমরমা," পার্থ ঘাড় দোলাল। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের কপালে যে কেন এমন জোটে না?"

"সরি, তুমি ওই টাকা পেলে দু'মাসে উড়িয়ে দিতে স্রেফ খেয়ে-খেয়ে," মিতিন মুখ বেঁকাল, "হীরানন্দ কী করেছিলেন জান? গোটা টাকাটা একবারে নেননি। যতটুকুনি দরকার, শুধু ততটুকুনই নিয়ে যেতেন। খেপে-খেপে এসে।"

"যাই হোক, পরের টাকায় শেঠ বনায় কৃতিত্ব নেই।"

"অন্যের টাকার জোরে ওঁরা শেঠ হননি। ব্যবসাবুদ্ধির জোরে ওঁরা ধনী হয়েছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদে ট্যাঁকশাল ছিল, সেখানে নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করা হত নবাবের। ওঁরা ছিলেন তার কর্তা। নবাবের গোটা টাকাপয়সার জগৎটাই ছিল ওঁদের মুঠোয়। কত ধনসম্পদ ছিল ওঁদের বাড়িতে জান?"

"দশ লাখ? বিশ লাখ? পঞ্চাশ লাখ?"

"ওভাবে হিসেব হবেই না। চার সিন্দুক বোঝাই রৌপ্যমুদ্রা মজুত থাকত সর্বদা। এছাড়া ছিল দু' সিন্দুক সোনার মোহর। আরও চার সিন্দুক সোনা, রুপোর বাট, সিন্দুকভর্তি হিরে-জহরত। প্লাস, রাশি-রাশি মুক্তো। প্লাস চুনি দিয়ে তৈরি একটা লক্ষ্মীমূর্তি, জৈনগুরু ভগবান পার্শ্বনাথের একখানা স্ট্যাচু, পান্না দিয়ে তৈরি।"

"যাঃ মাসি। তুমি কিন্তু বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলছ, "টুপুর না বলে পারল না। অবিশ্বাসী সুরে বলল, "এত কিছু কারও থাকে নাকি?"

"সত্যিই ছিল রে। শুধু তাই নয়, মাত্র দু' পুরুষেই এই সম্পত্তি তৈরি করে ছিলেন জগৎ শেঠরা। নবাব, বিদেশি বণিক, দেশি জমিদার সকলে ছিল ওঁদের কৃপাপ্রার্থী। তবে বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ফতেচাঁদের নাতি মহতাপচাঁদ পর্যন্ত জলুস ছিল, তারপর থেকেই পতন, শুধু পতন।"

"ঠিক হয়েছে," টুপুর চোখ ঘোরাল, "ওই জগৎ শেঠই না সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে চক্রান্তের মূল পান্ডা।"

"হুম, অর্থবল ওঁরই সবচেয়ে বেশি ছিল কিনা। ইংরেজরা যে সিরাজকে হটিয়ে একদিন দেশটার রাজা হয়ে বসবে, আর সেই সঙ্গে তাঁদেরও কপাল পুড়বে, এতটা ওঁরা অনুমান করতে পারেননি। মিরকাশিম তো ওঁদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। মহতাপ আর তাঁর ভাই স্বরূপ, দু'জনকেই উনি মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন।"

"ইজ ইট?" পার্থর গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "জান খতম! ওই জন্যই ওংগঙ্গা!"

"ইয়েস, " মিতিন মাথা নাড়ল, "মহতাপচাঁদের ছেলে খুশলচাঁদ জগৎ শেঠ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোমরের জোর ভেঙে গিয়েছিল। আর দু'-তিন পুরুষ পর থেকেই তো ইংরেজের হাততোলা হয়ে জীবনধারণ। মাসোহারা মিলত যৎসামান্য, সেই টাকায়।"

"তুমি এত জানলে কোত্থেকে মাসি?" টুপুর কৌতূহলী, "ইন্টারনেট ঘেঁটে?"

"নো মাদমোয়াজেল। তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য সোর্স।"

"সেটা কী?"

"কী নয়? কে," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসছে, "সোর্সটা অবশ্য ডিক্লেয়ার করব না।"

"কেন?" পার্থ মুখ বেঁকাল, "সোর্স গোপন রাখাই বুঝি টিকটিকি সমাজে আইন?"

টুপুরও একটু ফুট কাটতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাশে রাখা মোবাইল সরব। মনিটরে শালিনীর নাম। বাটন টিপতে গিয়েও থমকাল টুপুর। নার্ভাস মুখে বলল, "ও মাসি, তুমি ধরবে না, আমি?"

"আমাকেই দে," মিতিন মোবাইলটা নিয়ে কানে চাপল। ফোনের মাইক্রোফোন চালু করে বলল, "হ্যালো, আমি শালিনীর সঙ্গে কথা বলছি তো?"

ওপারে ক্ষীণকণ্ঠ, শোনাই যাচ্ছে না প্রায়, "হ্যাঁ রে। আমি খুব সরি রে।"

"আমি ঐন্দ্রিলা নই শালিনী। আমি ঐন্দ্রিলার মাসি। মিতিনের গলা ভারী নরম, "সকালে আমিই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

সাড়াশব্দ নেই, মিতিন প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তুমি এখন কোথায়?"

এবার অস্পষ্ট গলা শোনা গেল, "আমাদের ফ্লোরের করিডরে।"

"বাবা বাড়ি নেই?"

"জাস্ট নাও বেরিয়ে গেলেন। বড়ে তাউজি, মানে আলোকচাঁদ আঙ্কেলের সঙ্গে।"

"উনি আজ এসেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। অনেকদিন পর," শালিনীর অস্ফুট স্বর, "কিন্তু আপনি কেন ফোন করছেন?"

"আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো," মিতিনের স্বর সামান্য উঠছে, "আমি ইতিহাসের গবেষক নই, মনের গলিঘুঁজি ঘাঁটি। তোমার স্বপ্নটার মানে খুঁজছি।"

ওপ্রান্ত আবার চুপ। মিতিন একটু সময় নিয়ে বলল, "ভয় পেও না শালিনী। তুমি কি সত্যিই জানতে চাও, কেন দেখছ স্বপ্নটা?"

"চাই তো। কিন্তু..."

"এতে কোনও কিন্তু নেই শালিনী। ভয়টা পাচ্ছ তুমি, কষ্টটাও তো তোমারই হচ্ছে," মিতিনের গলায় স্নেহ, "দ্যাখো মেয়ে, তুমিও নিশ্চয়ই মন থেকে ভয়টাকে উপড়ে ফেলতে চাও, নয় কি?"

"হ্যাঁ চাই তো," একটু যেন সপ্রতিভ হয়েছে শালিনী।

"তা হলে যা-যা প্রশ্ন করব, মনে করে জবাব দাও তো। স্বপ্নটা প্রথম কবে দেখলে?"

"লাস্ট মানডে। না-না লাস্ট সানডে।"

"সেদিন কোনও স্পেশাল ইভেন্ট? তোমার ছোড়দাদু কি..."

"হ্যাঁ, সানডে সন্ধেবেলাতেই উনি আমাদের বাড়ি এলেন।"

"তুমি কি আগে কখনও ওঁকে দেখেছিলে?"

"না তবে অনেক গল্প শুনেছি।"

"কীরকম? একটা-দুটো গল্প কি শুনতে পারি?"

"উনি নাকি লেখাপড়ায় খুব ব্রাইট ছিলেন। একবার যা পড়তেন তাই নাকি ওঁর মেমারিতে রয়ে যেত। অনেক ভাষা জানতেন। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ছাড়া সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু, জার্মান... উনি নাকি পাস্ট, প্রেজেন্ট সব দেখতে পান।"

"কে বলেছেন এসব?"

"বাবা। উনি ছোটা দাদাজিকে খুব রেসপেক্ট করেন।"

"ওর সঙ্গে তোমার বাবার যোগাযোগ আছে বুঝি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আছে তো। এভরি ইয়ার বাবা একবার ওঁর আশ্রমে যান। রাজস্থানে।"

"তুমি কখনও সেখানে যাওনি? আই মিন, তোমার বাবা নিয়ে যাননি তোমাকে?"

"না। উনি নাকি ফ্যামিলির লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে চান না।"

টুপুরের অবাক লাগছিল। কোনও জড়তা নেই, বেশ টকটক কথা বলছে শালিনী। মিতিনমাসি কি ভোজবাজিতে শালিনীর জড়তা কাটিয়ে দিল?

মিতিনমাসি জিজ্ঞেস করছে, "তা হঠাৎ উনি কলকাতায় চলে এলেন যে বড়?"

"বাবাই বোধ হয় কী এক জরুরি কারণে ওঁকে ডেকেছেন।"

"হুম। তো ছোটা দাদাজিকে দেখার জন্য, তুমি খুব এক্সসাইটেড ছিলে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, ছিলাম তো। অত স্টোরি শুনেছি, তিনি নিজে আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন..."

"সেদিন দাদাজি আসার পর কী-কী হল, একটু গুছিয়ে বলো তো।"

"দাদাজিকে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এলেন বাবা। আমি, মা, সবাই ওঁকে প্রণাম করলাম। মা কত কী বানিয়েছিলেন, উনি কিছু খেলেন না। একটা পুরনো বই ছিল ওঁর কাছে। বাবা আর উনি ওইটা খুলে কী সব কথা বলতে লাগলেন।"

"তোমার সঙ্গে কথা বলেননি?"

"হ্যাঁ। আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প বললেন। আমি শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে খাওয়ার জন্য মা যখন ডাকল, আহিরচাঁদজি চলে গিয়েছেন।"

"আর আসেননি উনি?"

"রোজ আসছেন। কাল রাতেও..."

আচমকা কুট করে কেটে গেল লাইনটা। টুপুর হাঁ। পার্থর ভুরু জড়ো।

মোবাইলটা নাড়াচাড়া করছে মিতিন। দৃষ্টি জানলার ওপারে। কী ভাবছে মাসি।

॥ ৬ ॥

সন্ধে নেমেছে কলকাতায়। দুপুর থেকেই আকাশে আজ মেঘেদের ঘনঘটা, কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। হাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বিচ্ছিরি গুমোটে, প্যাচপ্যাচে গরমে, মানুষজনের প্রাণ যায়-যায় দশা।

টুপুরও ছটফট করছিল। শুধু গরমে নয়, টেনশনেও আবার ফোনটা তুলে রিং করল শালিনীকে। উঁহু, আবার সেই সুইচড অফ ঘোষণা। নাহ, ব্যাপারটা খুব খারাপ। মেয়েটাকে নতুন করে কেন যে জড়িয়ে দিল মাসি? ধরা তো পড়েছেই, ফ্ল্যাটের বাইরে এসে ফোন করার জন্য জোর বকুনিও খেয়েছে নির্ঘাত। স্বপ্নটা নিয়ে কেন যে এত কুস্তি লড়ছে মাসি?

টুপুর ঘরে ফের উঁকি দিল। এখনও বুমবুমকে হোমটাস্ক করাচ্ছে মাসি। ওকে পার্থমেসো একমনে একটা আদ্যিকালের পুরনো ফুটবল ম্যাচ দেখছে টিভিতে। আশ্চর্য, কারও কোনও তাপউত্তাপ নেই। ওই ঘটনার পরেও দিব্যি নাচতে-নাচতে মাটন রোল নিয়ে এল মেসো, টুপুরকে গপগপ করে তা খেতে হল। এদিকে যে টুপুর বন্ধুর চিন্তায় কত কাতর, তা কেউ বুঝতেই পারছে না।

মেসোর পাশে গিয়ে ধপাস করে বসল টুপুর। গুমগুমে গলায় বলল, "আমার বন্ধুটার যে কী হল, কে জানে!"

"কী আবার হবে?" পার্থ তেমন একটা আমল দিল না। হালকা ভাবে বলল, "বরং পেটের কথা বেশ খানিকটা উগরে দিতে পেরে সে হয়তো অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। তোর মাসি তাকে কত ভরসা দিল।"

"কিন্তু যেভাবে ফোনটা কেটে গেল..."

"তার একাধিক কারণ থাকতে পারে। হয়তো তক্ষুনি ওর ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল কিংবা সার্ভিস-প্রোভাইডার কোম্পানিটির হয়তো ঠিক ওই মুহূর্তে সার্ভার বসে গেল।"

"কিন্তু তারপর থেকেই ফোন সুইচড অফ থাকবে কেন?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে সে বাবার আদেশমতো ফোনটি বন্ধ করে রেখেছে," পার্থ ঝুঁকল সামান্য, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁরে, তোর মাসির মাথাটা একেবারে গিয়েছে, তাই না?"

টুপুর সতর্ক স্বরে বলল, "হুঁ, মাসিকে স্বপ্নের কথাটা বলাই গোক্ষুরি হয়েছে।"

"হাতে এখন কেসটেস নেই তো, তাই জোর করে কেস বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে," পার্থ চোখ টিপল, "ভাব তুই, একটা স্বপ্নকে ধরে তার মধ্যে জগৎ শেঠ পরিবারকে এনে খানিক উত্তেজনার আগুন পোহানো ছাড়া আর কোনও লাভ আছে? কাল রাত্রে আমিও তো স্বপ্ন দেখেছি, আমি একটা নদীতে ডুবে যাচ্ছি, সেখানে গ্লেসিয়ারের মতো রাবড়ির মোটা-মোটা সর ভাসছে..."

"যাঃ, তুমি বানিয়ে বলছ..."

"নারে, সত্যি। আমি একটা সরের উপর উঠেছি, অমনি সরটা ডুবতে শুরু করল, আমি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছি, কিন্তু গলায় আওয়াজ নেই..."

"তারপর উঠে বসে ঢকঢক করে জল খেলে, বিছানা থেকে নেমে ডাইনিংয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুললে," মিতিন দরজায়, সেখান থেকেই টুপুরকে বলল, "তোর মেসোকে জিজ্ঞেস কর তো, ফ্রিজের রাবড়ির ভাঁড়টা তখনই অর্ধেক করেছিল কিনা?"

পার্থ ঘাড় চুলকোচ্ছে, "তখন তুমি জেগে ছিলে বুঝি?"

"আজ্ঞে না। তোমার অভ্যেস আর কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে মেলালাম," মিতিন সোফায় এসে বসল, মোলায়েম সুরে বলল, "শালিনীর স্বপ্নটাও আমি ওভাবেই স্টাডি করছি মশাই।"

"টাইমপাস হিসেবে মন্দ কী!" পার্থর স্বরে বিদ্রুপ। রাতদুপুরে চুরি

AMARBOI.COM

ধরা পড়ে যাওয়ার ঝাল মেটাতে টকটক গলায় বলল, "শেষে কিন্তু অশ্বডিম্ব মিলবেই।"

মিতিন একটুও চটল না। হাসিমুখেই বলল, "আমাকে কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে?"

পার্থ টিভি অফ করে সিধে হয়ে বসল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "লেট মি ট্রাই।"

"যে সংসারত্যাগী মানুষটা আত্মীয়স্বজনদের দেখতে চান না, তিনি হঠাৎ উড়ে এলেন কলকাতায়। হ্যাঁ, উড়ে। ট্রেনে চেপে নয়। খরচের কথা এক্ষুনি ধরছি না। কিন্তু এত তাড়া কিসের?"

"শালিনী তো বলল, আকাশচাঁদ ওঁকে ডেকে এনেছেন।"

"ডাকতেই উনি চলে এলেন? যিনি বিশ বছর কলকাতার ছায়া মাড়ান না? এসেই চামড়া বাঁধানো কিতাব খুলে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দুই জৈন? যাঁদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী? তারপরই নাতনিকে গল্প শোনাতে এগিয়ে এলেন, যে নাতনির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই নেই? গল্পটা কী নিয়ে তা জানি না। কিন্তু সেই গল্প শুনে সন্ধেবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল শালিনী। আর সেই রাত থেকেই শুরু হল মেয়েটার দুঃস্বপ্ন।"

"ওটা কাকতালীয়। অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে মেলাচ্ছ কেন?"

"মানতাম। যদি স্বপ্নটা গোপন রাখার জন্য আকাশচাঁদ আর আহিরচাঁদ মরিয়া হয়ে না উঠতেন। এমন স্বপ্ন যা রোজ রিপিট হয়। ঘটনাটা কি খুব স্বাভাবিক?"

পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঢোক গিলে পার্থ বলল, "দুনিয়ায় রোজ অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। তার মানে এই নয় যে, পিছনে সর্বদাই একটা ক্রাইম হচ্ছে, বা হতে চলেছে।"

"এখানে কিছু একটা ঘটবেই, ইন ফ্যাক্ট হয়তো অলরেডি ঘটে গিয়েছে।"

"কী করে বলছ?" পার্থর স্বরে ফের ব্যঙ্গ, "তুমি কি জ্যোতিষচর্চা শুরু করেছ?"

"নো। জগৎ শেঠদের ইতিহাস যা বলছে..."

"অ্যাই বেশি বোকো না তো," পার্থর গলা সামান্য চড়ে গেল, "জগৎ শেঠদের হিস্ট্রি আমার ঘাঁটা হয়ে গিয়েছে। আকাশচাঁদ, শালিনীরা আদৌ জগৎ শেঠই নয়।"

"বটে," মুচকি হাসল মিতিন। বুমবুম ঘর থেকে বেরিয়ে জুলজুল চোখে বন্ধ টিভির দিকে তাকাচ্ছিল, তাকে কার্টুন চ্যানেল চালিয়ে দিয়ে সোফায় বাবু হয়ে বসে বলল, "তা কী জেনেছ একটু শেয়ার করা যাক।"

"তুমি তখন যে খুশলচাঁদের কথা বলছিলে, তিনি ছিলেন বেজায় খরুচে। জৈন মন্দির বানিয়ে আর দানধ্যান করেই জগৎ শেঠদের সম্পত্তি প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিলেন। এমন হাল হয়েছিল, ইংরেজদের কাছে মাসখরচ চাইতে শুরু করেন। বছরে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিল ইংরেজ, নেননি খুশলচাঁদ। কারণ, তাঁর মাসিক খরচই ছিল একলাখ টাকা।"

"বলো কী?" টুপুরের চোখ কপালে,"তখনকার একলাখ মানে তো এখনকার কোটি টাকার সমান।"

"তার চেয়েও ঢের-ঢের বেশি। ওই টাকা উড়িয়েই তো ফৌত হয়েছিলেন," পার্থর ঠোঁটে তেরচা হাসি, "খুশলচাঁদের পর এলেন হারাকচাঁদ, তারপর ইন্দ্রচাঁদ, দেন গোবিন্দচাঁদ। তিনিও ছিলেন টাকা ওড়ানোর মাস্টার। জগৎ শেঠদের যেখানে যা সম্পত্তি ছিল, সব বেচেবুচে দিয়ে তাঁর প্রায় নাঙ্গা ফকিরের দশা। মাত্র বারোশো টাকা ভিক্ষে দিত ইংরেজরা, শেষে সংসার চালাতে তাই নিতেন হাত পেতে। তিনি মারা যেতে মাসোহারা গেল তাঁর খুড়তুতো ভাই কিষনচাঁদের হাতে, টাকার পরিমাণ তখন আটশো। তার আবার এক ভাগীদার জুটল গোপালচাঁদ, ওই টাকা থেকে তিনশো চলে গেল তার গব্বায়। ভাব তুই?"

"হুঁ," টুপুর মাথা দোলালো, "খুবই করুণ।"

"আরও আছে। গোপালের পর নামকাওয়াস্তে জগৎ শেঠ হলেন গোলাপচাঁদ, আঠারোশো সাতানব্বইয়ের ভূমিকম্পে তাঁদের মহিমাপুরের বাড়ি, মন্দির সব ধূলিসাৎ। ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে আবার বাড়িটাড়ি হল বটে, কিন্তু তখন জগৎ শেঠ পরিচয় দিলে লোকজন হাসে।"

"যেমন কর্ম তেমনি ফল। সিরাজদৌল্লার সঙ্গে বেইমানি করে ইংরেজকে রাজা বানানোর উচিত শাস্তি।"

"সবাই তাই বলে। নিয়তিই নাকি সাজা দিয়েছে বংশটাকে। ...যাই হোক গোলাপচাঁদের ছেলে দ্বিতীয় ফতেচাঁদেরও মৃত্যু ঘটেছে বছরপঞ্চাশ আগে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে," পার্থ ঘাড় বেঁকিয়ে মিতিনের দিকে তাকাল, "আমার ফান্ডায় কিছু ভুল আছে?"

"নাঃ, মোটামুটি কারেক্ট।"

"ভাঙবে, তবু মচকাবে না। এবার এটুকু তো মানবে, দেড়শো বছর আগে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটে যাঁরা বাড়ি বানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও ভাবেই জগৎ শেঠ নন।"

"সরি। মানা গেল না।"

"কেন-কেন-কেন?"

কারণ, এত খেটেখুটে তুমি শুধু ইতিহাসের অর্ধেকটা জেনেছ। আকাশচাঁদ শেঠদের পরিবারটা আছে ইতিহাসের বাকি অর্ধেকটায়। বলতে পার চাঁদের উলটো পিঠে।"

"বুঝলাম না," পার্থর চোখ পিটপিট। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "কোনও আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবে না তো?"

"উঁহু," মিতিন হাসতে-হাসতে বলল, "জান কি, খুশলচাঁদের এক ভাই ছিল। উদয়চাঁদ। তাঁর বংশধররা জগৎ শেঠ উপাধি পাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁরাও তো ওই পরিবারের অংশ। জগৎ শেঠ বলে তাঁরা পরিচয় দেন না, কিন্তু ওই বংশের সৌভাগ্যের ভাগ তাঁরাও পেয়েছেন। এমনকী, জগৎ শেঠদের কিছু-কিছু বিশেষ সম্পদ এঁদের কাছে গচ্ছিত রয়ে গিয়েছে।"

"তোমায় কে বলল এটা?" পার্থ শ্লেষের সুরে বলল, "তোমার সেই সোর্স?"

"ধরো তাই। অনেক দলিলদস্তাবেজ ঘেঁটে তিনি জানাচ্ছেন, মূল জগৎ শেঠ পরিবার যখন ক্রমশ ডুবছে, এঁদের রমরমা তখন হু হু করে বেড়েছে। মূলধন কোথা থেকে পেয়েছিলেন সেটাই রহস্য। সেই বিষয়ে অবশ্য নানান জনশ্রুতি আছে। কোথাও বলা হচ্ছে, জগৎ শেঠদের অনেক লুকনো সোনাদানা এঁদের হাতে এসে গিয়েছিল, কোথাও বা বলা হয়েছে..."

"তোমার গল্পে আমি নট ইন্টারেস্টেড। যদি কোনও বিশ্বাসযোগ্য ডকুমেন্ট থাকে তো বলো, নয়তো মুখে কুলুপ আঁটো।"

গোমড়া গলায় কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে পার্থ কার্টুনে মন দিয়েছে। মিতিন ভুরু কুঁচকে নখ খুঁটছে। একবার মোবাইলটা হাতে নিয়েও রেখে দিল। উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল একটু, আবার এসে বসল সোফায়। বোঝাই যায়, মনের মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণিপাক চলছে। কিন্তু কী নিয়ে? পার্থমেসোর জন্য লাগসই উত্তর খুঁজছে মিতিনমাসি? নাকি শালিনীকে নিয়ে এতক্ষণে ভাবিত হয়েছে মাসি?

টুপুর বুঝতে পারছিল না। মাসিকে প্রশ্ন করতেও মন থেকে সাড়া পাচ্ছে না। অগত্যা টিভিতেই চোখ রাখল। কার্টুনের প্রোগ্রামটা শেষ হল, বিজ্ঞাপন স্টার্ট। রিমোটে খেলার চ্যানেলে গেল মেসো। সেখানে এখন গল্ফ। পাশের চ্যানেলে বাস্কেটবল। পছন্দের খেলা না হলে আঙুল স্থির থাকে না মেসোর। ঘুরে এবার খবরের চ্যানেল। কোথায় যেন কী একটা চুরি হয়েছে, শুভ্রবসন সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ অভিযোগ জানাচ্ছেন বুমধারী সাংবাদিককে। পার্থমেসো ফের চ্যানেল ঘোরাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠল মাসি, "আহ্, থামো না। খবরটা একটু দেখি।"

থমকেছে পার্থ। কয়েক সেকেন্ড পরে তারও চোখ গোলগোল এবং টুপুরেরও। অভিযোগকারী ভদ্রলোকের নাম আহিরচাঁদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালিনীর ছোড়দাদুর নামও তো তাই। তিনিই নন তো।

হ্যাঁ তিনিই। চুরিটা হয়েছে বড়বাজারের জৈন ধর্মশালায়। আহিরচাঁদের কক্ষে। বিকেলে বেরিয়ে কাছেই একটা জৈন মন্দিরে গিয়েছিলেন আহিরচাঁদ, ফিরে দেখেন দরজা খোলা। ঘরে একটি বহুমূল্য ভগবান পার্শ্বনাথের মূর্তি ছিল। সেটি গায়েব। মূর্তিটি নাকি হাজার বছরের পুরনো, চোখের মণিদুটো পান্নার। পুলিশ এসে অকুস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছে একটু আগে। জোরকদমে নেমে পড়েছে তদন্তে। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

কয়েক সেকেন্ড ঘরে অখণ্ড নীরবতা। তারপরই পার্থর গলাই বেজে উঠল সবার আগে, "কী হল ব্যাপারটা? হঠাৎ একটা মূর্তি চুরি হয়ে গেল?"

টুপুর বলল, "অত দামি মূর্তি ওঁর কাছে এল কীভাবে?"

পার্থ বলল, "ওই জৈন ধর্মশালা আমি চিনি। যথেষ্ট ভদ্রসভ্য জায়গা। উটকো লোক তো ওখানে এন্ট্রি পায় না।"

টুপুর বলল, "আমার মনে হচ্ছে, ওই ধর্মশালার কোনও স্টাফ জড়িত। আগেই দেখে রেখেছিল, তক্কে-তক্কে ছিল। আজ সুযোগ মিলতেই হাপিস করে দিয়েছে।"

পার্থ বলল, "হুঁ, ওদের কাছে তো রুম-কি থাকেই।"

টুপুর বলল, "কী গেরো বলো তো, সেই কোন রনকপুর থেকে এসে কলকাতায় মূর্তিটা খোয়ালেন। কলকাতার বদনাম হয়ে গেল!"

চুপচাপ শুনছিল মিতিন, হঠাৎ ঝেঁজে উঠল, "তোদের বোকা-বোকা গবেষণাগুলো থামাবি? বুঝতে পারছিস না কমপ্লেন্টটায় গড়বড় আছে?"

টুপুর ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, "কেন?"

"আহিরচাঁদ একজন সন্ন্যাসী। তাঁর কাছে পার্শ্বনাথের বিগ্রহ হারানোটাই মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হওয়া উচিত। উনি কিন্তু বারবার সাংবাদিককে মূর্তির দামটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন।"

"হয়তো পুলিশের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছেন," পার্থ বলল, "দামি জিনিস হলে তবেই না পুলিশের টনক নড়ে।"

"উঁহু, আমি আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি।" মিতিন মোবাইল ফোন হাতে নিল। একটা নম্বর টিপে চাপল কানে, "অনিশ্চয়দা, জৈন ধর্মশালার মূর্তিচুরির কেসটা দেখছিলাম। খুব সিম্পল নয়। আমি আপনাদের সঙ্গে...হ্যাঁ, আমি পারসোনালি আগ্রহী..."

কী কাণ্ড। খোদ ডি সি ডি ডি অনিশ্চয় মজুমদারকে ফোন! স্বপ্ন আর চুরি...কোনও সম্পর্ক আছে নাকি।

॥ ৭ ॥

সকাল হতে না-হতেই মিতিনের ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ। টুপুরকে ডাকাডাকির বালাই নেই, ঘুম থেকে উঠেই কোথায় না-কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরেই বুমবুমকে বিছানা ছাড়াল, সে মুখ ধুতে না-ধুতেই তার হাতে ধরিয়ে দিল দুধের গ্লাস। ঝটাঝট ফোন করল বেশ কয়েকখানা, স্মার্টফোনে নিবিষ্ট হয়ে ঘাঁটল কী যেন, তারই মধ্যে আরতিকে জলখাবার তৈরি করার তাড়া লাগাচ্ছে। টুপুর আর পার্থকে তৈরি হয়ে নিতে বলল চটপট, কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে একচোট ধমক খেল পার্থ। ফ্রেঞ্চটোস্ট আর কফি শেষ হতেই সে সালোয়ার-কামিজ পরে প্রস্তুত, পার্থকে গাড়ি বের করতে বলে আবার কাকে যেন ফোন করছে।

মাসির এই ব্যস্ত রূপটা টুপুরের দারুণ প্রিয়। বুঝতে পারে মাসির মগজটা এখন প্রবল সক্রিয়, নিজের মস্তিষ্কের সঙ্গে তাল রাখতেই বেজায় ছটফট করছে মাসি। মনে-মনে একটা কিছু আঁচ করে নিয়েছে, এবার শুধু ধাপে-ধাপে সেটাই মেলানোর পালা। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই, জবাব মিলবে না, সুতরাং নীরবে মাসির কাজকর্ম দেখে যাওয়াই ভাল।

অবশ্য তাড়াহুড়োর ফাঁকে সকালের খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে টুপুর। জৈন ধর্মশালার চুরির ঘটনাটা মোটামুটি ফলাও করেই বেরিয়েছে। চুরি যাওয়া পার্শ্ব[illegible]

~ www.amarboi.com ~

প্রায় দেড় কেজি, দু'চোখে দু'খানা পান্না বসানো আছে, তার দামও নেহাত কম নয়। তা ছাড়া বেশ প্রাচীন বলে একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে মূর্তিটার। পুলিশ যথেষ্ট তৎপর, কালই ধর্মশালার এক কর্মচারীকে সম্ভাব্য চোর হিসেবে গ্রেফতার করেছে। তবে মূর্তিটার কোনও হদিশ মেলেনি এখনও।

বুমবুমেরও আজ স্কুল বন্ধ। জন্মাষ্টমীর ছুটি। তাকে অঙ্ক করতে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুর আগেই গাড়িতে, পার্থমেসোর পাশে।

পার্থ স্টার্ট দিল গাড়িতে। নীরবে চালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোনও ব্যাপারেই যেন তার আগ্রহ নেই। গাড়ি গলি ছেড়ে মেনরোডে, অমনি মিতিনের স্বর শোনা গেল, "প্রথমে আমরা সোজা বড়বাজার যাব।"

পার্থর গলা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত ধ্বনি ঠিকরে এল, "হুম।"

"বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, আমাদের গন্তব্যস্থল জৈন ধর্মশালা।"

"আমার বোঝাবুঝির কোনও প্রয়োজন আছে কি?" পার্থর গলা আরও গোমড়া শোনাল, "ধর্মশালায় যাও, পাঠশালায় যাও, আমার কী?"

"এখনও চটে আছ," মিতিন ফিক করে হাসল, "আরে বাবা, মেজাজ গরম থাকলে আমাকে হেল্প করবে কীভাবে?"

"আমার মতো গোবরগণেশের সাহায্যের কোনও দরকার আছে কি?"

"লাগে-লাগে, কাজে লাগে বইকী," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "এক-আধটা বোকাসোকা লোক পাশে না থাকলে চলে? বুদ্ধিমানদের তা হলে সার্ভিস দেবে কারা?"

পার্থ রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী ভেবে তার ভুরুতে ভাঁজ। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "তুমি আমায় ইচ্ছে করে তাতাচ্ছ, তাই না?"

"যাক, ঘটে ঢুকেছে এতক্ষণে। এবার আন্দাজ করো দেখি, তোমাকে আজ প্রেসে যেতে না দিয়ে টেনে আনলাম কেন?"

গাড়ি চালাতে-চালাতে গর্বিত স্বরে পার্থ বলল, "আত্মবিশ্বাস বাড়াতে।"

"ভুল অনুমান। নেক্সট গেস।"

"মূর্তিটা খুঁজতে আমার টিপ্‌স কাজে লাগাবে?"

"নো চান্স। খুবই মোটা দাগের কাজে তোমাকে লাগাব আজ। দেখি, তার মধ্যেই তোমার বুদ্ধির ছাপ রাখতে পার কিনা।"

"মানে? কী করাতে চাও আমাকে দিয়ে?"

"খুব সিম্পল জব। আমি আর টুপুর যখন আহিরচাঁদজির সঙ্গে মোলাকাত করব, সেই সময়টায় তুমি অন্যদের জবানবন্দিগুলো নোট করে ফেলবে। ইন ডিটেল।"'

"যা থেকে তুমি মূর্তিচুরির কেসটা সল্‌ভ করতে পার, তাই তো?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল না মিতিন। ঘাড় হেলিয়ে দেখছে কাচের বাইরেটা। সকাল দশটার কলকাতা, পথেঘাটে থিকথিকে ভিড়। খানিকক্ষণ সেই এলোমেলো জনতার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ফিরিয়েছে মুখ। ঠান্ডা গলায় বলল, "একটা কথা তোমাদের দু'জনকে বলে রাখা ভাল। মূর্তিচুরির কেসটা সমাধান কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য নয়।"

"তবে?" টুপুর আর পার্থর গলা একসঙ্গে বেজে উঠল, "আমরা তা হলে যাচ্ছি কেন?"

"শালিনীর স্বপ্নটার অর্থ উদ্ধার করতে।"

টুপুর ফ্যালফ্যাল চোখে পার্থর দিকে তাকাল। পার্থর দৃষ্টিও কেমন বিস্ফারিত। মিতিনের কথার মানে উদ্ধার করতে বেহাল দু'জনে। তবু সাহস করে প্রশ্ন করতে পারছে না কেউ। পাছে বোকা প্রতিপন্ন হতে হয়।

মিতিনও কিছু ভাঙল না। মোবাইল ফোনে কী যেন খুঁজছে মন দিয়ে। যানজট কাটিয়ে-কাটিয়ে পার্থ মহাত্মা গাঁধী রোডে ঢুকে পড়েছে। একজায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গলাখাঁকারি দিল, অমনি মিতিনও সজাগ। মোবাইলকে ঘুম পাড়িয়ে নেমে এল। দেখাদেখি টুপুরও।

রিকশা, ঠেলা, মানুষের উথালপাথাল ঢেউয়ে টলমল করছে বড়বাজার। শহরের অজস্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এই ব্যস্ত সময়ে বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ি যেন একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে আদ্যিকালের রাস্তাটায়।

পার্থ ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আমাদের বাহনটি যে কোথায় পার্ক করি?"

মিতিন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "এখানেই থাক।"

"রাস্তাটা তো চওড়া নয়। পুলিশ যদি ঝামেলা করে?"

"কেউ কিচ্ছুটি বলবে না মশাই। বড়বাজার থানাকে খবর দেওয়া আছে। সো, এটাও আজ পুলিশের গাড়ি। আর সময় নষ্ট কোরো না, লক করে নিশ্চিন্তে চলে এসো।"

এই না হলে মিতিনমাসি। পাছে উটকো অশান্তিতে পড়তে হয়, আগেভাগেই মাসি আটঘাট বেঁধে নেয়।

পাশেই জৈন ধর্মশালা। গাড়িবারান্দাওয়ালা বেশ বড়সড় পুরনো ধাঁচের বাড়ি। তিনধাপ সিঁড়ি উঠে পিতলবসানো প্রকাণ্ড কাঠের দরজা। খোলা দরজার ওপারে ডাইনে এক কাচঘেরা ঘর, সেখানে বসে হিন্দি খবরের কাগজ পড়ছেন এক ফরসা প্রৌঢ়। গলা বাড়িয়ে নিচুস্বরে তাকে কী যেন বলল মাসি, অমনি প্রৌঢ় তটস্থ। কাগজ মুড়ে রেখে হন্তদন্ত পায়ে হাঁটা দিলেন সিঁড়ির পানে। সামান্য দুলে চলেছেন উপরতলায়।

টুপুর সামনের খোলামতো জায়গাটা দেখছিল। প্রাচীন হলেও জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন নয় বাড়িটা, বরং একটা হালকা সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। দেওয়ালে একটা পিতলের বোর্ডে হিন্দিতে সার-সার নাম, পাশে টাকার অঙ্ক। এঁদের অর্থেই গড়ে উঠেছে ধর্মশালাটি, সম্ভবত দেখভালও হয় এঁদের পয়সায়।

নামগুলো পড়তে-পড়তে টুপুর বলল, "একজনও তো বাঙালি নেই।"

"থাকবে কোত্থেকে?" পার্থর টুকুস মন্তব্য, "জৈনধর্মটাই তো রাজস্থানিদের। আরও সঠিকভাবে বলা যায়, মারোয়াড়িদের।"

"একদম ভুল ধারণা," মিতিন ঝটিতি প্রতিবাদ জুড়ল, "ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর জৈন আছেন। তাঁরা সকলে মোটেই রাজস্থানের লোক নন। তামিল, কর্নাটকিদের মধ্যে একসময় ভাল প্রচার হয়েছিল ধর্মটা। ওঁদের অনেক রাজামহারাজাও তখন জৈন ছিলেন যে। এমনকী, আমাদের এই বাংলাতেও হাজারদুই বছর আগে বেশ রমরমা হয়েছিল জৈনধর্মের। বিশেষত, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে।"

"এখন তো চিহ্নই নেই," পার্থর স্বরে অবিশ্বাস প্রকট, "সেই জৈনরা সব উবে গেল নাকি?"

"প্রায় তাই," মিতিন সায় দিল, "বৌদ্ধ আর হিন্দু রাজাদের চাপে পড়ে জৈন ধর্ম এ রাজ্য থেকে পিঠটান দিয়েছিল। আবার ফিরল মাত্র তিনশো বছর আগে। রাজস্থানি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আমরাও অমনি ধরে নিলাম, ধর্মটা শুধু ওদেরই।"

মিতিন সিঁড়ির দিকে তাকাল। আপনমনেই বলল, "মহাবীর জৈনদের একজন প্রধান ধর্মগুরু। তিনি জন্মেছিলেন বিহারে, রাজস্থানে নয়। সুতরাং..."

আর এগোতে পারল না মিতিন, ভদ্রলোক ডাকছেন ইশারায়। কাছে যেতেই মিতিনকে বললেন, "বেশিক্ষণ টাইম লিবেন না প্লিজ।"

মিতিন কপাল কুঁচকাল, "আহিরচাঁদজি কোথাও বেরোবেন নাকি?"

"ও বাত জানি না। আমি শুধু ওর ইচ্ছেটা জানালাম।" ভদ্রলোক মিতিনদের আর-একবার জরিপ করলেন। মৃদু আপত্তির সুরে বললেন, "আপনারা সবাই ওঁর ঘরে যাবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। ওরা দু'জন যাক," আগ বাড়িয়ে বলল পার্থ, "আপনাতে-আমাতে ততক্ষণ না হয় গল্প করি।" ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তিলমাত্র বিলম্ব করল না মিতিন, ঘরের নম্বর জেনে নিয়েই হরিণপায়ে উঠে গিয়েছে দোতলায়। লম্বা করিডরের দু'পাশে সার-সার ঘর, বাঁদিকের শেষ দরজার সামনে গিয়ে থামল। সামান্য গলা উঠিয়ে বলল, "ভিতরে আসতে পারি?"

একটা জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল, "আসুন।"

টুপুর অবাক। কাল টিভিতে মোটেই গলাটা এমন ভারী শোনাচ্ছিল না তো? জৈন সাধুটি কি নিজেকে ওজনদার করতে চাইছেন? কণ্ঠের ভারে?

দরজা ঠেলে ঢুকল মিতিন। টুপুরও। একেবারেই বাহুল্যবর্জিত রুম। খাট, ছোট একখানা কাঠের আলমারি আর একসেট চেয়ার-টেবিল। মেঝেয় একফালি সাদা কার্পেট, ওটুকুই যা বিলাসিতার উপস্থিতি।

আহিরচাঁদ বসে আছেন শুভ্র বিছানায়, পদ্মাসনে। পরনে সাদা ধুতি, খালি গা। তাঁর চোখজোড়া তিলেক মিতিনকে দেখল, ঝলক টুপুরকে। বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, "কলকাতা পুলিশের অনেক উন্নতি হয়েছে তো? বারো-তেরো বছরের মেয়েদেরও তদন্তে পাঠায়।"

মিতিন নম্র ভাবে বলল, "আমি পুলিশ নই। আমি পেশাদার গোয়েন্দা, এ আমার সহকারী। আমরা পুলিশকে সাহায্য করছি মাত্র।"

"অ। তা পুলিশকে তো আমার স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে। নতুন আর কী বলব?"

"যেমন ধরুন, অত দামি একটা মূর্তি আপনি কেন সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলেন?"

"আইনগত কোনও বাধা আছে কি? আমি তো যদ্দুর জানি, নেই।"

"ততক্ষণই নেই যতক্ষণ না কোনও অপরাধ ঘটছে। আই মিন, যদি মনে হয় যিনি মূর্তি নিয়ে ঘুরছেন, তাঁর কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে। যেমন ধরুন চোরাচালান, বা বিদেশে পাচার..."

"আপনার স্পর্ধা তো কম নয়," স্থৈর্য ভেঙে স্বর চড়ে গেল আহিরচাঁদের, "জানেন আমি কে? জৈন সমাজে আমার কোথায় স্থান? আমাকে আপনি চোরবাটপাড়দের সঙ্গে এক আসনে বসাচ্ছেন?"

"ছি ছি তা কেন? আমি শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম," মিতিনের কণামাত্র উত্তেজনা নেই। ঠান্ডা স্বরে বলল, "আপনার তা হলে বদ মতলব কিছু ছিল না? এমনি-এমনিই মূর্তিটা নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন? যেমন-তেমন বেড়ানো নয়, দীর্ঘ কুড়ি বছর পর কলকাতায় আসা। খুবই মামুলি ঘটনা, নয় কী?"

কটমট চোখে মিতিনকে দেখলেন আহিরচাঁদ। সামান্য গলা নামিয়ে বললেন, "আমি মূর্তিটা একটা বিশেষ কাজে এনেছিলাম।"

"একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানে পার্শ্বনাথের মূর্তিটা বিরাজ করবে। তাই তো?"

"আপনি জানলেন কী করে?" আহিরচাঁদের গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "আমি তো পুলিশকে একথা বলিনি।"

"আমি এও জানি, পার্শ্বনাথের মূর্তিটি ছিল আপনার রনকপুরে। মানে, অম্বামাতার মন্দিরের পাশে যে জৈন আশ্রমটিতে আপনি এখন অবস্থান করেন, সেখানে। কিন্তু মূর্তিটি ওই মনোরম পরিবেশ থেকে এনে হঠাৎ কলকাতায় বসানোর জন্য কেন ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, সেটা কিন্তু এখনও ধাঁধা," মিতিনও স্বর নামাল, "আপনি কি সমাধানটা বলবেন?"

"না, মানে...আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল..."

"কে আপনাকে কথা দিয়েছিলেন? আপনার কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়?"

চমকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আহিরচাঁদ। জবাব নেই।

"আমি কি একটু ধরিয়ে দেব?" মিতিনের স্বর মিহি, "আকাশচাঁদ, না আলোকচাঁদ?"

আহিরচাঁদ ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, "আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

"এতে কিন্তু আপনার সুবিধেই হত। হয়তো মিলে যেত আপনার পার্শ্বনাথ।"

"আমার চাই না ফেরত," আহিরচাঁদ প্রায় ফেটে পড়লেন, "আমার ওই মূর্তিতে আর কোনও আগ্রহ নেই। যেখানকার জিনিস, সেখানেই ফেরাতে চেয়েছিলাম। পার্শ্বনাথজি বোধ হয় তা চান না।"

"নাকি আরও বড় কিছু চাইছেন পার্শ্বনাথ?" মিতিনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "এবং তার সন্ধান মিলতে চলেছে?"

"আপনি বড্ড বাজে বকছেন।" আচমকা পদ্মাসন ছেড়ে খাট থেকে নেমে এলেন আহিরচাঁদ। সৌম্য মুখখানিও সহসা রুক্ষ, "আপনি এবার আসুন। বললাম তো, ওই মূর্তি আমি আর চাই না।"

"সে বললে হয়?" আহিরচাঁদজির রাগকে গ্রাহ্য করল না মিতিন। অচঞ্চল ভঙ্গিতে বলল, "জানেনই তো, বাঘ ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। সেই পুলিশ কেস যখন হয়েছে, তার শেষ তো আপনাকে দেখতেই হবে গুরুজি।"

আহিরচাঁদের মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। টকটকে গৌরবর্ণ কপালে চিন্তার ভাঁজ।

হঠাৎ মিতিনের স্বর অস্বাভাবিক নরম, "আমি কি আপনাকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি?"

"কীরকম?"

"যেমন ধরুন, লেখাপড়ায় তো আপনি দারুণ চৌকস ছিলেন। সব ছেড়েছুড়ে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন কেন?"

প্রশান্তি ফিরেছে আহিরচাঁদের। স্মিতমুখে বললেন, "ধর্ম আমাকে টানল যে।"

"কীভাবে?"

"আমাদের পুরনো পুঁথি পড়ে। সেখানে স্পষ্ট ভাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা আছে, আমাদের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। যতই চেষ্টা করি না কেন, জ্ঞান হবে অন্ধের হাতি দেখার মতো। আংশিক। তাই ওই পথ পরিত্যাগ করে নিজেকে ভগবান পার্শ্বনাথের চরণে

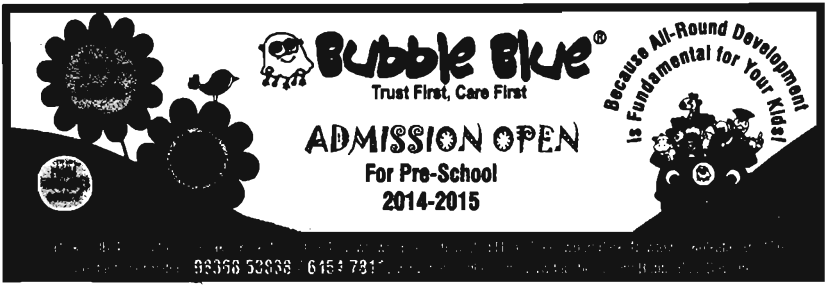

নিবেদন করে দিলাম। আমার জ্ঞানচর্চা অসমাপ্ত রইল বটে, কিন্তু মনের শান্তি তো মিলল।"

"হুম। আপনার বাংলাটি কিন্তু চমৎকার। এত বছর দেশের বাইরে, তবু কী নিখুঁত।"

"ভাষাজ্ঞান আমার বরাবরই উচ্চমানের। গর্ব করছি না, আমি যে ভাষা একবার শিখেছি, আমার মধ্যে সেটি গেঁথে গিয়েছে।"

"আপনি তো ভাল ফারসিও জানেন, তাই না?"

"অবশ্যই," বলেই যেন জোর হোঁচট খেলেন আহিরচাঁদ, আমতা-আমতা করছেন হঠাৎই, "না, মানে এখন আর তেমন চর্চা নেই..."

"তা বটে। আবার মূল কথায় আসি," মিতিনের গলায় ফের কেজো সুর, "কাল বিকেলে আপনি ঠিক চারটেয় বেরিয়েছিলেন, তাই তো? আর ফিরেছিলেন সাতটার পরে?"

"হ্যাঁ। প্রায় সাড়ে সাতটায়।"

"এই সাড়ে তিন ঘণ্টা আপনার রুম অরক্ষিত ছিল?"

"তা কেন? আমি তো চাবি দিয়েই..."

"সত্যি বলছেন তো? জৈনধর্মে সত্য বলাকেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ বলা হয়।"

পলকে আহিরচাঁদের মুখ বিবর্ণ। মাথা নামিয়ে নাড়ছেন দু'দিকে।

টুপুর থ। মাসি টের পেল কী করে? আন্দাজে ঢিল? নাকি অন্তর্যামী!

"শুনলাম, চুরির অপরাধে এই ধর্মশালার এক কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন," অল্প চড়ল মিতিনের স্বর, "কাজটা কি ন্যায্য হয়েছে? আপনার ধর্মজ্ঞান কী বলে?"

"আমি এমনটা চাইনি," আহিরচাঁদ বিড়বিড় করছেন, "কিন্তু কী যে হচ্ছে!"

মিতিন মৃদুগলায় বলল, "আমরা কি আর-একটু খোলামেলা কথা বলতে পারি আহিরচাঁদজি?"

আহিরচাঁদ নীরব। মিতিন দেখছে আহিরচাঁদকে। মিতিনকে দেখছে টুপুর।

॥ ৮ ॥

নতুন করে শুরু হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব, ঠিক জেরা নয়, নরম করেই জিজ্ঞেস করছে মিতিন, থেমে-থেমে জবাব দিচ্ছেন আহিরচাঁদ।

"মন্দির প্রতিষ্ঠাই তা হলে আপনার এত বছর পর কলকাতায় আসার একমাত্র কারণ?"

"বলতে পারেন। তবে আর-একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমাদের বংশের একটা পুরনো নথি অনেককাল ধরেই আমার কাছে পড়েছিল, ভেবেছিলাম সেটাও এই উপলক্ষে আমার ভাইপোদের দিয়ে যাব।"

"কী নথি? গোপন কিছু?"

"ঠিক তা নয়," একটু সময় নিয়ে আহিরচাঁদ বললেন, "আসলে একটা বিক্রিবাটার কাগজ। এক আর্মানি বণিক আমার এক পূর্বপুরুষকে কিছু মূল্যবান জিনিস বেচেছিলেন। সেই পূর্বপুরুষটির হাতে তখন নগদ অর্থ ছিল না, টাকাটা তিনি পরে মেটাবেন এইসব লেখা ছিল আর কী।"

"লেখাটা কি ফারসি ভাষায়? সেই আর্মানি বণিকটির নাম খাজা ওয়াজেদ? আর আপনার পূর্বপুরুষটি সম্ভবত ফতেচাঁদ, অর্থাৎ প্রথম জগৎ শেঠ।"

"আ-আ-আপনি কী করে জানলেন?" আহিরচাঁদের দৃষ্টি বিস্ফারিত।

"আমি তা হলে ভুল বলিনি," মিতিন কায়দা করে জবাবটা এড়িয়ে গেল। পালটা প্রশ্ন জুড়ল, "তা সেই নথি আপনার কাছে গেল কী করে?"

"আমি গৃহত্যাগের সময় ওটি নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"আমার বড়া ভাইসাব, মানে দাদাকে, লোভের হাত থেকে মুক্ত করতে।"

"কীভাবে?"

"আমার বড়া ভাইজির ধারণা ছিল, ওই কাগজে যে জিনিসগুলোর কথা লেখা আছে, সেইসব হিরে, জহরত, বাড়িতেই কোথাও আছে। তাই ওই নথি উনি সারাক্ষণ বুকে আঁকড়ে থাকতেন। মায়ার বাঁধন কাটাতে ওই নথি সরিয়ে ফেলা আবশ্যক ছিল। শুধু তাই নয়, আমার তখন মনে হয়েছিল, ভগবান পার্শ্বনাথজির মূর্তিও আমাদের ঘরে বেমানান। সেই জন্য পার্শ্বনাথজির মূর্তিটিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম," "আস্তে-আস্তে ম্লান হয়ে গেল আহিরচাঁদের মুখমণ্ডল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "লাভ হল না কিছুই, শুধুই লোকসান।"

টুপুর চোখ সরু করে সওয়াল-জবাব গিলছিল। ফস করে বলে উঠল, "ওই মূর্তিই কাল চুরি গেল বুঝি?"

"হাঁ বেটি," আহিরচাঁদ ম্রিয়মান, "আমাদের বংশে আর ভাল কিছু হবে না। যে দাদার লোভের মায়া কাটাতে সোনাদানার কাগজ নিয়ে গেলাম, সেও তো শেষ জীবনে পাগল হয়ে গেল। ওই গুপ্তধন খুঁজে না পেয়েই নাকি তাঁর মাথা বিগড়েছিল।"

"তা সেই কাগজ ভাইপোদের দেওয়ার কথা ভাবলেন কেন?"

"ওরা চেয়েছিল।"

"জানত বুঝি কাগজ আপনার কাছে আছে?"

"না। ওরা জানত কাগজ বহুকাল আগেই হারিয়ে গিয়েছে। আলোক, আকাশ দুইভাই আমার আশ্রমে যায় নিয়মিত। আকাশ তো বছরে তিন-চারবার, আলোক অন্তত একবার। কথাচ্ছলে বলেছিলাম ওদের, তখন ওরাই বলল কাগজটা বাড়ির সম্পদ, সুতরাং ওটি কলকাতাতেই থাকা উচিত। আমিও ভেবে দেখলাম, একটা তুচ্ছ কাগজের মায়ায় কেন আটকে থাকি? ভগবান পার্শ্বনাথ দ্রব্যের আসক্তি থেকে মুক্ত হতেই তো উপদেশ দিয়েছেন। ওরা প্লেনের টিকিট পাঠাল, আমিও চলে এলাম।"

"তা কাগজটি এখন কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে।"

"একটু দেখতে পারি?"

সামান্য ভেবে বিছানা ছেড়ে নামলেন আহিরচাঁদ। আলমারি থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করলেন। গিঁট খুলে একটা জীর্ণ চামড়ার পুঁথি বাড়িয়ে দিলেন মিতিনকে। সন্তর্পণে পাতা ওলটাচ্ছে মিতিন। শেষ পৃষ্ঠায় এসে থামল। ঝুঁকে কী যেন দেখল চোখ কুঁচকে। ঝোলাব্যাগ থেকে আতসকাচটা বের করে আরও গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতে-করতে বলল, "একটা নবাবি পাঞ্জা রয়েছে মনে হচ্ছে?"

"উঁহু ওটা শাহি পাঞ্জা। খোদ মুঘল সম্রাট জগৎ শেঠদের যে-কোনও চুক্তি তখন তামাম ভারতবর্ষে মান্যতা পেত।"

"আমি কি পাতাগুলোর ফোটো নিতে পারি?"

অল্প ইতস্তত করে আহিরচাঁদ সায় দেওয়ামাত্র স্ন্যাপ উঠে গেল মিতিনের স্মার্টফোনে। পুঁথিটা ফেরত দিয়ে মিতিন বলল, "ফারসি লিপি কিন্তু আড়াইশো বছর পরেও খুব স্পষ্ট আছে এখনও। বেশ আশ্চর্যজনক,তাই না?"

জবাব ছাড়াই কাপড়ের পুঁটলি ফের চালান হয়ে গেল আলমারির অন্দরে।

মিতিনও খোঁচাল না। আবার ফিরে গিয়েছে পুরনো প্রসঙ্গে।

"আপনার মন্দিরটি তো পৈতৃক বাড়িতেই করবেন?"

"আর হবে কী করে? স্বয়ং পার্শ্বনাথজিই উধাও হয়ে গেলেন।"

"ভাইপোদের বলুন। তারা নতুন মূর্তি গড়িয়ে দেবেন।"

"তা হয় না ম্যাডাম। মন্দির প্রতিষ্ঠা একজন জৈনসন্ন্যাসীর জীবনে সবচেয়ে মহৎ কাজ। এ কাজ জোড়াতালি দিয়ে যেমন-তেমন করে হয় না। ওই মূর্তিটি আমার মন্দিরের জন্য চিহ্নিত করা ছিল, অন্য মূর্তি আমি বসাব কী করে?"

"যদি মূর্তিটা ফেরত পাওয়া যায়?"

"পার্শ্বনাথজি আর ফিরবেন না।"

"তবু যদি মিলে যায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে তখন ভাবা যাবে। প্রকৃত জৈন আকাশকুসুম কল্পনায় বিশ্বাস করে না।"

"কিছু মনে করবেন না, আহিরচাঁদজি, একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"মূর্তিটি যখন এতই মূল্যবান, আপনার কি আর-একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল না?" মিতিনের স্বরে অনুযোগ, "দরজা ঠিকমতো বন্ধ না করে আপনি বেরলেন কী করে?"

"জৈন ধর্মশালা থেকে ভগবান পার্শ্বনাথের বিগ্রহ চুরি হতে পারে, এ যে আমার কল্পনাতেও ছিল না ম্যাডাম," আহিরচাঁদের ঠোঁটে করুণ হাসি। মলিন গলায় বললেন, "আমার তো ঘরে তালা লাগানোর অভ্যেসই নেই। আমাদের রনকপুরের আশ্রমেও তালা চাবি লাগানোর প্রথা নেই কিনা।"

"ও," মিতিন বুঝদারের মতো ঘাড় দোলাল। দুঃখী-দুঃখী গলায় বলল, "আপনার এতদিন পর কলকাতায় ফেরাটা সুখের হল না?"

"তা বটে। ভগবান পার্শ্বনাথের হয়তো ইচ্ছে নয় আমি আবার পুরনো শহরে ফিরে আসি," ছোট্ট শ্বাস পড়ল আহিরচাঁদের। পরক্ষণেই প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "একটাই লাভ, ঘটনাচক্রে আকাশের স্ত্রী, কন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"কেমন লাগল তাদের?"

"ভাল। ভালই তো," আহিরচাঁদের মুখমণ্ডলে হালকা প্রসন্নতার আভা, "আকাশের মেয়েটি তো অতি চমৎকার। এমন সরল বিস্ময় নিয়ে প্রথমদিন আমাকে দেখছিল। আমাদের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটের বাড়িটার নানান গল্প শোনালাম, ও তো আবিষ্ট হয়ে ঘুমিয়েই পড়ল!"

টুপুর টানটান। আহিরচাঁদজিকে শালিনীর স্বপ্নের কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলবে কিনা ভাবছে, আচমকা মিতিন বলে উঠল, "এবার তা হলে চলি আহিরচাঁদজি?"

"কেন?" আহিরচাঁদের স্বরে আলগা ঠাট্টা, "প্রশ্নের ভাঁড়ার কি ফুরিয়ে গেল?"

মিতিন ব্যঙ্গটা গায়েই মাখল না। চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখনকার মতো এইটুকুই যথেষ্ট।"

"আমার ভগবানজির মূর্তি কি মিলবে? চান্স আছে কোনও?"

"দেখা যাক।"

উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়েও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে মিতিন। ঘুরে এসে ভারী নরম গলায় বলল, "আপনার কাছে আরও একটা বিষয় জানার ছিল। তদন্তের ব্যাপার নয়... আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ বলেই..."

টুপুর তাজ্জব। কী কথা রে বাবা। মিতিনমাসি আমতা-আমতা করছে যে বড়!

আহিরচাঁদ কিন্তু বেশ বিগলিত। ভারিক্কি ভঙ্গিতে বললেন, "আমি মোটেই জ্ঞানী নই। সত্যের সন্ধানে হাঁটছি মাত্র। তবু শোনা যাক, কী জানতে চান?"

"মানুষ তো নানান রকম স্বপ্ন দেখে। সব স্বপ্নের কি অর্থ হয়?"

"অবশ্যই। মানুষ তো এমনি-এমনি স্বপ্ন দেখে না, তাদের স্বপ্ন দেখান জিনেরা। মানে আমাদের ধর্মীয় অবতাররা। যাঁদের আমরা বলি তীর্থঙ্কর। ওঁরা স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই তো আমাদের সুপথে চলার রাস্তা চেনান।"

"ভাল-খারাপ সব ধরনের স্বপ্নই তা হলে জিনদের অবদান?"

"না, না তা কেন? খারাপ-খারাপ স্বপ্ন তো আসে মার, মানে অশুভ শক্তি থেকে।"

"বুঝেছি। আমার স্বপ্নটা তা হলে মারই দেখাচ্ছেন। প্রায় রোজ রাতেই।"

"কী স্বপ্ন?"

"বলব? আপনি হয়তো হাসবেন।"

"কখনও না। আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

"দেখছি কী, আমি হঠাৎ ছোট্ট এইটুকুন হয়ে গিয়েছি। ঢুকেছি একটা প্রকাণ্ড ঘরে, একটা দশাসই চেহারার লোকের হাতে..."

দিব্যি গড়গড়িয়ে শালিনীর স্বপ্নটাই হুবহু আওড়ে দিল মিতিন। শুনতে-শুনতে আহিরচাঁদের মুখখানাই বদলে গেল। টকটকে ফরসা গালে সহসা কালচে ছায়া। দু'চোখে ঘোর অবিশ্বাস। ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি এই স্বপ্ন দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, পর-পর পাঁচ রাত। সেই কাল রোববারের আগের রোববার থেকে।"

"অসম্ভব। হতেই পারে না," স্থানকালপাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন আহিরচাঁদ।

"কেন হতে পারে না আহিরচাঁদজি? এমন স্বপ্ন কি কেউ দেখে না? আপনি এত উত্তেজিতই বা হচ্ছেন কেন?"

মিতিনের নিরীহ জিজ্ঞাসায় আহিরচাঁদ যেন গুটিয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ থেকে বললেন, "আপনার অনুমান সঠিক। স্বপ্নটি মারের। অর্থাৎ অশুভ।"

"কোনও বিপদের সঙ্কেত?"

"হওয়া অসম্ভব নয়।"

"তা হলে পাঁচজনকে বলে না বেড়ানোই ভাল, কি বলেন?"

তীব্র চোখে মিতিনকে দেখলেন আহিরচাঁদ। তারপর গুমগুমে গলায় বললেন, "আমি কি এবার ধ্যানে বসতে পারি?"

মিতিন আর কথা বাড়াল না। ছোট্ট করে ঘাড়টি নেড়ে টুপুরকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে। একতলায় নেমে টুপুর দেখল ধর্মশালার সামনের ফুটপাথে পায়চারি করছে পার্থমেসো। ওখান থেকেই অধৈর্য স্বরে চেঁচাচ্ছে, "কী এতক্ষণ ভ্যাজরং-ভ্যাজরং করছিলিস? কেস তো আমি সলভ করেই ফেলেছি।"

মিতিন ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে চুপচাপ গাড়িতে ওঠার ইঙ্গিত করল পার্থকে। স্টার্ট দেওয়ার পর বলল, "কাকে-কাকে জেরা করলে?"

"পর-পর পাঁচজনকে। ওই কেয়ারটেকার মনোহর সোলাঙ্কি, কুক কাম ভাঁড়াররক্ষক হরদেও প্রসাদ, রুম সার্ভিসের তিন ওস্তাদ, বালুরাম, গঙ্গাধর, মুরলী। প্রত্যেককে অ্যাভারেজ চার-মিনিট। ব্যস, এতেই সমাধান হাতের মুঠোয়।"

"বটে? তা কীরকম উত্তর বেরোল শুনি?"

"তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না কে এই দুষ্কর্মটি করেছে?" নাটুকে ভঙ্গিতে কাঁধ বেঁকিয়ে টুপুরের দিকে তাকাল পার্থ, "বল তো কে সেই পামর?"

টুপুরের চোখ পিটপিট, "ওই ভালমানুষ'চেহারার কেয়ারটেকার?"

"আজ্ঞে না। উফ্‌ফ, কত কী যে জানলাম! ভাবতে পারিস, বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত ধর্মশালায় একজন কর্মচারীও প্রেজেন্ট থাকে না। চোর তাই ওই সময়েই মূর্তিটা হাপিস করেছে।"

"কে সে?"

"এমন কেউ, যে ধর্মশালার এই লুপহোলটা জানে?"

"আরে বাবা সেটা কে বলবে তো?" টুপুর ছটফট করে উঠল, "ধর্মশালার বাইরের কেউ?"

"ধীরে বালিকা, ধীরে," চৌরঙ্গির মোড় টপকে গাড়ির গতি সামান্য বাড়াল পার্থ, "ওই ধর্মশালায় দু'জন অতিথি বিকেলের ওই সময়টাতেই আসত রোজ। আহিরচাঁদের সঙ্গে মোলাকাত করতে। কোনওদিন এ, তো কোনওদিন ও। আবার কোনওদিন দু'জন হাত ধরাধরি করে।"

"তারা কারা?" বলেই টুপুরের মগজ ঝিলিক, "আহিরচাঁদজির দুই ভাইপো?"

"যাক মাসির চামচাগিরি করে একটু উন্নতি হয়েছে। গোবরের জায়গায় ঘিলুর পরিমাণ বাড়ছে," মেসোর ব্যঙ্গটা প্রশস্তি হিসেবে গায়ে মেখে নিল টুপুর। কিন্তু মনে সন্দেহের খচখচ। জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কিন্তু ওঁরা নেবেন কেন? কাকা অতদূর থেকে মূর্তিটা এনেছেন মন্দির গড়ে সেখানে পার্শ্বনাথজিকে স্থাপন করবেন বলে।"

"অ। এইসব ব্যাপার আছে নাকি?" পার্থ ঈষৎ থমকাল। পরক্ষণেই বলল, "মন্দির মানেই তো পাবলিক প্রপার্টি। ভাইপোরা হয়তো মূর্তিখানা নিজেদের দখলে রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল। তাই

বিকেলের অরক্ষিত সময়ে এসে মাল ঝাপ্পুস করে নিতেই পারে।"

"দু'জনে মিলে? একজোট হয়ে?"

"সেটা বলা শক্ত। ওদের যে-কোনও একজন হয়তো..."

"এক সেকেন্ড," বহুক্ষণ পর মিতিন সরব, "মূর্তিটা দেখতে কেমন, সাইজে কত বড়, সে বিষয়ে কে কী বলল?"

"ওরা কেউ দেখেছে নাকি? ওদের কথা শুনে তো তেমনটা মনে হল না।"

"তুমি জিজ্ঞেসও করোনি?"

"ধুস। ওটা কোনও প্রশ্ন নাকি? জেনে লাভ কী হত?"

"মূর্তিটা উনি রেখেছিলেন কোথায়?"

"নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না। কেউ বলে আহিরচাঁদজির ঝোলায়, কেউ বলে রুমে একটা নাকি কাঠের আলমারি আছে, হয়তো তার মধ্যেই রাখা ছিল।"

গাড়ি ভবানীপুর ঢুকেছে, ভিড় থিকথিক পথ দেখতে-দেখতে পার্থ আপন মনেই বলল, "যেখানেই থাকুক, আলোক, আকাশের তো অজানা নয়। সুতরাং সন্দেহের তিরটা ওদের দিকেই যায়। তা ছাড়া ভেবে দেখো, এত ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস গায়েব হয়েছে, টিভি খবরের কাগজ সর্বত্র বেরিয়েছে খবরটা, অথচ দুই মূর্তিমানের টিকি নেই। এটাও নিশ্চয়ই একেবারে নিরামিষ ঘটনা নয়।"

"হুম। তা দুই ভাইয়ের কোনও একজনও যে কাল বিকেলে ধর্মশালায় এসেছিল, এমন কোনও তথ্য প্রমাণ মিলেছে কি?"

"আরে, ওইটুকুর জন্যেই তো আটকে আছে। নয়তো আমিই অনিশ্চয়বাবুকে জানিয়ে দিতাম। কেস ক্লোজড, আসামীদুটোকে গারদে পুরে দিন। বাই দা বাই, অনিশ্চয়বাবুর পুলিশ তাড়াহুড়ো করে মিছিমিছি যে লোকটাকে ফাটকে ঢোকাল, আশা করি তাকে অন্তত..."

"ওটা একটা গল্প," মিতিন মিচকে হাসল, "আমিই ডি সি ডি ডি সাহেবকে ছড়াতে বলেছি গল্পটা, যাতে সাংবাদিকরা না জ্বালাতে পারে।"

"কী ডেঞ্জারাস গেম। জানতে পারলে তো মিডিয়া পুলিশকে তুলোধনা করবে।"

"প্রথমত, জানতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, জানতে পারলে পুলিশ বলবে আসল চোরকে ধরার জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।"

এরকম কৌশল মাসি হরবখত করে, মাসির মগজের উপর অগাধ আস্থার দরুন অনিশ্চয়আঙ্কলও নিশ্চিন্তে অংশ নেয় খেলাটায়, জানে টুপুর। তবু আজ একটু অবাকই হল। মাসিও কি তবে নিশ্চিত, মূর্তিটা শালিনীর বাবা-জ্যাঠারাই নিয়েছেন? কিন্তু মাসি একবারও আহিরচাঁদজিকে ওই লাইনে প্রশ্ন করল না। হঠাৎ নিজের নাম করে শালিনীর স্বপ্নটা শোনানোর বা কী অর্থ? শুধুই সন্ন্যাসীটিকে চমকে দেওয়া? নাকি অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মাসির? বিদঘুটে স্বপ্নটার কোনও মানে খুঁজে পেল কি? আহিরচাঁদজির ঘরে অতটা সময় কাটানো কি শেষপর্যন্ত মাসির কোনও কাজে লাগবে? ভদ্রলোক থুড়ি, সন্ন্যাসীটিকে যেন বড্ড বেশি পরখ করছিল মাসি। কেন?

"অ্যাই টুপুর, ঢুলছিস নাকি?"

মাসির ডাকে টুপুরের ভাবনাটা ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি টুপুর বলল, "কই না তো? আমি ভাবা প্র্যাকটিস করছি।"

"গুড... তা কাল থেকে তো তোর স্কুল?"

বেজার গলায় টুপুর বলল, "হুঁ।"

"ওবেলা তো তা হলে তোকে হাতিবাগানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।"

"আরে আমি তো আছিই," পার্থ তুরন্ত সবাক, "অ্যালেন্স কিচেনের কাটলেট অনেকদিন চাখা হয়নি, আজ নয় সেটাও..."

সুখাদ্যের চিন্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতেও পার্থর চোখ জ্বলজ্বল। পিছন থেকে আচমকা মিতিনের ঘোষণা, "উঁহু, আজ আমি যাব। শুধু আমি আর টুপুর।"

মাসির বলার ভঙ্গিটা যেন অচেনা-অচেনা। স্বরে যেন আমিষ-আমিষ গন্ধ।

॥ ৯ ॥

সন্ধের কলকাতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে হালকা জ্যাম। গাড়িতে মিতিনের পাশে টুপুর শুকনো মুখে বসে। দু'-দুটো দিন বেশ রোমাঞ্চের স্বাদ মিলেছিল, আজ বাড়ি ফিরে আবার শুরু হবে পুরনো রুটিন। সেই অ্যালজেব্রা, সেই জ্যামিতি, সেই ইতিহাস, ভূগোলের নীরস জগৎ। উফ, ভাবলেই কান্না পায়।

মানিকতলার মোড় পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই গাড়ি ডাইনে ঘোরাল মিতিন। একটা আধোচেনা রাস্তায় ঢুকছে।

টুপুর একটু অবাক হয়েই বলল, "কী গো, আগে অন্য কোথাও যাবে নাকি?"

মিতিনের সংক্ষিপ্ত জবাব, "হুঁ।"

"তোমার কোনও কাজের ব্যাপারে?"

"শুধু আমার নয়, তোরও কাজ।"

"মানে?"

"আমরা বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটে যাচ্ছি। আলোকচাঁদ শেঠের বাড়ি।"

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল টুপুরের। কোনওক্রমে উত্তেজনা দমন করে বলল, "কেন গো মাসি? মূর্তিটা কি তবে উনিই..."

"যদি সত্যিই চুরিটা হয়ে থাকে, তবে ওঁরই কালপ্রিট হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। আমার মেথড অফ এলিমিনেশন তো তাই বলছে?"

"যদি ঘটে থাকে মানে? চুরিটা কি হয়নি?"

"দেখা যাক। সময়ই বলবে।"

কী হেঁয়ালি মার্কা উত্তর। পরের প্রশ্নটা করে উঠতে পারল না টুপুর, তার আগেই আবার বাঁক নিয়েছে গাড়ি। এবার ঢুকছে একটা সরু রাস্তায়। ও মা, সামনেই তো পরেশনাথের মন্দির। ওই তো মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এটাই তবে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট!

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একঝলক মন্দিরটা দেখল টুপুর। তাদের বাড়ি থেকে মোটেই তেমন দূর নয়, তবু সেই ছেলেবেলার পর আর আসা হয়নি। পাশাপাশি আরও তিনটে জৈন মন্দির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুণে বেশ একটা পবিত্রতার ভাব আছে প্রতিটি মন্দিরে। কিন্তু ছেলেবেলার সেই মুগ্ধতা যেন আর জাগছে না।

মিতিন মন্দিরের পাশের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে গাড়ি নিয়ে। মন্দির পেরোতেই চওড়া হয়েছে রাস্তা। আবার ক্রমশ সরু। সেই পথের ধার ঘেঁষে একটা মরচে ধরা লোহার ফটকের সামনে পার্ক করল গাড়ি। স্টিয়ারিং লক করে ডাকল টুপুরকে, "নেমে পড়।"

লোহার গেটের ওপারে এক দর্শনীয় বাড়ি। বাহারি দেখনদারির জন্য নয়, স্রেফ প্রাচীনত্বর কারণেই চোখ আটকে যায়। ইস, কী চেহারা। একসময়ের গোল-গোল ডোরিক থামগুলো থেকে ইটের দাঁত বেরিয়ে আছে, রঙের বালাই নেই, প্লাস্টার খসে গিয়ে খোবলা-খোবলা হয়ে গিয়েছে, গা-ময় ঝুলের আস্তরণ জালের মতো ঢেকে ফেলেছে জীর্ণ গৃহের সর্বাঙ্গ। শহরে এমন বাড়ি টিকে আছে এখনও।

টুপুর সংশয়ের সুরে বলল, "এ বাড়িতে মানুষ থাকে নাকি?"

"হ্যাঁ রে বাবা, আছে লোক। ওই দ্যাখ, উপর দিয়ে আলো।"

তাই তো ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ একটা দীপ্তি যেন আসছে বটে। কিন্তু এই বাড়িতে জগৎ শেঠের বংশধর বাস করছে এমনটা কল্পনা করা বেশ কঠিন।

মিতিন নিচু গলায় বলল, "ঘাবড়ে গেলি নাকি? সাবধানে পা ফেলে আয়। আমার পিছন-পিছন।" বলেই লোহার গেট ঠেলল মিতিন। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে যেতেই পলকা বিস্ময়। একটা চকচকে বিদেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে। আলোকচাঁদের?

চওড়া ভাঙাচোরা পাঁচধাপ সিঁড়ি মাড়িয়ে একটা বারান্দায় উঠল দু'জনে। সামনে আটফুটি দরজা, পাল্লার মাথায় সার বসানো রঙিন কাচের অর্ধবৃত্ত। জলুস নেই কাচের, কিন্তু আভিজাত্যের গরিমা

ঠিকরোচ্ছে যেন।

দরজার ফ্রেমে কলিংবেল। টিপল মিতিন। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনন্ত প্রতীক্ষার পর আবার আঙুল রেখেছে সুইচে, খুলে গিয়েছে পাল্লা। এক মাঝবয়সি ফরসা লম্বা টাকমাথা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। রীতিমতো কর্কশ ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুড়লেন, "কী চাই?"

টুপুরকে অবাক করে দিয়ে মিতিনও পালটা তেরিয়া গলায় বলল, "আপনিই শেয়ার ব্যবসায়ী আলোকচাঁদ শেঠ?"

"হ্যাঁ। তো?"

"কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছি। একটা চুরির তদন্তে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

আলোকচাঁদ পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, "কী চুরি? কার চুরি? আমি কোনও চুরিটুরির খবর রাখি না।"

"বাজে কথা থামান। আপনার কাকার কোটি টাকার মূর্তি চুরি হয়ে গেল, আপনি তা জানেন না?" মিতিনের স্বর আরও কঠোর হল, "আপনি কি চান লালবাজারে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনাকে জেরা করি? ওখানে কিন্তু বয়সটয়স মানে না, যাকে তাকে থার্ড ডিগ্রি দেয়।"

আলোকচাঁদ মিনিটখানেক রা কাড়লেন না। নিশ্বাস ফেলছেন জোরে-জোরে। তারপর আচমকাই স্বরে মধু, "আসুন, ঘরে বসে কথা বলি।"

অন্দরটা বাইরের মতো হতশ্রী নয়। ঢুকেই অনেকটা খোলা জায়গা, হিন্দি সিরিয়ালের সেটের মতো। বেশ কয়েকটা ভারী সোফা শোভা পাচ্ছে সেখানে। তবে চেহারায় আদ্যিকালের ছাপ। একটা পেল্লাই সাইজের দেওয়াল ঘড়িও দৃশ্যমান। টিউবলাইটের আলোয় বুঝতে অসুবিধে নেই ঘড়ির পেন্ডুলামটি অচল। বৈঠকখানার সাজসজ্জার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘড়ির সময়ও থেমে আছে বহুকাল। উঁচু কড়িবরগার সিলিং যেন সাক্ষী দিচ্ছে দূর অতীতের।

টুপুরের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন আলোকচাঁদ। মিতিন গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "ও আমার বোনঝি। ভবিষ্যতে পুলিশে জয়েন করতে চায়। ওকে সঙ্গে রাখি।"

"তা বেশ তো।" চটপট একটা কাঠ-কাঠ হাসি ফোটালেন আলোকচাঁদ। বিনয়ী স্বরে বললেন, "কী জানতে চান আমার কাছে?"

"বেশি ধানাইপানাই করবেন না," মিতিন তেজের সঙ্গে বলল, "সাফ-সাফ বলুন দেখি, আহিরচাঁদের মূর্তিটি গেল কোথায়?"

"সে তো চুরির জন্য কে যেন অ্যারেস্ট হয়েছে শুনলাম।"

"তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। কারণ সে মূর্তি নেয়নি। খবর আছে, বিকেলে একজন মাত্র লোক আহিরচাঁদজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। উনি তখন ছিলেন না, ওঁর ঘরে অনেকক্ষণ একা বসেছিল লোকটা। সে যখন বেরিয়ে যায়, দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়েছিল, তাই দরজার কড়ায় তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। সে যদি দরজা হাট করে রেখে দিত, তা হলে হয়তো তাকে ধরাই যেত না। কেন যে সে এমন একটা সিলি মিসটেক করল..."

"বাহ, এখন তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলালেই আসামী ধরা পড়ে যাবে।"

আলোকচাঁদের নির্বিকার মন্তব্যে মিতিন যেন ঈষৎ অপ্রতিভ। মাসি যে কায়দা করে চালটা দিয়েছিল, এতেই সাধারণ অপরাধীর ফেঁসে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই আলোকচাঁদ তো দিব্যি কেটে বেরিয়ে গেলেন। নাকি ইনি সত্যিই নিরপরাধ?

মিতিন সহসা সুর বদলেছে, মুখে একটা হাসি টেনে বলল, "সে তো আমরা জানিই। তবু আপনাকে সন্দেহের তালিকায় বাইরে আনতে গেলে একটুখানি বিরক্ত তো আপনাকে করতেই হবে। যদি আপনি সহযোগিতা করেন..."

"কীভাবে?"

"আপনার বাড়িটা একবার তল্লাশি করতে চাই।"

"আপনার ওয়ারেন্ট আছে নিশ্চয়ই?"

"আজ্ঞে না। সার্চটা আমি আন-অফিসিয়াল রাখতে চাই," মিতিন আচমকা গলা খাদে নামাল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আহিরচাঁদজির সঙ্গে আমার বাতচিত হয়েছে। উনি বলেছেন, মূর্তি ফেরত পেলে উনি চুরির কেসটা তুলে নেবেন।"

হঠাৎ মাসি-বোনঝিকে চমকে দিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন আলোকচাঁদ। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "কাকা ভেবেছেনটা কী, অ্যাঁ? আমাকে উনি চোর প্রমাণ করতে চান? আসল চোর তো কাকা নিজে।"

"মানে? একজন সাধুসন্ত মানুষের নামে এ কী অপবাদ।"

"হুঁ, সাধু। ওই মূর্তিটা কি ওঁর? আমাদের পরিবারের জিনিসটি তো চুরি করেই নিয়ে গিয়েছিলেন? সেই মূর্তি যদি আমি নিয়েও আসি, সেটাকে কি চুরি বলে?"

"আহিরচাঁদজি তো সেই মূর্তিটা ফেরত দিতেই সেই রনকপুর থেকে..."

"তাই তো জানতাম। এখন তো দেখছি ওঁর মতলব অন্য। উনি এসেছেন নিজের ধান্ধায়।"

অনুভূতিশীল পাঠকদের জন্য

ডঃ ভূতনাথ চৌধুরী কৃত
• সল্টলেকের ভূত ৫০

• মজুমদারের জীবন ও কাব্যের সীমারেখা ১৫০

তপ রায় কৃত
• বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা (২য় স.) ১০০
• একুশ শতকের ভারত : সমাজ ও অর্থনীতি ৮০
• আধুনিক ভারত : নতুন অর্থনীতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ ১০০
• ত্রিপদী কুসুমপুর ৬০

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
• থিয়েটার ঘরে বাইরে ১০০

ডঃ রবীন্দ্রনাথ পাত্র কৃত
• চার্লস ডারউইন ৬০

• আয়ুর্বেদে রোগ আরোগ্য ও জীবনশৈলী ১৫০

কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত
• সেরা প্রেমের গল্প ২৫০
• অন্তহীন বিবেকানন্দ ২৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী বলছেন? উনি কলকাতায় একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন..."

"বিলকুল বকোয়াস। তেমন ইচ্ছে থাকলে রনকপুর থেকে আসার আগেই তো জানাতেন। কলকাতায় পা রাখার পরের দিন হঠাৎ মন্দির বানানোর বাসনা জেগে উঠল।" আলোকচাঁদ মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, "নেহি জি, জরুর ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

"কী হতে পারে?"

"ও আমি জানি না। লেকিন আমি ভি মারোয়াড়ি। শেঠ মানিকচাঁদ, ফতেচাঁদের বানিয়া রক্ত আমার শরীরেও তো থোড়াবহুত আছে। তিরিশ বছর ধরে শেয়ার মার্কেটের ওঠানামাও দেখছি। সুতরাং নাফালোকসানের আমি গন্ধ পাই ম্যাডাম। সন্ন্যাসী হোক যাই হোক, বড় কোনও দাঁওয়ের বেপার না থাকলে চাচাজি শহরে রয়ে যেত না।"

"বাড়ির অংশ বাগানোই কি সেই দাঁও?"

"না-না, তার চেয়েও বড় কিছু আছে।"

"কী সেটা? আপনার ভাই আকাশচাঁদজি কি জানেন কিছু?"

আলোকচাঁদ চোখ সরু করে খানেক দেখলেন মিতিনকে। তারপর গরগরে গলায় বললেন, "আকাশ তো চাচাজির দলে আছে। উনার পার্টনার বনেছে।"

"এমন ধারণা হল কেন?"

"মূর্তি কলকাতায় আমার কাছে জিম্মা করে দিয়ে চাচাজির চলে যাওয়ার কথা। সেই মূর্তি তো দিচ্ছেনই না, উল্টে বাড়ির অংশ না দিলে মামলা করার ভয় দেখাচ্ছেন চাচাজি। কাল আকাশের সঙ্গে ওই নিয়ে ডিসকাস করতে গেলাম, ও আমায় উলটোসিধা বলে ভাগিয়ে দিল," আলোকচাঁদের মুখে বাঁকা হাসি, "এবার দ্যাখ, তোর চাচাজি তোকে কী দেয়!"

"শুনেছি আপনার চাচাজির কাছে নাকি কী সব নথি আছে?" মিতিন হাওয়ায় কথাটা ভাসিয়ে দিল, "বোধ হয় গুপ্তধন বা ওই ধরনের কিছু?"

আলোকচাঁদের চোখের মণিজোড়া দপ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক। ধূর্ত হেসে বললেন, "আছে তো আছে। এ বাড়িতেই আছে। থাকবে। এ বাড়ির ভাগ তো আমি কাউকে দিব না। মরার আগে গভর্নমেন্টকে বাড়ি দিয়ে যাব, সেও ঠিক আছে, লেকিন ওই চাচা-ভাতিজার কপালে কিছু মিলবে না।"

"বুঝলাম," মিতিন ঠোঁট চাপল, "তা যে কাজের জন্য আসা, সেটা হয়ে যাক।"

"কী বলুন তো?"

"আপনারা তিনজনে যতখুশি লড়াই করুন। কিন্তু পুলিশকে তার কাজটা করতে দিন," মিতিন অল্প হাসল, "মূর্তিটা এবার ফেরত দিন।"

আলোকচাঁদ আকাশ থেকে পড়লেন, "মূর্তি তো আমার কাছে নেই।"

"আপনি কিন্তু একটু আগেই স্বীকার করেছেন..."

"উঁহু, আমি বলছি, মূর্তিটা যদি এনেও থাকি, কাজটা অন্যায় নয়," আলোকচাঁদ নির্বিকার, "তার অর্থ কিন্তু এই নয়, পার্শ্বনাথজির মূর্তি আমি সরিয়েছি।"

"তা হলে তো এ বাড়িটা একটু খুঁজেপেতে দেখতে হয়। যদি সার্চ ওয়ারেন্টের কথা বলেন তো আনিয়ে নিতে পারি। তাতে কি আপনার সম্মান বাড়বে?"

আলোকচাঁদ কী যেন ভাবলেন একটু, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সহজ গলায় বললেন, "বেশ, দেখুন আমার ঘরটর। সন্দেহটা মিটিয়েই যান।"

পাঞ্জাবির নীচে কোমরে বাঁধা বটুয়া থেকে মস্ত একটা চাবির গোছা বের করলেন আলোকচাঁদ। বসার জায়গার লাগোয়া একখানা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "এটাই ছিল আমাদের বৈঠকখানা। এখান থেকেই শুরু হোক।"

ঘরটা মোটামুটি বড়ই। আগেকার দিনের আসবাবে ঠাসা। নানান কিসিমের পুতুলে সাজানো কাচবসানো কাঠের শোকেস, চিত্রবিচিত্র রং করা সিলিং, শ্বেতপাথরের টেবিল, প্রকাণ্ড ডিভান, সর্বত্র অতীতের ছোঁয়া। দেওয়ালে পর-পর পূর্বপুরুষদের অয়েল পেন্টিং, বাঁধানো ফোটোও আছে কয়েকটা। পুরনো হলেও এ ঘরের কোনওকিছুই তেমন মলিন নয়। দেখেই মালুম হয়, নিয়মিত হাত পড়ে এই কক্ষে।

একটামাত্র টিউবলাইটের ম্যাড়মেড়ে আলোয় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে-করতে মিতিন বলল, "আপনার কাজের লোকজন কোথায়?"

"সারাদিনের জন্য কেউ থাকে না," আলোকচাঁদের তুরন্ত জবাব, "পিতাজির আমলের একজন আছে, সকাল ছ'টায় আসে, সন্ধের মুখে-মুখে চলে যায়।"

"দু'বেলার রান্নাবান্নাও কি তিনিই করেন?"

"আমি একাহারী। সূর্যাস্তের পর জলও স্পর্শ করি না।"

"আপনি তো খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ।"

"ধর্মের অনুশাসন মেনে চলি। একজন সত্যিকারের জৈনের মতো," আলোকচাঁদ ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, "সেই জন্যেই তো বলছি, চাচাজি কেন, মন্দির কি আমিই বানাতে পারি না? মূর্তি আমাকে দিয়ে যেতে ওঁর কী অসুবিধে ছিল? যত্তসব অন্যের কাঁধে চেপে নাম কেনার ফিকির!"

"হুম!" মিতিন অল্প ঘাড় নাড়ল। ঘরময় ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ থামল। একটা বাঁধানো ফোটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইনি কেন?"

"আমার পিতাজি," আলোকচাঁদ দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, "স্বর্গীয় শ্রী দীপচাঁদ শেঠ।"

মিতিন ডাকল, "অ্যাই টুপুর, দ্যাখ তো এঁকে চিনতে পারিস নাকি?"

টুপুর সরু চোখে দেখল ফোটোটা। পাগড়ি মাথায় এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক। মুখখানা বেশ ফোলা-ফোলা, মোটা পাকানো গোঁফ, চৌকো ফ্রেমের চশমাপরা বড়-বড় চোখ...টুপুর কি কখনও দেখেছে?

টুপুর দু'দিকে ঘাড় নাড়ল, "উহুঁ, মনে পড়ছে না তো।"

"ভাল করে লক্ষ কর।"

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল টুপুর। চোখজোড়া যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। আকাশচাঁদের সঙ্গে হালকা মিল আছে কি? নাকি অন্য কারও কথা বলছে মাসি? টুপুর হাল ছেড়ে দিল। মিতিন টুকুস করে স্মার্টফোনে একটা ফোটো তুলে নিল ছবিটার।

অমনি আলোকচাঁদ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, "এসব কী হচ্ছে?"

মিতিনের জবাব, হামেহাল হাজির, "আমার বোনঝিকে ওদের স্কুল থেকে জৈনদের উপর একটা প্রোজেক্ট করতে বলেছে। ওতে আপনার বাবার ফোটোটা দিয়ে দেব ভাবছি। অভিজাত জৈন হিসেবে ওঁর চেহারাটা বেশ মানাবে।"

"উনি তো অভিজাতই ছিলেন।"

"শেষ বয়সে মাথাটায় একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, এই যা..."

"কে বললেন? চাচাজি? উনি চলে যাওয়ার দুঃখেই কিন্তু পিতাজি..."

পুরনো কাহিনি বলছেন আলোকচাঁদ, কিন্তু মিতিন যেন শুনছেই না। খোঁজাখুঁজিতেও মন নেই, একের পর-এক তৈলচিত্র দেখে চলেছে। ছবির একদম কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে কী যেন। চিত্রকরের নাম খুঁজছে? হবেও বা। দেওয়ালের মধ্যিখানে প্রথম জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবিটি বিশাল। রক্তবর্ণ পাথরবসানো পাগড়িধারী ব্যবসায়ীর প্রতিকৃতির সামনে পা আটকে গিয়েছে মিতিনের।

"সন্ধান মিলল?"

আলোকচাঁদের বিদ্রুপ মেশানো প্রশ্নের জবাবে মিতিনের মুখে কুলুপ।

আলোকচাঁদ ফের বললেন, "এবার আমাদের রান্নাঘর, ভাঁড়ার দাসদাসীদের রুমগুলোয় চলুন। বহুকাল অবশ্য ব্যবহার হয় না। তারপর দোতলা। আলমারি-বিছানা-তোষক-বালিশ খুলে ছিঁড়ে দেখুন কুছ মেলে কিনা।"

মিতিন একটুও চটল না। বরফশীতল স্বরে বলল, "থাক, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

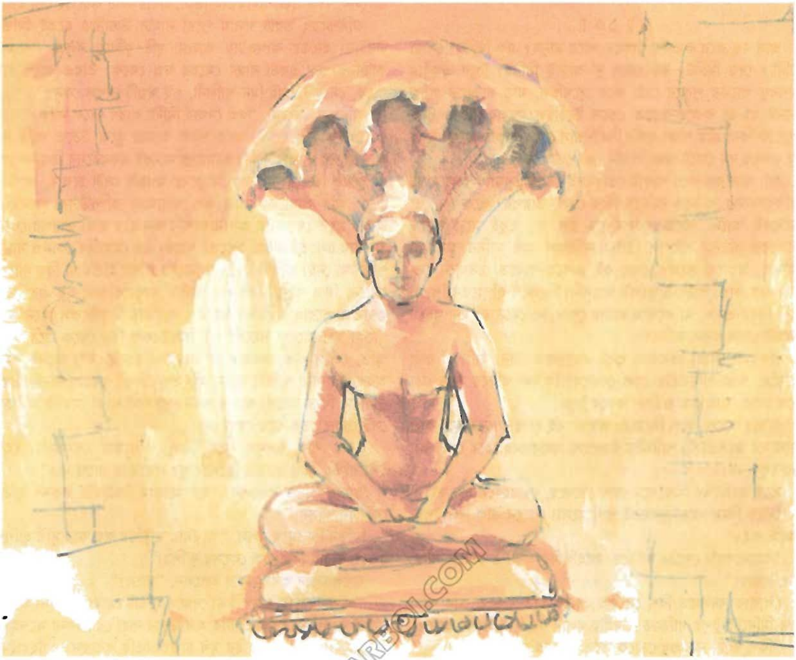

দরকার নেই।"

"সে কী? কেন? জোশ খতম?"

"বলতে পারেন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

আলোকচাঁদকে চমকে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুরকে নিয়ে নতমস্তকে বিদায় জানাল আলোকচাঁদকে।

বাইরে এসেও মিতিন ম্রিয়মাণ। স্টার্ট দিল গাড়িতে, চলছে ধীরে। পরেশনাথের বড় মন্দিরটার গেটে দাঁড়াল। টুপুরকে বলল, "চল, ভিতরটায় গিয়ে বসি একটু?"

টুপুর মাসির চকিত ভাবান্তরে অবাক, "কেন গো? মিশন ফেল করল?"

"পুরোটা নয়। শুধু একটা পয়েন্ট মিলছে না। মহিমাপুরে যেতে হবে।"

"মহিমাপুরে কেন?"

"ওখানেই জগৎ শেঠদের আদি বাড়ি। স্বপ্নের তালা খোলার চাবি হয়তো ওখানেই মিলবে।"

"বুঝলাম না। কী হেঁয়ালি করছ?"

"চল, বুঝিয়ে বলছি।"

অন্দরের প্রশস্ত চাতালটা প্রায় ফাঁকা। অদূরে মন্দিরের সিঁড়ি। উপরে মূল মন্দিরে ঝলমল করছে আলো। সেদিকে তাকিয়ে মিতিন বলল, "সুন্দর না মন্দিরটা?"

"সো-সো। আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না?"

"কেন রে? ছেলেবেলায় তো পরেশনাথ মন্দিরের নাম শুনলেই লাফাতিস।"

"ছেলেবেলায় কী বিশাল মনে হত। মন্দিরের চুড়োটা কত উঁচু দেখাত তখন। এখন মোটেই সেরকম লাগছে না," টুপুর বিজ্ঞের সুরে বলল, "ছেলেবেলায় দেখা অনেক প্রকাণ্ড জিনিসই বড় হলে আর তত বড় লাগে না। ফলে সেই চার্মটা আর আসে না।"

হঠাৎ মিতিনের চোখদুটো বড়-বড় হয়ে গেল। টুপুরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঠাসঠাস চড় মারছে নিজের গালে। বিড়বিড় করছে, "ছিঃ, এই সামান্য জিনিসটা খেয়াল হয়নি?"

টুপুর অস্ফুটে বলল, "কী খেয়াল হয়নি গো মাসি?"

আচমকা টুপুরকে জড়িয়ে ধরেছে মিতিন। চকাস করে গালে চুমু খেল। টুপুরের নাকখানা নেড়ে দিয়ে বলল, "ওরে, তুইই তো আমায় মোক্ষম সমাধানটা দিলি।"

টুপুর হতবুদ্ধির মতো বলল, "মানে?"

"মানে বুঝে আজ কাজ নেই," শচীন দেববর্মনের সুরে গেয়ে উঠল মিতিন। হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল টুপুরকে, "এখন বাড়ি চল। বাকিটা কাল হবে।"

"কাল কী হবে?"

"যবনিকা উত্তোলন।"

"কীসের?"

"উঁহুঁ, এখন কোনও প্রশ্ন নয়। চটপট গাড়িতে ওঠ। এক্ষুনি ফিরতে হবে। রাতভর কত কাজ, কত কাটাকুটি প্লাস-মাইনাস...আর হ্যাঁ, কাল স্কুল থেকে ফিরে...হা হা হা...মাদারির খেল দেখবি...ঝিকিসঝ্যাক...চিচিংফাঁক...

কী আবোলতাবোল বকছে মাসি? পাগল হয়ে গেল নাকি? অথবা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপুরই যা দেখলে-শুনছে, তা সত্যি নয়। স্বপ্ন।

॥ ১০ ॥

শ্বাস বন্ধ করে কতক্ষণ থাকতে পারে মানুষ? এক মিনিট? সোয়া মিনিট? দেড় মিনিট? বড় জোর দু'-আড়াই মিনিট? টুপুর একবার দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে চেষ্টা করে দেখেছিল, মাত্র সাতাত্তর পর্যন্ত গুনেই হা হা করতে-করতে ভেসে উঠেছিল জলের উপর। সেই টুপুরকে কিনা প্রায় পাক্কা একটা দিন নিশ্বাস চেপে থাকতে হচ্ছে। টুপুর যে এখনও দম ফেটে অক্কা পায়নি, এই তো ঢের।

হ্যাঁ, শ্বাস বন্ধ করে থাকাই তো। সেই যে মিতিনমাসি কাল রাতে হাতিবাগানের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল, তারপর থেকে দম তো আটকেই আছে। রাতে একদম ঘুম হল না, শুধুই মনে পড়ছে কালকের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটের অভিযান আর মাসির অসংলগ্ন আচরণ। সকালে স্কুলেও গেল ওই ভাবতে-ভাবতে। সেখানে তো আর-এক কাণ্ড, শালিনী স্কুলেই আসেনি। বিকেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরে শুনল, না এসেছে মাসির ফোন, না মেসোর। মান খুইয়ে নিজেই ফোন করল মাসিকে।

একবার। দুবার। তিনবার। শুধুই এনগেজড টোন। মাসি না কথা দিয়েছে, আজ ভানুমতীর খেল দেখাবে! বিকেল গড়িয়ে সন্ধে তো হতে চলল, আর কত প্রতীক্ষা করবে টুপুর!

রাস্তার আলো জ্বলে গিয়েছে। অগত্যা বই খুলে বসতেই হয়। কাল ম্যাথসের ক্লাস টেস্ট, শালিনীর স্বপ্নরহস্য সমাধানের চেয়ে সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সবে জ্যামিতির থিওরেমে চোখ রেখেছে, ডোরবেলে ডিং ডং।

দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই পার্থমেসো। পিছনে উঁকি দিল টুপুর, "মাসি কই?"

"আলোকচাঁদ শেঠের বাড়িতে। সহেলিদির অনুমতি করিয়ে নিচ্ছি, চটপট আয়।"

পোশাক বদলাতে বিশ সেকেন্ড, মাকে হাত নাড়তে আর পাঁচ। আধ মিনিটেই টুপুর গাড়িতে। উদগ্রীব গলায় বলল, "কী হল আজ?"

"কিচ্ছু জানি না। শুধু তোকে তুলে আনতে বলল।"

"কে আছে ওখানে? শুধু মিতিনমাসি?"

"কিছুই জানি নারে। তুইও যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে।"

বুকে ঠাঁই ঠকাঠক তেহাই নিয়েই ফের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট। ফাঁকা-ফাঁকা রাস্তাটা আজ যেন আরও বেশি নির্জন। সামনে পথবাতিটা জ্বলছে না, আধো আলোছায়ায় আলোকচাঁদের বাড়ি আজ আরও রহস্যময়।

দরজা খোলাই ছিল। ঢুকে থমকে গেল টুপুর। আলোকচাঁদের বসার জায়গা তো প্রায় ভর্তি। দুই ভাই, সন্ন্যাসী কাকা, এমনকী, স্বয়ং অনিশ্চয়আঙ্কলও ডিভানে আসীন। সবচেয়ে বড় চমক, শালিনী। বাবার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে।

ধন্দ লাগল টুপুরের। শালিনীর বাবা-জ্যাঠা-দাদু কাউকে না-কাউকে আজ অপদস্থ করবে মাসি, এখানে শালিনীকে না রাখাটাই তো ঠিক ছিল। যাকগে, মাসি যা ভাল বুঝছে, তাই করছে নিশ্চয়ই। মিতিনের একহাতে স্মার্টফোন, অন্য হাতে একটা কাগজ। টুপুরকে আঙুল নেড়ে ডাকল। কাছে যেতেই নিচু গলায় বলল, "শালিনী হংসোমধ্যে বকো যথা হয়ে আছে, তুই আর ও একসঙ্গে বোস। তার আগে এই ফোটোগুলো দ্যাখ আমার ফোনে।"

সামান্য ঝুঁকল টুপুর। মাসির ফোনের মনিটরে পর-পর পাঁচখানা ফোটো। প্রথম ফোটোতে আকাশচাঁদ, আলোকচাঁদের বাবা। পরেরটায় মাথায় পাগড়ি নেই। তারপরেরটায় গোঁফ উধাও। তারপরেরটায় গালের ফোলাভাবটা কম। শেষের ফোটোয় চশমাটাও নেই। কী কাণ্ড, এ তো আহিরচাঁদ! ফোটোশপে একটু কারিকুরি করতেই মিলটা চলে এসেছে। এই জন্যই মাসি কাল বারবার বলছিল, ছবির মানুষটাকে টুপুর চেনে, অথচ টুপুর বুঝতেই পারেনি! নাহ, টুপুর মোটেই মাসির থার্ড আইয়ে কাজ করার যোগ্য নয়।

ব্যস্ত মানুষ অনিশ্চয় মজুমদার ঘড়ি দেখছেন। গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কি প্রজ্ঞাপারমিতাম্যাডাম, এবার স্টার্ট করলেই তো হয়।"

অনিশ্চয়ের ভরাট গলায় পুরো নামটা উচ্চারিত হতেই মিতিন টানটান। হাতের কাগজটায় আলগা দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, "আমার কাহিনির শুরু একটা বাচ্চা মেয়ের স্বপ্ন থেকে। তারও আগে প্রশ্ন থাকে, মেয়েটি, আই মিন শালিনী, ওই স্বপ্নটি দেখল কেন?"

অনিশ্চয় বললেন, "স্বপ্ন দেখার নির্দিষ্ট কারণ থাকে নাকি?"

"থাকে তো বটেই, তবে সর্বদা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আসলে স্বপ্ন ব্যাপারটা কী? আমাদের মনেরই একধরনের ক্রিয়াকলাপ, যা ঘুমের ভিতরে চালু হয়। মানুষের মগজই সেটা চালায়, কন্ট্রোল করে। আর আমাদের মগজ এক অসামান্য কম্পিউটার। আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকে সে আপনাআপনি অন হয়ে যায়। তারপর থেকে অবিরাম চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। এর মেমারির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় যা কিছু দ্যাখে, শোনে, ফিল করে, সবই এর অসীম ভাণ্ডারে জমা হয় এবং তার কণামাত্র পুরোপুরি ডিলিট হয় না। বড়জোর রিসাইকেল বিনে জমা থাকে। স্বপ্ন অনেক সময়েই ওই রিসাইকেল বিন থেকে উঠে আসা স্মৃতি, জেগে থাকা অবস্থায় যা আমাদের মনেই নেই। অনেক সময় অবশ্য সরাসরি স্মৃতিটা আসে না, তখন কিছুই হয়তো নানান উদ্ভট চেহারায় ফিরে আসে। আবার কখনও বা জমা থাকা মেমারি অবিকল সেই চেহারাতেও স্বপ্নে দেখা দেয়।"

এবার পার্থ উসখুস করে উঠল, "তোমার লেকচারটা বেশ ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ধরতাই হিসেবে খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে না?"

আলোকচাঁদও বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম, কাটছাঁট করুন। মূর্তির কেসটায় আসুন।"

মিতিন স্মিতমুখে বলল, "আপনার ভাইঝির স্বপ্ন আর মূর্তি হাপিশ হওয়া, দুটোই কিন্তু এক কেসের দু'পিঠ।"

আলোকচাঁদ অবাক সুরে বললেন, "মানে?"

"আপনার ভাইঝি স্বপ্নটি না দেখলে মূর্তিটি খোয়া যেত না। আবার মূর্তিটি না গায়েব হলে স্বপ্নটার অর্থ উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ।"

আকাশ-আলোক-আহির মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। আহিরচাঁদই বললেন, "বেশ, আপনার ভাষণই শুনি তবে।"

মিতিন শান্ত ভাবে বলল, "না, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। স্বপ্নটা আপনাদের কারও অজানা নয়। শুধু বলি, স্বপ্নের উৎসটি আকস্মিক।"

"কীরকম?"

"আকাশজি-আলোকজি আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আপনার চাচাজির সঙ্গে আপনাদের বাবার বেশ মিল। অন্তত খুব ছেলেবেলায় শালিনী তার দাদুকে যেমনটা দেখেছিল, সেই চেহারাটা এখনকার আহিরচাঁদজির সঙ্গে অনেকটাই মেলে। আমি কি ভুল বলছি, আকাশচাঁদজি?"

একটু চমকেই কাকার দিকে তাকালেন আকাশচাঁদ। তাঁর মুখে ক্রমশ একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। দু'দিকে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো। চাচাজিকে শেষ বয়সের পিতাজির মতোই লাগছে বটে। কিন্তু তখন তো আমার শালু এত্তটুকুন। ভাল করে কথাও ফোটেনি।"

"একদম ঠিক," মিতিন সায় দিল, "কিন্তু ওর মগজের গুহায় দাদাজির ছবিটা রয়েই গিয়েছিল।"

"আহিরচাঁদের মুখখানা শালিনীর অজান্তে উসকে দিল সেই আবছা স্মৃতি। তার সঙ্গে এই বাড়িটার পুরনো কিছু গল্প। আহিরচাঁদজি যা শুনিয়েছিলেন শালিনীকে। সব মিলেমিশে খুব বাচ্চাবেলায়, প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় এবাড়িতে দাদুকে যেমনটি দেখেছিল, সেটাই ফিরে এল স্বপ্নে। কিন্তু দুঃস্বপ্ন হয়ে।"

"কেন? দুঃস্বপ্ন কেন?" টুপুরের পাশে বসা শালিনীর মুখ দিয়ে আচমকা প্রশ্ন ঠিকরে এল, "দাদাজি নিশ্চয়ই আমাকে খুব ভালবাসতেন, আদর করতেন। তাঁর মেমারি অমন ভয় দেখানো হবে কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্বপ্নটা স্মরণ করো, ওখানেও তিনি তোমাকে আদরই করছিলেন। যেমন দাদাজিরা করেন নাতি-নাতনিদের। কিন্তু স্মৃতি সামান্য বেঁকেচুরে গিয়ে তোমাকে ভীষণ ঘাবড়ে দিয়েছিল।"

"কিন্তু এর মধ্যে পার্শ্বনাথজির মূর্তিটা কোথায়?" ফের আলোকচাঁদের গলা বেজে উঠেছে, "আপনি এইমাত্র বললেন না স্বপ্নের জন্যই চুরি..."

"হ্যাঁ, আলোকচাঁদজি। আমি এখনও তাই বলছি," মিতিন শান্ত, "তবে সেজন্য আহিরচাঁদজিকে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করা প্রয়োজন।"

"যাঃ বাবা, আমি কী করলাম?"

"সেই প্রসঙ্গেই তো আসছি," মিতিনের ঠোঁটে একচিলতে হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, "আপনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন ধরেই কলকাতায় ফিরে আসার জন্য ছটফট করছিলেন। তার কারণও ছিল। আপনি নেতার আসনে থাকতে ভালবাসেন, কিন্তু কিছুতেই রনকপুরের আশ্রমটির কর্তৃত্ব পাচ্ছিলেন না। আমার কথা অস্বীকার করতে পারেন, আহিরচাঁদজি? খবরটা কিন্তু পাক্কা, খোদ রনকপুর থেকে পাওয়া।"

আহিরচাঁদ নীরস গলায় বললেন, "মারোয়াড়িই হই বা রাজস্থানি, বাংলাই আমার দেশঘর সব কিছু। সেখানে ফিরতে চাওয়াটা কি দোষের?"

"একেবারেই না। বরং বাংলাকে, কলকাতাকে, ভালবাসা তো আপনাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নয়-নয় করে প্রায় তিনশো বছর আপনাদের পরিবার আছেন এরাজ্যে। সেই সুবাদে আপনারা তো আমাদের অনেকের চেয়েই বেশি বাঙালি।"

"তা হলে খামোকা রনকপুরের কথা পাড়ছেন কেন?"

"একেবারে অকারণে নয় গুরুজি। ওখান থেকেই আপনার ফেরার প্ল্যান শুরু হয়েছিল কিনা।"

"কী বলছেন? নিজের শহরে আসব, তার জন্য প্ল্যান লাগে নাকি?"

"আপনি তো একজন সাধারণ জৈন সাধু হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চাননি। একটু বিশেষ মর্যাদার আসন চেয়েছিলেন আপনি। তার জন্য এগিয়েছেন ধাপে-ধাপে।"

"তাই বুঝি? আপনি সব জেনে ফেলেছেন দেখছি?"

আহিরচাঁদের শ্লেষ গায়ে মাখল না মিতিন। ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনার দুই ভাইপোর রনকপুরে যাতায়াত আছে, প্রথমে তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য পার্শ্বনাথজির কাহিনিটা বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। মানে, আপনার কাছে ওই মূর্তিটা আছে, আপনি সেটি ভাইপোদের হাতে তুলে দিতে চান, এইসব।"

"হ্যাঁ, তাই তো চেয়েছিলাম। এখনও চাই।"

"দাঁড়ান, আমি সবটা বলে নিই। এর পর আপনি নামলেন ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে। শুধু ছোট ভাইপোকে বললেন সেই কাহিনিটা, যা বিশ্বাস করে আপনার বড় ভাই দীপচাঁদজি শেষজীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।"

"কোন কাহিনি? হিরে-জহরত?" আকাশচাঁদ প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন, "চাচাজির কাছে ফারসিতে যেটা লেখা আছে?"

"গয়না, পাথর, সোনাদানা আদৌ আছে কিনা, অন্য কথা। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।"

আলোকচাঁদ রাগী চোখে একবার ভাইকে দেখছেন, একবার চাচাজিকে। তাঁর দৃষ্টিটা পড়ে নিয়ে মিতিন বলল, "কিন্তু ওই গুপ্তধনের গাজর নাকের ডগায় ঝুলিয়ে আকাশচাঁদজিকে হাত করে ফেললেন চাচাজি। উদ্দেশ্য, জমিবাড়ির অংশ ফেরত চাওয়ার সময়ে যেন আকাশচাঁদ তাঁর পক্ষে থাকেন। কিন্তু শালিনীর স্বপ্ন যে প্ল্যানটাকেই বদলে দিল।"

"কীভাবে?"

"আহিরচাঁদজি খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। পণ্ডিতও। আমি স্বপ্ন সম্পর্কে গোড়ায় যা-যা বললাম, সবই ওঁর জানা। স্বপ্নটা শোনামাত্র উনি বুঝে গেলেন, ওই দেওয়াল ফাঁক হয়ে যাওয়াটা কোনও অলীক ঘটনা নয়। ঘোরতর বাস্তব এবং ওই দেওয়ালের ওপারেই সন্ধান মিলতে পারে গুপ্তধনের।"

"তাই পাঁচকান করতে মানা করেছিলেন?" টুপুরের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়েই গেল, "যাতে গুপ্তধনের ব্যাপারটা বেশি চাউর না হয়?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক। ওই কারণে শালিনীর উপর একগাদা বারণ চাপল। ওদিকে জমিবাড়ির অর্ধেকের বদলে বাড়ির আসল জায়গাটা চেয়ে বসলেন আহিরচাঁদজি। জুড়লেন মন্দির বানানোর বাসনাটা। ব্যস, অমনি আলোকচাঁদজি চটে লাল। মূর্তিটাও কাছছাড়া করছেন না, উলটে এই আবদার, তিনি মানবেনই না। তখন আহিরচাঁদজি আর-একটি মতলব ভাঁজলেন। মূর্তিটাই চুরির নামে ভ্যানিশ হয়ে গেল।"

"মানে?" অনিশ্চয়ের ভাঁটার মতো চোখ দু'খানা ঝলসে উঠল, "চুরিই হয়নি মূর্তি? গোটাটাই সাধুজির নাটক?"

"কিন্তু কেন?" টুপুরের প্রশ্ন, "মিছিমিছি সব্বাইকে ব্যস্ত করে ওঁর কী লাভ?"

"আছে। একটা নয়, দুটো। এক নম্বর, মূর্তি না উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত নির্বিবাদে রয়ে যেতে পারবেন কলকাতায় এবং এই বাড়িতে এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এটাই বেশি মারাত্মক, আলোকচাঁদকে বাড়ি থেকে হঠানো।"

"তা কী করে সম্ভব?"

"সেইখানেই তো আহিরচাঁদের খেল। আলোকচাঁদ সেদিন বিকেলে আসবেন বলেছিলেন ধর্মশালায়। রোজ দেব-দেব বলেও দিচ্ছেন না, সেদিন তিনি মূর্তি নেবেনই। আকাশকে সঙ্গী করতে ভাইয়ের বাড়ি গেলেন আলোকচাঁদ। চাচাজি ভাইকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, যেন সে ওইদিন কোনওভাবে দাদাকে এড়িয়ে যায়। এবার চুরির পর পুলিশি তদন্ত হলে আলোকচাঁদের ধর্মশালায় আগমন প্রকাশ পাবেই। কোথাও না-কোথাও তাঁর আঙুলের ছাপ মিলবেই। তখন গ্রেফতার হবেন আলোকচাঁদ, সেই অবসরে আকাশকে নিয়ে এবাড়িতে ঢুকে পড়বেন চাচাজি এবং নিশ্চিন্তে খোঁজ চালাবেন গুপ্তধনের।"

"আইব্বাস, নিখুঁত ছক!" পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "ঝানু ক্রিমিনালদেরও মাথায় আসবে কিনা সন্দেহ!"

"কিন্তু ফেল। আলোকচাঁদ সেদিন গেলেন না ধর্মশালায়।"

"সে যাই হোক, বদমাইশি বুদ্ধিটার তারিফ করব না!"

"ওভাবে ওঁকে অসম্মান কোরো না। আহিরচাঁদজির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মন্দ ছিল না। ধনরত্ন পেলেও উনি তো ভোগ করতেন না। মন্দির গড়তেন। জৈন সন্ত হিসেবে একটা স্থায়ী কীর্তি রচনা করতেন," মিতিন আহিরচাঁদের চোখে চোখ রাখল, "এটাই তো আপনি চেয়েছিলেন, তাই না গুরুজি?"

আহিরচাঁদ নীরব। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে নামিয়ে নিয়েছেন মাথা।

"তা হলে কি হিরে-জহরত নেই?" আকাশচাঁদের দুরুদুরু জিজ্ঞাসা, "চাচাজির ওই লেখাটায় কিন্তু..."

"ওটা জাল," মিতিনের ঘোষণায় চমকে তাকালেন আহিরচাঁদ। মিতিন তাঁকেই বলল, "হ্যাঁ, ওটা আপনি বানিয়েছেন। একটা পুরনো-পুরনো চেহারাও দিয়েছেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।"

আহিরচাঁদের দু'চোখে প্রবল বিস্ময়। মিতিন বলল, "ওই দলিলে এমন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ রয়েছে, যেগুলো আড়াইশো বছর আগের ফারসিতে ছিলই না। যেমন, লেখার একদম শেষে আছে, মের্সি। অর্থাৎ ধন্যবাদ। এটাও ফ্রেঞ্চ। কিন্তু সবে দেড়শো বছর আগে ঠাঁই পেয়েছে ফারসি ভাষায়। সুতরাং দলিলটি শেঠ ফতেচাঁদের সময়ে লেখাই হয়নি। আপনি ফারসি শিখেছেন বড়জোর তিরিশ বছর আগে, তাই হয়তো অজান্তেই হয়ে গিয়েছে ভুলটা।"

টুপুরের চোখ কপালে। মাসি ফারসি শিখল কবে? নাকি বাবার বন্ধু প্রোফেসর শমিউদ্দিনজেঠুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? মাসির পক্ষে অসম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিকে আর-এক নাটক। আহিরচাঁদ উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক পা, এক পা করে এগোচ্ছেন দরজার দিকে। মিতিনই উঠে গিয়ে থামাল তাঁকে। নরম সুরে বলল, "আপনাকে যে আরও কিছু জানানোর ছিল, গুরুজি।"

আহিরচাঁদ আস্তে-আস্তে মাথা নাড়াচ্ছেন। ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "কিন্তু আমার যে আর কিছু শোনার নেই।"

"তবু গুপ্তধনের রহস্যের চিরতরে ইতি হোক, এ কি আপনি চান না?"

থমকালেন আহিরচাঁদ। এবার বড় ভাইপো সরব হয়েছেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেটুকু যা আছে, যদি পাওয়া যায়..."

"চলুন, সবাই মিলেই সন্ধান করি," মিতিন মুচকি হাসল, "যদিও কিস্যু মিলবে না..."

"কেন? কেন? কেন?"

কোরাসে বেজে ওঠা প্রশ্নে কান না দিয়ে মিতিন গটগট করে ঢুকল কালকের ঘরটায়। থামল একটু। এবার এক পা, এক পা করে জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবির সামনে। টুর গাইডের ভঙ্গিতে বলল, "আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, শালিনীর স্বপ্নে দ্বিতীয় একজনের কথা বলা হয়েছে...ইনিই সেই দ্বিতীয়জন।"

একসঙ্গে অনেক বিস্ময়ধ্বনি, "তাই বুঝি!"

"ইয়েস," মিতিন হাত বাড়িয়ে ছবির ফ্রেমের খাঁজ থেকে একটা সরু লোহার শলাকা বের করে আনল। শলাকাটি ছোঁয়াল ফতেচাঁদের পাগড়িতে। উঁহু, পাগড়ির রক্তবর্ণ পাথরে। তারপর আচমকাই ডান পা তুলে দিয়েছে দেওয়ালে। শলাকা যেখানে ছবিকে ছুঁয়েছে, তার খাড়া নীচটায়। ঘাড় ঘুরিয়ে গোটা দঙ্গলকে বলল, "মনে রাখুন, শালিনীর স্বপ্নে এটাই লাথি।"

বলেই শলাকা আর পা দিয়ে একসঙ্গে চাপ। অমনি এক বিকট ঘড়ঘড় শব্দ। আওয়াজে কেঁপে উঠেছে সকলে। পরক্ষণে পিলে চমকানো কাণ্ড। ছবিসুদ্ধ আস্ত দেওয়াল দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

মিতিন উঁকি দিল দেওয়ালের ওপারে। তারপর মৃদু হেসে বলল, "সিঁড়ি আছে। যান, সরেজমিন করে আসুন।"

হুড়মুড়িয়ে ছুটেছে সকলে। পাথরের সিঁড়ি ধরে নামছে টুপুরও। বড়ঘরের চিলতে আলো এসে পড়েছে মাটির তলার কুঠুরিতে। খোলা সিন্দুক, তামার প্রকাণ্ড জালা রয়েছে বেশ কয়েকটা। সবগুলোই বেবাক ফাঁকা। সোনা-রুপো-হিরে-মুক্তোর একটি কুচিও পড়ে নেই।

একই প্রক্রিয়ায় মিতিন বন্ধ করল দেওয়াল। জুড়ে দিল জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবি। অবসন্ন মুখে আবার বসার জায়গায় ফিরেছেন আকাশ-আলোক-আহির।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে আলোকচাঁদই বলে উঠলেন, "আশ্চর্য, ধনরত্ন সব উধাও! গেল কোথায়?"

মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তা তো জানি না। আপনাদের পূর্বপুরুষরাই শেষ করে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। হয়তো মন্দির বানিয়েছেন, দানধ্যান করেছেন কিংবা ব্যবসায় খুইয়েছেন। তবে এটা বলতে পারি, গুপ্তকক্ষ আবিষ্কার করেই দীপানাথজির মাথার গোলমাল হয়েছিল। কুঠুরি শূন্য, এই ধাক্কাটা উনি সামলাতে পারেননি।"

"তাই হবে হয়তো," আলোকচাঁদ একটা ওজনদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরের মুহূর্তেই সরু চোখে বললেন, "যাক গে যাক, তার জন্য শোক করাও বোকামি। কিন্তু পার্শ্বনাথজির মূর্তিটার হদিশ মিলবে কি?"

মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "আপনি দেখেছেন মূর্তিটা?"

"উঁহু।"

"আকাশচাঁদজি, আপনি?"

"না, চাচাজি বলতেন। তোমাদের হাতেই তো তুলে দেব, একবারেই দেখো। একবার শুধু নজরে পড়েছিল, ওঁর আলমারিতে একটা জিনিস যেন মোড়া আছে কাপড়ে। ওইটাই বোধ হয়..."

"সরি। ওই কাপড়টাই ছিল শুধু। ভিতরে ভোঁভোঁ।"

"মানে?"

"আহিরচাঁদজির কাছে কোনও মূর্তি ছিলই না। সুচারু ভাবে ওই গল্পটা ফেঁদেছিলেন আপনাদের চাচাজি। কলকাতায় পায়ের নীচে শক্তপোক্ত মাটি পাওয়ার আশায়। শালিনীর স্বপ্ন ওঁকে সে সুযোগও করে দিয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।"

দুই ভাই কটমট চোখে দেখছেন কাকাকে। মিতিন অনিশ্চয়কে বলল, "চলুন, আমরা এবার উঠি। ওঁরাও এখন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াগুলো শান্তিতে সারতে পারবেন।"

চারজনে বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে, হঠাৎ দৌড়ে এল শালিনী। টিপ করে মিতিনকে প্রণাম করে বলল, "মাসি, ইউ আর আ জিনিয়াস! ইউ আর গ্রেট!"

অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, "যাক, কেসটায় কিছু ফি মিলল তা হলে!"

পার্থও হাসছে। হাসছে টুপুরও।

ওফ, সত্যি, মাসি খেল দেখাল বটে আজ! আচ্ছা, মাসিকে আজ থেকে ভানুমতী বলে ডাকলে কেমন হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ উপন্যাস

স্যান্ডরসাহেবের পুঁথি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

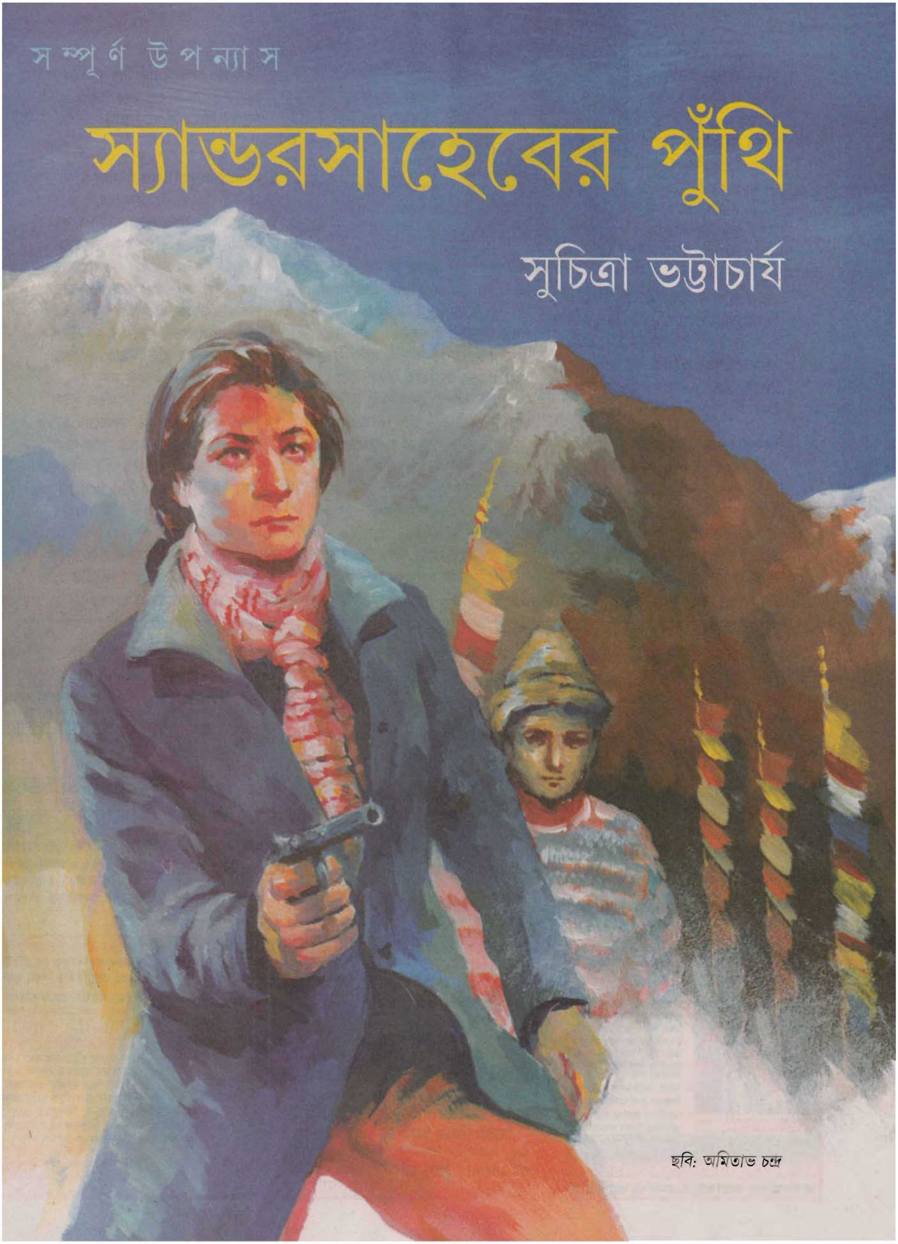

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

এক-একসময়ে পার্থমেসোকে দেখে যা হাসি পায় টুপুরের! বিশেষত রোববারের সকালে। পার্থমেসোকে যেন ভূতে পায়! পাঁচ-পাঁচখানা বাংলা কাগজ ছড়িয়ে বসবে সোফায়। শব্দজব্দের পাতাগুলো খুলে। একবার এই কাগজের ছক মেলাচ্ছে, খানিক পরেই চলে যাচ্ছে আর-একটা কাগজে, সেটা শেষ না করেই আবার একটা কাগজ। ছক মেলাতে-মেলাতে কখনও আপন

মনে গান গেয়ে উঠছে, কখনও অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কখনও বা সোফা ছেড়ে তড়াং লাফিয়ে উঠে পায়চারি করছে ঘরময়। পার্থমেসোর তখন পুরো বেভুল দশা। টুপুর তো ছার, ওই সময়ে মিতিনমাসি, বুমবুমকে দেখলেও চিনতে পারে না। সুখাদ্য ভরা প্লেট পর্যন্ত তখন চোখে পড়ে না মেসোর।

আজও প্রায় সেই হাল। ফ্রেঞ্চটোস্টের পাহাড় সামনে পড়ে, ছুঁয়েও দেখছে না। ঠকাঠক পেনসিল ঠুকছে কপালে, হঠাৎ-হঠাৎ ঘাড় ঝোঁকাচ্ছে কাগজে, পরক্ষণে ঠোঁট উলটে নাচাচ্ছে বুড়ো আঙুল। অর্থাৎ এই শব্দটাও লাগসই হল না।

কোনও মতে হাসি চেপে টুপুর বলল, "কী গো মেসো, তোমার ব্রেন আজ ফেল মেরে গেল নাকি?"

পার্থ যেন শুনতেই পেল না। চোখ পিটপিট করে বলল, "শিশুরা কী টানতে ভালবাসে বল তো?"

সদ্য কেনা প্রকাণ্ড স্মার্ট টিভিতে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট দেখছিল বুমবুম। পুটুস করে বলে উঠল, "হামা।"

"সেটা তো আমিও ভেবেছি। কিন্তু এক ধরনের ধর্মগুরু... দু' অক্ষরের..."

একটু দ্বিধা নিয়ে টুপুর বলল, "মোল্লা? পাদ্রি?"

মিতিন ইংরেজি কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। একটা ফ্রেঞ্চটোস্ট তুলে নিয়ে বলল, "লামাও হতে পারে।"

"হ্যাঁ। লামাই হবে। হামার সঙ্গে আড়াআড়ি মিলবে," পার্থ ঘাড় দোলাল, "কিন্তু রাত্রির এক বিশেষ রূপ... পাঁচঅক্ষর..."

টুপুর অস্ফুটে বলল, "নিশুতি রাত? কিংবা গভীর রাতে?"

"আসছে না।"

"থার্ড লেটারটা কি 'স'? মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তা হলে নিঃসম্পাত হতে পারে।"

"হচ্ছে না। ফোর্থ লেটার সম্ভবত 'ম'," পার্থ ভুরু কোঁচকাল, "আসছে কিছু মাথায়?"

"উঁহু," দু'-চার সেকেন্ড চেষ্টা করে মিতিন হাল ছেড়ে দিল। কৌতূহলী সুরে বলল, "তা প্রথম অক্ষরটা কী?"

"সেটাও তো ছাই আসছে না।... দু' অক্ষরে পরিমাপ। কী-ই হতে পারে? মান? মিতি? কিন্তু 'মা' বা 'মি' দিয়ে কী কোনও বিশেষ ধরনের রাত হয় কি?"

"হুম। সত্যি বেশ কঠিন," মিতিন সায় দিল। খাবার চিবোতে-চিবোতে বলল, "যাক গে, এবার কানটা একটু খাড়া করো। ঘরে তোমার মোবাইল বাজছে। যাও, ধরো।"

অগত্যা পার্থকে উঠতেই হল। ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটায় মুখ বেজার। পেনসিল হাতে যাচ্ছে শোয়ার ঘরে।

টুপুর হাসতে-হাসতে বলল, "শব্দ মেলানোর খেলায় কেন যে এত মজা পায় পার্থমেসো?"

"মানুষ জীবটা বড় আজব রে টুপুর। কে যে কীসে কেন আনন্দ পায়, তা কি ঠাহর করা সোজা কাজ? কোনও বিজ্ঞানী টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে রাতের পর-রাত বসে থাকেন, তাতেই তাঁর আনন্দ। কেউ হয়তো মাটির তলায় কী আছে তা খোঁজার নেশায় মজে থাকে দিনরাত। কেউ সমুদ্রের নীচে কী আছে তাই নিয়ে মশগুল, আবার কেউ বা হাজার-হাজার বছর আগের সভ্যতা খোঁজায় বিভোর। এত সব বৈচিত্র্য আছে বলেই না মানুষ দুনিয়ার সেরা প্রাণী। হাতি কিংবা গন্ডারের এত ধরনের শখ, খেয়াল নেই বলেই না বেচারারা এত শক্তিশালী হয়েও মানুষের হাতে লেজেগোবরে হচ্ছে। তারপর ধর, এই যে মানুষের জ্ঞানপিপাসা..."

বাধ্য ছাত্রীর মতো মিতিনমাসির কথাগুলো শুনছিল টুপুর। এত সুন্দর ভাবে গুছিয়ে ব্যাখ্যা করে মিতিনমাসি। সাধে কী টুপুর ছুটি পড়লেই মাসির বাড়ি ছুটে আসে। কত দুরূহ ব্যাপার যে জলের মতো বুঝিয়ে দেয় মাসি। এই যে সামার ভেকেশনে এবার সে ঢাকুরিয়া এসেছে, মাত্র তিনদিনেই কত কিছু যে জানা হয়ে গেল। সেই প্রাচীনকাল থেকে কত দেশের যে লোক এসেছে ভারতে, কীভাবে তারা এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে পুরোপুরি, এই ভারত থেকেই বা কোথায়-কোথায় মানুষ পাড়ি জমিয়েছিল, তারা এখন সেখানে কেমন আছে, সবই তো মাসির গল্প শুনে-শুনেই জানা হয়ে গেল টুপুরের। মাসির হাতে এখন তেমন কেসটেসও নেই, তাই সারাদিন মাসির সঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে, এটাও তো টুপুরের বাড়তি লাভ। এখন দিনকয়েকের জন্য কোথাও একটা বেড়ানো হয়ে গেলেই টুপুরের গরমের ছুটিটা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

কথাও একটা চলছে বটে। ওড়িশায়। সিমলিপালের জঙ্গলে যাওয়ার। খোঁজখবর চালাচ্ছে পার্থমেসো, তবে প্রোগ্রামটা এখনও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আজ মেসোকে আবার খোঁচাতে হবে। মেসোও বেড়াতে যথেষ্ট ভালবাসে, তবু বারবার ঠেলা না মারলে কাজ হবে না।

ভাবনার মাঝেই পার্থ ফিরেছে। কাঁচুমাচু মুখে মিতিনকে বলল, "একটা গন্ডগোল করে ফেলেছি, বুঝলে।"

"এ আর নতুন কী," মিতিন ঠোঁট টিপল, "আমার কাছে কাউকে আসতে বলে বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ, তাই তো?"

"হ্যাঁ...মানে...তুমি কী করে আন্দাজ করলে?"

"তোমার বলার ভঙ্গি দেখে," আরতি চা রেখে গিয়েছে। কাপ তুলে চুমুক দিল মিতিন। মুচকি হেসে বলল, "চোর-ডাকাত, খুনি-বদমাশ চরিয়ে খাই মশাই, তোমার মতো একটা হাবাগোবা লোকের মনের কথা আঁচ করা কী এমন কঠিন?"

পার্থ দুম করে চটে যাচ্ছিল, কী ভেবে থমকেছে। চোখ সরু করে বলল, "তুমি কী আমাকে খেপাতে চাইছ?"

"যাক ঘট এখনও পুরো খালি হয়নি তা হলে। ...তা কে আসছেন জানতে পারি?"

"আমার বউবাজার পাড়ারই একজন। মানে আমার প্রেসের কাছেই ভদ্রলোকের দোকান। আমার খুব একটা ঘনিষ্ঠ নন। প্রেসে ছাপাতেটাপাতে আসেন, সেই সূত্রেই চেনা, এই যা। তবে তোমার টিকটিকিগিরির যশোগাথা ওঁর কানেও পৌঁছেছে। আর তাই কী এক জটিল সমস্যা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কাল রাত্তিরেই আসতে চাইছিলেন। বার্সেলোনার ফুটবল ম্যাচটা দেখব বলে আমিই নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম রোববার সকালে আসুন।"

"অ। তা কখন আসছেন?"

"এসে পড়েছেন, প্রায় গড়িয়াহাটা পেরিয়ে গিয়েছেন। বাড়ির ডিরেকশনটা আর-একবার জেনে নিলেন," বলেই পার্থ জলখাবারের প্লেটখানা টানল। দ্যাখ না-দ্যাখ ফ্রেঞ্চটোস্ট সাফ। হড়াসহড়াস চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। অন্য সময়ে মেসোর এই তাড়াহুড়ো দেখে হাসত টুপুর, এখন কেমন বুকটা ধুকপুক করছে। কেন আসছেন ভদ্রলোক? কোনও রহস্যফহস্য আছে নাকি? মিতিনমাসি কি নেবে কেসটা? যদি নেয়, তা হলে তো টুপুরের কপাল খুলে গেল। আরও-একবার মাসির শাগরেদি করার সুযোগ মিলবে, এ কি কম কথা?

হঠাৎ মিতিনমাসির গলা কানে এল টুপুরের, "এখনই গোঁফে তা দিস না রে টুপুর। কাঁঠাল এখনও গাছে।"

টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "আরে ধুস। কাঁঠাল, না এঁচোড়, তাই কী এখনও জানি! এঁচোড় হলে তো গাছেই ঝুলে থাকবে। খসে পড়বে না। ঠিক কিনা?"

"উঁহু। কাঁঠালই মনে হচ্ছে," মিতিন পার্থর দিকে ফিরল, "ভদ্রলোকের কীসের দোকান? সোনা-রুপোর?"

"না। বিয়ের কার্ড বানান। আমি ছাপিয়েটাপিয়ে দিই।"

"পুরনো বিজ্‌নেস?"

"আদ্যিকালের। বোধ হয় দু'-তিন পুরুষ ধরে এই কারবার করছেন। দোকানের উপরতলায় বাড়ি। সেই বাড়ির বয়সও না হোক

দেড়-দুশো বছর হবে। খসে-খসে পড়ছিল। রিসেন্টলি মেরামত হল, রংটং করাল।"

"নাম কী ভদ্রলোকের?"

"মনোজ। মনোজ বড়ুয়া। মাসতিন-চার আগে কাগজে মনোজবাবুর নামটা এসেছিল।"

"কেন?"

"কী সব প্রাচীন পুঁথিটুথি নাকি পাওয়া গিয়েছিল ওঁদের বাড়ি থেকে।"

মিতিন কয়েকসেকেন্ড ভাবল। ঘাড় নেড়ে বলল, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সম্ভবত বৌদ্ধ কোনও ধর্মগ্রন্থ। ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই বুদ্ধিস্ট?"

"সে আমি কী করে জানব? শুধু জানি, মনোজবাবুর দেশ পূর্ববঙ্গে। আই মিন, বাংলাদেশে।"

"এবার থেকে এও জেনে রাখো বাঙালি বৌদ্ধদের পদবি সাধারণত বড়ুয়াই হয়।"

"তার মানে ফিল্মজগতের প্রবাদপুরুষ প্রমথেশ বড়ুয়াও বৌদ্ধ?"

"উনি তো বাঙালিই নন। অসমিয়া," মিতিন গুছিয়ে বসল, "বড়ুয়া পদবিটার অনেক হিস্ট্রি আছে, বুঝলে। বড়ুয়া পদবির বাঙালি বৌদ্ধরা সকলেই প্রায় চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তারা প্রায় পাঁচহাজার বছর ধরে ওখানে বাস করছে। শুনলে অবাক হবে, চট্টগ্রাম শব্দটা এসেছে চৈত্য গ্রাম থেকে। চৈত্য মানে জান তো?"

"অতটা মূর্খ ভেবো না। চৈত্য শব্দটা এসেছে চিতা থেকে। অর্থাৎ কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে পোড়ানোর পর তাঁর চিতাভস্ম দিয়ে যে স্মৃতিস্তম্ভ বানানো হয়, তারই নাম চৈত্য।"

"কারেক্ট। অজস্র চৈত্য ছিল বলেই বড়ুয়াদের বাসস্থানের নাম চৈত্যগ্রাম। মুখে-মুখে সেটাই হয়ে গিয়েছে চট্টগ্রাম। ওখানকার বড়ুয়ারা ছিল মহাযানী বৌদ্ধ। আবার তারা হিন্দুদের অনেক আচার বিচারও মেনে চলত। পরে অবশ্য বার্মিজ আর সিংহলিদের সংস্পর্শে এসে তারা অনেকটাই গোঁড়া হয়ে যায়।"

টুপুরের এসব কচকচানি ভাল লাগছিল না। অধৈর্য ভাবে বলল, "কিন্তু ভদ্রলোক মাসির কাছে আসছেন কেন? পার্থমেসো, তিনি তোমায় কিছু বলেননি?"

"জানতেই চাইনি। আমার অত ফালতু কৌতূহল নেই। যাঁর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা পেমেন্ট বের করতে চারবার তাগাদা মারতে হয়, আগ বাড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে আমার ভারী দায় পড়েছে। তবে..."

"কী তবে?"

"মনোজবাবু কেন আসছেন তা আন্দাজ করতে তোর মাসির মতো টিকটিকি হওয়ার প্রয়োজন নেই। নির্ঘাত ওই পুঁথিটুথিগুলো খোয়া গিয়েছে। উনি পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন, তারা হয়তো পাত্তাফাত্তা দেয়নি, তাই তোর মাসির শরণাপন্ন হচ্ছেন।"

"একেবারেই ভুল অনুমান," মিতিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "ক'দিন আগে যে পুঁথি নিয়ে কাগজে খবর বেরিয়েছে, সেটা চুরি গেলে অবশ্যই আর-একটা বড়সড় নিউজ হত। এবং পুলিশও চুরিটাকে হেলাফেলা করতে পারত না। সুতরাং রহস্যটা অন্য কিছু। আর তা যথেষ্ট গভীর।"

"ওই ভেবেই নাচো," পার্থ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "তবে একটা কথা বলে রাখছি। বিনে পয়সায় একদম খাটবে না। তাতে কিন্তু আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "কেন?"

"বা রে, তোর মাসি মাগনায় কাজ উদ্ধার করে দিলে উনি তো ধরেই নেবেন, আমরা খুব মালদার। এবং আমাদের পয়সাকড়ি না দিলেও চলে। অতএব ভবিষ্যতে আমাকেও পেমেন্ট দিতে বহুত হয়রান করবেন।"

পার্থমেসোর বিটকেল যুক্তিতে টুপুর হেসে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই কলিংবেলের ঝংকার। বুমবুম সাঁই ছুটে গিয়েছে দরজায়। পিছন-পিছন পার্থ। পাল্লা খুলতেই দৃশ্যমান হয়েছেন মনোজ বড়ুয়া। বয়স বছরপঞ্চান্ন। বেঁটেখাটো। মাথাজোড়া টাক। গায়ের রং ফরসা। মুখটি মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মনোজ ভারী বিনয়ী ভঙ্গিতে নমস্কার করলেন মিতিনকে। পার্থর আহ্বানে পায়ে-পায়ে গিয়ে বসেছেন সোফায়।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন? না কফি? এই জৈষ্ঠ্যের গরমে এতটা পথ ড্রাইভ করে এলেন, ঠান্ডা শরবতও নিতে পারেন।"

মনোজ যেন সামান্য চমকেছেন। হাতে গাড়ির চাবিটা ঝুলছিল, ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে রাখলেন পকেটে। সামান্য ইতস্তত করে বললেন, "কিচ্ছু লাগবে না। প্লেন জল হলেই চলবে।"

"দিচ্ছি...আপনি বোধ হয় খুব ডিস্টার্বড আছেন, শান্ত হয়ে বসুন।"

জল খেয়ে মনোজ একেবারে চুপচাপ। কথাই বলছেন না। ভদ্রলোককে সহজ করার জন্য মিতিনই শুরু করল আলাপচারিতা। সামনের সোফায় বসে বলল, "আমাদের বাড়ি চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি?"

জবাব দিলেন না মনোজ। শুধু ঘাড় নাড়লেন দু'দিকে।

"আপনাদের আদি বাড়ি তো চট্টগ্রাম, তাই না?"

"প্রপার চট্টগ্রাম নয়। তবে তার কাছেই," এবার স্বর ফুটছে মনোজের, "আমাদের দেশ রাঙামাটি।"

"একসময়ে যার নাম ছিল রক্তমৃত্তিকা? ঠিক বলছি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা তো শুনলাম বউবাজারের পুরনো বাসিন্দা। রাঙামাটি থেকে সরাসরি চলে এসেছিলেন?"

"না। দশ-এগারো পুরুষ আগে আমরা ঢাকায় যাই। বিক্রমপুর। পরে সেখান থেকে কলকাতা।"

"ও।...তা কলকাতায় এখন কে-কে আছে আপনার?"

"আমার জেঠতুতো-খুড়তুতো দাদা-ভাইরা, তাদের ফ্যামিলি, আমার স্ত্রী-ছেলে..."

"যৌথ পরিবার নাকি আপনাদের?"

"ছিল। এখন যে যার মতো পৃথক।"

"একই বাড়িতে?"

"হ্যাঁ। আলাদা-আলাদা অংশে।"

"ও। তা শরিকে-শরিকে সম্পর্ক কেমন? সদ্ভাব আছে?"

"মোটামুটি," বলে একটুক্ষণ থেমে রইলেন মনোজ। তারপর আচমকাই বদলে গিয়েছে তাঁর স্বর। কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "আমার দেবলের বড় বিপদ ম্যাডাম। আমি যে তাকে নিয়ে কী টেনশনে ভুগছি, আপনাকে বোঝাতে পারব না।"

মিতিন ঝুঁকল সামান্য, "কে দেবল?"

"আমার একমাত্র ছেলে। খেয়ালের ঝোঁকে বেরিয়ে এখন তার প্রাণ সংশয় দশা। সে বেঁচে আছে, কী নেই, তাও বুঝতে পারছি না। আপনি অনুগ্রহ করে তার একটা খবর এনে দিন। ভগবান তথাগতর কৃপায় যদি সে এখনও জীবিত থাকে, দয়া করে তাকে রক্ষা করুন।"

টুপুর স্তম্ভিত। পার্থ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মিতিনের কপালে চওড়া ভাঁজ।

তিনজনের কেউই বুঝি কল্পনা করতে পারেনি, মনোজ বড়ুয়া এমন একটা সমস্যা নিয়ে হাজির হবেন আজ।

॥ ২ ॥

মনোজ বড়ুয়ার কথাগুলো মোটেই বোধগম্য হচ্ছিল না টুপুরের। একে তো ঘটনার পরম্পরা থাকছে না, তার উপর ছেলে নিরুদ্দেশ,

নাকি বাড়িতে বলেকয়েই গিয়েছে। তাও যেন স্পষ্ট হচ্ছে না। একবার বলছেন ছেলে কাশ্মীর থেকে ফোন করেছিল, পরক্ষণে বলছেন ফোনটা ছেলের নম্বর থেকে আসেনি, কেউ জোর করে দেবলকে দিয়ে কথা বলাচ্ছিল। মাসি যে খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তারও জো নেই। মাঝে-মাঝেই গলা ছেড়ে যা হাঁউমাউ করে উঠছেন ভদ্রলোক। পার্থমেসো তো বিরক্ত হয়ে চলেই গেল পাশের ঘরে। টুপুরেরও কৌতূহল মাথায় উঠেছে, এখন এই ঘ্যানঘেনে ভদ্রলোক মানে-মানে বিদেয় হলেই সে যেন বাঁচে।

মিতিনেরও হিমশীতল রূপটা বদলে গেল আচমকা। রীতিমতো রূঢ় গলায় বলল, "আমার এখন দরকারি কাজ আছে। আপনি এবার আসুন।"

থতমত খাওয়া মুখে মনোজ বললেন, "তা হলে আমার ছেলের ব্যাপারটা..."

"সরি," মিতিনের সাফ জবাব, "বোগাস কেস আমি নিই না। ছেলে আপনার বহাল তবিয়তেই আছে, আপনি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছেন।"

"কী বলছেন আপনি?" মনোজের মুখ ফ্যাকাসে দেখাল, "ছেলেকে বাঁচাতে বলার পিছনে একজন বাবার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?"

"ধান্দাটা যে কী, সে আপনিই ভাল জানেন," বিচ্ছিরি কর্কশ স্বরে বলল মিতিন। টুপুর হাঁ। ঘরে আসা কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে মাসি এই সুরে কথা বলছে, এ যেন অকল্পনীয়। টুপুরকে আরও বিস্মিত করে মিতিন তেরিয়া ভাবে বলল, "আপনার ছেলে যে সত্যিই নিপাত্তা, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

মনোজ এবার আমতা-আমতা করছেন, "আসলে হয়েছে কী... পুলিশের কাছে তো যাইনি... ডায়েরিও লেখাইনি..."

"ধানাইপানাই ছাড়ুন। সাফ-সাফ বলুন, হ্যাঁ, কি না?"

"না।"

"সে কবে থেকে নিখোঁজ?"

"ধরুন বুধবার," একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন মনোজ। পরমুহূর্তে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, "না-না, বুধবারেই তো দেবল ফোন করেছিল..."

"ফের উলটোসিধে বকছেন?" মিতিন ধমক দিল, "কোথা থেকে ফোন করেছিল ছেলে?"

"কাশ্মীরের শ্রীনগর। মানে তাই তো বলল দেবল।"

"সে কবে শ্রীনগর গিয়েছিল?"

"বোধ হয় আগের দিন।... ওইদিনও হতে পারে।"

"আশ্চর্য, কবে ছেলে কাশ্মীর গিয়েছে তাও গুলিয়ে ফেলছেন?"

"সে আদৌ কোথাও যাচ্ছে কিনা, কিছুই তো বাড়িতে জানায়নি। আর পাঁচটা দিনের মতোই মঙ্গলবার সকালে চান-খাওয়া করে পিঠে ল্যাপটপ চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর ফোন পেলাম তো ওই পরের দিন।"

"রোজ কোথায় যেত আপনার ছেলে? অফিসে?"

"না-না। সারাটা দিন এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে পড়ে থাকত।"

"কেন? গবেষণা করত বুঝি?"

"ওই আর কী। খ্যাপামিও বলতে পারেন। অত ভাল রেজাল্ট করল এম এ পরীক্ষায়, কিন্তু চাকরিবাকরির লাইনে গেলই না। বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকাটাই ছিল ওর জীবন।"

"সে কী বিষয়ে রিসার্চ করছিল?"

"তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বা ওই জাতীয় কিছু। আমি সঠিক বলতে পারব না।"

"হুম। তা মঙ্গলবারেও কি আপনার ছেলে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে গিয়েছিল?"

"লাইব্রেরিয়ান বললেন, দুপুর বারোটা পর্যন্ত ওখানে ছিল দেবল। তবে অন্যদিনের মতো পড়াশুনো করছিল না, মাঝে-মাঝেই মোবাইল ফোনে কথা বলছিল, আর ল্যাপটপ খুলে কীসব কাজ করছিল। তারপর হঠাৎই ব্যাগ গুছিয়ে লাইব্রেরি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। রাতে খোঁজ নেই, পরের দিন সে শ্রীনগরে। তার পরের দিন থেকে আর কোনও সাড়াশব্দই নেই," মনোজের গলা আবার ধরা-ধরা, "যে ছেলে বই ছাড়া দুনিয়ার কিচ্ছুটি জানে না, কলকাতা ছেড়ে নড়তেই চায় না, তার এমন বিচিত্র আচরণে নার্ভাস হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক? চার-চারটে দিন চলে গেল, সে একটি বারের জন্য কারওর সঙ্গে যোগাযোগ করল না... আপনিই বলুন, এর পরেও কি বাবা-মা ভয় পাবে না?"

"আপনার ছেলে তো কচি খোকা নয় মনোজবাবু। হয়তো সে নিজের মনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফোন করার কথা তার মাথাতেই নেই। সে যে বিপদে পড়েছে, এমন একটা উদ্ভট ধারণা আপনার হল কেন?"

"উদ্ভট নয় ম্যাডাম। বিশ্বাস করুন। দেবল শেষ ফোনটা ওর মোবাইল থেকে করেনি। সেটা এসেছিল একটা ল্যান্ডলাইন থেকে। ওর গলাটাও কেমন যেন শোনাচ্ছিল। উত্তেজিত। নার্ভাস। যা বলল, সেও তো কম মারাত্মক নয়।"

"কীরকম?"

"সে নাকি এক্ষুনি একটা বিপজ্জনক কাজে বেরচ্ছে। সেই কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা যতটা, প্রাণ হারানোর ঝুঁকিও নাকি ততটাই।"

"কেন? কোথায় যাচ্ছে সে?"

"স্পষ্ট কিছু জানাল না। শুধু বলল, কোন গুম্ফায় নাকি রত্নখনির সন্ধান মিলেছে। পিছনে ফেউ লাগার আগে সেখানে পৌঁছতে হবে।"

"ফেউ? মানে? আরও কেউ সেই খনির খোঁজ পেয়েছে নাকি? রত্নখনি মানেটাই বা কী?"

"জানি না। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ম্যাডাম। তবে আমার মনে হয়..."

মনোজ হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ভাবছেন কী যেন। মিতিন চোখা স্বরে বলল, "সম্প্রতি বাড়িতে একটা বৌদ্ধ পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। তার সঙ্গে আপনার ছেলের হঠাৎ কাশ্মীর যাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে কী?"

মনোজ মাথা দোলালেন, "আমিও তাই সন্দেহ করছি।"

"কেন?"

"কাগজের খবরটা প্রকাশ হোক, এটা দেবলের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমার জেঠতুতো দাদার ছেলে অতি উৎসাহী হয়ে এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানায়। তাতেই খবরটা চাউর হয়। খুব বিরক্ত হয়েছিল দেবল। তারপর থেকে পুঁথিগুলো সে নিজের জিম্মাতেই রাখত। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতেও কখনও নিয়ে যায়নি। পাতাগুলোর ফোটো তুলে ওই ফোটোগুলো নিয়েই পড়াশোনা করছিল দেবল। ওই পুঁথি থেকেই হয়তো ও অজানা কিছু জানতে পেরেছিল। সেই টানেই হয়তো..."

"পুঁথিগুলো ঠিক কীরকম? তালপাতার? নাকি প্লেটের উপর লেখা?"

"কোনওটাই নয়। পুরনো কাগজের। ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছিল। একটা পাতলা কাঠের বাক্সে যত্ন করে রেখেছিল দেবল। বাক্সটা ধরুন একফুট বাই একফুট," মনোজ একটু থেমে থেকে বললেন, "পরশু আবিষ্কার করলাম, কাঠের বাক্সখানা নেই। সম্ভবত দেবল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।"

"সম্ভবত বলছেন কেন?"

"কারণ দেবল শেষ যেদিন ফোন করল, সেই রাত্রেই বাড়িতে

একটা চোর এসেছিল। রেনপাইপ বেয়ে উঠে দেবলের চিলেকোঠার ঘরেই হানা দিয়েছিল চোর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে বাক্সটার সন্ধানেই এসেছিল। কিন্তু পায়নি।''

"কীভাবে বুঝলেন?''

"ওটা একদম সামনে থাকত যে। দেবলের মাথার বালিশের পাশে। ঘরে ঢুকলেই যে কারওর চোখে পড়বে। ওই জিনিস খুঁজতে কেউ গোটা ঘর তছনছ করে? পায়নি বলেই বোধ হয়...'' মনোজ ঢোক গিললেন, "চোরের কথা ভেবেই তো আরও ভয় পাচ্ছি ম্যাডাম। বোধ হয় এমন একটা কিছু আশঙ্কা করেই দেবল ফেউয়ের কথা বলছিল।''

"হতে পারে,'' মিতিন এবার নড়ে বসল, "এখন মনে হচ্ছে আপনার আগমন নেহাত অযৌক্তিক নয়।''

"আপনি তা হলে দায়িত্ব নিচ্ছেন?'' মনোজের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, "ছেলেটাকে বাঁচাবেন তো?''

"দাঁড়ান-দাঁড়ান। ব্যাপারটা আর একটু বুঝি,'' মিতিন আবার সহজ স্বরে কথা বলছে। মাসির হঠাৎ-হঠাৎ বদলে টুপুরের ভেবলে যাওয়া মুখখানা একবার দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "ওই পুঁথি আপনি পেলেন কোত্থেকে?''

"বাড়িতেই তো ছিল। শোয়ার ঘরের মাথার একটা কুলুঙ্গিতে। আমরা অবশ্য একেবারেই জানতাম না। বহুকাল বাড়িটায় হাত পড়ে না, কড়িবরগার হাল খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই এবার আমার অংশে মিস্ত্রি লাগিয়েছিলাম। ওরাই কুলুঙ্গি থেকে একটা ছোট লোহার তোরঙ্গ বের করে। তার মধ্যেই কিছু পুরনো বইপত্রের সঙ্গে ছিল ওই পুঁথি। আমি ওর মূল্য বুঝতে পারিনি। দেবলই বলল ওটা নাকি অমূল্য সম্পদ। কোন এক সাহেবের লেখা।"

"কাগজে তো সে সব কথা ছিল না। শুধু লিখেছিল প্রাচীন এক মূল্যবান পুঁথি মিলেছে।"

"পাছে বেশি হইচই হয়, তাই দেবলই গোপন করেছিল।"

"আপনাদের বাড়িতে ওই পুঁথি এল কী করে?"

"সেই ধাঁধারও সমাধান করেছে দেবল। আমাদের বংশের ঠিকুজিকুলুজি ঘেঁটে-ঘেঁটে ও দেখেছে, আটপুরুষ আগে আমাদের বড়ুয়া পরিবারেরই একজন বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। নাম হেমকান্ত বড়ুয়া। তিনি বিয়ে-থা করেননি, বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল বিস্তর। সিকিম আর দার্জিলিংয়ের অজস্র গুম্ফাতেও যাতায়াত করেছেন বেশ কয়েকবার। সেই সময়েই নাকি ওই সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।"

"এই সব তথ্য দেবল পেল কীভাবে?"

"ওই সাহেব আর হেমকান্ত নাকি এশিয়াটিক সোসাইটিতেই গবেষণা করতেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম নিয়ে। সোসাইটির লাইব্রেরির পুরনো জার্নালেই নাকি এসবের উল্লেখ আছে। সাহেব নাকি এদেশেই মারা যান। তিব্বতে যাওয়ার পথে। দেবলের ধারণা, হেমকান্ত তখন পুঁথিটি রক্ষা করার জন্যে নিজের কাছে রেখেছিলেন। আমাদের এই কলকাতার বাড়িটি তৈরি হয় সিপাহি বিদ্রোহের আগের বছর। তখন থেকেই এবাড়িতে কোনও ভাবে রয়ে গিয়েছে পুঁথিটি। হেমকান্তর দৌলতে।"

"হুউম," মিতিন মাথা দোলাল, "এবার খানিকটা পরিষ্কার হল।... তা সাহেবের নামটা জানতে পারি?"

"বলেছিল দেবল। কী একটা খটোমটো নাম। মনে পড়ছে না।"

"বটে।... তাই ওই পুঁথিটা কি আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। অন্তত তিন-চারবার।"

"কোন ভাষায় লেখা। সংস্কৃত? পালি? নাকি গ্রিক-ল্যাটিন?"

"দেখে আমার সংস্কৃত মনে হচ্ছিল। কিন্তু দেবল বলল, ওটা নাকি বাংলা। ওরকম সংস্কৃতের ছাঁদে বাংলা হরফ আমি আগে কখনও দেখিনি।"

"সাহেব বাংলায় লিখেছেন? আশ্চর্য তো!" টুপুর প্রশ্ন করে ফেলল, "কী লেখা ছিল?"

"প্রথম কয়েকপাতা ভগবান তথাগতর উদ্দেশে নিবেদিত শ্লোক। আমরা বৌদ্ধরা যাকে বলি সূত্র। তারপর হাতে আঁকা কয়েকটা ছবি। পাহাড়-পর্বতের। মাঝে-মাঝে কিছু লাইন টানা। যেন কোনও দিকনির্দেশ। শেষে পাহাড়ের মাথায় অবলোকিতেশ্বর। তার নীচে কী সব হিজিবিজি কাটা আছে।"

মিতিন শুনল নীরবে। মন্তব্য না করে হেলান দিয়েছে সোফায়। মিনিটখানেক পর হঠাৎই টানটান। গম্ভীর স্বরে বলল, "আপনার কেসটা আমি নিলাম। তবে সফল যে হবই, এই গ্যারান্টি দিতে পারছি না।"

"আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন, এটাই তো আমার সৌভাগ্য। এর পর বাকিটা আমার কপাল," মেঘ সরে এতক্ষণে একফালি হাসি ফুটেছে মনোজের মুখে। উৎসাহিত গলায় বললেন,

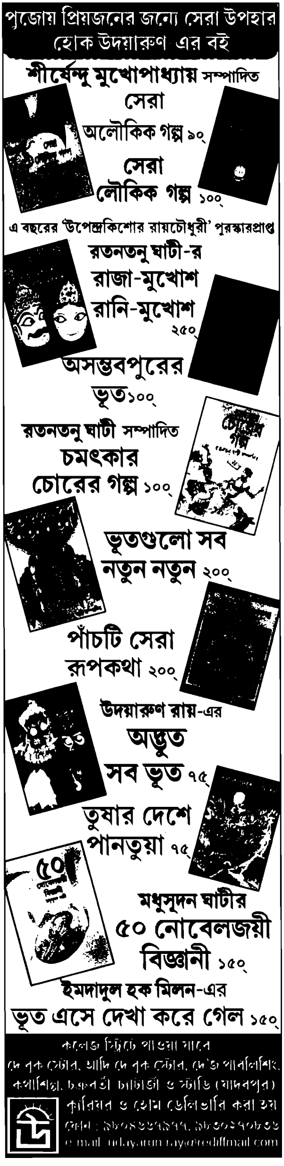

"আপনি তা হলে যাবেন কাশ্মীর?"

"যেতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পারলে কালই। একটুও সময় নষ্ট করা বোধ হয় ঠিক হবে না।"

টুপুর ফস করে বলে ফেলল, "তা হলে তো মাসিকে প্লেনে যেতে হয়।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেভাবে ম্যাডামের সুবিধে। খরচখরচা নিয়ে ভাবতে হবে না," টুপুরকে চমকে দিয়ে পকেট থেকে দু'খানা হাজার টাকার বান্ডিল বের করলেন মনোজ, "আপাতত এতেই চালিয়ে নিন। আমার জোয়ান ছেলেটাকে ভালয়-ভালয় ফিরিয়ে আনতে পারলে পুরো পাঁচলাখই দেব ম্যাডাম।"

মিতিন যেন একটুও অবাক হয়নি। নোটের তাড়ার দিকে তাকালই না। ঠান্ডা গলায় বলল, "আমার যে আরও কয়েকটা প্রশ্ন আছে মনোজবাবু।"

"বলুন ম্যাডাম।"

"আপনি প্রথমেই পুলিশে না গিয়ে আমার কাছে এলেন কেন?"

"সত্যি বলব? আমি চাই না ব্যাপারটা বেশি জানাজানি হোক। তা হলে হয়তো দেবলের বিপদ আরও বাড়তে পারে। তা ছাড়া পুলিশের উপর আমার তেমন আস্থা নেই। ওরা আমার আশঙ্কাকে আদৌ আমল দেবে কিনা তা নিয়েও আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।"

"হুঁ।...আচ্ছা, শ্রীনগর থেকে আপনার ছেলে যে ফোন করেছিল, সেই নম্বরে আর যোগাযোগ করেছিলেন?"

"অনেকবার। শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ তুলছেই না।"

"নম্বরটা আমায় দিন। আর আপনার ছেলের মোবাইল নম্বরটাও।"

"মোবাইলটা তো সুইচড অফ হয়ে পড়ে।"

"তবু দিন। আপনার ছেলের ফোটোও চাই একটা।"

"এনেছি ম্যাডাম," বুকপকেট থেকে এবার একটা ছোট খাম বাড়িয়ে দিলেন মনোজ। বললেন, "এটা রিসেন্ট ফোটো। গত মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন তোলা।"

খাম খুলে ফোটোটায় একবার চোখ বোলাল মিতিন। টুপুরও দেখছিল উঁকি মেরে। এক ঝকঝকে তরুণ, গালে দাড়ি, চোখে চশমা। ফোটোটা খামে চালান করে মিতিন সামান্য হালকা সুরে বলল, "আমার উপর পুরো দায়টা চাপাচ্ছেন মনোজবাবু? আপনিও সঙ্গে চলুন।"

"উপায় নেই ম্যাডাম? ছেলের চিন্তায় তার মা প্রায় শয্যা নিয়েছেন। তাঁকে ফেলে নড়ি কী করে?"

মিতিন আর কিছু বলল না। মনোজ গলা ঝাড়লেন, "তা হলে এখন উঠি ম্যাডাম?"

"আসুন।"

"কদ্দুর কী এগোলেন টাইম টু-টাইম জানালে ভাল হয়। বুঝতেই তো পারছেন, কীরকম টেনশনে থাকব..."

"চেষ্টা করব। যদি জানানোর মতো কিছু ঘটে।"

মনোজ বেরিয়ে যেতে না-যেতেই হুড়মুড়িয়ে পার্থর আবির্ভাব। বোঝাই যায় কান খাড়া করে এঘরের প্রতিটি বাক্য গিলছিল এতক্ষণ। নোটের গোছা হাতে তুলে ওজন দেখছে। খুশি-খুশি মুখে বলল, "গোনার দরকার নেই। পুরো দু'লাখই আছে, কী বলো?"

"মনে তো হচ্ছে।"

"ভাগ্যিস লোকটাকে সত্যি-সত্যি ভাগিয়ে দাওনি!... তবে আমার কিন্তু বেশ অবাক লাগছে। চিপ্পুস পার্টি ঝটাকসে দু'লাখ ফেলে দিয়ে গেল... খুবই রহস্যজনক। বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করার জন্য..."

"তোমার গবেষণা এখন থামাবে? চটপট গিয়ে নেটে বোসো। ফ্লাইটের টিকিটগুলো করো। যেন কালই বিকেল-বিকেল শ্রীনগর পৌঁছতে পারি।"

"যথা আজ্ঞা শ্রীমতী টিকটিকি।"

"চল রে টুপুর, এক্ষুনি তোর মা'র সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

বুমবুম ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে, "কী মজা, কী মজা, আমরা পাহাড় দেখব!"

ভাইয়ের উল্লাসধ্বনি শুনতে-শুনতে টুপুর শুকনো গলায় বলল, "আজই আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেবে বুঝি?"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "দূর বোকা। তোর গরমের জামাকাপড়গুলো আনাতে হবে না?"

টুপুর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার ধপ করে বসে পড়েছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে তড়াক-তড়াক। সে যে আনন্দে অজ্ঞান হয়ে যায়নি, এই না ঢের। এই গরমে ভূস্বর্গ ভ্রমণ? ভাবা যায়।

॥ ৩ ॥

উড়োজাহাজ থেকে বাইরের পৃথিবীটা দেখছিল টুপুর। জানলার কাচে চোখ লাগিয়ে। আকাশ আজ পুরো নির্মেঘ বলে নীচের মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-নদীনালা দিব্যি দেখা যায়। ঠিক দেখা নয়, বোঝা যায়। ভূপৃষ্ঠের রং বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। দিল্লি থেকে প্লেন ছাড়ার পর বেশ খানিকক্ষণ সবজেটে ছিল, তারপর কখনও খয়েরি, কখনও বাদামি। এবড়োখেবড়ো পাহাড় উঁচু হয়ে গেল আচমকা। তার মাথায়-মাথায় বরফের রেখা। কী সুন্দর, কী সুন্দর, তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লি আসার সময়ে বুমবুম জানলার ধারে বসেছিল। শ্রীনগর পর্যন্ত বাকি পথটুকু টুপুরের পালা। ভাগ্যিস টুপুর বুদ্ধি করে এই বন্দোবস্তটা করেছিল, নইলে নিসর্গের এমন অপরূপ ভোলবদল তার অদেখাই থেকে যেত।

টুপুরের পাশে পার্থ। হঠাৎ মেসোর গলা কানে এল টুপুরের, "কীরে, খাবি কিছু?"

প্লেনের সরু প্যাসেজে ট্রলি নিয়ে হাজির দুই বিমানসেবিকা। ফিরে তাদের ঝলক দেখল টুপুর। মাথা নেড়ে বলল, "আমার তেমন খিদে পায়নি।"

"আমার কিন্তু থোড়া-থোড়া ভুখ লাগছে। দিল্লির ফ্লাইটে লাঞ্চটা তেমন জমেনি। চিকেনের পিসগুলো কেমন ছিবড়ে-ছিবড়ে ছিল।"

"খাও না যা ইচ্ছে।"

"স্যান্ডউইচ নিই, কী বল? সকাল থেকে তোর মাসি যা ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে ছুটছে... শ্রীনগর পৌঁছে হয়তো আবার দৌড়... মুখে কিছু গোঁজারই টাইম মিলবে না। ভাল চাস তো পেটে কিছু লোড কর। চিপস, কাজু, এনিথিং।"

বুমবুম আইল সিট থেকে বলল, "আমার দু'প্যাকেট চিপস চাই বাবা। আমি একা খাব।"

"না। দুটোই কিনছি। একটা তোমার, একটা দিদির। ঠিক আছে?"

ঠোঁট উলটে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, বিচিত্র ভঙ্গি করছে বুমবুম। টুপুর হেসে ফেলল। ঝুঁকে দেখল ওদিকের আইল সিটে বসে থাকা মিতিনকে। ল্যাপটপ খুলে গভীর মনোযোগে কী যেন পড়ছে মাসি। ফ্লাইটেও সারাক্ষণ ল্যাপটপে ডুবে ছিল। মগজে কী-কী যে ঢোকাচ্ছে কে জানে।

চিপসের প্যাকেট হাতে নিয়ে টুপুর ফের চোখ রাখল জানলায়। আবার পার্থর গলা, "তোর মাসিটা বহুৎ চালু আছে, বুঝলি।"

"মিতিনমাসি যে বুদ্ধিমতী, এ আর নতুন কী কথা?"

"তার সঙ্গে এখন নাটক করার প্রতিভাও যুক্ত হয়েছে রে।"

"মানে?"

"দেখলি না, মনোজবাবুকে প্রথমে একপ্রস্থ দাবড়ানি, তারপর হেব্বি গ্র্যাভিটি দেখিয়ে ভদ্রলোককে কৃতার্থ করার ভান... ব্যস, তাতে মনোজও ফ্ল্যাট। দিব্যি কাজের ছুতোয় ফুল ফ্যামিলির কাশ্মীর বেড়ানোর বন্দোবস্ত হয়ে গেল। খরচখরচা সমেত।"

গতকাল মনোজবাবুর সঙ্গে মিতিনমাসির রুক্ষ ব্যবহার যে

অনেকটাই অভিনয়, তা টুপুরও মানে। তবু মেসোর কথার প্রতিবাদ করে বলল, "ছুতো বলছ কেন? মাসি তো কাজেই যাচ্ছে।"

"আরে ছাড়। একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়সের ছেলেকে পাহাড়পর্বতে ভরা কাশ্মীরে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নাকি?" সন্তর্পণে স্যান্ডউইচের মোড়ক খুলতে-খুলতে পার্থ চোখ টিপল, "এবার আমাদের আসল কাজে নামতে হবে, বুঝলি।"

"সেটা কী?"

"কাশ্মীরের প্রতিটি টুরিস্ট স্পট চষে ফেলা। গুলমার্গ, সোনমার্গ, খিলানমার্গ, পহেলগাঁও... চার-চারখানা মুঘল গার্ডেন... উলার লেক... কিচ্ছুটি বাদ দেওয়া চলবে না।"

"যাহ, তা হয় নাকি? মাসি কি বেড়াতে যাচ্ছে?"

"আরে, আমরাও কি বেড়াব?" পার্থ খিকখিক হাসছে, "ঘোরাঘুরি তো তদন্তেরই পার্ট। কে বলতে পারে, দেবল ওই সব জায়গায় লুকিয়ে নেই? অভিযানের গপ্পো ফেঁদে, বাবাকে ঘাবড়ে দিয়ে, হয়তো সে এখন ঝিলাম নদীতে ট্রাউট মাছ ধরছে?"

"ইস তুমি কী যে বলো না!" টুপুরও হাসছে। একটু-একটু যেন কৌতূহলও ফুটল গলায়, "তা যদি এদিক-সেদিক যাই, কীভাবে ঘুরব? কন্ডাক্টেড ট্যুর?"

"আরে ছোঃ। সঙ্গে একটা গাড়ি না থাকলে জমে? তোর মাসি যে অত টাকা পেল... খরচা করতে হবে না? প্রয়োজনে সিনিক স্পটগুলোয় নাইট হল্ট করব। তন্নতন্ন করে খুঁজব ছেলেটাকে। হা হা।"

"তুমি কি দেবল বড়ুয়ার গায়ের হওয়াটাকে একবারেই পাত্তা দিচ্ছ না?"

"দেওয়ার তো কোনও কারণও দেখি না।"

"তা হলে মিতিনমাসি বুঝি এমনি-এমনি সিরিয়াস হয়ে গিয়েছে? স্রেফ অকারণে?"

"তোর মাসির তো এটাই রীতি রে। একটা অতি সরল ঘটনাকে ক্রমশ জটিল করে বাহবা কুড়োয়," পার্থ স্যান্ডউইচে প্রকাণ্ড কামড় বসাল। পেপার ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে বলল, "তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ, কেসটায় কী আছে? লেখাপড়া নিয়ে পাগল এক ছেলে, কিছুর একটা গবেষণায় মেতে, হুট করে কাশ্মীরে চলে এসেছে। বাবা-মাকে হয়তো জানিয়ে আসেনি, তাতেই বা কী? সাচ্চা গবেষকদের ওসব হুঁশ থাকে নাকি? এখানে এসে ছেলেটাকে কোথাও একটা যাচ্ছে, তা নিয়ে তার বাবা-মা উৎকণ্ঠিত থাকতে পারে, কিন্তু মিতিনের সেখানে কী ভূমিকা? এ যেন পয়সা দিয়ে তোর মাসিকে ছেলেটার বডিগার্ড ফিট করে দিল। থার্ড আইয়ের মালকিন বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জিকে কি এই কাজ মানায়?"

"না মেসো। তুমি বোধ হয় ঠিক বলছ না। এই কেসে কোনও এক সাহেবের লেখা বৌদ্ধদের কী সব পুঁথিটুথির ব্যাপার আছে। তার উপর মনোজবাবুর বাড়িতে পুঁথি সরানোর জন্য চোর ঢুকেছিল..."

"মনোজবাবুর সব ইনফরমেশনে অনেক ভেজাল আছে রে টুপুর। তোর মাসি হয়তো এখনও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি এক-এক করে বলে দিতে পারি।"

"কীরকম?"

"তা হলে গোড়া থেকেই বলি। ছেলে মঙ্গলবার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আর বাড়িই ফিরল না, তখন কি বাবা-মা'র টনক নড়েছিল? উত্তরটা যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ছেলে মাঝে-মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরে না। সুতরাং সে হঠাৎ কাশ্মীর গেল, কী কামস্কাটকা, তা নিয়ে মনোজবাবুদের উচাটন হওয়ার কোনও মানে হয় না। খেয়াল করে দ্যাখ, মঙ্গলবার রাতের প্রসঙ্গটা কিন্তু মনোজবাবু এড়িয়ে গিয়েছেন।... তারপর ধর, বুধবার ছেলের ফোন এল। আবার বুধবার রাতেই চোর বাড়িতে হানা দিল। এটা যেন কেমন-কেমন লাগে না? ছেলের ব্যাপারে থানায় না যান। চোরের কথা কি মনোজবাবুর পুলিশকে জানানো উচিত ছিল না?"

টুপুর অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, "কেন জানাননি বলো তো?"

"আমারও তো সেটাই প্রশ্ন। তা ছাড়া চোরের আগমন কখন ডিটেক্ট করলেন, সে ব্যাপারেও তিনি আশ্চর্য রকমের নীরব। শুধু তাই নয়, ছেলে যে পুঁথির বাক্সখানা নিয়ে গিয়েছে, তা তিনি কবে আবিষ্কার করলেন? শুক্রবার। অথচ চোর বুধবার রাতে ঘর লন্ডভন্ড করে গিয়েছে। এবং পুঁথির বাক্স তো তখনই নেই। গল্প দুটো মিলছে কি? গোঁজামিল মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ গো। গোলমেলেই ঠেকছে," টুপুরকে মানতেই হল। তাও সংশয়মাখা স্বরে বলল, "কিন্তু মেসো, মনোজবাবু মিছিমিছি গল্প ফাঁদলেন কেন? পাঁচলাখ টাকা দেবেন বলেছেন, তা-ই বা কী কারণে?"

"এটাও বুঝলি না? যে-কোনও ভাবেই হোক, ছেলের পিছনে তিনি গোয়েন্দা লাগাতে চান। আর তার জন্য একটা জুতসই যুক্তি খাড়া করতে হবে তো। ওই পুঁথির কাহিনি দিয়ে

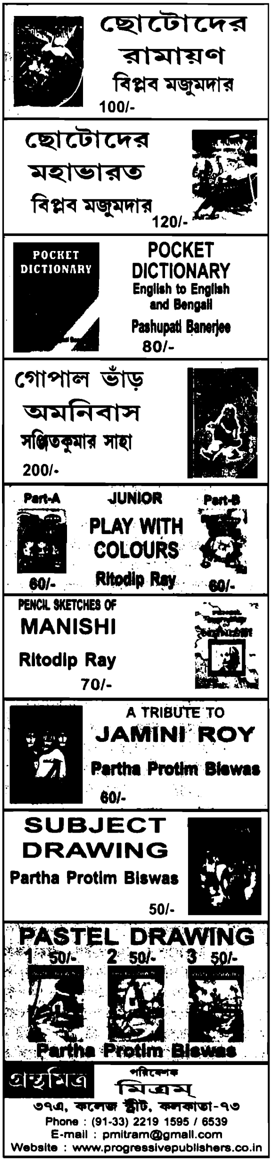

দিব্যি একটা রহস্যের টোপ তৈরি হল, তোর মাসিও অমনি খপাৎ করে বঁড়শি গিলে নিল," পার্থ ভুরু নাচিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, "আর পাঁচলাখের কথা বলছিস? টাকাটা বউয়ের চাপে পড়ে খরচ করতে মনোজবাবু বাধ্য হচ্ছেন।"

পার্থমেসোর কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তবু টুপুরের মনে যেন খটকা থেকেই যাচ্ছে। মিতিনমাসি তো এত কাঁচা কাজ করে না। কাল মনোজবাবু যাওয়ার পর কাদের যেন রাশি-রাশি ফোন করল, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আই জি আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলল প্রায় দেড়ঘণ্টা। লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগের সঙ্গেও ফেসবুক নিয়ে কী যেন আলোচনা করছিল মাসি। এসবের পিছনে নিশ্চয়ই মাসির নিজস্ব যুক্তি আছে। আছেই।

টুপুরকে অবশ্য এখনও কিছুই বলেনি মিতিনমাসি। বাড়ির কুলুঙ্গি থেকে পুঁথি উদ্ধার হওয়া নিয়ে মাসিকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিল টুপুর। মাসি গ্রাহ্যই করল না। যাক গে, ওসব ভেবে কী লাভ। টুপুর তো মাসির লেজে-লেজেই আছে। যা হবে, সে তো দেখতেই পাবে।

বিমানের প্রপেলারের গর্জন চলছে একটানা। তারই মাঝে বেজে উঠল মাইক। প্লেন এবার নামবে শ্রীনগরে, যাত্রীদের সিট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিচ্ছেন পাইলট। ঘুমন্ত-ঘুমন্ত গলায়। কোমরে ঝটপট ফাঁস এঁটে টুপুর চোখ চাপল কাচে। আহা, কী মনোরম দৃশ্য। সামনে বরফে ঢাকা পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা, নীচের ঢালে এক গাঢ় সবুজ উপত্যকা। নাগরদোলার মতো নামছে বিমান। গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট মিলিয়ে পটে আঁকা ছবিটা কাছে আসছে ক্রমশ, আরও কাছে এল। আরও কাছে। ঢক করে মাটি ছুঁল চাকা। তরতরিয়ে ছুটছে এবার। গতি কমাচ্ছে, থামল অবশেষে।

ছোট্ট বিমানবন্দরটি বাইরে এসে সামান্য হতাশই হল টুপুর। কোথায় স্বর্গের নন্দনকানন? চারদিক তো রীতিমতো ধু ধু। বাতাসে ঠান্ডার লেশমাত্র নেই, বিকেল সাড়ে চারটেতেও গরম লাগছে বেশ।

লাগেজ ট্রলি ঠেলতে-ঠেলতে বেরিয়েছে বুমবুম। টুপুরের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা এখন কোন হোটেলে যাব রে দিদি?"

টুপুরের খুব ইচ্ছে হাউজবোটে থাকার। জলের মাঝে নৌকোর মধ্যে বাস করছে, ভাবনাতেই যে কী রোমাঞ্চ! তবু বাসনাটা গোপন করে আলগা ভাবে বলল, "সে মাসি জানে।"

দীর্ঘক্ষণ পর সুযোগ পেয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল পার্থ। বড় একটা টান মেরে বলল, "কাল নেটে দেখলাম ডাল লেকের ধারে বেশ কয়েকটা দেখনবাহার লজ আছে। সবাই চাইলে কোনও একটা রিসর্টেও ওঠা যায়। লেকের একেবারে মধ্যিখানে, দ্বীপের উপর।"

বুমবুম বলল, "আমরা পাহাড়ের মাথায় থাকতে পারি না? ওখান থেকে সানরাইজ, সানসেট দেখব।"

পার্থ আলগা চাপড় দিল বুমবুমের পিঠে। তরল সুরে বলল, "দূর বোকা, শ্রীনগর তো একটা উপত্যকা। চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এখানে সূর্য ওঠা, ডোবা কোনওটারই তেমন চার্ম নেই। ভাল সানরাইজ দেখতে হলে..."

বাক্যটা শেষ হল না। একটা ট্যাক্সি ধরে এনেছে মিতিন। হাত নেড়ে ডাকছে।

ট্যাক্সিচালক এক প্রবীণ। পাক্কা কাশ্মীরি চেহারা। টকটকে রং, টিকলো নাক, নিখুঁত কামানো দাড়ি। পরনে ঢোলা কুর্তা-পাজামা, মাথায় ফেজ টুপি। দরজা খুলে নেমে এসে নিজেই তিনখানা সুটকেস তুলে দিলেন ডিকিতে। টুপুররা সিটে বসার পর স্টার্ট দিয়েছেন গাড়ি। তাঁর পাশের আসনে, মিতিন, তাকেই নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁ বহেনজি, বোলিয়ে কাঁহা জায়েঙ্গে আপ?"

মিতিন কেজো গলায় বলল, "আমন গেস্ট হাউজ।"

"ও কাঁহা পর হ্যায়? লালচকমে?"

"নেহি। রিসেপশন সেন্টারকে বাদ লেফট ঘুমকে শেরওয়ানি রোড পকড়কে সোনাওয়ার বাগ তক চলনা। উঁহা হোটেল তরান্নুমকে বগলমে এক গল্লি হ্যায়। উসকি অন্দরমে চার বিল্ডিং ছোড়কে ডাহিনা। সমঝ গয়ে না?"

"হাঁ জি। আপ ইধারমেই কঁহি রহতে হ্যায় কেয়া, বহেনজি?"

"নেহি তো। ম্যায় তো পহেলি দফা শ্রীনগরমে আ রহি হুঁ।"

"তাজ্জব কি বাত। হমারা শহরকো ইতনা আচ্ছা পেহচানতা হ্যায়..."

"মোবাইল ফোন কী কামাল," হাতের আইফোনটা দেখাল মিতিন। স্মিতমুখে বলল, "ইসমে জি পি এস হ্যায় না..."

তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছে না প্রবীণ কাশ্মীরির। গাড়ি চালাতে-চালাতেই বারবার টেরিয়ে তাকাচ্ছেন মিতিনের দিকে। মিতিন কিন্তু মোটেই বিব্রতবোধ করল না। ঘাড় ঘুরিয়ে সহজ ভাবে টুপুরকে বলল, "গেস্ট হাউজটা তেমন আহামরি নয়। খাট-বিছানা মোটামুটি, বাথরুম চলেবল, রুমে টিভি নেই, খানা একেবারেই বাঁধাগতের।"

টুপুর কিছু বলার আগেই পার্থর প্রশ্ন ধেয়ে এল, "নেটে বুক করলে?"

"ওই আর কী।"

"এর চেয়ে ভাল কিছু চোখে পড়ল না?"

"তাকাইনি। এই গেস্ট হাউজে ওঠাটাই আমার কাছে জরুরি ছিল?"

"কেন? অতিথিশালাটির কোনও বিশেষত্ব আছে বুঝি?"

"গেলেই মালুম হবে।"

বাতাসে জবাব ভাসিয়ে দিয়ে আইফোন ব্যাগে চালান করল মিতিন। পুরনো আদ্যিকেলে মডেলের একটা মোবাইল বের করেছে। টিপছে খুটখাট, পরীক্ষা করছে কী যেন।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "এটা বাতিল করে দিয়েছিলে না?"

"উঁহু, চালুই ছিল, ব্যবহার করতাম না। বড্ড ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে তো। এখন এর সিমটা ভরব আইফোনে আর আমার নম্বরটা চলে যাবে এই ফোনে। ফেরার সময়ে দিল্লিতে আবার বদলাবদলি করে নেব।"

টুপুর চোখ পিটপিট করল, "এত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট করবে কেন?"

"ওটাতে বি এস এন এল-এর কানেকশন আছে যে। পোস্টপেড। এই কাশ্মীর ভ্যালিতে আর কোনও সার্ভিস প্রোভাইডার কাজ করে না। সুতরাং এখন থেকে ওই সিম দিয়েই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো," পার্থ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "আমি তো নিয়মটা জানতাম, তবু কেন যে বাড়িতে আগের সিমটা ফেলে এলাম..."

"এখন আর আফসোস করে লাভ আছে? বাইরে তাকাও, মন দিয়ে প্রকৃতি দ্যাখো।"

মিতিনের এই কথাটাও টুপুরের কানে ঠাট্টার মতো শোনাল। কোথায় প্রকৃতি? নিসর্গ চুলোয় গিয়েছে, শহরে ঢোকার পর থেকেই অফিস ছুটির বেমক্কা ভিড়। ট্র্যাফিক জ্যামে ট্যাক্সি প্রায় নিথর। ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে বাতাস। পোড়া পেট্রল-ডিজেলের গন্ধে বন্ধ হয়ে আসছে নিশ্বাস। কোলাহলেও কানে তালা লাগার জোগাড়। এ যদি ভূস্বর্গ হয়, কলকাতাও তো তা হলে অমরাবতী।

যানবাহনের চাপে হাঁসফাস করতে-করতে আমন গেস্ট হাউজের সামনে থেমেছে ট্যাক্সি। সাধারণ একটা দোতলা বাড়ি, সাইনবোর্ড না থাকলে খুঁজে বের করা যেত কিনা সন্দেহ।

তিনধাপ সিঁড়ির পর একটা খোলা দরজা। টুপুর আর বুমবুমকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে মিতিন।

জিন্‌স টি-শার্ট পরা এক তরুণ কম্পিউটারে মগ্ন। মিতিনকে দেখে চোখ তুলল, "ইয়েস ম্যাম, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

মিতিন বলল,"পারহ্যাপস ইউ হ্যাভ রিসিভড মাই ইমেল লাস্ট

নাইট?"

মুহূর্ত থমকে থেকে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, "ও, আপ হি মিস মুখার্জি। রুম আপকা রেডি হ্যায়," বলেই গলা ওঠাল, "কলিমভাই, ম্যাডামলোগকা সামান তিন নাম্বারমে পঁউছা দো। জলদি, জলদি।... আইয়ে-আইয়ে আপ সব আইয়ে। ওয়েলকাম টু কাশ্মীর। আই অ্যাম মিলাপ, রানিং দিস স্মল জয়েন্ট।"

চলছে কাশ্মীরি আপ্যায়ন, এক মধ্যবয়সি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছেন ভিতরে। পিছনে পার্থ আর বুমবুম। মিতিন দাঁড়িয়েই আছে। মিলাপ বলল, "আপ ভি যাইয়ে ম্যাডাম, থোড়া আরাম কিজিয়ে..."

"একসেকেন্ড," মিতিন ব্যাগ খুলে দেবলের একটা ফোটো এগিয়ে দিল, "ক্যান ইউ রিমেমবার দিস ম্যান?"

একবার তাকিয়েই মিলাপ বলল, "ওহ শিয়োর। লাস্ট উইক হি কেম টু দিস প্লেস।"

"অ্যান্ড দিস ম্যান?"

আইফোনটা বাড়িয়ে দিয়েছে মিতিন। মনিটরে বছরপঁয়তাল্লিশের একটা মুখ। সরু গোঁফ, ফোলা গাল, একমাথা চুল, চোখে সানগ্লাস।

টুপুরের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এটা কার ফোটো? মিলাপকে কেনই বা ফোটোটা দেখাচ্ছে মাসি।

॥ ৪ ॥

উত্তেজনায় পেট ফুলছিল টুপুরের। গেস্ট হাউজের কামরায় ঢুকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "জান পার্থমেসো, এখানে পা রেখেই মিতিনমাসি কিন্তু তদন্তের কাজ স্টার্ট করে দিয়েছে।"

পার্থ বিছানার চাদর সরিয়ে দেখছিল কী যেন। হালকা চালে বলল, "সে তো আমিও তদন্ত শুরু করেছি রে। খাটে ছারপোকা আছে কিনা খুঁজছি। মনে হচ্ছে পেয়ে যাব। বসামাত্র কামড়াচ্ছিল।"

"আহা, মজা কোরো না। কথাটা শোনো। দেবল বড়ুয়া নাকি এই গেস্ট হাউজেই উঠেছিল।"

"বটে? আমিও এরকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম।"

"কী দারুণ ব্যাপার, তাই না? একদিনেই সঠিক জায়গাটাকে লোকেট করা..."

"মোটেই এটা কঠিন নয় টুপুর। দেবল যেখান থেকে ফোন করেছিল, তোর মাসি মনোজবাবুর কাছ থেকে সেই নম্বরটা নিয়েছে। তারপর ওই নম্বরে ফোন করলেই তো..."

"এদের ফোন খারাপ হয়ে আছে মেসো। গত বৃহস্পতিবার থেকে।"

"তা হলে আর কী। নেটে একটা-একটা করে হোটেল, গেস্ট হাউজ ঘেঁটে বের করেছে। বুকিংয়ের জন্যে এরা নেটে ফোননম্বর, ইমেল আইডি, সব দিয়ে রাখে।"

"মাসি আর-একটা খবরও জোগাড় করেছে।... দেবল বড়ুয়া নাকি এখানে একা আসেনি। সঙ্গে আর-একজন ভদ্রলোক ছিলেন।"

"তাই নাকি?" এবার যেন পার্থ একটু চমকেছে, "কে ভদ্রলোক?"

"রেজিস্টারে নাম আছে গো। চন্দ্রকুমার ত্রিবেদী।"

"তিনি কে? কোনও প্রোফেসারটোফেসার নাকি?"

"মাসি বলল উনি নাকি একজন হিস্টোরিয়ান। ভুবনেশ্বরে থাকেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেবলের কনট্যাক্ট হল কী করে?"

"কে জানে," টুপুর ঠোঁট ওলটাল, "দেবল এখন কোথায়, তাও ধরে ফেলেছে মাসি।"

পার্থর গলা থেকে বিস্ময় ঠিকরে এল, "ইজ় ইট?"

"মাসিকে তুমি আন্ডার এস্টিমেট কোরো না মেসো। মাথা খাটিয়ে এই গেস্ট হাউজে এল বলেই না চটপট সমাধানটা পেয়ে গেল," টুপুরের চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠল, "ওই ভদ্রলোক আর দেবল একসঙ্গে লাদাখ গিয়েছে। লেহ-তে।"

"ওয়াও। এ তো কেল্লা মার দিয়া কেস," পার্থ উল্লসিত, "কতকাল ধরে ভাবছি লেহ, লাদাখ যাব। ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের ধারে টলটলে হ্রদের পাড় ধরে হাঁটছি। সেই স্বপ্ন তা হলে সার্থক হতে চলেছে?"

"মনে তো হয়। মাসি আর-একটা ভেলকি দেখিয়েছে, বুঝলে। মাসির আইফোনে সেই চন্দ্রকুমার ত্রিবেদীর ফোটো পর্যন্ত মজুত। একদিনের মধ্যে কীভাবে যে জোগাড় করল।"

"ওই ক্যালিটা আছে বলেই না তোর মাসি করে খাচ্ছে," তরল সুরে মিতিনের উদ্দেশে তারিফ ছুড়ল পার্থ, "তা মহারানি কোথায়? এখনও আসছেন না কেন?"

"কাউন্টারে মিলাপ ছেলেটার সঙ্গে বকরবকর করছিল। আমায় রুমে পাঠিয়ে দিল। বলল, 'ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। আমি বুমবুমকে নিয়ে একটু বেরব, কিছু কেনাকাটা আছে।'"

"একবার ঘরে এল না। কোনও মানে হয়?" পার্থ নাক কোঁচকাল, "তোর মাসির জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানট্যানগুলো বড্ড কম।"

মিতিনমাসির নামে এরকম উলটোসিধে কিছু বললে টুপুরের বড্ড গায়ে লাগে। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "কী গলতিটা দেখলে মাসির?"

"একবার সরেজমিন করে যাবে না, কোন ছিরির গলতায় এনে তুলল? খাটে ভাল গদি পর্যন্ত নেই। খসখসে কয়্যার গায়ে ফুটছে। বাথরুমে নো শাওয়ার। কলের জলে বালতি ভরে চান করতে হবে। কমোড পর্যন্ত রাখেনি, ভাব তুই? পটি হবে কী করে?"

টুপুর একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। কমোড না থাকাটা সত্যিই সমস্যা। ছোটবেলা থেকে যা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। পরক্ষণেই ধমকাল নিজেকে। সে না ভবিষ্যতে গোয়েন্দা হতে চায়? কী বলেছে মিতিনমাসি? ডিটেকটিভ হওয়ার একদম প্রাথমিক শর্ত, যে-কোনও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা। কোনও ফ্যাচাং জোড়া চলবে না। মনের মতো খাবার নাও জুটতে পারে, মাথার উপর ছাদ না থাকাও অসম্ভব নয়, সব সইতে হবে হাসিমুখে। তা হলে তুচ্ছ দু'-চারটে সুবিধে নেই বলে আজ দুশ্চিন্তা করা কি সাজে টুপুরের?

মনকে প্রবোধ দিল বটে টুপুর, কিন্তু খচখচানি একটা থাকছেই। তাদের ক্লাসের সংহিতা গত পুজোয় বেড়াতে এসেছিল। উঠেছিল চশমেশাহি নামের মুঘল গার্ডেনের সরকারি অতিথিশালায়। সেখানে চারদিকে ফুলের বাগান। রংবেরঙের গোলাপ দেখে-দেখে চোখ নাকি ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সংহিতাদের। আর টুপুররা কিনা থাকছে এঁদোগলির ভিতর এক অগামারা ছল্লড়ে? সিনসিনারি বলতে শুধুই পাশের আস্তাবল, যেখান থেকে ঘোড়ার নাদি উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে! ফিরে তো কাউকে গল্পও করতে পারব না টুপুর।

ছোট শ্বাস ফেলে টুপুর বাথরুমে ঢুকল। জল ছিটোল মুখে-চোখে। সেই কোন সকাল আটটায় ঢাকুরিয়া থেকে বেরিয়েছিল, এখন প্রায় ছ'টা বাজে। সারাদিনের লম্বা দৌড়ে শরীর গরম হয়ে গিয়েছে, শীতল জলের ছোঁয়ায় আরাম হল ভারী। বেরিয়ে দেখল ওই বিছানাতেই লম্বা হয়েছে পার্থমেসো।

অন্য শয্যায় গড়িয়ে না পড়ে কোণের হাতল ছাড়া চেয়ারে বসল টুপুর। অল্প গলা উঠিয়ে বলল, "কী গো, ঘুমোলে নাকি?"

"উঁহু," চোখ না খুলেই পার্থ বলল, "নতুন করে প্ল্যান ছকছি।"

"কীরকম?"

"লাদাখের পথে পা বাড়ানোর আগেই কীভাবে কম সময়ে ঝটাকসে কাশ্মীরটা ঘুরে নেওয়া যায়," পার্থ উঠে বসল। ঠোঁট টিপে বলল, "ধর, একদিনে গুলমার্গে, খিলানমার্গ প্লাস বাগানগুলো দেখে নিলাম, আর-একদিনে যদি যদি শোনমার্গ-পহেলগাঁও সারতে পারি... সঙ্গে উলার হ্রদটাও যদি মেরে দেওয়া যায়..."

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। তিরবেগে প্রবেশ করল বুমবুম। পিছনে-পিছনে মিতিন। তার দু'হাতে ইয়া-ইয়া প্লাস্টিকের ঝোলা।

পার্থ অপ্রসন্ন স্বরে বলল, "সাত তাড়াতাড়ি শপিং করতে ছোটার কী দরকার ছিল। আমরা সবাই মিলে বেরিয়েই না হয়..."

"আমার শিক্ষা একটু অন্য রকম স্যার," মাথা থেকে ক্লিপ খুলে চুল ছড়িয়ে দিল মিতিন। খাটের ধারে বসে বলল, "হাতের কাজ আমি ফেলে রাখতে পারি না।"

"কেনাকাটা তোমার হাতের কাজ? কিনলেটা কী?

একটা কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে বুমবুম নেচে বেড়াচ্ছে ঘরময়। টুপুরকে গিয়ে ঠেলা মারল, "অ্যাই দিদি, ওঠ না। কী এনেছি দ্যাখ না।"

খপ করে বুমবুমের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিল টুপুর। ভাই বাধা দেওয়ার আগেই চোঁচোঁ টান দিল কয়েকটা। বোতল ফের বুমবুমকে ধরিয়ে দিয়ে ঝোলা দু'খানা ঘাঁটছে। অবাক সুরে বলল, "এসব কী এনেছ মাসি? গ্লাভস, মোজা, ফুলহাতা গেঞ্জি..."

"সবগুলোই খাঁটি পশমের। সঙ্গে টুপিও আছে। প্রত্যেকের জন্য সানগ্লাসও।"

"কিন্তু কেন? আমাদের সুটকেস তো সোয়েটার-জ্যাকেট-মাফলারে বোঝাই।"

"তবু লাগবে। লাদাখের ঠান্ডা খুব সাংঘাতিক। একটু অসাবধান হলেই ফ্রস্টবাইট বাঁধা। আর কালো চশমাটা স্টাইল করার জন্য নয়, ওটাও ভীষণ-ভীষণ জরুরি।"

"জানি ম্যাডাম," পার্থ গলা ঝাড়ল, "পলিউশন নেই বলে লাদাখে সান-রে বেজায় চড়া। অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণও বেশি। তাই দিনের বেলায় চোখকে প্রোটেক্ট করতে ওই চশমাটি ব্যবহার করতে হয়। ঠিক বলেছি?"

"তোমার অসীম জ্ঞান। এবার একটা আনন্দ সংবাদ দিই?"

"টুপুর আমায় শুনিয়ে দিয়েছে।"

"সরি, টুপুর এটা জানে না। বুমবুম, বাবাকে বলে দে তো।"

"এক্ষুনি গরম-গরম চিকেন পকোড়া আসছে," বুমবুম উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, "সঙ্গে কফি।"

"এই একটা কাজের কাজ করেছ," পার্থর খুশি আর ধরে না। দু'গাল ছড়িয়ে বলল, "আরও একটা ভাল কাজ করে ফেলো।"

"কী?"

"আমন গেস্ট হাউজে আসার উদ্দেশ্য তো সফল হয়েছে, মোটামুটি হদিশ মিলেছে দেবলের। কষ্ট করে এখানে থাকার আর কী দরকার। এখন যে ক'টা দিন শ্রীনগরে আছি, একটু বেটার কোথাও স্টে করলে হয় না? যেখানে পটিটা অন্তত শান্তিতে করতে পারি?"

"আই এগ্রি," মিতিনের মুখ ভাবলেশহীন, "কাল আমরা আমন গেস্ট হাউজ ছেড়ে দেব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। সন্ধেবেলায় আজ তা হলে হোটেল খুঁজি?"

"প্রয়োজন নেই। মোটামুটি বন্দোবস্ত করে এসেছি। রাতটা কাটতে দাও।"

"এই আমনের চেয়ে কমফর্টেবল তো?"

জবাব না দিয়ে মিতিন হাসল একটু। এদিকে খাবার নিয়ে এল কলিম। ট্রে থেকে শুধু প্লেট নামার অপেক্ষা, তারপরই টকাটক তুলছে সবাই। টম্যাটো সস মাখিয়ে পার্থর চিকেন পকোড়া গালে পোরা দেখে কে বলবে মাত্র ঘণ্টাদেড়েক আগে গোবদা স্যান্ডউইচ সাঁটিয়েছে মানুষটা।

আহ্লাদিত স্বরে পার্থ বলল, "এদের রান্নাবান্নার মান খারাপ নয়।"

"তা হলে রাতে এখানে খেতে পারি?"

"মেনুটা যদি মনমতো হয়, তো কীসের আপত্তি? মাটন রেজালা আর লাচ্ছা পরোটা। কীরে টুপুর, জমবে না?"

টুপুর অন্য কথা ভাবছিল। মেসোর প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে দিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মাসি, দেবল বড়ুয়া যে আমন গেস্ট হাউজে একা আসেনি, জানলে কীভাবে?"

"বুঝলি না, ঝড়ে বক কেস," পার্থই জবাব দিল, "মাসি ওয়াইল্ড গেস ছুড়েছিল, লেগে গিয়েছে।"

"তা কী করে হয়? আন্দাজই যদি হবে, মাসির কাছে সেই ভদ্রলোকের ফোটো এল কী করে?"

"এটা অবশ্য একটু ভাবার বিষয়," পার্থও প্রশ্ন জুড়ল মিতিনকে, "কোথায় পেলে গো ফোটোটা?"

"যেভাবে কলকাতা ছাড়ার আগেই জানতে পেরেছিলাম, দেবল একা কাশ্মীর পাড়ি দেয়নি, ফোটোও মোবাইলে এসেছে ঠিক সেই ভাবেই।"

"ট্যানজেন্ট হয়ে গেল যে। তোমার জানার পদ্ধতিটা কী, সেটা তো বলবে।"

"খুব সিম্পল। শুধু মগজটাকে খাটানো," মিতিন মুচকি হাসল, "অবশ্য সেই মগজে ঘিলু নামক বস্তুটি থাকা একান্তই জরুরি।"

মাসির তির সঠিক স্থানে বিঁধেছে। পার্থ পলকে গুম। বুমবুম বাবার প্লেট থেকে একখানা পকোড়া তুলে নিল, দেখতেই পেল না যেন। চুপচাপ কচর কচর মুরগি চিবোচ্ছে।

মিলাপ স্বয়ং কফি নিয়ে হাজির। কাপ-প্লেট টেবিলে রেখে মিতিনকে বলল, "ম্যাডামজি, ও গাড়িওয়ালা নাসিরভাই আ গয়া। ইঁহা ভেজ দুঁ ক্যায়া?"

"জরুর। আয়াম ওয়েটিং ফর হিম।"

মিলাপ বেরিয়ে যেতেই টুপুর বলে উঠল, "তুমি একদম গাড়ি ফিট করে এসেছ।"

পার্থর উদাস স্বর ভেসে এল, "টুপুর, তোর মাসিকে বলে দে, কাল কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে রে। ড্রাইভারের সঙ্গে যেন অন্তত দশঘণ্টার চুক্তি করে নেয়।"

মিতিনও পালটা শুনিয়ে দিল, "টুপুর, তোর মেসোকে জানিয়ে রাখ, আপাতত অন্তত টানা তিনদিনের জন্য ড্রাইভারসমেত গাড়ি বুক করা হবে। আশা করি, বাবুর আপত্তি নেই?"

ব্যস, পার্থ গলে জল। উৎসাহী গলায় বলল, "তা হলে কখন বেরনো হবে কাল?"

"রহু ধৈর্যং। এক্ষুনি জানতে পারবে," বলতে-বলতেই রুমে বছরপঁয়ত্রিশের এক রোগাসোগা যুবকের আবির্ভাব। মিতিনই বলল, "সালাম আলেকুম নাসিরভাই।"

যুবক মাথা ঝোঁকাল, "আলেকুম সালাম, ম্যাডাম। আপ মুঝে ঢুন্ড রহি থি? লাদাখ যানে কে লিয়ে?"

"হ্যাঁ ভাইজান," উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে বাতচিত শুরু করল মিতিন, "মিলাপ বলছিল, আপনিই নাকি আমন গেস্ট হাউজ থেকে দু'জন বোর্ডারকে লাদাখ নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। গত বৃহস্পতিবার।"

"তা হলে লেহ পৌঁছেছিলেন তো শনিবার। সোমবারের মধ্যে ফিরলেন কী করে? খুব ধকল গিয়েছে নিশ্চয়ই?"

"ওঁরা তো লেহ যাননি ম্যাডাম। কারগিলেই আমাকে ওঁরা ছেড়ে দিলেন। শুক্রবার সকালে।"

"সে কী। ওঁরা তা হলে গেলেন কোথায়?"

"তা তো জানি না। শুধু বললেন, এখন এক-দু'দিন নাকি কারগিলেই থাকবেন। কন্ট্র্যাক্টের গাড়িতে এমন হয় না। নিয়ম নেই বলে কারগিল থেকে প্যাসেঞ্জার তুলতে পারলাম না, আমাকে ফাঁকাই শ্রীনগর ফিরতে হল। ওঁরা কিছু রুপিয়া বাড়তি দিয়ে দিলেন বলে আমি আর কিছু বলিনি। তা আপনারা তো লেহ পর্যন্ত যাবেন নিশ্চয়ই।"

"ইচ্ছে তো সে রকমই। পুরোটা যাই না-যাই, ভাড়া আমরা পুরোই দেব। তা আমন গেস্ট হাউজের ওঁরা কারগিলে গিয়ে

উঠেছিলেন কোথায়?"

"সরকারি টুরিস্ট বাংলোয় ওঁদের বুকিং ছিল। আপনারা ভি ওখানেই থাকবেন, আমি বন্দোবস্ত করে দেব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ নাসিরভাই। তা হলে কাল সকালে আমরা ক'টায় রওনা হচ্ছি? পাহাড়ি রাস্তায় তো সকাল-সকাল স্টার্ট করতে হয়।"

"জরুর। ছ'টার মধ্যে তৈরি থাকবেন, আমি এসে যাব। বাদ মে নাস্তা করেঙ্গে, রাস্তেমে। ঠিক হ্যায়।"

"বিলকুল।"

সবাইকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল নাসির। দেবলরা লেহ যায়নি শুনে টুপুর যেন সামান্য হতাশ। মাসির পরিকল্পনা কি খানিকটা গুলিয়ে গেল না? কারগিলে গিয়ে কি আদৌ সন্ধান মিলবে তাদের?

পার্থর ভারিক্কি গলায় টুপুরের চিন্তা ছিঁড়ে গেল, "বুঝলি টুপুর, কপালে না সইলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?"

"হঠাৎ প্রবাদ আওড়াচ্ছ কেন?"

"মনের দুঃখে। কাশ্মীরে এসেও কাশ্মীর দেখা হবে না, এ কী ভাবা যায়?"

"আহা আফসোস করছ কেন?" মিতিন চিমটি কাটল, "তোমার সব আবদারই তো মানা হয়েছে বাপু। কাল থেকে এই হোটেলে নো স্টে, গাড়ি ড্রাইভার সারাদিন তোমার হাতের মুঠোয়..."

"অনেক হয়েছে। এবার কি আমরা একটু বেরব? অন্তত ডাল লেকটাও যদি দেখতে পারি?"

"ঘুরে এসো। তবে আটটার মধ্যে ফিরো। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে।"

"তুমি যাবে না?"

"আমি তো বেড়াতে আসিনি স্যার। এখন নিরিবিলি ঘরে আমি একটু হিসেবে বসব।"

"কীসের হিসেব? কত কী খরচা হতে পারে, তার? সে নয় আমিই রাত্রিবেলায় এস্টিমেট করে দেব।"

"উঁহু, এ হল জমা খরচের হিসেব। তুমি পারবে না।"

টুপুর ঠিক মানে বুঝতে পারল না কথাটার। এ তো টাকাপয়সার প্রসঙ্গ নয়, অন্য কিছু! দূর ছাই, এক-এক সময়ে কী যে হেঁয়ালি করে মাসি!

॥ ৫ ॥

শ্রীনগর ছেড়ে বেরনোর পর থেকেই একটু-একটু করে উপরে উঠছিল গাড়ি। বাইরে দৃশ্যপট অবর্ণনীয় সুন্দর। কাছে-দূরে বরফে মোড়া নানান মাপের পাহাড়ের সারি, তার গায়ে-গায়ে ঘন সবুজের বাহার। বেশ খানিকটা নীচ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। এঁকেবেঁকে। পাহাড়ের বুক চিরে।

টুপুরের মনটা ভরে যাচ্ছিল। কাল সন্ধেবেলা ডাল লেক দেখে বেশ খিঁচড়ে গিয়েছিল মেজাজ। কী নোংরা, কী নোংরা। কালচে সবুজ শ্যাওলায় ভরে আছে গোটা হ্রদ। বাঁধানো পাড়ে থিকথিকে

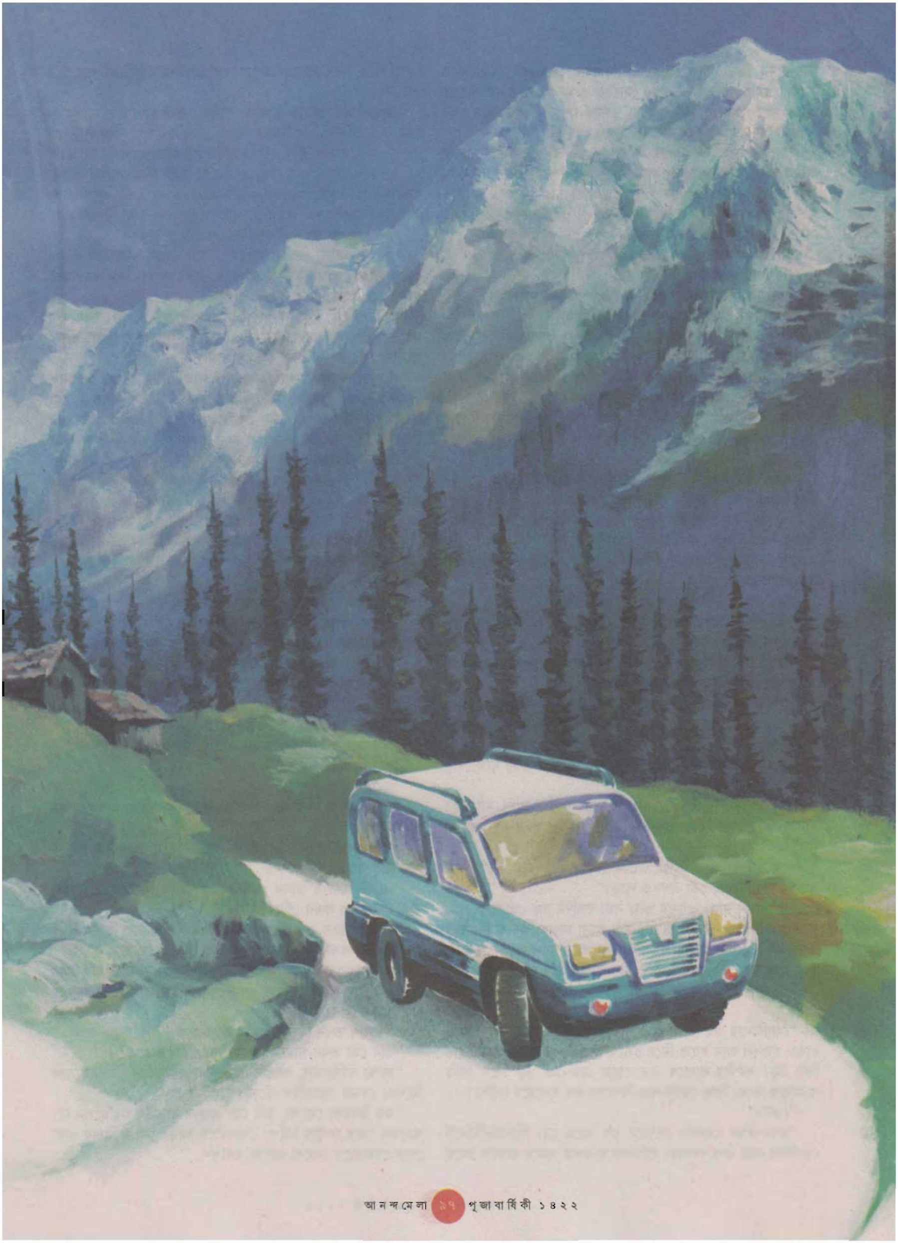

টুরিস্টদের ভিড় দু'দণ্ড শান্তিতে দাঁড়ানোর জো নেই। ফোটোতে যেমন দেখায়, হাউজবোটগুলো মোটেও তেমন মনোহর নয়। জলের মাঝে আলোকমালা, এইটুকুই যা তাদের শোভা। কিন্তু আজ যেন কাশ্মীর চিনিয়ে দিচ্ছে কেন তাকে ভূস্বর্গ বলা হয়।

চলতে-চলতে নদী এখন একদম পথের ধারে। দামাল বাচ্চার মতো লাফাতে-লাফাতে চলেছে। নুড়িপাথর টপকে-টপকে। ঝমঝম শব্দ উঠছে একটা। এপাশে পাহাড়ের গায়ে চরে বেড়াচ্ছে লোমশ ভেড়ার পাল। বরফ গলে গিয়ে কচি-কচি ঘাস গড়িয়েছে সবে। সেই সবুজে মুখ ডুবিয়েছে ভেড়ার দল।

মিতিন বলল,"ভেড়াগুলোকে দ্যাখ টুপুর। এদের লোম থেকেই জগৎবিখ্যাত কাশ্মীরি উল তৈরি হয়।"

সামনের সিট থেকে পার্থর ফোড়ন, "এদের মাংস যে কেমন, কাল রাত্তিরেই টের পেয়েছিস। কী স্বাদ, আহা।"

বুমবুম গোল-গোল চোখে নদী দেখছিল। পাহাড়ের এক বাঁকে এসে বায়না জুড়েছে, "আমি জল টাচ করব।"

থামানো হল গাড়ি। দৌড়ে নদীর পারে গিয়েছে বুমবুম। জলে হাত ছুঁইয়েই চেল্লাচ্ছে, "ওরে বাবা, কী ঠান্ডা।"

ক্যামেরা বের করে খটাখট ফোটো তুলছিল পার্থ। সাবধানী সুরে বলল, "সরে আয়। জলে পড়লে সিন্ধু যে তোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঠিক নেই।"

নদীর নামটা শুনে টুপুরের চোখ বড়-বড়, "এই সেই বিখ্যাত সিন্ধু? যার পারে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা?"

"হা হা। অনেকেই এই ভুলটা করে," নদীর আওয়াজ ছাপিয়ে পার্থর গলা গমগম করে উঠল, "এটা লোকাল সিন্ধু। বেরিয়েছে কাছেই অমরনাথ পাহাড়ের এক গ্লেসিয়ার থেকে। সম্ভবত হিমবাহটার নাম খাজিয়ার।"

"ও। তার মানে কাশ্মীরে আসল সিন্ধু নেই?"

"তা কেন? আছে বইকী। তবে সেই লাদাখে। আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে লেহতে পৌঁছে।"

"উঁহু, তার অনেক আগেই," মিতিন বলল, "দেখলে বুঝবি এই নদীর চেয়ে সে অনেক বেশি তাগদদার।"

এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে টুপুর বলল, "জায়গাটা ভারী নির্জন। এখানে একটু বসা যায় না মেসো? পাখির ডাক আর নদীর আওয়াজ শুনব?"

"মন্দ বলিসনি। আধাঘণ্টা জিরিয়ে নে। আমিও একটু ঘুরে দেখি যদি দারুণ কিছু ল্যান্ডস্কেপ ধরা যায়।"

সবে একটা পাথরে হেলান দিয়েছে টুপুর, ওমনি নাসিরের হাঁকাহাঁকি, "চলুন স্যার। চলুন ম্যাডাম। একটুও সময় নষ্ট করবেন না।"

পার্থ হালকা স্বরে বলল, "কেন ভাই? মাত্র তো সাড়ে ন'টা বাজে। সারাদিনটাই তো এখনও পড়ে।"

"না স্যার। রাস্তা একদম ভাল নয়। দশদিন হল জোজিলা পাস খুলেছে। এখনও গাড়িঘোড়া নিয়মিত আসা যাওয়া করছে না। তার উপর এই সময়ে মাঝে-মাঝেই জোজিলা পাসে বরফ পড়ে। তেমনটা হলে তো ব্যস, ওইটুকু পেরোতে দিন কাবার হয়ে যাবে।"

"বা রে, শুনেছি মিলিটারি নাকি সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা ক্লিয়ার করে দেয়?"

"জোজিলায় ওই নিয়ম চলে না স্যার। বুঝবেন, সে কী ভয়ঙ্কর রাস্তা। হরপল জান হাতে নিয়ে চলতে হয়। অথচ মাত্র বারোহাজার ফিট উঁচু। কাশ্মীর-লাদাখে এর চেয়ে ঢের-ঢের উঁচু দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে। কিন্তু জোজিলায় বিপদের ভয় সবচেয়ে বেশি।"

"কেন?"

"যখন-তখন যেখানে-সেখানে ধস নামে যে। মিনিটে-মিনিটে জোজিলা তার রূপ বদলায়। প্রতিবার যাওয়ার সময়ে আল্লার কাছে দোয়া করি, যেন এবারের মতো ভালয়-ভালয় জোজিলা পার হয়ে যাই।"

টুপুরের মুখ শুকিয়ে আমসি। পার্থও যথেষ্ট ঘাবড়েছে। বুমবুমের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মিতিন। মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি, পাহাড়ে ভাগ্য একটা বড় ফ্যাক্টর। দেখা যাক আমাদের কপালে কী আছে।"

তুরন্ত গাড়িতে উঠে পড়েছে সবাই। স্টার্ট দিয়ে নাসির বলল, "আর-একটা কথা ম্যাডাম। সোনমার্গে কিন্তু পেট পুরে লাঞ্চ সারবেন। কারগিলের আগে কোথাও আর আচ্ছা খানা মিলবে না।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কারগিলে ক'টায় পৌঁছব?"

"সাতটা-আটটা তো বাজবেই।... শীতে গোটা পথই তো বরফে ঢেকে থাকে, রাস্তা অনেক জায়গায় ভেঙে যায়। এখন মেরামতি চলছে। দেরি তো একটু হবেই স্যার।"

যতই শুনছে, টুপুরের ধুকপুকুনি যেন বাড়ছে আরও। তবে এক ধরনের রোমাঞ্চও জাগছে মনে। এমন এক বিপদসঙ্কুল রাস্তায় চলার সুযোগ পেয়েছে, এও কি কম সৌভাগ্য?

এঁকেবেঁকে চলছে গাড়ি। কখনও পাক খাচ্ছে পাহাড়। কখনও ছুটছে সোজা। চুপচাপ, নিসর্গে মগ্ন সবাই। মিতিন পর্যন্ত নীরব। সোনমার্গে আহারটাও যেন তেমন জমল না আজ। রুটি আর চিকেনই নিল সকলে, কিন্তু এ যেন স্রেফ খাওয়ার জন্য খাওয়া। কেউই যেন ঠিক উপভোগ করল না আহার। উলটোদিকের অমরনাথ পাহাড় চেনাল নাসির, কোনও মন্তব্যই করল না কেউ। কঠিন পথের আশঙ্কা বুঝি ম্লান করে দিয়েছে টুপুরদের উচ্ছলতা।

ফের গাড়ি ছাড়তেই, বোধ হয় টুপুরদের ভয় ভাঙাতে, হঠাৎ নাসিরের সঙ্গে গল্প জুড়েছে মিতিন, "আপনি কতদিন এই রুটে গাড়ি চালাচ্ছেন নাসিরভাই?"

"তা প্রায় বারোবছর।"

"শুধু শ্রীনগর থেকে লেহ যান? অন্য কোথাও নয়?"

"লেহর ওপারেও যাই কখনওসখনও। নুবরা ভ্যালি, প্যাংগং লেক, খারদুংলা... তবে তার জন্যে আলাদা অনুমতি লাগে।"

"কারগিল থেকে সব টুরিস্টই কি শুধু লেহ যায়?"

"বেশির ভাগ। অবশ্য ফরেনাররা কেউ-কেউ জাঁসকর ভ্যালিতেও ঢোকেন।"

"সেখানে অনেক বৌদ্ধ গুম্ফা আছে, তাই না?"

"জি। বহোত পুরানা-পুরানা। আর দেখার কিছুই নেই।"

"আপনি গিয়েছেন জাঁসকর ভ্যালিতে?"

"একবার। পদুম পর্যন্ত।"

"লেহ আর জাঁসকর ভ্যালি ছাড়া কারগিল থেকে আর কোথায় যাওয়া যায়?"

একটু চিন্তা করে নাসির বলল, "না ম্যাডাম। আর সব দিকেই মিলিটারি পাহারা। টুরিস্টদের যেতে দেয় না।"

"আপনি যাদের আমন গেস্ট হাউজ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা কারগিলে কখন পৌঁছেছিলেন?"

"তা প্রায় রাত দশটা। জোজিলায় তিনঘণ্টা আটকে ছিলাম।"

"পরদিন কখন জানলেন, আপনাকে লেহ যেতে হবে না?"

"তখন প্রায় ন'টা। আমি গাড়ি সাফসুফ করে তৈয়ার। যাঁর উমর বেশি, উনি সকালে কোথায় যেন বেরিয়েছিলেন। ফিরেই আমার ছুট্টি করে দিলেন। অচানক।"

"অন্যজন তখন কিছু বলেননি আপনাকে?"

"উনি তো তখন সামনে ছিলেন না। শায়দ রুমমে থে।"

"আচ্ছা নাসিরভাই, আপনি তো পুরো একটা দিন দু'জনের সঙ্গে ছিলেন। কেমন লেগেছিল ওঁদের?"

"কম উমরকা যো থা, উনি তো একদম বাতচিৎ করছিলেন না। অন্যজন বহুত ফান্টুশ টাইপ। শোনমার্গে আড়াইশো রুপিয়ার খানা খেয়ে বেয়ারাকে দোশো রুপিয়া বখশিস..."

বাক্য শেষ হল না, গাড়ি থেমেছে আচমকা। সামনে জোজিলা পাস চেকপোস্ট।

পরের দেড়টি ঘণ্টা যে কীভাবে কাটল টুপুরদের। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। কাদায় ডুবে-ডুবে যাচ্ছে চাকা। ডাইনে অতলস্পর্শী খাদ। বিপুল ভাঙাচোরা রাস্তায় গাড়ি একবার এদিকে হেলছে, একবার ওদিকে। প্রতিটি বাঁকই যেন মরণফাঁদ। ঘুরতে গিয়ে কেতরে যাচ্ছে গাড়ি। মাঝে-মাঝে বরফ, পিছল পথে চাকা বশে রাখতে নাসিরের প্রাণান্তকর দশা। অভিজ্ঞ ড্রাইভারও ঘামছে দরদরিয়ে। কী সাংঘাতিক গিরিপথ রে বাবা। এমন কুচকুচে কালো করাল মূর্তিধারী পাহাড়ই বা টুপুর কখনও দেখেছে নাকি।

অবশেষে চূড়ায় উঠল গাড়ি। একটা লোহার ফলকে চোখ পড়ল টুপুরের। বড়-বড় করে লেখা 'হোল্ড ইওর ব্রেথ, ইউ আর এন্টারিং লাদাখ।'

জোজিলা পেরিয়ে সত্যিই টুপুরের শ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড়। চোখ যা দেখছে, তা কি ঠিক? একটু আগে আশপাশের পাহাড়গুলো ছিল সবুজে সবুজ, হঠাৎ কোথায় উবে গেল তারা? সামনে যত দূর চোখ যায়, শ্যামলিমার চিহ্নমাত্র নেই। এদিকের বিশাল উঁচু-উঁচু পর্বতমালা একদম ন্যাড়া। এমন লাল-লাল চেহারাও হয় পাহাড়ের?

মিতিন বুঝি টুপুরের চক্ষু ছানাবড়া হওয়াটা লক্ষ করেছে। টুপুরের কাঁধে আলগা ঠেলা দিয়ে বলল, "এটাই লাদাখের বিউটি, বুঝলি। এ হল পারফেক্ট বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। মৌসুমি বায়ুর খেল হিমালয়ের ওপারেই খতম, লাদাখের কপালে সারা বছরে তিন-চারইঞ্চিও বৃষ্টি জোটে কিনা সন্দেহ। তারই এই পরিণাম। গাছপালা তো দূরস্থান, ঘাসপাতাও তোকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হবে।"

"হ্যাঁ, কেমন শুকনো-শুকনো চেহারা। যেন মরুভূমি।"

"শুধু বালির বদলে পাথর, এই যা," বলেই মিতিন দু'দিকে ঘাড় নাড়ল, "না-না, বালিও আছে। লেহর ওপারে। নুবরা উপত্যকায়। যেখান থেকে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণির শুরু। সেখানে উটও দেখা যায়।"

"ইয়েস। দু' কুঁজওয়ালা উট," বহুক্ষণ পর পার্থর স্বর ফুটেছে, "ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল। শোনা যায় তৈমুরলং নাকি ভারত অভিযানের সময়ে সঙ্গে এনেছিলেন। সেই উটেরই বংশ নাকি ওখানে টিকে আছে কয়েকশো বছর।"

"তৈমুরলং এ পথে এসেছিলেন? এই ঠান্ডার দেশ পেরিয়ে?"

"ইয়েস মিস ওয়াটসন। লাদাখ বড় আজব জায়গা। এখানে শয়ে-শয়ে গিরিপথ। লা মানে গিরিপথ। আর দাক মানে দেশ। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা কোনও কালেই ছিল না। ওই গিরিপথ দিয়ে যে খুশি এসেছে এখানে। কখনও মধ্য এশিয়া থেকে মোঙ্গলরা, কখনও বালতিস্থানের দর্দরা, কখনও বা উত্তর ভারত থেকে মন উপজাতির লোকরা। চিনা উপজাতি হু-রাও নাকি আস্তানা গেড়েছিল এখানে। আর তিব্বতিরা তো লাদাখকে প্রায় তিব্বতই ভাবে। এরকম একটা পাঁচমেশালি জায়গা দিয়ে তৈমুরলংদের যাওয়া আসাটা তো খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ভারতে আসার এই রাস্তাটা যখন সকলেরই চেনা। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে হুটহাট ঢুকে পড়া যায়।"

"কত ব্যবসায়ীও তো এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত," মিতিন কাঁধে দোপাট্টা জড়াতে-জড়াতে বলল, "ঘোড়া, খচ্চর, ইয়াকের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে এই গিরিপথ দিয়ে তারা পাড়ি জমাত ভারতে। পরে তো এরই নাম হয়েছে গ্রেট ইন্ডিয়ান সিল্ক রুট।"

লাদাখ নিয়ে গল্প চলছে তো চলছেই। নাসিরের কাছ থেকেও জানা হচ্ছে পথঘাটের বিবরণ। মাটিয়ান বলে একটা পুঁচকে জনপদে পৌঁছে টুপুর শুনল, এখানে নাকি এক বিচিত্র কুণ্ড আছে। মহাভারতের দ্রৌপদী নাকি আজও স্নান করেন সেখানে। সেই কুণ্ডের সামনে পাঁচ-পাঁচখানা পাহাড়। তাদের নাম পঞ্চপাণ্ডব।

আর একটু গিয়েই দ্রাস। পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম স্থান। বাইরে ঝলমলে রোদ দেখে জানলা নামিয়ে ঠান্ডাটা একটু বোঝার চেষ্টা করল টুপুর। পাঁচসেকেন্ড পরেই কাচ তুলে দিয়েছে। বাপস কী কনকনে বাতাস।

দ্রাসের পর আর তেমন ওঠাপড়া নেই রাস্তার। গাড়ি তবু চলছে টিকিটিকি। সাবধানে। সাড়ে সাতটা নাগাদ কারগিলের সরকারি টুরিস্ট বাংলোয় ঢুকল। তখনও ফটফট করছে দিনের আলো।

নাসিরের ভরসায় না থেকে মিতিন হনহনিয়ে বাংলোর অফিসে চলে গেল। টুপুরকে নিয়ে। টুরিস্ট অফিসার, লাদাখি, বয়স সম্ভবত চল্লিশের এপারে। পরনে জিন্স, ফুলস্লিভ শার্ট, হাফহাতা সোয়েটার। চোখে ফোটোসান চশমা।

নেমপ্লেটে অফিসারের নাম দেখে নিয়ে মিতিন সপ্রতিভ স্বরে বলল, "জুল্লে মিঃ লুবজাং ইয়াবগো।"

লুবজাং স্মিত মুখে বললেন, "জুল্লে। ওয়েলকাম টু কারগিল। হাউ ক্যান আই সার্ভ ইউ ম্যাডাম?"

চেয়ার টেনে বসল মিতিন। ইংরেজিতে বলল, "একটা রুম চাই। ফোর বেড হলে ভাল হয়। থ্রি-বেডও চলবে।"

"কিন্তু...আগে থেকে বুকিং না থাকলে তো এখানে..."

"সম্ভব হয়নি স্যার। খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। কাল ইভনিংয়ে শ্রীনগর ল্যান্ড করেই আজ সকালে স্টার্ট," মিতিন মৃদু হাসল, "পথেও কমিউনিকেট করতে পারিনি। শোনমার্গের পর তো টাওয়ারই ছিল না।"

"টুরিস্ট?"

"বলতে পারেন। একটু অন্য কাজও আছে অবশ্য।"

"লেহ যাবেন তো?" ক্ষণিক ভাবলেন লুবজাং, "রাস্তা তো খুলে গিয়েছে, কালই রওনা হবেন নিশ্চয়ই?"

মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, "লেহর রাস্তা বন্ধ ছিল নাকি?"

"জানেন না বুঝি? শুক্রবার বিকেল থেকেই তো লেহর দিকে হাইওয়ে ক্লোজড। খাটুলার আগে একটা বড় ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল। ইউ আর লাকি। আজ সকাল থেকে আবার গাড়ি যাচ্ছে।"

"ও। তা হলে এক রাতের জন্যই দিন। প্লিজ।"

"ঠিক আছে। সাতনম্বরটা খুলে দিচ্ছি। সুট রুম, চারজনের স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যাবে।"

"থ্যাঙ্কস," উঠতে গিয়েও যেন থমকাল মিতিন। বিনীত সুরে বলল, "একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি তো বৌদ্ধ।"

"হ্যাঁ। ভগবান তথাগতর এক দীন অনুগামী।"

"লাদাখে তো প্রচুর বৌদ্ধ টুরিস্টের আসা-যাওয়া। তাঁদের অনেকে তো এখানেই ওঠেন। আপনার সঙ্গে কি তাঁদের পরিচয় হয়?"

"অবশ্যই। পরিচয় পেলে আমি নিজে গিয়ে আলাপ করি," অমায়িক লুবজাং হাসলেন একটু, "ভগবান তথাগতর অনুগামীদের প্রতি বাড়তি দুর্বলতা থাকা নিশ্চয়ই দোষের নয়।"

"একেবারেই না। বরং এটাই তো স্বাভাবিক। অনেকে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণার কাজে আসেন, আপনি তো তাঁদের সাহায্যও করতে পারেন।"

"করি বইকী," লুবজাংয়ের স্বরে যেন জোর বেড়ে গেল, "এই তো গত সপ্তাহেই একজন এসেছিলেন। ইয়ংম্যান ফ্রম কোলকাতা। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের উপর তিনি কাজ করছেন।"

"নাম দেবল বড়ুয়া? গবেষণা কি গেলুপা শাখার বৌদ্ধদের নিয়ে?"

"আপনি তাঁকে চেনেন?"

"একটু-একটু। সম্প্রতি কোলকাতায় আলাপ হয়েছিল। বলছিলেন কী এক গুম্ফার খোঁজে লাদাখ যাবেন," মিতিন টেবিলে ঝুঁকল, "উনি কি এখানে আছেন এখনও?"

"না-না, শনিবারেই চলে গিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আত্মীয়গোছের

একজন ছিলেন, উনিই নাকি তাড়াহুড়ো করে... আমি খুব শক্‌ড হয়েছিলাম। আমাকে না জানিয়েই যেভাবে চলে গেলেন।''

"কোথায় গেলেন ওঁরা?''

"কিচ্ছু জানি না। শনিবার সকালে অফিসে এসে শুধু যাওয়ার খবরটা পেলাম।''

"লেহর দিকে তো যাননি নিশ্চয়ই?''

"একটাই তো রাস্তা। সেটা বন্ধ থাকলে যাবেন কী করে?''

"কাছেপিঠে আপনাদের গেলুপা শাখার বৌদ্ধদের কোনও গুম্ফা আছে?''

"হ্যাঁ। মূলবেখে। যেখানে আটাশফিট উঁচু বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি দেখতে যায় সবাই। ওখানে দু'টি গুম্ফার একটি গেলুপা গোষ্ঠীর।''

"ও।...তা ওঁরা মূলবেখে গিয়েছেন কি?''

"না-না, শুক্রবারই মূলবেখ থেকে ঘুরে এলেন। বলছিলেন ওখানে কাজ হল না, বোধ হয় ট্রেকিং ছাড়া গত্যন্তর নেই,'' লুবজাংকে হঠাৎ একটু বিস্মিত দেখাল, "মিঃ বড়ুয়া বেশ বিখ্যাত ব্যক্তি, তাই না? চেনাজানার সার্কলটাও বেশ বড়?''

"কেন বলুন তো?''

"শনিবার রাত্রে দু'জন ভদ্রলোক ওঁর খোঁজ করছিলেন। উনি নেই শুনে খুব হতাশ হয়ে চলে গেলেন।''

"কে তাঁরা। এখানেই উঠেছিলেন?''

"না। বললেন হোটেল সিয়াচেনে আছেন। দিল্লি থেকে এসেছেন।''

"কীরকম বয়স? চেহারাপত্রই বা কেমন?''

"আমার বয়সি কী একটু বড়। অ্যারাউন্ড চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। এডুকেশন লাইনের লোক বলে পরিচয় দিলেন, কিন্তু শরীরগুলো বেশ মজবুত। স্পোর্টসম্যান লাইক,'' লুবজাং থমকালেন একটু, "এসব জেনে আপনার কী হবে?''

"কিছুই না। ধরুন, মেয়েলি কৌতূহল,'' মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "চলি তা হলে। রুমে যাই। কাইন্ডলি রুম সার্ভিসের স্টাফকে পাঠিয়ে দিন।''

বেরিয়ে এল মিতিন। পার্থ আর বুমবুম গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। কী নিয়ে যেন জোর গবেষণা চলছে বাবা-ছেলের। দু'জনে ডাকছে মিতিনকে, বোধ হয় তার মতামত জানতে চায়।

মিতিন থামল না। চলেছে ঘরে। অগত্যা টুপুরকে যেতেই হয়। রহস্যের জাল ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশ, এই সময়ে মাসির পিছু ছাড়তে পারে টুপুর!

॥ ৬ ॥

গাড়িতে উঠেও চোখ খুলতে পারছিল না টুপুর। কাল দিনভর জার্নির ধকলে রাতে মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, ভোরের আলো ফুটতেই জাগিয়ে দিয়েছে মিতিন। ঠেলা মেরে-মেরে পার্থ আর বুমবুমকেও। তড়িঘড়ি তাদের তৈরি হতে বলেই ছুটল নাসিরকে তুলতে। আজকের গন্তব্য শুনেই সে বেঁকে বসেছিল, অনেক তুইয়ে-বুইয়ে তাকে রাজি করিয়েছে শেষমেশ। বাড়তি পনেরোহাজার টাকার কড়ারে। সাতটা বাজার আগেই সকলে সিটে আসীন, জিনিসপত্র তুলে কম্পাউন্ড ছেড়েছে নাসির।

বেরিয়েই তার প্রথম বাক্য, "গাড়িতে তেল নিতে হবে ম্যাডাম।"

"এক্ষুনি?'' পার্থ একটা প্রকাণ্ড হাই তুলল, "এখনও তো কারগিল ছাড়িনি?''

"কারগিলেই ট্যাঙ্কি ফুল করতে হবে। পিছনের ড্রামগুলোও ভরব। কারগিল থেকে পদুম দুশো চল্লিশ কিলোমিটার। যাতায়াতে পাঁচশো। গোটা জাঁসকর ভ্যালিতে এক বুঁদ ডিজেল মিলবে না, সবটাই বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

এর পর আর কথা চলে না। টুপুর ঢুলতে-ঢুলতেও টের পেল, আজও ভ্রমণটা খুব সুখের হবে না।

পেট্রলপাম্পে গাড়ি দাঁড়াতেই মিতিন টুক করে নেমে গিয়েছে। পলকে ভ্যানিশ। তেল ভরা শেষ, নাসির কখন স্টিয়ারিংয়ে বসে প্রস্তুত, মিতিন আর আসেই না। বারবার ঘড়ি দেখছে নাসির, ছটফট করছে।

পার্থ বিরস মুখে বলল, "তোর মাসি যে কী করে? কাশ্মীর দেখতে দিল না, কারগিলেও তিষ্ঠোল না, এখন তিনি কোন চুলোয় হাওয়া মারলেন কে জানে?"

বুমবুম বলল,"কারগিলে কী-কী আছে বাবা?"

"এই কারগিলেই তো ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল," টুপুরই জবাব দিল, "কাল দেখলি না বাংলোর কম্পাউন্ডে কেমন বাঙ্কার বানানো হয়েছিল। লোহার জালের নীচে।"

"শুধু যুদ্ধ দিয়ে কারগিলকে চেনাস না টুপুর," পার্থ উপদেশের সুরে বলল, "কাল যে ইন্ডিয়ান সিল্ক রুটের কথা বলছিলাম, কারগিল থেকেই তার যাত্রা শুরু হত। বোখারা, সমরখন্দ, ইয়ারকন্দ, বার্মিয়ানের বড়-বড় সওদাগররা তখন ভিড় জমাত তিন পাহাড়ে ঘেরা এই কারগিলে। শহরটায় চক্কর মারলে সেই পুরনোদিনের একটা রেশ তো অনুভব করা যেত। এছাড়াও কারগিলের খোবানি খুব বিখ্যাত। পথের ধারেই দেখবি সাদা-সাদা ফুল ফুটে আছে..."

কথার মাঝেই এসে পড়েছে মিতিন। বড়সড় একটা ঝোলা নিয়ে। গাড়িতে উঠেই জিভ কাটছে, "সরি-সরি, তোমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি..."

"আমরা কী জানতে পারি মহারানি কোথায় গিয়েছিলেন?'' পার্থ গুলি ছুড়ল, "কী জিনিস কেনার প্রয়োজন পড়ল সাত সকালে?"

"রেশন নিলাম," মিতিন মিচকে হাসল, "সঙ্গে কিছু সঞ্চয় রাখাই তো ভাল।"

নাসির গাড়ি ছুটিয়েছে। কারগিল শহরটা বেশ ঘিঞ্জি, পাশে-পাশে চলা সরু নদীটার জলও বেজায় ঘোলা, পথের দু'ধারের দৃশ্যও তেমন তাকানোর মতো নয়, সাদা ফুলও নজরে পড়ছে না খুব একটা। সকলের হাতে বিস্কুটের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছে মিতিন, তাই কচকচ চিবোচ্ছে টুপুর নীরবে।

পার্থ কিন্তু প্রশ্ন হানল, "তা হঠাৎ জাঁসকরে যাওয়ার বাসনা চেগে উঠল যে বড়?"

মিতিন বলল, "দেবলের ওদিকেই যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।"

"সে যে আবার শ্রীনগরেই ফিরে যায়নি, একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়?"

"অবশ্যই। টেকনিক্যালি প্রায় অসম্ভব।"

"কেন?"

"কারণ, সে বাংলো ছেড়েছে শনিবার সকালে। ওইদিনই সন্ধেবেলায় দু'জন লোক তার খোঁজ করছিল। লেহর রাস্তা বন্ধ, অতএব তারা শ্রীনগর থেকেই এসেছে এবং সেই দিনই। দেখেছ, শ্রীনগর-কারগিল একটাই রাস্তা। তা হলে একই দিনে দেবল ওই পথে গেলে লোকদুটোর সঙ্গে মাঝে কোথাও দেখা হয়ে যেত।"

"শুধু এইটুকু আন্দাজ করেই এত দূরে পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিলে?"

"আজ্ঞে না স্যার। অন্য হিসেবও আছে," মিতিন ঈষৎ গম্ভীর, "আমার ধারণা যে গুম্ফার সন্ধানে দেবল বেরিয়েছে, সেটা জাঁসকরেই আছে।"

"ধারণাফারনা ছাড়ো। যুক্তির কথা বলো," পার্থ ধার বাড়াল আক্রমণের, "সে যদি বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে চায়, তবে তো লেহর কাছাকাছি হেমিস গুম্ফায় যাওয়া উচিত। ওখানেই তো বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। আমি যতটুকু জানি, হেমিস থেকেই বই ছাপিয়ে অন্য সব গুম্ফায় পাঠানো হয়।"

"গোড়াতেই তুমি ভুল করছ। দেবল কোনও লাইব্রেরিতে

পড়াশোনা করতে বেরয়নি। একটা প্রাচীন পুঁথি তাদের বাড়িতে ছিল, সে এসেছে সম্ভবত সেই পুঁথির উৎস সন্ধানে। কিংবা সেই পুঁথি নির্দেশিত পথে কোনও এক গুম্ফায় পৌঁছনোই তার লক্ষ। কারণ পুঁথিতে মহামূল্যবান কিছুর সন্ধান দেওয়া আছে।"

"মানে? গুপ্তধন গোছের কিছু?"

"গোপনে রয়েছে যখন, গুপ্তধন তো বলাই যায়। তবে সচরাচর আমরা যেমনটা ভাবি, এ তেমন নয়। সোনাদানা, হিরে-জহরতের চেয়ে ঢের-ঢের দামি।"

"সেটা কী?"

"এমন কিছু, তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আর দেবলের এই উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসা এও বলে দিচ্ছে, সেটা গেলুপা শাখার বৌদ্ধদের কোনও গুম্ফাতেই থাকার প্রবল সম্ভাবনা।"

"গেলুপা শাখা আবার কোত্থেকে এল?" পার্থ ভুরু কোঁচকাল, "বৌদ্ধদের তো তিনটেই শাখা। হীনযান, মহাযান আর বজ্রযান। প্রথমটা কট্টরপন্থী, মহাযানরা মাঝামাঝি, আর বজ্রযানরা বোধ হয় শুধু জপতপ নয়, তন্ত্রসাধনাও করে..."

"তিব্বতে এটা একটু অন্য রকম। ওখানে বৌদ্ধধর্ম প্রথম পৌঁছয় সেভেন্থ সেঞ্চুরিতে। থ্রু সাম মহাযানী ভিক্ষু। তারও তিনশো বছর পর পদ্মসম্ভব নামের এক বৌদ্ধ ধর্মগুরু যান তিব্বতে। তিনি ছিলেন বজ্রযান সম্প্রদায়ের, তখন থেকেই ওখানকার বৌদ্ধরা নানান শাখায় ভাগ হয়ে যায়। সেই পদ্মসম্ভবের শ'দেড়েক বছর পর তিব্বতে পা পড়ে এক বাঙালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর।"

পার্থ তর্জনী উঁচোল, "অতীশ দীপঙ্কর?"

"কারেক্ট। অতীশ গিয়ে তিব্বতি বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচার আচরণে প্রথা প্রকরণে অনেক বদল ঘটান। তাঁর শিষ্যরাই বৌদ্ধদের আধুনিক গোষ্ঠী গেলুপা শাখার জন্মদাতা। যাঁদের প্রধান ধর্মগুরু দলাই লামা।"

"ও। তা দেবল কেন..."

"দেবলের তো আগ্রহ থাকবেই। দেবলরাও তো বজ্রযানী, গেলুপাদের প্রায় সমগোত্রীয়। তাই তো বলছি..."

বলা আর হল না, আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি। সরু নদীর পাশে-পাশে এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে টিকিয়ে-টিকিয়ে চলছিল গাড়ি, বড় গাড্ডা সামলাতে মরিয়া ব্রেক মেরেছে নাসির। বুমবুম প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ছিল, মিতিন তাকে ধরে নিয়েছে কোনও মতে।

আলগা ধমকের সুরে মিতিন বলল, "থোড়া সাবধানীসে চলিয়ে নাসিরভাই।

"এই কারগিল-পদুম রোডে গাড়ি এভাবেই চলবে ম্যাডাম। এর পর তো রাস্তা আরও বেহাল হবে। এখন তো সুরু ভ্যালি দিয়ে যাচ্ছি, পাহাড়ে ওঠার পর তো আর রাস্তাই থাকবে না," নাসির একটানা গজগজ করে চলেছে, "আপনি তো আমার বাত শুনলেন না, জানেন এবছর এখনও রুটের বাস সার্ভিস শুরু হয়নি।"

"কেন? রাস্তা তো খুলে গিয়েছে?"

"সে আর ক'দিন? মাত্র তো একসপ্তাহ। তার মধ্যে বড়জোর তিন-চারটে ভাড়ার গাড়ি গিয়েছে জাঁসকরে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বলল, শেষ একটা গিয়েছিল গত শনিবার। তারপর এই আমরাই। কপালে যে কী আছে, সে খোদাই জানেন।"

"বিপদ হবে না নাসিরভাই," মিতিন মিষ্টি করে বলল, "আমরা ভাল কাজে যাচ্ছি যে। না গিয়ে উপায় নেই।"

"কিঁউ?"

"শ্রীনগরে আমন গেস্ট হাউজ থেকে যাঁদের কারগিলে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের যে খুব বিপদ। কমবয়সি যে ছিল, সে তো আপনার ছোটভাইয়ের মতো। তাঁকে বাঁচাতেই তো আমরা ঝুঁকি নিয়েও বেরিয়েছি। আপনার মতো একজন ওস্তাদ ড্রাইভার সঙ্গে আছে, এটা আমাদের মস্ত বলভরসা। আপনি চান না, আপনার ভাইটা..."

"বাস-বাস," মিতিনের তোয়াজে নাসির গলে জল। স্বরই বদলে গেল নাসিরের, "আপ বেফিকর রহিয়ে ম্যাডাম। ম্যায় আপলোগকা সাথ দুঙ্গা। আখরি দম তক।"

"আপাতত একটু ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করা যায় না, নাসিরভাই?" পার্থর অনুনয় শোনা গেল, "নাকি গোটা রাস্তা শুধু ঝাঁকুনি খেয়েই থাকতে হবে?"

পার্থকে আশ্বস্ত করে আধঘণ্টার মধ্যেই এসেছে একটা মাঝারি জনপদ। শাংখু। বাড়িঘর, স্কুল, ব্যাঙ্ক, খাবার হোটেলও আছে বেশ কয়েকখানা। ঝড়ের গতিতে পেটপুরে মোটা-মোটা বাজরার রুটি আর সবজি সাঁটিয়ে আবার গাড়িতে আরোহণ। এবার পথশোভা যেন বেড়েছে খানিকটা। দু'দিকে সবজেটে পাহাড়, মধ্যিখানে বয়ে চলা সুরু নদী এখন বেশ স্বচ্ছ সলিলা, ইতস্তত দেখা যাচ্ছে ফার-পাইন-দেবদারু, তাকিয়ে থাকলে বেশ আরাম হচ্ছে চোখে। রাস্তারও বেশ উন্নতি হয়েছে, ভরাপেটে একটু-একটু তন্দ্রাও আসছে যেন।

হঠাৎ বুমবুমের চিৎকার, "অ্যাই টুপুরদিদি, দ্যাখ কী মজার পাহাড়।"

টুপুর চোখ রগড়ে তাকাল। সত্যিই তো আজব দৃশ্য। পাশাপাশি দু'খানা পর্বতশৃঙ্গ, দুটোই প্রায় সমান উঁচু। একটি বরফে সাদা হয়ে আছে, অন্যটিতে প্রায় তুষারই নেই। কী করে এমনটা সম্ভব হল?

জবাব মিলল নাসিরের কাছ থেকে। ওই দুই পাহাড় নাকি দুই ভাই, একজনের নাম নুন, অন্যজন কুন। দু'জনেই একুশ-বাইশ হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু ভাইয়ে-ভাইয়ে নাকি একটুও মিল নেই। নুন খুব শান্তশিষ্ট, মাথাটা তার বরফে ঢাকা। কুন বেজায় রাগী, বরফ নাকি তার মাথার কাছাকাছি ঘেঁষতেই সাহস পায় না। নুন-কুনের পা ছুঁয়ে আছে এক হিমবাহ, নাম তার পারকিচিক। সে নাকি দুই ভাইয়েরই অনুগত, কিছুতেই দু'জনকে ঝগড়া করতে দেয় না। ভাইদের থামাতে খুব কান্নাকাটি করে পারকিচিক, তার চোখের জলই নাকি সুরু নদী হয়ে বইছে।

নুন-কুনের অভিনব কাহিনি শুনে মিতিন পর্যন্ত হেসে খুন। হাসতে-হাসতেই টুপুরকে বলল, "আসল কারণটা কি জানিস? পাহাড়ের গায়ে বা মাথায় কতটা বরফ জমবে, তা নির্ভর করে পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপর। যে পাহাড়ে ঢাল কম, সেখানে বরফও বেশি। নুনের তুলনায় কুন অনেক বেশি খাড়া, তাই কুনের গায়ে বরফ টিকতে পারে না, গোটা বরফটা গিয়ে ওই নুনপাহাড়েই জমা হয়।"

তথ্যটা মেমারিতে চালান করে দিল টুপুর। তবে পারকিচিক হিমবাহটাকে দেখছিল মন দিয়ে। এমন ভাবে দুই পাহাড়ের পায়ের নীচে পড়ে আছে, ওকে কিন্তু নুন-কুনের বাধ্য অনুচর হিসেবে দিব্যি মানিয়ে যায়।

এবার পাহাড়ে চড়ছে গাড়ি। উঁহু, লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। রাস্তা বলতে স্রেফ ভাঙাচোরা পাথর, তার উপর দিয়েই কোনও মতে গড়াচ্ছে গাড়ির চাকা। উঠতে-উঠতে কখন যে পাহাড়ের শৃঙ্গে পৌঁছল, কখনই বা নামছে অল্প-অল্প, কিচ্ছুটি আর বোঝার বাসনা নেই টুপুরের। গাড়ি যখন হেলছে বিশ্রী ভাবে, অমনি মনে হচ্ছে এই বুঝি দু'-তিনহাজার ফিট নীচে পড়ে গেল সবসুদ্ধ। পরক্ষণেই হয়তো কেতরে গিয়ে প্রায় ধাক্কা মারছে পাহাড়ের গায়ে। নিসর্গ দেখবে কী, টুপুর তো চোখ বুজে সিঁটিয়ে বসে। মনে একটাই চিন্তা কখন যে ফুরোবে এই পথ।

অবশেষে প্রাণ এসেছে ধড়ে। এই পাহাড় শেষ, এবার সমভূমি আসছে। হঠাৎ নাসির গাড়ি থামিয়ে হেঁকে উঠল, "খবরদার, হুঁশিয়ার, আঁধি আ রহা হ্যায়..."

আরে সত্যিই তো, সামনে ধুলোর ঝড় উঠেছে না। সমভূমি থেকে ধোঁয়ার মতো এদিক পানেই ধেয়ে আসছে যেন। পাক খাচ্ছে

বাতাস, ছোট-ছোট পাথরকেও অবলীলায় আকাশে তুলে নিয়ে ঘূর্ণি এগোচ্ছে তীব্রগতিতে। একটা অদ্ভুত হুঙ্কারও শোনা যায় কেন?

নাসির ঊর্ধ্বপানে হাতজোড় করে কাঁপছে ঠকঠক। তার প্রার্থনার গুণেই হোক, কী প্রকৃতির খেয়ালে, কয়েকমিনিট পরেই থেমে গেল ঝড়টা। তার আর চিহ্নই নেই, আবার ঝকঝক করছে নীল আকাশ, সমভূমি ফের নিথর। আঁধিটা যেন সত্যি নয়, শুধুই ক্ষণিক বিভ্রম। টুপুরদের মনের ভুল।

গাড়ি ছেড়েছে নাসির। সদ্য ঘাস গজানো সমভূমিতে নেমে জলের উপর দিয়েই পেরোল একটা সরু নদী। পাশে বসা পার্থকে বলল, "কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছি স্যার।"

পার্থ বলল,"এমন শুকনো ধুলোর ঝড় এপথে হয় নাকি?"

"এই জায়গাটায় হয়। রংদুম গুম্ফার কাছে। তিনদিকে পাহাড় তো, এখানে এই খারাপ হাওয়াটা আসে হরদম। আঁধির মধ্যে পড়ে গেলে আস্ত গাড়িকেও-দলে মুচড়ে চুরমার করে দেয়। সামনে চলুন, আরও কত খেল দেখবেন হাওয়ার।"

অদূরে ছোট্ট টিলার মাথার রংদুম গুম্ফা। চূড়ায় হলুদ পতাকা। ওই পতাকা দেখেই নাকি বোঝা যায়, এটা গেলুপা বৌদ্ধদের গুম্ফা। এখানেই কেন যে দেবল থাকতে পারে না, বুঝল না টুপুর। মাসি যেন জাঁসকরের আগে কোথাওই থামতে রাজি নয়।

উপত্যকার মতো জায়গাটা পেরতে-পেরতে টুপুর শিহরিত হচ্ছিল। খাড়া-খাড়া গাঢ় লাল পাহাড়গুলো দেখে। বাতাসের ঝাপটায় কত যে অপার্থিব ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে। কোথাও ভল্লুক, কোথাও বা শাঁখ, কোথাও চাকা, কোথাও বা হরিণ। প্রকৃতিও যে কী নিপুণ চিত্রকর হতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে বুঝি বিশ্বাসই হত না টুপুরের!

স্বস্তির মেয়াদ শিগগিরি ফুরোল, আবার এসেছে চড়াই। বিকেলের মুখে-মুখে একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামাল নাসির। বলল, "কারগিল-পদুম রোডে এটাই সবচেয়ে উঁচু গিরিপথ। প্রায় পনেরোহাজার ফিট। নাম পেনজিলা। আপনারা এখানে একটু হাত-পা ছাড়ান। ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়েছে গাড়ির, সেও ততক্ষণে জিরিয়ে নিক।"

প্রস্তাবটা দারুণ মনমতো হয়েছে বুমবুমের। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল সে, তিরবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। খানিক দূরে সাদা-সাদা কয়েকটা সিমেন্টের বেদি চোখে পড়ল টুপুরের। কে এমন যত্ন করে বানাল? এই নির্জন জায়গায়?

পাশেই মিতিন। জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি আন্দাজ করতে পারছিস?"

টুপুর কপাল কোঁচকোল, "কারওর সমাধি?"

"একদম ঠিক। কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর," টুপুরের পিঠ চাপড়ে দিল মিতিন, "সংস্কৃত কিংবা পালিতে একে বলে চৈত্য। লাদাখি ভাষায় চোরতেন। গোটা লাদাখেই দেখবি চোরতেনের ছড়াছড়ি।"

আচমকা কাঁধে টোকা, "পিছনে একবার তাকা রে টুপুর।"

পার্থর গলা পেয়েই টুপুর ঘাড় ঘোরাল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাস আটকে গেল যেন। যা দেখছে, তা কি সত্যি? না স্বপ্ন? দু'খানা পেল্লাই উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বিশাল চওড়া নদী নেমে আসছে! আস্ত নদীটাই জমে তুষার? খানিকটা নদী যেন ঝুলছে শূন্যে।

টুপুরের ঠোঁট নড়ল, "ওটা কী নদী?"

"ও তো নদী নয়," নাসির বলে উঠল, "লাদাখের একটা বিখ্যাত গ্লেসিয়ার। নাম দ্রাং-দ্রুং।"

নামের ওজনেই বোঝা যায়, হিমবাহটি হেলাফেলার বস্তু নয়। নাসিরই ফের বলল, "ওই দ্রাং-দ্রুং থেকেই তো বেরিয়েছে স্টড নদী। এখন থেকে স্টড আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলবে। সেই পদুম পর্যন্ত। পুরো জায়গাটাই স্টড ভ্যালি।"

"পদুমও?"

"না-না। এখান থেকে স্টড গিয়ে পদুমে সরাপ নদীর সঙ্গে মিশে তৈরি হচ্ছে জাঁসকর নদী। তাই পদুম পৌঁছে উপত্যকার নাম হবে জাঁসকর।"

বিকেলের চমৎকার আলো পেয়ে প্রাণের সুখে শাটার টিপছিল পার্থ। ক্যামেরাকে বিশ্রাম দিয়ে টুপুরকে বলল, "এভাবেই উপত্যকার নামকরণ হয়। নদীর নামে। লেহর অনেকটা আগে জাঁসকর গিয়ে পড়বে সিন্ধুতে। তখন সেটা হয়ে যাবে সিন্ধু উপত্যকা। ব্যাপারটা বুঝলি?"

মাথা নাড়তে-নাড়তে সরে এল টুপুর। মিতিনমাসি হাত নেড়ে ডাকছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সেদিকে। একটা তেলের জারিকেন নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছিল মিতিন। টুপুরই জিজ্ঞেস করল, "এখানে পেলে বুঝি?"

"হুম। এতে পেট্রল ছিল। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।" মিতিন পলক আনমনা। পরক্ষণে ভ্যানিটিব্যাগ খুলে একটা দলা পাকানো কাগজ বের করল। টুপুরকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা দ্যাখ।"

ভাঁজ খুলেই টুপুরের চোখ বড়-বড়, "এ তো আনন্দবাজার পত্রিকা।"

"তারিখটা নোটিস করেছিস?"

"জুনের চার।"

"অর্থাৎ গত মঙ্গলবার। যেদিন দেবল কলকাতা ছেড়েছিল। মানেটা বুঝলি?"

"এটা কি দেবলের আনা? এখানে ফেলে গিয়েছে?"

"শিওর। আমরা তা হলে ঠিকদিকেই এগোচ্ছি।"

মিতিনের চোখ জ্বলজ্বল করছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নাসির দু'জনের কথোপকথন শুনছিল। কী বুঝেছে, কে জানে, এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে মিতিনকে বলল, "এক বাত পুঁছু, ম্যাডামজি?"

"বেশক।"

"আপ জাঁসুস হ্যায় কেয়া?"

PROGRAMMES OFFERED
www.acharyabbs.ac.in
BBA | BCA | B.Com | DEGREE+
B.A. Journalism | B.Sc. Biotech/Genetics/Micro
MBA | PGDM | M.Com | MFM | M.Sc.Biotech/Applied Genetics
শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা
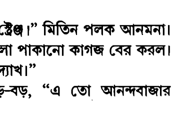
A+ CATEGORY
Acharya Bangalore B-School
(Affiliated to Bangalore University & Recognized by Govt. of Karnataka, UGC under Sec 2 (F) & AICTE)
Andrahalli Main Road, Off: Magadi Road, Bengaluru - 560 091
ABBS NURTURING THE FUTURE
NAAC | IACBE

"সমঝ গয়া?" মিতিন লঘু স্বরে বলল, "তব আপ ভি তো জাঁসুস বন গয়া নাসিরভাই?"

ভারী লজ্জা পেয়েছে নাসির। আড়ে-আড়ে দেখছে মিতিনকে। মুগ্ধচোখে। বুঝি মেয়ে ডিটেকটিভ দর্শন তার জীবনে এই প্রথম।

॥ ৭ ॥

রাত প্রায় সাড়েদশটা। ছোট্ট পদুম শহরে যেন গাঢ় নিশুতি। একটা-দুটো পথবাতি টিমটিম করছে। মানুষ তো দূরস্থান, কুকুর-বিড়ালও দেখা যায় না রাস্তায়। এলাকা যেন ঘুমিয়ে কাদা।

পদুমের টুরিস্ট বাংলোর লোহার গেটে ধাক্কা মারছিল পার্থ। সাড়াশব্দ নেই। হতাশ হয়ে পার্থ বলল, "এখানে নিশ্চয়ই আরও হোটেলটোটেল আছে? দেখে আসব?"

প্রস্তাবে জল ঢেলে দিল নাসির। বলল, "লাভ নেই স্যার। বেড়ানোর মরসুম শুরু হয়নি। একটা হোটেলও খোলা পাবেন না।"

"তা হলে? রাতটা কি এখানেই কাটাতে হবে?"

টুপুর কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "ঠান্ডা খুব বাড়ছে গো মেসো। এবার নির্ঘাত জমে যাব। কী কনকনে হাওয়া।"

পার্থ বলল,"বেঘোরে প্রাণ হারিয়ে লাভ নেই। যা একখানা জায়গা, সাতদিনের আগে ডেথ নিউজ়টাও বেরবে না। চল বরং গাড়িতে গিয়ে বসি।"

"এত অল্পে হাল ছেড়ে দিলে?" মিতিন এগিয়ে এল, "দাঁড়াও, আমি দেখছি।"

বলেই হাত দু'খানা মুখের সামনে চোঙার মতো ধরে উৎকট সুরে চেঁচিয়ে উঠল মিতিন, "কোইইই হ্যাঅ্যাঅ্যায়? হ্যায় কোওওওই?"

আশ্চর্য ব্যাপার, বারদুয়েক চিৎকারের পরই গেটে শব্দ। তালা খুলছে কেউ। সামান্য ফাঁক হল দরজা। কম্ফর্টার মোড়া একটা পাহাড়ি লোক বেরিয়েছে।

মিতিন অনেকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "জুল্লে জুল্লে।"

চোখ পিটপিট করে লোকটাও বলল, "জুল্লে।"

গাড়ি আর সহযাত্রীদের দেখিয়ে মিতিন আঙুলে ইশারা করছে, "টুরিস্ট হুঁ। অন্দর যানেকো মাংতা।"

বোধ হয় বুঝেছে লোকটা। গেট খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে নাসির। কম্পাউন্ডটি বেশ বড়সড়। দোতলা বাড়ি। খানদশ-বারো ঘর তো আছেই। পাশে আলাদা করে একটা ডাইনিং হলও নজরে পড়ল টুপুরের। যাক, শুধু আশ্রয় নয়, আহারেরও বন্দোবস্তও হবে।

হায় রে কপাল। রুম চাওয়া মাত্র লোকটা দু'দিকে মাথা নাড়ছে। ম্যানেজারবাবু নেই, ঘর দিতে পারবে না। অনেক বলে-কয়ে তাকে নিমরাজি করাল নাসির। তবে লোকটা সাফ জানিয়ে দিল, খানা কিছু জুটবে না।

এবার পার্থর কাকুতি-মিনতি। বুমবুমকে দেখিয়ে বলল, "বাচ্চা ভুখা হ্যায়। ইসকে লিয়ে তো কুছ করো।"

অবশেষে খানদশেক ডিমসেদ্ধর প্রতিশ্রুতি মিলেছে। মিতিন আর চাপাচাপি করতে নিষেধ করল। পাহাড়ি মানুষরা নাকি ভারী জেদি হয়। দুম করে বেঁকে বসলে ওইটুকুও জুটবে না। সঙ্গে প্রচুর বানরুটি আছে, একটা রাত চালিয়ে নেওয়া যাবে।

দোতলায় একটা ঘর খুলে দিতে টুপুরের মনটা ভাল হয়ে গেল। দিব্যি পরিচ্ছন্ন। বড়-বড় বিছানা, লেপকম্বলও মজুত। এমনকী, কমোডও আছে বাথরুমে। এর বেশি আর কী চাই।

পার্থর গলাতেও তারিফ। বিছানায় চিত হয়ে বলল, "এতটা আমি আশা করিনি। এমন দুর্গম জায়গাতেও কারেন্ট আছে! ফ্যাটফ্যাট টিউব জ্বলছে।"

"এটা সৌরবিদ্যুতে চলছে। খেয়াল করোনি, কম্পাউন্ডে ঢুকেই ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড সোলার প্যানেল," গায়ে ভাল করে শাল জড়াতে-জড়াতে মিতিন বলল, "লাদাখের এইদিকটায় ঘরে-ঘরে কারেন্ট। সর্বত্র সৌরবিদ্যুৎ।"

টুকটাক কথার মধ্যেই যে যার মতো বদলে নিল পোশাক। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়ছিল, এবার তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে মিতিন। নাসির এসে জানিয়ে গেল সেও ঘর পেয়েছে একতলায়। তার কপালেও দু'খানা ডিমসেদ্ধ শুনে মিতিন বানরুটি দিল তাকে। টুপুরও নিশ্চিন্ত হয়ে বসল কম্বল মুড়ি দিয়ে। রাত বাড়ছিল।

আহারের পর সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল পার্থ। ফিরে বলল, "আমরা দারুণ সময়ে এসেছি, বুঝলি টুপুর।"

"কেন?"

"এখন শুক্লপক্ষ। বোধ হয় দশমী-একাদশী কিছু হবে। চমৎকার একটা চাঁদ উঠেছে। ঝকঝকে আকাশে দারুণ লাগছে রে চাঁদটাকে।"

দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে এল টুপুর। চোখ গোল-গোল করে বলল, "সত্যি গো। যেন পাহাড় থেকে চাঁদ উঠছে। চূড়ার বরফ চিকমিক করছে আলোয়।"

"হুম। তবে এই সব জ্যোৎস্নাফোসনা প্রাণভরে উপভোগ করা যাবে কি? তোর মাসি হয়তো কাল সকাল থেকে আবার দৌড় করাবে," পার্থ ভুরু নাচাল, "এর পর আমরা কোথায় যাব ম্যাডাম?"

"দেখা যাক। সকাল তো হোক।"

"আমি কিন্তু বলে রাখছি, সকালবেলা ভ্যালিতে যত খুশি চক্কর মারো, রাতে এই গেস্ট হাউজ়েই ফিরব। দুমদাম কোথাও নিয়ে ফেলার তাল কোরো না। বেড়ানোর একটা স্টেজ অন্তত এনজয় করতে দাও।"

"স্ট্রেঞ্জ।" টুপুর না বলে পারল না, "দেবল বড়ুয়াকে নিয়ে তোমার একটুও ভাবনা হচ্ছে না? যাকে খুঁজতে..."

"আমি তো খোঁজাখুঁজির কোনও মানেই পাচ্ছি না। যদি ধরেও নিই সে এই ভ্যালিতে এসেছে, তাতেও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ আছে কি? তার বিপদের কোনও চান্স এখনও দেখা যায়নি। সুতরাং খামকা দৌড়াদৌড়িরই বা কি প্রয়োজন?"

"বা রে, তাকে পেতে হবে না?"

"সে তো এমনিই ধরা দেবে। জাঁসকর ভ্যালি থেকে বেরনোর একটাই রাস্তা। আর আমরা সেখানেই বসে।"

"হুঁ। এখানে তো কোনও হোটেলও খোলা নেই। অতএব দেবল পদুমে থাকলে তো নিশ্চয়ই এই বাংলোয়..."

"নেই," পার্থ বুড়ো আঙুল নাড়ছে, "আছে শুধু এক সাহেব-মেমসাহেব। বাকি সব রুম ঢুঁঢুঁ। খবর নিয়েছি।"

"এখানে সে আদৌ এসেছিল কি?... যাই হোক, এখন সে নেই, এটাই আসল কথা। তাই তো মিতিনমাসি?"

"বলে যা। শুনছি।"

একটু উৎসাহ পেল টুপুর। কপালে মোটা ভাঁজ ফেলে বলল, "তা হলে সে গেল কোথায়? এমন কোথাও গিয়েছে, যেখানে ট্রেকিং করে পৌঁছতে হয়? মিঃ লুবজাংকে তো দেবল সেরকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল।"

"গুড মেমারি," মিতিন হাত দোলাল, "কন্টিনিউ।"

টুপুর দ্বিগুণ উৎসাহে বলল, "এবার তা হলে জানতে হবে, পদুম থেকে কোথায়-কোথায় ট্রেকিং করা যায়।"

পার্থ বলল, "যদ্দুর শুনেছি, জাঁসকর থেকে নাকি হেঁটে লেহ যাওয়া যায়। পথে কিছু গুম্ফাটুম্ফা পড়ে। তা ছাড়া জাঁসকরের মধ্যে দিয়ে বোধ হয় মানালি যাওয়ারও একটা রাস্তা আছে। হাঁটাপথে।"

"ধুস। মানালি তো হিমাচল প্রদেশে। সেখানে যাওয়ার জন্যে সে জাঁসকরে ঢুকবে কেন?"

"পদুম লেহ ট্রেকিং নিয়েও তো একই কথা বলা যায় টুপুর। ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে তো দেবল লেহ যেতে পারে। রাস্তা খোলা পর্যন্ত ওয়েট করে। আর গুম্ফা যাওয়ার জন্যে তো লেহ থেকেই

ট্রেকিং করা সুবিধে।"

"আহ, তোমরা ভুল ট্র্যাকে ঢুকেছ," মিতিন মৃদু ধমক দিল, "একটা কথা মাথায় ভাল করে ঢুকিয়ে নাও, দেবল মোটেই ট্রেক করতে বেরয়নি। তবে তার নিজের কাজের খাতিরে হয়তো তাকে পাহাড়ে হাঁটতে হতেও পারে। তা ছাড়া ডোন্ট ফরগেট, পিছনে আরও দু'জন লোক আছে। অশোক পারেখ আর রাকেশ শ্রীবাস্তব। লুবজাং যাদের সম্পর্কে বলেছেন, স্পোর্টসম্যান লাইক ফিজিক।"

পার্থ বলল, "কিন্তু তারা যে জাঁসকরে এসেছে, এমন প্রমাণ এখনও তুমি পাওনি। এবং নাসিরের কথা অনুযায়ী কারগিলের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে জাঁসকরমুখো কোনও গাড়ি শনিবারের পর ভাড়া হয়নি।"

"হয়তো তারা আমাদের মতো এসেছে," টুপুর বলে উঠল, "শ্রীনগর থেকে। গাড়ি ভাড়া নিয়ে।"

"হ্যাঁ, তা হতে পারে," পার্থ ঘাড় নাড়ল, "তবে তাদেরও কিন্তু এখানেই উঠতে হবে। নয় কী?"

মিতিনকে এবার যেন একটু দূরমনস্ক দেখাল। বুমবুম ঘুমোচ্ছে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আর-একটা সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারছি না।"

"কী গো?"

"আগে কনফার্মড হই, তারপর শুনিস। অনেক রাত হয়েছে, এখন ঘুমিয়ে পড়।"

আলো নিভেছে ঘরের। বালিশে মাথা রাখল টুপুর। নরম উলের কম্বলে দারুণ আরাম, তবু কেন যেন জাঁকিয়ে নিদ্রা আসছে না? আবছা তন্দ্রায় কত যে কল্পদৃশ্য ভাসছে মস্তিষ্কে।... আপাদমস্তক শীতপোশাকে মুড়ে হিমবাহের উপর দিয়ে হাঁটছে দেবল। পাশে-পাশে ওই লোকটা। চন্দ্রকুমার ত্রিবেদী যার নাম। পিছন-পিছন দুটো ভল্লুক। হঠাৎ দেবল ঘুরে তাকাল। অমনি ভল্লুক দুটো লুকিয়ে পড়ল পাথরের আড়ালে। কারওকে দেখতে না পেয়ে আবার বেশ নিশ্চিন্তে হাঁটছে দুই মূর্তি। ভল্লুক দুটোও বেরিয়ে পড়ল। এগোচ্ছে দুলে-দুলে। খুব কাছে এসে ঝাঁপাতে যাচ্ছে দেবলদের উপর, অমনি কোথা থেকে একটা বড় বরফের চাঁই খসে পড়ল। বরফের সঙ্গে গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে চারটে প্রাণী। গড়াতে-গড়াতে নীচে এক নদীতে গিয়ে পড়ল। ওটা কি স্টড নদী? হিমবাহটা কি দ্রাং-দ্রুং?

ছবি ডুবে গেল আঁধারে। কখন যে ঘুমের রাজ্যে চলে গিয়েছে টুপুর।

জাগল তীব্র আলোর ঝলকানিতে। চোখ খুলে দেখে, সোনা রং রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে ঘর। লাফিয়ে পুবের জানলায় গেল টুপুর। কাচে চোখ রাখতেই চলকে উঠেছে হৃৎপিণ্ড। তিনদিকে খাড়া-খাড়া পাঁচিলের মতো পাহাড়। মাথায় তুষারের মুকুট। নীচে বিস্তীর্ণ সমভূমি। সেখানে ছড়ানো-ছেটানো ঘরবাড়ি। তারও ওপারে দু'দিক থেকে দু'খানা নদী এসে মিশেছে।

হঠাৎ পিছনে মিতিনের গলা, "জুলে মিসিবাবা। রাতে শান্তিতে ঘুম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ। পরশুর ঘুম পুষিয়ে নিয়েছি," টুপুর হাসল, "কালও পাহাড়ি বুড়োটাকে জুলে বলছিলে। জুলে মানে কী?"

"কিছুই না। লাদাখি ভাষার হাই-হ্যালো। ওদের ভাষা বললে লাদাখিরা খুব খুশি হয়।... বাই দ্য বাই, বাংলোর কেয়ারটেকারকে তোর বুড়ো মনে হল?"

"বুড়ো নয়? মুখময় রিংকল, গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে..."

"ভয়ঙ্কর ঠান্ডার দেশে চামড়া অনেক তাড়াতাড়ি ইলাস্টিসিটি লুজ করে রে। তখন মাত্র চল্লিশবছরের লোককেও সত্তর বলে ভুল হয়।"

মগজের ভাঁড়ারে আর-একটা তথ্য জমা পড়ল টুপুরের। বাইরেটা দেখতে-দেখতে বলল, "নদী দুটোর নাম কী গো? একটা তো স্টড..."

"বানানটা টি এস এ আর এ পি। কী উচ্চারণ করবি? সরাপ? না ৎসারাপ?" মিতিন টুপুরের পিঠে হাত রাখল, "দুই নদী মিলে হয়েছে জাঁসকর।"

"কী অসাধারণ লাগছে গো। ওই মিটিং পয়েন্টে যাওয়া যায় না?"

"আমরা কাজে এসেছি টুপুর। এবার তৈরি হয়ে নাও।"

"এক্ষুনি? কোথায় যাব?"

"সেটা পরের চিন্তা। আপাতত প্রস্তুতিটা সেরে রাখো।"

একটু মিতিনমাসির আদর খেয়ে ব্রাশ-পেস্ট নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিল টুপুর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, "বুমবুম আর মেসো কোথায়?"

"চরতে বেরিয়েছে। মর্নিংওয়াক চলছে বাবা-ছেলের।"

"তুমি কখন উঠলে?"

"যেমন উঠি কলকাতায়। ভোর পাঁচটা।"

"ব্যায়ামও সারা?"

"ইয়েস মাই ডিয়ার। চটপট নীচে আয়। আমি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি।"

প্রাতরাশটি একটু অদ্ভুত হল। গুঁড়ো-গুঁড়ো ডিমভাজা দিয়ে মোটা-মোটা পুরি। এ মরসুমে এখনও আলু এসে পৌঁছয়নি পদুমে, তাই এই আয়োজন। পার্থর তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। পাকিয়ে রোল বানিয়ে গোটাআষ্টেক পুরি খেয়ে ফেলল।

মুখ ধুয়ে এসে পার্থ বলল, "উফ টুপুর, কী মিস যে করলি তুই।"

"কেন?"

"বেরলে দেখতে পেতিস কোন রাজ্যে এসেছিস। জায়গাটার কী নাম হওয়া উচিত জানিস? ঘুঁটেনগর। যেদিকে তাকাবি, সেদিকে শুধু ঘুঁটে আর ঘুঁটে। বাড়ির বারান্দায় ঘুঁটের তাল, ছাদে ঘুঁটের পাহাড়, সামনে একটা ধর্মস্থান পড়ল, তারও দরজায় থাকে-থাকে ঘুঁটে। এমনকী, একটা ভাঙা রাজবাড়িও দেখলাম, সেখানেও সোনাচাঁদির বদলে শুধুই ঘুঁটে।"

"ঠাট্টা কোরো না স্যার," মিতিন হাসল, "ঘুঁটেই এদের প্রাণভোমরা। বছরে আট-ন'মাস পুরো উপত্যকা ঢাকা থাকে বরফে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন ঘুঁটেই এদের জ্বালানি, ঘুঁটেই এদের রুমহিটার। ঘুঁটে না জমিয়ে রাখলে চলবে কেন।"

কেয়ারটেকার চা দিয়েছে। চুমুক দিল পার্থ-মিতিন। তখনই ডাইনিংহলে নাসিরের প্রবেশ। সামনে এসে বলল, "ম্যাডামজি, খবর লায়া।"

"সন্ধান মিলেছে সেই ড্রাইভারের? যে দু'জন বাবুকে কারগিলের টুরিস্ট বাংলো থেকে নিয়ে এসেছিল?"

"জি ম্যাডাম। তার নাম সোনম ওয়াংদি। সে কারগিলে ফেরেনি। এখন আর যাবেও না।"

"কেন?"

"এটা ওদের খেতির সময়। গ্লেসিয়ার গলা নদীর জলে তিনমাস চাষ হবে ভ্যালিতে। গোটা জাঁসকরে এখন চাষের মরসুম।"

"তাও তো বটে। কোথায় গ্রাম সোনমের?"

"দূর আছে। অন্তত তিরিশকিলোমিটার। জাংলা গুম্ফার ওপারে। আরও একটা খবর পেলাম। অ্যালপাইন টুর নামে একটা ট্র্যাভেল কোম্পানি আছে পদুমে। তারা বারোমাস খোলা থাকে। শীতেও চাদরে নিয়ে যায়।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "চাদরটা কী?"

মিতিন বলল, "শীতে এখানে সব নদীই জমে যায়। সেই বরফের উপর হাঁটাকে স্থানীয় ভাষায় বলে চাদর।"

"ও বাবা, সে তো ডেঞ্জারাস। ওই বরফে তো শুনেছি অনেক ক্রেভাস থাকে। আই মিন, ফাটলটাটল..."

"হুঁ। বুঝতে না পারলে অবধারিত মৃত্যু। ছ'মাস পরে হয়তো বডি মিলবে," মিতিন ফের নাসিরের দিকে ফিরেছে, "তা অ্যালপাইনে

কী জানলেন?"

"রবিবার সকালে নাকি বাংলো থেকে দু'জন ইন্ডিয়ান গিয়ে ওঁদের কাছে ট্রেকিং মেটিরিয়াল চাইছিল। কাঁটা দেওয়া শু, স্টিক টেন্ট... ভাড়ায় দেয় না বলে কিনেই নিয়েছে। আর ওইদিন বিকেলেই নাকি তারা পিঠে ব্যাগট্যাগ চাপিয়ে হাওয়া।"

"ও," মিতিনকে যেন খানিক উত্তেজিত দেখাল, "তারপর? কোন দিকে গেল?"

"শায়েদ ইছরে। রোড বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের একটা ট্রাক যাচ্ছিল, তাতেই নাকি উঠেছে।"

"ইছর কোথায়?" টুপুর জিজ্ঞেস করল, "অনেক দূর?"

"চল্লিশকিলোমিটার হবে। ওখান থেকে দারচা মানালির ট্রেকিং শুরু হয়।"

মিতিনের চোখমুখ সহসা উজ্জ্বল, "যাক, আমাদের খোঁজাটা বোধ হয় খানিক সহজ হয়ে গেল।"

নাসিরের চোখ বড়-বড়, "আপনারাও ইছর যাবেন নাকি?"

"মনে তো হচ্ছে। চলুন, আগে একবার অ্যালপাইনে টুঁ মেরে আসি।"

টেবিল ছেড়ে উঠল মিতিন। নাসিরকে নিয়ে ডাইনিংহল থেকে বেরচ্ছিল, একটা পুলিশের জিপ ঢুকছে কম্পাউন্ডে। সানগ্লাস পরা এক বেঁটেখাটো অফিসার নামলেন লাফিয়ে। তাঁকে দেখামাত্র কেয়ারটেকার হুড়মুড়িয়ে আসছিল, তাকে থামিয়ে মিতিন এগিয়ে গেল। সপ্রতিভ সুরে বলল, "জুল্লে অফিসার। এনি প্রবলেম?"

"জুল্লে," অফিসার পলক জরিপ করলেন মিতিনকে। অন্যদেরও। বিচিত্র উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, "দেবল বড়ুয়া নামে কেউ কি ছিলেন এখানে?"

টুপুর বেজায় চমকেছে। হঠাৎ দেবলের খোঁজ করে কেন পুলিশ!

॥ ৮ ॥

পুলিশ অফিসার যা শোনালেন, তাতে টুপুরের তো চক্ষু চড়কগাছ। ইছর নামের গ্রামটিতে, পথের ধারে একখানা মোটরবাইক পাওয়া গিয়েছে। কোনও আরোহীর সন্ধান মেলেনি। মোটরবাইকের কাছে পড়েছিল একটা মানিব্যাগ। হাজারচারেক টাকা ছাড়া একটি ডেবিট কার্ড ছিল পার্সে। কার্ডের মালিকের নাম দেবল বড়ুয়া। এছাড়া মিলেছে একটি বিল। পদুমের টুরিস্টবাংলোর।

কেয়ারটেকার খবর দিয়েছিল, বাংলোর ম্যানেজার দাওয়া নরবু ছুটতে-ছুটতে হাজির। পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে বিলটি নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। ঘাড় নেড়ে বললেন, "ইয়েস। দেবল বড়ুয়ার নামেই রুম বুক হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তো রোববার চলে গিয়েছেন।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "মোটরবাইকটি আপনারা কবে পেয়েছেন?"

"খবরটা এল কাল রাতে। মঙ্গলবার থেকে নাকি পড়ে আছে।"

"পুরো একদিন পর জানলেন?"

"পদুমের ওপার থেকে চটজলদি ইনফরমেশন আসে না ম্যাডাম। মোবাইল সার্ভিস নেই। একটাই মাত্র স্যাটেলাইট ফোন আছে, তাও রারুতে। মিলিটারির জিম্মায়। হয়তো আরও দেরিতে পেতাম... নেহাত ইছর থেকে একজন সাইকেলে পদুমে এসেছে... সে যেচে থানায় খবর দিয়ে এল।"

"আপনারা নিয়মিত টহল দেন না?"

"গাড়ির তেল এখানে অঢেল নয়। মাসে দু'বার হেলিকপ্টারে সাপ্লাই আসে। কারগিল থেকে। মেপে-মেপে খরচ করতে হয়," হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে অফিসারের। ঈষৎ রুক্ষস্বরে মিতিনকে বললেন, "পুলিশকে এত প্রশ্ন করছেন কোন এক্তিয়ারে? আপনি কে?"

"আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ," ভ্যানিটিব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করল মিতিন। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমিও দেবল বড়ুয়াকেই খুঁজছি।"

পুলিশ অফিসারের যেন বিশ্বাস হল না। উলটেপালটে দেখছেন কার্ডটা। সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন।

মিতিন গাম্ভারী গলায় বলল, "দেবল বড়ুয়ার বাবা আমাকে এই কাজে নিয়োগ করেছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান অনিশ্চয় মজুমদারের সম্মতি নিয়েই আমি বেরিয়েছি। কোনও সংশয় থাকলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদর দফতরে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিন। তাতে আপনার সাহায্য পেতে আমার সুবিধে হবে।"

কাজ হয়েছে। মিতিনের স্বরের জোরালো প্রত্যয় বুঝি অভিভূত করেছে অফিসারকে। গলা ঝেড়ে বললেন, "ওকে ম্যাডাম। আমি জিগমি ওয়াংচুক। অফিসার ইন চার্জ পদুম পি এস। অ্যাশিওর করছি, পদুম পুলিশ আপনার পাশেই থাকবে।... কিন্তু দেবল বড়ুয়ার কেসটা কী? ইজ হি রিয়েলি মিসিং?"

"অনেকটা সেই রকমই," সংক্ষেপে গোটা উপাখ্যানের অনেকটাই অফিসারকে শুনিয়ে দিল মিতিন। দেবলের হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে বেরনো, গত বুধবার শ্রীনগর থেকে ফোন, তার কারগিল যাওয়া, জাঁসকরে আসা, কিছুই বাদ দিল না। দেবলের সঙ্গে যে একটা মূল্যবান পুঁথি আছে, সেটাও জানাল। উল্লেখ করল চন্দ্রকুমার ত্রিবেদীর কথাও। কাহিনি শেষ করে বলল, "একটা ব্যাপারে এখন একশো শতাংশ নিশ্চিত হলাম। আমরা ভুল পথে আসিনি।"

অফিসার বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি কী করে যে গোটা পথটা নিখুঁত ভাবে ট্রেল করলেন? তাও মাত্র তিনদিনে? এত কঠিন রাস্তা..."

"সঙ্গে ফ্যামিলি ছিল তো, ওরাই আমায় ইন্সপায়ার করেছে," পার্থ, টুপুর আর বুমবুমের সঙ্গে ওয়াংচুকের পরিচয় করিয়ে দিল মিতিন। হেসে বলল, "তা এখন কীভাবে এগনো যায়?"

"আমি কী বলব? সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে আপনি তো যথেষ্ট দক্ষ," ওয়াংচুক মুহূর্ত ভাবলেন, "তবে আমার একটা অনুমান আপনাকে জানাতে পারি। হয়তো তাতে আপনার অনুসন্ধানের কিছু সুবিধে হবে।"

"হ্যাঁ, বলুন না প্লিজ।"

"দেবল বড়ুয়া সম্ভবত দারচা-মানালির পথে গিয়েছে।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"কারগিল-পদুম-মানালি হাইওয়ে ইছর পর্যন্তই তৈরি হয়েছে। তারপরে আর রাস্তা নেই। ওখান থেকেই দারচা-মানালি রুটের ট্রেকিং শুরু হয়। হয়তো সেই কারণেই ইছরে মোটরসাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে।"

"কিন্তু দেবলরা মোটরসাইকেলে যে ইছর গিয়েছিল, সেটা কি জোর দিয়ে বলা যায়? আমি যত দূর জানি, ওরা পদুম ছেড়েছে ট্রাকে চড়ে। রোববার বিকেলে।"

"তা কী করে হয়? আমি ইছর থেকে ফেরার পথে রারু গ্রামেও গিয়েছিলাম। কেসটার তদন্ত করতে। রোববার রাতে তারা রারু গ্রামেই উঠেছিল। ওখানে টুরিস্টদের জন্যে হোমস্টে-র ব্যবস্থা আছে, তারই একটিতে। রারুতে যা শুনলাম, মোটরসাইকেলেই এসেছিল দেবলরা। তারপর সোমবারও নাকি ওখানে ছিল। শেষ রাতে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়।"

"ও," একটু থমকে থেকে মিতিন বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ইনফরমেশন মিঃ ওয়াংচুক।"

"ইটস ওকে। কিন্তু আমার তো টেনশন রয়েই গেল ম্যাডাম। মোটরসাইকেলটা পড়েই আছে, আনাতে হবে।"

জিগমি ওয়াংচুক জিপে উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আপনি কী করবেন? দেবল বড়ুয়ার জন্যে

অপেক্ষা? নাকি ফিরে যাবেন?"

"দেখি। ভাবি।"

"কোনও প্রয়োজন পড়লে স্বচ্ছন্দে জানাবেন কিন্তু।"

জিপটা অদৃশ্য হওয়ার পরও দাঁড়িয়ে আছে মিতিন। চিন্তান্বিত মুখে। পুলিশ দেখে ইউরোপিয়ান দম্পতি বেরিয়ে এসেছিলেন। রীতিমতো প্রবীণ, কেউই সত্তরের নীচে নন। ভদ্রলোক অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, রোগাসোগা মহিলাটিও প্রায় ছ'ফুটি। বিপুল কৌতূহল নিয়ে পার্থর কাছে তাঁরা শুনছিলেন ঘটনাটা। ব্যস, পার্থকে আর পায় কে, দিব্যি গপ্পো জুড়েছে। দু'মিনিটেই জেনে নিল তাঁদের পরিচয় আর আগমনের কারণ। ভদ্রলোকের নাম ওলগেন জোহানসন। মহিলার নাম হানা। মেলবোর্নের বাসিন্দা। বৃদ্ধ বয়সে দু'জনের নাকি বৌদ্ধধর্মের প্রতি খুব অনুরাগ জেগেছে। ছ'দিন হল এসেছেন পদুমে, দু'খানা সাইকেল জোগাড় করে নাকি বিভিন্ন মনাস্ট্রিতে ঘুরছেন। কারসা, জাংলা, স্টোংডে, বরদান, মোনে... পাঁচ-পাঁচখানা গুম্ফা ঘোরা শেষ। এবার নাকি যাবেন এক পাহাড়ের মাথায় জংকুল গুম্ফায়। এক্ষুনি ফেরার তাড়া নেই, আর দশ-বারোদিন নাকি এখানে থাকবেন দম্পতি।

আলাপচারিতার মাঝে হঠাৎ মিতিন হিন্দিতে বলে উঠল, "তোমরা সবাই একবার রুমে এসো। নাসিরও। জরুরি কথা আছে।"

ওলগেনের ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি শুনতে বেশ লাগছিল টুপুরের, কিন্তু ভঙ্গ দিতে হল আড্ডায়। মিতিনের পিছু-পিছু সবাই এল রুমে।

ঘরে ঢুকেই মিতিন বিনা ভূমিকায় বলল, "এখনও পর্যন্ত তোমরা সকলে আমার ইচ্ছেমতো চলেছ। এবার প্রত্যেককেই নিজের-নিজের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

বুমবুম বলল, "আমাকেও?"

"হ্যাঁ। কারওর উপর আমি আর জোর করব না।"

পার্থ বলল, "হেঁয়ালি করছ কেন? খুলে বলো না।"

"এটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, দেবলরা ইছর ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছে। এবং কারগিলের সেই অশোক পারেখ আর রাকেশ শ্রীবাস্তবও।"

"যাহ্ বাবা, অশোকরা কী করে পিকচারে এল?"

"কেন, ওই মোটরসাইকেল। ওই বাহনে চেপেই তো তারা কারগিল থেকে পাড়ি দিয়েছে। পদুমে না থেকে তারা সোজা চলে গিয়েছিল রারুতে। কারণ তারা আগেই বুঝে গিয়েছে, কোথায় চলেছে দেবলরা।"

"কীভাবে?"

"যে বা যারা ওদের লাগিয়েছে, হয়তো তারা এবিষয়ে ওয়াকিবহাল। সেই সূত্রে ওরাও," মিতিন টুপুরের দিকে তাকাল, "পেনজিলায় পড়ে থাকা পেট্রলক্যানটার কথা মনে আছে? ওরকম ক্যান শুধু মোটরসাইকেল আরোহীরাই সঙ্গে নিয়ে বেরয়। তাই তো নাসিরভাই?"

নাসির ঘাড় দোলাল, "হাঁ জি। আমরা তো ড্রাম রাখি। ছোটা ক্যানে আমাদের কী হবে?"

"অশোকরা একটাই ভুল কাজ করেছে। ক্যানটা খাদে ফেলে দিলেই চুকে যেত," মিতিন বলল, "আর রারুতে দেবলরা ছিল, না অশোকরা, মিঃ ওয়াংচুকের পক্ষে তো তা জানা সম্ভব নয়। দেবলরাও দু'জন, অশোকরাও দু'জন। সুতরাং তাঁর হিসেব মিলে গিয়েছে।"

"তা হলে দেবলরা ছিল কোথায়? ওই পার্সই বা ইছরে এল কোত্থেকে? তাও কিনা মোটরসাইকেলের ধারে?"

নাসির ফস করে বলে উঠল, "ওরা দু'জন রোড কন্ট্রাক্টরের তাঁবুতে ছিল হয়তো।"

"হতে পারে। তবে দেবলদের সঙ্গে অশোকদের একবার অন্তত মোলাকাত হয়েছে, এটা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। আর তার পরে কী ঘটেছে, কিংবা ঘটছে, তা জানাই এখন আমার কাজ।"

"মানে?" পার্থ যেন আঁতকে উঠল, "দারচা-মানালি রুটে যাওয়ার মতলব করছ নাকি?"

"আমার তো উপায় নেই। মনোজ বড়ুয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি... প্রফেশনাল এথিক্স তো আমায় মানতেই হবে। তবে আর কারওর সেই বাধ্যবাধকতা নেই।"

পার্থর চোখ সরু, "কী বলতে চাইছ? তুমি একাই যাবে?"

"যদি তোমরা কেউ না যাও। কোনও জোরাজুরি নেই। যদি কেউ যেতেও চাও, আগেই জেনে রাখা ভাল, দারচা-মানালি রুট ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। সর্বদাই তেরো-চোদ্দোহাজার ফিট অলটিটিউডে হাঁটা। কখনও আরও বেশি। জুনের গোড়ায় এখনও পথে অনেক জায়গায় বরফে থাকবে। পিছল রাস্তায় একবার পা হড়কালে আর রক্ষে নেই। যে-কোনও সময়ে ধস নামতে পারে, তুষারঝড়ে পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পথে কোথায় কীভাবে থাকব, তার স্থিরতা নেই। খাবারদাবার কী জুটবে, কিছুই জানি না।"

মিতিনমাসি বলে চলেছে একদমে। শুনতে-শুনতে টুপুরের যেন হাঁটুর জোর কমে আসছিল। গলা যেন শুকিয়ে কাঠ। তবু নিজেকে অবাক করে ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলে উঠল, "আমি যাব মাসি। তোমার সঙ্গে থাকব।"

"আবেগে চলিস না টুপুর। জীবনমরণের ব্যাপার। দুর্যোগে পড়লে তোকে বাঁচাব, সে ক্ষমতাও নেই আমার।"

"তবু..." টুপুর হঠাৎ অকুতোভয়, "তোমার যা হওয়ার... আমারও তাই হবে।"

"অ। তার মানে তোরা দু'জনে যাচ্ছিস? আর তোদের ছেড়ে দিয়ে আমি পদুমে বসে-বসে সারাক্ষণ টেনশন করব?" পার্থ চোখ পাকাল, "ওটি হচ্ছে না চাঁদু। আমিও টিমে আছি।"

বুমবুম চোখ গোল-গোল করে শুনছিল। এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছে, "আমি একা থাকব নাকি?"

টুপুর হাসছে মিটিমিটি, "কেন কী অসুবিধে। আমি বলে যাব, ওই সাহেব দাদু-দিদার সঙ্গে সাইকেলে বেড়াবি।"

"না-আ-আ-আ। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। যাবই।"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা। চেল্লানি থামাও," মিতিন বুমবুমের চুল ঘেঁটে দিল। নাসিরকে বলল, "তা হলে চলুন ভাই, অ্যালপাইনে গিয়ে ট্রেকিংয়ের সাজ-সরঞ্জাম কিনে নিই।"

"জি ম্যাডাম।"

"আর একটু কষ্ট করতে হবে। আমাদের ইছর অবধি পৌঁছে দিন। তারপর চাইলে পদুমে আমাদের জন্যে ওয়েট করতে পারেন। ফিরে গেলেও কিছু বলার নেই।"

"কেয়া বোল রহেঁ হ্যায় ম্যাডাম?" নাসির যেন ভারী অবাক, "ম্যায়নে আপকো জবান দিয়া না? সাথ-সাথ রহুঙ্গা? আখরি দম তক?"

টুপুর হাঁ। এই প্রায় অচেনা চালকও হবে তাদের অভিযানের সঙ্গী। এত বিপদ আছে জেনেও?

ব্যস, সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। একঘণ্টায় কেনাকাটা শেষ। বিলটিল চুকিয়ে, একপেট রুটি আর স্কোয়াশের সবজি খেয়ে, বাহিনী প্রস্তুত। তারা ট্রেকিংয়ে যাচ্ছে শুনে ওলগেন আর হানা দু'খানা ইয়া-ইয়া বাদামের প্যাকেট উপহার দিয়ে গেলেন। ম্যাকাডেমিয়া নাটস। এ নাকি দুধের বিকল্প। খেলে বহুক্ষণ ভরাট থাকে পাকস্থলী।

ইছরের পথে রওনা দিয়েছে গাড়ি। পাহাড় কেটে রাস্তা, কিন্তু দু'ধার পুরো ন্যাড়া-ন্যাড়া নয়। দর্শন পাওয়া যায় গাছগাছালির। দু'-দু'খানা মাঝারি মাপের গুম্ফা পড়ল পথে। বরদান আর মুনে। দেখার ইচ্ছে ছিল টুপুরের, মিতিনমাসি গাড়ি থামাতে দিল না। ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে এসে গিয়েছে রারু। গ্রামটি দেখে টুপুর চমকেছে রীতিমতো। মাঠঘাট নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া। চাষবাসও শুরু হয়েছে দিব্যি। চরে

বেড়াচ্ছে ইয়াক। উঁহু, পুরো ইয়াক নয়, খানিকটা যেন গোরু-গোরু ভাবও আছে চেহারায়। চাষের কাজে লাগে বোধ হয়। বারো-তেরোহাজার ফুট উঁচুতে এমন একটা গ্রাম ভাবা যায়!

রারুতে গাড়ি থামিয়ে হঠাৎ নেমে গেল মিতিন। সবাইকে বসিয়ে রেখে। মিনিটপনেরোর মধ্যে ফিরেছে। মুখ আরও থমথমে। শুকনো গলায় বলল, "যা ভেবেছিলাম, তাই। হোমস্টে-তে দেবলরা ছিল না। দেবলের ফোটো দেখালাম, কেউ চিনতে পারল না।"

পার্থ বলল, "ও। তার মানে সামনে চারজন আছে?"

"সংখ্যায় তাই বোঝায় বটে। আসলে টু এগেনস্ট টু।"

"অর্থাৎ তারা পরস্পরের প্রতিপক্ষ?"

"সে রকমই তো লাগছে।"

"দু'পক্ষে মারামারি হয়েছিল নাকি? তখন কি দেবলের পার্স পড়ে গিয়েছে?"

"গবেষণা পরে," মিতিন লাফিয়ে গাড়িতে উঠল, "চলুন নাসিরভাই, এগনো যাক।"

ইছরে পৌঁছতেই দেখা মিলল মোটরসাইকেলটির। পাহাড়ের খাঁজ ঘেঁষে দাঁড় করানো, যাতে হাওয়ায় না উলটে যায়। তন্নতন্ন করে মোটরসাইকেলের কেরিয়ার ঘাঁটল মিতিন, কিচ্ছু পাওয়া গেল না।

মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ, "গাড়ির টুলবক্স গেল কোথায়?"

নাসিরও যেন অবাক, "তাজ্জব কী বাত, ম্যাডামজি। টুলবক্স ছাড়া তো পাহাড়ে কেউ গাড়ি বের করে না।"

"পাহাড়ে তো চুরি হওয়ার কথা নয়," মিতিন মাথা দোলাচ্ছে, "উঁহু, এ তো খারাপ লক্ষণ।"

রাস্তার কাজ বন্ধ, রোড কন্ট্র্যাক্টরের লোকও নেই ইছরে। অনেকটা নীচ দিয়ে বইছে সরাপ। নদীর উপর একটা ছোট্ট ব্রিজ। ওপারে পায়েচলা পথ। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের মধ্যে রাস্তাটা যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, বোঝা দায়।

ওয়াইড লেন্সে সেতুকে ক্যামেরাবন্দি করে পার্থ বলল, "অতঃ কিম?"

মিতিন আঙুল তুলে সামনের সাইনবোর্ডটা দেখাল। তিরচিহ্ন দিয়ে বলা, ব্রিজের ওপার থেকে দারচা-মানালি হাঁটাপথের শুরু।

পার্থ ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "বুঝলাম। তা দুটো দশ তো বাজে, আজকের মতো এখানেই তাঁবু ফেলি।... নাসির, গাড়ি কোথায় রাখবেন?"

নাসির বলল, "চিন্তা নেই স্যার। সামনে ইছর মনাস্ট্রি। ওখানেই রেখে দিচ্ছি। গুম্ফায় গাড়ি রাখার ভাল ব্যবস্থা আছে। দলাই লামা এলে ওই গুম্ফাতেই ওঠেন কিনা।"

"দলাই লামা এখানে আসেন? এই অজ জায়গায়?"

"জি। পাহাড়ের ভিতরে নাকি একটা বড় গুম্ফা আছে। দলাই লামা পায়ে হেঁটে গিয়েছেন সেখানে।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কী নাম গুম্ফাটার? ফুকতাল?"

"জি। শুনেছি হলুদ-টুপি লামাদের গুম্ফা।"

"অর্থাৎ গেলুপাদের?" মিতিনকে আরও উত্তেজিত দেখাল, "সেটা ঠিক কোথায়?"

"আমি তো যাইনি। শুনেছি দারচার পথে একটা ব্রিজ পড়ে। সেখানেই ভাগ হয়েছে ফুকতালের রাস্তা।"

"ইউরেকা!" পলক থমকে থেকে মিতিন সহসা চেঁচিয়ে উঠল, "দেবলের গন্তব্য পেয়ে গিয়েছি রে টুপুর।"

"দেবল ফুকতালে গিয়েছে? কী করে বুঝলে?"

"প্রশ্ন পরে। এবার ফাইনাল ল্যাপের যাত্রা শুরু। এক্ষুনি।"

॥ ৯ ॥

ছোট্ট পাথরের সমতলে তাঁবু গাড়ছিল নাসির। দক্ষ হাতে। ঠাই ঠপাঠপ আওয়াজ হচ্ছে খুঁটি পোঁতার। সামান্য তফাতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহে চলেছে সরাপ নদী। পাথরে ধাক্কা খেতে-খেতে। বিকেল প্রায় শেষ, সূর্য ডুবে গিয়েছে পাহাড়ের পিছনে, তবে আঁধার তেমন গাঢ় নয়। একটানা। হালকা গর্জন সব আবছায়ামাখা বহতা নদীকে দেখে রীতিমতো ভয় করে এখন।

টুপুর একটা পাথরের উপর বসে। এখনও দমে ফিরতে পারেনি, ধড়াস-ধড়াস কাঁপছে বুক। এর-ওর-তার মুখে আগে ট্রেকিংয়ের গল্প শুনেছে, কখনওসখনও রোমাঞ্চিতও হয়েছে বইকী। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটা যে আদতে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, এমনটা সে কদাচ ভাবেনি। উফ কী বিপজ্জনক! ইছরে বড় রাস্তা থেকে তরতরিয়ে অনেকটা নেমে যখন তারা ছোট্ট সেতুটা পেরল, মন তখনও ভাল লাগার উত্তেজনায় ভরপুর। খানিক চড়াই হেঁটে পড়ল একটা মালভূমির মতো জায়গা। সেখানে পাশাপাশি কয়েকটা চোরতেন। সমাধিগুলোর মাথায় বৌদ্ধদের লাল-নীল-হলদে পতাকা পতপত উড়ছে। দেখে বেশ প্রফুল্লতাই জেগেছিল টুপুরের। তখনও কি ছাই আন্দাজ ছিল, সামনে কী রাস্তা পড়বে এবার?

রাস্তা কোথায়, স্রেফ পাহাড়ের গা ঘেঁষে নুড়িপাথরের উপর দিয়ে হেঁটে চলা। কখনও পথের বহর তিন-চারফুট। কখনও বা কমতে-কমতে একফুটও নয়। পায়ের তলায় নুড়িপাথর সরে-সরে যাচ্ছে, সরসর ঝরছে অবিরাম। একবার পা পিছলোলেই পাথরে ঠোক্কর খেতে-খেতে গড়িয়ে পড়তে হবে নীচে নদীর জলে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য। এক-দু' জায়গায় তো লাফিয়ে পেরতে হল ওই সরু পথ। নেহাত মিতিনমাসি বা নাসির তাকে ধরে নিয়েছে, নইলে তো টুপুর এত দূর পৌঁছতেই পারত না। তার উপরে এক-এক সময়ে কী সাংঘাতিক চড়াই। বিশ-পঁচিশমিনিট টানা উঠতে হচ্ছে, কোমর বেঁকে যাওয়ার দশা। তারপরেই তো আরও বিপদ, রাস্তা বেজায় ঢালু হয়ে খাড়া নামছে। তখন শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা যে কী মুশকিল। পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো গা আঁকড়ে, পা টিপে-টিপে, কীভাবে যে ওই ঢালগুলো পেরিয়েছে, তা বুঝি টুপুর নিজেও জানে না। সারাক্ষণ মনে হয়েছে এই বুঝি শেষ, এই বুঝি গেলাম পরপারে।

তাও ভাগ্যিস বুমবুমের জন্যে একটা সুবন্দোবস্ত করেছিল নাসির। ইছরের গুম্ফায় গাড়ি রাখতে গিয়ে কোত্থেকে একটা খচ্চর ভাড়া করে আনল। ওই জন্তুটির পিঠে শুধু বুমবুম নয়, চাপানো হয়েছিল মালপত্রও। অসীম সহিষ্ণু প্রাণীটির কল্যাণে অনেকটা ঝাড়া হাত-পা হয়ে হেঁটেছে সবাই।

বুমবুম তবু ভীষণ ক্লান্ত। যতটা না ধকলে, তার চেয়ে বেশি বোধ হয় আতঙ্কে। মাঝে-মাঝেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল, এখন সে চুপটি মেরে লেপটে আছে পার্থমেসোর গায়ে। মাটিতে ছড়িয়ে বসে, একটা পাথরে হেলান দিয়ে, এখনও হাঁপাচ্ছে পার্থমেসো। অবসর পেয়েও সিগারেট ধরায়নি। সম্ভবত দমে টান পড়েছে বলে প্রিয় বদ নেশাটিকে বর্জন করেছে আপাতত।

মিতিনমাসিই শুধু দিব্যি ফিট। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে নাসিরের কর্মকাণ্ড, নিজেও হাত লাগাচ্ছে, খচ্চরের পিঠ থেকে মাল নামিয়ে জড়ো করছে তাঁবুর পাশে। ভার হালকা হতেই খচ্চরটা নড়েচড়ে উঠল। এগোচ্ছে জলের পানে। মিতিনমাসিও গেল তার সঙ্গে। নদীর পাড়ে উবু হয়ে বসে আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে।

হঠাৎ পার্থ বলে উঠল, "ধন্যি তোর মাসির উৎসাহ। দেবল তো খ্যাপা বটেই, কিন্তু তোর মাসি তার ডাবল ছিটিয়াল।"

টুপুরেরও খানিকটা তাই মনে হচ্ছিল। তাও ক্ষীণ প্রতিবাদ করল, "মাসি কি অকারণে ঝুঁকি নিচ্ছে? নিশ্চয়ই মনে করছে দেবল বড়ুয়াকে সাহায্য করা উচিত।"

"জানি না বাপু। তবে এই নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে বাস মোটেই কাজের কথা নয়।"

"সে কি এমনি-এমনি থাকছে? কাছেপিঠে জনবসতি নেই বলেই তো..."

"এই দুর্গম রাস্তায় মানুষ থাকাটাই তো আশ্চর্যের।"

মিতিন এদিকেই আসছিল, পার্থর কথা শুনতে পেয়েছে। গলা তুলে বলল, "জায়গাটা অত নির্জন ভেবো না। আশপাশে গ্রামটাম আছে। নদীর পাড় থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল।"

"তো সেখানে গেলেই হত।"

"এখনও হাঁটার এনার্জি আছে তোমার? এই পাহাড়ি পথে? অন্ধকারে?"

পার্থ জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নাসিরের ডাক, "তাঁবু তৈয়ার ম্যাডাম। আপলোগ আ যাইয়ে।"

ছোট্ট তাঁবুটায় ঢুকে টুপুর একটু স্বস্তি পেল যেন। কোনওক্রমে ঠেসেঠুসে পাঁচজন থাকতে পারবে রাতটা। কিন্তু খাবার? পেট তো চুঁই চুঁই করছে।

মিতিন বুঝি পড়ে ফেলেছে টুপুরের মন। বলে উঠল, "এবার ডিনারটা সেরে নিলে হয়।"'

পার্থ বলল,"কী খাব? নদীর জল?"

"উঁহু। সুখাদ্য তো মজুত। খানআট-দশ বানরুটি। আর সাহেবদের দেওয়া ম্যাকাডেমিয়া নাটস।... ও হ্যাঁ, দু'টিন চিজ় আছে ব্যাগে।"

"কোত্থেকে পেলে?"

"কলকাতা থেকেই নিয়ে বেরিয়েছিলাম স্যার। কখন কী জোটে না-জোটে..."

"ইউ আর সিম্পলি অসাম মিতিনমাসি," টুপুর খুশিতে আটখানা, "বের করো। চটপট।"

"তার আগে জল নিয়ে আয়। বোতল ভর্তি করে।"

শুধু খাবার নয়, দু'খানা টর্চ বেরল ব্যাগ থেকে। একটা ফোর সেলের, ইয়া গোবদা। একখানা সরু লম্বা। সঙ্গে মোমবাতিও। দুটো বোতলে জল ভরে আনল নাসির। কম্পমান মোমবাতির আলোয় শুরু হল নৈশভোজ। আহা, খিদের কী মহিমা। শুকনো বানরুটির মাঝে শক্ত-শক্ত চিজ় পুরে হাঁউহাঁউ চিবোচ্ছে সকলে। ম্যাকাডেমিয়া নাটস যেন অমৃত। বুমবুম যে বুমবুম, সেও বিনা প্রতিবাদে গপাগপ গিলছে। সাধে প্রবাদটা এসেছে, হাঙ্গার ইজ় দ্য বেস্ট সস।

আহার শেষ করেই নাসির লম্বা হয়েছে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে নাসিকা গর্জন। পার্থ বেরিয়েছিল তাঁবু থেকে। হঠাৎ চিৎকার করে ডাকছে, "টুপুর, শিগগির আয়।"

খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই টুপুরের গা শিরশির। শীতে নয়, এক অলৌকিক দৃশ্যে। ওপারের পাহাড়ের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ। স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে ধরণী। চন্দ্রকিরণে নদীর জল চিকচিক। যেন রুপোর কুচি।

পার্থ উল্লসিত গলায় বলল, "শব্দটা আমি পেয়ে গিয়েছি রে টুপুর।"

"কীসের শব্দ?"

"সেই যে, কলকাতায় খুঁজছিলাম। রাত্রির বিশেষ রূপ। পাঁচ অক্ষর।"

"কী পেলে?"

"শব্দটা জোছনামত্তা। দেখ, জ্যোৎস্নায় কেমন মাতাল হয়ে আছে চরাচর। একেই তো রবিঠাকুর বলেছেন, 'যামিনী জোছনামত্তা'।"

সত্যিই তাই। জ্যোৎস্না যেন রাত্রিকে পাগল করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কী করে যে এমন সুন্দর-সুন্দর শব্দচয়ন করতেন। প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

মিতিন তাঁবুর মুখে এসে ডাকছে, "অ্যাই, চলে এসো তোমরা। ঠান্ডা লাগলে আর দেখতে হবে না।"

দু'জনে ফিরেছে অন্দরে। পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "টিকটিকিদেবী কি আগামিকালের পরিকল্পনা বাঁধছিলেন?"

"হুম। কাল তো বিস্তর হাঁটা। রোড নিশ্চয়ই আরও টাফ হবে?"

আমাদের দুর্ভাগ্য। পার্থ হাত উলটোল, "এই রাস্তায় আসার কি দরকার ছিল তোমার দেবল বড়ুয়ার? তুমি তো আবার কায়দা মেরে বলছিলে, সে এমন কিছুর সন্ধানে এসেছে যা সোনাদানার চেয়েও দামি?"

"হ্যাঁ তো।"

"সেটা কী, আন্দাজ করতে পারলে কিছু?"

"এখন অনেকটাই নিশ্চিত। স্যান্ডর সোমা দ্য কোরোস, ওরফে কোরোসি সোমা স্যান্ডরের, পুঁথি নির্দেশিত কোনও এক মহাগ্রন্থের খোঁজে।"

"এই ভজকট নামটি কোত্থেকে পেলে? তিনি?"

"এক মহাপণ্ডিত। তিব্বতিরা যাঁর নাম দিয়েছিল ফাই-গ্লিন-গি-গ্রুয়া-পা। অর্থাৎ, বিদেশি ছাত্র। সঙ্গে একটা উপাধিও ছিল। বোসাৎসু। মানে বোধিসত্ত্ব। বৌদ্ধদের জগতে এটাই সর্বোচ্চ সম্মান। তাঁর মৃত্যুর নব্বইবছর পরে জাপানিরাও তাঁকে হাঙ্গেরিয়ান বোধিসত্ত্ব নামে সম্মান জানায়।"

"দেবল এঁর খোঁজ পেল কোত্থেকে?"

"মনোজ বড়ুয়ার ঊর্ধ্বতন অষ্টমপুরুষ হেমকান্ত এই সাহেবের সঙ্গেই তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করতেন। মনোজবাবুর বাড়িতে যে পুঁথিটি পাওয়া গিয়েছে, ইনিই তাঁর রচয়িতা।"

"এই সাহেব যে সেই সাহেব, কী করে বুঝলে? মনোজবাবু তো নামটা বলতে পারেননি।"

"আজকের দিনে এটা কি খুব কঠিন? ইন্টারনেট খুলে উইকিপিডিয়া ঘাঁটলেই তো অনেক তথ্য মেলে। সেখান থেকে মাথা খাটিয়ে দরকারিটুকু খুঁজে নিতে হয়," বুমবুমকে ভাল করে কম্বলে ঢেকে দিল মিতিন। সোজা হয়ে বলল, "মনোজবাবু যে হেমকান্তর কথা বলেছেন, তিনি প্রায় দুশোবছর আগের লোক। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, মোটামুটি ওই সময়েই কলকাতায় এসেছিলেন হাঙ্গেরিয়ান সাহেবটি। তখন আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটির নাম ছিল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি। সাহেব যে শুধু সেখানে গবেষণা করতেন তাই নয়, পাক্কা চারবছর সোসাইটির লাইব্রেরিয়ানও ছিলেন। কলকাতা থেকেও একবার তিব্বতে যাওয়ার প্ল্যান ছিল তাঁর। তবে ডুয়ার্সে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়, মারা যান দার্জিলিংয়ে। বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন সাহেব। তার মধ্যে বাংলাও ছিল।"

"অর্থাৎ তুমি একে-একে দুই করেছ? কিন্তু ফুকতালের গুম্ফায় সাহেব একটি মহাগ্রন্থ রেখে গিয়েছেন, এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছ কী করে?"

"প্রথমত, দেবলের মতো এক জ্ঞানপাগল ছেলের লাদাখে ছুটে আসা। কোনও বাধাবিঘ্ন না মেনে। হয়তো সে লেহর দিকেও যেতে পারত। কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকাটা তাকে জাঁসকরের দিকে ঠেলে দেয়। তখনই সে খেয়াল করে, জাঁসকরেই জীবনের অনেকবছর কাটিয়েছিলেন স্যান্ডর। এবং সেটা এই ফুকতাল গুম্ফায়।''

"বলো কী? সাহেব তা হলে এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলেন?''

"তখন এই পথটা ছিল নাকি? জাঁসকর উপত্যকারই সে ভাবে কেউ খবর জানত না। এদিকেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল, শুধু এইটুকু জ্ঞান সম্বল করে তিনি পাড়ি জমান এই প্রায় অগম্য উপত্যকায়। ফুকতাল গুম্ফাটি বাইরের পৃথিবীর সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল তখনও। এটিও স্যান্ডরের আবিষ্কার।''

"স্যান্ডর তো দেখছি মহাখ্যাপা লোক?''

"সে আর বলতে। ওঁর জীবনী শুনলে তাক লেগে যাবে।''

''স্যান্ডর ছিলেন হাঙ্গেরির ম্যাগিয়ার সম্প্রদায়ের মানুষ। জনশ্রুতি আছে, দুর্ধর্ষ হুনদের একটা শাখার বংশধর এই ম্যাগিয়াররা। পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানতেই স্যান্ডর নাকি এশিয়ায় আসেন। গ্রিস, মধ্যএশিয়া, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, সব চষে বেড়িয়ে যান তিব্বতে। সেখান থেকে লাদাখ। তারপর জাঁসকরে ঢুকে ফুকতালে আস্তানা গাড়েন। প্রায় দেড়বছর ছিলেন ফুকতালের গুম্ফায়। তখন

তিব্বতি ভাষাটাকে একেবারে গুলে খান। তারপর প্রচুর তিব্বতি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে আসেন কলকাতায়। ওখানে বসে রচনা করেন প্রথম টিবেটিয়ান টু ইংলিশ ডিকশনারি।''

"বুঝেছি," পার্থ ফুট কাটল, "কিন্তু মহাগ্রন্থটা কী? যা পেতে দেবল দৌড়চ্ছে?''

"একটি গেথংপা।''

"সে আবার কী?''

"বিশেষ ধরনের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। যা মেনে বৌদ্ধদের নানান অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়। অনেকটা পাঁজি টাইপ।''

"তা নিশ্চয়ই আরও পাওয়া যায়। স্যান্ডরসাহেবেরটার বিশেষত্ব কী?''

"ওতে নাকি প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র লিপিবদ্ধ আছে। উইথ টীকা। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত অনেক তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখও তাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি উদ্ধার করা গেলে বৌদ্ধধর্মের উপর গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।''

"অ। তাতেই বা দেবলের কী লাভ?''

"কী বলছ তুমি? বিশ্বজোড়া খ্যাতি হবে দেবলের। বৌদ্ধধর্মের গবেষক হিসেবে অমর হয়ে থাকবে তার নাম। এ কি কম মূল্যবান?''

বহুক্ষণ একটা প্রশ্ন টুপুরের মাথায় বুড়বুড়ি কাটছিল। বলেই ফেলল, "এগুলোও সব উইকিপিডিয়ায় আছে?''

"না। গেথংপা সংক্রান্ত তথ্যটি সাপ্লাই করেছেন জনৈক বইপোকা। যাঁকে তোরা সবাই চিনিস।''

টুপুর ফ্যালফ্যাল তাকাল, "কে গো?''

"আমাদের অবনিদা। তোর বাবা। মনোজবাবুর খবরটা শুনে তোর বাবাকে ফোন করেছিলাম। উনিই বললেন, লাদাখের কোনও গুম্ফায় নাকি এক সাহেবের লেখা গেথংপা আছে। তবে সেটা যে ঠিক কোথায়, এখনও নাকি তা রহস্যের আড়ালে। এক্ষেত্রেও আমি দুই আর দুই চার করছি।''

"কিন্তু..." টুপুরের এখনও খুঁতখুঁতানি যায়নি। বলল, "দেবলের অভিযানের রিজন নয় বোঝা গেল। এর মধ্যে দেবলের বিপদের সম্ভাবনা কোথায়? দুটো লোক ফলোই বা করছে কেন?''

"ওরে, গেথংপাটি উদ্ধার হলে তার বাজারমূল্য কী হবে, ভাবতে পারিস?''

"দাম তো হবেই কিছু। দু'-চার লাখ তো বটে।''

"পুরো গোল্লা পেলি। প্রাচীন পুঁথি, মূর্তি, কেনাবেচার একটা দুনিয়াজোড়া মার্কেট আছে রে হাঁদা। প্লেনে আসার সময়ে আমিও ওই বাজারে একটু ঢুঁ মারছিলাম। সেখানে এখনই ওই পুঁথি নিয়ে দামাদামি শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য মূল্য দেখলাম এককোটি তিরিশলাখ।''

"অ্যাঁ?" পার্থর স্বর ঠিকরে উঠল, "ওই লোভেই কি দু'জন পিছু নিয়েছে?''

"ওরা পেশাদার ক্রিমিনাল। টাকা দিয়ে কেউ লাগিয়েছে।''

"কীভাবে বুঝলে?''

"এদের গতিপ্রকৃতি দেখে। কোটিটাকা দিয়ে কেনাবেচার লোক মোটরসাইকেলে ঘুরবে না। এই পথে যাওয়ার প্রাণের ঝুঁকিও নেবে না। আর যেরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা মুভ করছে, তাতে পেশাদারিত্বই প্রমাণিত হয়।''

"আর-একটা কথা," পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "গেথংপার তো এখনও দর্শন নেই। অ্যান্টিক মার্কেটে তার দাম চলে আসে কী করে?''

"তিনটে পয়েন্ট তোমাদের দিতে পারি। তার থেকে ডিডিউস করো। একনম্বর, চন্দ্রকুমার ত্রিবেদী দেবল বড়ুয়ার ফেসবুক ফ্রেন্ড। নম্বর, চন্দ্রকুমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি খুলেছেন মাত্র বাইশদিন আগে। তিননম্বর, ভুবনেশ্বরে চন্দ্রকুমার ত্রিবেদী নামে কোনও ঐতিহাসিকের ট্রেস মেলেনি।''

"মানে? চন্দ্রকুমারও জালি?''

"ভাবো। কম্বল মুড়ি দিয়ে। কাল ভোরে উঠে ফের হনটন, মাথায় রেখো।''

আচমকা রহস্যের জাল বুনে দিয়ে শুয়ে পড়ল মিতিন। টুপুরই বা আর কী করে? মাটন রোলের মতো নিজেকে মোটা কম্বলে পেঁচিয়ে মগজটাকে এতালবেতাল ঘোরাল কিছুক্ষণ। শ্রান্ত শরীর কখন যে তলিয়ে গিয়েছে নিদ্রায়।

শেষ রাতে ঘুম ছুটে গেল। পার্থ ঠেলছে, "অ্যাই টুপুর, কীসের একটা আওয়াজ হল না?''

তাঁবুর দুয়ার থেকে মিতিনের ফিসফিস, "আস্তে।... কী একটা যেন বাইরে ঘুরছে।''

কী কাণ্ড, নাসিরও জেগে গিয়েছে। অস্ফুটে বলল, "বাহার মত জাইয়ে ম্যাডাম। ডেঞ্জার হো সকতা।''

"বিপদ তো ভিতরেও হতে পারে," বলে পা টিপে বেরল মিতিন। একহাতে জোরদার টর্চ, অন্যহাতে ট্রেকিংয়ের লাঠি। পিছন-পিছন বাকি তিনজন।

অকস্মাৎ টুপুরের রক্ত হিম। একটু দূরে বড় পাথরের উপর কী ওটা? ফটফটে চাঁদের আলোয় গায়ের ডোরাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

বাঘ নাকি? এই বরফের দেশে?

নাসিরের গলা ঠকঠক, "ইয়ে তো স্নো-লেপার্ড হ্যায়। বহুৎ খতরনাক। অ্যাটাক করলে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।''

মিতিন ঝাং করে টর্চ ফেলল তুষারচিতার মুখে। চোখ লক্ষ করে। অমনি কাজ হল। তীব্র আলোয় বেজায় চমকেছে চিতা। অস্বস্তিতে নড়ে উঠল যেন। এক-পা, এক-পা করে পিছোচ্ছে। আচমকা উলটো দিকে ঘুরে লাফ মারল। মাত্র কয়েকসেকেন্ডের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল প্রাণীটা।

নাসির বিড়বিড় করছে, "ইয়ে চিতা ইধর কিঁউ আয়া? এসময়ে তো নীচে নামে না খুব একটা?''

পার্থ বলল,"কিছু মরেছে নাকি? কাছাকাছি?''

মিতিন বলল,"উঁহু। স্নো-লেপার্ড শুধু নিজের শিকার করা প্রাণীই খায়।... কিছু মারলটারল নাকি?''

বলতে-বলতে পায়ে-পায়ে এগোল মিতিন। চিতা যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সন্তর্পণে উঠেছে সেখানে। টর্চ চালাচ্ছে এদিক-ওদিক।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কী একটা নড়ছে যেন? মানুষ না?''

ওমা, তাই তো। পাথরের ওপাশে, বেশ খানিকটা নীচে, লোকটার একদম সামনে গিয়ে টুপুর শিউরে উঠেছে। আরে, এ যে দেবল বড়ুয়া!

॥ ১০ ॥

তাঁবুতে বয়ে এনে তক্ষুনি দেবলের শুশ্রূষা শুরু করে দিল মিতিন। মারাত্মক জখম হয়েছে দেবল। কাঁধ নাড়াতেই পারছে না, তার পা দু'খানাও প্রায় অসাড়, পাঁজরেও চোট খেয়েছে জোর। ফেটে গিয়েছে কপাল, মুখমণ্ডলে রক্ত শুকিয়ে জমাট। গা-হাত-পাও ছড়ে গিয়েছে অজস্র জায়গায়।

ফার্স্ট-এড বক্স খুলে তুলো দিয়ে মোছানো হল তার ক্ষত, পায়েও শক্ত করে ক্রেপব্যান্ডেজ বেঁধে দিল মিতিন। খুব কষ্ট হচ্ছে চিবোতে, তাও অল্প করে ম্যাকাডেমিয়া নাটস খেল দেবল। একটু-একটু করে চাঙ্গা হচ্ছে। মনোজ বড়ুয়া মিতিনদের পাঠিয়েছেন শুনে মুখ-চোখও যেন খানিক উজ্জ্বল ক্রমশ।

স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল দেবলের। তবু দুর্বল গলায় যেটুকু যা বলল, রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। ইছরে পৌঁছে নাকি আচমকা

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রকুমার। উপায়ান্তর না দেখে ওখানেই গুম্ফায় আশ্রয় নিতে হয় দেবলদের। দু'রাত সেখানে কাটানোর পর যখন রওনা দিচ্ছে, দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হয় ইছরে। দেবলরা ফুকতাল যাবে শুনে তারাও সঙ্গী হতে চায়। প্রস্তাবটা নাকি মোটেই পছন্দ হয়নি চন্দ্রকুমারের, খারিজ করে দেন তৎক্ষণাৎ। লোকদুটো অমনি তর্ক জুড়ে দিল, ভয় দেখাতে লাগল। চন্দ্রকুমার তো রেগে কাঁই, তার সঙ্গে ওই দু'জনের হাতাহাতি বাধার উপক্রম। অতিকষ্টে দেবলই ঝগড়া থামায়, তখনই খুইয়েছে নিজের মানিব্যাগ।

খেয়াল হয়েছে অনেক পরে। চারজনেই তখন ফুকতালের পথে। ফিরে গিয়ে ব্যাগ খুঁজবে ভাবছে, আবার চন্দ্রকুমারের শরীর গড়বড়। এই নদীর পাড়েই তারা তাঁবু খাটিয়েছিল, একটা বাড়তি দিন রয়ে গেল সেখানে। দ্বিতীয় রাতে হঠাৎ সেই দুই মক্কেল চড়াও হল দেবলদের উপর। কাঠের বাক্সে রাখা পুঁথিখানা তাদের চাই। তাদের হাতে খোলা রিভলভার দেখে চন্দ্রকুমার পর্যন্ত ভয়ে ঠকঠক। অগত্যা যে পুঁথিখানা সে যক্ষের মতো আগলে-আগলে চলছিল, চন্দ্রকুমারকেও যা সে দেখায়নি, ছেড়ে দিতে হল লোকদুটোকে। তার পরে যা ঘটল! পরদিন সকাল হতে না-হতেই লোকদুটো তাকে ঠেলে দিল পাহাড় থেকে! একেবারে নদীর কিনারে গিয়ে পড়েছিল দেবল, প্রায় একদিন জ্ঞান ছিল না, চেতনা ফেরার পর কোনও রকমে ঘষটে-ঘষটে ফেরার চেষ্টা করছিল। পাহাড়ি রাস্তাটায়। মাঝে-মাঝেই তো লোকজন যাতায়াত করে পথ দিয়ে, যদি তারা রক্ষা করে দেবলকে। তাতেও বিপত্তি, বাঘগোছের কোনও একটা প্রাণী খানিক আগে দেবলের কাছে এসেছিল, কী জানি তাকে শুঁকেই চলে গেল...

শুনতে-শুনতে টুপুরের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। পার্থ বলে উঠল, "বোধ হয় আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছিল লেপার্ডটা..."

"আর আমিও এই বিজন বিভুঁইয়ে প্রাণে বেঁচে গেলাম... "

"কিন্তু চন্দ্রকুমার?" মিতিনের প্রশ্ন, "তিনি গেলেন কোথায়?"

"লোকদুটো যা সাংঘাতিক... তাঁকেও হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছে। হয়তো তিনি মরেই গিয়েছেন।"

"হুম।... তা আপনার সব পরিশ্রম তো ব্যর্থ হয়ে গেল।"

দেবলের দাড়িভরা মুখখানা করুণ পলকে। চোখের কোল চিকচিক করছে।

"ভুল তো আপনার," পার্থ গজগজ করছে, "একা এলেই পারতেন। সঙ্গে চন্দ্রকুমারকে আনার কি প্রয়োজন ছিল?"

দেবল ধরা গলায় বলল, "অল্প ক'দিনের আলাপে উনিই তো যেচে আসতে চাইলেন। আমিও দেখলাম পুঁথিখানা আমার কাছে রাখা সেফ নয়।"

"কেন?"

"কাগজে খবরটা বেরনোর পর থেকেই নানান খারাপ-খারাপ প্রস্তাব আসছিল যে। ফোনে। ইমেলে। কেউ দশলাখ টাকা দিতে চাইছে, কেউ অফার করছে বিশলাখ...তা সামান্য কিছু প্রাপ্তির লোভে তো স্যান্ডর কোরোসির ওই পুঁথি বেচতে পারি না। চন্দ্রকুমারের প্রস্তাব পেয়ে আমি তাই দেরি করিনি। অচেনা জায়গায় যাব, একজন উৎসাহী সঙ্গী মিলছে... উনিই টিকিট কেটে ডাকলেন..."

"অমনি বাড়িতে না জানিয়ে চলে এলেন?" পার্থর গলায় এবার অভিভাবকের সুর, "বাবা-মাকে টেনশনে ফেলে..."

"উপায় ছিল না। চন্দ্রকুমার যে অভিযানের কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। ফিরে গিয়ে সবাইকে নাকি উনি চমকে দেবেন।" দেবলের মুখখানা করুণ দেখাল, "আমার স্বপ্নপূরণ হল না। ফুকতালের আগেই বেহাত হয়ে গেল ওই পুঁথি।"

"আশা ছাড়বেন না। আমি তো আছি," অনেকক্ষণ পর মিতিনের গলা শোনা গেল। বাইরে সকাল ফুটছে, সেদিকে তাকিয়ে বলল, "সবার আগে জানা দরকার, আপনি এখন কেমন ফিল করছেন? যেতে পারবেন ফুকতালে?"

"গিয়ে আর লাভ আছে কোনও?... ওরা হয়তো..."

"ওদের কথা ছাড়ুন।... আপনি কী করবেন সেটাই বলুন।"

কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল দেবল, "উহ" করে উঠল যন্ত্রণায়। কাতর গলায় বলল, "শরীর কি চলবে?"

ক্ষণেক চিন্তা করে মিতিন ডাকল নাসিরকে। বলল, "দেবলবাবুকে কি আমাদের খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দেওয়া যাবে? আমার ছেলের সঙ্গে?"

নাসির কাঁধ ঝাঁকাল, "জরুর। এমন ভাবে রসসি বেঁধে দেব, বিনা তকলিফে দেবলজি পৌঁছে যাবেন।"

"বেচারা প্রাণীটা এত লোড টানতে পারবে তো? এই পাহাড়ি রাস্তায়?"

"আরামসে। এটাই তো ওর কাজ ম্যাডামজি। রুটি-রুজি।"

ব্যস, সমাধান হয়ে গেল। বাঁধা-ছাঁদা সেরে একঘণ্টার মধ্যে রওনা। পাহাড়ি বাহনটিকে লাগাম ধরে সামলে-সামলে নিয়ে চলেছে নাসির। আজকের রাস্তা আরও বিঘ্নসঙ্কুল, চড়াই উৎরাই আরও বেশি, তবু যেন কালকের মতো কষ্ট হচ্ছে না। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে কত যে কারুকার্য, নয়ন মেলে দেখতে-দেখতে ক্লান্তি যেন উবে যাচ্ছে। শুধু একটা বিচিত্র জায়গায় এসে হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল হঠাৎ। এক পাহাড় ছেড়ে আর-এক পাহাড়ে উঠছিল টুপুররা, মধ্যিখানে পাথুরে পাঁচিলের নীচে সকাল দশটায় কী যে ঘন অন্ধকার! ঠিক সেখানেই উপর থেকে ভীমবেগে নেমে আসছে হিমবাহ গলা জল, বিপুল গর্জন তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সরাপে। একটা ছোট্ট কাঠের ব্রিজ ধরে পেরতে হল ধারা, পায়ের চাপে মড়মড় করছে দুর্বল পাটাতন। ওই আঁধার, জলের হুঙ্কার, দুলন্ত সাঁকো, কেন যেন খচ্চরটিও আচমকা ছটফট করছে... সব মিলিয়ে এক করাল আতঙ্কের পরিবেশ। আশ্চর্য, কয়েকমিনিট পরে যেই নীল আকাশের দর্শন মিলল, আবার সব কিছু একদম স্বাভাবিক, হুস করে পালিয়ে গেল আকস্মিক ভয়ডর।

পথে একটা গ্রামও মিলেছে। মাত্র আটদশ ঘর মানুষের বাস। লোকগুলো ভারী ভাল। টুপুর যেই না বলছে "জুল্লে," অমনি সবাই মিলে কোরাসে ধ্বনি তুলছে, "জুল্লে-জুল্লে।" বুমবুমকে দেখে তারা কী খুশি, পাহাড়ি বউ-মেয়েরা তাকে আদর করছে খুব। বুমবুমের সুবাদে না চাইতেই খাবার মিলল, গরম-গরম সেদ্ধ চট জলদি নুডলস যেন অমৃত হয়ে গলা দিয়ে নামছে। এই প্রায় নির্জন জনপদেও ছোট্ট একটা স্কুল। পাহাড়ি পথ ভেঙে দূর-দূর গাঁ থেকে পড়তে এসেছে জনাপনেরো-কুড়ি বাচ্চা, দেখে তো টুপুর অভিভূত। আহা রে, এরা তো এই দেশেরই ছেলেমেয়ে, অথচ কত কষ্ট করে যে এদের লেখাপড়া শিখতে হয়।

সরাপ নদী আগাগোড়াই চলছে টুপুরদের পাশে-পাশে। নদীর ওপারে পটে আঁকা ছবির মতো গ্রাম। মাঠেঘাটে চাষও হচ্ছে, এখনই গ্রামের মাটি গাঢ় সবুজ। লাল পাহাড়ের মাঝে ওই সবুজটুকু কী যে মধুর লাগে। চারটে নাগাদ থামল টুপুররা। বাঁয়ে একটা পোক্ত লোহার সেতু, সেখানে আর-একটা নদী এসে মিলেছে সরাপের সঙ্গে।

মিতিন বলল, "এটাই তো পুর্নে ব্রিজ। সোজা রাস্তাটা চলে গিয়েছে দারচায়।"

নাসির সায় দিল, "হাঁ ম্যাডামজি। এবার বাঁয়ে যেতে হবে। ব্রিজের ওপারে।"

বেশি দূর এগোতে হল না। ব্রিজের একটু পরেই লোকালয়। এদিকের আর-পাঁচটা গ্রামের চেয়ে চেহারা অনেকটা আলাদা। পাকা দোতলা বাড়ি আছে, ঘরদোরও বেশি, এমনকী একটা রেস্তরাঁও মজুত। বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'প্যারাডাইস কাফে'। নীচে লেখা, 'ওয়েলকাম টু লুংনাক ভ্যালি, ল্যান্ড অফ বুদ্ধ'।

বেরিয়ে এসেছেন এক মহিলা। হাতজোড় করে আমন্ত্রণ

জানাচ্ছেন। তার সঙ্গে কথা বলে পার্থ দারুণ খুশি। এখানে ফারনিশড ঘর মিলবে, কমোড সমেত। পিছনেই আছে রুমগুলো। ঝটিতি বুক করে এল তিনখানা রুম। আজ রাতটা সে একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে চায়।

সারাদিন খচ্চরের পিঠে ঠায় বসা দেবল খুবই কাহিল। নাসির আর মিতিন মিলে তাকে ধরাধরি করে নামাল। বুমবুমও আবার অবতরণের সুযোগ পেয়ে মহা আহ্লাদিত। ঘুরে-ঘুরে দেখছে রেস্তরাঁ। অতি সাধারণ বন্দোবস্ত প্লাস্টিকের টেবিল-চেয়ার আছে কয়েকখানা। দেবলকে এনে বসানো হল চেয়ারে। খানা বলতে আছে রুটি আর রাজমা, তবে বানাতে সময় লাগবে। এক্ষুনি মিলবে শুধু চট জলদি নুডলস, এই খাদ্যটিই পাহাড়ে সবচেয়ে বেশি চালু।

পার্থ, বুমবুম আর নাসির এক টেবিলে, বাকিরা পাশেরটায়। সুড়ুৎ সুড়ুৎ নুডুলস গিলতে-গিলতে মিতিন কথা বলছিল মহিলার সঙ্গে। হিন্দি-ইংরেজির মাঝে একটা-দুটো স্থানীয় শব্দ মিশিয়ে। কাজে লাগতে পারে ভেবে কলকাতা থেকে বেরনোর সময়েই নাকি শিখে এসেছে মিতিন। মহিলাই বললেন, এখানে নাকি দারচা-মানালি রুটের ট্রেকাররা বারোমাস ভিড় জমায়, বিদেশিদের আনাগোনাও লেগে থাকে বছরভর। কেউ সামনের মাঠে তাঁবু খাটায়, কেউ বা ওঠে হোটেল রুমে। তবে এখন তেমন কেউ নেই, শুধু তিনজন এসেছে পরশু। তারা দু'খানা রুম নিয়েছে বটে, কিন্তু গতকাল সকালে সেই যে দু'-আড়াইঘণ্টার পথ ফুকতাল দেখতে বেরল, এখনও ফেরেনি।

"চন্দ্রকুমার আর বাকি দু'জন... সবাই এক দলে?" টুপুর বেশ অবাক হয়েছে, "ওরা না ইছরে ঝগড়া করেছিল? তার পরেও তো নাকি..."

"স্রেফ নাটক। দেবলের কনফিডেন্সে থাকার তাল," পার্থ বিজ্ঞের মতো রায় দিল। ভুরু কুঁচকে মিতিনকে বলল, "কিন্তু পাখি কি উড়ে পালাল? অন্য পথে?"

মহিলা জানালেন ফুকতাল থেকে ইছরে যাওয়ার আর-একটি রাস্তা আছে, চা-আনমো-জেতাং হয়ে। কিন্তু ওই পথে ধস নেমেছে, যাওয়া-আসাও বন্ধ।

"ওয়াও। ক্যাচ, কট, কট," পার্থ পলকে উজ্জীবিত। দেবলকে বলল, "আর আপনার ভাবনা নেই ভাই। স্যান্ডরসাহেবের বইটাও রক্ষা পেয়ে গেল।"

দেবলের দু'চোখে আলো জ্বলে উঠল, "ভরসা দিচ্ছেন?"

"আমি না, ভরসা দেবেন উনি," মিতিনকে দেখাল পার্থ। মিতিনকেই বলল, "কী ম্যাডাম, আপনার গণনা কী বলছে? তারা কি অলরেডি গুম্ফা থেকে স্যান্ডরসাহেবের বইখানি হাতিয়ে ফেলেছে? না এখনও লড়ে যাচ্ছে?"

দেবল চোখ পিটপিট করল, "ফুকতালে? স্যান্ডর কোরোসির কী বই?"

"সে তো আপনিই ভাল জানেন," পার্থ হাসছে, "ওই যে, গেতংপা না কী যেন নাম? ফুকতাল গুম্ফায় বসে নাকি রচনা করেছিলেন স্যান্ডরসাহেব?"

"ও তো একটা আদ্যিকেলে মিথ। ওরকম কোনও বই তো সত্যিই নেই।"

"মানে?" পার্থ প্রায় পড়ে যাচ্ছিল চেয়ার থেকে, কোনও মতে সামলেছে। বিস্ফারিত চোখে বলল, "তা হলে আপনি ফুকতালে যাচ্ছিলেন কেন?"

একবার পার্থকে দেখল দেবল, একবার মিতিনকে। তারপর ঢোক গিলে বলল, "যে পুঁথিটি আমার কাছে ছিল, ওটি বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গেতংপা। আমি যাচ্ছিলাম পুঁথিখানি ফুকতালে রেখে আসতে।"

"বলেন কী? কেন?"

"স্যান্ডর কোরোসি ওই নির্দেশই যে লিখে গিয়েছেন স্বহস্তে। পুঁথিটি যেন রক্ষিত হয় নদীপাড়ের সেই অনাদি প্রাচীন গুহা গুম্ফায়, যার প্রতিষ্ঠা করেছেন লামা জংখাপার শিষ্য গেলুপা বৌদ্ধ শ্রমণ গাংসেম-সেরাপ-জাংপো, যেখানে বসে সাধনা করেছেন মহাগুরু পদ্মসম্ভব। সমস্ত শর্ত মেনে, ওই পুঁথিতে আঁকা দিক নির্দেশ মিলিয়ে তবে না মহান ফুকতাল গুম্ফার সন্ধান মিলেছিল।"

"ও। ফুকতাল গুম্ফায় তা হলে কিছুই লুকনো নেই।"

"আমার পড়াশোনা তো তাই বলছে। অবশ্য গুম্ফাটি দর্শনীয়। গেলুপা বৌদ্ধদের খুব পবিত্র স্থানও বটে।"

পার্থ হঠাৎ হাহা হেসে উঠল। হাসি তার আর থামছেই না। টুপুরেরও পেটে বুড়বুড়ি কাটছিল। এত সামান্য কারণে এমন একটা অভিযান, ভাবা যায়? দিল্লি থেকে যারা এসেছে কি ঠকানটাই না ঠকল তারা? এখন হয়তো দু'জনে, থুড়ি তিনজনে, ফুকতালে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে!

মিতিন হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তা আপনার আসার উদ্দেশ্যটি নিশ্চয়ই চন্দ্রকুমারকে বলেননি?"

"এড়িয়ে গিয়েছি। জানলে তিনি আসতেন নাকি?"

"কী বলেছিলেন তাঁকে?"

"সত্যি-মিথ্যের মাঝামাঝি। বিশেষ একটা কারণে স্যান্ডরসাহেবের পুঁথিখানি অনুসরণ করে লাদাখের একটি গুম্ফায় যেতে হবে।"

"হুম," মিতিন কয়েকসেকেন্ড টরে টক্কা বাজাল টেবিলে। আঙুল থামিয়ে গম্ভীর ভাবে দেবলকে বলল, "আপনি খুব টায়ার্ড। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আজ আর একদম বেরবেন না। নাসিরভাই, আপনিও ওঁর কাছে থাকুন। প্লিজ়।"

দেবল মিনমিনে গলায় বলল, "আমি কিন্তু এখন অনেকটা বেটার।"

"আহ্, যা বলছি, করুন। অনেক গোল পাকিয়েছেন, এবার ঠান্ডা মাথায় জট ছাড়াতে দিন।"

ধমকে কাজ হয়েছে, টেবিলে ভর দিয়ে উঠল দেবল। নাসির এসে ধরেছে তাকে, নিয়ে যাচ্ছে রুমে। মিতিনও গেল সঙ্গে। ফিরল মিনিটপনেরো পর। কাঁধে ঢাউস ব্যাগখানা চাপিয়ে। শীতল স্বরে বলল, "আমি একটু বেরচ্ছি।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "তোরা এখানেই থাকিস। এদিক ওদিক কোথাও ঘোরাঘুরির দরকার নেই।"

পার্থ অপ্রসন্ন মুখে বলল, "যদি চন্দ্রকুমার আর ওই লোকদুটো চলে আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ জমাব কি? না এখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব?"

পার্থকে একবার দেখে নিয়ে মিতিন বলল, "রাতে না ফিরলে চিন্তা কোরো না। সকালে ফুকতাল রওনা দিও।"

হনহনিয়ে হাঁটা দিল মিতিন। দু'মিনিটে গ্রাম ছাড়িয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

টুপুর আর পার্থ হতবুদ্ধি। বুমবুমও ভ্যাবাচ্যাকা। কারওর কিছু করার নেই, বসে-বসে সময় কাটাও। হাঁ করে আকাশ দেখছে টুপুর। একসঙ্গে তিন-চার রকমের নীল ছড়িয়ে আছে আকাশময়। হঠাৎ নীলের মাঝেই সাদা বিন্দু। আস্তে-আস্তে বড় হচ্ছে বিন্দুটা। কখন যে বিন্দুটাকে ঘিরে একটা মেঘ তৈরি হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, মেঘটা ছোট হচ্ছে যে। দেখ না-দেখ, মেঘটা মিলিয়েই গেল শূন্যে। এমন দৃশ্য বুঝি শুধু এখানেই মেলে। ঠিক যেন কেসটার মতো। একটা পুঁথি ঘিরে দানা বাঁধল রহস্য, আবার যেন উবেও গেল। কেন যে এখনও ছোটাছুটি করছে মিতিনমাসি।

ভাবনার মাঝে কখন যেন অন্ধকার নেমেছে। বইছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। পার্থ-বুমবুম সামনের মাঠে হাঁটছিল, এবার তোড়জোড় করছে ঘরে যাওয়ার।

তখনই হঠাৎ মাসির গলা। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে-বলতে ফিরছে। সামনে আসতেই চেনা গেল। চন্দ্রকুমার। সঙ্গে দু'জন গাঁট্টাগোট্টা লোক। তিনজনেরই মুখ শুকনো, চেহারা যেন ঝোড়ো কাক। মিটিমিটি হেসে মিতিন আলাপ করিয়ে দিল টুপুরদের সঙ্গে। তারপর হাসি মুখেই সবাইকে নিয়ে চলেছে দেবলের ঘরে।

দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে আসছিল তিনমূর্তি। তক্ষুনি যেন বদলে গেল মিতিন। ব্যাগ খুলে কী বের করছে মাসি? রিভলভার।

মিতিনের গলা বজ্র কঠোর, "ডোন্ট মুভ। ডোন্ট ফোর্স মি টু শুট। এবার সুড়সুড় করে আপনাদের রুমে চলুন।... নাসিরভাই, ফোর্স কখন পৌঁছচ্ছে?"

অমনি নাসিরের তুরন্ত জবাব, "এনি মোমেন্ট ম্যাডামজি। সকালেই তো পদুম থানায় খবর চলে গিয়েছে। রাত্রে না এলেও কাল দুপুরের মধ্যে তো আসছেই।"

"গুড। এঁদের আপাতত রুমে পুরে তালা দিয়ে দিন," মিতিনের গলায় পুরো পুলিশি মেজাজ, "আর হ্যাঁ, ওঁদের ফায়ার আর্মসগুলোও জিম্মা করে নিন। মোটরসাইকেলের টুলবক্সটাও। কেসের জন্য ওটা খুব ভাইটাল। ভিতরে একটা পুরানা কিতাব আছে, সাবধানিসে রাখনা।"

"ইয়েস ম্যাডামজি। আমি সব নিয়ে রাখছি।"

নাসির যেন অফিসারের বাধ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট। নির্ঘাত মাসি ট্রেনিং দিয়েছে, বুঝে গেল টুপুর। মাসির আকস্মিক ভোলবদলে তিনমূর্তি কিন্তু বেজায় নার্ভাস। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। কারওর মুখেই বাক্যি সরছে না।

মিতিন এবার চন্দ্রকুমারের দিকে ফিরেছে। একপা-একপা করে একদম সামনে গিয়ে হিমেল স্বরে বলল, "মিঃ ত্রিবেদী, আশা করি দরজা-জানলা ভেঙে পালানোর ছেলেমানুষি করবেন না। আপনাদের জেনে রাখা ভাল, ইছরে রেখে আসা মোটরসাইকেলটিও এখন পুলিশের হেফাজতে।"

এবার কথা ফুটেছে চন্দ্রকুমারের। মিনমিন করে বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের অপরাধটা কী?"

"কতগুলো বলব? মিথ্যা পরিচয় দিয়ে দেবল বড়ুয়ার বিশ্বাস অর্জন, একটি ধর্মীয় স্থান থেকে মূল্যবান পুঁথি চুরির চক্রান্ত, একটি নিরীহ যুবককে হত্যার ষড়যন্ত্র..." এতক্ষণ চোস্ত হিন্দিতেই হুকুমদারি চালাচ্ছিল মিতিন। আচমকা নিখাদ বাংলায় বলল, "আচ্ছা চন্দ্রকুমারবাবু, গুপ্তপুঁথির আশায় আপনি মনোজ বড়ুয়াকে এখনও পর্যন্ত কত টাকা দাদন দিয়েছেন? পাঁচলাখ, দশ, কুড়ি? নাকি আরও বেশি? কিন্তু সেই পুঁথিটাই তো নেই। সব টাকা জলে গেল তো।"

মিতিনমাসির সপ্রতিভ অভিনয়ে মুগ্ধ হচ্ছিল টুপুর। তিনমূর্তির একটু-একটু করে নুয়ে পড়াও মন্দ লাগছিল না। কিন্তু শেষ অংশটিতে টুপুর স্তম্ভিত। মুখ হাঁ হয়ে আছে পার্থমেসোর, বন্ধ হচ্ছে না। বুঝি বিস্ময়ে আটকে গিয়েছে চোয়াল।

এ যে অবিশ্বাস্য। নাকি লোভের দুনিয়ায় এটাও স্বাভাবিক? মাথায় ঢুকছিল না টুপুরের।

॥ ১১ ॥

সন্ধে নেমেছে পদুমে। টুরিস্ট বাংলোর বিছানায় হাত-পা মেলে দিয়েছিল টুপুর। চোখ বুজে অভিজ্ঞতা সাজাচ্ছিল মনের ভাঁড়ারে। বারবার ভেসে উঠছে ফুকতালের সেই বিচিত্র গুম্ফা। পাহাড়ের মুখে ঠিক যেন একটা মৌচাকের মতো ঝুলছে। ভিতরটাও কেমন রহস্যমাখা। প্রায় অন্ধকার ঘরে জ্বলছে মোমবাতি, মোঙ্গলিয়ান ছাঁদের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে নিমীলিত চোখে ধ্যান করছেন হলুদ টুপির লামারা, অদ্ভুত একটা ঘি পোড়া গন্ধ আসছে কোথা থেকে, গম্ভীর একটা ধ্বনি ভাসছে বাতাসে। কত যে ছোট-ছোট কুঠুরি গুম্ফায়। আলোবাতাসহীন ওই সব ঘরগুলোতেই কী প্রসন্ন মুখে বাস করছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দল। ফুকতাল যাওয়ার রাস্তাটাও যে কী বিচিত্র। ঘন-ঘন পাহাড়ি বাঁক, কোথা থেকে যে উদয় হচ্ছে নতুন-নতুন পাহাড়। সেগুলোর মাথাও যেন অবিকল কোনও মন্দিরের চূড়া। অত খাঁজখোজ পেরিয়ে অমন একটা অগম্য জায়গায় কেন যে দু'-আড়াইহাজার বছর আগে আস্তানা গেঁড়েছিল মানুষ? ভগবানের আরাধনা করতে হলে এত নির্জনতা লাগে? নীচের ওই সুন্দর খাজিয়ার নদীটা নাকি বছরে আটমাস বরফ হয়ে থাকে, ভাবা যায়।

"কীরে টুপুর, লেটে গেলি নাকি? খুব টায়ার্ড?"

পার্থমেসোর গলা। মেসোর পিছন-পিছন গোটা দলটা। তিনদিনে দেবল অনেকটাই সমে ফিরেছে, হাঁটছে টলোমলো পায়ে। নিজেই চেয়ার টেনে বসল। স্যান্ডর কোরোসির বাংলা গেতংপাটি স্বহস্তে ফুকতাল গুম্ফার প্রধান লামাকে সমর্পণ করতে পেরে তার মন এখন সদাই প্রসন্ন, উবে গিয়েছে ব্যথাবেদনা। নাসির তো ভক্ত বনে গিয়েছে মিতিনমাসির, তার ছায়ার মতো ঘুরছে সারাক্ষণ। তিন বজ্জাতকে দিনভর পাহারাদারির সময়েই বুমবুম আর নাসিরে ভারী দোস্তি হয়েছে, এখনও কী এক বিচিত্র ভাষায় দিব্যি গল্প করছে দু'জনে।

পার্থ বিছানায় বসে তারিফের সুরে বলল, "তোর মাসি একটা খেল দেখাল বটে। শুধু ভয় দেখিয়েই দু'-দুটো দিন একটা ঘরে আটকে রাখল তিন মক্কেলকে।"

মিতিন হাসছে, "ওইটুকু ঝুঁকি নিতেই হয়েছিল। জানিই তো গুন্ডা-বদমাস-ক্রিমিনালরা বেসিক্যালি ভিতুই হয়। কারণ প্রকৃত সাহসী মানুষরা সাধারণত অপরাধপ্রবণ হয় না। তা ছাড়া বুঝেই গিয়েছিলাম, এরা খুন-খারাপির লোক নয়। তত সাংঘাতিক হলে, দেবলকে কি জ্যান্ত ছেড়ে যেত? আর পুঁথিটা না পেয়ে ওরা তখন এতটাই হতাশ, ওদের আর প্রতিরোধের ক্ষমতাই ছিল না।"

"মিঃ ওয়াংচুক কিন্তু যথেষ্ট ঝুলিয়েছিলেন। এলেনই তো দু'দিন পর।"

"যুক্তি দিয়ে ভাবো। ওদের পাকড়াও করার পরদিন সকালে চিঠি পাঠালাম। তা গ্রামের সেই লোকটাকে তো পদুমে পৌঁছতে হবে। উনি তো তার পরদিনই পড়িমড়ি করে হাজির হয়েছিলেন। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে সেটাই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি মশাই। তিনজনকেই গারদে পুরেছেন, ব্যস এতেই আমি নিশ্চিন্ত।"

"তা বটে," পার্থ মাথা নাড়ল। পরক্ষণে চোখ সরু করে বলল, "এবার কি মহারানিকে একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারি? আশা করি আর এড়িয়ে যাবে না?"

মিতিন ঠোঁট ওলটাল, "শুনি, কী জানতে চাও?"

"মনোজবাবুর স্টেটমেন্টে অনেক গলতি ছিল, মানছি। কিন্তু তাঁকে এই দেবলদের অভিযানের সঙ্গে লিঙ্ক করলে কীভাবে?"

"গোটা ঘটনাটা মনে-মনে সাজাতে হয়েছে। হয়তো অবিকল এভাবেই ঘটেনি, তবু অনেকটাই মিলে যাবে।"

"কীরকম?"

"বাড়িতে পুঁথিটি মেলার পর শুধু দেবলবাবুই যে লোভনীয় অফার পেয়েছিলেন, তা নয়। মনোজবাবুকেও তো অনেকে অ্যাপ্রোচ করেছে। সেরকমই একজন লোক চন্দ্রকুমার ত্রিবেদী। কলকাতার একজন সন্দেহজনক অ্যান্টিক ডিলার, আন্তর্জাতিক বাজারেও যাঁর কিঞ্চিৎ পরিচিতি আছে। সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, চোরাচালানদার বলেই তাঁর খ্যাতি। পুঁথিটি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি নেমে পড়লেন আসরে। স্যান্ডরসাহেবের গুপ্তপুঁথি সম্পর্কিত প্রবাদটি তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। পুঁথিটির বাজারদরও যাচাই করে নিলেন। তারপর ঐতিহাসিকের মিথ্যে পরিচয়ে ভালমানুষ ছেলেটার সঙ্গে মিতালি পাতালেন ফেসবুকে। দেবলের কাছে ভাসা-ভাসা কিছু তথ্য পেয়ে তিনি এবার গোপনে যোগাযোগ করলেন

বাবার সঙ্গে, তাঁকে মোটা একটা অগ্রিম ধরিয়ে দিয়ে গুপ্তপুঁথিটির মালিকানার ব্যাপারে নিশ্চিন্তও হলেন মোটামুটি। কিন্তু তার জন্য ছেলেটিকে তো নিয়ে যেতে হবে সেই গুম্ফায়। মনোজবাবুই তখন ব্যবস্থা করলেন দেবলকে পাঠানোর। চন্দ্রকুমারের নাম করে প্লেনের টিকিটও এসে গেল দেবলের হাতে।''

দেবল নীরবে শুনছিল। মৃদু স্বরে বলল, "আমি কিন্তু এসব কিছু জানতাম না, বিশ্বাস করুন। টিকিটও ছিল চন্দ্রকুমারবাবুর কাছে। দমদম এয়ারপোর্টেই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।''

টুপুর বলে উঠল, "ও তুমি বলছ ছেলের জন্য মনোজবাবুর দুশ্চিন্তা ধাপ্পাবাজি? কিন্তু তোমাকে দু'লাখ টাকার চেক দেওয়াটাও তো হিসেবে মেলে না মিতিনমাসি।''

"ভাবনাটা আরও ছাড়া'' মিতিন সামান্য আনমনা সুরে বলল, "মনোজ ছেলেকে লুকিয়েই টাকাপয়সার ডিল করেছেন বটে, কিন্তু তিনি তো বাবা। চন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেবলকে পাঠানোর পরই তাঁর মনে হল, কাজটা হয়তো ঠিক হয়নি। যে লোক অবলীলায় কিছু না পেয়েই দশলাখ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে যায়, সে তো টাকার জন্য তাঁর ছেলেকে হাপিসও করে দিতে পারে। ছেলে চোখের আড়াল হওয়ার পর ভয়টা আরও বেড়ে গেল মনোজের। তাই না আমার কাছে দৌড়ে আসা।''

পার্থ তেরচা চোখে তাকাল, "তুমি আন্দাজ করলে কীভাবে মনোজবাবুই দেবলবাবুদের কাশ্মীর পাঠিয়েছেন?''

"উঁহু, এটা অনুমান নয়,'' মিতিন ভুরু নাচাল, "একটু দুষ্টুমি করতে হয়েছে মশাই।''

"কীরকম?''

"শঠে শাঠ্যং,'' দেবলকে একবার দেখে নিয়ে মিতিন চোখ টিপল, "মনোজবাবুর কার্ডে ওঁর ইমেল আই ডি ছিল। ওঁর মেলগুলো হ্যাক করলাম। হ্যাঁ, কাশ্মীরগামী বিমানের টিকিট ওঁর ইনবক্সে মজুত। চন্দ্রকুমারের নামও তো ওখানেই মিলল। দেবলের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ফ্রেন্ড লিস্ট থেকেও পেলাম নামটা। অনিশ্চয় মজুমদার চন্দ্রকুমারের আসল পরিচয়টা কনফার্ম করলেন। যদিও অতীতে শ্রীঘর বাস করেননি চন্দ্রকুমার, কিন্তু পুলিশের কালো তালিকায় তাঁর নাম তো আছেই। এর পরেও অঙ্ক না মিলে পারে?''

"ও। নাটকটা জেনেই প্লেনে উঠেছিলে? তার পরেও অত তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিল?''

"ছিল মশাই,'' মিতিন একটু গম্ভীর হল, "বাবার সাইকোলজি স্টাডি করতে পেরেছিলাম বলেই গোড়া থেকে অত সিরিয়াস ছিলাম, কোথাও সময় নষ্ট করতে চাইনি। বুঝতে পারছিলাম দেবল যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়বে। প্লাস উনি একটা হিন্টও দিয়েছিলেন। দেবল নাকি তাঁকে ফোনে বলেছে তার পিছনে ফেউ লাগতে পারে।''

দেবল অবাক মুখে বলল, "কিন্তু আমি তো বাবাকে ফোন করিনি। চন্দ্রকুমার মানা করেছিলেন।''

"ফোন চন্দ্রকুমার নিজেই করেছিলেন। কাশ্মীরের হোটেল থেকে। ওটাই তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। তখনই মনোজবাবু আভাস পেয়েছিলেন, চন্দ্রকুমার তাঁর আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সহকারীদের দিল্লি থেকে আমদানি করছেন। নার্ভাস হয়েও দু'-তিনদিন দোলাচলে ভুগে অবশেষে তিনি বেসরকারি গোয়েন্দার শরণাপন্ন হন,'' মিতিন অল্প হাসল, "কী দেবলবাবু, আমার হিসেবে কি ভুল আছে মনে হয়?... বাড়ি গিয়ে স্বচ্ছন্দে মেলাতে পারেন। আর বোধ হয় লুকোছাপা করবেন না মনোজবাবু।''

জবাব দিল না দেবল। মাথা নামিয়ে বসে। বোধ হয় বাবার কৃতকর্মের লজ্জা এড়াতে।

বাংলোর কর্মচারীটি এসে ডাকছে। রাতের আহার প্রস্তুত, পরোটা আর সবজি, মিতিনরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে তারও ছুটি মেলে।

গুটি-গুটি পায়ে ডাইনিং হলে যাচ্ছে টুপুররা। পথে পার্থ থামাল টুপুরকে। নিচু গলায় বলল, "তোর মাসির তো লস হয়ে গেল রে?''

টুপুর ফিসফিস করল, "কেন গো?''

"পুঁথি নেই, চন্দ্রকুমার অ্যান্ড কোম্পানি জেলের লপসি খেতে চলেছে, কলকাতায় ফিরে পাঁচলাখের বাকি টাকা চাইতে গেলে মনোজবাবু না পেটান।''

মিতিনের ঠিক কানে গিয়েছে কথাটা। মুচকি হেসে বলল, "আমার হিসেব কিন্তু বলছে টাকাটা মিলবে। তবে মনোজবাবুর আর দর্শন পাব কিনা বলা কঠিন।''

এমনটা কি করে সম্ভব? টুপুরের মাথায় ঢুকছে না।

আশ্চর্য, তাই কিন্তু ঘটল। দেবলকে নিয়ে কলকাতায় ফেরার আটচল্লিশঘণ্টার মধ্যে দরজায় দেবল। হাতে তিনলাখ টাকার চেক। মনোজ বড়ুয়া ধন্যবাদ জানিয়েছেন মিতিনকে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

মিতিনমাসির গণনায় মোহিত টুপুর। কিন্তু সহসা উদাসও। দরজায় দেবলকে দেখামাত্র আবার যে মনে পড়ে গিয়েছে সেই অসামান্য রূপবান উপত্যকা। লাল পাহাড়ের দেওয়াল ঘেরা, ছাদ সেখানে নীল আকাশ। তাদের আলোয় মোহিনী হয়ে ওঠে রাত, তুষারচিতাও সেখানে হিংস্রতা ভুলে মানুষকে মারতে ভুলে যায়। বাতাসের তুলি দিয়ে পাহাড়ের ক্যানভাসে সেখানে রং বোলায় প্রকৃতি। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের ফারাক সেখানে এক ফুটও নয়, অথচ নিসর্গের মোহে মনেই পড়ে না সে কথা।

এমন অপরূপ জাঁসকর উপত্যকাতেও কেন যে অকারণে লোভের থাবা বাড়ায় মানুষ! ভাবলেই ব্যথিয়ে ওঠে টুপুরের মনটা। এখনও।